১৩২০ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র-সূচী

কাৰ্ত্তিক প্ৰেস। নিকুঞ্জে ... কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

প্রাচীন চিত্র হইতে

৩৭শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২০ [৭ম সংখ্যা

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১১)

স্বামী নারায়ণ

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সমস্ত অনীতিগর্ভ আচার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বামী নারায়ণ ধর্ম্ম সমুত্থিত হয়। সহজানন্দ স্বামী-এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। গুজরাটে তাঁহার অন্যূন দুই লক্ষ অনুচর। সহজানন্দ রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। (১) যে সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গলাদেশে মূর্ত্তিপূজার স্থানে একেশ্বরবাদের বীজ বপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, সহজানন্দ স্বামীও তখন গুজরাটে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনীতি-কলঙ্ক অপনোদন করিয়া বিশুদ্ধ নীতিমার্গ প্রদর্শন করিতে তৎপর ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, সংযমী উদারচরিত সাধুপুরুষ ছিলেন। সহজানন্দ অযোধ্যার অন্তর্গত চপাই গ্রামে ১৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুজরাটে জুনাগড় নবাবের অধীনস্থ একটি গ্রামে আসিয়া রামানন্দ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮০৪ অব্দে স্বামীর সহিত আহমদাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কি-এক সরল মাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি ছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি অনুরক্ত শিষ্যদলে পরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে আহমদাবাদের ব্রাহ্মণগণের ও কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি অত্যাচার ভয়ে আহমদাবাদ ছাড়িয়া তাহার ৬ ক্রোশ দক্ষিণ জয়তলপুর গ্রামে চলিয়া যান ও তথায় এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহার এই সকল উদ্যোগে গোলযোগ আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপুরুষেরা স্বামীকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করেন কিন্তু তাহার ফল উল্টা হইল। লোকের হৃদয় তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট ও তাঁহার

(১) রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩

আধিপত্য শতগুণ বৃদ্ধি হইল। শীঘ্রই তিনি কারামুক্ত হইলেন ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ আসিয়া জুটিল। সহজানন্দ তখন ‘স্বামী নারায়ণ’ নাম গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে বিশপ হীবর গুজরাটে গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার Journal নামক গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা এইরূপ :—

“এই সাধুপুরুষ মধ্যমাকৃতি, কৃশাঙ্গ, প্রায় আমার সমবয়সী, সাদাসিদে সহজ মানুষের মত বিনীত নম্রস্বভাব—তাঁহার আকার প্রকারে অসাধারণ প্রতিভার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম এক দেখিলাম অন্য দৃশ্য—তিনি প্রায় দুই শত ঘোড়-সোয়ার সঙ্গে মহা ঘটা করিয়া আমার
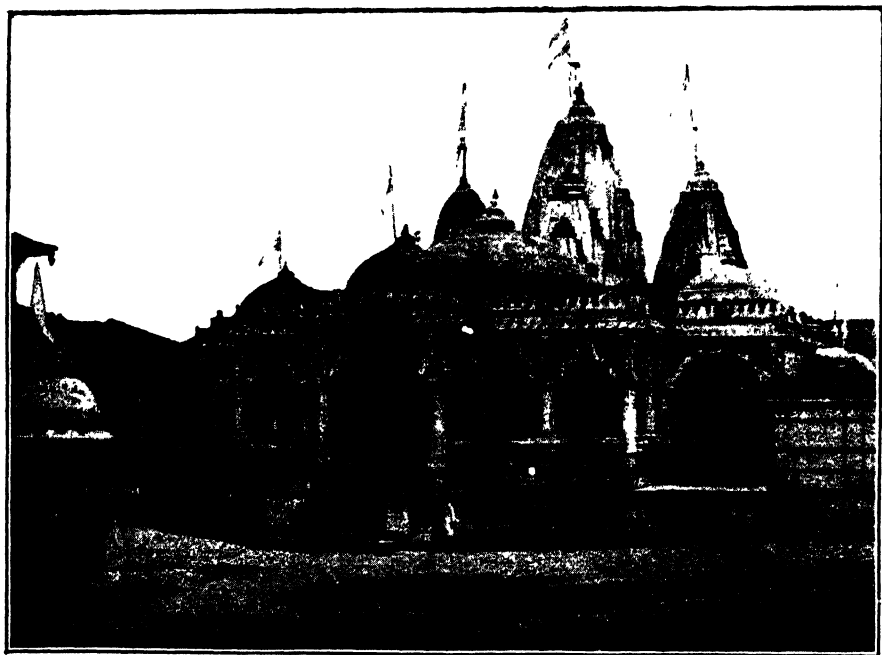
স্বামীনারায়ণ মন্দির।

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুইজন ধর্ম্মাধ্যক্ষ এইরূপ সৈন্য সামন্ত লইয়া সহর তোলপাড় করিয়া তুলিলেন, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম। আমার সৈন্যদল যদিও অল্পসংখ্যক তথাপি শিক্ষা ও শস্ত্রবলে বলবত্তর, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে অন্য হিসাবে কত তফাৎ! আমার সেনাগণ আমাকে জানে না চেনে না, যন্ত্রের ন্যায় আমার কাজ করিয়া যাইতেছে কিন্তু আমার সহিত তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই। স্বামীর রক্ষকগণ তাঁহার শিষ্য, অনুরক্ত ভক্ত, তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য দূর দূর হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত হইয়াছে, তাঁহার কোন বিপদ হইলে শরীরের রক্ত দিয়া তাঁহার

সংরক্ষণে প্রস্তুত—হায়, খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রতি ভারতবর্ষীয়দের প্রীতি ও অনুরাগ এইরূপ কবে হইবে!" Bishop Heber's Journal—CH.XXV.

সহজানন্দ শীঘ্রই বুঝিলেন যে তাঁহার বিচ্ছিন্ন শিষ্যদের লইয়া একটি দলবন্ধনের প্রয়োজন, এই উদ্দেশে তিনি শিষ্যগণসহ বর্ত্তাল নামক এক বিজন পল্লীতে গিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও তথা হইতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এইক্ষণে বর্ত্তাল গ্রামে স্বামীনারায়ণ পন্থীদের দুইটি মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে রাধিকা ও বামে স্বামী-নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি। কেমন সহজে তিনি কলিকালের দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন—আশ্চর্য্য! আমাদের দেশে সাধু পুরুষের দেবাসন অধিকারের জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না।

এই ধর্ম্মপ্রাণ স্বামী তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামীনারায়ণ ধর্ম্ম ক্রমে গুজরাটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামিজী স্বীয় কার্য্য পরিদর্শনার্থে ভ্রমণে বাহির হইতেন—ভ্রমণ পথে অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কাঠেয়াডে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

স্বামী নারায়ণ পন্থীর দুই শ্রেণী—সাধু ও গৃহস্থ। সাধুরা অবিবাহিত, গেরুয়া বসন-ধারী সন্ন্যাসী। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০০০। ইহারা সমুদায় সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। জাতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি—চাষা কুলি প্রভৃতি হীনজাতীয় লোকের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। স্বামী-নারায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থের নাম শিক্ষাপত্রী। ইহা স্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় দুই শত দ্বাদশ শ্লোকে বিরচিত—কতকগুলি তাঁহার নিজের রচনা, অন্যগুলি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানি স্বামী নারায়ণী 'বাইবেল'। ইহার আদ্যোপান্ত ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের কণ্ঠস্থ। ইহার সারকথাগুলি নিম্নে লিখিত হইল;—

জীবহিংসা করিবেক না।

মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ; মদ্য অপেয় অগ্রাহ্য, ঔষধার্থেও সেবন করিবে না।

চৌর্য্য, ব্যভিচার, আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা, অশ্লীলবাক্য পরিহার করিবেক।

স্বধর্ম্ম পালন করিবে—পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। শ্রুতি স্মৃতির বিধানই ধর্ম্ম।

অর্থ লোভে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে না।

প্রত্যূষে উঠিয়া কৃষ্ণনাম জপিবে—'শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম,' এই মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করিবে।

সেই অন্তর্যামী পুরুষ যিনি জগতের আদি-কারণ, তাঁহাকে কৃষ্ণ ভগবান্ পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম যে নামেই হোক্ স্মরণ ও ভজনা করিবে। মন্দিরে গিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিবে। তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা, তাঁহার প্রতি ভক্তিতেই আমাদের মুক্তি।

দেবভক্তি ও কর্ত্তব্য পালন—ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সধন গৃহস্থ অর্জনের দশমাংশ এবং নির্ধন বিংশভাগ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে।

আমার শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিবেন, চতুর্ব্বর্গফল তাঁহাদের অব্যর্থ পুরস্কার। (২)

কড়ুয়া কণবী

গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। কণবীগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—লেওয়া কণবী ও কড়ুয়া কণবী। কড়ুয়া ও লেওয়া কণবী একত্রে পানভোজন করিতে পারে কিন্তু উহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান প্রদান নাই।

কড়ুয়া কণবীদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, এক দিন হরপার্ব্বতী বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। মহাদেব উমাকে কহিলেন, প্রিয়ে তুমি এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর, আমি বিরলে তপস্যা করিতে চলিলাম, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিব। এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। বিরহ-বিধুরা উমা কথঞ্চিৎ কালহরণ করিবার জন্য মৃত্তিকার পুত্তলী গড়িয়া পূজা করিতেন। বার বৎসর পরে মহাদেব ফিরিয়া আসিলেন ও উমার অনুরোধে ঐ সকল পুত্তলীকে জীবনদান করত সচেতন করিলেন, তাহা হইতেই কণবী জাতির উৎপত্তি হইল। এই হেতু কণবী জাতি উমার বিশেষ ভক্ত। যে স্থানে মহাদেব বার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা গাইকুয়াড় পরগণার উমা নামক গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সেখানে একটি দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠিত, এই দেবীর আদেশ ক্রমে কড়ুয়া কণবীদের বিবাহ লগ্ন স্থিরীকৃত হয়। প্রতি দশ কিম্বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হয়। উমা সম্মতি দান করিলে পূজারীগণ বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে ও তাহা গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির মধ্যে দূত কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকে।

এই বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কণবী জাতির মধ্যে যত অবিবাহিতা কন্যা থাকে তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া সেই একই দিবসে সম্পন্ন হয়। মাসেকের দুগ্ধপোষ্য হইতে যোগ্যবয়স্কা কন্যা পর্য্যন্ত সকলেই এক একটি বরের সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হয়। এই অবসর চলিয়া গেলে আবার বার বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হয়; সুতরাং পারত পক্ষে এ সময় কেহ অবহেলা করে না। যদি কারণ বশতঃ কোন কন্যার পাত্র না পাওয়া যায় ত পুষ্পরাশির সহিত তাহার নাম মাত্র বিবাহ দেওয়া হয়, পর দিবস সেই সকল ফুল কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ক্রিয়া বরের মৃত্যু সমান পরিগণিত হয় ও তৎপরে সেই কন্যার "নাত্রা" অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ হইবার কোন বাধা হয় না। ঈদৃশ আর একটি প্রথার নাম 'বাহুবর' বিবাহ। অর্থাৎ যদি স্বজাতীয় কোন পুরুষ পূর্ব্ব হইতে অঙ্গীকার করে যে, আমি এত টাকা পাইলে এই কন্যার বিবাহের পর আমার কোন দাবী থাকিবে না এবং এই বলিয়া যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে বিবাহিত কন্যার উপর তাহার কোন অধিকার থাকে না। কন্যাদানের অব্যবহিত পরেই

(২) Religious life and thought in India. Monier Williams.

বিবাহবন্ধন হইতে বর কন্যা উভয়েই নিষ্কৃতি পায়। যে স্ত্রী এইরূপে অব্যাহতি পায় তাহার "নাত্রা" অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ করিবার বাধা নাই। অবিবাহিতা স্ত্রীর নাত্রা হইবার বিধি নাই, সুতরাং বিবাহের নির্দ্দিষ্ট কাল ভিন্ন তাহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু একবার নামমাত্র বিবাহ দিতে পারিলে পুনর্ব্বিবাহ সম্ভবে ও এইরূপ বিবাহের কোন নিরূপিত সময় নাই, যখন ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে। 'বাহুবর' বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর-ক্ষণেই বর স্বকীয় আলয়ে গমন করে। কন্যা পিতৃগৃহে আসিয়া হাতের চুড়ি ফেলিয়া দিয়া স্নান করে, যেন তার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবিধা হইলে পিতামাতা তাহার নাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মুসলমানদের যেমন নিকা, নীচবর্ণ হিন্দু-গণের সেইরূপ নাত্রা। নাত্রাতে বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি কিছুই আবশ্যক হয় না, বিবাহের ন্যায় তাহাতে ব্যয় বাহুল্যও নাই। অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করিবার পূর্ব্বেই যে রমণীর বৈধব্য হয় অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে নামস্থ বিবাহের পর যে স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হয়, তাহার নাত্রা অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার সাড়ীর অঞ্চলে গাঁঠ দেওয়া হয়, ও এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী অশ্বারূঢ় হইয়া জনতার মধ্য দিয়া গীতবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিত তাহাদিগকে গণপতি পূজা করাইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইহার নাম নাত্রা।

এইরূপ শুনা যায় যে, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্তানদিগেরও বিবাহের সম্বন্ধ কখন কখন স্থির হইয়া থাকে। দুই প্রতিবেশীর নিজ নিজ পত্নী গর্ভবতী হইলে তাহারা এইরূপ যুক্তি করে যে তোমার পুত্র আমার কন্যা, কিম্বা আমার পুত্র তোমার কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইবে। এইরূপ ধার্য্য হইলে সত্য সত্যই যদি এক স্ত্রীর কন্যা ও অপরের পুত্র জন্মে ত অঙ্গীকার মত উপযুক্ত সময়ে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়।

সকলের কুল সমান নহে। পূর্ব্ব পুরুষের কৃতি ও সুখ্যাতি বশতঃ কোন কোন বংশ বিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছে। এক্ষণে অনেকটা জন্মভূমির উপর বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। আহমদাবাদের আদিম-বাসী কণবীগণ কুলশীলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রখ্যাত। কুলীনের সহিত কন্যার কিসে বিবাহ হয় ইহারই উপর পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য। নীচকুলে কন্যাদান মহা অপমানের বিষয়, কুলীন যদি হতশ্রী বা বিগত-যৌবন হয় তথাপি সে প্রার্থনীয়। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে তাঁহারা দশম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। উচ্চ কুলের বর পাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন ও বিবাহের অনুষ্ঠানেও বিস্তর ব্যয়। এইহেতু কুলাভিমানী নির্ধন কণবী এবং রাজপুতদের মধ্যে কন্যা-হত্যা এত প্রচলিত ছিল। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক দুগ্ধ পূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতামাতা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, এই প্রথার নাম 'দুগ্ধপীতি'। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ রাজ্যে এ নিয়ম এক্ষণে সতীদাহ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথার ন্যায় রাজ শাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর নীচবর্ণ হইলে তাহাকে টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। অর্থের অভাবে আপন পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও কন্যা পাওয়া যায়। মনে কর রণছোড়ের এক ভগিনী ও দাজীর একটি কন্যা আছে। রণছোড় দাজীর ভ্রাতার সঙ্গে আপনার ভগিনীর বিবাহ দিয়া দাজীর কন্যাকে বিনিময়ে পাইতে পারেন। এইরূপ তিন ভ্রাতার তিন ভগিনী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভগিনীর বিনিময়ে এক এক স্ত্রী পরিগ্রহে সমর্থ হয়। এইরূপ বিবাহকে সট্টা বিবাহ বলে।

কণবীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধন হইতে বিযুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থলালসায় বশ করিতে পারিলে স্ত্রী আপন অভিলষিত নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। স্বামীর অভিমতি ভিন্ন পরপুরুষের সহিত সহবাস করিলে অনেক সময় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে; কিন্তু আইন অনুসারে স্ত্রী দণ্ডনীয় নহে, তাহার নায়ককেই দণ্ডভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল মোকদ্দমা কোর্টে যাইবার পূর্ব্বে প্রায় পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জাতীয় শাসন বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। জাতীয় পাঁচজন মিলিয়া যে বিধান করেন তাহা উভয় পক্ষেরই শিরোধার্য্য। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আর এক জনের সংসর্গে বাস করে—স্বামী স্বজাতীয় লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট আপন কাহিনী ব্যক্ত করেন। জাতির মত হইলে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপরাধী পুরুষকে জাতি হইতে বহিস্কৃত করা হয়, ইহা হইতে গুরুতর দণ্ড আছে কি না সন্দেহ। জাতির অভিপ্রায়ে যদি স্থির হইল যে, পর স্ত্রী গ্রহণের দণ্ড স্বরূপ ৩০০ টাকা দণ্ড দিয়া স্বামীর সম্মতি ক্রয় করিতে হইবে ত অগত্যা তাহাই করিতে হয়। জাতির বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলে উপায়াভাবে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হয়।

যে সকল কণবীর মধ্যে স্ত্রী জাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহাদের পুরুষদের বিবাহ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক একটি কন্যারত্ন পাইবার জন্য তাহাদের প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়, ও অর্থাভাবে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাজে কাজেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সকল বিবাহার্থী পুরুষদিগের মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার আশয়ে কোন কোন প্রবঞ্চক এক এক কন্যা লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কন্যা হয়ত অন্য জাতীয়, অথবা বিবাহিতা ও তাহার স্বামী জীবিত। বর ত কন্যার জন্য বুভুক্ষিত মৎস্যের ন্যায় তাকাইয়া আছেন, টপ্ করিয়া টোপ পড়িল কি অমনি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আটকাইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ না হয় তজ্জন্য গ্রামের দুই-একজন ভদ্রলোক হয়ত জামীন হইল, তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া ছল-বল-কৌশলে তাহাদিগকেও বশ করিতে হয়। বর কন্যাকর্ত্তার হাতে টাকা গণিয়া দিয়া মহাউল্লাসে উদ্বাহ শৃঙ্খল গলে পরিলেন

—পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন যে কন্যা নাই, কন্যাকর্ত্তাও অন্তর্হিত হইয়াছে। খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্—পরে সন্ধান পাইলে হয়ত আদালতে এক প্রকাণ্ড মকদ্দমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইনি ত চক্ষু মুদিয়া পরস্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিলেন—এদিকে সেই স্ত্রীর যে স্বামী তাহার বাটীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী কোথায় পলায়ন করিল, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অন্বেষণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে তিনিও বিচারালয়ে গিয়া কন্যাকর্ত্তার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। সত্য নিরূপণ করিতে বিচারপতির মাথা ঘুরিয়া যায়। স্বামী চান তাহার স্ত্রী, উপস্বামী, প্রতারক দল সকলেরই সমুচিত শাস্তি হয়। স্ত্রী বলিতেছেন, আমার স্বামী আমায় মা বোন্ বলিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে আমার দোষ কি? উপস্বামী বলিতেছেন—এই স্ত্রীর স্বামী বর্ত্তমান ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, জানিতে পারিলে কি এত টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিব-তাম? প্রতারক দল বলিতেছে, আমরা কিছুই জানি না, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করিয়াছে, বরকন্যা আমরা কাহাকেও চিনি না—আমরা আমাদের গ্রামে বাস করিতেছিলাম, তথা হইতে পুলিষের লোকে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন সাক্ষী আনিয়া হাজির। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন এই মিথ্যা জালের মধ্য হইতে সত্য নির্ণয় করা কি সহজ ব্যাপার?

গরবা

গুজরাটী রমণীগণ সুরূপা, মিশুক ও আমোদপ্রিয়। গুজরাটে গরবা বলিয়া একরকম গান নারীমহলে প্রচলিত। আশ্বিন মাসে নবরাত্রির উৎসবের আরম্ভ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই গরবা গানের ধূম লাগিয়া যায়। আহমদাবাদ বরদা সুরাট প্রভৃতি গুজরাটের প্রধান প্রধান নগরে কুলস্ত্রীগণ মিলিত হইয়া গরবা গানে মাতিয়া যায়। গীতের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বিবাহাদি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে গরবাগান উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। নাগর ব্রাহ্মণ রমণীরাই এই গানের ওস্তাদ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁরা সুগায়ক বন্ধুবাটীতে গান গাহিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয়। গরবা একজনেও গাহিতে পারে কিন্তু সচরাচর নারীমণ্ডলী মিলিয়া গায়। গরবা গাহিবার রীতি এই। একদল গায়িকা চক্র বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে

গুজরাটী রমণীর নাচ, গান

গীত আরম্ভ করে। আরম্ভের সময় প্রধান গায়িকা যিনি তিনি দুই এক তান ধরেন, পরে তাহাতে আর সকলে যোগ দেয়। প্রত্যেক চরণ দুইবার করিয়া গীত হয়। এমনও হইতে পারে যে গীতের প্রধান অংশগুলি প্রধানা কর্ত্তৃক গীত হয়, কেবল ধূয়াতে আর সকলে সমস্বরে যোগদান করে। এইরূপ চক্রাকারে তালে তালে করতালি ধ্বনিতে নাগরিকাদের মধুর সঙ্গীত গুজরাট ভিন্ন আর কোথাও শুনি নাই। না শুনিলে ইহার প্রকৃত মাধুর্য্য বোঝা যায় না।

পেশাদারী শোক প্রকাশ

গুজরাটে একটা অদ্ভুত রীতি আছে— শোকের ভান করিয়া বুক চাপড়াইয়া পেশাদারী শোক প্রকাশ। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিতে হইলে একদল স্ত্রীলোক ভাড়া করিয়া আনা হয়, তাহারা বক্ষাঘাত করিয়া মহা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে। পথে ঘাটে এইরূপ শোকাভিনয় দেখিতে পাইবে। দেখিলে মনে হয় যেন কাহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই শোককারী নারীদিগের তালে তালে বক্ষাঘাত, অশ্রুহীন বিলাপধ্বনি ও কৃত্রিম ভাবভঙ্গী দেখিয়া শীঘ্রই সে ভ্রম দূর হয়।

ভাঁড়ের যাত্রা

শোকের কাহিনী হইতে একটু আমোদের কথা বলিয়া এই ভাগ শেষ করি। আমি যখন প্রথম আহমদাবাদে যাই তখন সেখানে একটা পার্টি দিয়াছিলাম—তাহাতে অনেক ইংরাজ ও দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই পার্টিতে আমোদের মধ্যে ভাবইয়া নামে ভাঁড়ের যাত্রার দল আনানো হইয়াছিল। ভাবইয়ারা উপস্থিত ঘটনা বর্ণনায় ও লোকজনের চরিত্র নকলে পরম পটু। তাহারা যে সময়কার চিত্রপ্রদর্শন করিতেছিল তখন বোম্বায়ে "সেয়ার মেনিয়া" রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেয়ার কিনিবার জন্য পাগল। নিঃস্ব কাঙ্গাল যাহার ঘরে অন্ন জোটে না সেও একরাত্রির মধ্যে সম্পদবান্ হইয়া উঠিবে—লোকের এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। ইংরাজ মারাঠী গুজরাটী এই সংক্রামক রোগ সকলকেই ধরিয়াছে। সেই ঝোঁকে ইংরাজ ও দেশীয়দের বিলক্ষণ মেলামেশা হইত। নেটিব তখন ইংরাজের অবজ্ঞার পাত্র ছিল না। তখন তাহাদের গলাগলি ভাব দেখে কে? সেয়ার বাজারের রাজা ছিলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ; তাঁর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে সেয়ার বাজারের উত্থান পতন হইত। ইংরাজেরা তখন তাঁহার দরবারে গিয়া খোসামোদ করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না। মেমসাহেব পর্য্যন্ত কখন কখন সেয়ার ভিক্ষা করিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই গুজরাটি ভাড়েরা সুন্দর নকল করিয়াছিল। সাহেব তাঁহার মেমকে লইয়া সেয়ার আবদারের জন্য বাহির হইয়াছেন দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে কি গোলযোগ উপস্থিত! চটাপট চপেটাঘাতের শব্দ! একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বজাতির ওরূপ উপহাসজনক নকল সহিতে না পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তম মধ্যম প্রহার আরম্ভ

করিলেন, সেই গোলমালে মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঁড়ের খেলা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল। আমরা হাঁসি কি কাঁদি কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না।

গুজরাট আমার সর্ভিসের প্রথমকালের বিহারক্ষেত্র। সে দেশের লোকের সঙ্গে আমার প্রথম প্রণয় বন্ধন। সেই নবানুরাগের আভা আমার স্মৃতিমন্দিরে নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎ পূর্ণিমা

১

জ্বাল জ্বাল আরো জ্বাল পূর্ণিমা রূপসী
তোমার ও বিরাট আলোক,
লুপ্ত হোক সে রূপের জ্বলন্ত প্রভায়
বিশ্বলোক—সারা বিশ্বলোক।
সারা বিশ্ব মাতোয়ারা তব পরশনে
অনিমেষ হেরে মধুরিমা,
ও প্রেম-মদিরা পিয়ে ভুলে গেছে ধরা
কোথা তার আপনার সীমা!

২

কোন্ অভিসার-পথে বিমোহিনী বেশে,
চলিয়াছ সুন্দরী শ্রেয়সী?
কোন্ ভাগ্যবান্ আজি বসে আছে কোথা,
তোমারে যে লভিবে প্রেয়সী?
খোল আজি দ্বার তবে, জ্বালাও প্রদীপ
হে প্রমত্ত অধীর অমর,—
উন্মাদ যামিনী আজ ছুটেছে আকুল
চুমিবারে তব ওষ্ঠাধর।

৩

ঢাল তবে ধীরে ধীরে ও রূপের সুধা
ও রূপের অমৃত মদিরা,
ত্রিলোকের অন্ধকার যাক্ আজ ঘুচে
পান করি ও অমিয়া-ধারা!
উদ্দাম উন্মাদ তব ও অনন্ত তৃষা
ঢাল আজ বিশ্বের হৃদয়ে
কোণে কোণে ভরা তার আবর্জ্জনা রাশি
মরুক্ গো চিরধন্য হয়ে!

৪

কোন্ মত্ত তৃষা আজ লইয়া অন্তরে
রাগরক্ত বাসনার রাশি,
জ্যোছনা আঁচলখানি লুটাইয়া গায়
মুখে লয়ে চারু শুভ্র হাসি,—
গোলাপ কমলে আর কেতকী কুমুদে
যত্নে গাঁথি অভিনব মালা
কোথা লয়ে চলিয়াছ কোন ভাগ্যবান?
লভিবে এ পূজা-অর্ঘ্য, বালা?

৫

খেলা কর লো ধরণী আজ আত্মভোলা
সুধাংশুর প্রেম-আলিঙ্গনে—
দেখ চেয়ে প্রিয় রাধা বিহ্বল হৃদয়ে
অপলক নীরব নয়নে!
ছড়াও বহাও আজ তব সীমাহীন
অসীম অনন্ত গভীরতা,
ঘিরে থাক্ চারিধারে অটবীর মত
শুধু স্তব্ধ চির-নীরবতা।

ও প্রমত্ত রাগরক্ত ও মত্ত তৃষায়
ডুবে গেছে বিশ্ব-চরাচর,
তুলিছে আনন্দ-রোল ত্রিদিব হইতে
আত্মভোলা অমরী-অমর!
এত তৃষা এত শোভা লয়ে আজ তব
ও তনুর অতুল গরিমা,
ভুবন চঞ্চল আজ তাই দেখে শশী
হারায়েছে আপনার সীমা।

শ্রীপ্রতিভাকুমারী দেবী

সৌধ-রহস্য

একদিন সেদিন সকাল বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো ধুয়ে সাফ হয়ে দিব্যি বাহার বেরিয়েচে। ডাল নাড়া পেলে বৃষ্টির জল ঝুরো ফুলের মত তখনও ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছিল,—আমি বাগানের সরু সুরকি-ফেলা লাল রাস্তা থেকে বড় বড় ঘাস্‌গুলো তুলে সাফ্ করে ফেল্‌চি, এমন সময় কর্ত্তা এসে আমায় বল্লেন, "ইজ্‌রেল তোমার কি কখনও বন্দুক ছোড়ার সুযোগ হয়েছিল?" সুযোগ!—ভগবান্ রক্ষে করুন—ও সব মানুষ-মারার কল-কব্জা আমি কখনও ছুঁই-ওনি। "তবে থাক্ এখন আর শিখ্‌তে হবে না,—সবারই নিজের নিজের অস্তর আছে, তুমি বোধ হয়, লাঠি চালাতে ভালই পার?"

আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলুম, "এঃ তা কর্ত্তা, খুব পারি—এই "বজরে" যত লোক আছে, সবারই সঙ্গে আমি তা খুব লড়্‌তে পারি।"

তিনি বল্লেন, "দেখ, বাড়ীটা ভারী নির্জ্জন। কি জানি, কোন্ সময় হয় ত কোন্ বদমায়েসের দল্ আসতে পারে—তাই বলছি আর কি, সব সময় তৈরী থাকা ভাল। তাহলে তুমি, আমি মরডণ্ট আর ব্রাহ্মসামের ফদারজিল ওয়েষ্ট, দরকার হলে তাকেও খবর দেব—এই চারজনে যত লোকই আসুক না তাদের হঠাতে পারব—কেমন পারব না কি? তুমি কি বল?"

"সে কথা আবার বল্‌তে? যুদ্ধ-টুদ্ধর চেয়ে ভোজ-টোজে আরাম আছে বটে, কিন্তু আমার যদি আর এক পাউণ্ড মাইনে বাড়িয়ে দেন ত আমি দুয়েতেই সমান রাজী।"

জেনারেল বল্লেন, "থাক্, এ সব কিছু এখনি দরকার নয়। যখনকার কথা, তখন দেখা যাবে।"

আমি যে এক পাউণ্ড মাইনে বাড়ানোর কথা বলে ছিলুম, তাতে তিনি রাজী হলেন। টাকা যেন খোলাম-কুচি! অবশ্য চাকর আমরা, মুনিবের সম্বন্ধে মন্দ ভাবা আমাদের পক্ষে উচিত নয়,—তা বুঝি, কিন্তু যখন একটা মুখের কথায় একদম বার মাসে বার পাউণ্ড মাইনে বেড়ে গেল, তখন আপনা থেকেই মনে হল, "মুনিবের হয়ত ভাল উপায়ে রোজগারের টাকা নয়।" আমি যে ভারী খারাপ লোক, মানুষকে সন্দেহ করাই যে কি গোয়েন্দাগিরি করা কেবল আমার স্বভাব তা নয় কিন্তু তবুও আমি যে এই সব বল্লুম বা করলুম তার কারণ, বুড়ো মানুষের রকম সকম,—সারারাত্তির জেগে তাঁর ঘুরে বেড়ানো—এই সব দেখে শুনে আমার মনে কেমন ভয় লেগেছিল।

আর একদিন সকালে, আমি যখন নীচেকার রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছি, হঠাৎ তখন কর্ত্তার ঘরের সাম্‌নের দালানে চোখ পড়ে গেল। দেখি, এক গাদা পুরোণো ময়লা পর্দ্দা আর ছেঁড়া কার্পেট পড়ে আছে। ধাঁ করে মনে একটা মতলব গজাল! মন বল্লে, "বাছা ইজরেল, তুমি কেন ঐ পর্দ্দাগুলোর ভেতর

রাত্তিরে ঢুকে থেকে দেখ না, বুড় কি কাণ্ড করে? রাত্তিরে যে ঘুরে বেড়ায়, কিছু ত করে!" আমি বল্লুম, "বেশ্! চুরিও কচ্চি না—ডাকাতিও কচ্চি না, লোকের মন্দও কিছু কচ্চিনা—চোখ্ দিয়ে শুধু দেখ্ব বৈ ত নয়, এতে আর দোষ কি? যতই ভাব্তে লাগলুম, কাজটা ততই সহজ বলে মনে হতে লাগল। পাপ্কে আমার বড় ভয়, পাপ কাজ কিছু যখন কচ্চি না, তখন আবার ভয় কি! নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি এই কাজ কর্‌ব।

রাত্রে কাজ-কর্ম্ম সেরে রাঁধুনীকে গিয়ে বল্লুম, "আমার শরীরটা খারাপ হয়েছে, রাত্তিরে আজ আর ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগাব না, শুতে যাই।" কথাটা কিছু আর মিথ্যা বলিনি। কি দেখ্‌ব? কি রকম করে থাক্‌ব, এই সব ভেবে ভেবে সত্যিই আমার মাথাটা কেমন একটু টিপ্‌টিপ্ কচ্ছিল,—হাতে পায়ে অত ঠাণ্ডাতেও ঘাম হচ্ছিল। একবার কোন গতিকে ঢুক্‌তে পাল্লে হয়, তার পর আর কেউ আমার নাগাল পাচ্চেন না!

রাত যখন নিশুতি—কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই, কেবল বাইরের বাগানে ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোর আওয়াজ আর মাঝে মাঝে দূরে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্চে, তখন আমি জুতো খুলে আস্তে আস্তে সেই পুরোণো পর্দ্দা আর কার্পেটের গাঁদির মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। কেবল দেখ্‌বার মত চোখের কাছে একটু ফাঁক রেখে সর্ব্বাঙ্গ বেশ করে ঢেকে রাখলুম। খানিক বাদেই ঠিক আমার পাশ দিয়ে জেনাবেল তার শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন, তার পর সব নিস্তব্ধ, চুপ চাপ্! একটা আলপিন্ পড়্‌লেও সে শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়!

ওঃ! গেছ্‌লুম আর কি! আমায় যদি ব্রাঙ্কসামারের ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে, তার সমস্ত সে দিতে চায়, তাহলেও ফের আমি সেখানে যাচ্চি না। ওঃ—সে সব কথা ভাবতে গেলেও পিঠের শির-দাঁড়াটা বরফের মত জমাট বেঁধে যায়! কন্‌কনানি ধরে!

এই একঘেয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে চুপ করে জেগে পড়ে থাকা,—নিশুতিকে জাগিয়ে তোল-বার জন্য কোথাও এতটুকু শব্দ নেই,—কি ভয়ানক! কিন্তু না, একটা শব্দ ছিল—কোথায় দূরে রাস্তায় এক ঘড়ির টক্‌টক্ আওয়াজ হচ্ছিল, প্রথম আমার মনে হয়েছিল, বুঝি, সে আমার বুকেরই শব্দ, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম, তা নয়। বুকের শব্দ এ শব্দের ঢের উপরে উঠ্‌ছিল, ভাগ্যে সেখানে কেউ ছিল না! তাহলে নিশ্চয় শুন্‌তে পেত। সব চেয়ে কষ্ট হয়েছিল ঐ ধূলোর জন্যে, ছেঁড়া ময়লা অপরিষ্কার পর্দ্দাগুলো—কত জন্মের ধুলো যে তার মধ্যে জড় করা আছে। ওঃ অসহ্য যন্ত্রণা। চোখে-মুখে-নাকে ধুলোর কাঁড়ি ঢুকে যাচ্ছিল। কাশি বন্ধ করা—কি সে দারুণ কষ্ট! মৃত্যু-যন্ত্রণা যে লোকে বলে, সে বোধ হয় এমনিই! মৃত্যুও তাহলে দেখছি বড় ভয়ঙ্কর!

আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরেছিল—শীতে কি? বোধ হয়, না। কারণ, কপালে যে ঠাণ্ডা ঘাম জমা হচ্ছিল, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিলুম। মনে করে ছিলুম, আমি যে দালানটায় শুয়ে

আছি, তার অপর দিককার দালানটার দিকে দেখ্‌ব, কিন্তু বাপ্‌, কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার তাল পাকিয়ে রয়েচে!

ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয় আছেন,—তা তোমরা মান,—আর, নাই মান! আমি ভাব্‌তে অবাক্ হয়ে যাচ্চি যে তত কষ্টতেও আমার মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে যায় নি, কেন! যদি আমায় কেউ "গ্লাসগো"র "লর্ড প্রভষ্ট" করে দেয়, তবুও আর আমি এমন কাজ দ্বিতীয় বার কচ্চি না।

রাত্রি বোধ হয়, বোধ হয় কেন, তখন ঠিক দুটো। কেন বল্‌চি! রাস্তার সেই ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে দুটোর ঘা বাজল। ভাবলুম, বাঁচা গেল! আজ আর তা হলে কিছু বোধ হয় দেখ্‌তে হবে না,—কথাটা মনে হওয়ায় আমার কি কিছু দুঃখ হয়েছিল?—না, একটুও না!

কিন্তু হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা চমৎকার আওয়াজ আমার কানে বাজ্‌তে লাগল।

সেই শব্দটা ভাল করে বর্ণনা করে বোঝাতে হবে? তবেই গেছি আর কি! তোমরা যদি শুন্‌তে, দেখে নিতুম একবার, কে কেমন বর্ণনা করতে পার। এক কথায় যদি বলি, এমন আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি, এর আগে নয়, পরেও নয়, তা হলেই ঠিক বলা হয়, কিন্তু তা হলে ত চলবে না—আমি না পারলেও বল্‌তে হবে! বেশ্‌! মদের গেলাস টেবিলের উপর ঠুন-ঠুন করে বাজালে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি শব্দ! না,—তার চেয়েও ঢের মিঠে আওয়াজ! আর ঢের জোরে, তার উপর যেন বৃষ্টির জলের একটা ছড়্‌ ছড়, গম গম, টিং টিং, এই গামলার উপর বৃষ্টির জলের আওয়াজ শুনেচ কি, সেই রকম কি কোন্ রকম তা আমি ঠিক জানি না। তবে আওয়াজটা কিন্তু চমৎকার! আমার ভয় হচ্ছিল! ভয়ানক ভয়! তবু কি মিঠে আওয়াজ! আমি ভয়ে উঠে বসে কান খাড়া করে শুনছিলুম—সব আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। না, কেবল সেই ঘড়ীটাই টক্ টক্ কচ্চে!

হঠাৎ শব্দটা আবার আরম্ভ হল—এবার যেন একটু বেশী জোরে। আমার মনে হল, জেনারেলও এবার শুন্‌তে পেয়েচেন, কেন, বল্লুম? হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে খুব কাহিল মানুষ যেমন গোঁ গোঁ করে, তেমনি একটা আওয়াজ তাঁর ঘরে শোনা যাচ্ছিল।

খাটের ক্যাঁচ্‌-কোঁচ্‌ শব্দে বুঝ্‌তে পারলুম, তিনি বিছানার উপর উঠে বসেচেন,—তারপর পোষাকের খস্‌খসানি, পায়ের শব্দ, এদিকে থেকে ওদিক, উত্তর থেকে দক্ষিণ, বোধ হয় পায়চারি করে বেড়াচ্চেন।

এখন আমার কি হবে! ভাব্‌তে বেশী সময় লাগ্‌ল না। ঝপ্‌ করে শুয়ে পড়্‌লুম,—তার পর প্রার্থনা,—ওঃ! জীবনে যত কিছু প্রার্থনা আমি শুনেচি, সব মনের ভিতর জড় করে এক করেছিলুম। হাঁ ভগবান্‌কে আমি মানি,—দরকার-মত ডেকেও থাকি,—ডাক্‌ছিলুমও তাই, কিন্তু চোখদুটোকে রেখেছিলুম জেনারেলের ঘরের দরজার দিকে, ইচ্ছা করলেই যে আমি তখন চোখ্‌দুটোকে ফেরাতে পারতুম, তা নয়,—বুঝতেই পারতুম না।

একটু পরেই হাতল ঘোরানোর শব্দ

পেলুম,—কর্ত্তার ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরের ভিতর আলো জল্‌ছিল—দেখ্‌তে পেলুম,—সারি সারি লাইন-বন্দী তরোয়াল ঝুল্‌চে। ভাগ্যে আমি সৈনিক হয়ে জন্মাইনি!

কর্ত্তা একটা ঢিলে লম্বা জামা—একটা লাল রংয়ের টুপী, আর একটা গোড়ালি কাটা, মাথার উপর শিং-উল্টোনো অদ্ভুত রকম চটি জুতো পরে, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একবার আমার মনে হল, কর্ত্তা হয়ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই চল্‌চেন, কিন্তু যখন ঘরের আলোটা তাঁর মুখের উপর পড়্‌ল, তখন আমি দেখ্‌লুম, কোন রকম ভয়ানক দুঃখ হলে মানুষের মুখ যেমন হয়ে যায়, তাঁর মুখও ঠিক্ তেমনি হয়ে গেছে। তাঁর সেই চেহারা—আর পাঁশুটে মুখ, সেই গম্ভীর ভাবের চলুনি, এখনও যখন আমার মনে পড়ে, বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে, রক্ত জমাট বেধে যায়। সে যেন গোর থেকে উঠে মরা মানুষ চলে বেড়াচ্ছে!

তিনি যখন আমার খুব কাছ দিয়ে চল্‌ছিলেন্, আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করছিলুম। আর যখন একেবারে আমার পাশে এসেছিলেন, ওঃ,—আমার দম বন্ধ হয়ে গেছল।

টিং—?—জোরে বেশ পরিষ্কার স্বরে মনে হচ্চে—যেন এক গজ তফাতে—সেই আওয়াজ! কোথা থেকে যে এল, আর কেনই যে এল, এইটিই হল বিষম সমিস্যে! হতে পারে কর্ত্তাই এটা কচ্চেন, না, তাও ত নয়, কর্ত্তার হাত-দুখানা অসাড় হয়ে দুদিকে ঝুলছিল, খালি হাত! তাঁর কাছ থেকেই আস্‌ছিল বটে, সরু-চাঁচা তাঁর মাথার উর্দ্ধে থেকে বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল। কি এ? কেউ বল্‌তে পারবে না।

কর্ত্তা কিন্তু কোন খবরই নিলেন না। যেমন আস্‌ছিলেন, অমনি চলে গেলেন।

এর পর আমি কি করলুম—? তাও কি আর বলে দিতে হবে! একেবারে এক দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলুম। রক্ত সমুদ্রের ভূতের দল যদি আজ এখানে নিমন্ত্রণ খেতে আসে, তবুও আমি আর দরজার বাইরে মাথা বার কচ্চি না।

মাসে চার পাউণ্ড মাইনে - মাইনে মোটা, অস্বীকার কর্‌ব না কিন্তু প্রাণটার দাম চার পাউণ্ডের চেয়ে অ-নেক বেশী। আমার আর ক্রুমবারে চাকরি করা পোষাবে না। চাকরিকে জবাব দেওয়াই স্থির। তারপর, আত্মা? চিরকালের জন্য সে-ও যে উচ্ছন্ন যাবে। শয়তান যখন একবার দেখা দিয়েচে, তখন সে যে কোথা দিয়ে ফের জাল ফেলবে, সে কথা কে-ই বা বল্‌তে পারে! তোমরা বল্‌বে, ভগবানের ক্ষমতা শয়তানের চেয়ে বেশী কিন্তু আমি বলি,—আমি গরিব মানুষ বাড়ীতে পাঁচটা পুষ্যি নিয়ে ঘর করি, কখনও কারো মন্দ করিনি,—কে বড়, সে পরীক্ষায় আমার দরকারই বা কি!

আমি বেশ্ বুঝ্‌তে পেরেছিলুম যে জেনারেল আর তাঁর এই কোঠাটি অভিশপ্ত। যারা অন্যায় করেচে, তারা তার ফল ভোগ করুক—কিন্তু আমরা নিষ্ঠাবান প্রেস্‌বিটারিয়ান, আমরা কেন তার ভাগ নিতে যাই!

সময় সময় কুমারী বেলের জন্যে আমার মনটা বড় কাতর হত। আমার মনটা ভারী

নরম কি না! আহা মেয়েটি বড় ভালো,—লোককে আমোদ দিতে, খুসী করতে ভারী মজবুত আর সুন্দরীও কি তেমনি! এই অন্ধকার বাড়ী খানাতে সেই যা একটু আলো জ্বেলে রেখেছে! কিন্তু কি করব, এ সবের জন্য ত আর আমার নিজের কোন অন্যায় করতে পারি না। দয়া অবশ্য ভাল জিনিষ, কিন্তু সকলের আগে নিজেকে ত দয়া করা চাই! সেই ভয়ঙ্কর টিং-টাং টুং ওবে বাপ্‌রে—সে শব্দ শোন্‌বার জন্য আবার আমি এখানে থাকব? ভুলেও আর সে রাস্তা দিয়ে চলি না। সুযোগ খুঁজ্‌চি, শীঘ্রই জেনারেলকে নোটিশ দেব। আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম, এবার এমন জায়গায় কাজ নেব, যেখান থেকে একটা ঢিল ছুঁড়্‌লেও গির্জ্জের গায়ে গিয়ে ঠেকে!

অক্টোবর মাসের গোড়ায় একদিন সকাল বেলা আমি ঘোড়াটাকে "দানা" দিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে আস্‌চি,—বাগানে ঘাস হয়েচে এক হাঁটু,—কেউ যেন দেখে না, বলে না কিছু, তবু আমার নিজের একটা "কর্ত্তব্য-জ্ঞান" আছে ত! ভাবলুম, আজ বাগানটাকে সাফ্‌ করে ফেলি। দিব্যি কুয়াশা হয়েচে, রোদের তেজও নেই, জলের নামও নেই! আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম সাদা ডানা মেলে পাখীগুলো উড়ে যাচ্চে, সব ঝাঁক্ বেঁধে চলেচে। সবুজ গাছের পাতার উপর কত রঙ্গের প্রজাপতি আর ফড়িং উড়্‌ছিল,—কেন? জল হবে বলে কি? হঠাৎ দেখলুম, একটা লোক সরাসর চলে আস্‌চে, লাফাতে লাফাতে চল্‌চে! খোঁড়া না কি? আমি দাঁড়ালুম। তার দিকে চেয়েই একটা কথা চট্ করে মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, জেনারেল যে সেদিন অত করে একটা বদ্‌মায়েস্ লোকের আস্‌বার কথা বল্‌ছিলেন, ত এ সে-ই নয়! পরীক্ষা করেই দেখা যাক্ না! কথাটি না কয়ে—তাড়াতাড়ি লাঠিগাছটা নিয়ে এলুম। আমার ভাব দেখেই হোক' আর লাঠির ভাব দেখেই হোক, লোকটা "ধাঁ" করে পকেট থেকে একখানা মস্ত ছুরি বার করে ফেল্লে। ছুরিখানা বার করেই বলে উঠল, আমি যদি সরে না যাই বা লাঠি তুলি, তা হলে ঐ ছুরিখানা দিয়ে সে আমায় খুন করতে একটুও ইতস্ততঃ করবে না। তা পারে সে,—যে দুষমন্ চেহারা! আমার চৈতন্য জন্মে গেল—সে সবই পারে! যখন আমরা ঠিক সোজাসুজি, সে ছুরি হাতে—আর আমি লাঠি হাতে সামনা-সাম্‌নি দাড়িয়ে ভাব্‌চি যে, এর শেষ কি রকম দাঁড়াবে, এমন সময় জেনারেল সেইখানে এলেন। বাড়ীটার সবই আশ্চর্য্য! জেনারেল এসেই যেন কত কালের চেনা জনের মত বল্লেন, "করপোর্‌্যাল, ছুরিখানা পকেটে পুরে রাখ। ভয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন ঘটেচে না কি?" অপর ব্যক্তি ছুরিটা পকেটে পুরতে-পুরতে উত্তর দিলে, "আঘাত আর রক্তের ভয়। যে অসভ্য বুনো জানোয়ার ঘরে পুষে রেখেছ।—আমি যদি ছুরি বার না কত্তুম, তাহলে এতক্ষণে এই সবুজ ঘাসের উপর আমার মাথার ঘিটুকু ছড়িয়ে পড়ে থাকত, দেখতে।"

প্রভু ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চাইলেন। বেশ্ বোঝা গেল যে, তার কাছে উনি কোন উপদেশ নিতে নারাজ! তার পর

আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, “ইজরেল,—তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছু বল্‌ছি না, তুমি কর্ত্তব্য-পরায়ণ লোক, ভালো চাকরই ছিলে, তুমি। কিন্তু ঘটনাতে করে আমায় ব্যবস্থা বদ্‌লাতে হচ্চে। আজ রাত্রেই তুমি চলে যেয়ো। আমার আর তোমাকে দরকার হবে না। আর এত অল্প সময়ে তোমায় নোটিশ দিতে হল বলে এক মাসের মাইনে তুমি বেশী পাবে’খন।”

কথা শেষ করেই তিনি বাড়ীব ভিতর চলে গেলেন। আর যাকে কত্তা করপোর‍্যাল বল্লেন, সেই খোঁড়াটাও তাঁর সঙ্গে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলে গেল।

সেই রাত্রেই আমি রাঁধুনি আর চাক্‌রাণী বার্বারাকে ধর্ম্মাধর্ম্মের দু-একটা কথা বুঝিয়ে, এখনকার মণি-মুক্তার চেয়ে সেখানকার বড় ঐশ্বর্য্যের কথা তুলে, ক্রুমবারের মাটী আমাব জুতোর তলা থেকে ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে এলুম।

এর পর আমি তাদের আর কখনও দেখিনি। ফদারজিল ওয়েষ্ট আমায় বলেচেন যে পরে কি হবে, সে কথা কিছু না ভেবে তখন কি হয়েছিল শুধু সেই কথাগুলিই আমায় লিখে দিতে হবে। তা হলেই বুঝ্‌তে পাচ্চ,—এর ভিতর নিশ্চয় কোন ভাল মতলব নেই। পরে যে কি ঘট্‌বে, তা আমি মাষ্টার ডোনাল্ড ম্যাস্কন্‌কে তখনই এক রকম বলে রেখেছিলুম। সেই জন্যেই যা ঘটেছিল তাতে আমার আর আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। গরিবের কথা বাসি হলেই মিষ্টি লাগে, তখন দেখেও নেবেন।

মাথু ক্লার্কের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলুম। তিনি আমার কথাগুলি যে হুবহু লিখে নিয়েছেন, তা আমায় পড়ে শুনিয়েওচেন,। লেখা ঠিক্ আছে! এর উপরও যদি কেউ কিছু জান্‌তে চান্,—তাহলে উইগটাইনের গোলাবাড়ীর কর্ত্তা মাষ্টার ম্যাক্‌লীনের কাছে গেলে তিনি আমার খবর বলে দিতে পার্‌বেন। তিনি আমায় খুব ভাল রকমই চেনেন। আমি গরিব বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক লোক,—পাপে আমার ভারী ভয়। ক্রুমবারের চাক্‌রি করার জন্যে আমার যে পাপ হয়েছিল, তা আমি পাদরী ম্যাক্‌সনের কাছে স্বীকার করে তার জন্য অনুতাপ করে সে পাপ খণ্ডন করে ফেলেচি। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

সুখ

ওরে সুখ, ওরে সুকুমার,
কচি মুখে ক্ষণিকের খেলা দেয়ালার,
এই কান্না এই হাসি সজল শেফালি রাশি
নিমেষ পরশ ভর সহেনাক যার,
বুকে আলো টলমল শিশির ঊষার!

ওরে সুখ ওরে অকারণ,
আঁধারে নয়ন মুদি দেবতা বরণ!
খুঁজিয়া কেহ না পায়, নাহি মিলে সাধনায়,
হারালে তখন বুঝি কেমন রতন,
সঙ্গোপন কামচারী, স্বপ্ন সম্মিলন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৭)

সংক্রামক রোগের শুশ্রূষা

রোগীর গৃহের দরজা ও জানালাগুলি সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং প্রত্যেক বায়ু-পথ এক একটী পর্দ্দা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। এই পর্দ্দাগুলি কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে * ভিজাইয়া রাখিলে সংক্রামক রোগের বীজ গৃহ হইতে অবাধে বাহিরে আসিবার সুবিধা পায় না এবং বাহির হইতে গৃহের মধ্যে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময়ে রোগীর গৃহে মাছি প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রোগের বীজ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি সাধিত হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহের বাহিরে একটা লৌহপাত্রে আগুন রাখিলে সেই স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিত হয়, রোগীর পথ্য বা জল গরম করিবার প্রয়োজন হইলে সহজেই তাহা নিষ্পন্ন করিতে পারা যায় এবং যখন রোগীর শ্লেষ্মাদিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দগ্ধ করিবার আবশ্যক হয়, তখন উহা বাটীর অন্যত্র লইয়া না যাইয়া ঐস্থানেই ঐ কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় হস্ত ও পদ যে কোন বিশোধক ঔষধের দ্রাবণ ও সাবানের দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবেন। পরিধেয় বস্ত্র যদি জলে কাচিবার মত হয়, তাহা হইলে কাচিবার পূর্ব্বে কোন পাত্রের মধ্যে উহাকে বিশোধক ঔষধে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সাবান ও উষ্ণ জলে কাচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; এইরূপে ঐ বস্ত্রের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়। বস্ত্রাদি অধিকক্ষণ রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেক সময়ে উহার সংক্রামকতা দূরীভূত হয়। রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি প্রথমতঃ বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে জলে অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইলে উহার সংক্রামকতা-দোষ একেবারে বিনষ্ট হয়। অতঃপর ঐ বস্ত্র ধোপার বাটী হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিলে পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে।

সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্রাদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাটীতে পাঠান নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। আমরা সচরাচর রোগীর বস্ত্রাদি তদবস্থায় অথবা শুদ্ধ জলকাচা করিয়া একস্থানে জড় করিয়া রাখি, পরে ধোপা আসিলে উহাদিগকে তাহার হস্তে সমর্পণ করি। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে এরূপ ব্যবস্থায় সমূহ বিপদ

---

* এক ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড্ ৩৯ ভাগ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইলে এই দ্রাবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঘটিবার সম্ভাবনা। সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্র কেবল জলে ধৌত করিলে উহার সংক্রামকতা নষ্ট হইয়া যায় না। এরূপ বস্ত্র বাটীর মধ্যে জড় করিয়া রাখিলে উক্ত রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ঐ কাপড় ধোপার বাটী যাইলে অন্য পরিবারের ধৌত বস্ত্রের সংস্পর্শে আসিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ ধোপারা সচরাচর একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বাস করে এবং তাহার মধ্যেই মলিন ও ধৌত বস্ত্রাদি পাশাপাশি রাখিয়া দেয়। সুতরাং দূষিত মলিন বস্ত্র হইতে ধৌত বস্ত্রে সংক্রামক রোগের বীজ সংলগ্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেক সময়ে হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ বাটীর মধ্যে কোথা হইতে উপস্থিত হইল, স্থির করিতে পারা যায় না। ধোপার বাটীর ফর্সা কাপড়ের সহিত উক্ত রোগের বীজের আমদানি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। ধোপার বাটী হইতে কাপড় আসিলে ২।৩ ঘণ্টার জন্য উহাকে রৌদ্রে রাখিয়া পরে ঘরের ভিতর তুলিলে এই দোষ অনেকাংশে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ ধোপার বাটীর কাপড় একবার জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহার করেন; ইহা দ্বারা কাপড়ের সংক্রামকতা দোষ কাটিয়া যায়।

সংক্রামতা-দুষ্ট কাপড় বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে তাহার পরিজনবর্গের মধ্যেও ঐ রোগের আবির্ভাব হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ইহা যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য রোগীর কাপড় ও শয্যাদি পূর্ব্বাহ্ণে জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া ধোপার বাটীতে পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। হস্পিটালে রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি অত্যুষ্ণ জলের ভাপ্‌রায় অথবা অত্যন্ত গরম বাতাসের দ্বারা বিশুদ্ধ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহস্থের বাটীতে একটা বড় পাত্রে বস্ত্রাদি জলে অধিকক্ষণ ফুটাইয়া লইলেই শোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

রোগীর গৃহ হইতে যে কোন বাসন বাহির করা হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিশোধক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। রোগী যে পাত্রে মল, মূত্র বা কফ পরিত্যাগ করিবে, গৃহের মধ্যেই উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া, যতশীঘ্র সম্ভব, উহাকে স্থানান্তরিত করিবে।

যখন রোগী আরোগ্য লাভ করিবে, তখন তাহাকে কার্ব্বলিক্ সাবান দ্বারা উষ্ণ জলে স্নান এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া বাটীর অন্যত্র গমন করিতে বা অন্যলোকের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত। রোগ-ভেদে উহার সংক্রামকতা-দোষ অল্প বা অধিক দিন রোগীব শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এই সময়ের মধ্যে যদি উক্ত রোগী সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে আইসে, তাহা হইলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে রোগীকে কাহারও সহিত মিশিতে না দিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিলে রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা সবিশেষ কমিয়া যায়। অধিকাংশ রোগেরই সংক্রামতা-দোষ প্রায় তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে।

রোগী আরোগ্য লাভ করিলে, যাঁহাদের

অবস্থা ভাল, তাঁহারা তাহার বস্ত্র ও শয্যাদি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। গদি, লেপ, বালিশ প্রভৃতি বিছানা বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়ে রোগীর শয্যা ব্যবহার করিয়া উপর্য্যুপরি অনেক লোকের হাম, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। রোগীর জন্য গদি ব্যবহৃত হইলে একখানি বড় অয়েল্ ক্লথ্ দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক মুড়িয়া দিলে গদির উপর রোগীর মলমূত্র পতিত হইতে পারে না। সুতরাং গদি এইরূপে রক্ষা করিয়া তোষক বালিশ ইত্যাদি অন্যান্য বিছানা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। রোগীর জন্য অল্প ব্যয়ে যদি আমরা এক প্রস্থ বিছানা প্রস্তুত করাইয়া দিই, তাহা হইলে রোগ-মুক্তির পর উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না।

সামান্য অবস্থার লোকে রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের পক্ষে ঐ সকল সামগ্রী ও অন্যান্য গৃহসজ্জা একটা রুদ্ধ গৃহের মধ্যে রাখিয়া ক্লোরিণ্ (Chlorine) গ্যাস্ সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। একটা চীনামাটী বা এনামেলের পাত্রে অধিক পরিমাণ ব্লীচিং পাউডার্ (Bleaching powder) নামক বিশোধক ঔষধের গুঁড়া রাখিয়া তাহার উপর জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Hydrochloric acid) ঢালিয়া দিলে ক্লোরিণ গ্যাস্ উৎপন্ন হইবে এবং উক্ত গৃহের সমস্ত বায়ুপথ কয়েক ঘণ্টা কাল রুদ্ধ করিয়া রাখিলে শয্যা ও বস্ত্রাদিসংলগ্ন রোগের বীজ ক্লোরিণ্ গ্যাস্ সাহায্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে গৃহে রোগী অবস্থান করে, আরোগ্যের পর সেই গৃহের মধ্যেই এই ব্যবস্থা করিলে গৃহ ও গৃহসজ্জা সমস্তই রোগের বীজমুক্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর কয়েক দিন ঐ সকল সামগ্রী প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া দিলে সূর্য্যকিরণ ও মুক্ত বাতাসের সাহায্যে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে ও পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

সচরাচর গন্ধকের ধূম দ্বারা রোগীর গৃহ বিশোধিত হইয়া থাকে। রোগীর গৃহে খাট, বাক্স, তোরঙ্গ প্রভৃতি কাঠের বা লোহের যে সমস্ত সামগ্রী থাকে, তাহাদিগকে এবং ঘরের দরজা, জানালা ও দেওয়াল সমূহ প্রথমতঃ কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে সিক্ত বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ঘর রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অধিক পরিমাণ গন্ধক কয়েক ঘণ্টাকাল জ্বালাইলে ঘরের মধ্যে যে কোন স্থানে রোগের বীজ সংলগ্ন থাকিবে, তাহা গন্ধকের ধূম দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অবশেষে ঘরের দেওয়ালের চুণ কিয়দংশ চাঁচিয়া লইয়া উহাতে পুনর্ব্বার চুণ ফিরাইয়া দিলে উক্ত গৃহ পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। গৃহের মেঝে ও ছাদের তলদেশও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত করিতে হইবে।

শাল প্রভৃতি পশমী দামী কাপড় যদি রোগীর সংস্পর্শে আইসে বা রোগীর ঘরের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপরি-উক্ত উপায়ে বিশুদ্ধ করিতে গেলে কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সূতার কাপড়কে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সহজেই বিশুদ্ধ করিতে পারা যায়। পশমী ও রেশমী কাপড় বিশুদ্ধ

করিতে হইলে পূর্ব্বে যে যন্ত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট করা উচিত। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এইরূপ একটী যন্ত্র ইটিলিতে (Entally) স্থাপন করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর অনুমতি লইয়া সাধারণ লোকেও সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্র ও শয্যাদি বিশুদ্ধ করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

টীকা লওয়া (Inoculation, Vaccination)—কোন কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে পুনরায় হইতে দেখা যায় না। যাহার একবার বসন্তরোগ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতে বার বার বসন্ত-রোগীর সংস্পর্শে আসিলেও প্রায় পুনরায় উক্তরোগে আক্রান্ত হয় না। ইহা দ্বারা চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, সংক্রামক রোগ হইলে রক্তের এমন কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় অথবা উক্ত রোগের বীজ হইতে এমন কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া দেহ-মধ্যে অবস্থিত থাকে, যাহা, ঐ ব্যক্তির শরীরে উক্ত রোগের বীজ পুনঃ প্রবিষ্ট হইলে, তাহার ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহা যে শুদ্ধ বসন্ত রোগেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। সংক্রামক রোগ মাত্রেই দেহমধ্যে এইরূপ একটী বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা দেহকে ঐ রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। তবে বসন্তের ন্যায় অন্য সংক্রামক রোগে এই বিষঘ্ন পদার্থের শক্তি সেরূপ প্রবল বা বহুদিন স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যেই উহা হীনশক্তি হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিলে উহা দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। হাম, পানবসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সচরাচর একবারের অধিক হইতে দেখা যায় না, তবে কখন কখন দুই, এমন কি তিনবার পর্য্যন্ত, হাম হইতে দেখা গিয়াছে। বসন্ত যে কখন পুনরায় হয় না, এরূপ নহে। লোকে বসন্ত-রোগে দুইবার আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল এবং ঘটিলেও প্রায় প্রাণহানি হয় না। কলেরা প্রভৃতি রোগেও এই নিবারণী-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহাকে অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অল্প বা অধিক দিন ঐ রোগে পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া প্রায় সকল প্রকার সংক্রামক রোগ নিবারণ করিবার জন্য অধুনা "টীকা" দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে বীজ দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয়, (১) উহা অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় বা মৃতাবস্থায়, অথবা (২) উহাকে অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করাইয়া উহার পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, কিম্বা (৩) উহা হইতে উৎপন্ন রস বিশেষ (Antitoxin) মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করাইলে ঐ রোগের 'টীকা' দেওয়া হয়। একটী সূচল পিচকারী দ্বারা অথবা চর্ম্মের উপরি ভাগের ছাল তুলিয়া তদুপরি লাগাইয়া উক্ত পদার্থ রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে উক্ত রোগ অতি মৃদুভাবে শরীরে প্রকাশ পাইয়া এমন একটী বিষঘ্ন পদার্থ দেহের মধ্যে উৎপাদন করে

এবং তাহাতে শরীরের এমন একটী সহ্যগুণ জন্মায় যে, উক্ত রোগের বীজ অধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করিলেও রোগ প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয় না, এমন কি, অনেক সময়ে রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলে কসৌলি নামক স্থানে যে টীকা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বসন্ত-নিবারণের জন্য যে মনুষ্য-বীজের টীকা লওয়া হইত, তাহাতে রোগীর গুটী হইতে রোগের বীজ সংগ্রহ করিয়া অতি সূক্ষ্মমাত্রায় সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করান হইত। ইহা দ্বারা তাহার শরীরে অতি মৃদুভাবে বসন্ত রোগ প্রকাশ পাইত এবং তদ্দ্বারা শরীরের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত যে তাহার, পুনরায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু বসন্তের টীকা লওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে; এইরূপ টীকা লইয়া অনেক সময়ে সাংঘাতিক বসন্ত রোগ হইতে দেখা গিয়াছে এবং উহা বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া কতলোকের জীবন নাশের কারণ হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা বসন্ত-রোগ নিবারণের জন্য গো-বসন্তের (Cow pox) টীকা লইয়া থাকি। মনুষ্যের বসন্ত গরুর শরীরে প্রবেশ করিলে বীজের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে উহা গো জাতির কোন অনিষ্ট সাধন করে না, অথচ গো-দেহ হইতে মনুষ্য শরীরে ঐ বীজ পুনঃপ্রবেশ করাইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে এক প্রকার অব্যাহতি লাভ বলিতে পারা যায়। বিখ্যাত ডাক্তার স্যর্ উইলিয়ম্ জেনার্ প্রথম এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তদবধি এই টীকা বসন্ত প্রতিষেধের জন্য ব্যবহৃত হইয়া অসংখ্য লোকের প্রাণ রক্ষার কারণ হইয়াছে এবং পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে বসন্ত রোগ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গো-বীজের টীকাকে ইংরাজিতে Vaccination কহে। শৈশবে একবার এবং ৭ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে আর একবার গো-বীজের টীকা লইলে বসন্ত রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারা যায়। তবে বসন্তরোগ মহামারী রূপে আবির্ভূত হইলে অথবা বসন্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে সকলেরই সেই সময়ে একবার টীকা লওয়া কর্ত্তব্য। যিনি বসন্তরোগীর সেবা করিবেন, তিনি যেন টীকা নূতন করিয়া লইয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন, নতুবা ঐ রোগে তিনি আক্রান্ত হইলেও হইতে পারেন। বহুদিনের টীকার উপর এইরূপ অবস্থায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। বসন্ত রোগের ন্যায় প্লেগ্, কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্যও টীকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যদিও এই সকল রোগের টীকার রোগ-নিবারণী শক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তথাপি যাহাদিগকে সর্ব্বদা এই সকল রোগের সংস্পর্শে আসিতে হয়, যাহাদিগকে এই সকল রোগীর সেবা করিতে হয়, তাহারা টীকা হইলে, বেশী দিন না হউক, অন্ততঃ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় রোগের সংস্পর্শে থাকিয়াও রোগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে টীকা

লওয়া সাতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য ; ইহাদ্বারা তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং রোগের বিস্তারও বিশেষভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে টীকা লইলে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না, অথচ অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, অথবা রোগ হইলেও উহা প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না এবং কদাচ প্রাণ হানি হইয়া থাকে। সুতরাং কোন সংক্রামক রোগ মহামারী রূপে প্রাদুর্ভূত হইলে সকলেরই টীকা লওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগ পল্লীর মধ্যে বিস্তারলাভ করিতে পারে না, অল্পদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

ডিপথিরিয়া, টিটেনাস্ প্রভৃতি রোগে যে টীকা দেওয়া হয়, তাহা রোগ আরোগ্য হইবার জন্য, নিবারণের জন্য নহে। ডিপ্থিরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পর এই টীকা দেওয়া হয় এ ং ইহার গুণে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ কমিয়া যায়। পূর্ব্বে ডিপ্থিরিয়া রোগে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, টীকা দেওয়া প্রচলিত হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা সবিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিশোধক ঔষধের তালিকা—সমস্ত বিশোধক ঔষধই বিষাক্ত পদার্থ; অতএব অতি সাবধানে ইহাদিগের ব্যবহার করা উচিত এবং যাহাতে বালকবালিকা বা অপর অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উহাতে হাত দিতে না পারে, তজ্জন্য উহাদিগকে সর্ব্বদা আলমারির ভিতর চাবিবন্ধ করিয়া রাখা উচিত।

করোসিভ্ সাব্লিমেট্ বা পার্ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারি (Perchloride of Mercury) ১ ভাগ ১০০০ ভাগ জলে

চিনসল্ (Chinosol)	„	১২০০	„
ফর্ম্মালিন্ (Formalin)	„	৪০	„
কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Carbolic Acid)	„	২০উষ্ণ	„
লাইসল্ (Lysol)	„	২৫	„
ব্লীচিং পাউডার্ বা ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ (Chloride of lime)	„	১০০	„
আইজল্ (Izal)	„	১০০	„
পোটাসিয়ম্ পার্ম্যাঙ্গানেট্	„	২০	„
ফেনাইল্ (Phenyle)	„	২০	„
সিলিন্ (Cyllin)	„	২০	„
ক্রীওলিন্ (Creolin)	„	২	„

এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে সাবান দিয়া কাপড় কাচিলে সাবানের মধ্যে যে ক্ষার-পদার্থ থাকে, তদ্দ্বারা সংক্রামক রোগের বীজ অনেক পরিমাণে ধ্বংস হইয়া যায়।

রোগীর গৃহ বীজশূন্য করিতে হইলে কতকগুলি বিশোধক ঔষধের ধূম তন্মধ্যে প্রয়োগ করা উচিত। যে প্রণালী মতে উহা প্রয়োগ কবিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

গন্ধক।—যে ঘরে ১০০০ কিউবিক্ (১০ × ১০ × ১০) ফিট্ স্থান থাকে, তাহার জন্য দেড়সের গন্ধক পোড়াইবার প্রয়োজন হয়। গৃহটীর দরজা, জানালা এবং যেখানে যে ছিদ্র আছে তাহা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া গন্ধক তন্মধ্যে পোড়াইতে হইবে।

ক্লোরিণ্ (Chlorine)—এই গ্যাসের বিশোধক গুণ, গন্ধকের ধূম অপেক্ষা অধিকতর

প্রবল। ১ ভাগ ব্লীচিং পাউডার (Chloride of lime) ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া চুণ ফিরাইবার মত ঘরের দেওয়ালের সর্ব্বত্র লাগাইয়া দিলে বায়ু-সাহায্যে উহা হইতে ক্লোরিণ্ গ্যাস্ অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া গৃহস্থিত রোগের বীজ নষ্ট করে। ক্লোরিণ্ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন কবিতে হইলে বেশী পরিমাণ ব্লীচিং পাউডার রুদ্ধ গৃহমধ্যে এনামেলের পাত্রে রাখিয়া তন্মধ্যে জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ ঢালিয়া দিলেই ক্লোরিণ্ গ্যাস্ উদ্গত হইবে। ক্লোরিণ্ দ্বারা সূতার কাপড়ের কোন অনিষ্ট হয় না, তবে গরম কাপড় বা রেশমের কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ফর্ম্মাল্ডিহাইড্ (Formaldehyde)—ফর্ম্মালিন্ নামক বিশোধক ঔষধের চাক্তি (Tablets) বিক্রীত হইয়া থাকে। এই চাক্তিগুলি পাত্র বিশেষে রাখিয়া অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই উহা হইতে ফর্ম্মাল্ডিহাইড্ গ্যাস্ উৎপন্ন হইবে এবং উহা দ্বারা গৃহের ও গৃহসজ্জার সংক্রামকতা-দোষ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পার্ম্মাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ গুঁড়া করিয়া তদুপরি ফর্ম্মালিন্ ঢালিয়া দিলেও এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। ফর্ম্মালিন্ একটী উৎকৃষ্ট বিশোধক ঔষধ; ইহার ব্যবহারে কাপড় নষ্ট হয় না অথচ রোগের বীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়।

ঘরে চূন ফিরাইয়া দিলে সংক্রামকতা-দোষ অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

কাশ-আন্দোলনে

(Arthur Symons)

কাশের চামর কাঁপে ওঠে দীর্ঘশ্বাস—
ধূসর সরসী আর শ্যাম তট হতে,
দীর্ঘ তৃণ আন্দোলিয়া সমুদ্র বাতাস
তুলিছে হুতাশ শৈলে দূর সিন্ধু পথে!

কাশের চামরে কাঁপে বিলাপ বেদনা
অনেক দিবস বাহি, বহু রাত্রি ধরে,
মরাল মানস-গামী চলেছে উন্মনা
নীলকণ্ঠ আর্ত্ত গাহি ওঠে আর পড়ে!

কাশের চামর দোলে বিহ্বল ব্যথায়
কত রাত্রি কত দীর্ঘ আকুল দিবসে,
জরা ভুলে গেছি মৃত্যু মনে নাহি হায়,
যৌবন প্রেমের ক্ষয় মনে নাহি পশে!

কাশের চামর শ্বসি' ওঠে বার বার,
তপ্ত মধ্য দিনে আর স্নিগ্ধ গোধূলিতে,
সে কোন বিস্মৃত স্বপ্ন আজিকে আবার
জাগিয়া ব্যাকুল হৃদে কি চাহে বলিতে?

কাশের চামর কহে শ্রান্ত মরমরে,
হায় ব্যর্থ জীবনের বিফল স্বপন,
লুপ্ত শান্তি, স্মৃতি যার পড়েছিল ঝরে
এ বুকে ধরিতে সেকি করেছি রোদন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চিঠি
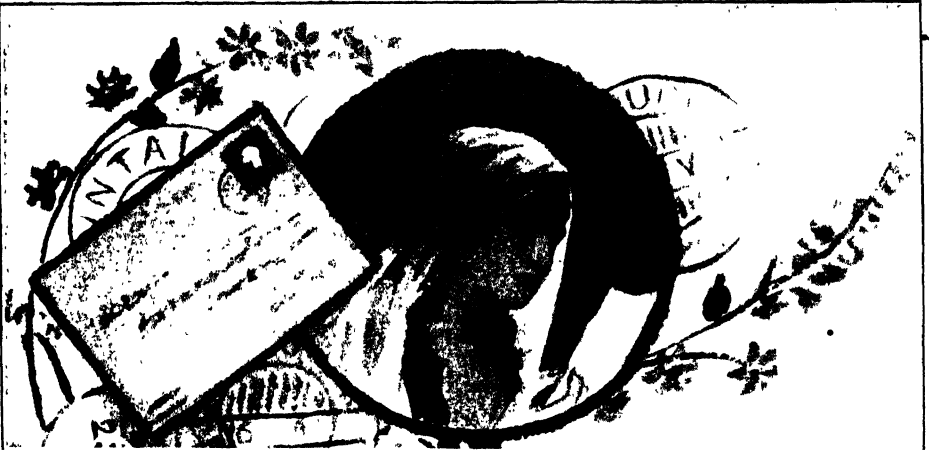
শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

ঠিক দুপুরের আরাম

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

(২৮)

মানব অন্তঃকরণের নিভৃত কন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার মানসলিপিপাঠ চেষ্টার মত এ সংসারে বোধ হয় অপর কোন কঠিন চেষ্টাই নাই। কি গভীর রহস্যে, কি জটিলতায় পূর্ণ করিয়া বিধাতা এই মানব-চিত্তকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়! যে মানবচিত্ত আত্মচৈতন্যের অবস্থিতি, গৌরবে উজ্জ্বল আনন্দময় ও মহৎ তাহাই নিজের কৃত জটিল পাপান্ধকারে ঘৃণ্য বীভৎস কুৎসিত। এ জগতে সমুদ্রের বিশালতায় আমরা বিস্মিত হই অনন্ত আকাশের বিশালতব মূর্ত্তি আমাদের চিত্তকে স্তম্ভিত করে কিন্তু এই অসীম মানবচিত্তের বিশালতম পরিচয় আমাদের সমস্ত হৃদয়কে এককালে অভিভূত করিয়া দেয়। একটি ক্ষুদ্র হৃদয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারা যদি কেহ কাব্য লিখিতে বসেন তবে নিঃসন্দেহ সে কাব্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যকেও পরাভব করিতে সমর্থ হইবে। কেন না মানবচিত্তে যাহা নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শচীকান্ত জীবিত দেহে প্রাণহীনবৎ বহুক্ষণ সেই বেঞ্চের উপরেই বসিয়া রহিল। যে পবিত্র নাম সে সারাজীবনে অবলম্বন করিয়াছিল করালীচরণের মুখে তাহা অকস্মাৎ উচ্চারিত হইবার পর হইতেই সে যেন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানুষের অবস্থা বিশেষে বিষ অমৃত ও অমৃত বিষে পরিণত হইয়া যায়। ট্রেন আসিল, মহাকায় দৈত্যের ন্যায় সে নিজের বিরাট উদরগহ্বরে কতকগুলা লোকজনকে ভরিয়া গর্জ্জনশব্দে বিদায় লইল, সন্ধ্যা ও শুক্রতারা তাহারই কুক্ষিতলে বিলীন হইয়া গেল, তথাপি শচীকান্তের সর্ব্বশরীরের কম্পন থামিল না। একটা যে প্রবল ঝটিকা ভিতর হইতে দুর্ব্বল দেবদারুর মত তাহাকে সঘনে কাঁপাইতেছিল তাহা তাহার বিবেক ও স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ। প্রথম মুহূর্ত্তে সে মনে করিল "এখনই শিবনারায়ণকে গিয়া খবর দিই, তিনি ইহাদেব হস্ত হইতে মনীশের বাগ্‌দত্তাকে মুক্ত করিয়া লউন। বুঝিলাম এব্যক্তি অতি নীচ ইহার অভিপ্রায় ভাল নয়, অর্থের জন্য এ সব করিতে পারে!" কিন্তু এ চিন্তা তাহার চিত্তে স্থায়ী হইল না, প্রথমকার এ মহত্বকে চাপা দিয়া ভিতর হইতে স্বার্থ হাঁকিয়া উঠিল "রহ, রহ এত ব্যস্ত কেন? ভাবিয়া দেখা যাক্— সত্যসত্যই ইহা আবশ্যকীয় কি না! এইখানেই দেবদানবে, যমদূতে বিষ্ণুদূতে সমর বাধিল। বিবেক বলিল "ভাবিবে আবার কি? কর্ত্তব্য পালনে বিলম্ব অবিধেয়"। স্বার্থ আবার ঘোর রবে আপত্তি তুলিল "কর্ত্তব্যই তো কবিতে চাই, কমলা মনীশের বাগদত্তা কিসের, তাহার যথার্থ অভিভাবক বহুপূর্ব্বে তাহাকে আমায় দিয়াছিলেন, তাহার উপর মনীশের কিসের অধিকার?"

বিবেক এ যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টায় অনেক শরক্ষেপ করিল কিন্তু এ অভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল না, সপ্তরথীতে সেখানে প্রবেশপথ

আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছিল। বিবেকের শাসন মন মানিতে রাজি হয় না, সে প্রবলস্বরে কেবলই বলে 'কেন আমি এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিব? কেন আমি নিজের ধর্ম্মরক্ষা করিব না? আমি তো চেষ্টা করি নাই, যদি'...

এইখানেই একটা খটকা বাধিয়া যায়!...কি বলিবে—যদি ঈশ্বর সুযোগ দিয়াছেন? ঈশ্বর কে? সেতো তাঁহাকে কখনও চিনে নাই ডাকে নাই, আছেন কি না তাহাতেও সংশয় করিয়া আসিয়াছে, তবে এ কি দৈব? অদৃষ্ট? কে তাহাকে আজ এ সুযোগ দান করিল? আচ্ছা সে যেই হউক না কেন তাহাতে কি! কেন সে তাহার দান গ্রহণ করিবে না?

সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হইয়াছিল, রাত্রি গভীরতর হইতে লাগিল। বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া ডেলি-পেসেঞ্জার গুলা আফিসের বাবুদের গৃহে ফিরাইয়া দিয়া গেল। ষ্টেশন ক্রমেই জনশূন্য হইতে হইতে শেষকালে একটা সময়ে একেবারে নিঃসাড়া হইয়া আসিল। বাহিরের গাছের মধ্যে তীব্র স্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতে লাগিল। কোয়াসার একখানা পাতলা ওড়না নৈশ প্রকৃতির অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, তাহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষীণ নক্ষত্রালোক সূক্ষ্ম বসনান্তরালে সুন্দরীর অঙ্গলাবণ্যবৎ অর্দ্ধ বিকসিত হইয়া উঠিতেছিল। কেবল গাছপালার অসংখ্য জোনাকীর ঝিকমিকানি যেন তাহারি নিশ্বাস প্রশ্বাসভরে কম্পিত হীরক দুলের মত থাকিয়া থাকিয়া ঝকিয়া উঠিতে লাগিল। সেই প্রবল শীত হিম নিদ্রালস্য উপেক্ষা করিয়া শচীকান্ত তেমনই নিস্তব্ধ বসিয়া রহিল, এবং তাহার মনের মধ্যে তেমনই ভীষণ বেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রবল আক্রমণের বেগে থাকিয়া থাকিয়া মাথার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃজিয়া উঠিতেছিল, ধমনী মধ্যস্থ শোণিতে উন্মত্ত তরঙ্গ ছুটিয়া ফিরিতেছিল!

ষ্টেশনের মধ্যে লোকজন অল্পই ছিল, কুলী দুইটা একটা চট মোড়া মাল ঠেলিয়া আনিয়া তাহার গায়ে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিল। আলো গুলা নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে কেবল একটি মাত্র ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল, ভোর পর্য্যন্ত আর কোন গাড়ি আসিবার কথা নাই।

শচীকান্ত ভাবিতে ভাবিতে একবার আলোটার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। হঠাৎ যেন মনে হইল সেই আলোকে কেহ তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল অবধি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা উলটিয়া দেখিতেছে। সে আলোকের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিল। কিন্তু হায় সেই অদৃশ্য দর্শকের অন্তর্বিদ্ধকারী দৃষ্টি হইতে সে নিজেকে লুকাইতে পারিল কই। এদিকের মৃদু অন্ধকারে তাঁহারই দুই নেত্র অনলউদ্গারণ করিয়া যুক্ততারকার আকারে চোখের উপর দুই ভৎর্সনা দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। শচীকান্ত শিহরিয়া দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া বেঞ্চের পিঠে মাথা রাখিল। সে দৃষ্টি যেন তাহার পিতার অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নেত্র যুগল স্মরণ করাইয়া দেয়! সে আবার মনে মনে বলিল,—যেন সেই দৃষ্টির উদ্দেশে নিজেকে সাফাই করিতে গিয়া বলিল, আমার দোষ কি? আমিতো পাপ করিতেছি না, কাহারও কোন ক্ষতি করিতেও ইচ্ছুক নই তবে এত সঙ্কোচই বা কিসের?

কিন্তু সঙ্কোচ নাই বলিলেও তো সঙ্কোচ যায় না, দোষ নয় ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও যে অপরাধের ভারে সারা প্রাণ ভারী হইয়া উঠিতেছে। মাথার ভিতরে আগুন জ্বলিতে লাগিল, পাপ নয়, দোষ নয় তবে কেন এ আগুন! তবে কেন এ হত্যাকারীর আতঙ্ক! চোরের মত যন্ত্রণাপূর্ণ সঙ্কোচ! ইহা কি কি তবে?

ধীরেধীরে সে উঠিয়া বলিল, চারিদিকে চাহিয়া ললাটের কেশগুচ্ছ অপসৃত করিল। কোয়াসার আক্রমণে নক্ষত্র দুইটি ঢাকা পড়িয়াছে তথাপি সেই দিকে চক্ষু যাইতেই আবার তাহার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। সেই অদৃশ্য তারকাদ্বয় যেন সেইখানে অগ্নিময় অক্ষরে তাহার পিতার হস্ত লিপির অনুকরণে লিখিয়া রাখিয়াছিল "বিশ্বাস ঘাতকতা! বন্ধুদ্রোহ।"

জলন্ত গোলা যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা অকস্মাৎ বিদ্ধ করিয়া তাহার মুখ হইতে আচমকা অস্ফুট কাতরোক্তি বাহির করিয়া লইল! "ওঃ না, না, না।"

সে সেই মুহূর্ত্তে যেন তাহার সম্মুখে অতি নিকটে তাঁহার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিল, সেই প্রসন্ন মুখ অথচ তেমনই হৃদয়ভেদী দৃষ্টি, তিনি যেন তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, শুধু একটু খানি হাসি - কিন্তু ইহাতেই তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। যেন স্পষ্ট কানের কাছে তাঁহারই কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল, "ইহা বিশ্বাসঘাতকতা, মিত্রদ্রোহ ইহাই।" হায় হায়, তবে তাহাকে কি এখনই চাকদায় যাইতে হইবে? মনীশের খুল্লতাতের নিকট করালীচরণের অসদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুর ঋণ শোধ করিতে হইবে! লোকে তাহাকে বন্ধুবৎসল বলিবে কিন্তু তাহার নিজের ইহাতে কি লাভ কি উপকার! দুই বৎসরাধিক সে যাহার অনুসন্ধানে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, যাহার জন্য সংসারের কোন লাভের দিকে চাহিয়া দেখে নাই, বরং করায়ত্ত লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া এই দারিদ্র গ্রহণেও দ্বিধা করে নাই সেই চির ঈপ্সিতকে সে কিসের মূল্যে ত্যাগ করে! বন্ধুত্ব। কর্ত্তব্য। সংসারে ইহাদের স্থানও অল্প নয়। নিজের হৃদয়ের মধ্যে যত আর্ত্তনাদ উঠুক, তাহা চাপা দিয়া জগতের চক্ষে যশলাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতে হইবে। বেশ তাহাই করিব, প্রথম গাড়িতেই আমি চাকদা যাইব। এতক্ষণে যেন মস্তিকের পীড়ন বক্ষের অস্থিরতা কতকটা সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিল। ফুটন্ত শোণিততরঙ্গ উদ্দাম নৃত্য ভঙ্গ করিয়া শান্তগতি ধরিয়া নিজপথে বহিতে আরম্ভ করিল। এত শীতেও আভ্যন্তরিকতাপে ললাট তলে দুএক বিন্দু ঘর্ম্ম জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সে দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিল, ললাটের স্ফীত শিরা অল্পে অল্পে স্থির হইয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ শচীকান্ত যেন একটা বিস্মৃত স্মৃতির উদ্রেকে আশান্বিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আমি কি একাই তার বন্ধু! সে তো কই বন্ধু বলিয়া আমার কথা মনে করা আবশ্যক বোধ করে নাই? এত বড় সন্দেহজনক অবস্থায় নাকি কেহ সত্য পরিচয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে? মনীশ নিশ্চয় বুঝিয়াছিল এ কমলা তাহারই

সেই হারাণো কমলা! তবে? সেকি তাহার মুখ চাহিয়াছিল? কেন তবে শচীকান্তই নিজের এই সর্ব্বনাশ করিবে? না ইহা কর্ত্তব্য নয়, সে ভুল বুঝিয়াছিল, সে কিছুই প্রকাশ করিবে না, করালীচরণ যে ইঙ্গিত দিয়া গেল সেই মতই কাজ করিয়া যাহার জন্য সে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে তাহাকে লাভে ধন্য হইবে। কেন সে তাহার একমাত্র সুখের আলোক নিজের অন্ধকার চিত্তে জ্বালাইতে এত দ্বিধা করিতেছে? কোন সঙ্কোচের কারণ বর্ত্তমান নাই, সে-ই বরং তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিল!

এতক্ষণে আসন ছাড়িয়া সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন কোয়াসার সূক্ষ্ম আস্তরণ পুরু হইয়া সুপ্ত জগতের অঙ্গে শীত বস্ত্র বিছাইয়া রাখিয়াছে, আকাশের একটি তারাও দেখা যাইতেছে না। সে মুক্তির নিশ্বাস লইয়া পুনশ্চ নিজের মনকে বল দিবার জন্য, উৎসাহিত করিবার জন্য কহিল,—এই আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন প্রথমে না করিয়া অপরের কথা কেন পূর্ব্বেই ভাবিতেছি!

কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবকেও সে যেন বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইল না, সেই নৈশ অন্ধকারে চন্দ্রহীন তারাহীন হিমবসনাবৃতা বিধবা নিশীথিনী যেন তাঁহার শীতল অঙ্গুলী তুলিয়া অলঙ্ঘ্য আদেশস্বরে শব্দহীন গম্ভীর ভাষায় উচ্চারণ করিলেন "ব্রহ্মহামুচ্যতে লোকে মিত্রদোহি ন মুচ্যতে!" মহাশূন্যে সেই শাস্ত্রশাসন গম্ভীর ধ্বনিতে শব্দায়মান হইয়া রহিল, দশদিকে সেই নীতিবাক্য শ্রুতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল, শব্দহীনা যামিনীর তৃতীয় প্রহরে, স্তব্ধতার প্রতিকেন্দ্রে সেই ভীষণ বাণী যেন কোন অশরীরি মহাপ্রাণীর অখণ্ডনীয় অভিসম্পাতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়া একমাত্র শ্রোতার প্রতি শিরা উপশিরার ভিতরে তুষার শীতলতা সঞ্চালিত করিয়া দিল। বেঞ্চের পিঠে মাথা রাখিয়া ক্রমশ শচীকান্ত ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কয় মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সর্ব্ব যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল।

যখন সে জাগিয়া উঠিল, শীতে তাহার সর্ব্ব শরীর জমিয়া আসিয়াছে, খোলা স্থানের ভোরের হাওয়া ছুরীর মত হাড়ের মধ্যে গিয়া বিঁধিতেছিল। প্লাটফরমের একটি মাত্র দেওয়াল-ল্যাম্প অতি ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল, চারিদিকে তখনও একটা অস্পষ্ট অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তৃত, নিস্তব্ধতার মধ্যে কোয়াসাদীর্ণ শিশিরবিন্দু বৃষ্টির মত গাছের পাতা হইতে ঝরিয়া পড়ার টুপ্ টাপ্ শব্দ যেন কোন শোকার্ত্তা নারীর অশ্রুপাতের ন্যায় নব জাগ্রিত বায়ু শব্দের সহিত শ্রুত হইতেছিল। ষ্টেশনের মধ্যে আফিস ঘরে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে আলো জ্বলিতেছে, বন্ধ শাসির মধ্য দিয়া সে আলো কাঁকরফেলা পথের উপর পড়িয়া দুঃখীর দীর্ণ পঞ্জরের মত দেখাইতেছিল। দুএকটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। একটা কুলী জোরে জোরে ঘড়িতে ঘা দিয়া পাঁচটা বাজাইয়া গেল, কোথা হইতে একটা কলের আহ্বান-বাঁশী উর্দ্ধ স্বরে বিশ্রামশয়ান কর্ম্মীদের জাগরণ গীতি গাহিল। শচীকান্ত চোখ রগড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—সে এখানে কেন?

একটি লোক অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল সে আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না কাছে আসিয়া ডাকিল "বাবু !"

শচীকান্ত অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল, এ পৃথিবীতে যে, সে ভিন্ন অপর কোন মানব বাস করিতেছে কাল হইতে সে একথা বিস্মৃত হইয়াছিল। "আপনি সন্ধ্যে থেকে বসে আছেন কোথায় যাবেন !" উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ কহিল "এখনি একটা গাড়ি আসবে যান তো তৈরি হয়ে নেন্।"

শচীকান্ত এতক্ষণে কথা কহিল, প্রথমটা নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই যেন বিস্ময় বোধ করিল,—এ যেন আর কাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বর! "কোন দিকের গাড়ি ?" "রাণাঘাটের দিকের"। পদতল হইতে মস্তক অবধি সঘনে কাঁপিয়া উঠিল, "রাণাঘাটের দিকের গাড়ি, তা আমার কি ?"

আপনি তাহলে কোনদিকে যাবেন ?"

"আমি, আমি কোনদিকে যাবো !"

কুলী অবাক্ হইয়া বাবুর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মনে মনে বলিল "বাউরা !"

ঘণ্টা বাজিল, টিকিট ঘরের সম্মুখে কয়েকটা লোক টিকিট কিনিতেছে, শচীকান্ত কলের পুতুলের মত সেইখানে গিয়া হাত পাতিল, মণিব্যাগ খুলিয়া কোন্ সময় যে টাকাটা বাহির করিয়াছিল কিছুমাত্র স্মরণ হয় না। অর্থ গ্রহণ করিয়া টিকিটমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার টিকিট !" শচীকান্তের বক্ষে আবার শোণিত তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ নিঃসাড়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল "চাকদা"।

"কোথা বল্লেন ? চাঁদপাড়া" ?

"হ্যাঁ, না চাঁদপাড়া নয়।"

"তবে !"

"চাকদা"।

"ওঃ চাকদা এই নেন্।"

সে তেমনি কলের পুতুলের মতই পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, একবার মনে হইল টিকিট খানা হাত হইতে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পারিল না, সেখানা যেন মন্ত্রবলে হাত আঁটিয়া ধরিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কোয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া উষালোক জগতে নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিল; ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পথ ঘাট গাছের তলা ভিজাইয়া দিল। অকস্মাৎ শিহরিয়া শচীকান্ত দেখিল দুইটা জ্বলন্ত রক্তনেত্র বিস্তৃত করিয়া একটা বিরাটকায় দানব তাহারি দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, সে আতঙ্কে পিছু হটিয়া গিয়া, দেওয়ালে পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। দৈত্যটা সহসা একখানা ট্রেনের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নম্র মূর্ত্তিতে প্লাট ফরমে প্রবেশ করিতেছিল, অসুর মূর্ত্তির চেয়েও এ ভয়ানক।

৩৯

সোনার রংয়ের পাকাধানে ক্ষেতগুলি ঝলমল করিতেছে। তাহার এক ধার দিয়া শীতের নদী বহিয়া চলিয়াছে। আকাশের অঙ্গে বিবিধ আকারে মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে প্রখর রৌদ্র কিছু পূর্ব্বে তাহাদের অঙ্গে শোণিত ফুটাইয়া তুলিয়াছিল এখন সে রৌদ্রতাপ নাই, কিন্তু এখনও সূর্য্যদেব জলতলে লোহিত রাগে ভক্ত হৃদয়ধারা ঢালিয়া রাখিয়াছেন। 'জবাকুসুম সঙ্কাশ' যেন জবার

মালা দিয়া জলশায়ী অনন্তের পূজা সমাধা করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, রাশি রাশি খড়ের আঁটি বাঁধিয়া স্তূপাকারে একপ্রান্তে রক্ষিত হইয়াছে, বলদ গাড়িতে কৃষক-পরিবার শস্য বোঝাই দিতে ব্যস্ত। হিম-সঙ্কুচিত বনবিহঙ্গ পক্ষ বিস্তৃত করিয়া দূর পরপার হইতে নীড় লক্ষ্যে ফিরিতেছিল। ক্বচিৎ দু-একটা পক্ষী স্থির বাতাসে পক্ষ চালিয়া ইচ্ছাসুখে কোন্ দিগন্তের শেষে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

মনীশ এই শান্ত সন্ধ্যায় মাঠের আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া বট অশ্বত্থের ছায়ানিবিড় তরুপথে ঘাটের কাছ অবধি আসিয়া পড়িল। গ্রাম্য নারীগণ তখন যে যাহার কলস ভরিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। কৃষাণ তখন শ্রমসাঙ্গ করিয়া কাস্তে হাতে রামপ্রসাদী এক তালায় "মন রে কৃষি কাজ জানো না" গাহিয়া ঘরের পানে চলিয়াছে, আকাশের কোলছাড়া পাখীগুলি বহুবিস্তৃতশাখ, প্রাসাদ তুল্য মহাবৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ কবিতে করিতে দিবসের শেষ আলাপ সাঙ্গ করিতেছিল। ভ্রমণক্লান্ত মনীশ একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। এবার এখানে আসিয়া মনীশ আবার তাহার আরব্ধ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীপতি বাবু দরিদ্র সন্তানগণের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া এতদিন যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন সেখানে সে বৃথা ক্ষমতা ব্যয় করিতে যায় নাই। পায়রাডাঙ্গায় এইরূপ একটি দরিদ্র পাঠশালা স্থাপনার্থে সে সেইখানে প্রতিদিন আসা যাওয়া করিতেছিল। অপরাহ্নে কর্ম্মপরায়ণ চাষাদের মাঝখানে তাহার উদয় যেন জ্যোতিষ্মান্ মঙ্গল গ্রহের অভ্যুদয় পরিকল্পিত হইত। সাগ্রহে মূর্খ শ্রমজীবীগণ দাদা ঠাকুরের মুখের অমৃতবাণী বিদেশী শ্রমজীবীগণের বিস্ময়কর ত্যাগশীলতা, স্বদেশপ্রেম স্বজাতি-প্রীতি, ধর্ম্মপ্রাণতা শ্রবণ করিত। গৌরবে তখন তাহাদের জ্যোতিঃ-হীন নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, বৃক্ষতলে সুষুপ্ত মানবাত্মা জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের বাহ্যিক ব্যবধান দূর করিয়া দিত, কেহ দন্তে দন্তে চাপিয়া, কেহ সহাস্যে অকস্মাৎ কহিয়া উঠিত "আমরাও তা হলে ভদ্দর লোকদের মতন ভাল ভাল কাজ করতে পারি হ্যাঁ দাদা ঠাকুর ?" দাদা ঠাকুরও উৎফুল্ল নেত্র স্নেহে করুণায় ঈষদার্দ্র করিয়া ভারী গলায় উত্তর দিতেন, "স্বভাবে যে বড় সেই প্রকৃত বড় কেন পারবে না তোমরা ?" অশিক্ষিত যুবা বৃদ্ধ বালক মুগ্ধ হইয়া ভাবিত "দাদা ঠাকুর দেবতা !"

আজও মনীশ সেই প্রাত্যহিক কার্য্য-ব্যপদেশে এখানে আসিয়াছিল, কর্ম্মশেষে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বিশ্বজগতের দ্বার রাত্রির অন্ধকারে রুদ্ধ হইয়া আসিল, সন্ধ্যাতেই বক্র রেখায় চাঁদ উঠিয়া অভয় হাস্যে বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিলেন, আবার ভীত জগৎ প্রসন্নচিত্তে হাসিয়া উঠিল। মনীশ গৃহে প্রতিগমনার্থে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে এ একটু খানি কালির রেখা কেন ? এই সুন্দর, সানন্দ ও বিশাল জগতের মধ্যে সে কেন আর তাহার সকল দীনতা সেই এক অবিচ্ছেদের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারে না! কেন নিজের অক্ষুব্ধ প্রেমের সুধা

ঢালিয়া তৃষিত সংসারের বুভুক্ষা বিদূরিত করিতে না চাহিয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুধা লইয়া অতৃপ্তি উপভোগ করিতেছে? হায় মানুষের সীমাবদ্ধ হৃদয়, উদার হও, সীমা হারাইয়া ফেল, অমৃত লাভ কর। তুমি যে অমৃতের পুত্র! কিন্তু হায়, সে যে মানুষ, সে কেমন করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া দেবতা হইবে? মন দেবপ্রসাদ ভোগ করিতে চাহে, দেবতা হইতে চাহে না!

মনীশ ধীরপদে গৃহে ফিরিল, ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলিতেছে, সত্য দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল "কে এসেছেন বলতে পারো?"

মনীশের বক্ষে সংশয় সজোরে আঘাত করিল, নেত্রপল্লব নত করিয়া সলজ্জ সন্দেহে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে সতু?" উত্তর শুনিবার জন্য নিজেরও অজ্ঞাতে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। "শচী দাদা"।

"শচী!"

"হ্যাঁ এই যে তিনি"—বলিতে বলিতে ঘরের ভিতর হইতে শচীকান্ত বাহির হইয়া আসিল।

"তুমি যে হঠাৎ এ সময়? ভাল আছ তো শচীন্!"

"ভাল, হ্যাঁ আছি তোমায় একবার দেখতে এলাম, তুমি ভাল আছ?"

"হ্যাঁ, আমায় দেখতে এসেছ তবে?"

"হ্যাঁ ভাই তোমাকেই, তুমি বেশ ভাল আছ তো?" মনীশ বন্ধুর এই পুনঃপুনঃ সাগ্রহ কুশল জিজ্ঞাসায় বিগলিত হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, তাহার সহিত সে যে একটু বেখাপ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল তাহারই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত! স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সে কহিল "আমি খুব ভাল আছি শচীন্, এসো বসবে এসো; কতক্ষণ এসেছ?"

"এই একটু হলো এসেছি, এখানে এসেছি সকালের ট্রেণে, দুপুর বেলা শুনলাম তুমি পায়রা ডাঙ্গায় গেছ, বিকালে শুনলাম তুমি এসেই আবার কোথায় বেরিয়েছ, কোথা গেছলে? সত্য বল্লে মাঠে, কেন? একা সন্ধ্যাবেলা মাঠে কি করছিলে?"

ইতিমধ্যে বন্ধুদ্বয় গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া পাশাপাশি আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সত্য তাহাদের বিশ্রব্ধালাপের অবসর দিয়া সরিয়া গিয়াছে। মনীশ উদ্ভাসিত আলোকে বন্ধুর মুখের দিকে প্রীতিকোমল নেত্রে চাহিয়া বিস্ময় বোধ করিল। বিবর্ণ মুখে দুই চোখ যেন বিদ্যুতের মত তীব্র আলো বিতরণ করিয়া জ্বলিতেছে, বেশভূষা বিশৃঙ্খল, মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা নিদারুণ কশাঘাতের মত গভীর রেখায় আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল। মুখচোখের ভাবে খুনী আসামীর ভয়াবহ প্রতিকৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। মনীশ বিমূঢ়ভাবে ডাকিল "শচীন্?" শচীকান্ত মনীশের দিকে চাহিয়াই শিহরিয়া দৃষ্টি নত করিল, অসহ্য! কি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! সে যদি জানিত, সে যদি বুঝিত তাহার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক ঈর্ষা, কি ঘৃণা, কি বিদ্বেষ সে মনের মধ্যে পোষণ করিয়া বেড়াইতেছে! তাহার বাহিরটার মত ভিতরটাকে এমনি স্পষ্ট দেখিতে পারিলে সে এতক্ষণ হয় ত তাহার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে সরিয়া যাইত। এক্ষনও তাহারা

সেই আভ্যন্তরিক ঝটিকা নিবৃত্তি হয় নাই। সেই মানসিক অগ্ন্যুৎপাতের গৈরিক নিঃস্রব এখনও সারাপ্রাণ ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে।

সে স্বেচ্ছায় এখানে আসে নাই, কে যেন তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছে। দুইবার খবর লইয়া যখন সে মনীশের অনুপস্থিতি সংবাদ পাইল, তখন মস্ত বড় একটা যুক্তি তাহার চিত্তে আশার বাণী বহন করিয়া আনিল। তবে সে আর কি করিবে? অগত্যাই মনীশের সহিত বিনা সাক্ষাতেই ফিরিয়া যাইতে হয়। সে ত চেষ্টার ক্রটি করে নাই কিন্তু সেই দিনই ফিরিবার কথায় দাদা এমনই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং নিজের মনেই সে এমনই একটা গুরু অপরাধের ভার অনুভব করিল যে যুক্তিটা সম্পূর্ণ অকাট্য হইলেও তাহা নিষ্ফল ব্যর্থ হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যায় আবার সে যখন মনীশের প্রতীক্ষায় তাহার বসিবার ঘরের টেবিলটার সম্মুখে সেই চিরপরিচিত স্থানটি গ্রহণ করিয়া বসিল, তখন একবার তাহার চিত্ত হইতে ভিতরকার রুদ্ধ উত্তাপ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। নিজের গুরু অপরাধ উপলব্ধি করিয়া সে যেন কেমন একটা আকুল চঞ্চলতা অনুভব করিল। তাহাদের সেই আবাল্য প্রীতি-প্রবাহিণীর মন্দীভূত বেগশীলতা সহসা যেন পূর্ব্বগতি ফিরিয়া পাইতেছে এমনি সে অনুভ করিতে লাগিল। মনে হইল সে সেই কলেজের ছাত্র শচীকান্ত, তাহার অকৃত্রিম বন্ধু মনীশের কাছে সে আসিয়াছে, আর কোন কিছু না।

অনেকক্ষণ অবধি মনীশ বাড়ী ফিরিল না জানালার মধ্য দিয়া শচী পুনঃপুন বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, গাঢ় মসীবর্ণের আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের জ্যোতি অতিমাত্রায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, তাহারই এক পাশে ক্ষয়প্রাপ্ত চক্রার্দ্ধবৎ চন্দ্র রত্নভূষণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে! গাছের পাতায় পাতায় চন্দ্রকর-লেখা মাখামাখি হইয়া গিয়াছিল। কে একজন দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে, শচীকান্ত উন্মুখ হইয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিল, মনীশ সম্মুখীন হইলেই সে তখনি উঠিয়া তাহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিবে, প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিবে আজ আমি তোমার বন্ধু, তোমার প্রকৃত বন্ধু হইতে আসিয়াছি খোলস ফেলিয়া আসিয়াছি, আমায় কাছে ডাকিয়া লও। কিন্তু তাহার প্রতীক্ষা ব্যর্থ করিয়া আসিল সত্য! আবার সে শুভ মুহূর্ত্তকে বিফল হইতে দেখিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। সাময়িক উত্তেজনার মত্ততাও ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল।

শেষকালে মনীশ আসিল, তাহার পদধ্বনি কণ্ঠস্বর, হাতের স্পর্শ, শচীকান্তের সর্ব্বশরীরে এককালে সহস্র তাড়িত ছুটাইয়া দিল, গূঢ় আনন্দের আভায় সারা মুখ উজ্জ্বল করিয়া দ্রুত স্পন্দিত হৃদয়ের আবেগে কম্পিত স্বরে সে যখন তাহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল তখন তাহার সমস্ত শরীরের স্নায়ু একটা অধীর বেদনার বেগে পীড়িত হইয়া উঠিল, অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় বুকখানা ফাটিয়া পড়িবার মত হইতে লাগিল, কি বন্ধুপ্রেমের কি প্রতিদান সে দিতে বসিয়াছে! সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে গেল, অনুতপ্ত চিত্তের বেদনাশর উৎপাটিত

করিতে চাহিল। কিন্তু আবার সেই কিন্তু' মানবের চির-শত্রু, সর্ব্ব মঙ্গল কর্ম্মের বিঘ্ন-সাধক সেই 'কিন্তু' বলিল,—করিতেছ কি ? এত সহজে তোমার আকিঞ্চনের ধনকে ভুলিয়া যাইবে ?' ধীরে সে উত্তর করিল "কি মনীশ !" মনীশ বলিল "তুমি আমার শরীরের কথা ভাবচো নিজের চেহারাটা যদি আয়না ধরে দেখ ! এমন হয়েচ কেন ? মনে হচ্চে যেন কতদিন খাওনি, ঘুমোওনি।" বাস্তবিকই মানসিক সংগ্রামে অনিয়মে শচীকান্তকে চেনা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ নত করিয়া বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "একটু অনিয়ম গেছে কি না। কদিন কলকাতায় ওরা সার্কাস থিয়েটারে, ধরে নিয়ে গেছল,—"

"তুমি কলকাতা গেছলে ?"

হ্যাঁ সেখানেই তো জানলাম তুমি বাড়ী এসেছ, হঠাৎ বাড়ী চলে এলে যে ?"

মনীশ বন্ধুর সহসা আগমনের গূঢ় কারণ এইবার স্পষ্ট বুঝিয়াছে। মনে করিল কলিকাতায় মনীশের পুরাতন প্রীতির অযুত স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অনুতাপ জাগাইয়া দিয়া আজ আবার তাহার বন্ধুকে তাহার বক্ষে ফিরাইয়া দিয়াছে। সে মহানগরীর উদ্দেশ্যে তাহার হৃদয়ের শত ধন্যবাদ প্রেরণ করিল। আনন্দে সে অকারণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল "হঠাৎ কুই ভাই, ছুটির সময় সত্য এলো আমিও তাই এসেছি ! সেখানে আমার নৈশ পাঠশালা চলচে কিছু শুন্‌লে ?"

শচীকান্ত আবার যেন একটা স্বস্তি বোধ করিল "হ্যাঁ শুন্‌লাম বই কি, বেশ চলচে। বড় দিনের দুদিন শুধু বন্ধ ছিল, সে দুদিন ওরা ইন্দুভূষণকে শুদ্ধ থিয়েটারে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

মনীশ হাসিতে লাগিল "ওদের সঙ্গে আমি ছাড়া আর কেউ পারে না, তুমি এখন দুদিন থাকবে তো ? বেশ বই লিখেচ।"

শচীকান্ত এই কথায় একটু যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া সে অপরাধী ভাবে উত্তর করিল "আমি কাল সকালেই যাবো—পাঁচটার ট্রেনে, তোমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না—"

মনীশ সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "ঈস্ যেতে দিলুম বলে, এত তাড়া কেন শুনি ?"

শচীকান্তের ললাট হইতে চিবুক অবধি রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে মাথা নীচু করিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে কহিল "সেখানে একটা বড় জরুরী কাজ ছিল, যদি মাসিমা মনে করেন কাজের ভয়ে পালিয়ে রইল—"

মনীশ তাহার হস্ত শিথিল করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল "ওঃ তাহলে তো আর কথাই চলে না।"

শচীকান্ত একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, ছাড়া পাইবার মুহূর্ত্তে তাহার সহসা মনে হইল, মনীশ তাহাকে তাহার মায়াজালে জড়াইয়া নিজের কাছে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলে ভাল করিত, কেন মুক্তি দিল !

কিন্তু তখন এ চিন্তার অবসর ছিল না এখনও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বাকী আছে। কিন্তু কিসের পরীক্ষা, মনীশের মুখে সেই হাসি, কণ্ঠে সেই অক্ষুণ্ণ প্রসন্নতা, দৃষ্টিতে তেমনি উদার মহত্ত্ব সুব্যক্ত, আহত হৃদয়ের ক্ষত চিহ্ন কোনখানেই শোণিতপঙ্কলিপ্ত

করে নাই! বৃথা ভয়, মিথ্যা এ ভাবনা। সে এ জগতের অনেক ঊর্দ্ধে, মানবচিত্তের ক্ষুদ্র সুখ কল্পনা আশা নিরাশার দ্বন্দ যুদ্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সে প্রেমিক নহে, নিজেই সে প্রেম!

নিস্পন্দলোচনে সে মনীশের হাস্যোজ্জ্বল মুখের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শ্রদ্ধাসংযত হৃদয়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মনে মনে মাথা নত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, পুলকিত অঙ্গে তাহাকে আলিঙ্গন কল্পনা করিয়া কণ্টকিত দেহ হইল, এ মহাযোগী মহাদেব আজও ধ্যানাসীন। মনীশ উঠিয়া হাসিমুখে সেল্ফের উপর হইতে একখানা অতি পরিপাটি আবরণ-মণ্ডিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া আসিল, সোনার জলের লতাযুক্ত সুন্দর ছাঁদের টানা অক্ষরে বড় বড় করিয়া ইহার উপরে খোদা "ক্ষণিকের দেখা", এবং মলাটের নীচের পাতার উপরে কালীর অক্ষরে লেখা "চিরস্নেহাস্পদ বন্ধু মনীশকে উপহার। অকৃত্রিম বন্ধু শচীকান্ত।" মনীশ পাতা উলটিয়া শচীর চক্ষের সম্মুখে ধরিল "এলেখাটা চিন্‌তে পারো?"

একবার চোখ বুলাইতেই শচীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল "আমার তো মনে হচ্চে না আমি তোমায় এ রকম বই পাঠিয়েছি, কিন্তু লেখা তো আমার হাতেরই?"

"কেমন করে হলো বলো তো?" মনীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "আমি নিজে লিখেছি, জাল করা বড় শক্ত, তোমার চিঠিগুলা দেখে এক একটি অক্ষর কত ধরে ধরে লিখেছি, কিন্তু যখন শেষ হলো দেখলাম ঠিক তোমার লেখার সঙ্গে মিলে গ্যাছে শচীন্, তখন মনে বড় আনন্দ হলো, বোধ হ'লো যেন তুমিই এ লেখা আমায় পাঠিয়েছ, আমি রোজ একবার করে লেখাটি দেখি, আর"—

"মনীশ!" আহতভন্ত্রী বীণার আকস্মিক ক্রন্দনমূর্চ্ছনার ন্যায় অকস্মাৎ শচীকান্ত ব্যথাকাতর চিত্তে বলিয়া উঠিল "মনীশ! তুমি তোমার এই পাষণ্ড বন্ধুর কথা এত ভাবো, এত খানি ভালবাসো, তাকে জানো না কত হীন, কত নীচ সে—" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিলাপ ধ্বনির মত আকুল স্বরে পুনরায় সে আরম্ভ করিল "শোন মনীশ, তোমার চির সুহৃদের অধঃপতন কাহিনী তবে তুমি শোন, আর আমি চাপতে পারি না, যা হবে হোক, সব বলি শোন। জেনে যদি ঘৃণা করতে হয় তাও করো তবু এ লুকোচুরি"—বিস্ময়ে মনীশ এ পর্য্যন্ত একটি বাক্য উচ্চারণেও সক্ষম হয় নাই, এতক্ষণে আকস্মিক বিস্ময়ের বেগ ঈষৎ প্রশমিত হইয়া আসিলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের আসন তাহার আসনের আরও কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার বাহুমূলে সান্ত্বনাহস্ত স্থাপন করিল "শান্ত হও ভাই, আমি কোন কথা শুনতে চাইনে" "না মণি! বাধা দিও না, আমায় বল্‌তে দাও। শোন তুমি কার উপরে এত বড় বিশ্বাস, এ অমর প্রেম স্থাপন করেছ সে তোমার—"

মনীশ ব্যগ্র করে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, তড়িৎ বেগে উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত অথচ পূর্ণ বিশ্বস্ত স্বরে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল "একটি কথাও না। আমি তোমার এ পাগলামীর প্রশ্রয় দিতে পারবো না শচি;

শোন ভাই আমি বেশি বলতে পারিনে, —কখনও বলিনি আজ বলচি আমি তোমায় যথার্থ ভালবাসি। প্রকৃত ভালবাসার চক্ষে প্রেমাস্পদের অপরাধ অতি নগণ্য, তাতে ব্যথা দিতে পারে কিন্তু ঘৃণা আনতে পারে না। তুমি পাগল তাই ওসব কথা বলচো, কাকে আমি ঘৃণা করবো, তোমায়? অসম্ভব! আমি তো তোমার মহত্বকে ভালবাসিনি, আশৈশব ভালবেসেছি তোমাকে। তোমার দেহ, মন, আত্মা, ভালমন্দ সবটাকে জড়িয়ে যে তুমি সেই তুমিই যে আমার বন্ধু! তোমার মধ্যে যদি কিছু মহিমা থাকে সেও তোমার অংশ, আর যদি কিছু ক্ষুদ্রতা থাকে তাও ত তোমা ছাড়া নয়। ঈশ্বর আমাদেব সবচেয়ে বড় বন্ধু তিনি তো আমাদের শত ভ্রান্তির জন্য আমাদের ঘৃণা করে ছেড়ে যান না। না, কিছু বলো না,— আমার উপর কোন অবিচার করে থাকে:— সে চুকে গেছে আমি তার কৈফিয়ৎ চাইনে।” মনীশ থামিল তাহার অন্তরের গোপন সমাচার হৃদয়ভাবের বিপুলবিভবে পরিপূর্ণ হইয়া মধুব মূর্চ্ছনার মত তাহার বন্ধুর বিহ্বল মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দুজনের কেহই কয় মুহূর্ত্ত একটি কথা কহিতে পারিল না, মনীশ সুখতন্ময়ভাবে কেবল চাহিয়া রহিল, আর শচীকান্ত মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গেল।

ঠাণ্ডা বাতাসে জলসেকআর্দ্র মাটির গন্ধের সহিত মনীশের স্বহস্তরোপিত হাসনাহানার সুবাস বন্দী করিয়া গৃহ অতিথির অর্ঘ্যরূপে আনিয়া দিল, ক্ষণস্থায়ী চন্দ্রাংশটুকু মসীবর্ণ আকাশের বিশাল উদর গহ্বরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, স্বপ্নোত্থিতবৎ সচকিত শচীকান্ত মাথা তুলিয়া মনীশের মুখের দিকে চাহিল “কিন্তু তুমি আমার পাপের কথা শুনলে ভাল করতে, এখনও উপায়—”

মনীশ সবটা শেষ হইতে দিল না, সে কহিয়া উঠিল “তুমি বাড়াবাড়ি করলে ওই কথা ভিন্ন আর কোন কথাই কইবে না, দাঁড়াও আমি খুড়িমাকে ডেকে আনচি আজ তোমার এখানে খেয়ে যেতে হবে, পুকুরের মাছ ধরা হয়েছে।” মনীশ দ্রুতপদে পাশের একটা দ্বার খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। বন্ধুকে সে আবার নিজের কাছে ফিরিয়া পাইয়াছে আর তো তাহার মনে এতটুকু ক্ষোভ নাই, মিথ্যা এই ক্লেশকর প্রসঙ্গ চলিতে দিয়া সে প্রেমাস্পদকে পীড়ানুভব করিতে দিবে কেন? ছাত্রাবাস প্রত্যাগত আত্মীয় মিলিত স্কুলের ছাত্রের মত তাহার বালসরল চিত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল।

ফিরিয়া সে বন্ধুকে সেখানে দেখিতে পাইল না, ভাবিল বাহিরে গিয়াছে, কই বাহিরেও তো কেহ নাই! অদূরে কামিনী গাছের শাখাপত্র বায়ুভরে স্বন্স্বনিয়া উঠিল, সে ভাবিল হয়ত সে তাহার সহিত কৌতুক করিতে উহারই মধ্যে গোপন হইয়া আছে। নিকটে গিয়া ডাকিল “হয়েচে হে হয়েছে অন্ধকারে এখানে কেন?” কই, কাহার প্রতি এ আহ্বান! কেহ কোথাও নাই। বিস্ময়বেদনায় বিমূঢ় মনীশ তখনও সেই নৈশ অন্ধকারের তলে প্রতীক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল, প্রতিক্ষণে পত্রমর্ম্মরে, বায়ুর শব্দে সে সচকিত উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, বুঝি কোন গোপনস্থল হইতে তাহার বন্ধু বাহির হইয়া আসিবে!

আততায়ী যেমন অন্ধকারে নিজের শিকারের বুকে ছুরি মারিয়া আতঙ্কস্পন্দিত পদে ঘরে ফেরে তেমনই করিয়া শচীকান্ত নির্জ্জন পথ অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পল্লীগ্রামে অনেক ঘরের দ্বার সন্ধ্যাতেই রুদ্ধ হইয়া যায়, সেই সব রুদ্ধদ্বার অন্ধকার গৃহের কোন একটার মধ্য হইতে কচিছেলের কান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে "আয়রে যাদু আয়" ইত্যাদি ছেলে ভুলানি ছড়ার অংশতর শোনা যাইতেছিল। কোথাও দুই এক্কে দুই, দুই দুগুণে চার" প্রভৃতি পাঠশালার নামতা পাঠের বিপুল কলরব শ্রুত হইতেছে, কোন স্থান হইতে আবার মহা কোলাহলে কোন্দলের তীক্ষ্ণ শর বর্ষিত হইতেছিল।

চলন্ত দুইখানা ট্রেনে যেমন সংঘর্ষ হইয়া পড়ে তেমনিই অনেক সময় রাস্তায় চলিতে চলিতে মানুষে মানুষেও সংঘর্ষ বাধে। উভয় স্থলেই উভয়ের পরিচালক এ দোষের জন্য দায়ী। মন যখন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায় মর্ত্ত্যলোকের কথা তখন মনেই থাকে না। বিশেষ দুইখানা আত্মবিস্মৃত গাড়ির চালক যদি এক পথে বাহির হয় তাহা হইলে তো কথাই নাই। প্রবলবেগে শচীকান্ত এইরূপ অন্যমনা একজন পথিকের উপর পতিত হইয়া ক্রুদ্ধ উত্তেজনার সহিত কহিয়া উঠিল "কেরে, কানা নাকি!"

দোষী দুজনেই সমান, অপর ব্যক্তিও এই গালি ফিরাইয়া দিতে পারিত কিন্তু সে তাহা করিল না, আপনাকে পতনবেগ হইতে কোনমতে বাঁচাইয়া সস্মিতভাবে উত্তর করিল "কানা হবার সময় হয়ে এলো বটে কিন্তু বাপু তুমি তো বৃদ্ধ নও বলেই মনে হচ্চে, যা হোক তোমার লাগে নি তো?" "কে শিবুদাদা না?"

"শচীকান্ত কি?" আজ্ঞে হ্যাঁ, মাপ কর্ব্বেন। দাদা আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, এত অন্ধকারে কেন বেড়ান, যদি বেশি ধাক্কাটা লাগতো!"

শিবনারায়ণ কহিলেন "নাহে মনটা বড়ই উৎকণ্ঠিত রয়েছে কি না, যা হোক আছতো ভাল?"

"হ্যাঁ ভালই, মন ভাল নেই কেন বললেন?" "নানান্ ঝঞ্ঝট সংসারে, বলো কেন? ইচ্ছা করে ছেলেদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে তোমার বাবার চরণতলে আশ্রয় নিই, আমাদের ওখানে গিয়েছিলে? মণীশের সঙ্গে দেখা হলো? কেমন দেখলে তাকে?" শচীকান্ত মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল "ভালই তো দেখলাম কেন একথা বলচেন?"

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন না, তিনি যেন কি ভাবিতেছিলেন।" আমায় কিছু বলবেন কি?"

"তোমায়! কই না, কেন বলো দেখি?"

"কে জানে মনে হলো যেন কি বলবেন, কিছু বলবার দরকার নেই তো?—আচ্ছা তা হলে প্রণাম, বড় শীত, আসি তা হলে।"

শচীকান্ত সবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তরল অন্ধকারে ত্বরিতে অদৃশ্য সেই নিশাচরবৎ অকস্মাৎ দৃষ্ট অদৃশ্য মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বিষণ্ণ চিত্তে মস্তক আন্দোলন করিয়া আত্মগত কহিলেন "মদ ধরেচে নাকি? কি পরিতাপ! দেবতার সন্তান ভূত হইল!"

চিত্রশরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপ্‌নি-খোলা কম্‌লা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রোয়ার মত,—
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশ্‌মিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়ল মসী সোনায় লেখা লিপির 'পরে!

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশাস ফেল্‌লে কেয়া!
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আস্‌ছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্‌ল কি হায় আজকে অকাল-বোধন-দিনে।

হাওয়ার তালে বৃষ্টি ধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মাদল বাজে,
শাল ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে!

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্‌পনা সে যাচ্ছে এঁকে!

ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্ ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সাম্‌নে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠ্‌ল জেগে আলোর মেলা।

কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে আলো আবার চোখ্ চেয়েছে!
মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ রাণী পান খেয়েছে!
মেশামেশি কান্নাহাসি মরম তাহার বুঝ্‌বে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ্ হাস্‌তে থাকে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিক্রমোর্ব্বশী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা জানি না, কালিদাসের শেষ নাটকটি সর্ব্বসাধারণের নিকট কিরূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছিল; নাটকের দোষগুলি অপেক্ষা, নাট্যদৃশ্যোপযোগী গুণগুলির প্রতিই সকলের বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সাহিত্যিক গুণের জন্য বিক্রমোর্ব্বশী যে স্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, বিভিন্ন পাঠান্তরের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত রুচি অনু-সারে, এবং বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-অনুসারে, পণ্ডিতেরা কালিদাসের দুইটি বড় নাটকের উপর একটু কলম চালাইয়াছিলেন। শকুন্তলার চারিটি পাঠান্তর ও বিক্রমোর্ব্বশীর দুইটি পাঠান্তর এখনও বিদ্যমান আছে। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর হস্তলিপির মধ্যে সুস্পষ্ট অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কাশ্মীরদেশীয় শকুন্তলার পুঁথিতে, অন্যান্য পুঁথি অপেক্ষা একটা দৃশ্য অধিক দেওয়া হইয়াছে। (ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশক); দেবনাগরী পুঁথিতে ১৯৪টি শ্লোক আছে; বাঙ্গালা পুঁথিতে ২২১টি শ্লোক আছে। রাজা ও শকুন্তলার মধ্যে যেখানে প্রেমের ব্যাপার আছে সেই তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যটি, দেবনাগরী গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, অথবা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে M. Pischel একটু রূঢ়ভাবে এইরূপ বলিয়াছেন:—"Monier Williams-এর ন্যায় কোন "শুচিবাই"গ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে অশ্লীল কল্পনার আভাস আছে বলিয়া সমস্ত দৃশ্যটাই উঠাইয়া দিয়াছেন।" দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থেই দ্রাবিড়ীয় পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থের সহিত এই দ্রাবিড়ীয় গ্রন্থের অনেক প্রভেদ।

অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত চতুর্থ অঙ্কের গীতগুলি, এবং তৎসহ সংগীতের পারিভাষিক বচনগুলি, উহা হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি, এই সকল পাঠান্তর হইতে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডার উৎপত্তি হই-য়াছে:—যাহার যোগ্যতা প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত সেই M. Pischel, Weber-এর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও—বিবিধ পাঠান্তরের সমালোচনায়, প্রাকৃতের সংশোধনকল্পে, বররুচির প্রদত্ত ব্যাকরণের নিয়মগুলিকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কালিদাসের মহাকাব্যগুলি হইতে, শুধু যে আমরা তাঁহার কবিত্বের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নূতন প্রমাণ প্রাপ্ত হই তাহা নহে,—তাঁহার যুগের নাট্যকলার অবস্থা সম্বন্ধেও আমরা অনেকটা জ্ঞানলাভ করি। একটি মহাকাব্যে তিনি যে শুধু তাঁহার বিচিত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে,—অন্যান্য শিল্পকলার ন্যায় নাট্যকলাতেও তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। একটি শ্লোকের মধ্যে নাট্য-কলার বিবিধ পারিভাষিক সংজ্ঞা একত্রিত করিলে তাহা হইতে যে 'রচনা-রীতির সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় তাহাকে শাস্ত্রীয়

আঙুরের ক্ষেতে

ভাষায় 'ভরতসমুচ্চয়' বলে। কুমারসম্ভব হইতে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। বিবাহ-অনুষ্ঠানের পর, শিব পার্ব্বতী দেবতাদিগের অনুষ্ঠিত উৎসবে উপস্থিত হইলেন। "সরস্বতী স্বকীয় বাক্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দম্পতির গুণকীর্ত্তন করিলেন: পতির গুণকীর্ত্তন সংস্কৃত ভাষায় ও পত্নীর গুণকীর্ত্তন সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষায় করিলেন। এই দম্পতি কিয়ৎকালের জন্য এমন একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দর্শন করিলেন,—যাহাতে বিবিধ নাট্যরীতি নাট্যসন্ধিগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, যাহাতে বিচিত্র রসের অনুরূপ সঙ্গীত ছিল এবং যাহাতে অপ্সরাগণ শোভন ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছিল।" রঘুবংশে, রাজা অগ্নিবর্ম্মা তাঁহার প্রাসাদে নাট্যকলায় আসক্ত—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "এই নাট্যকলায়-সুশিক্ষিতা রমণীগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া তিনি, রসভাব, ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর সহযোগে নাটকাদির অভিনয় করিতেন এবং স্বকীয় বন্ধুগণের সমক্ষে, খ্যাতনামা নটদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতেন!" পরিশেষে অপ্সরা উর্ব্বশীর সেই নাট্যাভিনয় পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—যে অভিনয়ে উর্ব্বশী ভরত মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছিল। সেই নাটকের রচয়িত্রী—সরস্বতী, এবং সেই নাটকের নাম—"লক্ষ্মীস্বয়ম্বর"! দেবতাদিগের দূত, অপ্সরাগণকে এই বলিয়া আহ্বান করিলেন:—"ভরত মুনি তোমাদিগকে অষ্টরসাত্মক একটি নাটকের অভিনয় শিখাইয়াছেন; মরুৎপতিগণ, দিক্‌পালগণ, সেই সুললিত নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন।"

এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, কালিদাসের যুগে, এই সকল নাটকের প্রয়োগ দ্বারা, তৎকালে অনুষ্ঠিত মহোৎসবাদির মহিমাবর্দ্ধন করা হইত। বিশেষত, তাঁহার রচিত মহাকাব্যাদিতে তিনি যেরূপ নাট্যশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহার নাট্যরচনাগুলি কতটা নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুগত।

কালিদাসের সমসাময়িক আর এক নাট্যকারের নাম আমরা অবগত হই:—তিনি ভর্ত্তৃমেন্থ—মাতৃগুপ্তের আশ্রিত ব্যক্তি। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত মহাকাব্য "হয়গ্রীব-বধ" পাঠে পরিতুষ্ট হইয়া মাতৃগুপ্ত তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদান করেন। কহ্লন, রাজতরঙ্গিণীর এক স্থানে এই মহাকাব্যের উল্লেখে যাহা বলিয়াছেন, প্রথম-ব্যাখ্যাকারীগণ তাঁহার সেই বাক্যে প্রতারিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বাক্য নাটকের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে এইরূপ তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরে ঐ গ্রন্থের আবিষ্কৃত খণ্ডাংশ হইতে ঐ গ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। তথাপি ভর্ত্তৃমেন্থ নাট্যকারেরই শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কবি-রাজশেখর বাল-রামায়ণের প্রস্তাবনায় ভর্ত্তৃমেন্থকে তাঁহার সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন:— "পুরাকালে বাল্মীকির এক গায়ক পুত্র ছিল, সেই পুত্র পরে ভর্ত্তৃমেন্থ নামে এই ধরাধামে পুনরাবির্ভূত হয়; পরে আবার ভবভূতির নাম ধরিয়া এই পৃথিবীতে আগমন করে; আর, আজ সে-ই আবার রাজশেখর নাম ধারণ করিয়াছে।" রামায়ণের গ্রন্থকারের পরেই যে রাজশেখর ভর্ত্তৃমেন্থের নামোল্লেখ

করিয়াছেন এবং তাঁহাকে রাম কথামূলক নাট্য-রচয়িতাদিগের শীর্ষস্থানে বসাইয়াছেন, ইহা ভর্তৃমেন্থের রচিত গ্রন্থের দ্বারা কখনই সমর্থন করা যাইতে পারে না; কারণ, হয়গ্রীববধ-নাটকের সহিত রামোপাখ্যানের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে, রামের কীর্ত্তিকলাপসম্বন্ধে ভর্তৃমেন্থ পূর্ব্বে একখানি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। ভর্তৃমেন্থ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক; কেননা বিক্রমাদিত্যের প্রিয়পাত্র মাতৃগুপ্তের সহিত মেন্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থাদিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সুভাষিতাবলী"তে বিশ্বমাদিত্যের নামে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, "শারঙ্গধরপদ্ধতি" উহা ভর্তৃমেন্থের উপর আরোপ করেন। (বিশ্বমাদিত্য = বিক্রমাদিত্য)। আর একটা কৌতুকাবহ কথা আছে:—মৃচ্ছকটিকার একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক – যাহা "সুভাষিতাবলী"তে বিক্রমাদিত্যের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে— "শারঙ্গধরপদ্ধতির" মতে, উহা বিক্রমাদিত্য ও ভর্তৃমেন্থ—এই উভয় কবির সম্মিলিত রচনা। ভর্তৃমেন্থ যে একজন নাট্যকার ছিলেন— এই অনুমানটি সমর্থন করিবার পক্ষে আরও একটি হেতু আছে। তাঁহার আশ্রয়দাতা মাতৃগুপ্ত তাঁহার নাট্যরচনায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তিনি তাহার পর নাট্য-কলার নিয়মাদি নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিপথে

বাড়ীর দ্বিতলের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। ঘরের জানালা খোলা। অন্ধকার পথে দাঁড়াইয়া এক নারী সেই খোলা জানালার পানে চাহিয়াছিল। নিশুতি রাত্রি। পথে জন-মানবের চিহ্ন নাই। শুধু অদূরে থাকিয়া থাকিয়া একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছিল।

চারিধারে অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিতেছিল। কে যেন নেপথ্যে বসিয়া সারা বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে-পিঠে মোটা তুলি দিয়া লেপা কালিটুকুর উপর আরও নিবিড় করিয়া কালি লাগাইতেছিল। শুধু সেই বাড়ীর কাছে বড় তেঁতুল গাছটার ডাল-পালার উপর ঘরের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। মনে হইতেছিল, কে যেন এই আঁধার-কালো বিশ্বের ছোট একটি কোণে খানিকটা আবির ঢালিয়া দিয়াছে।

এক অব্যক্ত বেদনায় নারীর বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। পতঙ্গ যেমন আগুন দেখিয়া ছোটে, ঘরের ঐ অস্পষ্ট আলোটুকুর পানে নারীর সারা চিত্ত তেমনই আকুল আগ্রহে ছুটিতেছিল। প্রাণ পুড়িয়া যায় তবু এ ছোটা কিছুতে বোধ করা যায় না।

নারীর ছিন্ন মলিন বেশ, শুষ্ক কেশে জট ধরিয়াছে, মুখে-চোপে কালির দীর্ঘ রেখা!

ঐ আলো-করা ঘরখানি। আলোর

পানে চাহিয়া চাহিয়া নারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বুকটা তাহাতে কতক যেন হাল্কা বোধ হইল। নারী ভাবিল, হায় ঐ ঘর! অমনি আলো-করা ছোট ঘর,—সে ঘরে সে সর্ব্বময়ী ছিল। সে ঘরের মর্য্যাদা সে বুঝে নাই, তাই সে তাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে!

কিন্তু আদর-গৌরবে পরিপূর্ণ এমন ঘর কিসের প্রলোভনে সে ত্যাগ করিয়া আসিল! আলেয়ার আলোয় মজিয়া বিপথে পড়িয়া সর্ব্বস্ব সে আজ খোয়াইয়া বসিয়াছে! এখন আর তাহা ফিরিয়া পাইবার এতটুকু আশা নাই, সম্ভাবনা নাই! কঠিন উপেক্ষার বাণে সে আজ বিদ্ধ জর্জ্জরিত। মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! শুধু কি তাই? সারা জীবনের উপর দিয়া কি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ঝড়ের শেষে আশ্রয়-চ্যুতা পাখীর মতই সে আজ নীড়-হারা! এত বড় পৃথিবী—তবু তাহার দাঁড়াইবার জন্য কোথাও আজ তিলমাত্র স্থান নাই।

অতীতের কথা বিরজার মনে পড়িল। এমনই আলো-করা ঘরে বিবাহের পর তাহার ফুলশয্যা হইয়াছিল। আজ কি দিলে সেই অতীত দিন, অতীত মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসে! মদের নেশার মতই অতীত স্মৃতির নেশায় তাহার মাথাটা রিম্-ঝিম্ রিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, সে দিন ফিরিবার নয়—কখনও কাহারও ভাগ্যে ফিরে নাই! তাহারও ভাগ্যে ফিরিবে না!

সেই ঘরের পানে চাহিয়াই বিরজার সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার যেন সংজ্ঞা ছিল না। ভোরের পাখী গাহিয়া উঠিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। দিনের আলো দেখিয়া কি-এক দারুণ ভয়ে তাহার বুকটা দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেখানে তাহার আর দাঁড়াইয়া থাকিবারও সাহস হইল না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—কে তুই? এখানে কেন? যদি তাড়াইয়া দেয়! ধীরে ধীরে সে দূরে সরিয়া গেল; কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিল না। মন্ত্র-স্পৃষ্ট সর্পের মতই সে সেই গৃহের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল।

ক্রমে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। তিনটি ছেলে গৃহ হইতে পথে বাহির হইল। পশ্চাতে ভৃত্যের হাতে বইয়ের গোছা। ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে—বিরজা ছেলেদের পশ্চাতে চলিল। তিনটি ছেলে! উহার মধ্যে যেটি বড়, তাহার মুখখানি—হাঁ, ঠিক, কোন ভুল নাই! ও মুখে সেই মুখখানিই যেন কে বসাইয়া রাখিয়াছে! এই মুখের ছায়া স্বপ্নে সে কতবার দেখিয়াছে—অস্পষ্ট ছায়া দেখাইয়া স্বপ্ন মিলাইয়া গিয়াছে! ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয় নাই!

বিরজার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ছেলেটিকে একবার সে বুকে তুলিয়া লয়, বুকে চাপিয়া ধরে—কোমল মুখখানি স্নেহের অমৃত-ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলে। তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরের পাষাণ স্তূপ ভেদ করিয়া আজ যেন সহসা স্নেহের নির্ঝর উথলিয়া উঠিয়াছে। সে বিমল স্নিগ্ধ ধারায় বিরজার প্রাণ জুড়াইয়া বাঁচিল।

২

ছেলেরা স্কুলে গেল; বিরজা ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। যদি আর একবার দেখা মিলে। ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া সাড়ে দশটার

ঘণ্টা বাজিয়া গেল। স্কুল বসিল। সমস্ত স্কুল-গৃহের বুক চিরিয়া একটা সুমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল—কর্ম্ম-রত মধুকরের গুঞ্জনের মতই তাহা জীবন্ত, সঙ্গীতময়! ছেলেরা পড়া করিতেছে, পড়া বলিতেছে। বিরজা উন্মাদের মত স্কুলের সম্মুখস্থ পথটায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা, বারোটা বাজিয়া বাজিয়া দেড়টার সময় টিফিনের ছুটি হইল। ছেলের দল উল্লাসে মাতিয়া স্কুলের বহিঃ-প্রাঙ্গণে ছুটিয়া বাহির হইল। যেন খাঁচা হইতে পাখীর দল কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তেমনই তাহাদের হর্ষোল্লাস। মার্ব্বেল, কপাটি ও লুকাচুরি খেলার ধূম বাধিয়া গেল। এত ছেলে—কিন্তু সেটি কৈ? কোথায় সে! সে কি খেলিতে আসিবে না? তাহাকে দেখিবার জন্য বিরজার প্রাণ যে তৃষিত হইয়া রহিয়াছে!

ঐ না? ছুটিয়া-ছুটিয়া একবার বাহিরে আসিতেছে, আবার ছুটিয়া ভিতরে পলাইতেছে—পিছনে ছেলের দলও ছুটিয়া চলিয়াছে। সকলে লুকাচুরি খেলিতেছে। ঐ আবার বাহিরে আসিয়াছে। ও কি? দুইটা ছেলে উহাকে ধরিয়া উহার মাথায় চড় মারিতেছে—ছেলে মাথা গুঁজিয়া হাসিয়া সে মার খাইতেছে! ওরে দস্যু, ওরে কঠিন, দে, দে, ছাড়িয়া দে, আহা,—কেন মারিতেছিস! তোদের ও খেলার প্রহারে এখানে বিরজার বুকে যে মুগুরের ঘা পড়িতেছে। ওরে দেখ্, দেখ্, বাছার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা বাড়ীর পথে ফিরিল; বিরজাও পিছনে চলিল! এ কি আকর্ষণ! এ আকর্ষণের প্রভাব এত দিন বিরজা কেন বুঝে নাই! ছেলে! সে যে কি রত্ন, বিরজা তাহা পূর্ব্বে বুঝে নাই,—আজ বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে বলিয়াই এটিকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখিবার জন্য আজ তাহার এমন আকুলতা, এতখানি অধীর আগ্রহ!

এমনই ভাবে ছেলের পিছনে, বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বিরজার দুই দিন দুই রাত্রি যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সকালে পথে দাঁড়াইয়া বিরজা জানালার ফাঁক দিয়া নীচেকার ঘরের মধ্যে আপনার ক্ষুব্ধ নয়নের আকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বসিয়া পড়িতেছে—আব্দার ধরিতেছে, দুষ্টামি করিতেছে,—বিরজা তাহাই দেখিতেছিল! হায়, এমন স্বর্গ, এমন সুখ, এ ত তাহারও অনায়াস-লব্ধ ছিল, নিজের দোষে ধূলার মতই সে তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আজ শত চেষ্টায় সহস্র সাধনায় এ স্বর্গের একটি কোণেও আর তাহার দাঁড়াইবার অধিকার নাই!

হঠাৎ একটা কঠিন কণ্ঠ-স্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল, "—কে?" বিরজা চোখ ফিরাইয়া দেখে, গৃহ-দ্বারে ও,—কে ও! ভয়ার্ত্ত শিশুর মত সে দূরে পলাইয়া গেল—সেখানে দাঁড়াইয়া সে মুখের পানে একবার ফিরিয়া চাহিবারও তাহার সামর্থ্য হইল না।

তবুও এ বাড়ীর মায়া, দেখিবার বাসনা কিছুতেই মিটিবার নয়। দৈত্যের মায়া-পুরীর মতই এই বাড়ীখানা বিরজার পায়ে এক দুশ্ছেদ্য নিগড় আঁটিয়া দিয়াছিল। এক-

একবার দারুণ ক্ষোভে যখন দূরে পলাইবার বাসনা হয়, দূরে পলাইবার চেষ্টাও সে করে, তখন এই বাড়ীখানাই আবার সেই অদৃশ্য সুদৃঢ় নিগড় ধরিয়া টানিয়া বিরজাকে ফিরাইয়া আনে! বিরজা কাঁদিয়া ফেলিল—সে কি পাগল হইবে!

কিন্তু পাগল হইলে সে আজ বাঁচিয়া যায়! অতীত স্মৃতিগুলা সর্পের মত ফণা তুলিয়া তাহার অন্তরে অহরহ দংশন করিতেছে, তীব্র বিষ ঢালিয়া দিতেছে! সে জ্বালা যে আর সহে না! সহিবার শক্তি নাই! ধৈর্য্যও নাই!

৩

পরদিন বাটীর দাসী গিয়াছিল, দোকানে খাবার আনিতে। বিরজা আসিয়া তাহার শরণ লইল। মিষ্ট কথায় তাহার মন ভুলাইয়া সে খবর পাইল, বাবুর দুই সংসার। একটি পুত্র রাখিয়া প্রথমা না-কি মারা গিয়াছে—পাঁচ জনের অনুরোধে বাবু দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। ইহার দুই পুত্র, এক কন্যা। স্ত্রীটিও বড় ভালো। সতীন-পোর উপর যেমন টান, তেমনি ভালোবাসা! ব্যবহার দেখিলে কে বলিবে, সতীন-পো! ভালো জামা, ভালো কাপড়, সবই তাহার। নিজের ছেলেরা আব্দার ধরিলে মা উত্তর দেয়, "ও পাবে না ত কে পাবে রে? ও যে বড়, তোরা ছোট!" আর ছেলেও তেমনই মা-বলিতে অজ্ঞান! এমন একগুঁয়ে ছেলে, পৃথিবীতে যদি সে কাহাকেও মানে, কিন্তু মার কাছে একেবারে জড়-সড়! বাবুও সুশীল-অন্ত প্রাণ! দাসী আরও বলিল, এ সব কথা পাড়ার লোকের মুখেই সে শুনিয়াছে। বাড়ীতে 'সতীন-পো' কথাটি কি কাহারো উচ্চারণ করিবার জো আছে! তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। বৌঠাকরুণের ত অমন মায়ার শরীর, তখন কোথায় থাকে, সে মায়া!

বিরজা মন দিয়া একটি-একটি করিয়া সব কথা শুনিল; শুনিয়া শুধু একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দাসী বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল, কহিল, "ওমা,—তোমার চোখে জল দেখচি যে।" বিরজা আর-একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, চোখে কি-একটা পড়ল!" বলিয়াই সে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল। দাসী গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দোকানী কহিল, "ও একটা পাগলী। আজ ক'দিন থেকে এই পাড়ার মধ্যে ওকে ঘুরতে দেখছি!"

অপরাহ্নে স্কুলের ছুটির পর সুশীল বাড়ী ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল, ছোট ভাই দুইটি ও কয়েকজন সঙ্গী। বিরজা অদূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। সুশীল এ কয়দিন এটুকু লক্ষ্য করিয়াছে যে, এক উন্মাদিনী নারী তাহাদের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়—বাড়ীর ধারেও সর্ব্বদা তাহাকে দেখা যায়! ইহার জন্য প্রাণে সে কেমন একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। রাগও যে হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহাকে তাড়াইতেও সাহস হয় না! কি জানি, পাগলী, চট্ করিয়া হাতটাই যদি ধরিয়া ফেলে! গালি দেয়! হাত ধরিয়া ফেলিলে পরিষ্কার জামাটা ত নষ্ট হইয়া যাইবে, তার উপর পথের মধ্যে লোকের কাছেও বিষম অপদস্থ হইতে হইবে! সে ভারী লজ্জার কথা।

আজ এই এতগুলা সঙ্গী নিকটে থাকিতে তাহার সাহসের অভাব হইল না। পথ চলিবার সময় বিরজার পানে অলক্ষ্যে সে চাহিতে ভুলে নাই। তবু এ কি আপদ! পাগলীটা যে কিছুতেই সঙ্গ-ছাড়া হয় না! আবার নজর তাহার সুশীলের পানেই! জ্বালাতন! সুশীল একজন সঙ্গীর কানে কানে কহিল, "দেখ্ ভাই, একটা পাগ্‌লী!" কথাটা বিরজার শ্রুতি এড়াইল না। সঙ্গী বালক কহিল, "হ্যাঁ ত রে! ঢিল মারব?" সুশীল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, ঢিল মারে না—তার চেয়ে এক মজা করি, দেখ্।" সঙ্গী কহিল, "কি মজা?"

সুশীল পকেট হইতে লজেঞ্জেস বাহির করিয়া মুখে পুরিল; খানিকক্ষণ সেটা চুষিয়া বিরজার পানে ছুড়িয়া কহিল, "এই নে, পাগ্‌লী, লবঞ্চুস্ খা"—সঙ্গীর দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লজেঞ্জেসটা বিরজার গায়ে লাগিয়া পথে পড়িল। তাহার মনে হইল, আকাশের বাজ বুকে প'ড়লেও বুঝি তাহার এমন বাজিত না। এই ছেলে—যাহাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য বিরজা পাগলের মত ছটফট করিতেছে,—সে এমন বিদ্রূপ করিল? কৈ, পাষাণ বুক তথাপি ভাঙ্গিল না ত! বিরজার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। কিন্তু উপায় নাই! এ বিষ ত তাহারই মন্থন-করা! যে পাপ সে করিয়াছে—এ তাহারই কর্ম্মফল! উচিত শাস্তি! চোখের জল সামলাইয়া সে সেই লজেঞ্জেসটুকু কুড়াইয়া লইল—সেটুকু বুকে চাপিয়া, তাহাতে চুমা দিয়া অন্তরে প্রথম সে আজ যে শান্তি অনুভব করিল, তাহা অপূর্ব্ব! মাণিকের টুকরার মতই সযত্নে সে সেই লজেঞ্জেসটুকু আপনার অঞ্চলে বাঁধিল।

৪

পরদিন—সুশীল তখন স্কুলে গিয়াছে, অভয় গৃহে নাই, বিরজা সাহসে ভর করিয়া অন্দরে ঢুকিল। ভৃত্য তাড়া দিয়া উঠিল,—সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না; একেবারে ছুটিয়া দ্বিতলের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণাল তখন শিশু কন্যার দুধের বাটি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিল। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক অপরিচিতা জীর্ণ-মলিন-বেশা শীর্ণা নারীকে একেবারে উপরে দাড়াইতে দেখিয়া প্রথমটা সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু বিরজার মুখে বিষাদের নিবিড় ছায়া, দুই চোখের কোণে সুগভীর কালির রেখা টানা দেখিয়া তাহার ভয় না হইয়া মায়া হইল। মিষ্ট স্বরে সে কহিল, "তুমি কে গা?"

বিরজার মুখে চট্ করিয়া কোন কথা যোগাইল না! মনের মধ্যে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। এমন ঘর, এমন বারান্দা,—এমন সব—তাহার কিসের অভাব ছিল? আজ ভিখারীর বেশে সে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এখানকার কিছুতে তাহার কোন অধিকার নাই—এখানে আসিয়া দাঁড়াইতে গেলেও পরিচয় দিতে হয়!

মৃণাল কহিল, "তুমি কি চাও,—বল না!"

কি চাই! বিরজার মনে হইল, সে বলে, ওগো কিছু নয়, কিছু চাই না—শুধু তোমার বাড়ীর কোণে এতটুকু স্থান দাও! তোমাদের উচ্ছিষ্ট উঠাইব, বাসন মাজিব,

তোমাদের পদ-সেবা করিব, দিনান্তে একটিবার শুধু তোমাদের ঐ ছেলেটিকে কোলে লইতে দিয়ো। কিন্তু না, সে কথা বলা চলে না—ভালো দেখায় না! এ যে পাগলের কথা! সে ত পাগল নয়! তাহার মুখে কোন কথাই ফুটিল না।

মৃণালের মনে হইল, বুঝি সে ভড়কাইয়া গিয়াছে। তাই আবার কহিল, "ভয় কি, বল—কি চাও! কিছু খাবে?"

বিরজা ভাবিল, এত গুণ না থাকিলে আর আজ এমন গৃহে লক্ষ্মী তুমি! বিরজা কহিল, "আমি—আমি—"

মৃণাল কহিল, "হ্যাঁ, কিছু খাবে কি?"

"না, না, খাওয়া নয়, খাওয়া নয়—বল, আমার কথা রাখবে?" বলিয়াই সে মৃণালের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। দুধের বাটি রাখিয়া মৃণাল সস্নেহে তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল, কহিল, "ছি, পায়ে হাত দিতে নেই। ওঠ,—কি চাও, বল। যদি রাখবার হয়, কেন তোমার কথা রাখব না?"

বিরজার চোখে জল দেখা দিল। সে কহিল, "আমি বড় অভাগিনী, বোন্। রাজার মত স্বামী, চাঁদের মত ছেলে, অগাধ ঐশ্বর্য্য, আমার সব ছিল,—কিন্তু আজ কিছু নেই—পোড়াকপালী আমি সে সব খুইয়েছি—"

করুণ সমবেদনায় মৃণালের অন্তর ভরিয়া উঠিল, মন ভিজিয়া গেল। একখানা মাদুর বিছাইয়া সে কহিল, "বসো ভাই—বসে বসে বল—"

বিরজা বসিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল, "তোমার ঐ ছেলে,—বড়টি—তারই মত ছেলে! একেবারে তারই মত! তাই—তাই—"

মৃণাল কহিল, "তাই—কি, বল।"

বিরজা কহিল, "ওকে ক'দিন দেখে অবধি কোথাও আর আমি নড়তে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন আগুন জ্বলছে—এ যে কি জ্বালা, বোন, তা কি বলব!"

মৃণালের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—মধ্যাহ্নের প্রখর আলো তাহার যেন ঝাপসা বোধ হইল। মুখ হইতে অস্ফুট করুণ স্বর ফুটিল, "আহা!"

বিরজা কহিল, "তবু যাব,—আমায় যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে একবার বড় সাধ হচ্ছে, তোমার ঐ ছেলেটিকে বুকে তুলে নি—বুকে চেপে ধরি—ও চাঁদ মুখে দুটি চুমু খাই! তা'হলে এ জ্বালাও জুড়োয়—কতক জুড়োয়!"

মৃণাল কহিল, "তার আর কি! তবে এখন ত ছেলে বাড়ী নেই, স্কুলে গেছে। সে ফিরুক্। তুমি বিকেলে এসো।"

বিরজা কহিল, "কিন্তু তোমার স্বামী যদি আমায় দেখলে বকেন্? বাড়ী ঢুকতে না দেন?"

মৃণাল কহিল, "তাঁকে আমি কিছু বলবো না—তুমি এসো—"

কৃতজ্ঞতায় বিরজার প্রাণ পূর্ণ হইল। চোখের জল মুছিয়া আবার সে মৃণালের পায়ে হাত দিল। মৃণাল শশব্যস্তে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, "ও কি—ছি, ছি, আবার কেন পায়ে হাত দিচ্ছ, ভাই?"

"তাতে কিছু দোষ নেই, দিদি। তুমি সতীলক্ষ্মী, দেবতা! বেশী আর কি বলবো,

দিদি,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি চিরসুখী হও!”

৫

সুশীলের সেদিন স্কুল হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইল। যে ভৃত্য আনিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া সংবাদ দিল, ছুটির পর স্কুলে ম্যাজিক হইবে। মাষ্টারবাবু বলিয়া দিলেন—খোকাবাবুরা তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গেই গৃহে ফিরিবে।

যথাসময়ে বিরজা আসিয়া মৃণালকে কহিল, “কৈ দিদি, ছেলে ত ফেরেনি এখনো—আমি স্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম,—বেরুতে দেখলুম না ত!”

মৃণাল তখন ম্যাজিকের কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বিরজা বলিল, “তা হলে আমি আবার আসব’খন! এখন যাই।”

মৃণাল কহিল, “কেন, বস না। ওপরে আমার ঘরে ততক্ষণ বসবে চল!”

বিরজা জিব কাটিয়া বলিল, “তোমার ঘরে কি আমি ঢুকতে পারি—দিদি? ও যে লক্ষ্মীর ঘর—আমার বাতাস ও ঘরে লাগা ঠিক নয়!”

মৃণালের অজ্ঞাতে তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর মথিত করিয়া ছোট একটি দীর্ঘ নিশ্বাস সন্ধ্যার বাতাসে মিলাইয়া গেল। মৃণাল ভাবিল, আহা উন্মাদিনী, অভাগিনী!

মস্ মস্ করিয়া অভয় আসিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মৃণালের ডাক পড়িল। মৃণাল স্বামীর কাছে গেল। স্বামী বলিল, “ও কার সঙ্গে অন্ধকারে বসে কথা কচ্ছিলে?”

“আহা, ও একটি মেয়েমানুষ—ছেলের শোকে স্বামীর শোকে মাথা ওর কেমন হয়ে গেছে!”

“তা এখানে কেন? কিছু চায় ত দিয়ে বিদেয় করে দাও না—”

“ও একবার শুধু সুশীলকে দেখতে চায়। আহা, ওর যে ছেলেটি ছিল, সেটি না কি আমাদের সুশীলেরই মত দেখতে!”

অভয়ের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল, “না, না, ও সব আব্দার শোনে না! কোথাকার কে মাগী—”অভয়ের স্বর শেষের দিকটায় চড়িয়া উঠিল। মৃণাল বাধা দিয়া কহিল, “আহা, অমন কথা বলো না গো,—আজই না হয় ও এমন হয়েছে, তবু ওর মায়ের প্রাণ ত বটে!”

মৃণাল কোন কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিরজা নাই, চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া মৃণাল পূজায় বসিতে যাইবে, এমন সময় মৃদু ভীত কণ্ঠে কে ডাকিল, “দিদি—” মৃণাল মুখ তুলিয়া দেখে, সেই উন্মাদিনী।

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল, কহিল, “তুমি এই ঘরে এস ভাই,—আমি সুশীলকে ডাকিয়ে পাঠাচ্চি।”

সুশীল তখন বাহিরে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত গত রাত্রির ম্যাজিক লইয়া বিষম তর্ক তুলিয়াছিল এবং ম্যাজিক শেখাটা যে ভূগোল মুখস্থ করার চেয়ে অনেকখানি প্রয়োজনীয়, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে কিছুতেই ম্যাজিকের অসারতা বুঝাইতে পারিতেছেন না, এমন সময় দাসী আসিয়া

সংবাদ দিল, মা ডাকিতেছেন। তর্কটা সেইখানেই মুলতুবি রাখিয়া সুশীল এক লম্ফে উঠিয়া মাতৃ-সন্নিধানে ছুটিল; কহিল, "কি মা ? ডাকছ ?"

মৃণাল কহিল, "হ্যাঁ, একবার এ ঘরে এস ত বাবা—"

সুশীল ঘরে ঢুকিয়াই সেই উন্মাদিনীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! এই রে, মাগী বুঝি মার কাছে সেদিনকার লজেঞ্জেস ছোঁড়ার কথা বলিয়া দিয়াছে! বটে! আচ্ছা, পাগলীকে পরে মজা দেখাইব একবার।

বিরজার উপর একেই তাহার রাগ ছিল, আজ আবার মার কাছে তাহাকে দেখিয়া সে রাগ বাড়িয়া গেল। বক্র কটাক্ষে তাহার পানে একবার চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা—? ডাকছিলে কেন? শীগ্‌গির বল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমার খুব ইয়ে চলেছে। দেখ মা, মাষ্টার মশাই বলে, ও ম্যাজিক-ট্যাজিক ও সব কিস্যু নয়! আচ্ছা মা, মাষ্টার মশাই ত এত জানেন, কত লেখাপড়া শিখেছেন,—কৈ, কওয়ান দেখি, —কাটা মুণ্ডুকে কথা কওয়ান দেখি, কাটা পায়রাকে জ্যান্ত করে দিন, দেখি। হ্যাঁ, তা আর পারতে হয় না!"

বিরজা স্থির দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া রহিল—আহা, এমন ছেলে! যেমন রূপ, তেমনই বুদ্ধি! তাহার মনে হইল, ছেলেকে ডাকিয়া সে বলে, ওরে বাছা আমার, যদি আমার, কাহাকে তুই মা বলিয়া ডাকিতেছিস্? কে তোর মা—? ও নয় রে, ও নয়! আমি যে তোর ঐ তপ্ত স্পর্শটুকু পাইবার জন্য কাতর তৃষিত প্রাণে এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, আমায় একবার মা বলিয়া ডাক্! ওরে আমি, আমি, আমিই তোর মা!

মৃণাল কহিল, "শোন একবার ছেলের পাগলামির কথা!—হ্যাঁ, ডেকেছি কেন, শোন্! ইনি একবার তোকে দেখতে চান—"

"কে, এই পাগলীটা—যাওঃ—এই বুঝি? আমি বলি, কি!" সুশীল চলিয়া যায় দেখিয়া বিরজা ছুটিয়া তাহাকে ধরিল,—ধরিয়া একেবারে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া তাহাকে বুকে চাপিল, ছোট মুখখানি অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিল।

সুশীল রাগে আগুন হইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে, পাগলী কোথাকার। আমি বাবাকে বলে দোব। এ্যাঁ, ছাড়্ বলচি আমাকে!"

অভয় নীচে নামিতেছিল। সুশীলের চীৎকার শুনিয়া পূজা-গৃহের সম্মুখে আসিল। বিরজা বাহিরে যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। মৃণালও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। সুশীল বিরজার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইতেছিল।

অভয় আসিয়া কহিল, "কি! হয়েছে কি? সুশীল অত চেঁচাচ্ছিল কেন?"

অভিমানের সুরে সুশীল কহিল, "দেখ না বাবা, ঐ পাগলীটা আমায় জাপটে ধরেছিল—মা ওকে কিছু বললে না—"

"কে পাগলী?" বিরজা কি ভাবিয়া মুখ তুলিল—অভয়ের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল। নিমেষের জন্য! তখনই বিরজা

চোখ নামাইল। অভয়ও দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া আসিল। বিরজা অমনি ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অভয় মৃণালকে কহিল, "ওকে এখানে ঢুকতে দিয়েছিলে, কেন?"

মৃণাল ব্যথিত স্বরে কহিল, "আহা, বেচারী বড় দুঃখ পেয়েছে!"

"দুঃখ পেয়েছে! তুমি তা হলে ওকে চিনতে পার নি!"

মৃণাল যেন আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, "কেন, কে ও?"

"দেখবে, এস—" বলিয়া অভয় আপনার শয়ন-কক্ষে গেল; মৃণালও তাহার অনুসরণ করিল।

আর্শির টেবিলের টানা খুলিয়া অভয় একখানা কাগজে-মোড়া ফটোগ্রাফ বাহির করিল। সে এক কিশোরীর প্রতিকৃতি। ছবিটা অনেকখানি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবু একটা সুশ্রী মুখের ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়! ফটোখানা মৃণালের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া অভয় কহিল, "এই দেখ—"

মৃণাল দেখিল, দেখিয়া কহিল, "এঁ্যা—ও তবে—"

"সে।"

"দিদি!"

"চুপ! দিদি নয়, পাপীয়সী,—পিশাচিনী—! আজ কদিন ধরে ওকে এই বাড়ীর ধারে ঘুরতে দেখ্‌ছি!"

মৃণাল স্বামীর পানে চাহিল, দেখিল, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারও চোখে জল আসিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বার্ণাড্ শ

"সভ্যতার প্রিয়শক্র, বার্ণাড শ,
সমাজের তুমি দেখ শৃঙ্খল আচার,
শিকল-বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা থ।
মানুষেতে ভালবাসে হ য ব র ল,
তারি লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ পায়, যে, করে বিচার,—
অন্যের পায়ের নীচে পড়ে যায় দ!
মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো॥
অপরে বোঝেনা, তাই নাটকেতে হাসো॥
হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদ্ঘর্ম্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!
সনেট পঞ্চাশৎ।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'সনেট পঞ্চাশৎ' নামক নবপ্রকাশিত পুস্তিকায় 'বার্ণাড শ' শীর্ষক গাথাটি পাঠ করে আমার কোনো বন্ধুর এই সুপ্রসিদ্ধ, সুরসিক, আইরিশ সাহিত্যিকের পরিচয় জান্‌বার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মেছিল। যাঁর "চাবুকাঘাতে" "জীবনের মর্ম্ম" বোঝান যায়, তাঁর সম্বন্ধে জান্‌বার জন্যে উৎসাহিত হওয়া ত শিক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাঁরা 'বার্ণাড শ'-এর সাহিত্যের সহিত পরিচিত হন্‌নি, তাঁদের পক্ষে প্রমথবাবুর এই সনেট্‌টি সহজে বোধগম্য হবার কোনো উপায় নেই। 'বার্ণাড শ'-এর গ্রন্থাবলী প'ড়ে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে যে

ভাব মুদ্রিত হ'য়ে আছে, এই প্রবন্ধে আমি তারই একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব মাত্র।

যাঁরা সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাক্‌বেন যে ইংলণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে কুড়ি বছর পূর্ব্বে যে মত যে ভাব (আইডিয়া) কাজ করছিল আজ তার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে—সেখানে সর্ব্বত্রই যেন একটা নবজীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। নবযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অভ্যর্থনার আয়োজনে বর্ত্তমানযুগের যে কয়েকজন মহাত্মা ও কর্ম্মবীর ব্যাপৃত রয়েছেন, বার্ণাড শ তাঁদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠকর্ম্মী এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই, কেননা তিনি বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাস্রোতকে নূতন পথে প্রবাহিত করবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করেছেন। শ মহাশয়ের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে তাঁর জীবনের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বার্ণাড শ-এর জন্ম; তিনি তাঁর সাহিত্যে বহু স্থানে নানা ছলে প্রকাশ করেছেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব—এরাই পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়চে ও গড়বে। কথাটি মিথ্যে নয়—সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে কোনো জাতির মেরুদণ্ডটা সেই জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর দিয়েই যেন নির্ম্মিত। সাধারণতঃ ছেলেকে যেমন বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে লেখা-পড়া শেখান হয়, শ-এর পিতা ছেলের শিক্ষার জন্য তেমনতর কোনো চেষ্টা করেননি। ছোটবেলা থেকে ছেলেকে তার নিজের পথে নিজেকে চল্‌তে দিয়েছেন—কোনোখানে তাকে বাধাগ্রস্ত করেন নি। এ জন্যেই তাঁর অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি ফুটতে পেরেছিল এবং বাল্যকাল থেকেই শ স্বাধীনচিত্ত ও নির্ভীক হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছিলেন। ছোট বেলা থেকেই বার্ণাড শ-এর মধ্যে চিন্তার মৌলিকত্ব ও আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে—পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর বয়সে 'Cashel Byrons' Profession' নামক একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। ইংলণ্ডের কোনো কোনো নামজাদা সংবাদপত্র তাঁর এই কিশোর বয়সের লেখা উপন্যাস খানিকে "Novel of

বার্ণাড্ শ

the age” অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে প্রশংসা করেছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি প্রায় দশ বৎসর কাল ইংলণ্ডের বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রে সঙ্গীত, নাট্য ও আর্টের সমালোচনা লিখে কিছু উপার্জ্জনের সংস্থান করলেন। সব জিনিষকে স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখ্‌বার শক্তি তাঁর ছিল তাই “কষ্টিপাথরের” কাজে তিনি অপটু ছিলেন না। শ-এর সমালোচনা কখনও কখনও তীব্র হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর লেখা আদৃত হ’তে লাগ্‌ল। এর কিছু পরেই তিনি নাট্য লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। বার্ণাড্‌ শ socialist দলভুক্ত; যারা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর রাখেন তাঁরা Fabian Socialist দলের নাম শুনে থাকবেন। শ এই দলভুক্ত হ’য়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও উদ্যমে এই সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক পদে ব্রতী হয়েছিলেন; হাইড পার্কে কখনও গরুর গাড়ী কখনও কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন।

বার্ণাড শ-এর সাহিত্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্। অবিশ্যি তাঁর লেখা-গুলির পরমায়ু আন্দাজ করে গণনা করা একটু শক্ত—যে কোনো লেখক সম্বন্ধেই একথা খাটে। ভবিষ্যতে শ এর কোন্ কোন্ নাটক টিঁকে থাকবে অথবা কতদিনই বা এগুলি মানুষের চিত্তকে উদ্বোধিত করতে পারবে বলা দুরূহ ব্যাপার। তবে লেখার রেখাগুলি দেখে খানিকটা আয়ু অনুমান করা যেতে পারে। যারা সমালোচক তারা বলেন আমাদের চেয়ে ভবিষ্যৎ বংশ শ-এর লেখার মর্ম্ম ভাল করে বুঝ্‌তে পারবে।

শ-এর নাটকে একদিকে যেমন হাসিচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে অপরদিকে লেখার ভিতর দিয়ে তেমনই এক আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্য বিকীর্ণ হচ্ছে। তাঁর লেখায় হাস্যরসের প্রাচুর্য্য দেখে কেউ কেউ তাঁকে “হাল্কা” মনে করেন, কিন্তু যাঁরা একটু তলিয়ে দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন শ-এর হাসি কি কঠিন! হাসির অন্তরালে যে কঠিন সত্যের তীক্ষ্ণ বাণটি লুকোনো থাকে তার আঘাত ত কম নয়! John Bull’s other island নাটকে Father Keegan বলছেন, “my way of Joking is to tell the truth” অর্থাৎ হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়েই আমি সত্য কথা বলে থাকি। এই হচ্চে শ-এর নিজের কথা।

তার লেখার এই বিশেষ স্বরূপের জন্য ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা শ-কে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা এঁকে যাত্রাদলের সং মাত্র মনে করেন এবং এঁর সমালোচনার ভিতরে কোনো গাম্ভীর্য্য নেই বলে দোষারোপ করেন।

Mrs. Warrens Profession নামক নাটক খানি যখন বার হয়, সমস্ত পাদ্রী-মহল তখন ক্ষেপে উঠেছিলেন। শ তীব্র বাক্যবাণে সমাজের আবরণ ভেদ করে যে ব্যাধিটি সকলের দৃষ্টির সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, দুর্ব্বলচিত্ত, ধর্ম্মযাজকেরা সেই ভীষণ দৃশ্য সইতে পারলেন না। অথচ ব্যাধিটিকে ত অস্বীকার করবার জো ছিল না। যাই হোক্, সহস্র গালি ও তীব্র আক্রমণেও শ এর অটল বিশ্বাসের ভিত্তি কেউ তিলমাত্র বিচলিত করতে পারে নাই। শুধু তাই নয়, এর সর্ব্বতোমুখী

প্রতিভার কাছে হার মানতেই হয়—এজন্য শ-এর জাতিকে ধর্ম্মযাজকেরাও ম্লান করতে পারেন নি।

অবিশ্যি বিদ্রূপরাগে রঞ্জিত করে সত্যকে মানুষের দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড় করান বড় সহজ নয়। এখানে রঙের এম্‌নি নিপুণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন যাতে সত্যের আকৃতি কোনো প্রকারে অস্পষ্ট থেকে না যায়। এ হিসাবে শ একজন নিপুণ আর্টিষ্ট ছিলেন। আমাদের দেশে যাঁরা এই চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বহুলোকেই সত্যকে হয় বিকৃত না হয় অস্পষ্ট করে তুলেছেন। আধুনিক লেখকদলের মধ্যে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্র-লালের লেখায় অট্ট হাসির কলরব সত্যের বাণী ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। তাঁর রচিত হাসির গানে কখনকখনও, বিকৃতাবস্থাপন্ন বঙ্গীয় সমাজের ক্রন্দন ধ্বনি বেশ স্পষ্ট শোনা যেত। যেখানে বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা সেখানে তিনি আঘাত করেছেন, যেখানে সমাজ ভাঙ্গাগড়ার সংঘর্ষণে আপনার আসন থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে, তিনি বিদ্রূপা-ঘাতে সে কঠিন সত্যকে বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিয়ে দিয়েছেন! য়ুরোপে Moliere, Heine প্রভৃতি সাহিত্যিকের লেখার ভিতরেও এই স্বরূপটি জাগ্রৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বার্ণাড শ-এর কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে তাঁর লেখায় কবিত্বের মাধুর্য্য আদৌ নেই—সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার তীব্র সমালোচনা বিদ্রূপের রঙে রঞ্জিত করে তিনি তাঁর পাঠকের মনে একটা ক্ষণিক আনন্দরসের সৃষ্টি করেন মাত্র। কিন্তু শ-এর নাট্যে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না একথা যাঁরা তাঁর বই পড়েছেন তাঁরা বল্‌তে পারেন না। ১৯১১ সালে Getting Married নামক একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। একটি অঙ্কেই নাটকখানি সমাপ্ত করা হয়েছে বলে নাটক খানিতে ভাষার ও চরিত্র বর্ণনের বাঁধন বেশ পরি-পাটি হয়েছে। একদিকে ভাষার লালিত্য অপরদিকে design ও চরিত্র বর্ণনের নিপুণতা নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেছে!

কেউ কেউ বলেন Getting Married নাটকখানিতে কথাবার্ত্তারই ছড়াছড়ি বেশি, সেখানায় কোনো plot নেই। কিন্তু নাটকের বাহিরের আকৃতি দেখে তার বিচার চলে না। নাটকের ভিতরকার কারুকার্য্যেই নাটকের সার্থকতা! মানব চরিত্রের বহু বিচিত্রতা, মানবজীবনের সংগ্রামকাহিনী ও চরিত্র রচনার আশ্চর্য্য নিপুণতা যেখানে ফুটে উঠেছে, সেখানেই নাটক সাহিত্যক্ষেত্রে অমরতা লাভ করেছে। শ এর এই নাটক-খানিতে মানুষের অন্তরের ইতিহাস গোপন থাকেনি—আমাদের জীবনধারাকে যে পথ দিয়ে প্রবাহিত হ'তে হয় সেই সুখদুঃখ হাসিকান্না, জয় পরাজয়ের পথটিই তিনি তাঁর নাটকের ভিতরে অঙ্কিত করেছেন। এবং ইংরেজি সাহিত্যে নাটকের যেখানে বিশেষত্ব অর্থাৎ ভাষার লালিত্য ও মনোহারিত্ব, শ-এর লেখার ভিতরেও তার অভাব ঘটেনি।

Man and Superman, Candida, প্রভৃতি নাটকের ভাষা সাহিত্যিক মাত্রেই প্রশংসা করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ-এর নাটকে চরিত্র বর্ণন হচ্চে আর একটি বিশেষত্ব। John Bull's other Island-এর চরিত্রগুলি যেমন বিদ্রূপের (irony) তুলিতে অঙ্কিত, 'Doctor's Dilemna' তে তেমনি হাসির পোষাকে (Satire) চরিত্রগুলিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে—এবং দু'টো নাটকেই চরিত্রগুলি আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হ'য়েছে।

যাঁরা বার্ণাড শ-এর গ্রন্থ পাঠ করেছেন বা পাঠ করবেন তাঁদের কাছে শ-এর নাট্যভাব (আইডিয়া) কখনও অদ্ভুত, কখনও অস্বাভাবিক এবং কখনও অসম্ভব বলে মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শ-এর নাটকগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌লে চল্‌বেনা—বস্তুত তেমন করে কোনো জিনিষেরই সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর সমস্ত রচনার ভিতরেই শ-এর যথার্থ পরিচয়টি লুকোনো আছে এবং সেইটিই তাঁর সত্য পরিচয়।

বার্ণাড শ-এর ব্যক্তিগত বা সামাজিক নৈতিক আদর্শ তাঁর দার্শনিক মতপ্রসূত। নরওয়েতে ইবসেন্, জর্ম্মানিতে নিট্‌চে প্রভৃতি চিন্তাশীল দার্শনিকগণ যে আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় জন্মলাভ এবং যে চিন্তা-স্রোতে অবগাহন করেছিলেন, শ সেই জলবায়ুর স্পর্শ লাভ করেছিলেন! তাঁর আইডিয়ার সঙ্গে এই সকল দার্শনিক মহাপুরুষের মতের যথেষ্ট ঐক্য ছিল। কিন্তু একই সত্য নানা মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে। বার্ণাড শ বলেন, এই দার্শনিকদের আইডিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার বহু পূর্ব্ব থেকেই তিনি তাঁর মত প্রচার করেছেন।

সুবিখ্যাত দার্শনিক বারগঁসো Elan vital বলে যে শক্তিতত্ত্ব প্রচার করচেন, সে কথার সঙ্গে বার্ণাড শ-এর life force-এর কোনো তফাৎ নেই। আমাদের জীবন যে এক মহাযাত্রার পথে চল্‌চে, যতটা পথ সে এগিয়ে যাচ্চে, কখনই আর সে পিছিয়ে পড়্‌বেনা—এ যাত্রা ব্যর্থ নয় এক মহাশক্তির প্রেরণায় নিরন্তরই আমাদের জীবন অনন্তপথের দিকে ছুটে চল্‌চে। আমরা পাপীও নই সাধুও নই, আমরা এই শক্তির হাতে যন্ত্রের মতন—যখন শক্তির আদেশ মেনে চলি সুখ ঘটে, যখন অমান্য করি আমাদের জীবন ব্যর্থতার বেদনা অনুভব করতে থাকে।

শ-এর ধর্ম্মমত তার ক্ষুদ্র নাটক—The Shewing up of Blanco Posnet'-এ বেশ স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। আমেরিকার পশ্চিমভাগে ঘোড়া চুরি করে Blanco Posnet দিন কাটাত—একদিন তার অন্তঃকরণে সে গভীর বেদনানুভব করতে লাগল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সে নিজেকে ধরা দিলে। এম্‌নি করে যখন তার ভিতরে যথার্থ পরিবর্ত্তন এল, একে একে তার দলভুক্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলিও পাপের রাস্তা পরিহার করে Posnet-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে। তারপর Posnet এই নবজীবনের আস্বাদ পেয়ে বুঝ্‌তে পারলে জীবনের সার্থকতা কোথায় এবং এই জীবনের অর্থ ই বা কি!

আমি পূর্ব্বে বলেছি, শ একজন Socialist। কিন্তু সাধারণ Socialist দের মত থেকে এঁর মতের একটু পার্থক্য আছে। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের মতামত অনুসারে দেশের শাসন কার্য্য চল্‌বে, একথা তিনি সঙ্গত বলে মনে করতেন না। এই অর্থে তিনি গণতন্ত্রবাদী ছিলেন না, বরঞ্চ শাসনসংরক্ষণ

কার্য্য অভিজাতবর্গ দ্বারা সুসম্পন্ন হয় এই বিশ্বাস করতেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতা সমাজের নিম্নস্তরে যে দুঃখ ও দরিদ্রতার বোঝা জমিয়ে তুলচে তার প্রতিকার না হলে সমস্ত সভ্যতার গৌরব নষ্ট হবে শ এ কথা বারম্বার বলেছেন। তিনি Socialistদের দলভুক্ত ছিলেন, কেননা সমাজের এমন অনেক ব্যাধি তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার কাছে এত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে Socialistদের মধ্যেই সে গুলির প্রতিকারের চেষ্টা লক্ষ্য করে, মহাপ্রাণ শ নিরস্ত থাকৃতে পারেন নাই। Play Unpleasant নাম দিয়ে তিনি যে নাটকাবলী প্রকাশ করেছেন, তাতে সমাজের বিকৃতাবস্থার তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করে ইংলণ্ডের জনসাধারণচিত্তকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

শএর এই তীব্র সমালোচনা, এই চাবুকাঘাতই ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তাঁরা শ-কে অধার্ম্মিক, বাচাল, সয়তান বলে গাল দিয়েছেন। শ নিজেই কিছুদিন পূর্ব্বে গর্ব্ব করে নিজেকে "Specialist in immoral and heretical play" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথার বিপরীত কাজই immoral, কিন্তু যেখানে নিরন্তর পরিবর্ত্তনের স্রোত বইচে, সেখানে ত কোনো জিনিষই স্থির থাকৃতে পারে না। এই স্রোতের মুখে সব জিনিষকে ঠিক রাস্তায় চালিয়ে দেওয়া আর্টের একটি মস্ত কাজ।

শ-এর সাহিত্যে সংযমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক দুর্গতি সম্বন্ধে লিখ্তে গিয়ে অনেকে ভাবরাজ্যের স্বপ্নলোকে গিয়ে উপস্থিত হন্—তাঁরা এক একটা বিষয়কে এত অতিরঞ্জিত করে তোলেন যে তাতে অনিষ্টই হয়। শএর imotional balance অর্থাৎ ভাবের সামঞ্জস্য এম্নি সম্পূর্ণ ছিল যে কোনো বিষয়ে তিনি এক চোখো বিচার করেন নি। "Preface on Doctors." প্রবন্ধটি পাঠ করুন সেখানে দেখ্বেন ডাক্তারদের কোনো ত্রুটি লেখকের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি,—তাঁর লেখনীর সমস্ত বিষ প্রয়োগ করে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনা লিখ্লেন, তার পরই লিখ্চেন "The true doctor is inspired by a hatred of ill-health, and a divine impatience of any waste of vital forces." অর্থাৎ—দূষিত স্বাস্থ্যের প্রতি খাঁটি চিকিৎসকের তীব্র ঘৃণা থাকৃবে এবং যেখানেই জীবনী-শক্তির অপচয় দৃষ্টি হবে সেখানেই তিনি বিদ্রোহী হবেন।

এতক্ষণ আমি সাহিত্যিক বলেই শএর পরিচয় দিয়ে আস্চি কিন্তু তাঁর মতন কর্ম্মী সাহিত্যিক দলের ভিতর সচরাচর দেখা যায় না। নিজের ঘরটিতে বসে কেবল নাটক লিখে, সমালোচনা করে, কেহ কোনোদিন কাউকে "জীবনের মর্ম্ম" শেখাতে পারেনি।

বার্ণাড শ-এব দৈনন্দিন জীবন যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁদের বইতে তাঁর কর্ম্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত পাঠ করে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়। একদিকে Fabian Society র জন্য তিনি যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, আবার নাটক, সঙ্গীত, ইত্যাদির উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত ইংলণ্ডের বহুস্থলে নানা সভাসমিতির তিনিই প্রধান উদ্যোগী। যেমন তাঁর সবল দেহ, তেমনি

তাঁর উদারপ্রসন্ন নির্ভীক চিত্ত; সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন তাঁর প্রতিভা, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেম্‌নি তাঁর অক্লান্ত উদ্যম। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ, সাহিত্যিক বার্ণাড শ যা বলেছিলেন, সেই কথা ওঠে। (ইঁহার নাম Professor Henderson ইনি সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল এখানে এসেছিলেন।) সে কথা ক'টি উদ্ধৃত করে প্রবন্ধটি শেষ করব:—

"I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no 'brief Candle' for me. It is a sort of splendid torch, which I have got hold of for the moment; and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations." ভাবার্থ এই:—মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি জীবনের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষে কর্ম্ম দেবতার পূজায় উৎসর্গ করতে চাই। আমি জীবনের মাঝেই আনন্দের উৎসব পেয়েছি। জীবনটাকে আমি নির্ব্বাণোন্মুখ একটি প্রদীপ মনে মনে করি না—এ যে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আলোক শলাকা! ভবিষ্যৎবংশের হাতে এ আলোক শলাকা তুলে দেবার পূর্ব্বে যেন এর আলো ম্লান না হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চুড়িওয়ালা

(গল্প)

"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।"

দুপুর বেলা যখন রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, গলির পথে লোক চলিতেছে না, ঘরে ঘরে গৃহিণীরা কাজকর্ম্ম সারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একটু গা-গড়া দিতেছেন, তখন নিজের পসরা মাথায় করিয়া পথে পথে চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া ফিরিতেছিল—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

গলির ধারের একটি জানলা অল্প একটু খুলিয়া একটি কিশোরী মেয়ে ডাকিল—"অ চুড়িওলা, চুড়িওলা! এই বাড়ীতে এস।"

চুড়িওয়ালা ফিরিয়া দুই হাতে মাথার ঝুড়ি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া উপরে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কনে, কেডা ডাকছ গো?"

কিশোরী বলিল—"এই যে এই বাড়ীতে।"

চুড়িওয়ালা দেখিল একটি তন্বী সুন্দরী কিশোরী একখানি চৌড়া লাল পেড়ে শাড়ীতে মাথায় আধঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—শাড়ীর চৌড়া লাল পাড়টি মাথার মাঝখানে সিঁদূরের মতো টকটক করিয়া যেন

পুষ্পলক্ষ্মী

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

জ্বলিতেছে। কিশোরীর নাকে একটি নোলক, কানে দুটি দুল—গায়ের রঙের সঙ্গে সেগুলি যেন মিশিয়া লুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই বুড়া আলিজানের মনটা খুসি হইয়া উঠিল। এমন মধুর রূপ সে আর কখনো দেখে নাই; অনেক সুন্দরীকে সে চুড়ি বেচিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিয়া তাহার প্রাণ এমন খুসি হইয়া উঠে নাই। সে হাতের ঝুড়ি মাথায় নামাইয়া বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরীটি নামিয়া আসিয়া চুড়িওয়ালার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"লাল চুড়ি আছে চুড়িওলা?"

চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"আছে মা লক্ষ্মী! কার হাতের চাই? তোমার হাতের?"

কিশোরী ঘাড় কাৎ করিয়া বলিল—"হাঁ।"

বুড়া আলিজান মাথার মোট নীচে নামাইয়া উপরের ঢাকা খুলিতে খুলিতে হাসিয়া বলিল—"তা লাল চুড়ি ত তোমার ও লাল হাতে মানাবে না মা লক্ষ্মী!—রঙে রঙে মিশে যাবে যে? ঐ রাঙা হাতে কালো চুড়ি ভালো মানাবে। কালো চুড়ি দেবো?"

কিশোরী লজ্জায় লাল হইয়া হাসিমুখ নত করিয়া বলিল—"না, লাল চুড়ি বা'র কর।"

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"মা আমার লালির ভক্ত! এস ত মা হাত দেহি।"

কিশোরী লজ্জিত হইয়া বলিল—"না, তুমি চুড়ি দাও, আমি দেখে নিচ্ছি।"

চুড়িওয়ালা বলিল—"তোমার হাতে পরায়ে দেবো না মা?"

কিশোরী বলিল—"না, আমি মার কাছে পরব।"

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"না মা, তা হবে না; ও রাঙা হাতে রাঙা চুড়ি আমি পরায়ে দিয়ে যাব। তা যদি না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না।"

বুড়া মনে করিতেছিল এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সে ত কত বাড়ীতে কত মেয়ের হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চুড়ি পরাইয়া দিয়াছে। কত স্পর্শ তাহাকে ক্ষণিকের জন্য একটু বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে কেহই ত মুগ্ধ করিতে পারে নাই। আজ বুড়ার মনে হইতে লাগিল এই সুন্দরী কিশোরীটির হাতে যদি সে চুড়ি পরাইয়া দিতে না পারে, তবে তাহার এই ব্যবসা মিথ্যা পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে; এই হাতখানিরই সন্ধানে সে সমস্ত জীবন রোদে রোদে গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বয়স কাটাইয়াছে, তাহার কাঁচা চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। তাই যখন সেই কিশোরী তাহার কাছে চুড়ি পরিবে না বলিল তখন বুড়া বলিয়া বসিল—"তা যদি পরাতে না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না!"

এই কথায় কিশোরীর ভারি লজ্জা বোধ হইল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিয়া বুড়ার কাছে বসিয়া তাহার সুন্দর সুকোমল হাতখানি বাড়াইয়া দিল—তাহার মুখে লজ্জার আভাস শাড়ীর লাল পাড়ের ছায়ার মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

চুড়িওয়ালা মৃণালসংযুক্ত পদ্মের কলির মতো কিশোরীর হাতের মুঠিটিকে নিজের দুই

হাতের মধ্যে ধরিয়া একবার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহের আবেগ দিয়া চাপিয়া চুড়ির মাপ ঠিক করিয়া লইল। বুড়ার মনে হইতেছিল যদি সে এই সুন্দর সুকোমল পদ্মের কলির মতো হাতখানি চোখের জলে ধুইয়া চুমায় চুমায় একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তারপর নিজের পসরাটি উজাড় করিয়া দিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায়, তবেই তাহার উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগ কথঞ্চিৎ চরিতার্থতা লাভ করিয়া শান্ত হইতে পারে।

চুড়িওয়ালা কিশোরীর হাত দুখানিকে নিজের হাতে ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া লাল চুড়ি একগাছির পর একগাছি করিয়া পরাইয়া দিতে লাগিল। বেদনায় কিশোরীর মুখ একটু কুঞ্চিত হইলে সে বেদনা সহস্রগুণ হইয়া বুড়ার বুকে গিয়া বাজিতেছিল, আর বুড়া বলিতেছিল—"বড্ড কি লাগতিছে মা? একটু সহ্য কর মা, তা হলি এ চুড়ি তোমার হাতে চাপে বসয়া যাবে, সে যা মানাবে মা!"

কিশোরীর চোখ ছলছল করিতেছিল, তবুও সে বুড়ার কথা শুনিয়া মুখ লাল করিয়া তুলিয়া হাসিল—হাসিতে দুটি গালে দুটি টোল পড়িল।

চুড়ি পরাইয়া দিয়া চুড়িওয়ালা আপনার ঝুড়ি হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভালো ভালো পুতুল, কড়ি-বসানো বাক্স, খেলনা, ফুলদান বাহির করিল।

কিশোরী তাহা দেখিয়া বলিল—"ওসব আমার কিছু চাইনে।"

বুড়া হাসিয়া বলিল—"তোমার না চাই তোমার খোকাকে দিয়ো।"

কিশোরী লজ্জায় আপাদমস্তক লাল হইয়া উঠিয়া মাথা নত করিল।

তাহার শাশুড়ী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বৌমার এখনো ত খোকা হয় নি, ওসবের দরকার নেই।"

চুড়িওয়ালা তাহার ঝুড়ির উপর ঢাকা চাপা দিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"তা না হোক, আমার মা-ই ত এখনো খুকি আছে, মা-ই খেলবে।"

কিশোরী বধূর শাশুড়ী বলিলেন—"ওগুলোর কত দাম?"

চুড়িওয়ালা ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ওসব আমি মাকে দেলাম।"

শাশুড়ী বলিলেন—"ওমা, সেকি কখনো হয়! ওগো চুড়িওলা, তুমি যেয়ো না, দাঁড়াও গো, দাঁড়াও, দাম নিয়ে যাও!"

ততক্ষণে চুড়িওয়ালা পথে বাহির হইয়া পড়িয়া খুসি মনে হাসিমুখে হাঁকিতে হাঁকিতে যাইতেছে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

সেই দিন হইতে চুড়িওয়ালা নিত্য দুপ্রহরে সেই গলির মধ্যে চুড়ি বেচিতে আসিতে লাগিল। চুড়ি ত আর নিত্যকারের প্রয়োজনীয় নয়, তাহাকে কেহ আর ডাকিত না। কিন্তু তাহার ডাক শুনিলেই সেই কিশোরী বধূটি একবার জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, আর বুড়া চুড়িওয়ালা দুই হাতে ঝুড়ি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লইত; দুজনে চোখোচোখি করিয়া সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়া আপনাদের একটি দিনের ক্ষণিক পরিচয়ের গভীর প্রীতির সম্পর্কটি স্বীকার করিয়া যাইত।

কিশোরী বধূর শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন – "কি বৌমা, তোমার খোকা এসেছে বুঝি? খাসা তোমার পাকা-দাড়িওলা খোকাটি বাছা!"

কিশোরী বধূ আনন্দের লজ্জিত হাসি হাসিয়া জানলা হইতে সরিয়া যাইত।

চুড়িওয়ালা ভাবিত সে যদি চুড়ি বেচা ছাড়িয়া দিয়া আলু পটল কি কেরোসিন তেল বেচিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে রোজ তাহার মায়ের বাড়ীতে যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু চুড়ি না বেচিলে ত সেই পদ্ম-কলির মতো মুঠিটি দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও স্নেহের ধারা মুক্ত করিয়া দিবার সুযোগ ঘটিবে না। সেই সুদূরের সুযোগের প্রত্যাশাতেই বুড়া চুড়ির পসরা মাথায় করিয়া দুপ্রহর রৌদ্রে গলিতে গলিতে হাঁকিয়া ফিরিত—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদানি চাইয়ে!"

কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই কিশোরী জানলায় তাহার নিয়মিত হাজরী বন্ধ করিয়া দিল। বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া হাঁকিয়া ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া যায়, উপরের সেই গরাদে-দেওয়া জানলার ফাঁকে সেই সুন্দর মুখখানি আর লজ্জিত স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঁকি মারে না। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফেরি সারিয়া ফিরিয়া যায়, কিন্তু ফিরিতে তাহার মন চাহে না, পা চলে না।

কিছুদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁকের পর হাঁক দিয়াও যখন আর সেই জানলায় সেই মুখখানি কিছুতেই দেখা দিল না, তখন একদিন চুড়িওয়ালা সাহসে ভর করিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরুণ, চুড়ি লেবেন?"

বাড়ীর মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—"না গো।"

চুড়িওয়ালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কনে গা?"

ঘরের মধ্য হইতে আবার রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—"এখানে নেই গো।"

সহস্র প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইলেও আর তাহার সাহসে কুলাইল না, সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চলিয়া গেল—সে ম্রিয়মাণ, গতি তাহার মন্থর, পথে পথে সে আর "চুড়ি চাই" বলিয়া হাঁকিলও না।

এখানে সে নাই। কিন্তু কবে আসিবে তাহারও ত স্থিরতা নাই। প্রতিদিন আশা বহিয়া চুড়িওয়ালা সেই গলিতে আসিয়া উচ্চ-স্বরে হাঁকে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!" একবার, দুবার, তিনবার! তার-পর সেই শূন্য জানলাটির দিকে ছলছল দৃষ্টি তুলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ফিরিয়া যায়। পরদিন আবার আসে।

এমনি করিয়া কত মাস গেল। পূজা আসিল। আজ ঘরে ঘরে চুড়ি কেনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে—সধবা কুমারী, তরুণী বালিকা, সবাই মনের মতন চুড়ি বাছিয়া বাছিয়া কিনিতেছে; চুড়িওয়ালা তাহাদের মুঠি হাতে লইয়া চুড়ির পর চুড়ি পরাইয়া দিতেছে! কিন্তু তাহার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন

হইতেছে না, প্রবোধ মানিতেছে না। তাহার মায়ের মতন সুন্দর হাত আর কাহারো না, তেমন নরম মুঠি আর কাহারো না, তেমন মধুর হাসি আর মিষ্ট কথা আর কাহারো না।

অপেক্ষা করিয়া করিয়া বুড়া ক্লান্ত হইয়া আবার একদিন সেই বাড়ীর সামনে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারবার করিয়া হাঁকিল—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।" কিন্তু কাহারো সাড়া পাইল না, কেহ তাহাকে জানলা হইতে ডাকিল না—"ও চুড়িওলা, চুড়িওলা, এই বাড়ীতে এস!" সেই জানলা তেমনি শূন্য, তেমনি নিরানন্দ! তখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চুড়িওয়ালা ডাকিল—"চুড়ি লেবেন মাঠাকরুণ?"

একজন ঝি বিরক্ত হইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"না গো না, একশ দিন বলেছি চুড়ি চাই নে, তবু কেন জ্বালাতে আস বল দিকিন? দরকার হয় রাস্তা থেকে ডেকে নেব।"

চুড়িওয়ালা ভয়ে লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে চোরের মতো ফিরিয়া যাইবে, এমন সময় দেখিল সেই কিশোরী বধূর শাশুড়ী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কি এহনো আসে নাই?"

শাশুড়ী ম্লানমুখে উদাস ভাবে চুড়িওলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এসেছে।"

চুড়িওলা একমুখ হাসিয়া আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে বলিল—"মা ঠাকরুণ, একবার তানাকে দেখতি পাই না? মারে আমার কতকাল দেহিনি—দেখতি আসি' আসি' ঘুরি যাই, দেখতি পাই না?" শাশুড়ী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি চোখ মুছিয়া স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"না বাবা, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

বুড়ার আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখ একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যেন নিবিয়া গেল। সে ব্যথিত ছলছল দৃষ্টিতে একবার বধূর শাশুড়ির দিকে চাহিয়া হতাশ মনে গমনে-অনিচ্ছুক পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া ফিরিয়া চলিল। সে এই পূজার সময় বাজার ঘুরিয়া সব চেয়ে ভালো এক জোড়া চুড়ি পছন্দ করিয়া আনিয়াছিল তাহার সুন্দরী মা-টির হাত নিজের হাতে ধরিয়া পরাইয়া দিবে বলিয়া। কিন্তু যেখানে ভালো বাসিবার অধিকার আছে, পাইবার দাবী করিবার অধিকার নাই, সেখানে সে কেমন করিয়া জোর করিবে? সেই কিশোরী বধূটি যদি তাহার কন্যা হইত, তবে কি তাহার শাশুড়ী তাহাকে এমন করিয়া বিমুখ করিয়া হতাশ করিয়া ফিরাইতে পারিত? বুড়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পতনোন্মুখ অশ্রু গামছায় মুছিয়া ফেলিল। সদর দরজা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়া চুড়িওয়ালা থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ঘাড় ঘুরাইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল। তার পর আবার ফিরিয়া মন্থর কুণ্ঠিত পদে বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

চুড়িওয়ালা দেখিল বধূর শাশুড়ী তখনো রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। চুড়িওয়ালা গলায় গামছা দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া মিনতি-বিগলিত স্বরে বলিল—"মা

ঠাকরুণ. মুই চুড়ি বেচতি আসি নাই। একডা বার মায়েরে মোর দেহি যাতাম !"

এই বলিতেই বুড়ার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া বেদনা-ভরা মিনতি অশ্রুজলে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বধূকে একজন নিঃসম্পর্ক পথের লোকের সামনে বাহির করিবার পক্ষে যেটুকু আপত্তি ছিল বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা তাহা চোখের জলে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিল। চোখের জল এই বৃদ্ধ মুসলমান চুড়িওয়ালার সহিত কিশোরী বধূর একটি প্রাণের টানের নিকট সম্পর্ক এক নিমেষে প্রমাণ করিয়া দিয়া গেল। বধূর শাশুড়ী এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে তাকাইয়া অক্ষিপল্লব হইতে কম্পমান অশ্রুবিন্দু মুছিয়া, অশ্রুপূর্ণ স্বরে ঝিকে বলিলেন—"মোক্ষদা, বৌমাকে একবার ডেকে দে !"

কিশোরী বধূ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত জড়িত পা ফেলিয়া চুড়িওয়ালার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। চুড়িওয়ালা এক মুখ হাসিয়া কোঁচার খুঁট হইতে কাগজের বাক্স খুলিয়া এক জোড়া বিচিত্র বর্ণের ডড়োয়া কাঁচের চুড়ি বাহির করিয়া বলিল—"মা, হা ত্যাগ, তোমার জন্যি মুই জুবিলি চুড়ি আন্যাছি !"

চুড়িওয়ালা হাসিমুখ তুলিয়া চুড়ি জোড়া কিশোরী বধূর হাতে দিতে গিয়া দেখিল কিশোরীর হাতে কোনো গহনা নাই! তাহার লাল হাত হইতে তাহার অত সখের লাল চুড়ি সে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে; সিঁথি হইতে সিঁদূর মুছিয়া ফেলিয়াছে; মাথার উপর কস্তা-পেড়ে শাড়ীর চৌড়া লাল পাড় আর হাসিতেছে না; পায়ে লাল আলতা নাই; ঠোঁটে লাল পান নাই; নাকে নোলক নাই, কানে সে সুন্দর দুল নাই; মুখে সে ভুবনভুলানো হাসিটুকুও নাই! একখানি শুভ্র থান তাহার যূথির মতো শুভ্র সুন্দর ম্লান মূর্ত্তিখানি কুণ্ঠিত ভাবে জড়াইয়া যেন মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। এই মূর্ত্তিমতী শোকের মূর্ত্তি দেখিয়া চুড়িওয়ালা চুড়ি-জোড়া আছড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই চূর্ণিত চুড়ির মতোই ভাঙা বুকের মধ্য হইতে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে চোখ চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—মা রে, এ মুই কী ত্যাখলাম! অ্যাব আগে মুই মলাম না ক্যান !"

কিশোরী মাথা নত করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া চলিয়া গেল, তাহার শাশুড়ী চোক মুছিতে মুছিতে ঘরে চলিয়া গেলেন। আর বুক-ভাঙা বুড়া চুড়িওয়ালা দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে পসরা মাথায় তুলিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-সংবাদে

দেশ :— তোকিও। কাল :— ২রা সেপ্টঃ ১৯১৩। পাত্র :— ওকাকুরা য়ান। জ্ঞানী, গুণী, ভারতপ্রেমিক ও বন্ধুবৎসল।

দেহ তার নাই,
পুড়ে হ'ল ছাই,—
এই মাত্র জানি।

দেহী কিন্তু রয়,
নাহি তার ক্ষয়,
এই সত্য মানি॥

বিশাল সে মন,
বিশ্ব-আয়তন,—
মরিতে কি পারে?
বিপুল সে হৃদি,
অগাধ বারিধি,—
শুকাইতে নারে॥
প্রগাঢ় সে প্রেম,
অগ্নিশুদ্ধ হেম,—
না ফুরায় দানে।
অপার সে জ্ঞান,
দেশের কল্যাণ
সাধিবে সমানে।
জনমান্তরীণ
ছিল কোন ঋণ,
শুধিতে ভারতে।
সাঙ্গ সেই কাজ,
তাই তুমি আজ
ত্যজিলে মরতে॥
ভিন্ন জাতীয়তা
প্রাণের একতা
নাহি করে রোধ।
ভারত জাপান,
সোদর সমান
করে শোক বোধ॥
হে সুধী, হে বীর,
হে বন্ধু সুধীর!
—হউক সুগতি।
দূর হতে দূরে
লহ সুরপুরে
মোদের প্রণতি॥

স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা

আমাদের দেশে যেমন, জাপানেও তেমনি একদিন পাশ্চাত্য শিল্প জাপানবাসীর সনাতন সভ্যতার পূর্ব্বভাবটুকু ঘুচাইয়া দিয়া জাপান শিল্পকলার যে অবশ্যম্ভাবী পতনের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশের শিল্পকে যথাস্থানে অটল অচল বজ্রাসনে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন মহামনা আচার্য্য ওকাকুরা।

কি বিরাট মানসিক শক্তি লইয়া, স্বজাতীয় শিল্পে কি অচলা ভক্তি প্রগাঢ় আস্থা লইয়াই এই মহাপুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন!

জাপানের রাজাপ্রজা যখন শিল্পে পাশ্চাত্য প্রথার বহুল প্রচারে বদ্ধপরিকর, যখন জাপানে ভাবস্রোত নব্যতার একটা প্রবল আকস্মিক আকর্ষণে পশ্চিমের দিকে বিপরীত-মুখী হইয়া প্রলয় কল্লোলে করাল অনির্দ্দিষ্টের দিকেই বহিয়া চলিয়াছে, সেই দুর্দ্দিনে এই মহামনা দৃঢ়চেতা উদ্যমশীল পুরুষ নিজের পদ মান সকলি তুচ্ছ করিয়া বন্যার মুখে অটুট অভেদ্য বাঁধের মত আপনার সমস্ত সংকল্প, সমস্ত উদ্যম আশা বিস্তৃত করিয়া একা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই মহাক্ষণে শিল্পাচার্য্য ওকাকুরাকে অনুসরণ করে এমন সাহস কাহারও হয় নাই। জাপানের সেই কালরাত্রির অন্ধকারপটে ওকাকুরা সেদিন তমোহন্ত্রী পূর্ণচন্দ্র রূপে প্রকাশ পাইলেন।

ওকাকুরা ছিলেন ক্ষত্রিয় সন্তান। বিপুল

বাধা দলিত করিয়া স্বদেশের শিল্পকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষাত্রতেজেরই পরিচয় দিয়া গেলেন।

রাজ-অনুগ্রহ, সম্মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য-পন্থী শিল্পীকুলের অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া যেদিন জাপানের সরকারি শিল্পশালা হইতে স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন সেদিন জাপানের পক্ষে শুভদিন বলিতে হইবে। কেন না ইহারই ছয়মাসের মধ্যে শ্রীমদ্-ওকাকুরা প্রমুখ চত্বারিংশ শিল্প-মহারথী তাঁহাদের নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-রূপ মহাযজ্ঞে নিজেদের সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিলেন এবং তাহাতেই স্রোত ফিরিয়া গেল ও জাপানে মুহ্যমান শিল্প নবজীবনের মধ্যে আর একবার বিকশিত হইয়া উঠিবার অবসর পাইল।

আচার্য্য ওকাকুরার যখন প্রথম পরিচয় লাভ করি তখন আমি আমার সারাজীবনের কাযটুকু সবেমাত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছি, আর সেই মহাপুরুষ তখন শিল্পজগতে তাঁর হাতের কায সার্থকতার পরিসমাপ্তির মাঝে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া জীবনে দীর্ঘ অবসর লাভ করিয়াছেন এবং ভারত মাতার শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া "Asia is one" এই মহাসত্যের—এই বিরাট প্রেমের বেদধ্বনি জগতে প্রচার করিতেছেন।

ভারত কলালক্ষ্মীর উপর তাঁহার সেদিন যে শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া ছিলাম, মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বে আর একবার তাহার পরিচয় তিনি আমাদের দিয়া যাইতেই যেন শেষবার এখানে আসিয়া ছিলেন। ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি এই কথা বলিয়া আমাদের নিকটে বিদায় লইলেন—দশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া শিল্প দেবতাকে তোমাদের মাঝে দেখি নাই, এবার আসিয়া তাঁহার আবির্ভাবের সূচনা মাত্র দেখিয়া গেলাম, পুনরায় যখন আসিব যেন তাঁহাকেই দেখিতে পাই এই কামনা।

এবার ভারতে আসিয়া প্রবাসের শেষ রাত্রি তিনি ভারত মহাসাগরের তীরে কোণার্ক মন্দিরে যাপন করিয়া অন্ধকারের পারে আলোকের দর্শন পাইয়া সত্যই চলিয়া গেলেন বিরাট আনন্দ সাগরের পরপারে আপনার গৃহে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্তি

(গল্প)

পল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আজ বইখানা লেখা শেষ হইয়াছে। যার জন্য সে দিনে বিশ্রাম করে নাই, রাত্রে ঘুমায় নাই, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই এক চিন্তার মধ্যে ডুবিয়াছিল, সে কাজের আজ অবসান হইল। দীর্ঘ দারুণ পরিশ্রমের পর মুক্তির আনন্দ তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছে।

লেখকের পক্ষে একখানা ভালো বই রচনা করার মত বালাই আর নাই। সেই লেখাটাই তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়—কারণ পরবর্ত্তী সকল লেখাই সেই লেখাটারই কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়।

সাত বৎসর পূর্ব্বে পলের প্রথম রোমান্স প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই লেখাটা তাহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিল। অপরিচিতের ভিড় হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তখনকার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করিল। তারপর প্রলোভন আসিল। প্রকাশকের দল আসিয়া কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিল—কত টাকা পাইলে তিনি বইখানার স্বত্ব বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু সে প্রলোভনে ভুলিবার পাত্র নয়—সকলকে হাঁকাইয়া দিল। তাহার দুবেলা দুমুঠা অন্ন তো জুটিতেছে, তবে সে কেন তাহার সাহিত্য সাধনাকে ব্যবসায়ের হীন পঙ্কে নিমজ্জিত করিবে! সাহিত্য তাহার ভালো লাগে, তাই সাহিত্যসাধনা করে; অর্থলাভের প্রত্যাশায় তো করে না!

তিন বৎসর পরে তাহার দ্বিতীয় বইখানি বাহির হইল। এইবার একাধিক বিজ্ঞ সমালোচক বলিলেন যে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তখন এই লেখকের উল্লেখ না করিলে চলিবে না। প্রথম উপন্যাস খানি অপেক্ষা এখানি আরো উঁচুদরের হইয়াছে।

অহরহ দুশ্চিন্তার ভারে পীড়িত হইয়া আজ প্রায় দুই বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের পর, সে তাহার তৃতীয় পুস্তকখানি শেষ করিয়াছে। পূর্ব্বপ্রকাশিত বই দুই খানির কোনো খানিই তাহাকে এতটা কাবু করিয়া ফেলিতে পারে নাই। কোনো কালেই স্বাস্থ্য তাহার বিশেষ ভালো ছিল না—এখন শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কতবার তাহার বন্ধুরা তাহাকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়াছে, কোথাও হাওয়া খাইতে যাইতে বলিয়াছে, সে তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করে নাই। এইবার সে দীর্ঘকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবে!

মনে মনে সে বেশ বুঝিতেছিল যে, সে একটা মস্ত বই লিখিয়াছে; কিন্তু তবুও ভয় হইতেছিল এ বিশ্বাস যদি ভুল হয়! মনে আমরা খুব সূক্ষ্ম জিনিস অনুভব করি বটে কিন্তু কাগজে সেটাকে ঠিকমত ফুটাইতে পারি কৈ? হয় তো লেখক নিজে ছাড়া আর কেহ রচনার সে সূক্ষ্মভাব ধরিতেই পারিবে না! সেইজন্য কোনো নিরপেক্ষ সমালোচককে লেখাটা দেখানো প্রয়োজন! এমন একটি লোককে সে জানিত। তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—দু'এক পরিচ্ছেদ পড়ে' দেখ তো ভাই।

সমালোচক পড়িতে বসিল। সে আসিয়াছিল বেলা আড়াইটার সময়—উঠিল যখন তখন রাত বারোটা। বইখানা সে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে—এক ছত্রও বাদ যায় নাই।

গ্রন্থকার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলে? সমালোচক দাঁড়াইয়া উঠিয়া পলের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—বেশ ভাই বেশ! খুব কাজটা করলে যাহোক! এ বইএর মার নেই। চমৎকার হয়েচে!

"বাঁচা গেল! আমি তাহ'লে ঠিকই ঠাউরেছিলুম।

এ সব কথা গত কল্যকার। আজ রাত্রে সে শেষ পরিচ্ছেদে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বইখানা শেষ হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। বাহিরে গিয়া খানিকটা না বেড়াইলে আর প্রাণ বাঁচে না। সে টুপি পরিল। একবার ভাবিল পাণ্ডুলিপিখানা ডাকে পাঠাইয়া দিবে না কি? পরক্ষণে ভাবিল না কাজ নাই, কাল স্বহস্তে সেখানা প্রকাশকের হাতে দিয়া আসিবে। কাজ কি, ডাকে পাঠাইলে যদি হারাইয়া যায়।

বাহিরে আসিয়া সে হাঁটিতে লাগিল। কোথায় যাইতেছে, কতদূর আসিল, সে খেয়াল তাহার একেবারেই ছিল না। সে কেবল বুঝিতে পারিতেছিল তাহার মনের উপর হইতে একটা পাষাণভার নামিয়া গেছে। শরীর এমন হাল্কা বোধ হইতেছিল যেন সে সারারাত হাঁটিলেও ক্লান্ত হইবে না। চলিতে চলিতে এক জায়গায় দমকল ইঞ্জিনের ঘণ্টার শব্দে তাহার চমক ভাঙিল। সে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল—ইঞ্জিনের মধ্য হইতে আগুনের ফুলকি ছিটকাইয়া পড়িতেছে, গাড়ীর আরোহীদের টুপিগুলো ঝকমক করিতেছে, পথের ভিড় চকিতে দুই ধারে সরিয়া গিয়া দমকল-ইঞ্জিনের পথ করিয়া দিতেছে—এ দৃশ্যে তাহার রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। এতদিন শরীরের রক্ত যেন জল হইয়া গিয়াছিল। আবার সে চলিতে লাগিল। মিনিট পাঁচেক পরে আর একখানা ইঞ্জিন হুস্ করিয়া ছুটিয়া গেল। সে ফিরিয়া আবার দেখিল। আর দেখিল সকলে আকাশের দিকে চাহিতেছে—আকাশের একটা কোণ সোনালী আভায় মণ্ডিত।

একজন কনষ্টেবলকে সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় আগুন লেগেচে?

"আজ্ঞে, আমার বোধ হয় ক্যাম্পডেন্ হিলের দিকে কোথাও লেগে থাকবে।"

পলের মুখ শাদা হইয়া গেল। ক্যাম্প্‌ডেন্ হিলের দিকে! ক্যাম্পডেন হিল! সেইখানেই তো সে থাকে! তার বইখানা যে সেখানে রহিয়াছে! যদি...

সে মনে মনে হাসিল, আবার চলিতে লাগিল। কি অদ্ভুত কথা ভাবিতেছে সে—ক্যাম্প্‌ডেন্ হিলে তাহার বাড়ী ছাড়া তো আরো অনেক বাড়ী আছে! সে ভাবিল অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার চিত্ত বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। মনে হইল এই ব্যাপার লইয়া বেশ একটা ছোট গল্প লেখা যায়—একজন লোক দমকল ইঞ্জিনের পিছে পিছে আসিয়া দেখিল তাহার নিজের বাড়ীই পুড়িতেছে!... আর একখানা ইঞ্জিন ছুটিয়া গেল—একখানা মোটরইঞ্জিন্। চমৎকার! ঠিক যেন বিদ্যুতের মত নিমেষে অদৃশ্য হইল।

আকাশ আরো লাল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই সেই দিকে ছুটিতেছিল। তাহার মনে হইল সে কখনো বড় অগ্নিকাণ্ড দেখে নাই। দেখিতে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর! এমন সুযোগ আর না মিলিতেও পারে। আগুনের দিকে একখানা গাড়ী যাইতেছিল, তাহাতে সে লাফাইয়া উঠিল।

খানিকটা আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। সে নামিয়া পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ?

কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। ভিড় ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছিল। ভিড়ের পিছনে পিছনে সে চলিল। একজন কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় আগুন লেগেচে ?

"আজ্ঞে বার্লিংটন্ স্কোয়ার।"

"কি-ই ই ?"

"আজ্ঞে বার্লিংটন্ স্কোয়ার। শুনতে পান না না কি ?"

পলের বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল, পা দুটো কাঁপিতে লাগিল। স্কোয়ারেই যে তাহার বাড়ী! ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া সে অনেকটা অগ্রসর হইল। দমকলের ফট্ ফট্ শব্দ তাহার কানে পৌঁছিল। সেই দিক হইতে একটা লোক আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কত নম্বরের বাড়ী ?

সে কহিল—জানি না। তিন চারখানা বাড়ীতে আগুন লেগেচে। কোণের সব বাড়ী-গুলোয়।

তার বাড়ীও যে কোণের বাড়ী! সে পাগলের মত ছুটিয়া চলিল। লোকে তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। ধাক্কা দিয়া পুলীশের সারি ভাঙিয়া সে ছুটিয়া গেল। আশ্চর্য্য! একজন পুলীশের সার্জেণ্ট হাঁকিল—ফিরে আসুন মশায়। ছুটিয়া গিয়া সে তাহার হাত ধরিল।

"ছেড়ে দাও ..ছেড়ে দাও বলচি...আমার বাড়ী পুড়চে !"

"কোনটা আপনার বাড়ী ?"

"ঐ বাড়ী। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে !"

"ওখানটায় তো অগ্নিকুণ্ড। ওখানে গিয়ে কি করবেন ?"

"তোমায় কি বোঝাবো ? ওখানে বই রয়েচে ! আমার বই !"—এক ঝট্কায় হাত ছাড়াইয়া পল জ্বলন্ত বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। যাহারা আগুন নিবাইতে আসিয়াছিল তাহাদের একজন তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া গেল।

একজন কর্ম্মচারি হাঁকিল—"ফিরে এস। লোকটা উন্মাদ।"

পিছন হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল —কি হয়েচে হা ?

"ও কিছু নয়। একটা পাগলা **আগুনের** ভিতর ছুটে গেল।"

কয়েক মিনিট পরে যে 'ফায়ারম্যান' পলের পিছন পিছন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গিয়াছিল সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে তাহার কেহ নাই !

তাহাকে দেখিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল *

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* ইংরাজি হইতে

বিবাহ-সজ্জায় রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ ও রাজকুমারী ইন্দিরা

লাজাঞ্জলি

এস মুকুটের মণি! দেশ-মুখ্য রাজার দুহিতা!
এস সাধ্বী! স্বয়ম্বরা! এস বঙ্গে রাজশ্রী ইন্দিরা!
এস লাবণ্যের লতা! মনস্বিনী! গৌরবে-গম্ভীরা!
এস গো জয়শ্রী এস ভূপ জিতেন্দ্রের প্রেম জিতা!

কেশবের আশীর্ব্বাদ উদ্ভাসিছে অয়ি শুচিস্মিতা!
ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ; ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীরা
মিলিল নর্ম্মদা-ধারা; ধ্যানে ধরি' দেখিল ধ্যানীরা
দেবতার এ ইঙ্গিত;—বঙ্গে মারাঠায় কুটুম্বিতা।

স্বর্গে আজি কোলাকুলি গৌরাঙ্গে ও গুরু রামদাসে,
চণ্ডীদাসে তুকারামে কীর্ত্তিধামে অপূর্ব্ব মিতালি;
বীর-লোকে ছত্রপতি মর্য্যাদায় প্রতাপে সম্ভাষে,
বর্গীরা এনেছে অর্ঘ্য,—সম্মানিত সমস্ত বাঙালী।

বহিছে প্রসাদ বায়ু বাধাহীন চতুর্দ্দিকে শুভ;
এস মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী! বাঙালীর কুলে হও ধ্রুব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তামাকুতত্ত্বের জের

বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া প্রথম একবার টানিবার পর আবার যতবার হাত ঘুরিয়া আসে, ততই তাহা বেশী মজে। সেই হিসাবে তামাকুতত্ত্বের যতই অধিক বার আলোচনা করা যাইবে ততই তাহা মিষ্ট লাগিবে। মূলপ্রবন্ধে বলিয়াছি, অজ্ঞাতনামা ইংরাজ কবি তামাকুসেবনের একজন অধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিত্ব-শক্তির অভাব-বশতঃ সেটির অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারি নাই। আমার অক্ষমতার জন্য কৃপাপরবশ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক আমার কর্ম্ম-সহচর (Colleague) শ্রীযুক্ত

পুলিনবিহারী কর এম এ মহাশয় কবিতাটির একটি সুললিত অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পুলিন বাবু গত জুলাই মাসের বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে 'তাম্রকূট-মাহাত্ম্য' শীর্ষক কবিতা লিখিয়া তামাকুসেবীদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ধূমপানের অধ্যাত্মতত্ত্ব

(১)

আজি রসহীন বিশীর্ণ মলিন
যে ছিল যৌবনে সরস নবীন
শুষ্ক পর্ণ হায় হৃদয়ে জাগায়—
নশ্বর এ দেহ ক্ষুদ্র তৃণ-প্রায়!
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(২)

(যেন) নলিনীর দল দুর্ব্বল এ নল—
ভঙ্গুর এ দেহ বলে অবিরল
তোমার (ও) এমতি জীবনের গতি
একটি পরশে ফুরাবে নিয়তি!
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(৩)

ধূমের কুণ্ডল লক্ষি নভস্তল
উঠিবে যখন বুঝিবে সকল—
এ ধরা-বৈভব বৃথায় গৌরব
একই ফুৎকারে বিনষ্ট সে সব।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(৪)

(হেরি) নলের ভিতর ক্লেদ থরে থর
পাপে কলুষিত তোমার (ও) অন্তর
স্মরিও তখন; অনল পাবন
করিতে নির্ম্মল হয় প্রয়োজন।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

(৫)

(যবে) ভস্মে পরিণত দূরে নিক্ষেপিত
হেরি, আপনারে বলিবে নিয়ত—
এই সুকুমার দেহ, এ ধূলার,
হবে পরিণত ধূলায় আবার।
ভুলনা ভুলনা রাখিও স্মরণ
তামাকুর ধূমে বিভোর যখন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

উদ্ভিদাদির বৈদিক নাম

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের কথা শুনিতে সকলেরই আগ্রহ এবং কৌতূহল আছে জানি; কিন্তু সে ইতিহাস মনোহর আখ্যানরূপে না পাইলে অনেকেরই পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। অনেকেই ভুলিয়া যান যে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সংগ্রহ না করিলে ইতিহাস হয় না, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার বিবরণ কেহই উপন্যাসের মত মনোহর করিয়া তুলিতে পারে না। ইতিহাসের প্রতি যদি যথার্থ শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে যে সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ইতিহাসের যথার্থ ভিত্তি, সে গুলির প্রতি মনোযোগ না দিলে

চলে না। অতি প্রাচীন আর্য্যনিবাসে কি কি বৃক্ষলতাদি ছিল, সে সকল কথা জানিতে পারিলে যে প্রাচীন আর্য্যনিবাসের ভৌগোলিক স্থিতি বিষয়ক জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পাবে।

বৈদিক যুগে উদ্ভিদ জাতি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইত, যথা—(১) "বীরুধ" (plant) এবং (২) "বনস্পতি" (tree)। বীরুধবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিংবা কোন বিশেষ গুণের জন্য আদৃত হইত, তাহাদেব নাম ছিল "ওষধি"। বৃক্ষ বলিলে বীরুধ, বনস্পতি প্রভৃতি সকল শ্রেণীকেই বুঝাইত। আমাব বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় plant অর্থে "ক্ষুপ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং অন্যান্য নূতন পাবিভাষিক শব্দ সাহিত্য-পরিষৎ-সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত করিতেছেন। যোগেশ বাবুর অবলম্বিত নূতন শব্দগুলি যখন ব্যবহৃত শব্দ নহে, এবং ঐ শব্দগুলি যখন লোককে নূতন করিয়া মুখস্থ করিতে হইবে, তখন বৈদিক যুগের শ্রেণীবিভাগ অবলম্বন করিলে ক্ষতি কি?

বৃক্ষ-শরীরের বিভিন্ন অংশের যে সকল নাম পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই এখনও পর্য্যন্ত ব্যবহৃত থাকিলেও অন্যান্য অপ্রচলিত শব্দের সহিত সে গুলিরও উল্লেখ করিতেছি। শিকড়ের নাম ছিল "মূল"; stem অর্থে "কাণ্ড" শব্দ প্রচলিত ছিল, এবং "শাখা", "পর্ণ", "পুষ্প" এবং "ফল" শব্দগুলিও সে যুগে উহাদের আধুনিক অর্থেই ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এবং একালে যাহাকে "পল্লব" বলে, তাহার নাম পাওয়া যায় "বল্শ", এবং বৃক্ষের "স্কন্ধ" corona অর্থজ্ঞাপক। ফলের অন্য নাম "বৃক্ষ্য" হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বড় গাছ হউক, লতা হউক, ওষধি হউক, সকলগুলিই বৃক্ষ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল। বট প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষে বায়বীয় মূল দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল বৃক্ষের সেই মূলগুলি শাখা কিংবা মূল নামে অভিহিত হইত না, এবং উহার স্বতন্ত্র নাম ছিল "বয়া"। এই "বয়া" শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত নাই; অথচ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "বয়া" বঙ্গদেশেব কোন কোন প্রদেশে এখনও বট গাছের "ঝুরি" অর্থে ব্যবহৃত আছে। বয়া শব্দটি বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে "ব" নামেও প্রচলিত আছে।

যে শ্রেণীব উদ্ভিদ ঝোপ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ইংবাজিতে যাহাকে bush বলে, তাহাদের বৈদিক নাম ছিল "স্তম্বিনীঃ"। বাঁশ, তাল, খেজুর, কচু প্রভৃতি যে সকল গাছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি করিয়া পাতা বাহিব হইবার পর সেই পাতাটিরই খাপ বা আববণের মধ্য হইতে আর একটি পাতা বাহির হয়, কিন্তু একসঙ্গে দুইটি পাতা নির্গত হয় না, তাহাদিগের নাম ছিল "একশুঙ্গাঃ"। "এক-কটিলিডন্" বুঝাইবার পক্ষে এ শব্দটি এখন ব্যবহৃত হইতে পারে কি?

যদি একটি কাণ্ড বিভক্ত হইয়া বহু শাখায় পরিণত হইত, এবং শাখাগুলি আবাব বিভক্ত হইয়া অনেক প্রশাখার সৃষ্টি করিত তবে ঐ শ্রেণীর বৃক্ষগুলির নাম হইত "অংশুমতীঃ"। অন্য দিকে, আবার

যে গাছগুলির কাণ্ড শাখায় পরিণত না হইয়া উর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত সোজা উঠিয়া যাইত, তাহাদিগকে "কাণ্ডিনীঃ" বলিত। উদ্ভিদ বিদ্যা-বিদেরা দেখিতে পাইতেছেন যে Deliquescent এবং Excurrent শব্দদ্বয়ের অনুবাদের জন্য দুইটি চমৎকার শব্দ পাওয়া গেল। আশা করি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে এই শব্দ দুইটি নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে। "কাণ্ডিনী"র মধ্যে যে বৃক্ষগুলিতে নিম্ন হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত অনেক শাখা থাকিত, তাহাদের নাম ছিল "বিশাখাঃ"।

গাছে ফুল ফুটিলে গাছগুলিকে 'পুষ্পবতীঃ' বলিত বটে, কিন্তু যে সকল গাছে ফুল ফুটে অর্থাৎ যাহারা flowering, তাহাদের নাম ছিল "প্রসূবরীঃ"। হয় ত এখন এ অর্থে "সপুষ্পক" শব্দ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু এই শব্দটি ব্যবহৃত হইলে একটি বিশুদ্ধ শব্দের প্রচলন হয়।

ডাঁটা বাহির হইয়া যখন ডাঁটার উপর ফুল ফুটে, তখন একটি অসংবদ্ধ প্রণালীতে ফুল ফুটিলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে panicle বলে। এই panicleএর খাঁটি বৈদিক নাম "তূল"। শব্দটি এ কালের ব্যবহারে না লাগিলেও আমরা সে কালের শব্দ সম্পদ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি।

লতা অর্থে সাধারণ শব্দ ছিল "প্রতন্বতীঃ"; এবং যে লতা গাছ বাহিয়া না উঠিলে বাড়িতে পারে না, তাহার নাম ছিল 'ব্রততি' এবং যাহারা সাধারণতঃ মাটিতেই বিস্তার লাভ করে, তাহাদের নাম ছিল "অলসালা"। আমরা এখন অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের "লতা" শব্দই সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রভেদ রক্ষা করিবার জন্য climber অর্থে 'ব্রততি' এবং creeper অর্থে "অলসালা" ব্যবহৃত হইলে মন্দ হয় না। শেষোক্ত শব্দটি কঠোর মনে হইলে অর্থ রক্ষা করিয়া "অলসা" শব্দ ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি?

কাঠ বুঝাইবার জন্য "ক্রমুক", "ক্রুমুক" এবং "দারু" শব্দ পাওয়া যায়। "পর্ণ" ভিন্ন পাতার অন্য কোন নাম পাওয়া যায় না। বাকলার নাম ছিল "বল্ক",—"বল্কল" নহে। প্রাচীন প্রাকৃতে বর্ণব্যত্যয়ে "বল্ক" "বক্ল" উচ্চারিত হইত, এবং সংস্কৃত ভাষায় ঐ দুইটি শব্দের খিঁচুড়িতে "বল্কল" শব্দ হইয়াছিল। গাছের আঠা, রস প্রভৃতি সকলেরই নাম ছিল "নির্য্যাস"।

এখন বর্ণমালাক্রমে বীরুধ এবং বনস্পতি দিগের নাম দিতেছি। (১) অজশৃঙ্গী (সম্ভবতঃ বাবলা), (২) অপামার্গ (আপাঙ্গ, ঔষধে ব্যবহৃত), (৩) অমলা (আম্‌লা, আমলকী), (৪) অমূলা (গাছে ঝুলিত, শিকড় হইত না এবং শরের মুখ বিষাক্ত করিবার জন্য উহার রস ব্যবহৃত হইত বলিয়া অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে; একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই অমূলাকে Methonica Superba বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন), (৫) অরটু (Colosanthes Indica—ইহার কাঠে গাড়ির চাকার "ধূরো" প্রস্তুত হইত), (৬) অরাটকী (সম্ভবতঃ অজ শৃঙ্গী হইতে অভিন্ন), (৭) অরুন্ধতী (এই ঔষধি লতা বা ব্রততি বড় বড় গাছে

উঠিত, এবং উহা "হিরণ্যবর্ণ" ছিল, এবং উহার ডাঁটায় হুল থাকিত অর্থাৎ "লোমশবক্ষণা" ছিল বলিয়া অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত ; ইহাও লিখিত আছে যে, উহার রস গোরুকে খাওয়াইলে গোরু বেশি দুধ দিত, এবং ঐ লতা হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হইত) (৮) অর্ক (আকন্দ), (৯) অলাপু বা অলাবু (লাউ), (১০) অবকা বা শীপাল (গন্ধর্ব্বেরা নাকি ইহার শাক খাইতেন ; ইহা জলে জন্মিত। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাকে শৈবল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; কেহ কেহ ইহাকে Blyxa Octandra সংজ্ঞা দিয়াছেন), (১১) অশ্বগন্ধা (উহার অর্থ এই যে ঐ ওষধি প্রস্তরগন্ধি ; পরবর্ত্তী সময়ে ইহারই নাম হইয়াছে অশ্বগন্ধা), (১২) অশ্বত্থ, (১৩) অশ্ববার (এক শ্রেণীর নলবিশেষ), (১৪) আণ্ডীক (পদ্ম), (১৫) আদার (আমাদের আদা), (১৬) আবয়ু (অন্য নাম সর্ষপ বা সরিষা), (১৭) আল (শস্যক্ষেত্রের আগাছা), (১৮) উদুম্বর (ডুমুর), (১৯) উর্বারু (শসা), (২০) উশনা (শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, সোমলতা না পাইলে উহা হইতে সোমরস বাহির করা হইত), (২১) এরণ্ড (খাঁটি বেদে উল্লেখ নাই ; অনেক পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই নামটি পাওয়া যায়), (২২) ঔক্ষগন্ধি —ষাঁড়ের গায়ের গন্ধবিশিষ্ট অর্থ হইলেও কোন সুগন্ধি ওষধিবিশেষ ; ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(২৩) কিয়াম্বু (কি প্রকারের শাক, তাহা জানা যায় না ; তবে যেখানে শব-দাহ হইত, সেখানে জলের মধ্যে লাগাইবার নিয়ম ছিল ; মৃতের সৎকারের ইহাও একটি অঙ্গ ছিল যে, কিয়াম্বু এবং (২৪) পাকদূর্ব্বা শ্মশানে লাগাইতে হইত ; (পাকদূর্ব্বা এ কালের জোয়ার), (২৫) কুমুদ, (২৬) কুষ্ঠ (ইহার আর এক নাম বিশ্বভেষজ, অর্থাৎ ইহা প্রায় সকল রোগেরই ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত ; এই বীরুধ হিমালয়ের উপরে পাওয়া যাইত, লেখা আছে), (২৭) জঙ্গিড় (ইহাকে Terminatia Arjuncya বলিয়া কেহ কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন)।

(২৮) কর্কন্ধু (কেহ কেহ ইহাকে রক্তবর্ণ বদর বা কুল বলিতে চাহেন ; কিন্তু আমার মনে হয় যে ইহা লাল কুমড়া ; ওড়িয়াতে কুমড়াকে "কখারু" বলে, এবং হয়-ত বা পূর্ব্বে ছাঁচি কুমড়াকে কর্কন্ধু বা কধু বলিত বলিয়াই লাউ ঐ "কধু" নামে আখ্যাত হয়), (২৯) কাকম্বীর (কি বৃক্ষ, জানা যায় না)।

তৃণ এবং নলবর্গে কুশ, কাশ প্রভৃতি ব্যতীত (৩০) "কুশর" নামে একটি বড় নল-তৃণ উল্লিখিত দেখিতে পাই। এক সময়ে আকৃকে অনেক স্থানে নলের মত তৃণ বলিয়া "কুশর" বলা হইত। এই বৈদিক কুশর শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত নাই ; অথচ একদিকে সম্বলপুরে এবং অন্যদিকে যশোহরে, পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে "কুশারি" এবং "কুশর" শব্দ আকৃ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩১) কিংশুক, (৩২) খদির এবং (৩৩) খর্জ্জূর সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, তবে "খর্জ্জূর-"এর দীর্ঘ-উকারটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। (৩৪) তিল আমাদের পরিচিত ; কিন্তু (৩৫) তিল্বক কি, তাহা জানি না। একজন পণ্ডিত উহাকে Symplocos Racimosa বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ঠিক্

বলিয়া মনে হইতেছে না। (৩৬) তৌদী এবং (৩৭) ত্রায়মাণ কি, তাহা জানা যায় না। (৩৮) নারাচী বলিয়া যে বিষাক্ত ওষধির নাম জানা যায়, শরে উহার প্রয়োগ হইত বলিয়াই হয়ত "নারাচ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (৩৯) পাটা—এক প্রকারের জলজ শৈবল বলিয়া মনে হয়। এখনও ঐ নামে শৈবল বা শৈবাল চিনি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৪০) পূতীক আমাদের পুঁই।

(৪১) ন্যগ্রোধ আমাদের বটগাছ; (৪২) পলাশও আমাদিগের পরিচিত। বেদে যে (৪৩) পিপ্পল শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ক্ষুদ্র ফল—পিপুল নহে। (৪৪) পীতুদারু অথবা পূতুদ্রু হিমালয় জাত সরল বৃক্ষ বা দেবদারু। (৪৫) প্লক্ষ হইল পাকুড়, (৪৬ ও ৪৭) বদর এবং বিল্ব আমাদের পরিচিত। (৪৮) প্রস্ কোন বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয় না। সায়ণের টীকার অর্থ ধরিলে চারা গাছ বা তেউড় প্রভৃতি অর্থ হয়। ইংরাজি shoot কথাটিকে ওড়িয়ায় "গজা" বলিতে পারা যায়; বাঙ্গলায় কি বলিব?

(৪৯) বজ সম্ভবতঃ আমাদের এ কালের বচ; (৫০) বিম্ব ঠিক্ তেলাকুচ বা তিক্তকুচ বটে, এবং অথর্ব্ব বেদের (৫১) ভঙ্গ ঠিক্ নেশা করিবার ভাঙ্গ্।

(৫২) মঞ্জিষ্ঠা কি, তাহা আমরা জানি। (৫৩) মহুঘ (মধুঘ নহে) কোন মদ্য উৎপাদক বৃক্ষের নাম ছিল। (৫৪) বিষাঙ্গা কি প্রকার বিষাক্ত গাছ, তাহা জানা যায় না।

(৫৫) শন আমাদের শণ বা hemp; কিন্তু (৫৬) শফক কি, তাহা ধরিতে পারা গেল না। (৫৭) শালুক ঠিক পদ্মের গাছের অঙ্কুর বা তেউড়।

(৫৮) শমী বৃক্ষের নাম বেদে যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন পণ্ডিত-নির্দ্দিষ্ট Mimosa Suma বলিয়া উহাকে বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে যে উহার পাতা চওড়া, এবং নির্য্যাস পান করিলে নেশা হয়। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে আছে যে, উহার রস মাখিলে শরীরের কেশ-বহুল স্থান সম্পূর্ণরূপে কেশশূন্য হয়। এই গাছের ডালেই অর্জ্জুন তাঁহার গাণ্ডীব ঝুলাইয়া ছিলেন।

(৫৯) শল্মলি (শাল্মলী নহে) বা শিম্বল ঠিক্ আমাদের "শিমূল" বটে। প্রথম নামটিতে অতিরিক্ত আ-কার যোগ হইয়া সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, এবং দ্বিতীয় নামটি হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের "শিমূল" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

বৈদিক যুগে যে সকল বৃক্ষের সহিত পরিচয় ছিল, তাহাদের সকলগুলির নামই হয়ত এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে পারিয়াছি। হয়-ত আরও দুই দশটি নাম পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেগুলির পরিচয় বড় সহজ হইবে মনে হয় না। (৬০) সোমলতার নাম সকলেই শুনিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে উহার নাম উল্লেখ করি নাই; কিন্তু উহা যে কি প্রকারের বীরুধ ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারেন নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কমলমণি

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

সমালোচনা

বৈজ্ঞানিকী।

শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

জগদানন্দ বাবু বঙ্গভাষার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। সম্প্রতি তিনি তাঁহার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিকী নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের বিষয়ও নানাবিধ,—যথা দেহশত্রু ও দেহমিত্র, বংশের উন্নতি বিধান, জৈব রসায়নের উন্নতি, আধুনিক ভূতত্ব, সৌরকলঙ্ক, আলোকের চাপ ইত্যাদি।

পাঠক দেখিতেছেন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীবতত্ব সমাজতত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখার আলোচনা করা হইয়াছে। কাজেই একটা দোষ দাঁড়াইয়াছে এই যে কোনও বিষয়ই ভাল করিয়া, বিস্তারিত ভাবে, বলা হয় নাই। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে লেখক তাঁহার প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ভাষার সাহায্যে অবৈজ্ঞানিক পাঠকের মনে বিজ্ঞানের কয়েকটী চিন্তাপ্রণালীর আভাস দিতে সক্ষম হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় রীতিমত বিজ্ঞানালোচনা আরম্ভ না হয় ততদিন আমাদের এইরূপ মোটামুটি রকমের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আর একটা দোষ দেখিতেছি লেখক স্থানে স্থানে বিজ্ঞানের অতি দুরূহ সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। যেমন আলোকের চাপ। আমরা একজন পদার্থবিদ্যার এম, এস সি, ক্লাসের ছাত্রকে প্রশ্ন করিয়া দেখিলাম সেও এ বিষয়ে ভাল বুঝে না। কাজেই অবৈজ্ঞানিক পাঠক যে ইহার কি বুঝিবেন তাহা বলিতে পারি না।

দুই একটী ত্রুটিও আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে—আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি দূরীকৃত হইবে। Electrolytic Dissociationএর কথায় লেখক কেবল Clausius সাহেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Clausius এই সিদ্ধান্তটীর সূত্রপাত করিয়াছিলেন মাত্র, স্কাণ্ডিনেভিয়াবাসী পণ্ডিত এর্হিনিয়সই (Arrhinius) প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেইরূপ বংশের উন্নতিবিধান বিষয়ে লিখিবার সময় কেবল মেণ্ডেলের নাম করিয়াছেন কিন্তু এই বিজ্ঞানের পিতৃস্থানীয় পণ্ডিত গ্যাল্টনের নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

যে কয়টী প্রবন্ধ আছে তন্মধ্যে বংশের উন্নতিবিধান নামক প্রবন্ধটীই আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কেন না অন্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু সে জ্ঞান তাঁহার সাধারণ জীবনযাত্রার বিশেষ কোনও সহায়তা করিতে পারিবে না। অপরদিকে বংশের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তগুলি জানা থাকিলে বিবাহে পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইবে। আরও বোধ হয় ইউরোপ অপেক্ষা আমাদের দেশেই বিজ্ঞানের এই শাখাটীর আলোচনা করিবার অধিকতর সুযোগ আছে কেননা এদেশে যেরূপ কুলগ্রন্থ সমূহে বংশ-বিবরণ পাওয়া যায় ইউরোপে সেরূপ পাওয়া কঠিন। এইজন্য মনে হয় লেখক এই বিষয়টী আরও একটু বিশদ ভাবে বিবৃত করিলে ভাল করিতেন।

এই প্রবন্ধের অন্তর্গত একটা কথায় লেখকের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। যে সকল ব্যক্তি এই পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক উন্নতি বিধান করিতে চেষ্টা করিতেছেন লেখক তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলেন ইহাতে নরনারীকে পশুবৎ পালন করা হইবে। কিন্তু ধীর ভাবে সমুদায় Eugenics শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে এমন মনে হয় না যে তদ্দ্বারা দাম্পত্য প্রেমের কোনও ক্ষতি হইবে। বস্তুতঃ আমি একটী প্রবন্ধে দেখইতে চেষ্টা করিয়াছি যে মনুপ্রচারিত বিবাহ-ব্যবস্থা মূলতঃ Eugenicsএর উপরই প্রতিষ্ঠিত। (১)

(১) See my articles on Hindu Eugenics In Hindu Review, May and June 1913.

এই কথার প্রসঙ্গে জগদানন্দ বাবু একটা কড়া কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "প্রকৃতি যাহাকে নিজের হাতে মূর্ত্তিমান্ করেন, বৈজ্ঞানিক শিল্পীর যন্ত্রের স্পর্শে তাহা কুশ্রী ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়।" (২৩পৃ) এরূপ একটা কথা একজন কবি বলিতে পারেন কিন্তু জগদানন্দ বাবুর ন্যায় একজন বৈজ্ঞানিক শিল্পীর নিকট এরূপ কথা শুনিবার আমরা আশা করি নাই। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়াই ত মানুষ বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতির উপর নিজের প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াই ত মনুষ্য আজ এত শক্তিমান্ ও সুসভ্য। বিজ্ঞান প্রকৃতিবিজয় কার্য্যে মানুষকে সাহায্য করে বলিয়াই ত তাহার এত আদর। বিবাহাদি সামাজিক বিধিব্যবস্থা কোনটীই প্রাকৃতিক নিয়ম নহে, সকলগুলিই মানুষ নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রণয়ন করিয়াছে। আর এই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লিখিলেই তাহার নাম হইল বিজ্ঞান। তবে আমি এমন কথা বলিতেছি না যে বিজ্ঞানে কোনও ভ্রান্তি নাই; সকলেই জানে মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। তাই বলিয়া যেটুকু জ্ঞান আমাদের আছে তাহারও ব্যবহার করিব না। নির্ম্মম অন্ধ প্রকৃতির হস্তে অসহায় বালকের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিব। যিনি করেন করুন, আমি ত পারিব না।

এ পর্য্যন্ত আমার বিবেচনায় যাহা দোষ তাহার উল্লেখ করিলাম কিন্তু পুস্তকখানি এমনি সারবান্ ও মনোরম হইয়াছে যে গুণের তুলনায় দোষগুলি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায়। যাঁহারা বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানালোচনা দেখিতে চান তাঁহারা সকলেই জগদানন্দ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিবেন সন্দেহ নাই। পাঠক, পূজার বাজারে যখন দুই চারিখানা বাংলা পুস্তক ক্রয় করিবেন তখন একখান বৈজ্ঞানিকীও লইবেন এই অনুরোধ করি। ইহাতে একাধারে আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রেসিডেন্সি কলেজ

বন্দী

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল প্রণীত; কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি জগতের শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিক ভিক্তর হুগোর গ্রন্থ-বিশেষ অবলম্বনে রচিত। "বঙ্গসাহিত্যে এরূপ রচনা নূতন" কি না, সে সংবাদ রাখি না; তবে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রত্যেক সাহিত্যসেবী যে বিমল আনন্দ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বন্দী" বলিলে—আদি গ্রন্থের "Under Sentence of Death" এর গাম্ভীর্য্য থাকে না; মৃত্যুর ভীষণতা এবং সেই মৃত্যু প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাত্র—এই ভাবের ছায়া "বন্দী" শব্দ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে না! তবে "বন্দী" এই শ্রুতি-মধুর ধ্বনিতে একটা করুণ সুর কাঁদিয়া উঠে, এবং তাহা সহজেই প্রাণে গলিয়া মিলিয়া, মিশিয়া যায়!

রচনাটির বিশেষত্ব :—ইহাতে উপন্যাসের বাহ্যিক সৌষ্ঠবাদির একান্ত অভাব, অথচ অন্তর্গূঢ় রস ও ভাবের উপাদানে নিতান্তই উপন্যাস! ইতস্ততঃ নাটকত্বের আভাস এমন করুণ ও সুকুমার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাতে শিল্পীর চমৎকারিত্বের কল্পনা একেবারে পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

জীবন্ত নায়ক-নায়িকা ইহাতে অভিনয় করে নাই; প্রেম ও অপ্রেমের জটিল গ্রন্থি-মোচনের চেষ্টারও একান্ত অভাব; অথচ ইহার মধ্যে প্রেম, প্রীতি, করুণা ও মনুষ্যত্ব; হত্যা, অবিশ্বাস, কর্ত্তব্য-চ্যুতি ও শাঠ্য বিনা-আড়ম্বরে দেখা দিয়া গিয়াছে;—প্রতি দিনের পথ চলিতে তাহাদের সহিত যেমন দেখা হয় তেমনি বিশেষ করিয়া, গায়ে-পড়িয়া, কোন ভূমিকার মধ্যে, কেহ বিলম্বিত অভিনয়ে পাঠকের চিত্তটিকে ধৈর্য্য চ্যুতির সীমায় টানিয়া লইয়া যায় নাই! প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যুক্তি বা পৌনঃপুনিক উচ্ছ্বাস নাই;—উৎকৃষ্ট রচনার ইহাই লক্ষণ।

উপন্যাস! অথচ পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি নাই! তবে দেখা যাক, উপন্যাস-নাটক জিনিসটার মূল কি?

না, মানুষের বুক চিরিয়া দেখানো—যেমন ভিষকের শল্য, চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে জীব-দেহের ক্রিয়ার ইতিহাস আবিষ্কার করে, ঔপন্যাসিকের লেখনী মানব-হৃদয়ে ক্রিয়ার উৎপত্তি, পরিণতি ও লয়ের মধ্য দিয়া বাধাহীন ধারাটির অনুসরণ-কাহিনী লিখিয়া যায়! কোন কোন উপন্যাসে আরো একটু "ফাউ" পাওয়া যায়। সেটা আর-কিছু নয়;—কি-হইতে-পারিত, কি-হওয়া-উচিত ছিলর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত; একটা কিছু-প্রকাশ—কিছু-অপ্রকাশ আভাষ। কেহ কেহ মনে করেন সেটা একেবারে বাহুল্য নয়। আবার কেহ তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না।

ইহাতে সংযমের গণ্ডীর মধ্যে লালিত ও বিকশিত হইতে পারে নাই, এমন একটী তরুণ যৌবনের ইতিহাস; করুণ আখ্যায়িকা অসঙ্কোচে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চলিতে-চলিতে-হঠাৎ-বাধা-পড়ায়-জীবনের আক্ষেপময় অসমাপ্ত কাহিনী ইহাতে কাব্যরসের মধু আহরণ করিয়া দিয়াছে। অভিযুক্ত আসামীর কাঠ-গড়ার বেষ্টনীর মধ্য হইতে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর ফাঁসি-কাঠে যাইবার পথের সকল কথাই বলা আছে;—কিন্তু বলা হয় নাই ত সেই গোপনতম-গোপন একটী কথা—আত্মাপরাধ-স্বীকার। সে কথাটী বলিতে-বলিতে বলা হয় নাই। সহস্র আঘাত-উত্যক্ত একটী ক্ষুদ্র প্রাণের ভিতর এই যে অবিরাম সংগ্রামের ত্বরিত ছবি -ইহাই না নাটক?

কেন এমন হয়;—কেন সে স্বীকার করিতে চায় না? তরুণ যৌবন বসন্তের উদার আলোক ও বাতাসে স্বচ্ছন্দ মুকুলিত পুষ্পের মত। সে নিজে সুন্দর: সুন্দর তাহার চোখে চারিদিক সুন্দর। তাহার অজ্ঞাতে, কখন এক কীট তাহার মর্ম্মস্থল কাটিয়া ফেলে,—সহসা জাগিয়া দেখে যে অসীম-আশা-ভরা তাহার জীবন, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন সেই কীটের প্রতি তাহার ক্রোধ হয় না, বিদ্বেষ হয় না। ধূর্জ্জটির মহাক্রোধের মত, উদ্বেল হইয়া উঠে শুধু ঘৃণা ও করুণা। সেই উচ্ছ্বসিত-ঘৃণার আতিশয্যে চিরসুন্দর পৃথিবী এক নিমেষে তাহার নিকট তিক্ত, শ্রীহীন হইয়া যায়! বিশ্বকে যেন তাহার বিদ্রোহী মনে হয়! সেই বিদ্রোহী চারিপাশের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে, তাহার অন্তরাত্মা আত্মাভিমানের দুর্গে আশ্রয় লয়। চারিধারে বিপুল-এত—আর সে অসীম একেলা—এই ভাবনা তাহার চিত্তকে কিছুতেই হার মানিতে দেয় না—সে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না সে দোষী।—মহাকবি এই ভাবটী কেমন নৈপুণ্যের সহিত আভাষে ফুটাইয়া গিয়াছেন। বন্দীর চক্ষে আদালত রহস্য মাত্র, বিচারক কর্ত্তব্য-জ্ঞানমূঢ়। এমন কি তাহার কন্যার নিকটও সে কথা বলিতে পারিল না। প্রাণ-দণ্ড-গ্রহণ-উদ্যত পিতার সহিত তাহার কন্যার শেষ মিলন, এই ঘটনা-সংস্থাপনে মহাকবি কতখানি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সেই সত্য,—অপরাধীর নিকট হইতে জগৎ সরিয়া যায়,—কেমন ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন। নাটক, কাব্য ও উপন্যাস গুঁড়া করিয়া, গুলিয়া কি উপাদেয় সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রাণের মায়া। সে যে মানুষের সহজাত বন্ধু। কোন্ প্রণয়ী তাহার আকর্ষণ তুচ্ছ করিতে পারে? শেষ মুহূর্ত্ত অবধি সে বলিতে কাতর হয়, "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" বিশেষতঃ, যে হৃদয় সহসা-খণ্ডিত, অতৃপ্তির নেশায় সে কখনো সত্যের আলোকের সন্ধান করিতে পারে না—গ্রন্থখানিতে এই সত্য পরম রমণীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহারই সৌন্দর্য্যে অবগাহন করিতে ছিলাম। সমালোচনা করি নাই। অনুবাদে সৌরীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব কত দূর—সেটুকু বলা প্রয়োজন। সৌরীন্দ্রবাবুর রচনা সাধারণতঃ সুললিত, ভাষা মনোহর। ভাষার মধ্যে ভাব কোথাও কুয়াশাচ্ছন্ন হয় না; চাতকের মত একেবারে মেঘলোকে অন্তর্দ্ধান হইয়া যায় না। বরাবর পাঠকের চিত্তটিকে হাত-ধরিয়া লইয়া যায়! অথচ তাঁহার চিন্তা ইংরাজি ভাবে পরিপুষ্ট। পদ-বিন্যাস সুন্দর উপভোগ্য। শব্দ-চয়নেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাই। তাঁহার বর্ণনা-কৌশল ও বাক্‌ভঙ্গী সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। তেজস্বিতার সহিত যুক্তপ্রাণতা ভাবের সহিত ভাষার স্বাভাবিক: মিলন তাঁহার রচনাটিকে চিরদিনই সুন্দর

হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলে। রচনার গুণে এখানিকে কোথাও অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রন্থখানি সাহিত্য-সেবীর বিমল আনন্দের আয়োজন করিবে—কারণ ইহাতে সনাতন সত্যের ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে। সে ছবি পুনঃপুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না—উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের ইহাই লক্ষণ। বর্ষাধৌত বনভূমির সবুজ-শ্যাম রূপটী সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের বর্ণ-চাতুরী; পূর্ণিমা চাঁদের মাধুরী স্বপ্নের মত সৎসাহিত্য চির-সুন্দর, চির-নূতন।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পিতা মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ *

পিতা মাতার প্রকৃতির সহিত সন্তানের প্রকৃতির যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। "বাপ্‌কা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ নেই ত থোড়া থোড়া।" অর্থাৎ সম্পূর্ণ না পাইলেও পিতার প্রকৃতি যে পুত্র আংশিক পরিমাণেও লাভ করে ইহা প্রবাদবাক্য। মনুষ্যের সন্তান কখন ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে কি? উদ্ভিদ জগতেও এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে; আমগাছে আমই ফলিয়া থাকে, কখন আম্‌ড়া ফলে না। জীবরাজ্যেরও এই নিয়ম। জন্মান্ধ পিতামাতার সন্তান জন্মান্ধই হইয়া থাকে কিন্তু কোন দৈবদুর্ঘটনা-প্রযুক্ত অন্ধ হইলে ঐ ব্যক্তির সন্তান অন্ধ হয় না। যুদ্ধাদিতে বিকলাঙ্গ সৈনিকের সন্তানকে পিতার অনুরূপ বিকলাঙ্গ হইতে দেখা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পিতামাতার কিরূপ প্রকৃতি সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে? উহার বৈজ্ঞানিক কারণই বা কি?

জীব ও উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর বাসস্থান জলবায়ু প্রভৃতি পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। একই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ ও নিম্ন বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করায় এক্ষণে সম্পূর্ণ ভিন্ন-জাতিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। নেপালীর সহিত বাঙ্গালীর শরীরের তুলনাই হয় না। এমন কি পশ্চিমদেশবাসী অনেক দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, মিশ্র এবং রাজপুত বাঙ্গলার ডাল-ভাত ও জল-হাওয়ার প্রভাবে পূর্ণমাত্রায় বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। উপাধির উল্লেখ না করিলে উঁহাদিগকে পশ্চিমদেশবাসী বলিয়া অনুমান করা যায় না। দধি, দুগ্ধ ও মৎস্যের মাত্রা অত্যন্ত কম হওয়ায় বাঙ্গালা জাতি ক্রমে হীনবীর্য্য ও ক্ষুদ্রকায় হইতেছে; পিতা বা পিতামহের সহিত তুলনা করিলে সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারিবেন। মনুষ্যের ন্যায় গবাদি পশুদেরও অপকৃষ্ট খাদ্যের দোষে ক্রমে অবনতি হইতেছে! উদ্ভিদ সমাজেও এই নিয়মের অন্যথা দেখা যায় না। যত্নপালিত গোলাপের সহিত বন্য গোলাপের তুলনা হয় না। সিলেটের কমলা বাঙ্গলায় গোঁড়ালেবু এবং কাবুলী বেদানা বাঙ্গলায় টক ডালিমে পরি-বর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং খাদ্য ও জল

* ১৯১২ মার্চ্চ নাইনটিন্থ সেন্‌চুরী হইতে

হাওয়ার পরিবর্ত্তনের সহিত জীব ও উদ্ভিদ দেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির এরূপ ক্রমোন্নতি বা পরিণতিকে বিবর্ত্তন (evolution) বলা হয়। এই বিবর্ত্তন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাকস্থলী, যকৃৎ প্লীহাদি দেহ-যন্ত্রের শারীর কার্য্যের (physiological action) ফল মাত্র।

পারিপার্শ্বিকের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য Virie নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত চিংড়ী জাতীয় কতকগুলি মাছকে ফাঁকা পুষ্করিণী ও নদী হইতে লইয়া পারী (Paris) নগরীর গাঢ় অন্ধকারময় যন্ত্রাগারে রক্ষা করেন। আলোকহীন স্থানে কয়েকমাস বাস করায়, পরিচালনার অভাবে উহাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ঘ্রাণ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকলের দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে জলাঙ্গী নদীর স্রোতহীন (বদ্ধজলে) জলে শৈবাল পরিবৃত হইয়া থাকায় একটি ইলিশমাছের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে প্রথমে উহাকে ইলিশমাছ বলিয়া চিনিতে পারা যায় নাই। বর্ষার স্রোতের সহিত আসিয়া উহা পরে আর গঙ্গা বা পদ্মানদীতে ফিরিয়া যাইতে পারে না বলিয়াই হয়ত আবদ্ধজলে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল ও শৈবালের রং পাইয়াছিল। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। গ্রীষ্মদেশীয় আম, জাম, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ, পার্ব্বত্য বা শীতপ্রধান দেশে নীত হইলে তত্রত্য বৃক্ষাদির গুণপ্রাপ্ত হয়। স্বভাবের প্রভাবে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে এইরূপেই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এইরূপ পরিবর্ত্তন কি সন্তানে স্থায়ীভাবে সংক্রামিত হইতে পারে? আর হইলেও ঐ সকল নূতন গুণ পূর্ব্ব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কতদিন স্থায়ী হইয়া থাকে? পূর্ব্বোক্ত টক গোঁড়ালেবু শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলে তদুৎপন্ন বৃক্ষের ফল পূর্ব্বপুরুষের সুমিষ্টভাব কি পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারে? এইরূপ পূর্ব্বোক্ত অন্ধ চিংড়ি বা কৃষ্ণকায় ইলিশের সন্তানগণ পৈতৃক আলোকময় বাসস্থানে পুনরায় স্থাপিত হইলে পূর্ব্বপুরুষের দৃষ্টিশক্তি বা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ফিরিয়া পাইতে পারে কি?

দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষার ফল এ বিষয়ে সম্যক পরিস্ফুট নহে! নূতন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে কোন জীব বা উদ্ভিদের পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি ও গুণাবলী সন্তানে স্থায়ীভাবে সংক্রমিত হইলে বিবর্ত্তনবাদ অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য হইয়া যায়। আংশিক পরিবর্ত্তন (voriation) বিবর্ত্তনের প্রথম-স্তর হইয়া উঠে। যাহারা নূতন অবস্থানের সহিত সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র মিল করিয়া লইতে না পাবে, তাহারা জীবন সংগ্রামে ক্রমে পশ্চাদ্‌পদ হইতে থাকে ও পরিশেষে বিলোপ পাইতে বাধ্য হয়; কারণ সংসারে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ও অযোগ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারবিন এবং তাঁহার সমসাময়িক হার্ব্বার্ট স্পেন্সর হক্সলি প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে জীব ও উদ্ভিদের শারীর যন্ত্রের আভ্যন্তরিক বিশেষ পরিবর্ত্তন উহাদের সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে। ডারবিনের মৃত্যুর পর

কীটতত্ত্ববিদ্ A. Weisman এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি ১৫টা ইন্দুরের ২২ পুরুষ ধরিয়া লেজ কাটিয়া দেন কিন্তু তাহাতেও লেজের আকৃতি ছোট হয় নাই বা উহার লোপ হয় নাই। Cope, Rosenthal এবং Ritzema নামক পণ্ডিতগণ এরূপ পরীক্ষা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে কোন এক অঙ্গের বাহ্যিক হানি বা বিনাশ সন্তানে সংক্রমিত হয় না। কিন্তু এ বিষয়টি যে ডারবিনের অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। তিনি জানিতেন যে ভেড়ার লেজ বা কুকুরের কাণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া কাটিয়া দিলেও শাবক কাণ হীন হয় না। সেইজন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে কয়েক পুরুষ ধরিয়া অঙ্গ-বিশেষের আংশিক বিলোপ হইলেও যদি ঐ সময়ে পীড়া দেখা না দেয় তবে বিলুপ্ত অঙ্গ সন্তানে দেখা দিয়া থাকে। এইরূপ বিলুপ্ত না হইবার অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে অধ্যাপক Nussbaum বলেন যে ভ্রূণের এইরূপ ক্ষমতা আছে যে বিলুপ্ত অংশটিকে সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র মেরামত (regenerate) করিয়া লইতে পারে। অধ্যাপক Brown-Sequard গিনি-শূককের মেরুদণ্ড আহত করিয়া দেখেন যে আহত শূকরের সংন্যাস রোগ দেখা দেয় এবং ঐ রোগ শূকর ছানাতে সংক্রমিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে কোনরূপ সংক্রামক বীজাণুর সম্পর্ক ছিল না। অনুরূপে অস্ত্র করিলে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংন্যাস রোগ সন্তানে সংক্রমিত হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে কোন কোন প্রকারের ক্ষত বা আঘাতের ফল সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

অতএব এইরূপ একটা মতবাদের (theory) আবশ্যক যাহা দ্বারা সন্তানে বংশগত গুণাবলীর প্রকাশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে নূতন ভাবের আবির্ভাব উভয়েরই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদ দেখা যায়—একটি ডারবিনের অপরটি Weisman এর। ডারবিন বলেন জীব ও উদ্ভিদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টিমাত্র। এই সমুদায় কোষ হইতে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব অংশ পরিত্যক্ত হয়। উহাদিগকে তিনি কোরকাণু (gemmule) নামে অভিহিত করেন। এই সমস্ত কোরকাণু আবার সময়ে পুষ্ট ও বিভক্ত হইয়া জনন-ক্ষম মাতৃকোষ (mother-cell) উৎপন্ন করিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হাওয়ায় কোরকাণু সমূহ জীব ও উদ্ভিদের সমুদায় অঙ্গে চলিয়া বেড়াইতে পারে। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কোষের আবরণ ভেদ করিয়া অবশেষে উৎপাদক কোষ (reproductive calls) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইজন্যই জীব ও উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের কোষ সমূহের প্রতিনিধি স্বরূপ কোরকাণু সকল উৎপাদক কোষে সংগৃহীত হইতে পারে;—প্রতি যন্ত্র, প্রত্যেক টিসু, অস্থি, পেশী শিরা, ধমনী ইত্যাদি সকলেরই প্রতিনিধি স্বরূপ কোরকাণু উৎপাদক কোষে সমুপস্থিত হয় এবং যখন সন্তান উৎপাদনের সময় উপস্থিত হয় তখন ঐ সকল কোষ কোরকাণু প্রেরণ করে। কাজেই সর্ব্ববিধ কোরকাণুর সমবায়ে উৎপন্ন সন্তান বংশগত

আকৃতি ও প্রকৃতি পাইয়া থাকে। সেই সঙ্গে পিতামাতার উপার্জ্জিত বা অন্যরূপে সংগৃহীত গুণাবলীও প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই রজকের ভারবাহী কোন একটি গর্দ্দভের বাচ্ছা বংশগত আকৃতি ও পিতামাতার ভারবহন ক্ষমতা পাইয়া থাকে; দুগ্ধবতী গাভীর বৎস্য উত্তরকালে মাতার ন্যায় দুগ্ধবতী হইতে পারে। এই কারণেই মাতালের ঔরসে মাতাল ও যক্ষ্মাকাশাদি রোগীর সন্তান পৈতৃক-রোগ ভোগ করিয়া থাকে।

ডারবিনের এই প্রতিনিধিমূলক মতবাদ (Pangenesis Hypothesis) দ্বারা জাতিগত আকৃতি ও বংশগত পৈতৃক উপার্জ্জিত গুণ এবং প্রকৃতি কিরূপে সন্তানে সংক্রমিত হয় তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায় বটে কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কিরূপে কোরকাণু সমূহ এক কোষে উৎপন্ন হইয়া উৎপাদক কোষে গমন করে? উপযুক্ত অনুপাতে যাওয়ারই বা কারণ কি? আর পরে যখন বীজটি বৃদ্ধি পাইয়া ভ্রূণে পরিণত হয় তখন কোরকাণু গুলি কি পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য করে—না একসঙ্গে কার্য্য করিয়া থাকে? ডারবিনের এই প্রতিনিধি-মূলক মতবাদ সকলে স্বীকার করেন নাই। অনেকেই weisman এর মতবাদ অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব ও উদ্ভিদের দেহ কতকগুলি কোষের সমষ্টিমাত্র। উহাদিগকে দেহকোষ বলা যায়। উহাদের কতকগুলি একত্র হইয়া সূত্রাকারে পরিণত হয় ও বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপে দলবদ্ধ কোষসমূহকে টিস্যু বলে। Weisman বলেন পিতামাতা হইতে জীব ও উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় উহা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ঘটে না, ভিতর হইতেই উদ্ভূত হয়—শারীরযন্ত্র সমূহই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। বীজকোষ (germ-cell) যাহা হইতে জীবের জন্ম হইয়া থাকে, উহা টিস্যু বা দেহ-কোষ হইতে উৎপন্ন হয় না। একটি মাত্র কোষবিশিষ্ট অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ হইতে পুরুষপরম্পরায় জীব উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা 'নিত্য' (immortal) পদার্থ—দেশকালাদি বাহ্যিক কারণের প্রভাবে উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হইয়া জীব আপনাপন সন্তানের জন্য উহাকে যকৃতাদি যন্ত্র, টিস্যু ও দেহকোষ সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থায় রক্ষা করে এবং যথাকালে পুত্রকন্যাকে অবিকৃত অবস্থায় দান করিয়া থাকে।

বীজপঙ্কের গঠন সম্বন্ধেও Weisman এর মত ডারবিনের মত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহার মতে বীজপঙ্ক কোরকাণুর সমষ্টি নহে এবং কোরকাণু বিভক্ত হইয়া কোষও সৃষ্টি করে না। উহার রাসায়নিক এরূপ স্বতঃপ্রবৃত্তি থাকে যাহার ফলে উহা বিশেষ বিশেষ কোষ, টিস্যু ও যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে। বীজ যখন পুষ্ট হইয়া ভ্রূণরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করে তখন উহার উপাদানের প্রকৃতির তারতম্যানুসারে টিস্যু ও হস্তপদাদির গঠন নিয়মিত হইয়া থাকে;—কতকগুলি কোষ টিস্যু প্রস্তুত করে, কতক গুলি হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত

করে। শুধু ইহাই নহে কতকগুলি কোষ বামহস্ত, অপর কতকগুলি দক্ষিণহস্ত, আবার আর কতকগুলি সময়ানুসারে অঙ্গুলি, চুল, নখ ইত্যাদি প্রস্তুত করে। সাধারণ সৈনিকেরা কাপ্তেনের আদেশ অনুসারে যেমন কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা আপনাপন কার্য্যে নিয়োজিত হয় সেইরূপ বীজের উপাদানের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে কোষগুলি যথা সময়ে হস্তপদ, অঙ্গুলি এবং অন্যান্য অঙ্গ গঠন করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে Weismanএর মতে সাধারণ কোষ ও বীজকোষ সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ, বীজপঙ্ক বীজকোষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, অন্যত্র উহাকে দেখা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বীজপঙ্ক প্রত্যেক কোষের কেন্দ্রস্থলে (nucleus) বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত থাকে সুতরাং সাধারণ দেহ-কোষের ন্যায় বীজকোষ যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে রূপান্তরিত হইতে পারে না তাহা কিরূপে অনুমান করা যায়? Manspas ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রত্যেক জনন-কোষের কেন্দ্র-পঙ্ককে(nucleoplasm) উহার চতুঃপার্শ্বস্থ কোষপঙ্ক সন্তানোৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। যে সময় প্রাণ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে সেই সময় কেন্দ্রপঙ্ক ও কোষপঙ্কের মধ্যে ঘন ঘন আদান প্রদান কার্য্য চলিয়া থাকে। কেন্দ্রপঙ্কের আচরণ এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না। আমরাও যখন নিশ্বাস-গ্রহণ করি তখন বায়ুস্থ অক্সিজেন (অম্লজান) নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধমণীসমূহের গাত্র-ভেদ করতঃ রক্তের সহিত মিলিত হয় ও দূষিতরক্তের অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid) গ্যাস ফুসফুস দিয়া প্রশ্বাসের সহিত বহিঃস্থ বায়ুর মধ্যে আশ্রয় লয়। ফুসফুসের বা ধমনীর প্রাচীর গ্যাসদ্বয়ের গমনাগমনে কোনরূপ বাধা দেয় না। এতদ্ভিন্ন এক-কোষবিশিষ্ট জীবের মধ্যে দেখা যায় যে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে রূপান্তরিত কোষপঙ্ক সন্তানে সর্ব্বদাই সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই জন্যই Weismanএর মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহা ভিন্ন উদ্ভিদ রাজ্যেও দেখা যায় বট, আখ, সজিনা প্রভৃতির কাণ্ড ও পাথরকুচির পাতা হইতেও নূতন নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বসন্তকালে শাল, তাল, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে অপর্য্যাপ্ত রেণুকণা বায়ুভরে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে। ঐ কণার প্রত্যেকটিই নূতন নূতন বৃক্ষ উৎপাদন করিবার উপযুক্ত শক্তি ধারণ করে। বিন্দুমাত্র রেণুকণা পিতৃবংশের সম্যক্ অনুরূপ শাল প্রভৃতি মহীরূহ উৎপাদন করে এবং ঐ সকল বৃক্ষ আবার যথাকালে ঐরূপ রেণুকণার উৎপত্তি করিয়া থাকে। জীব-রাজ্যেও এই নিয়মের অন্যথা হয় না। যে পঙ্ককণা হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হয় উহাই আবার বিভক্ত হইয়া জীবের যৌবনকালে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি করে। উহাদের এক একটি হইতে এক একটি নূতন জীবের জন্ম হইয়া থাকে। পৈতৃক বীজপঙ্ক দীর্ঘকাল ধরিয়া নানাবিধ খাদ্যগ্রহণ করতঃ পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ বা জীবে পরিণত হয়। সুতরাং খাদ্যের প্রভাব যে উহাতে

সংক্রমিত হয় না ইহা কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে?

জনন-কোষের সহিত দেহ-কোষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে উহা নপুংসক জীবের আকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই অনেকটা অনুমান করা যায়। কৃত্রিম নপুংসক বলীবর্দ্দের একটিরও সাধারণ ষাঁড়ের ন্যায় ঝাঁট (কলুৎস) হয় না। চেহারারও পার্থক্য দেখা যায়। কষ্টসহিষ্ণু হইলেও নপুংসক জীব সেরূপ তেজস্বী হয় না।

উদ্ভিদ রাজ্যেও যে একটি কোষের পঙ্ক আবরণ ভেদ করিয়া অন্য কোষের পঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া থাকে ইহা অনেকেই অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মুকুল (bud), কাণ্ড, মূল ও পত্র হইতেও কেবলমাত্র অনুরূপ অঙ্গ উৎপাদিত না হইয়া—সমুদায় অঙ্গ এমন কি জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতএব দেখা গেল জীব ও উদ্ভিদ উভয়েরই সর্ব্বগাত্র ব্যাপিয়া বীজপঙ্ক রহিয়াছে এবং এই বীজপঙ্ক শুধু যে স্বজাতীয় নূতন কোষ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা নহে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় কোষেরও উৎপাদন করিয়া থাকে। Hydra নামক জীবকে সাত অংশে বিভক্ত করিলেও উহার প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক একটি পূর্ণাঙ্গ Hydra উৎপন্ন হইয়াছিল। Plararia নামক জীবকে ৯ টুক্‌রা করিয়াও দেখা গিয়াছে যে উহাদের ৭ টুক্‌রা হইতে পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে ক্রমে সম্মুখভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে হয় সর্ব্বগাত্রস্থ বীজপঙ্কেরই পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি করিবার শক্তি রহিয়াছে, নতুবা মস্তক, চক্ষু, মুখ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপাদনে সক্ষম বীজপঙ্কের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বীজ-কোষের বাহিরে শরীরের কোন এক স্থানে অবস্থিত থাকে এবং যখন যেখানে উহাদের আবশ্যক হয় তখন সেইস্থানে গমন করতঃ নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। যে মতই স্বীকার করা যাউক না কেন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে শরীরের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের সহিত বীজপঙ্কের নিয়ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও গতিবিধি রহিয়াছে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কতকগুলি জীবকে বহু অংশে বিভক্ত করিলেও প্রত্যেক খণ্ড হইতে পূর্ণাঙ্গ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইতস্ততঃ সঞ্চরণক্ষম কতকগুলি কোষ ক্ষতাদির সংস্কারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। এই সময়ে উহারা টিস্যুর ভিতরে সঞ্চিত মালমসলা ও গাত্রবর্ণের উপাদান কণিকা আত্মসাৎ করে এবং যে অংশের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতে থাকে উহার কোষসমূহের খাদ্যরূপে পরিণত হয়। দধীচি মুনির ন্যায় এই সকল সঞ্চরণশীল কোষের আত্মবলিদান প্রশংসার্হ বটে। এখানেও দেখা যায় যে বীজকোষের সহিত দেহ-কোষের অতি ঘনিষ্ঠ —খাদ্যখাদক সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার খাদ্যের উপর খাদকের প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। তৃণভোজী গবাদি পশু অপেক্ষা উত্তেজক মাংস-ভোজী ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জীব অধিকতর তেজস্বী।

পিতৃ বীজ-পঙ্ক মাতৃকোষপঙ্কের সহিত মিলিত হইলে গর্ভস্থ ডিম্বাণু ক্রমে পুষ্ট হইয়া ভ্রূণরূপে পরিণত হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের

সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে পিতৃ-মাতৃ পক্ষ প্রথমে মিলিত হইয়া পরে দ্বিধাবিভক্ত হয় ও উহার এক অংশ পুষ্ট হইতে থাকে। এই জন্যই সচরাচর গবাদি পশু ও মানবের একটি মাত্র সন্তান একবাবে জন্মগ্রহণ করে। যে স্থলে অপর অংশটিও পুষ্টিলাভ করে সে স্থলে যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়। Weisman অনুমান করেন যে ভ্রূণ পিতা হইতে কিছু অংশ ও মাতা হইতে বাকী অংশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতি পিতামাতার অনেকটা অনুরূপ হইয়া থাকে; তবে পক্ষদ্বয়ের বিভিন্ন সংমিশ্রন বা ন্যূনাধিক্যই ভ্রাতা ভগিনীদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্য ঘটাইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে সন্তান কেবলমাত্র পিতামাতারই প্রকৃতি পাইলে ভিন্ন প্রকৃতিলাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যাহা নাই তাহা কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু অনেকে যে পিতামাতার আকৃতি না পাইয়া পিতামহ, পিতামহী বা ঊর্দ্ধতন কোন পুরুষের আকৃতি পাইয়া থাকে ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আর এইমত অনুসারে চাষ বা চর্চ্চাদ্বারা পুরুষপরম্পরায় বংশের উন্নতি করা সম্ভব হয় না, বন্য ওল হইতে উৎকৃষ্ট ওল, বন্য উদ্ভিদ হইতে উৎকৃষ্ট বাঁধাকফিও লাভ করা যাইত না; অসভ্য মানবের বংশে নিউটন, সেক্সপিয়র, বেকন প্রভৃতি মনীষীর জন্ম সম্ভব হইত না।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে পিতামাতা হইতে জীব বংশের প্রকৃতি লাভ করে এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে যাহা নিজে উপার্জ্জন করে তাহাও সন্তানে সংক্রমিত করিয়া দেয়। এই জন্যই উচ্চ বংশ হইতে সাধারণতঃ উন্নত মানবের জন্ম হইয়া থাকে। শীত গ্রীষ্ম, বাসভূমি ও জলবায়ু প্রভৃতি স্বভাবের শক্তির প্রভাবে জীব ও উদ্ভিদের বীজপক্ষের প্রকৃতি অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনকেই পিতামাতা হইতে সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্যের কারণ বুঝিতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালী মল্লযোদ্ধা

যাহারা বলেন বাঙ্গালী ক্রমশঃই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, তাহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে কলিকাতা নিবাসী কোনও পরিবারের একটি যুবক ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইংরেজ দর্শকগণকে বিস্মিত করিয়াছেন। এডিনবরাতে একজন ইংরেজ পালোয়ান ইহাকে অভিভূত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অসঙ্গত প্রণালী অবলম্বন করিতেছিল, কিন্তু পরীক্ষকগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া ইংরেজ পালোয়ানকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। পরীক্ষকগণ একবাক্যে গুহ মহাশয়ের প্রশংসা করিয়াছেন, কেন না ইনি ইংরেজ পালোয়ানের অন্যায় ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোনো প্রকার অসঙ্গত কলকৌশল অবলম্বন না করিয়া অসীম ধৈর্য্য-সহকারে বীরের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিতেছিলেন। গুহ মহাশয় য়ুরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করুন এবং স্বদেশে ফিরিয়া যুবকদলকে শক্তিবান্ হইবার জন্য উৎসাহিত করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত জে, সি গুহ

স্বদেশী মেলা

স্বদেশের শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি কিরূপ বেগে হইতেছে, স্বদেশীমেলা শিল্পপ্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই বিদেশী-দ্রব্য ভার-গ্রস্ত দেশে স্বদেশী মেলার আয়োজন একান্ত আবশ্যক। এ বৎসর লর্ড কারমাইকেল স্বদেশী মেলার দরজা খুলিবার কালে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, স্বদেশসেবীগণ ইহা স্মরণ রাখিলে স্বদেশী মেলার শৈশবেই মৃত্যু ঘটিবে না। আমাদের দেশে কল্যাণকর আয়োজন ত অনেকই হইয়াছে, কিন্তু কোনটাকেই আমরা শেষপর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি নাই। তীরন্দাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস এই মেলায় তীরবিদ্যায় আশ্চর্য্যরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আশা করি, স্বদেশী মেলা দীর্ঘজীবি হইবে।

সন্তরণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বড় রকমের এক একটা আঘাত আসিয়া অনেক সময় যে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়, অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে শিবপুর দুর্ঘটনাতে আমরা ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। কলিকাতার বহু যুবক গঙ্গাতীরে বাস করিয়াও এবং অসংখ্য নদনদীপ্লাবিত বঙ্গদেশে জন্ম লাভ করিয়াও যে সন্তরণ বিদ্যায় অপটু, একদিন গঙ্গাবক্ষে একদল যুবক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া একথা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিয়াছে। সেদিন যখন গোলদীঘিতে সন্তরণপ্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিতেছিলাম, তখন তাহাদের কথাই মনে হইতেছিল।

সন্তরণপ্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ হয় কলিকাতায় এই সর্ব্ব প্রথম। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছি যে যুবকগণ কেবলমাত্র পুঁথি পড়িয়াই শিক্ষার অধ্যায় শেষ করেন না; মানুষ হইতে হইলে যতগুলি সাধারণ বিদ্যা অর্জ্জন করা প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে সচেষ্ট হন্। সন্তরণ, অশ্বারোহণ, নৌ-পরিচালন, প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য ইহাদের অদম্য উৎসাহ। সর্ব্বপ্রকার খেলা খেলিতে পারা, শিকার করিতে জানা, ইহাদের শিক্ষার এক এক অঙ্গবিশেষ। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই সকলদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু একরূপ ঝাঁপ সাঁতারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সাঁতারে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। আরও কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কার পাইয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু ঝাঁপ দিতেছেন
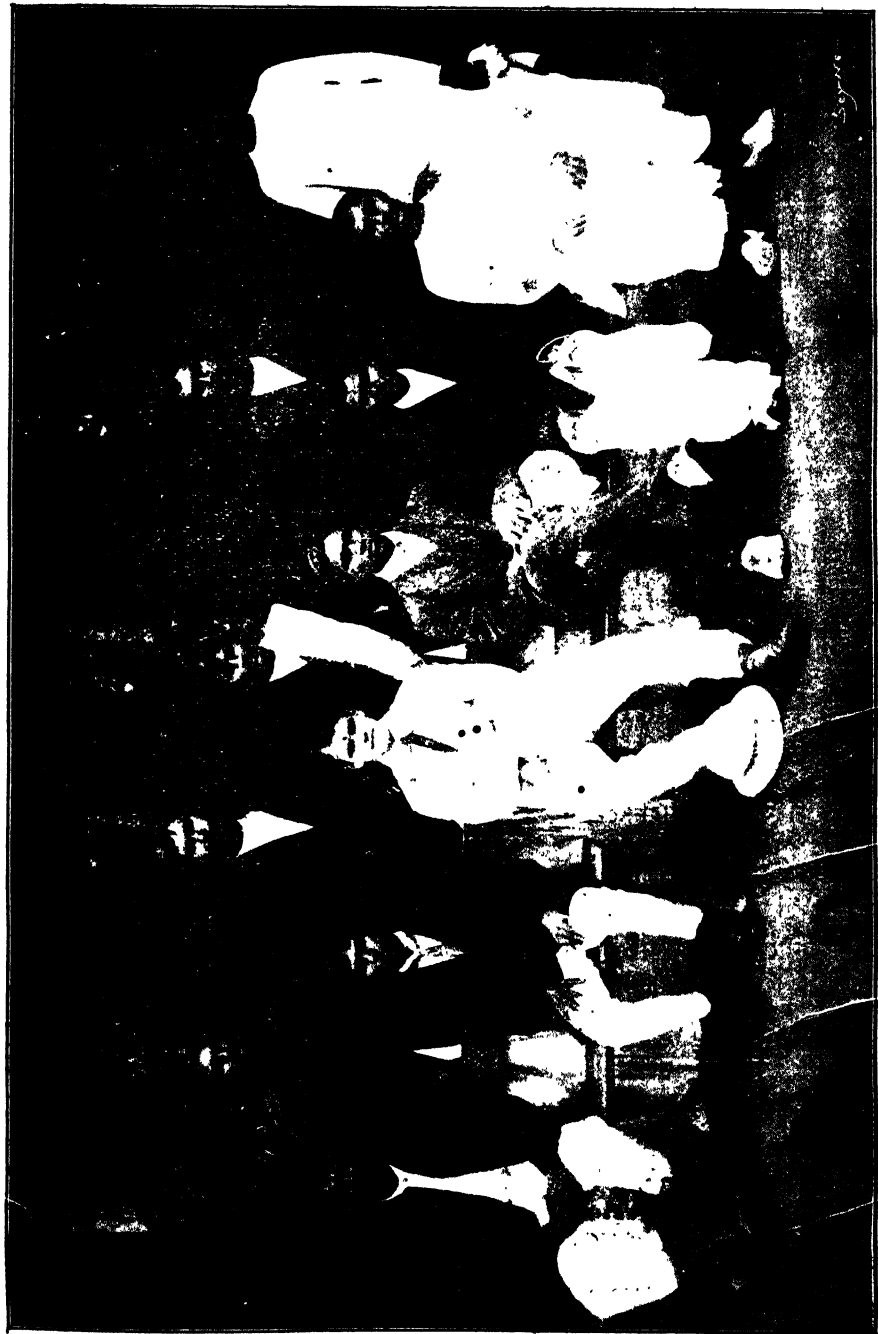
রণে পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকটি যুবক

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের আবিষ্কার

উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ আছে কিনা এই লইয়া বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বহুদিন হইতে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার আধুনিক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদে স্নায়ুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রাণীদেহে স্নায়ু-সূত্র ধরিয়া উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু উদ্ভিদে এরূপ প্রবাহ থাকা সম্ভব নয়। স্নায়ুজালের সাহায্যে প্রাণীদেহে বাহিরের উত্তেজনা যে প্রকার একস্থান হইতে অপর-স্থানে চলাচল করে, উদ্ভিদদেহেও তদ্রূপ স্নায়ুজাল বিদ্যমান। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভার নিকট ইহা অপ্রকাশ থাকে নাই—তিনি বহুপূর্ব্বেই ইহার লক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে আচার্য্য বসু তাঁহার নিভৃত পরীক্ষাগারে এই বিষয় আবিষ্কারের জন্য নানা গবেষণা করিতেছিলেন। উদ্ভিদমাত্রই বাহিরের আঘাতের উত্তেজনায় ঠিক প্রাণীর মতই সাড়া দেয়, একথা তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সম্মুখে প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার সাড়া যে স্নায়ুজালের সাহায্যেই সম্ভব উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ এতদিন তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা আণবিক উত্তেজনা, জলের ধাক্কা, ইত্যাদিকেই এই প্রকার সাড়ার কারণ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। অধ্যাপক বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদ দেহে স্নায়ু বর্ত্তমান এবং ইহার সাহায্যেই বাহিরের উত্তেজনা ও আঘাতে উদ্ভিদ সাড়া দেয়। তিনি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়; তাঁহার এই আবিষ্কার ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরিষৎ রয়েল সোসাইটি ঘোষণা করিয়াছেন। সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনের আশ্চর্য্য একতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতবাসী সমগ্র জগতের সম্মুখে উদ্ভিদ-জীবনের এই অসীম রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া যে সত্য প্রচার করিলেন, উপনিষদের ঋষি একদা নিভৃত আশ্রমে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণত্রজতি নিঃসৃতং" এই সত্য সাধনদুর্লভ দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াই বিশ্বদেবতাকে সমগ্র বনস্পতির মাঝে প্রণাম করিয়াছিলেন—"যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

লাঞ্ছিতা

বরষার বারিধারা বহে,
সিক্তপথ জনশূন্য হায়!
পাখীরা গিয়াছে উড়ি গেহে
নীড়ে তারা মাথাটি লুকায়।

বন্ধ সব দোকান পসারি
গৃহস্থের সদর দুয়ার;
কাঠুরীরা ফেলেছে কাটারী
তুমি কেন এ পথের ধার?

নাহি কি বলিতে আপনার
অরণ্যে কি ফুটিয়াছে ফুল!
এ রূপ, এ মাধুরী তোমার
কেহ কি গো বলেনা অতুল!

"আছে সব আছে নিজঘর
ফুটিয়াছি রাজার কাননে,
লভিয়াছি সোহাগ আদর
ছিল সুখ অপার জীবনে।

"হায় বিধি নিদারুণ হ'ল
প্রিয়তম বুঝিলনা মন,
কত ভুল কথা সে কহিল
দোষী হনু সামান্য কারণ!

সে লাঞ্ছনা সে ঘৃণার হাসি
নারিনু গো সহিবারে আর,
তাই আজি চিরবনবাসী
ঘর মোর এ পথের ধার।"

শ্রীমতী লীলা দেবী।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু
("প্রবাসী" হইতে গৃহীত)

বিদেশিনী

(ফরাসী হইতে)

প্রশান্ত-সাগর-জলে ঢেউ তুলে চলেছে জাহাজ,
গ্রামভারি-সুগম্ভীর যাত্রী তাহে যুবক ইংরাজ।
জাহাজ লাগিল এসে ভেসে ভেসে দ্বীপ সুগন্ধায়,
সে দ্বীপের রাণী 'তীয়া' বসেছিল সৈকতে সন্ধ্যায়।
বিদেশীরে চক্ষে হেরি' মুগ্ধা নারী—ঝিনুকের হার—
কণ্ঠ হ'তে খুলি' দ্রুত,—ছুঁড়ে দিল উদ্দেশ তাহার;
মেলি' বাহু, মাল্যরূপে প্রেরিল সে যেন আলিঙ্গন,
গ্রামভারি যাত্রীটি সে আমন্ত্রণ করিল গ্রহণ।...
তারপর মাসাবধি মহোৎসব চলিল উল্লাসে
বাঁশের কেল্লার মাঝে;—বিদেশিনী বিদেশীর পাশে।
পাতিয়া শীতল পাটি তোষে 'তীয়া' অতিথির মন,
আন্দোলিত বক্ষ তার—চক্ষে ধরা পড়িছে স্পন্দন।
তারপর ঘনাইয়া এল যবে বিদায়ের দিন,—
ফুরাল মিলন-মেলা, হাসি খেলা; তীয়া অশ্রুহীন
সাজাইল ধীরে ধীরে সিন্ধুতীরে চন্দনের চিতা;
বিদায় লইয়া, হায়, চলে গেল দু'দিনের মিতা।
তারপর হেলে দুলে ঢেউ তুলে চলিল জাহাজ;
জ্বলিল চন্দন-চিতা,—জল হ'তে দেখিল ইংরাজ,—
দেখিল সে পাংশুমুখে,—মানিল না বিস্ময়ের লেশ;
সুগন্ধ চন্দন সনে সিন্ধুতীরে তীয়া ভস্মশেষ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের একটী বৈদিক প্রমাণ

বৈদিক আর্য্যদিগের আদিনিবাস যে উত্তর কুরুতে ছিল তৎসম্বন্ধে বেদের একটী বিশেষ নিদর্শনের আলোচনা আমরা উপস্থিত প্রস্তাবে করিতে প্রয়াস পাইব।

বর্ত্তমান উত্তর-মেরুমণ্ডলের চিরতুষারাবৃত অবস্থা বিবেচনা করিলে তৎসন্নিকটবর্ত্তী উত্তর-কুরু প্রদেশ যে বিশেষরূপে শীতপ্রধান ছিল তাহা সহজেই আমরা অনুমান করিতে পারি এবং

ইহাও অনুমান করিতে পারি যে উত্তর মেরু-মণ্ডলে যেরূপ বৎসরের অধিকাংশ সময় শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে উত্তর কুরু প্রদেশেও তদ্রূপ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই শীতের প্রাদুর্ভাব থাকিত। বৎসরের সুদীর্ঘকাল শীতের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাদুর্ভাব থাকিত বলিয়াই সুদীর্ঘ শীতকালের নামানুসারেই বেদে বৎসরের প্রথম নাম পবিকল্পিত দেখিতে পাই। শীতের "হিম" নাম হইতে বেদে বৎসর "হিম" নামেই উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"ইদংসু মে মরুতো হর্য্যতা বচো যস্ত তবেম তরসা শতং হিমাঃ ॥" ১৫

(ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ৫৪ সূক্ত)

"হে মরুৎগণ! তোমরা আমার এই স্তবে প্রসন্ন হও যেন এই স্তোত্রবলে আমরা শত শীতকাল অতিক্রম করিতে পারি। (অর্থাৎ শতবৎসর জীবিত থাকিতে পাবি)"

উদ্ধৃত ঋকে 'তরসা' ও 'তবেম' শব্দেব প্রয়োগ দেখিয়া শীতকাল কষ্টকর ছিল বলিয়াই ইহা উত্তীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে এরূপ কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ঋক্‌সকলে শীতের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে শীতকাল অবিমিশ্র কষ্টের সময় ছিল বলিয়া বোধ হয় না; পরন্তু ইহা সুখের সময় ছিল বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যথা—

"মদেম শতাহিমাঃ সুবীরাঃ।"

(৮—ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৪ ঋক্।)

"আমরা যেন শোভন সন্ততি সম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখ ভোগ করি।" (রমেশ বাবুর অনুবাদ।)

১০ম, ১২শ, ১৩শ, ও ১৭শ ঋকে আমরা এই বর্ণনারই পুনরুক্তি দেখিতে পাই।

শীতকাল কি প্রকার সুখকর হইত নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌টির অর্থালোচনা করিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব :—

"বিশ্বাসাংগৃহপতির্ব্বিশামসিত্বমগ্নে মানুষীণাম্।
শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ পাহ্যংহসঃ সমেদ্ধারং শতং হিমাঃ স্তোতৃভ্যো যেচ দদতি ॥" ৮

(ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৪৮ সূক্ত।)

"হে অগ্নি! তুমি সমস্ত মনুষ্যের গৃহপতি। হে যুবতম অগ্নি! আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্বলিত করিতেছি। তুমি আমাকে শত সংখ্যক রক্ষা দ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর। যাহারা ত্বদীয় স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করে, তাহাদিগকেও রক্ষা কর।"

শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশে শীতকালের রাত্রি সময়ে গৃহাগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে কিরূপ আমোদ-সভা বসিয়া থাকে তাহার জীবন্ত চিত্র ইংরেজ স্বভাবকবি কাউপারের (Cowper), টাস্ক (Task) নামক সর্ব্বজনপরিচিত কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে। মিসেস্ হিমেন্‌স্ (Mrs. Hemans) তদীয় Homes of England ("ইংলণ্ডের পরিবার") নামক কবিতায় গৃহাগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উপবেশনকারী পবিবারমণ্ডলীব শীতকালের রাত্রির সুখ ভোগ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"The merry homes of England
Around their hearths by night,
What gladsome looks of household love
Meet in the ruddy light."

"ইংলণ্ডের আনন্দময় পরিবারসকল রাত্রিতে তথায় গৃহাগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে রক্তি-

মাভ আলোকে কিরূপ পারিবারিক সম্প্রীতির ভাবে হর্ষোৎফুল্লনয়নে সম্মিলিত হয়।'

উত্তর কুরুর আর্য্যগণও এই প্রকারে গৃহাগ্নির সুখোষ্ণ উত্তাপ উপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, বেদের উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে এইরূপ বোধ হয়। শীতপ্রধান দেশাধিবাসীদিগের পক্ষে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যত অধিক তত অধিক আর কাহারও পক্ষে হইতে পারে না। আর্য্যগণ শীতপ্রধান উত্তরকুরুবাসী ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা অগ্নির প্রয়োজনীয়তা এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে ইহাতে দেবত্ব আরোপ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা হইতেই অগ্নিপূজার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং শীতের প্রকোপনিবারণার্থ গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি সঞ্চয়ের আবশ্যকতা হইতেই গৃহে নিত্য যজ্ঞাগ্নি সংরক্ষণের রীতি প্রচলিত হইয়াছে। "অগ্নিহোত্রী" ও "সাগ্নিক" ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মূলে এই ঐতিহাসিক সত্যই বর্ত্তমান।

বৎসরের যে 'হিম' নাম আমরা বেদে পাইয়াছি তাহার অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, 'হিম' তুষার (বরফ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যেখানে শীতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যাইত সেইখানেই শীতকাল অর্থে 'হিম' শব্দের প্রথম প্রয়োগ হওয় সম্ভবপর ছিল। হিম ঋতু অর্থে বেদের এই হিমশব্দের প্রয়োগ পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে অতীব বিরল। তৎপরিবর্ত্তে শীত শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে যখন আর্য্যগণ শীত ঋতু বলিয়া শীতকালকে নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা তীব্র শীতের দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত মৃদু শীতের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বৈদিক ঋষিদিগের 'হিম' শব্দ নির্দ্দেশ্য বৎসর কোন্ সময়ে আরম্ভ হইত তাহার আভাস আমরা বেদেই পাইতে পারি। বেদে আমরা যেমন "হিম" শব্দ বৎসর অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই তেমনই "হেমন্ত" শব্দও বৎসর অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই যথা—

"শতং জীব শাদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্॥" ৪

(ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৬১ সূক্ত।)

"হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাক; সুখে স্বচ্ছন্দে একশত হেমন্ত, একশত বসন্ত জীবিত থাক।" অভিধানেও 'হেমন্ত' ও "হিম" একই ঋতু বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে হেমন্ত হইতেই হিম ঋতুর আরম্ভ হইত এইরূপই অনুমান হয়। শব্দকল্পদ্রুমে হেমন্তের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে আমাদের কথারই সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। সেই ব্যুৎপত্তি এই,—হিমোঽন্তোঽস্যেতি বা মনীষাদিত্বাৎ হেমন্তঃ। "যাহার শেষে হিম আসে তাহাই হেমন্ত।" উভয় ঋতুরই ব্যাপ্তিকাল অগ্রহায়ণ ও পৌষমাস বলিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উল্লিখিত হইয়াছে। হেমন্ত ঋতু হিম বা বৎসরের আদি বলিয়াই যে ইহার প্রথম মাস অগ্রহায়ণ (অর্থাৎ বৎসরের প্রথম) বলিয়া অভিহিত হইবে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। এবং কিজন্য পৌষ মাসে বৎসরের ফলাফল সূচিত হয় বলিয়া সংস্কার প্রচলিত হইয়াছে তাহাও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

উপরে আমরা বেদে শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত

প্রভৃতি নামে যে বৎসরের উল্লেখ পাইয়াছি তাহাতে এই সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারি যে আর্য্যগণ উত্তর-কুরু হইতে ক্রমে যতই দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন ততই নূতন নূতন ঋতুর প্রভাব অনুভব করতঃ তত্তৎ ঋতুর প্রাধান্য হইতে ইহাদের নামানুসারেই বৎসরের নূতন নূতন নামকরণ করিতে লাগিলেন। ঋতু বিশেষের প্রাধান্য হইতে যে সেই ঋতুর নামানুসারে বৎসরের নাম হয় তাহার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত আমাদের বৎসরের বর্ত্তমান "বর্ষ" নামে পাওয়া যায়। "বর্ষ" নামটী বর্ষা ঋতুর নামানুসারেই যে হইয়াছে তাহা উভয়ের এক রূপ ও এক মূল দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপেই প্রতিপাদিত হয়। বেদে আমরা বৎসরের হিম, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত প্রভৃতি নাম পাইলেও "বর্ষা" নামের কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হই না। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে আর্য্যগণ নূতন দেশের সন্ধানে ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে এই নামের উৎপত্তি হয় নাই। ভারতবর্ষ বর্ষা প্রধান দেশ বলিয়া বর্ষাঋতুর নূতন প্রভাব ও দীর্ঘকাল ব্যাপীত্ব হেতু আর্য্যগণ ইহারই নামানুসারে "বর্ষ" নামে বৎসরের নূতন নামকরণ করিলেন।

হিম ঋতু যে আর্য্যদিগের প্রথম ও প্রধান ঋতু ছিল, শীতকালের আর্য্যসাধারণ "হিম" নাম হইতেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আচার্য্য মোক্ষমূলর পাশ্চাত্য প্রাচীন আর্য্যভাষা সকলে এই "হিম" নামের অপভ্রংশ আবিষ্কার করতঃ অনুমান করিয়াছেন যে আর্য্যগণ অধিক দক্ষিণ দিক হইতে আগমন করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"That the Aryans did not come from a very southern clime has long been known, since they possessed common names for winter, such as Sanskrit, hima, Latin hiems, Old Slav zima, Irish gam." Biographies of Words by Prof. Maxmuller p. 103.

"আর্য্যগণ যে অধিক দক্ষিণ দেশ হইতে আগমন করেন নাই তাহা বহুকাল হইতেই জানা গিয়াছে, কারণ তাঁহাদের ভাষায় শীতকালের একই সাধারণ নাম পাওয়া যায় যথা—সংস্কৃতে 'হিম'; লাটিনে, 'হায়েম্‌স্‌'; প্রাচীন স্লেভ ভাষায় 'যিম' এবং আইরিস্‌ ভাষায় 'জেম্‌'।"

এই প্রকারের ভাষা বিজ্ঞানের প্রমাণ হইতে পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ফ্রেজার তদীয় "ভারতের সাহিত্যমূলক ইতিহাস" (Literary History of India) নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এরূপ দেশই আর্য্যদিগের মূল-বাসভূমি ছিল যেখানে অধিকাংশ সময়ই শীতের প্রাদুর্ভাব থাকিত। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান হইতে ব্যক্ত হয় যে, তথাকার জল বায়ু অধিকাংশসময় শৈত্যবিশিষ্ট থাকিলে, তথায় গ্রীষ্মও যে অনুভূত না হইত তাহা নহে।"

"Philology can however, tell that the Aryans came from a land where the climate was for the most part, cold, although a summer was known." Literary History of India by R. W. Frazer L.L.B. p. 13.

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সন্দেশবাহক পারাবত

আজকাল ঘোড়দৌড়ের ন্যায় শূন্যমার্গে পায়রার দৌড়ও ইংলণ্ডে বেশ প্রচলিত হইতেছে। সেখানে ইহা একটি বিশেষ আমোদজনক কৌতুক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মহিমান্বিত সম্রাট জর্জ্জেরও এই ক্রীড়ার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সাণ্ড্রিংহামে তাঁহার পায়রার বাসের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট উচ্চ মঞ্চ আছে; সেগুলি বাস্তবিকই দর্শনীয় জিনিস।

এই পত্রবাহক পারাবতগণের স্ব স্ব বাসার প্রতি এক স্বভাবসিদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সেই জন্যই ইহাদিগকে বাসা হইতে অনেক মাইল দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলেও, ইহারা পথ চিনিয়া বাসায় ঠিক প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই কৌতুকজনক ক্রীড়ায় সম্রাটের অনুরাগ বহুদিন পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল। তখন তিনি Duke of York উপাধিধারী। সে সময় দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া নিউ-জিলাণ্ডের অন্তর্গত অকলাণ্ড প্রদেশে পদার্পণ করিলে, গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপের অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদর স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার জন্য কপোতের দ্বারা এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিউ জিলাণ্ড ও গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপ—এই দুই স্থানের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান ৫৮ মাইল। ইহাদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কোনপ্রকার টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত নাই; এবং অতি অল্পসংখ্যক জাহাজই এই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত করে। সেইজন্য পত্রবাহক পারাবতের সাহায্যেই সংবাদ এবং পত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে। গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপবাসিগণ তাঁহাদের আন্তরিক রাজভক্তি ও সাম্রাজ্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ সম্রাটকে জ্ঞাপন করিবার জন্য পারাবতের দ্বারা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রটি গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে ৬২ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। মহানুভব সম্রাট এই আশ্চর্য্যজনক উপায়ে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া এতদূর সন্তুষ্ট হ'ন যে, তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের ফোটো তুলিয়া লইতে আদেশ করেন।

পত্রবাহক পারাবতের দৌড়ের বেগ ঠিক নিরূপণ করা সহজ নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত ক্রীড়ানুরক্ত ইংরাজ, ব্রাসেলস্ হইতে লণ্ডনে উড়িয়া যাইবার জন্য তাঁহার তিনশত পায়রার ঝাঁক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই দুই নগরের মধ্যে দুইশত মাইল দূরত্ব বর্ত্তমান। পায়রাদের শূন্যে ছাড়িয়া দিয়াই তিনি তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণকে ইহাদের যাত্রাবিষয়ে অবগত করাইবার জন্য টেলিগ্রাফ-আফিসে উপস্থিত হইলেন; এবং এই মর্ম্মে তাঁহাদের নিকট তারে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, 'পায়রাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, নির্মেঘ; বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম মুখো।'' কিন্তু এই টেলিগ্রাম তাঁহার বন্ধুদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই, পূর্ব্বোক্ত উড্ডীয়মান পারাবতগণের মধ্যে একটি পায়রা তাঁহাদের সমীপে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার ক্ষিপ্রগতি যথার্থই বিস্ময়জনক।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা অনুকূল বাতাস পাইলে এক মিনিটে হাজার গজ পথ উড়িয়া যাইতে পারে এবং প্রবল বায়ুভরে ইহারা মিনিটের মধ্যে আরও ৬০০।৭০০ গজ বেশী উড়িতে সমর্থ; কিন্তু বাতাসের বিপরীত মুখে ইহারা মিনিটে ৮০০।৯০০ গজের বেশি যাইতে পারে না। মিঃ লজের দুইটি ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট বিখ্যাত পারাবত আছে। তন্মধ্যে একটির নাম "ম্যাডিসন", অপরটি "উইলকিন্স"। প্রথম পায়রাটি ৬৯ মিনিটে ১০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিল। বেগের ক্ষিপ্রতায় ইহা পৃথিবীর সকল প্রাণীকেই পরাভূত করিয়াছে। "উইলকিন্স" যে পায়রাটির নাম সে ১৩ ঘণ্টা ১২ মিনিটে ৭০০ মাইল রাস্তা দৌড়িয়াছিল। অপর কোনো পক্ষীকে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে এতদূর পথ কখনও ভ্রমণ করিতে শুনা যায় নাই।

মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস ইংলণ্ডে পায়রা দৌড়ের সময়। সে সময় প্রতি শুক্রবার রাত্রে একখানি স্বতন্ত্র ট্রেন কেবলমাত্র পায়রার ঝাঁক লইয়া King's Cross হইতে ইংলণ্ডের উত্তর ও মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে উপস্থিত হয়। সেখানে লইয়া গিয়া পায়রাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়; তাহারা ঠিক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বাসায় আবার উড়িয়া আসে।

এই পত্রবাহক পারাবতগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ উপকার সাধন করে। অরাতির দ্বারা অবরুদ্ধ সৈন্যদল এই কপোতের দ্বারাই স্বপক্ষীয় বন্ধুবর্গের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে; সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। অনেকস্থলে ইহারা শত্রুপক্ষের গোপনীয় সংবাদ বহন করিয়া যুদ্ধ-জয়ের পথ সুগম করিয়া দেয়। অনেকগুলি পায়রা এতদূর শিক্ষিত যে, শত্রুহস্তে ধৃত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই সংবাদ পত্রাদি যেমন করিয়া পারে নষ্ট করিয়া ফেলে।

সাধারণ কাজেও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ফলপ্রদ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নিব্রেস্কা দেশের ফ্রাঙ্ক মারিস নামক একজন চিকিৎসক রোগী পরিদর্শনের সময় তাঁহার সহিত কতকগুলি পায়রা লইয়া যাইতেন এবং সেগুলিকে তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীদিগের বিভিন্ন আবাসে রাখিয়া আসিতেন। তাঁহার কতকগুলি ছাপান কাগজে রোগীর অবস্থার বিষয় লেখা থাকিত; কেবল নাড়ীর অবস্থা এবং দেহের শীতলতা ও উষ্ণতার পরিমাণজ্ঞাপক স্থানগুলি শূন্য থাকিত। সেই স্থানগুলি যথাকালে পরিপূর্ণ করিয়া কাগজখানি পায়রার গলদেশে বাঁধিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেই সে ঠিক ডাক্তারের বাটী ফিরিয়া আসিত। ইহাতে রোগী ও ডাক্তার উভয়েরই বিশেষ সুবিধা ছিল। পায়রার নিকট হইতে রোগীর সংবাদ পাইয়া ডাক্তার তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিতেন—কাজ বেশ সহজে, স্বল্প সময়ে ও সুশৃঙ্খলায় চলিত।

পায়রা দৌত্যকার্য্যে কিরূপ পটু তাহা দেখাইবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একজন যুবতী স্ত্রীলোক এক দরিদ্র যুবকের প্রেমে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যুবতীর পিতা কন্যার এইরূপ দীন অযোগ্যপাত্রে প্রাণ

সমর্পণের বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে ভবিষ্যতে তাঁহার বাসভবনে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তখন গভীর প্রণয়াসক্ত যুবকযুবতী, পরস্পরের মধ্যে প্রেমপত্র আদান প্রদানের জন্য শীঘ্রই এক আশ্চর্য্য কৌশল উদ্ভাবন করিল।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটি পায়রা যুবতীর গৃহের এক উচ্চ মঞ্চে আসিয়া বসিত; এবং অপর একটি পায়রা সন্ধ্যার অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া পত্রের উত্তর লইয়া ঠিক নিয়মিত ভাবে যুবকের আলয়ে উপস্থিত হইত। এইপ্রকারে নির্ব্বিঘ্নে বহুদিন ধরিয়া তাহাদের পত্রাদি প্রেরণ চলিয়াছিল। কেহই কোনো প্রকার সন্দেহ করিতে পারে নাই।

শেষে দৈবক্রমে একদিন যুবতীর পিতা সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন। তখন আর তাঁহার ক্রোধ রহিল না—পরস্পরের প্রণয়ের প্রগাঢ়তা দেখিয়া তাঁহার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সূর্য্যোদয়

সূর্য্য যখন উদয় হোল তালী বনের অন্তরালে,
সবুজ গাছের পাতার ভিতর নূতন মাজা সোনার থালে,
উদয় মেরুর শিখর হতে রক্তধারা পড়ল' টুটি,
কমল বনে উঠল' ফুটে ঊষা রাণীর চরণ দুটি,
মহুয়া ফুলের রঙিন কাপড় বিছিয়ে দিলে গাছের তলে,
মৌমাছিদের গুণগুণানি আবির মাখা ডুমুর ফলে।
পারের ঘাটে ভীড় লেগেছে যাত্রীরা সব যাবে নায়ে,
কলমী ডাঁটায় বাজায় বাঁশী রাখাল-ছেলে গাছের ছায়ে,
নিভিয়ে দিয়ে নিশার প্রদীপ গন্ধ ধূপে সাজিয়ে ডালা
প্রভাত করে সূর্য্য পূজা বিনি সুতোয় গেঁথে মালা।
পড়ল রবির অরুণ কিরণ মুক্তা-ঝরা দূর্ব্বাদলে,
লক্ষ্মী দেবীর স্বর্ণ আঁচল ঝকিয়ে দিলে খেলার ছলে।
ছড়িয়ে দিয়ে সোনার আলো শিশির-ঝরা পল্লী পথে,
উঠল গিয়ে তরুণ রবি অষ্ট ঘোড়ার পুষ্প রথে।
বংশ রন্ধ্রে বাজিয়ে বাঁশী অশথ ডালে দিয়ে নাড়া।
দক্ষিণা বায় গেল বয়ে নদীর বুকে জাগিয়ে সাড়া
পুণ্য লোভী ফিরছে ঘরে সিক্তবাসে সমাপি স্নান
পাখীরা গায় সবুজ শাখে প্রভাত রবির বন্দনা গান।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
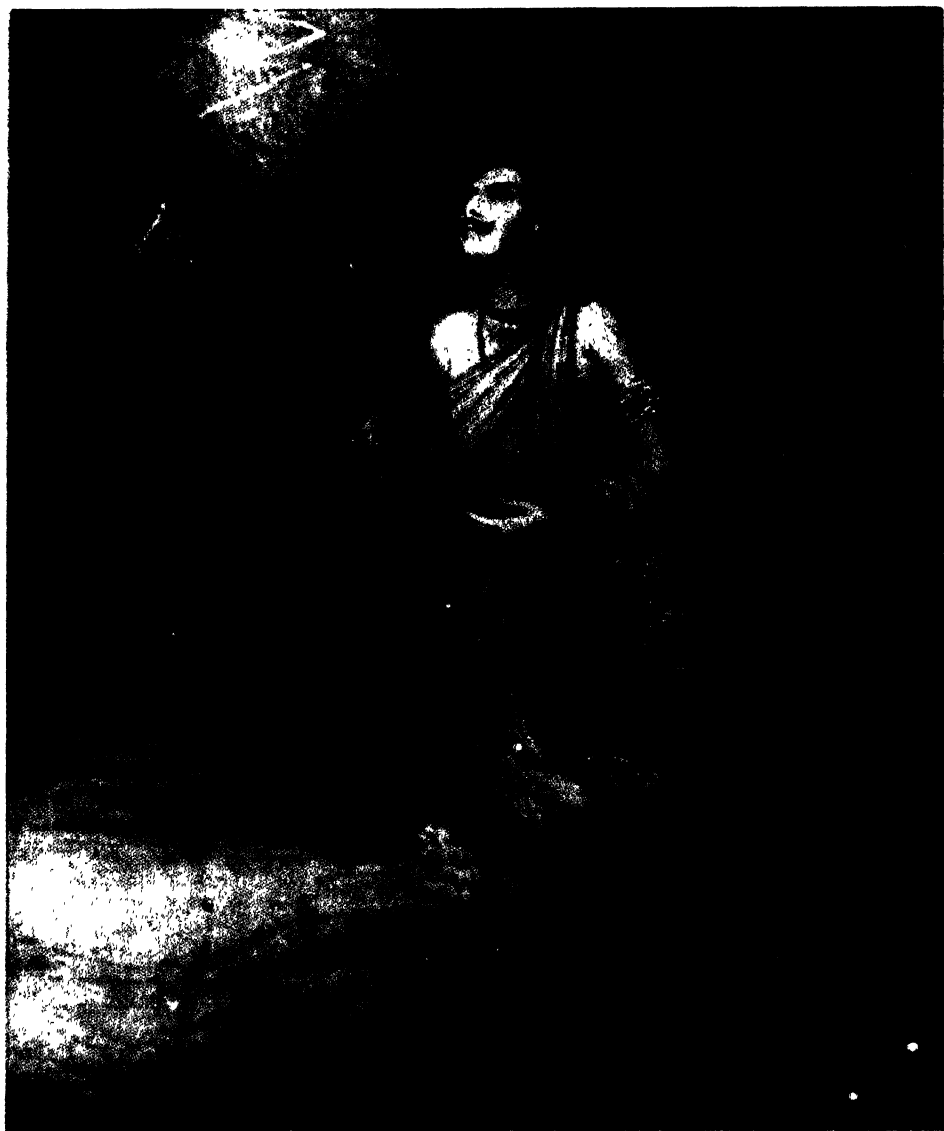
কৃষ্ণাষ্টমী

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

৩৭শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২০ [৮ম সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

৪০

লাটিমটা যতক্ষণ ঘুরিতে থাকে তাহার উভয়দিকের লাল, কালো রং তুইটাও তাহার সেই ঘূর্ণন বেগের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে একাকার হইয়া যায়। শচীকান্তের চপল চিত্তবৃত্তির মধ্যেও সেইরূপ লাল, কালো অংশ তুইটার সমাবর্ত্তন চলিতেছিল। রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া সে কাগজ কলম লইয়া একখানা দীর্ঘপত্র লিখিল মনীশকে। আর একখানা সংক্ষিপ্ত পত্রে একই ধরণের কথা লিখিয়া লেফাফার উপরে শিরোনামা দিল "পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রদ্ধাপদেষু"।

ইহার পর সে একটু স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যুষে ভক্তিনাথ প্রাতঃস্নানার্থ প্রস্তত হইতেছিলেন, দেখিলেন ভাই ব্যাগ-হাতে বাহির হইয়া যাইতেছে, ডাকিলেন, "শচি যাচ্চো কোথা ?"

"আপনি উঠেছেন, তাহলে দিদিকে বলবেন চল্লাম।" ফিরিয়া আসিয়া সে ভাইকে নমস্কার করিল। ভক্তিনাথ কহিলেন "সে কি এখনই কোথা যাবে? তুদিন থাকো, বেলা হোক খাওয়া দাওয়া কর। যেতে হয় তখন যেও; এমন করে কি যায়!"

অপরাধের কালিমা শচীকান্তের ললাট অন্ধকার করিয়া ফেলিল সে ব্যস্ত হইয়া বলিল "কুটুমতো নই, সকাল সকাল যাওয়াই ভাল"। ভক্তিনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কুটুমের যে বাড়া হয়েচ শচি! একখানা চিঠি লিখেও তো খোঁজ নাওনা; আসার পাঠ তো উঠিয়েই দিয়েছ,—এলে যদি তাও একটা দিন বই নয়।"

শচীকান্তের মন একেই অস্থির সে ঈষৎ উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বিরক্তি দমন করিয়া সে উত্তর করিল "এসে তো কত যত্নই পাই, কার জন্য আসবো? বাড়ীর গিন্নিতো দেখি ঠুক্ ঠাক্ কথা শোনাতেই জানেন—"

"সে দোষ কি আমার ভাই? একজন পরের মেয়ে যদি আমাদের না মানে তার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত তুমি আমায় করাবে? তুমি আমার সেই স্নেহের শচী,—আমিতো কোন অপরাধ করিনি?"

শচী বিরক্তির হাসি হাসিল "আমিই বা করিচি কি? সুবিধা হলেই আসচি, কখনও আপনাকে অমান্য করিনি, আর কি করবো বলুন।"

ভক্তিনাথ চুপ করিয়া রহিলেন, বলিবার মত এমন সত্যই কিছু ছিল না, কেবল মনের একটু খানি ক্ষোভ মাত্র। যাহাকে জন্মমুহূর্ত্ত হইতে জীবনের মধ্যে একটা স্নেহাধিকার দিয়া আসিয়াছেন সে যদি সেটা তুচ্ছ বলিয়া প্রত্যাখান করে তাহাতে স্বভাবতঃই মনে ক্লেশ হয়, ইহাতো আইনের দাবী নয় এ যে বুকের টান।

"তবে এখনই আসচো? মাসিমাকে আমার প্রণাম দিও, কল্যাণী সেখানে আছে বুঝি? আশীর্ব্বাদ করচি তাকে বলো—"

দাদাকে স্বর ফিরাইতে দেখিয়া সেও একটু লজ্জানুভব করিল। দাদা আজন্মই এইরূপে নিজেকে সংযত করিতে অভ্যস্ত ইহা তাহার মনে পড়িল।

মৃদু স্বরে সে কহিল "আসি তবে দাদা আবার শীঘ্র একদিন আসবো না হয়। বলেন তো কিছুদিন থাকা যাবে তখন,—এখন একটু কাজ আছে। বাবার চিঠি পেয়েছেন?" চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই প্রথম পিতার সংবাদ লইবার কথা মনে পড়িল! "পেয়েছি, ভাল আছেন। এসো তাহলে সুবিধা হলেই। দূরে থাক, মন তোমার কাছেই সর্ব্বদা পড়ে আছে, গিয়ে একখানা পত্র দিও।"

"দেবো," এই বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই শচীকান্ত ভ্রাতার দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নেত্র ফিরাইয়া ভক্তিনাথ আবার একটা মৃদুশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শিশু ভ্রাতার সৌম্য সুকুমার মূর্ত্তি, জ্যেষ্ঠের প্রতি অসহায় আত্ম-সমর্পণ মনে পড়িল। মানুষ কত বদলাইয়া যায়! তাঁহার মনের স্নেহ নির্ঝর আজও ঝরিতেছে কিন্তু সে ক্ষীরধারা আর শচীকান্ত স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক নয়। নাই হোক, ভাল থাক সুখী হোক, ভাইএর জন্য ভাই আর কি করিতে পারে!

৪১

মধ্যাহ্নে দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া করালী-চরণ তাহার সমান দরের একটি বন্ধু লইয়া বড়ে টিপিতেছিল এমন সময় বেড়ার পাশ হইতে একখানা সুন্দর তরুণ মুখ সেখানে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। কলাঝাড়ে কদলীপুষ্প দোদুল্যমান, বেড়ার ধারে পালং বাতাসে মাথা দুলাইতেছে, মাচাভরা লাউশাকের মধ্যে মধ্যে সাদাফুলের বাহার খুলিয়া দিয়া ছোট ছোট লাউ ধরিয়াছিল, খানকত উচ্ছিষ্ট বাসনকোসন লইয়া কমলা সেই ফসল ক্ষেতের মধ্য দিয়া ঘাটের পানে চলিয়াছে, শচীকান্ত তাহা দেখিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।—

পল্লীগ্রামে গৃহস্থগৃহে লক্ষ্মীপূজা হয় সে দেখিয়াছিল; অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজায় তাহার মা "তিল-সোনার" কথা বলিতেন, ছোট বেলায় সে তাহা অনেকবার শুনিয়াছে, সে কাহিনীর মধ্যে তিলফুল তোলার প্রায়শ্চিত্ত হেতু বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীকে দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হইয়াছিল; সেই গল্পটা আজ অকস্মাৎ সার্থকভাবে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। কি পাপে এই লক্ষ্মীস্বরূপা কমলাকে

এ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে ? তবু মূর্খ লোকে বলে ঈশ্বর আছেন !

অদূর পুষ্করিণীর ভগ্ন সোপান অবতরণ করিয়া জলের মধ্যে কিশোরী বাসন রাখিল। হাত ধুইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর,—কোথা গেল সে ? শচীকান্ত তাহার উৎসুক দৃষ্টি বিস্তৃত করিয়াও আর তাহাকে দেখিতে পাইলনা, জলে অবগাহন করিয়া থাকিবে ভাবিয়া সেখান হইতে অপসৃত হইল। মধুর স্বপ্ন উপভোগান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন মনে একটা বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয় তেমনই একটি প্রসন্নতার আনন্দ লইয়া সে করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ মানসে অগ্রসর হইল। মাঝখানের মানসিক সংগ্রাম, সেই মুহূর্ত্তে যেন যাদু মন্ত্রে তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। করালীচরণ বড়ের চাল ভুলিয়া আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল "আসুন, আসুন, কাল থেকে কেবল আপনার কথাই ভেবেচি। ওহে নৃসিংহ ! এখন তা হলে তুমি এসো গিয়ে, খেলাটা এখন ত আর হলো না, রাত্তিরে তখন তোমার গিয়ে শোধ দেওয়া যাবে। তারপর শচীকান্ত বাবু! কি মনে করে ?" আবার সেই মনের উপর আক্রমণ ! শচীকান্তের আললাটকণ্ঠ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, "বিশেষ কিছু নয়, দেখা হয়েছিল তাই একবার—"

"বটে বটে এমনই আমার সৌভাগ্য, বসুন, বসুন, কম্লি কোথা গেল পান এনে দিক্ না,—"

অকস্মাৎ সঙ্কুচিত শ্রোতা এমন করিয়া চমকিয়া উঠিল যে, যেন সে গুপ্ত ঘাতকের ছুরির আঘাত পাইয়াছে, আকস্মিক ক্রোধের উচ্ছ্বাসে তাহার সমুদয় মুখখানা অরুণাচলের মত লোহিত হইয়া গেল, সে দুই পদ পিছাইয়া তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল "ছিঃ—"

করালীচরণ এ অকস্মাৎ ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। বিস্ময়ে সে তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু টানিয়া ডাগর করিল "রাগ করলেন কেন ? কিছু অলেহ্য বলেচি ? মুখ্য সুক্ষ্যু মানুষ ও সব ধর্ত্তব্য করবেন না, আপনারা ইয়ং ম্যান ইংরিজীশেখা, আমরা সেকেলে ;—বেফাঁস বলা রোগ আমাদের। তা যা হোক শচীবাবু যখন দয়া করে পা'র ধূলো দে'ছেন তখন এ গরীবের একটি উপকার করুন। আমি ছা-পোষা কোথা থেকে বাইরের লোক পুষি বলুন ? শিবনারাণ বাবু যখন কমলাকে নিতে চান না তখন কাঁহাতক আমি আর তাঁদের পায়ে তেল দিতে থাকবো ? একটি যোগ্য পাত্তর খুঁজে দিন, মেয়েও তো বড় সড় হয়েচে, দু হাত এক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।"

কোথায় বিরক্তি, কোথায় ক্রোধ ! হৃদ্‌পিণ্ড হইতে নির্গত শোণিত পুনরায় নিজ স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আছড়াপাছড়ি করিতে লাগিল, সে বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "সেটা কি উচিত !"

"কেন নয় মশাই ? ষোল বছরের মেয়ে ! তাঁরা জানেন না মাথায় কি ভার ? চিঠির উত্তরটাও দেওয়া দরকার বোধ করলেন না তো, সে দিনও তো স্পষ্ট বলেচেন—"

অতি কষ্টে শচীকান্ত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে উচ্চারণ করিল "কি ?"

"কেন বলেছেন যার ভাগ্যে যা আছে

কেউ খণ্ডাতে পারে না তোমার ভাগ্নিকে তুমি নে যাও আমরা চাই না।"

শচী ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল "রাগ করেই বলেছেন তো, সেটা" ?

"রাগ! কিসের রাগ? টাকা খসাতে হলে অনেক মশায়েরই রাগ হয় সেটা জানা আছে। কেন নেবো না? দুশোবার নেবো। তোমরা কুলীনেরা চোখের চামড়া খসিয়ে বিয়ের টাকা নিতে পারো, গরীবের ঘর বাড়ী বেচে নাও, মুনিবের ক্যাস ভাঙ্গিয়ে কনের বাপকে জেল খাটাও, আর দোষ হলো গরীব আমাদের বেলায়? উপদেশে মাছ মরে না, জলে নামতে হয়। আমি যেখানে তিন হাজার টাকা পাবো সেইখানে মেয়ে দোব, কেন দোব না, তোমরা বড় মানুষেরা ছান্‌লাতলা থেকে বর ফিরোও না?"

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল, শচীকান্তের চঞ্চল হৃদপিণ্ড পুনর্নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল, মনে একটা অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল; কিন্তু কাহার প্রতি সে ক্রোধ। সে ঈষৎ ঝাঁঝিয়া কহিল "তবে তুমি কি করতে চাও?"

করালী তাহার মুখচক্ষুর শোচনীয় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে মনে মনে হাসিল, প্রকাশ্যে বিনীত স্বরে উত্তর করিল "যে ও মেয়ের দর বোঝে তেমন লোকের হাতে তাকে দিতে চাই, বংশজের ঘরে কেউ পায়ে ধরে মেয়ে দেয় নি আমিও দেবো না।"

"তা হলে—তা হলে এই মতই স্থির!"

"অবিশ্যি"

"কিন্তু কিন্তু—এটা ভাল হবে কি?"

"কেন মশাই? মেয়ের অভিভাবক আমি, আমার যাকে খুসী মেয়ে দোব, ভাল মন্দ এতে কি পেলেন শুনি?"

আবার শচীকান্তের বুকের মধ্যে তুমুল তরঙ্গ উঠিল! মনতরী টলমল করিয়া বুঝি এবার অতলে ডুবিয়া যায়। সে কি একটা বলিতে গেল বক্তব্যটা কণ্ঠের মধ্যেই অস্ফুট হইয়া রহিল। বিবেক এবার পরাজিত প্রায়, স্বেচ্ছায় সে স্বার্থকে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত, মন বলিতেছিল তবে আর তুমি কি করিবে? তোমার ইহাতে হাত কি? তুমি শুদ্ধ কেন বঞ্চিত হও! বিবেক সায় দিয়া বলিল "না পাপ কি? তোমার আর দোষ কি?"

করালীচরণ দাওয়ার এক পার্শ্বে চকমকির নিকট সজ্জিত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে একটা ডিবাভরা পান লইয়া বাহিরে আসিল। স্তব্ধ শচীকান্তের কাছে আসিয়া উপহার বস্তু হস্তে স্থাপনান্তে জিজ্ঞাসা করিল "দোক্তা টোক্তা চলে?" সে নীরবে ঘাড় নাড়িল। ডিবাটা তাহার হাতের মধ্যেই রহিয়া গেল। তাম্বুল মুখে উঠিল না। "তামাকটাও চলে না? বেশ, বেশ, কতদূর অবধি পড়াশোনা হয়েচে? পাশ কটা?" করালী এবার তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে অপ্রকৃতিস্থমতি অতিথির পাশে বসিয়া বিজ্ঞ কন্যাকর্ত্তার সুরে তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

শচীকান্তের এসব ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজের ভাবনাতেই অস্থির তথাপি বাহ্যিক ভদ্রতার খাতিরে কোনমতে জবাব দিয়া গেল "এম্ এ"।

"অঁ্যা চার চারটে পাশ! আমাদের কম্লীর তপস্যা ভাল ছিল।"

শচীকান্তের নিশ্চল হৃদ্পিণ্ড প্রতিঘাতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল চোখ মুখ লাল করিয়া একটা রক্তের উচ্ছাস মাথার মধ্যে ছুটিয়া গেল "সেকি; সেকি!"

ধূর্ত্ত করালী শান্তভাবে ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল "এই একটা কথার কথা বলছিলাম, বিবাহ হয়েছে?" "না" বলিয়া ডিবাটা নামাইয়া রাখিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল, যেন এখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া সে এই মায়াবীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবে! কিন্তু সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই আবার ও কি দৃশ্য!

সজল চরণচিহ্নগুলি ধূলায় অঙ্কিত করিয়া আর্দ্রবসনে ভারাবনত দেহে কে ঐ ঘাটের পথ হইতে ফিরিতেছে! সে প্রভাতের হাস্যময়ী মানসপ্রতিমা নহে, সংসারের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিতা সুকরুণমূর্ত্তি সে। শচীকান্ত তাহার দৃষ্টি বাঁচাইবার চেষ্টায় একটু সরিয়া বসিল, নিজেকে স্থির করিয়া লইবার জন্য একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর ললাটের স্বেদজড়িত কেশগুচ্ছ ধীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আবার সেই দিকে চাহিল। অতি নিকট দিয়া কমলা কোনদিকে না চাহিয়া ধীরপদে খিরকির দিকে চলিয়া গেল। তাহার বিষণ্ণ নত নেত্রের আভাষ দ্রষ্টার সব দ্বিধা ঘুচাইয়া দিয়া গেল, সে অভিভাবকের দিকে অসঙ্কোচে চাহিয়া কহিল "ওখানের সঙ্গে তাহলে মেটাতে চান না?"

"না"।

"তাহলে যদি আর কেউ কমলার কর প্রার্থনা করে তো—"

"যদি তিনহাজার টাকা দেয়, তাহলে তারই সঙ্গে বিয়ে দেবো,—"

একটা ঘৃণাপূর্ণ ক্রোধ কটাক্ষ করিয়া সে কহিল "হ্যাঁ, হ্যাঁ তা আমি জানি। টাকা দিলেই—আপত্তি নাই কিছু?"

"কিছু না। তবে টাকাটা আগাম চাই বুঝলেন?"

"আচ্ছা তাই হবে!"

বক্তার মন বুঝিয়া আবার করালীচরণ মনের মধ্যে হাসিল। টাকা খসাতে হলেই বাবুরা বড় চটেন। প্রকাশ্যে সে কিছু না বলিয়া সজোরে হুঁকার নলে টান দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অতিথির পানে ফিরিয়া না বুঝিবার ভানে বলিল "বর কে?" লোকটার অল্পবুদ্ধির প্রতি অসহায় ভাবে চটিয়া শচীকান্ত নীরবে অধর দংশন করিল, তাহার মনের মধ্যে আবার দেবাসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

৪২

"বলি আজ যে বড় খুসী খুসী? বেলাতো আর রেখে এসোনি যে দুটো কথা বার্ত্তা কইব, সত্যি কমল তোকে শুধু ঐ হাসিটুকুতেই আজ এত সুন্দর দেখিয়েছে আমারই মনে হচ্চে নিজেকে বিকিয়ে দিই।"

কমলার নূতন বন্ধু সরোজিনী প্রীতিপূর্ণ নেত্রে তাহার সরমরঞ্জিত মুখে দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা বলিল। অপরাহ্নে তখন সায়াহ্নের ছায়াপাত হইয়াছিল। ম্লান আলোকে সলিলমধ্যবর্ত্তিনী কমলাকে জলদেবীর মতই অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল, তাহার স্থিরদৃষ্টি আজ ক্ষণচঞ্চল, একটা সলজ্জ রাঙ্গা আভা তড়িৎবেগে

শুভ্র ললাটে, গোলাপি গণ্ডে মিলাইয়া যাইতেছে। সে মৃদু হাসিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টি নত করিল, রন্ধনের কালি গামছা দিয়া রগড়াইয়া তুলিতে তুলিতে কহিল "কি যে বলো !"

"নালো সত্যি আমি ঠাট্টা করচিনে। ...কিযে নাম তাওতো কিছুতে বল্লিনে? তবে তোর বরই বলি; তিনি যদি এখানে থাকতেন এখনি পাগল হয়ে রাঙ্গা পায়ে লুটিয়ে পড়তেন,। আচ্ছা ভাই মাঘ মাসতো যায় বিয়ের কি হলো ? তাঁরা কিছু বলেন নি ?"

কমলার রঞ্জিতমুখ সুখের স্মৃতিতে উজ্জ্বল দেখাইল, আনত মুখখানি অধিক নত করিয়া সে উত্তর করিল "হ্যাঁ ভাই লিখেছেন,"

"কি ? কবে বিয়ে ঠিক হয়েচে ?"

"পরশু !" "পরশু !" "হ্যাঁ ভাই।" সরোজিনী বিস্ময়ের সহিত আনন্দে চমকিত হইল, "তাই এত আহ্লাদ বটে ! বেশ হলো ভাই ! যত শীঘ্র এ ঠাঁইখানা ত্যাগ করতে পারিস্ ততই মঙ্গল,। আমার দুদিন ফাঁকা ঠেক্‌বে—বয়ে গ্যাল, তুই তো বত্তাবি। কাল তা হলে গায় হলুদ ? কোন সাড়াটিও তো নেই, ঢের ঢের কিপ্‌টে দেখিচি বাবা এমন কিপ্‌টে আমার চৌদ্দ পুরুষেও দেখেনি। তা যাই হোক, কমল তোর বর দেখতে ভাই যাবোই, গলাধাক্কা দিলেও সেদিন নড়চিনে। ভয় নেই পাত পেতে বসচিনে, সেদিন একাদশী ওপাঠ সারাই থাকলো! তোর খুব আনন্দ হচ্চে ? মরি, লজ্জায় যে একেবারে গেলেন ! বুড় ধাড়ি কনের আবার অত কেন বা ! আহা আনন্দ আর হবে না বোন, কি সুখেই এখানে আছ, ঠাকুর মুখ তুলে চান, সুখে থেকো, এসো কমল সন্ধ্যা হয়ে গ্যাছে বাড়ী যাওয়া যাক্। শীতে হিমে অসুখ করলেই মুস্কিল, নিজের বিয়েতো তোমায় নিজেকেই দিতে হবে। যেমন কালনেমী মামা জুটেচে !"

কলসী ভরিয়া দুই সখীতে জল ছাড়িয়া উঠিল, আর্দ্র বসন ত্যাগ করিয়া ভিজা বস্ত্র নিঙড়াইয়া উভয়েই নীরবে গৃহাভিমুখী হইল, দুজনেই নিজ নিজ চিন্তায় তন্ময় ছিল। সখীর বিবাহের কথায় সরোজিনীর নিজের বিবাহের সমস্ত কথা মনে পড়িতেছিল। গাত্র হরিদ্রা, আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্নভোজন, প্রতিবেশী গৃহে সাদর নিমন্ত্রণ, সানাইএর বাদ্যে, শঙ্খ রবে, হুলুধ্বনির কোলাহলে কতবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এক অপরিচিত কুণ্ঠিত দৃষ্টির সহিত তাহার তন্দ্রাবিজড়িত চক্ষের ক্ষণিক মিলন, এই সকল কত কথা মনে পড়িতেছিল। সবই ত সেদিনের কথা ! শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় মায়ের গলা ধরিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইতেছিল, পাঁচ জনে জোর করিয়া তাহাকে পাল্কীর ভিতর পুরিয়া দিল, কঠিনচিত্ত বেহারাগুলা তাহার কান্নাকাটি অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ অচেনা পুরীর উদ্দেশ্যে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল। সেই অজানা গৃহে সেদিন তাহার কত আদর ! শাশুড়ী কোলে লইয়া "লক্ষ্মী" রূপে বরণ করিয়াছিলেন, চারিদিকেই স্নেহ মমতার ছড়াছড়ি !

তারপর অল্পে অল্পে নারী জীবনের সারসুখ সে যখন চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় সব চুকিয়া বুকিয়া গেল। দু চারদিন পরে অলক্ষ্মী অপয়া বধূ পিত্রালয়ে পুনঃপ্রেরিত হইল। বৎসরাধিক পূর্ব্বে যে বেহারা-গুলার কাঁধে চাপিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে

গিয়াছিল সেই পথ ধরিয়া তাহারাই তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। মাঝখান হইতে শুধু সমস্ত জীবনটা শ্মশানবহ্নির বুকে আহুতি দিয়া আসিল!

কমলা গৃহকর্ম্মের অবসানে ভাল করিয়া সাড়িখানা গুছাইয়া পরিল, সুগোল মণিবন্ধে করভূষণ দুখানির প্রতি একটা প্রীতিকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নববধূর সরমশঙ্কিত চরণে সে পূর্ব্বের মত বাহিরে গাছের তলায় গিয়া বসিল। নূতন একটা ভাবের আলো নবোন্মেষিত হৃদয়মুকুলে পতিত হইয়া আজ সারাদিনে তাহাকে পূর্ণবিকশিত শতদলে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, আজ শুধু দয়াকৃতজ্ঞতার আদান প্রদান নয়, তাহাদের সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের বন্যা আজ তাহাদের এক, অছিন্ন মিলনে মিলাইয়াছে! কমলা আজ অনাথা নয়, হীনচিত্ত আত্মীয়ের সংস্পর্শে হেয় নয়, সে অকুণ্ঠ কৌমার প্রেমের বৈজয়ন্তী মাল্যধারিণী মহামহিমময়ী নারী, একনিষ্ঠ, সংযত চরিত্র মনীশের হৃদয় রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী সে!

যত বড় কৃপণই হোক হাজার হউক মেয়ের বিয়ে,—করালীচরণ উত্যক্তচিত্তে দুচারটি প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। সত্যকালী বিছানা ছাড়িয়া রোয়াকে আসিয়া বসিয়াছেন; কমলা যে তাঁহার সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছে ইহাতে তাঁহার মন মোটেই ভাল ছিল না। বিমর্ষমুখে চারিদিকে চোক ফিরাইয়া আয়োজনের স্বল্পতা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার মৃদুস্বরে বলিলেন "ঐটুকু ঘিয়ে অত ময়দা তো ভাজা যাবে না, আরও সের পাঁচেক লাগবে না!"

"আরও পাঁচ সের! চুমুক দিয়ে ঘি খাওয়া হবে না কি? ঐ ঢের হয়েচে।"

সত্যকালী কহিলেন "মিষ্টিতেও কুলবে না, মোটেতো এক রকম ঐ গোল্লাসন্দেশ তাও—"

করালীচরণ মুখ খিঁচাইয়া ধমক দিয়া উঠিল "থাম থাম আর সরফরাজি করতে হবে না, যার কুলবে সে খাবে, না হয় না খাবে, তুই কি আমায় ডুবোতে চাস্ নাকি?"

সন্ধ্যার সময় সরোজিনী আসিয়া স্পন্দিত-বক্ষঃ কমলাকে নির্জ্জন কোণ হইতে বাহির করিল, সে লজ্জায় তাহার গলা ধরিয়া বুকে মুখটা গুঁজিয়া ফেলিল "সবোজ যেখানে থাকি তোকে কখন ভুলব না।"

আসন্ন বিরহাশঙ্কাব্যথিতা সরোজিনী তাহার রক্তিম গণ্ডে অঙ্গুলীর মৃদু আঘাত করিয়া সজলনেত্রে হাসিয়া কহিল "দেখা যাবে ভাই, ওমা চুলটা এখনও বাঁধা হয়নি যে, বোস্"।

সুচারু ছাঁদে কবরী রচনা করিয়া অনেক কষ্টে সরোজিনী চন্দন আল্‌তা সংগ্রহে কনে সাজাইল, খাটো রাঙ্গাচেলিখানা সে অঙ্গের পরিপূর্ণ লাবণ্য একবিন্দু হতশ্রী করিতে পারিল না। গহনা নাই শুনিয়া একবার সে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়াছিল, পরে চন্দন চর্চ্চিত ললাটে প্রভাতগগনে প্রথম চিহ্ন ঊষার রক্তিম ছটার মত নবজীবনের প্রথম মঙ্গল সূচনা স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র সিন্দুর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া দুই হাতে সেই মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিল "তা কিছুই না থাকুক, এম্‌নিতেই এরূপ ভুবন ভোলাতে পারে।"

স্নিগ্ধ কালো চোখ দুইটি একবার পূর্ণ প্রীতিভরে সখীর মুখে স্থাপন করিয়া সে নিজের মুখখানা তাহার হস্তমধ্য হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সবেগে কহিল "যাও!"

কিন্তু স্তুতির বাণী কয়টা বোধ হয় বড়ই মনের মত হইয়াছিল। কস্তুরী মৃগ যেমন নিজের গন্ধে নিজে মোহিত হয় আজ তাহার মনটাও তেমনি এ খবর টুকুতে মাতিয়া উঠিল।

লগ্নমাথায় করিয়া বর আসিল। বরযাত্রী জনকয়েক মাত্র। বরকর্ত্তা লম্বোদর তুল্য দেহ গরদ উত্তরীয়ে আচ্ছাদন করিয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। বরের পার্শ্বে মোটা চেনপরা মিতবর মৃদুস্বরে রহস্য বাণী বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু এ কি বর! নেপথ্যস্থিতা সরোজিনী নিস্পন্দনেত্রে বরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর পরিকল্পনা লইয়া শিক্ষিত নট যেন রঙ্গভূমে প্রবেশ করিতেছে! এই কমলার বর! অতি সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি, কিন্তু ভস্মের ন্যায় বিবর্ণ, প্রাণ-হীনের মতই নিস্পন্দ! কে যেন শ্মশান যাত্রার পরিবর্ত্তে তাহাকে বিবাহবেশে সাজাইয়া আনিয়াছে!

(৪৪)

গিরিজাসুন্দরী অবাক্ হইয়াছেন। কালধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ টেঁকেনা; একথা ভাবিয়া তিনি এখনকার কালের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে অনেকখানি উদার নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন, শচীকান্তের অনেক অসঙ্গত চালচলন যাহা তাহার পিতৃগৃহেও অনেকে সমালোচনার চক্ষে দেখিত তিনি সে সকল তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, অপর কেহ কিছু বলিলে বরং সেটা চাপা দিবার ইচ্ছায় হাসিয়া কহিতেন "চিরকাল কি সমান যায়রে বাপু, যুগধর্ম্ম একটা নেই?"

কিন্তু সেই স্নেহময়ী মাসিমাও এবার তাঁহার উদার নীতিকে তেমন করিয়া যেন প্রশ্রয় দিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার জন্মের সাধে ছাই ঢালিয়া বাসন্তীকে সে তো প্রত্যাখ্যান করিলই—করুক ইহার সঙ্গত কারণও প্রথমটা দেখাইয়াছিল; কিন্তু মাঝখানে শোনা গেল সে মেয়ের আজ তিন চার বছর ধরিয়া কোন খোঁজখবর নাই। তারপর সে যখন আসিয়া সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যার পুনঃপ্রাপ্তি সংবাদ জানাইয়া বলিল, আগত পরশ্ব বিবাহের দিন আছে সেই শুভলগ্নেই সে বিবাহ করিতে চাহে, তখন সত্যই তাঁহাকে সে বিস্মিত করিল, আহতও করিল। হউক কলিকাল তা বলিয়া এতখানি স্বাধীনভাব শোভা পায় না! গিরিজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "পরশু কেমন করে হবে? তোমার বাপভাইকেও কি জানাতে হবে না?" বিয়েপাগলা ছেলের আপাদ মস্তক যেন কম্পিত হইল, মুখ এতটুকু করিয়া সে কহিল "তাঁরা পূর্ব্বেই জানতেন, এখনই না-ই বললে বিয়ের পর একবারে লিখ। এদিনটা ছাড়া হতেই পারে না; মাসিমা ওরা ফাল্গুন মাসে রাজী নয়।"

"না হয় বৈশাখ মাসেই হবে, এত শীঘ্র কখনও বিয়ে হয় রে বাপু! খেলাঘরের বিয়ে নাকি? পত্র আছে, গায় হলুদ আছে, সামাজিক করতে হবে, নেমন্তন্ন, কুটুম সজ্জন, আনা—বলিস্ কি! একি হাড়িডোমের ঘর!"

শচীকান্তের মুখখানা একেবারে কালি

হইয়া গেল "পায়ে পড়ি মাসিমা, কিছু করোনা কাউকে খবর দিওনা—শুধু"—

ঢের ঢের বেহায়া ছেলেপিলে দেখা যায় এতবড় নিল্লর্জ্জ কেহ কখনও দেখে নাই! মনের ক্ষোভ বিরক্তি ক্রোধ এক সঙ্গে উথলিয়া উঠিল, মুখ রাঙ্গা করিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন "বেশ বাছা যা বোঝ করো আমরা বুড়োশুড়ো হয়েছি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ভালমন্দ চিনে উঠ্‌তে পারিনে!"

নিগূঢ় অভিমানে স্তব্ধ থাকিয়া যথাসম্ভব আয়োজনে মন দিলেন, কাশীতে এবং ভক্তিনাথকে সংবাদ পাঠাইতে বারণ করিয়াছে, রাগ করিয়া একটা খবরও দিলেন না, বাহিরের লোকের কাছে মান হারাইবার ভয়ে হরচন্দ্রকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, "পরশুর মধ্যে যাতে সামাজিক বিলি হয় তার বন্দোবস্ত কর।" বাজনার ফরমাস নিমন্ত্রণের ফর্দ্দও এই সঙ্গে তৈয়ারির আদেশ হইয়া গেল। নায়েব কহিল "যে আজ্ঞে সব হয়ে যাবে, কিন্তু এত শীঘ্র কেন? আগে কনে দেখাই হোক্ তারপর পত্র—

ক্ষোভের সহিত হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন "ওগো না না, সে সব ভাবনায় তোমার কাজ নেই, সে যে ভাববার সেই ভাবচে। পরশু বে'র আগে এগুলো হওয়া চাই নৈলে লোকে বলবে কি?"

আঁ্যা পরশু বে! দাদাবাবুর বে পরশু! পত্র টত্র হলোনা?"

"সে সব হয়ে গ্যাছে বল্লাম যে, এখন যাও যা বল্লাম কর, হরিপোদ্দারকে একবার ডেকে পাঠাও দেখি, যদি বৌভাত নাগাদ দুএকখানা কিছু গড়ে দিতে পারে।"

কল্যাণী মায়ের গম্ভীর মুখে তাঁহার বিরক্তির লেখা পাঠ করিলেও এ সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিল না, তাহার ভালবাসাভরা প্রাণটি দাদার সুখের অংশ ভাগ করিয়া লইয়া বিভোর হইয়াছিল। পরশু তারিখটা যদি নেত্রপল্লবকম্পনে অতীত হইয়া যায় তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই, কমলাকে কতক্ষণে সে দেখিবে সেই ঔৎসুক্য লইয়াই মনে মনে ছট ফট করিতেছিল।

বিবাহের বেশ পরিয়া বর কনকাঞ্জলি গ্রহণ করিল, বাহিরে হরচন্দ্র সময়ের অল্পতায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, গ্রামের প্রান্ত অবধি বাজনার দল; দেশের বালকগণ বরানুগমন করিবে বলিয়া ভিড় করিতেছিল, সিম্পান, পাল্কি, সালুমোড়া চতুর্দ্দোল কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে, অভিমান ভুলিয়া গিরিজাসুন্দরী পুত্রের চন্দনচর্চ্চিত ললাটে চুম্বন করিয়া ছলছল নেত্রে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, দিদি আজ কোথায়, এমন সময় সে যদি থাকত! সহসা বর স্খলিতকণ্ঠে ডাকিল "মাসিমা!" "বাবা?"

"আমি বিয়ে করবনা ওদের সব সরে যেতে বল!"

"কি বলিস্!"

"সত্যি বলচি আমি যাবোনা, না মাসিমা এখন সব বলতে পারব না পরে বলবো,—আমি বিয়ে করবো না—"

সে কলাতলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপর সিড়ির দিকে ফিরিল। কি যেন একটা ঘোর সংশয়ে তাহার কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বেশ বুঝা যাইতেছে চিত্ত সুখলেশহীন। গিরিজা অনুতপ্ত হইয়া ভাবিলেন তিনি রাগ করিয়া আছেন বুঝিয়া সে অভিমান করিতেছে।

মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া তাহার হাত ধরিলেন "পাগল-ছেলে! করিস্ কি?"

"না মাসিমা থাক্ আমি যাবোনা"

"তুই সময়ে না পৌঁছুলে সেখানে কি কাণ্ডটা হবে তা ভাবচিস্? রাত্রের মধ্যে যাকে পাবে তাকে ধরে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে, হয়ত কোন থুড়থুড়ে বুড়োর হাতে মেয়েটি পড়ে আজন্ম জ্বলে খুন হবে, বাপরে! এমন শত্রুও হ'তে আছে!"

বর মুহূর্ত্তে সচেতন হইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে ফিরিল।

জমীদার বাড়ীর বিবাহ, তাহাতে গিরিজা-সুন্দরীর ঘরে কখনও বধূগমন ঘটে নাই, পল্লীগ্রামে উৎসবের গন্ধে একেই ফুলবনে মধু-মক্ষিকাবৎ পাড়া মাতিয়া উঠে তাহার উপর এমন একটা সুযোগ। বড় বড় চুলা বানাইয়া অন্নসত্র খুলা হইয়াছে, সকলের জন্যই এ গৃহের দ্বার অবারিত, গরীব, গৃহস্থ, যে আসিতেছে গিরিজার নিয়োজিত লোকেরা পাত পাতিয়া পরিতোষ ভোজন করাইতেছে। পরিবেশনের যাতায়াতে উঠান কর্দ্দমে দধিতে পিছল হইয়া উঠিয়াছিল। দেরে, আয়রে শব্দের সঙ্গে জয়জয়কার মিশিয়া সর্ব্ব-ক্ষণই একটা কোলাহল জমাইয়া রাখিয়া-ছিল। দাসী চাকর, প্রজা, পড়সী রঙ্গিন কাপড়ে সাজিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে ত্রুটি করিতে-ছিল না। গিরিজার গৃহ অন্নদার যজ্ঞশালা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শারীরিক মানসিক সকল চিন্তা ভুলিয়া বর-বধূর কল্যাণার্থ অকাতরে সকলকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, বাঁধিয়া দিয়া, যে যাহাতে সুখী তাহাই সম্পন্ন করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

রান্নাবাড়ীর একদিকে যশোহর হইতে ভিয়ানকর আসিয়া রাশি রাশি মিঠাই মুড়কি ফেনি বাতাসা প্রস্তুত করিতেছে, পাঁচ সাত-জনে তাহা ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া পিতলের হাঁড়ি ভরিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে; পল্লীগ্রামের প্রথা মত বধূর মুখ দেখিয়া মিষ্টমুখ করিতে প্রতিজনে একটি করিয়া সমিষ্টান্ন হাঁড়ি ঘরে লইয়া যাইবেন। এই দিকেই পাড়ার ছেলে-গুলা ও রাজ্যের মাছি ঝাঁক বাঁধিয়াছে। গৃহিণী কর্ম্মব্যস্তভাবে এদিক ওদিক করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে আদেশ করিতেছিলেন "ওরে ছেলেদের হাতে দুটো দুটো মিষ্টি দিস্, ভিয়েন বন্ধ রেখে ঠাকুরদের একটু জল খেতে দাও, মতে মাছ এনেছে, ওকে এক সরা মুড়কির ওপোর গণ্ডাদুই মেঠাই দিয়ে বিদেয় করো।

গ্রামের শেষে বাজনদারগণ ষ্টেশনের নিকট অপেক্ষা করিতেছে। চতুর্দ্দোল, মহাপায়া পাল্কি লোক লস্কর সবই সেখানে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে হঠাৎ বাজনা বাজিয়া উঠিল, উৎকর্ণ পুরবাসী মহারোলে চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ বর ঐ বর আসচে।" চারিদিকে একটা হৈ চৈ সোরগোল পড়িয়া গেল, মলের ঝম্ ঝম্, বাজুর ও খোঁপার গুঁজিকাঠির ঘুঙ্গুরের ঝিন্‌ঝিনানি তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল। শশব্যস্ত বাটির গৃহিণী হাঁকিলেন "পূর্ণকুম্ভ ঠিক আছে তো? দুধের কড়ায় ভাল করে জ্বাল দিতে থাক, ওরে ও কল্যাণী ধানের কাঠাটা? ধানের কাঠা বরণ পিঁড়ির কাছে দেখচিনে কেন? নিয়ে আয় নিয়ে আয়। ন্যাঠা মাছটা কোথায় রেখেছিস্?" মহাশঙ্কে যুগল 'শঙ্খ দেবদত্ত

ও পাঞ্চজন্য একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল, লাজ-বর্ষিত গন্ধহীন পদ্ম, ও জীবন শূন্য ভ্রমর অঙ্কিত পথের দুইপাশে নারীবাহিনী উন্মুখ হইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল, ছেলেরা অসহিষ্ণু হইয়া রাস্তা দিয়া ছুটিয়াছিল।

বরকনের যান আসিয়া দ্বারে থামিল!" ওমা একি গো! এ কি কনে! এ যে সাত ব্যাটার মা ধেড়ে মাগী—"হরি বলো কে এই কনে তুলে কোমর ভাঙ্গবে, 'ওলো কল্যাণি। হাত ধরে নে আয়, কনে তোর মতন সাতটাকে চেপে মেরে ফেলতে পারে।" "একে তো এই বুড় কন্যে তার ওপর হাঁটু ঢেকে বস্তরও জোটেনি!" 'পায়ে দুগাছা মলও দ্যায়নি গা, অবাক—গিরিজা সুন্দরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এই বধূ ঘরে আসিল! কাহার মুখে তিনি হাত চাপা দিয়া বেড়াইবেন? শচী করিল কি? শুধু কল্যাণীই কোন বাধা মানিল না, একেবারে দ্বিধাশূন্য চিত্তে সে গিয়া বধূর হাত ধরিল। বিলম্ব সহিতে না পারিয়া সেইখানেই সে বধূর মুখের আবরণ তুলিয়া তাহার মুখে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্মিত হাস্যে কহিল "এসো লক্ষ্মী এসো"। কিন্তু গিরিজা সেই উন্মোচিত অবগুণ্ঠিতা নববধূর মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহার মনে হইল কবর খনন করিয়া শচীকান্ত একটা বহুদিনের মৃত নারীকে কোন যাদুমন্ত্র প্রভাবে তাহার পার্শ্বে উত্তোলন করিয়া আনিয়াছে। কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সুযোগমত শিশির কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল "এ বিয়ের সবই যেন হেঁয়ালি দেখচি; বউ কেমন দেখলে?" কল্যাণী অকপটে উত্তর করিল "কেন চমৎকার। দাদা সাধে পাগল হয়েছিল।"

শিশির এই সরলতার প্রতিমাকে তাহার সংশয়াকুল চিত্তের বৃথাভারে ভারাক্রান্ত করিতে চাহিল না, সে শুধু কহিল "কে জানে এসব কি রকম!"

"কি রকম?"

"না এমন কিছু নয়, মেয়েটির বোধ হয় মৃগী রোগ আছে, সাবধানে রেখ, সম্প্রদান টান সমস্তই মুর্চ্ছার মধ্যে হয়েচে।"

গিরিজাসুন্দরী কন্যাকে ডাকিয়া গোপনে কহিলেন "শচী কি কাণ্ডটাই করলে এমন লোকের কাছে মুখ পাওয়া দায়, তার ওপোর একটা বদ্ধ পাগল এত সৃষ্টি করে জোটালে! আমার যেন মাথামুড় খুঁড়তে ইচ্ছে করচে।"

কমলার অসামান্য সৌন্দর্য্য কল্যাণীর সংসার অনভিজ্ঞ কিশোর চিত্তের উপর মায়া যষ্টি স্পর্শ করাইয়াছিল। সে ব্যথিত হইয়া কেবলমাত্র কহিল "না মা বউ খুব ভাল হয়েচে পথের কষ্টে নিশ্চয় আজ ও রকম হয়ে আছে, কাল দেখো বেশ সহজ লোকের মত হয়ে যাবে।"

কিন্তু সে রাত্রির অবসানে পূর্ণ একটা দিন চলিয়া গেল তথাপি নববধূর মধ্যে পরিবর্ত্তনের লেশ দেখা গেল না, সেই একই উদ্‌ভ্রান্তভাব, অর্থহীন দৃষ্টি, বর্ণলালিত্য ঘুচিয়া গিয়া একটা শুভ্র বিবর্ণতা ক্রমেই তাহার ললাট গণ্ডে বিস্তৃত হইতেছিল, পাড়ার ছোট ছোট বধূ ও কন্যাগণ বিবিধ উপায় অবলম্বনেও যখন সেই পাংশু ওষ্ঠ হইতে এক বর্ণাত্মক একটি শব্দও

সংগ্রহ করিতে পারিল না তখন সকলেই বিরক্ত, ক্ষুব্ধ কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে বাড়ীময়, পাড়াময়, দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল জমীদার গৃহিণীর বোনপো রূপসী দেখিয়া একটা বিংশ বর্ষীয়া মূক্ উন্মাদকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। একালের ছেলেদের রূপতৃষ্ণার শত ধিক্ দিয়া দেশ জুড়িয়া একটা তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। শিশির জিজ্ঞাসা করিল "সত্যি কল্যাণি?" বিবর্ণমুখে কল্যাণী কহিল "হতেও পারে।"

"তোমার দাদাও এবার বুঝেছেন, তিনিও তো এদিকে শয্যাগত"।

"কে জানে, এ আবার কি হলো!"

বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ

পূর্ব্বকালে পরমাণু বস্তুর সূক্ষ্মতর অংশ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু ইদানীং ইহাদের মধ্যেও শত শত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু (কর্পাস্কল্ Corpuscle) বিদ্যুৎবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় দুইটি হাইড্রোজেনের (Hydrogen) পরমাণু ও একটি অক্সিজেনের (Oxigen) পরমাণু একত্রিত হইয়া যখন একঅণু জলকণিকা প্রস্তুত হয়, তখন এই সকল 'কর্পাসকোলের' কি একটা ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। কেবল জলাণু নহে, এইরূপে অন্যান্য নানা জাতীয় পরমাণুর সংমিশ্রণে যখন বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয় তখন তাহার মধ্যে যে সংঘর্ষণ ক্রিয়া চলে, তাহা চিন্তা দ্বারাই মাত্র কথঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পাবে, তাহার এককোটি ভাগের একভাগও প্রত্যক্ষ-ভাবে আমাদের অনুভূত হয় না। যথা চূণ এবং হরিদ্রা মিলিত হইলে সামান্য রকম উত্তপ্ত হইয়া বর্ণ পরিবর্ত্তিত করে,—আমরা কেবলমাত্র সেইটুক উপলব্ধি করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা একটি ভয়ঙ্কর কাণ্ড বলিয়া অনুমিত হইবে। একখানা চলন্ত জাহাজ জলনিমগ্ন শৈলে লাগিয়া নিমেষ মধ্যে চূর্ণীকৃত হইলে যে বিস্ময়-জনক কাণ্ড ঘটে, পূর্ব্ববর্ণিত হরিদ্রা ও চূণের রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও প্রায় সেইরূপ। কিন্তু সাধারণ চক্ষে এ সকল কাণ্ড আমরা কিছুই দেখিতে পাই না এইজন্যই চতুর্দ্দিকের পদার্থ দিগকে আমরা নির্জীব নিশ্চেষ্ট মনে করি। কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখিতে গেলে সর্ব্বদাই আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুসমূহে এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রতিমুহূর্ত্তে ঘটিতেছে বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে।

যখন আমরা সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন উহাকে একটা ভয়ানক শক্তিমান্ পদার্থ বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে, ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে, এবং সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতিতেও আমরা ঈশ্বরিক শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকি। সেইজন্যই হিন্দুরা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও অগ্নিদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতির কেহ পূজা করেন না। তাহার কারণ সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার মধ্যে কোন ঐশ্বরিক শক্তি উপলব্ধ হয় না। অথচ

ভাবিতে গেলে সূর্য্যের মধ্যে যে কাণ্ড হইতেছে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বস্থানে সকল বস্তুর মধ্যে অহরহঃ প্রায় ঐরূপই কাণ্ড ঘটিতেছে।

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহার কোন অংশ কোমল, কোন অংশ তরল, কোন অংশ বাষ্পীয়। জীবদেহ ও উদ্ভিদ লতাপাতা প্রভৃতি সমুদয়েরই নির্ম্মাণ এইরূপ। মনুষ্য দেহে অস্থি কঠিন, মাংস কোমল, রক্তরস তরল ও ফুসফুসে বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত যে কতকগুলি জীবন্ত বস্তুর সমষ্টিতে প্রত্যেক দেহ নির্ম্মিত, তাহার প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিতে গেলে পৃথক পৃথক বস্তু বলিয়া বোধ হয়। যথা দেহ মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন কোষ, রক্তের শ্বেত কণিকা, রক্তকণিকা, আরো সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে শরীরের প্রত্যেক অংশই জীবন্ত পদার্থের সমষ্টি, তাহাদের প্রত্যেককে ভিন্ন পদার্থ বলিলেও বলা যায়; পক্ষান্তরে আমরা সেই ভিন্ন ভিন্ন জীবন্ত পদার্থের সমষ্টিকে "আমি" বলিয়া মনে করি। এই অনন্ত সৌরজগতেরও নির্ম্মাণ এইরূপ। যথা কোন স্থান কঠিন, কোন স্থান তরল, কোন স্থান বাষ্পীয়, এবং সকল স্থানই সূক্ষ্ম ইথারের অন্তর্গত। যদি আমরা বিদ্যুৎবেগেও উত্তর দিকে চলিতে থাকি তাহা হইলেও অনন্ত কোটি কোটি বৎসরে তাহার অন্ত পাইব না। সেইরূপ দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি সকল দিকই অসীম অনন্ত। তথাপি যেরূপ আমার দেহকে একটি ভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে করি সেইরূপ পূর্ব্ববর্ণিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকেও একটিমাত্র বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণুরই একটা শক্তি আছে, শক্তি ছাড়া পরমাণু হয় না, পরমাণু ছাড়াও শক্তি হইতে পারে না। সুতরাং যদি কেহ পরমাণুকে শক্তি হইতে তফাৎ করিয়া শক্তিকেই বা পরমাণুকেই ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করেন, তবে বিজ্ঞান বলিবে তাহা ভুল। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে হিন্দুরা পরমাণুকে শিব এবং গুণকে শক্তি বলিয়া আদ্যাশক্তি রূপে পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং এহিসাবে সমুদয় অখিল ব্রহ্মাণ্ড শিব ও শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। অথবা এক ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় আর কিছুই নাই— অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম, খেচর, ভূচর, আকাশ নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যত কিছু সমুদয়ই ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নহে। এইজন্যই বোধ হয় ঈশ্বরের স্তবে বলা হয়, তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি শিব, তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি বরুণ, তুমি স্থাবর তুমি জঙ্গম, ইত্যাদি। আবার চণ্ডীতে বলা হইয়াছে "নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।' "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।" এইরূপে ছায়া, লজ্জা, আলো ইত্যাদিকেও উহার মধ্যে স্থানদান করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই অনন্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঈশ্বর ব্যতীত বাকি কি রহিল? মোটামুটি বলিতে গেলে কিছুই রহিল না।

আবার মোসলমান ধর্ম্মের প্রথম কথাই

"কলেমা"। তাহার একইরূপ অর্থ, যথা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রসুলল্লাহু" ইহার অর্থ "ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই।" ইংরাজীতে There is nothing but God : সেইরূপ ভাবে একজন অদ্বৈতবাদী বলিবেন "শিবোহম্" অর্থাৎ আমি ঈশ্বর।

সমুদ্র হইতে এক কলসী জল উঠাইলে উহা একটি ভিন্ন পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু কলসী ভাঙ্গিয়া দিলে পুনবায় সমুদ্রের জল সমুদ্রেই মিলিত হয়, পৃথক ভাব থাকে না, সেইরূপ মনুষ্য জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদয় বস্তুই যাহা একবার ভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হয়, তাহা আবার সেই অনন্ত ঈশ্বরেই বিলীন হইয়া পড়ে। তাহা হইলে এক্ষণে বলিতে হইবে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই ঈশ্বর।

অধিকাংশ লোকে বলেন যে, "ঈশ্বর সমুদয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাহা হইলে তিনি কোথায় থাকিয়া কিরূপে এসকল সৃষ্টি করিলেন? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শূন্য স্থান নাই, তাঁহার থাকার স্থান কোথায়? ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তা কে"? ইহার উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে চৈতন্যস্বরূপ নিরাকার ঈশ্বরের আর থাকার স্থানের প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। তাহা হইলে প্রকারান্তরে হিন্দুদিগের সেই আদ্যাশক্তিই আসিয়া পড়িল, অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুর অন্তরালে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তিই আদ্যাশক্তি; এবং তাহাই ব্রাহ্মদিগের নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর। বিজ্ঞানের মতে এ শক্তি "পরমাণুর" সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাহা হইলে সেই পূর্ব্বকথা আসিয়া পড়ে, আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। সেই আধাররূপ পরমাণুই তাহা হইলে শিব ও তাহাদের শক্তিই আদ্যাশক্তি অথবা পরমেশ্বর। বস্তুত বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিব ও শক্তি পৃথক নহে তাহাই ঈশ্বর। কিম্বা অন্যভাবে বলিতে গেলে অনন্ত, অসীম, অনাদি, অনশ্বর, অপরিমিত শক্তিস্বরূপ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই সর্ব্বশক্তিমান, পরমেশ্বর।

ঈশ্বর "স্বয়ম্ভূ" এই কথার উত্তর দেওয়া হয় নাই। বিজ্ঞান-জগতে সৃষ্টি ও লয় বলিয়া কিছুই নাই। অর্থাৎ কোন বস্তু সৃষ্টিও হইতে পারে না ধ্বংসও হইতে পারে না; তবে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এ বিষয় সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবে। যথা এক খণ্ড কাষ্ঠ অগ্নিতে দাহন করিলে উহার কতক অংশ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dyoxcied) রূপে আকাশে উড্ডীয়মান হয়, কতক অংশ বাষ্পরূপে পরিণত হয় ও অবশিষ্ট ভস্মরূপে অবস্থান করে। ইহার কোন অংশই একবারে ধ্বংস হয় না,—অথবা কোন অংশ ধ্বংস করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেইরূপ কোন বস্তু সৃষ্টি করাও কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে বা সৃষ্টি হওয়াও সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত হইতে পারে যে মাটী দিয়া একটি ঘট প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিন্তু বিনা মাটীতে ঘট প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহাকেই সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। এইরূপ সৃষ্টি হওয়া বিজ্ঞানের মতে একেবারেই অসম্ভব। তবে যে সকল বস্তু বর্ত্তমান আছে তাহারই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। তাই বলিতে হয়, ঈশ্বর অনন্তকাল হইতেই আছেন ও থাকিবেন। সৃষ্টিও হয় নাই ধ্বংসও হইবে না।

এস্থলে আর একটি কথা এই যে প্রত্যেক পরমাণুকে আমরা সাধারণ ভাবে যেরূপ নির্জ্জীব জড় পদার্থ বলিয়া মনে করি বাস্তবিক তাহা নহে। প্রত্যেক পরমাণুরই শক্তি আছে ও জীবন্ত পদার্থের ন্যায় তাহা কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান। তাহার সহজ দৃষ্টান্ত এই যে, গর্ভের মধ্যে যখন অণ্ড শুক্রকীটের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভৌতিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও গঠিত হয়, তখন তাহাতে একটি চমৎকার বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষু সম্বন্ধে দেখ— কোন জীববস্তরই চক্ষু পায়ের তলায় হয় না; উহা এমন স্থানে রক্ষিত, যাহাতে চতুর্দ্দিকে ভালরূপে দৃষ্টি করা যায়। আবার আরো সুক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে (Iris) আইরিস নামে একটি পর্দ্দা আছে, যাহার মধ্যস্থিত ছিদ্র দিয়া আলো চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে, যদি এই আলো প্রখর হয়, তাহা হইলে ঐ ছিদ্রটি প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া অতিরিক্ত আলোককে চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। সেইরূপ যখন পাকাশয় শক্ত বস্তু পরিপাক করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই দন্তোদ্গম হয়, এই সকল দন্তের মৌলিক অংশ মাড়ির ভিতর অবস্থান করে, সময় অনুসারে বাহিরে বহির্গত হইয়া উহারা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। এইরূপে মনুষ্য-দেহের প্রত্যেক অংশের কারুকার্য্যেই বুদ্ধির সমাবেশ দেখা যায়। তবে পরমাণু-সমাবেশের তারতম্য অনুসারে বুদ্ধিবিকাশের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা পরমাণু সমাবেশের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন মস্তিষ্কে বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, ধারণা, মেধা, বিচারশক্তি প্রভৃতির তারতম্য হইয়া থাকে। আবার যখন মৃত্যুর পর এই সমাবেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন ঐ সকল পরমাণু নির্জ্জীব, বুদ্ধিহীন, মৃত্তিকাবৎ হইয়া মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়। পুনরায় ঐ সকল পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন জীব, জন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতির দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বৃক্ষ লতাদির অনুভব শক্তি প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি জড় পাথরও একেবারে অনুভব শক্তি-বর্জ্জিত নহে বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

কেহ বলিতে পারেন, আমি একটি ভিন্ন বস্তু, সে আর একটি, ইহারা যদি সকলেই ঈশ্বর হন, তাহা হইলে "আমি" তুমি" এই জ্ঞান কেন? ইহার উত্তর এই, কেবল অল্পকালের জন্য পরমাণু সমাবেশের বিভিন্নতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে, কিন্তু কালের গতিতে সেই ভিন্নভাব কিছুকাল পরে পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। যেমন সমুদ্র হইতে এক বোতল জল উঠাইয়া আনিলে উহা সমুদ্র হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, আবার বোতল ভাঙ্গিয়া দিলে, সমুদ্রের জল সমুদ্রে গিয়া এক বিস্তীর্ণ জলরাশিতে বিলীন হইয়া এক হইয়া যায়, আমাদের দেহও কিছুকাল পরে সেইরূপ অবস্থাতে পরিণত হয়, তখন আর "আমি" বলিয়া একটি ভিন্ন বস্তু-জ্ঞান থাকে না। আমি যাহাকে "আমি" বলি তাহার মধ্যেও চিন্তা করিয়া দেখিলে আমার ন্যায় অনেক আমির সমষ্টি বোধ হইবে। যথা আমার দেহের কোষ, রক্তকণা, শ্বেতকণা (phaguacyte) ফেগাসাইট, (anti-

body) এণ্টিবডী প্রভৃতি। উহাদের মধ্যে আমিত্ব জ্ঞান আছে কি না সে বিষয় নির্ণয় করা কঠিন; তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের মস্তিষ্ক আছে তাহার আমিত্ব জ্ঞান সামান্যই হউক আর অধিকই হউক আছে। কিন্তু (Phaguacyte) ফেগাসাইট্ (Antibody) এণ্টিবডী প্রভৃতির সেইরূপ জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক তাহারা যে ভাবে কার্য্য করে তাহাতে আপন ও শত্রু বুঝিয়া কাজ করে; সুতরাং তাহাদিগকেও মস্তিষ্কযুক্ত কীটের চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবিত বস্তু বলিলেও ভুল হয় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আমার দেহ বহুসংখ্যক "আমি" দ্বারা গঠিত। আবার পৃথিবী বহুসংখ্যক জীব জন্তু উদ্ভিদ ইত্যাদির সমষ্টি। আবার গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য এক একটি পৃথিবীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবী। ইহাদের মধ্যে সংযোজক যে (ether) সেই ইথার সহ ধরিতে গেলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আবার এক। সেই অসীম এক ব্রহ্মাণ্ডই পরমেশ্বর।

(ডাক্তার) শ্রীনিবারণচন্দ্র সোম।

দুয়ানি

(১)

প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝঙ্কার।
বাণহীন ধনুকের ছিলার টঙ্কার॥

(২)

কেবল কথার রাজ্যে বিস্তারে প্রভাব।
ছোট ছোট হৃদয়ের বড় বড় ভাব॥

(৩)

ডুব দিয়ে অন্তরের অতল সাগরে
কেহ বা মুকুতা তোলে, কেহ ডুবে মরে॥

(৪)

খুঁজোনাকো সৌন্দর্য্যের গোড়াকার অঙ্ক।
ফুলের গাছের মূলে পাবে শুধু পঙ্ক॥

(৫)

শ্রোতা বলে রাগ বাজে শুধু এক তারে।
তবে কেন বাজে তার সাজে ডান্ ধারে॥

(৬)

কাঁদ যদি বসে উচ্চ হিমালয় শিরে।
প্রতি বিন্দু অশ্রু হবে হাস্যোজ্জ্বল হীরে॥

(৭)

অয়স্কান্ত মহাকাশ মনের চুম্বক।
মন যার লোহা, তার সহজ কুম্ভক॥

(৮)

দ্বারে এসে অবশেষে রাথ শ্রান্ত কায়া।
পড়েছে মুখেতে তাই কপাটের ছায়া॥

(৯)

বহুকাল তরুতলে আছ ধ্যানে বসি'।
জাননা পড়েছে সব পাতাগুলি খসি॥

(১০)

যদিচ অনন্ত বটে সুমুখের পথ।
শেষের আশার বাষ্পে চলে মনোরথ॥

(১১)

বিশ্বছন্দ গড়ি, দিয়ে পদে পদে যতি।
পদে পদে স্থিতি বিনা নাহি হয় গতি॥

(১২)

পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা।
দেখিবে সেথায় আছে দাঁড়ায়ে প্রতিমা॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সৌধ-রহস্য

নবম পরিচ্ছেদ

ইজরেল টেক্সের বিবরণী শেষ হইয়াছে। এইবার ডাক্তার ইষ্টারলিং যিনি আজি পর্য্যন্ত ষ্ট্র্যানরেয়ারে সম্মানের সহিত ডাক্তারি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারই কথা কিছু জানাইব।

জেনারল হিথারষ্টনের ক্লুমবার হলে আগমন কালের মধ্যে একবার মাত্র ডাক্তার ক্লুমবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই এমন কতকগুলি ঘটনা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যাহা না বলিলে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ডাক্তার তাঁহার বহুমূল্য সময়ের ক্ষতি করিয়াও যে তাহা লিখিয়া দিয়াছেন সে জন্য এই অবসরে আমি তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার লিখিত বিবরণটি তাঁহারই ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।--

"মিঃ জিল ওয়েষ্টের অনুরোধে আমি এই রহস্যময় বৃত্তান্তটি লিখিতে ঈষৎ কৌতুকপূর্ণ আনন্দই অনুভব করিতেছি। মিঃ ওয়েষ্ট যতদিন এখানে আছেন তাঁহাকে আমি ততদিন হইতেই জানি। তাহার শুভ্র সরল সাধু চরিত্র, লোকপ্রিয়তা, বিনয়নম্র ব্যবহার, আর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত সুন্দর চেহারা এই সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের জন্য আমি তাঁহাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি।

জেনারেল হিথারষ্টনের বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ কাহিনীট জন সাধারণকে জানিতে দেওয়াও আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

গতবৎসর সেপ্টেম্বরের প্রথমেই একদিন প্রভাতে ক্লুমবার হলের মিসেস্ হিথারষ্টনের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রে তিনি তাঁহার স্বামীর শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ দিয়া, সেই দিনই আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

যদিও আমার বাহিরের বিষয় লইয়া মস্তিষ্কের পরিচালনার অবসর খুব অল্পই ছিল, তথাপি ঐ খেয়ালি, অদ্ভুত নির্জ্জনতাপ্রিয় জেনারেলের সম্বন্ধে অবসর কালে কখনও কখনও চিন্তা আসিত। জানিতে ইচ্ছা হইত লোকটার ভিতরের প্রচ্ছন্ন কোন গভীর রহস্য আছে কিনা। মিসেস্ হিথারষ্টনের আহ্বান অবিলম্বেই পালন করিতে মনস্থ করিলাম।

ক্লুমবারের পূর্ব্বতন অধিকারী মিষ্টার ম্যাক্‌ভিতির আমলে এই তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ পথ দিয়া অনেকবার আমি ক্লুমবার হলে যাতায়াত করিয়াছি। কিন্তু এবার সেই চিরপরিচিত ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ রঙ্গের রেলিং ঘেরা প্রকাণ্ড ফটকটার সম্মুখে আসিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। যে উন্নতশীর্ষ সিংহদ্বার তাহার বিরাট বক্ষ মুক্ত করিয়া দিবানিশি অভ্যাগতগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইত, এখন তাহা সামান্য একটা লৌহের কুলুপে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বাড়ীটার চারিদিকের যে সবুজ শোভা দূর হইতে দর্শকের চক্ষুকে আকর্ষণ করিত সেই শ্যামস্নিগ্ধ কোমল চিক্কণতা অপ্রিয়দর্শন কঠোর কাষ্ঠপ্রাচীরের বেষ্টনে বেষ্টিত। দেখিলেই জেলখানার দৃশ্য মনে পড়ে। গাড়ী চলিবার রাস্তাটা—শুষ্ক পত্র ও আগাছায় পরিপূর্ণ। বাড়ীটার চারিদিকেই কেমন একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ নিরানন্দের ভাব, বাতাসটাও যেন দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত।

ফটকে দুই তিন বার ধাক্কা দিবার পর একজন দাসী আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল, এবং দুই তিনটি ঘর পার হইয়া একটি ছোট ঘরের ভিতরে আমায় লইয়া গেল। ঘরের ভিতর একখানা সোফার উপর একটী স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন, ইনিই মিসেস্ হিথারষ্টন্। রমণীর বিবর্ণ ম্লান মুখে, জ্যোতিহীন নেত্রের করুণ কটাক্ষে, অকালপক্ক রজত কেশরাজিতে, এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ বেশভূষায় সেই দুঃখপূর্ণ প্রাসাদটার সহিত সামঞ্জস্যই বিধান করিয়াছিল।

অত্যন্ত মৃদু শান্তস্বরে মিসেস্ হিথারষ্টন কহিলেন "ডাক্তার—আপনি বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছেন, আমরা ভারী কষ্টে পড়েচি, কিছুদিন থেকেই আমার স্বামীর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে-সেইজন্যে আমরা এই শান্তিপূর্ণ নির্জ্জনতা তাঁর স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী ভেবে এখানে এসেছিলাম,—আমরা ভুল করেচি ডাক্তার,—এখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল থাকা দূরে থাক্ দিন দিন তিনি ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে যাচ্চেন। আজ সকালে তাঁর জ্বর হয়েছে—এমন প্রবল জ্বর—যে আমি ও ছেলেরা ভয় পেয়ে আপনাকে ডাক্‌তে পাঠাই,—আসুন তাঁকে দেখে যা হয় উপায় স্থির করুন,—বোধ হয় বিকার হয়েচে।" উদ্বেগ ও আশঙ্কায় রমণীর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল।

কয়েকটি দালান ও ঘর পার হইয়া, আমরা একটা আস্‌বাবহীন কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ ঘরখানি একেবারে বাটীর শেষপ্রান্তে অবস্থিত। কক্ষতলে গালিচা নাই। গৃহসজ্জাও যৎসামান্য,—একপাশে একটা চৌকা টেবিল, টেবিলের উপর কতকগুলা বাঁধান স্বর্ণাক্ষর যুক্ত পুস্তক, কাগজ পত্র, এবং একটা বৃহদাকার বস্ত্রাচ্ছাদিত পদার্থ। টেবিলের অদূরে একখানা কৌচের উপর শয্যায় রোগী শায়িত।

কক্ষ মধ্যে কোন মূল্যবান গৃহসজ্জা না থাকিলেও কক্ষগাত্রে এবং ঘরটির চারি কোণে নানা আকারের নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত ছিল। কতকগুলা ছোরা, কাটারী এবং ভারতীয় ও এসিয়াদেশজাত বহু প্রকারের বহুতর অস্ত্রাদি: কতকগুলি কাটারির বাঁট ও তরবারির খাপ বহুমূল্য প্রস্তর ও সুবর্ণের কারুকার্য্যযুক্ত। এক এক খানি তরবারির খাপে এমন সব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত যে দেখিলেই তাহা কোন উন্নত সৌখীনরুচি সৈনিকপুরুষের দ্রব্য বলিয়া সহজেই অনুমান হয়। কক্ষসজ্জার হীনাবস্থা এবং কক্ষগাত্রের অস্ত্র শস্ত্রাদির মহার্ঘতা, যুগপৎ দর্শকের চিত্তে বিষম বৈষম্যের পরিচয় প্রদান করিতে থাকে।

জেনারলের এই সকল সখের দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার সুযোগ ঘটিল না। জেনারলকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইল

যে সেই মুহূর্ত্তেই আমার সাহায্য তাঁহার প্রয়োজন হইবে। তিনি বাহিরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। নিশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত পতিত হইতেছিল, খুব সম্ভব আমাদের আগমন তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

আমি ঘুরিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। চক্ষু মুদ্রিত—মুখের আরক্তিম ভাব জ্বরের প্রবলতার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। শয্যার নিকট একটুখানি নত হইয়া নাড়ী পরীক্ষার জন্য আমি তাঁহার উত্তপ্ত দক্ষিণ হস্তখানি আপনার অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিলাম।

সহসা যেন কোন অতিমানসিক বলে রোগী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া সজোরে আমার ললাটে একটা ঘুসি বসাইয়া দিল। তাঁহার চক্ষে এমন ভয়ের ও উদ্বেগের ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যে আমি আমার ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতায় অপর কোন রোগীর চক্ষে এমন ভয়ানক ভাব কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমায়-ছেড়ে দাও, আমি বল্‌চি—আমায় ছেড়ে দাও, আর তোমার ঐ ঠাণ্ডা হাত আমার উপর থেকে উঠিয়ে নাও,—ওতে মরণের ছায়া লেগে আছে। সমস্ত জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গ্যাছে - এতেও কি শোধ হয় নি,—একটা জীবন এ কি ঢের নয়,—কবে,—কতদিনে আমার ছুটি হবে, কতদিন—কত—দিন—আমি এম্‌নি করে সহ্য করে বেঁচে থাকব ?"

মিসেস হিথারষ্টন্ তাঁহার রুগ্ন স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে—আপনার শীতল, শীর্ণ হস্তখানি জেনারলের তপ্তললাটে মর্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন "চুপ কর,—চুপ কর,—শান্ত হও—দেখ্‌চ না, ইনি ডাক্তার ষ্টারলিং,—ইনি তোমার কোন ক্ষতি কর্‌বেন না—তোমার রোগ আরাম করে, তোমায় সুস্থ করে দেবেন এখুনি!" আকস্মিক অত্যধিক উত্তেজনার পর যেমন অবসাদ আসে জেনারলেরও সেইরূপ ভাব হইল, তিনি অত্যন্ত শ্রান্তভাবে বালিষের উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের ভাব ও বর্ণ, যেন রামধনুর বর্ণ পরিবর্ত্তনের মতই দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল বিকারের ঝোঁক্‌টা সম্পূর্ণই কাটিয়া যাইতেছে। এবং পত্নীর বাক্যের অর্থও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

বগলে থারমোমিটার যন্ত্র লাগাইয়া আমি তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন-শব্দ গণনা করিতেছিলাম, স্পন্দনের সংখ্যা ছিল—একশত কুড়ী, জ্বরের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, এটা ম্যালেরিয়া ফিবার! জীবনের ভূরিভাগ যাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কাটাইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে—এ রোগ,—তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী!

থারমোমিটারটা 'কেসের' মধ্যে ভরিতে ভরিতে আমি বলিলাম "কিছুই হয় নি, সামান্য মাত্রায় কুইনাইন্ আর আর্সেনিক, দিলেই জ্বর ছেড়ে যাবে, শরীর সার্‌তেও সময় লাগ্‌বে না, এম্‌নি সাধারণ জ্বর।"

একটা দীর্ঘকালস্থায়ী নিশ্বাস ফেলিয়া জেনারল কহিলেন "এঃ,—কোন বিপদ নেই"! কথার সুরে মনে হইল যেন কঠিন রোগ ও

বিপদ নিকটবর্ত্তী শুনিলেই তিনি খুসী হইতেন। "আমি জানি, —আমাকে মারাও যত কঠিন ভবঘুরে নাগা ফকিরগুলোকে মারাও ঠিক্ তাই। মেরী,—আমার মাথাটা বেশ্ সাফ্ হয়ে গেছে, —আমাকে ডাক্তারের কাছে কিছুক্ষণের জন্যে রেখে তুমি বাইরে যাও।"

মিসেস হিথারষ্টন্ স্বামীর বাক্যে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিতই মৃদু পদসঞ্চারে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

আমিও রোগীর বক্তব্য শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার বিছানার আর একটু নিকটে চেয়ার টানিয়া লইলাম।

জেনারল কহিলেন "ডাক্তার, আমি আগে একবার লিবারটা পরীক্ষা করতে অনুরোধ কচ্চি। পূর্ব্বে এই জায়গাটায় ফোড়া হোত। ব্রোডি,—আমাদের পারিবারিক ডাক্তার বলেছিলেন যে, এ জায়গায় ফোড়া হলে শতকরা পাঁচটা রোগীও বাঁচে কি না সন্দেহ? যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ছেড়ে এসেচি—আশ্চর্য্য আমার আর কোন কিছুই হয়নি। এই, এই খানটা—য়, পাঁজরার ঠিক নীচেটা?" আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া কহিলাম "আমি আপ্নাকে খুব আহ্লাদের সঙ্গেই জানাচ্চি, যে সেটা একেবারে শুখিয়ে গিয়েচে, কোনও অপকার কর্‌বারই আর ওর শক্তি নেই।"

আমার শুভসংবাদে তিনি যে কিছু খুসী হইলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া এমন কোন ভাবই বুঝিতে পারা গেল না, বরং এ সংবাদে তাঁহাকে যেন একটু বিরক্ত বলিয়াই মনে হইল। হয়ত আমার সেটা ভ্রম!

একটু চিন্তিত ভাবেই তিনি কহিলেন "ঘটনাগুলো চিরদিনই আমার বিরুদ্ধে এম্‌নি করেই ঘটে আস্‌চে! যদি আমি ছাড়া অপর কোন লোকের এই রকম জ্বর আর বিকার হোত, আপনারাই বলতেন, লোকটা বাঁচবে না—পীড়া মারাত্মক, অথচ সেই আপনিই বল্‌চেন আমার সে সব কিছুই ভয় নেই। আচ্ছা, এইটে দেখুন দেখি,—" তিনি তাঁহার বক্ষাবরণ উন্মুক্ত করিয়া ঠিক্ হৃদয়ের উপরকার একটা দাগ দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, একটা পাহাড়ীর গোলা এইখান দিয়ে চলে গেছ্‌ল। আপনি হয়ত মনে কর্‌বেন এটা এমন জায়গা যেখানে লাগলে মানুষ সেই মুহূর্ত্তেই মারা প'ড়ে, কিন্তু দেখুন,—এতে আমার আর কি হবে—বুক দিয়ে গোলাটা ঢুকে পিঠ্ দিয়ে সোজা চলে গেল। আপ্‌নারা, ডাক্তাররা—যাকে "প্লিউরা" বলেন তাতে ঠেক্‌লাই না—এম্‌নি আশ্চর্য্য! এমন আর কখনও দেখেচেন?"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তরচ্ছলে কহিলাম "আপনি নিশ্চয়ই কোন শুভগ্রহে জন্মগ্রহণ করেচেন,—তা না হলে—"

মাথা নাড়িয়া জেনারল কহিলেন "না, সে সব মনের সংস্কার! দেখুন ডাক্তার, যদি সাধারণ ভাবে মৃত্যু আসে, আমি—তাকে একটুকুও ভয় করি না,—সৈনিকে মৃত্যু ভয় করে না, কিন্তু আমি স্বীকার করছি—আপনি হয়ত বল্‌বেন এটা আমার স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, কিন্তু সত্যসত্যই কোন রকম অস্বাভাবিক মৃত্যুভয়ে আমায় স্নায়ুমণ্ডলীকে একেবারে বিকারগ্রস্ত করে তুলেচে, এ কল্পনা নয়, আমি তার বাস্তবছায়া দিনরাতই যেন চোখের উপর দেখ্‌তে পাচ্চি।"

একটুখানি বিস্ময়ে থতমত খাইয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম "কেন, আপনি কি অস্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করেন?"

"না আমি ঠিক্ ও ভাবের কথা বলিনি, শীতল ইস্পাৎ বা গুরুভার সীসক, এদের সঙ্গে আমি এত বেশী পরিচিত যে এরা আমার আর ভয়ের জিনিষ নয়। ডাক্তার, আপনি দৈব বলের ক্ষমতা সম্বন্ধে জানেন কিছু?"

"মহাশয়, আমি ও সবের কোন খবর রাখি না।" উত্তরের সহিত দ্রুত কটাক্ষে আমি আমার রোগীর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। কারণ তাঁহার কথার ভাবে আমার মনে সন্দেহ জন্মাইতেছিল যে তাঁহার বিকার পুনর্বায় ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু না—জ্বরের আরক্ত ভাব সম্পূর্ণ রূপেই মিলাইয়া গিয়াছিল। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা দীপ্যমান। "আঃ,—পশ্চিম দেশীয় বিজ্ঞানবিদ্ আপনারা, এ সকল বিষয়ে ঢের পিছনে পড়ে আছেন। পার্থিব শারীরিক সুখবিধানের উপায় যে সব জড় বিজ্ঞানে নিহিত আছে, সে সবে আপ্‌নারা যে খুব দ্রুত উন্নতি কচ্চেন সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পার্‌বে না, কিন্তু, এ ছাড়া প্রকৃতির অসীম ক্ষমতা—আত্মার যে পার্থিব মহান্ শক্তি—তাতে ভারতবর্ষের একটা সামান্য মুটে মজুরও আমাদের চেয়ে এত বেশী উন্নত, যে বহু শতাব্দির বহু পরিশ্রমেও আমরা তাদের সমকক্ষ হতে পার্‌ব না। বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকার সূত্রে—গোমাংস ভক্ষণে আর বিলাসব্যসনে দেহসুখ ভোগ করে—আমাদের আত্মা পশুপ্রবৃত্তির কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে পড়েচে। এখন এত নীচে আমরা নেমে গেছি, দেহ যাহা আত্মাচালিত একটি যন্ত্রস্বরূপ হওয়া উচিত, সেই আত্মাকেই দেহ যেন গারদ ঘরে ভরে রেখেচে। ভারত-বাসীর আত্মা ও দেহ এমন ভাবে জড়িত হয় নাই,—সেই জন্যই যখন মৃত্যুতে আত্মার সহিত দেহের বিচ্ছিন্নতা ঘটায়,—তখন তাঁদের এমন বেগ পেতে হয় না, বা এ রকম মোচড় দেয় না।"

আমি অবিশ্বাসের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিলাম "এই পার্থক্যের দরুন, তাদের কিই বা এমন উপকার হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়, কেবল উন্নত জ্ঞানের যে উচ্চফল তাই তাদের লাভ! আপনি যদি কখনও ভারতবর্ষে যান, প্রথমেই একটা সামান্য বিষয়ে নজর পড়্‌বে। উদাহরণ স্বরূপ দেখাই—ধরুন, আমোদ আহ্লাদের বিষয়,—মনে করুন একটা লোক আপনার সাম্‌নে একটি আমের আঁটি পুত্‌লে, তারপর তার উপর আমাদের অজ্ঞাত কোন রকম মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করতে লাগল, দেখতে দেখ্‌তে অঙ্কুর - অঙ্কুর থেকে গাছ,—গাছে পাতা, মুকুল, ফল—ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নবজাত বৃক্ষে সুপক্ক আম্রের আবির্ভাব। এসব চালাকী—বা ভেল্কী নয়, এ তাদের একটা বিশেষ শক্তি, এই লোক গুলো আপনা-দের "টিনডেল" বা হাক্সলির চেয়ে প্রকৃতি রহস্যে ঢের বেশী অভিজ্ঞ। তারা ইচ্ছা শক্তির চালনায় প্রকৃতির গতি এমন ভাবে বর্দ্ধিত বা রুদ্ধ করতে পারে যে আম্‌রা সে

কল্পনাও করতে পারি না। আমি যাদের উদাহরণ দেখালুম এরাত সব নীচ জাতীয় যাদুকরের দল। কিন্তু যাঁরা উচ্চজ্ঞানের এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করেচেন তাঁদের সঙ্গে ঐ যাদুকরদের—যেমন আমাদের সঙ্গে হটেনটট্ বা প্যাটাগোনোয়ারদের তফাৎ তেমনিই তফাৎ।"

একটু হাসিয়া আমি কহিলাম "আপনি যেন তাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত—এম্নি ভাবেই কথা বল্‌চেন?"

জেনারল তাঁহার উত্থিত মস্তক ক্লান্তভাবে বালিসের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন "সত্যি, রীতিমত ঠেকেই আমায় শিখ্‌তে হয়েচে কিনা; আমি যেমন ভাবে তাঁদের সঙ্গে মিশেছিলেম, আমার কোন দুর্ভাগ্য শত্রুও যেন তেমন করে তাঁদের সঙ্গে না মেশে,—সে কথা থাক্—আপনার কিন্তু এ সকল বিষয়ে কতকটা অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। কারণ, আপনার ব্যবসায়ে—ভবিষ্যতের জন্য মস্ত একটা পথ পড়ে রয়েচে। আপনি বিশেনব্যাকের Researches on Magnetism and vital force আর গ্রেগরির Letters on Animal Magnetism বই দুখানা নিশ্চয় পড়বেন। তারপর, মেশমারের Aphorisms আর ডাক্তার জস্তিনাস কার্ণারের বইগুলোও পড়ে ফেলবেন। তাতে আপনার 'আইডিয়া' বেড়ে যাবে কত!"

আমার ব্যবসায় সম্বন্ধে অপরের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণরূপেই অনিচ্ছুক। কিন্তু জেনারলের বাক্যে, প্রতিবাদ মাত্র না করিয়াই আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্য হাত দেখিলাম। জ্বর সম্পূর্ণরূপেই ছাড়িয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর এরকম হইয়াই থাকে, কেন হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক এখানে নিরুত্তর! তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়াই আমি দস্তানাটা লইবার জন্য টেবিলের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলাম।

দৃষ্টি, মন এবং কার্য্য যদি পরস্পরের বিপরীত পথে চলে, তাহা হইতে যতটুকু সুফল পাওয়া সম্ভব এক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিল। দস্তানাটার সহিত টেবিলের উপর যে আচ্ছাদিত বস্তুটি লোকচক্ষু হইতে আপনার অস্তিত্ব গোপনে রাখিয়াছিল তাহার আচ্ছাদন বস্ত্রখানিও আমার হাতে উঠিয়া আসিল। ব্যাপারটি এমন কিছু মারাত্মক—বা সঙ্গীন নহে হয়ত ইহার ফল আমার অনুভবেও আসিত না, কিন্তু আমার দৃষ্টি জেনারলের উপর থাকায় তাঁহার মুখে চক্ষে যে ভয়ানক ক্রুদ্ধভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং অধীর কণ্ঠস্বরে যে বিরক্তি উচ্ছসিত হইল তাহাতেই বিদ্যুতাহতের ন্যায় আমি টেবিলের দিকে ফিরিলাম—এবং তাড়াতাড়ি আচ্ছাদন বস্ত্রটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। কাজটা এতশীঘ্র করিয়াছিলাম যে আচ্ছাদিত বস্তুটি যে কি, তাহা আমি নিজেই অনুভব করিতে পারিলাম না,—এইটুকু অনুমান হইল যে একটি বিবাহের প্রকাণ্ড 'কেক' বা ঐরূপ কোন কিছু হইবে।

জেনারল যখন বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্যটি সম্পূর্ণ দৈবাধীন, ইহার ভিতর আমার

ইচ্ছাকৃত কোন দুষ্ট অভিপ্রায় লুক্কায়িত নাই, তখন যেন একটু শান্তভাবে সহজসুরে বলিলেন "থাক্, থাক্, অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এতে আর হয়েচে কি? ডাক্তার তুমি ইচ্ছে কর ত, দেখাতেও বাধা নেই—অনুগ্রহ করে ঐটে এখানে নিয়ে এস দেখি।"

দ্রব্যটির উপরের আবরণবস্ত্রখানি জেনারল খুলিয়া ফেলিলে ভিতরের রহস্যটি বাহির হইয়া পড়িল। আমি যাহাকে কেক্ মনে করিয়াছিলাম তাহা কেক্ নহে অতি সুন্দর মনোরম পর্ব্বত শৃঙ্গের একটি অনুকৃতি। চূড়ার উপরে শুভ্র প্রস্তরবিন্দু গুলি—যাহা তুষারকণার অনুকরণে ঝুরি বাঁধিয়া আছে, সেই গুলিকেই আমার ভ্রান্তচক্ষু পরিচিত কেকের উপরের চিনির দানা স্থির করিয়াছিল।

জেনারল বলিলেন "এটি হচ্চে হিমালয়, না, হিমালয় নয়—সবটা নয়—এ জায়গাটি সুরিনামশাখা, এটি ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্থানে যাবার গিরিবর্ত্ম। অনুকৃতিটি কি সুন্দর!"

বাস্তবিকই তাই! এমন সুন্দর অনুকরণ কম দেখা যায়। আমি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম, পর্ব্বত গাত্রের তৃণগুল্মগুলিও যেন সজীব।

জেনারল কহিলেন "এই স্থানটির সহিত আমার জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ এইখানেই আমার প্রথম অভিযান সম্পন্ন হয়, ঐ—কালাবাগ—আর থুল উপত্যকার অপর প্রান্তে—গিরিবর্ত্মে আঠার শো এক চল্লিশের গ্রীষ্মকালে—আফ্রিদিদের দমনের জন্য আমি সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেম। এটা যে বড় সঙ্কটহীন বা সহজসাধ্য কাজ ছিল না—আমাকেও তা স্বীকার করতে হয়েছিল।"

জেনারলকে থামিতে দেখিয়া, তিনি যে স্থানটি দেখাইতেছিলেন তাহারই অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী একটি রক্তের মত লাল চুনির উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমি বলিলাম—"এই বুঝি সেই গিরিবর্ত্ম যেখানে আপনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছিলেন"?

"হাঁ, এইখানেই—আমাদের একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছ্ল।" বলিয়া, অত্যন্ত ঝুঁকিয়া তিনি সেই লাল চিহ্নটিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, "আমরা এ—ইখানে—ই আ—ক্রা—ন্ত—" বলিতে বলিতে সহসা তিনি মূর্চ্ছিতের মত বালিসের উপরে পড়িয়া গেলেন। আমি যখন প্রথম এই গৃহে প্রবেশ করি তাঁহার চোখে মুখে যেমন ঘোর বিকারের লক্ষণ দেখিয়াছিলাম—ঠিক্ সেই ভাব আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছিল। আর—ঠিক্ সেই-মুহূর্ত্তেই তাঁহার বিছানার উপর হইতে একটি শব্দ ভাসিয়া আসিল টিং টীং, টীং, শব্দটা যেন বাতাসেই ভাসিতেছিল, তাহার আধার বা উৎপত্তির কোন স্থান দেখা গেল না, শূন্যে যেন হাওয়ার জোরে বাজিতেছিল টিং, টিং, টিং, কি সে শব্দ? তাহা শ্রুতিসুখকর, অথবা শ্রুতিকটু, সে কথা প্রকাশ করিয়া বোঝান যায় না, তবে এরূপ শব্দ আমার জীবনে যে আমি দ্বিতীয় বার শুনি নাই, ইহার পূর্ব্বেও নয়, আর পরেও নয়, এই কথাটিই বলিতে পারি। আর দ্বিতীয় বার না শোনার জন্য যে আমি দুঃখিত হই নাই,—এই টুকুই ইহার বিশেষণ!

বাইসাইকেলের ঘণ্টার এক রকম

আওয়াজ হয় অনেকটা যেন সেই রকম? না, ঠিক্ তা নয়; হৃদ্ যন্ত্রের উপর দ্রুততালে উত্থান পতনের যে ধ্বনি তাহারই সুস্পষ্টতা, অথবা বৃষ্টির জলের শব্দের সহিত কোন বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রণের অনুরূপ কি? আমার বোধ হয় যদি কোন সঙ্গীতরসজ্ঞ ব্যক্তি সেই শব্দ শুনিতেন তাহা হইলে সহজে তুলনা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, বাদ্যযন্ত্রে আমি,—যাক্ সব কথা সব সময় খুলিয়া না বলাই ভাল।

বাতাসে ঠিক বিছানার উপরে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি ভাসিতেছিল টিং, টিং, টিং। আমার বিচলিত বিপন্নমুখ বোধ হয় জেনারলের চোখের দৃষ্টি এড়ায় নাই, একটুখানি বিষাদ মিশ্রিত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন "ও ঠিক্ই আছে, ডাক্তার ওটা আমার একটা গোপনীয় ঘণ্টার আওয়াজ। আপনি যদি নীচে গিয়ে এইবার আমার প্রেসক্রুপসনটা লিখে দে'ন তাহলে বড়ই ভাল হয়!"

স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল তিনি আমার বিদায় ইচ্ছা করিতেছেন। ঐ অভূতপূর্ব্ব শব্দের উৎপত্তি রহস্য আবিষ্কারে আমার চিত্তে যেটুকু কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল,—এ কথার পর—আমি সেটাকে দমন করিয়া লইয়া, বিদায় লইয়া নীচে নামিয়া আসিলাম, এবং যথাবিহিত প্রেসক্রুপসন্ লিখিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

আমার ইচ্ছা ছিল পুনরায় জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কারণ সকালবেলা আমি তাঁহার অবস্থা খারাপই দেখিয়া আসিয়াছি, রোগীর বর্ত্তমান ও অতীত জীবনের সমস্ত বিবরণ জানিবারও আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। শুধু সাধারণ কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য নহে, তাঁহার বর্ত্তমান মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতির সহিত লক্ষণ মিলাইয়া যতটুকু রোগ নিরাকরণ করিতে পারা যায়,—সেইটুকুই আমার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

সেইদিনই সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে জেনারলের নিকট হইতে একখানি পত্র এবং বড় রকম একটা "ফি" পাইলাম। পত্রে জেনারল হিথারষ্টন, আপনার সম্পূর্ণ সুস্থ সংবাদ দিয়া জানাইয়াছেন, যে দ্বিতীয়বার আমার সাহায্য তাঁহার আবশ্যক হইল না।

ক্রুমবার হলের সেই অপূর্ব্ব খেয়ালি ভদ্রলোকটীর নিকট হইতে এই একখানি মাত্র পত্রই আমার প্রথম ও শেষ।

আমার প্রতিবাসী ও বন্ধু বান্ধবেরা অনেক সময় আমাকে সকৌতুকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে জেনারলে আমি "পাগলের লক্ষণ" কিছু দেখিতে পাইয়াছি কি না?—আমি দ্বিধাশূন্য হইয়াই তাঁহাদের বাক্যের উত্তর দিয়াছিলাম যে "না,"! তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এইটুকু আমি বুঝিয়াছিলাম যে তিনি লেখাপড়ার যথেষ্ট অনুশীলন ও চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনি একজন বুদ্ধিমান, এবং বিদ্বান ব্যক্তি। তবে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ধমনীগুলা শক্ত হইয়া গিয়াছে, অনুভবশক্তিও দুর্ব্বল। কি একটা বিপদ ঘটিবে এমনই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই তিনি শঙ্কিত, কাতর!

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বাঙ্গালার পল্লীদৃশ্য

অবনত জাতি

ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর হইল প্রথমে যোগী ও সুবর্ণবণিক জাতি আপনাদিগকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। প্রায় সেই সময় হইতেই চণ্ডাল বা চাঁড়ালদিগের নমশূদ্র জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা হয়। বহু চেষ্টার পর গত তিন শতাব্দী হইল তাহাদের নাম নমশূদ্র বলিয়াই জনসংখ্যাকালে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। নমশূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহা জানা যায় না। সঞ্জীবনী সংবাদ পত্রের একজন নমশূদ্র-জাতীয় লেখক দুই তিন বৎসর হইল একবার লিখিয়াছিলেন যে প্রকৃত পক্ষে শব্দটা নমঃশূদ্র এবং তাহার অর্থ নমস্ত শূদ্র অর্থাৎ অন্য জাতির লোক নমঃশূদ্রদিগকে দেখিয়া নমস্কার করিবে। এই ব্যুৎপত্তিটার প্রতি কতলোকের শ্রদ্ধা হইবে তাহা বলিতে পারি না। শব্দটার আর একটা ব্যুৎপত্তি আমি গত বৎসর শুনিয়াছি। তাহা এই যে চণ্ডালদিগের আদিপুরুষের নাম লোমশ। শব্দের প্রথমাক্ষর ল হইলে পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোক ন উচ্চারণ করে সুতরাং লোমশ স্থলে নোমোশ উচ্চারিত হয়। কিন্তু লোমশ নামে একজন ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন। লোমশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে এই জন্য শূদ্র শব্দ ইহাতে যোগ করা হইয়াছে। এই রূপেই লোমশ শূদ্র, নমঃশূদ্র এবং অবশেষে নমশূদ্র হইয়াছে।

আসামের হাড়ি ও ডোমজাতি পুরাতন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যথাক্রমে বৃত্তিয়াল ও নদিয়াল হইয়াছে। আসামের গ্রহাচার্য্যগণ এতদিন গণক বলিয়া অভিহিত হইতেন কিন্তু সম্প্রতি তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

কোন কোন জাতি নামের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না করিয়া আভিজাত্যের দাবী করেন। আসামের কাছারীরা বিশেষত সজাই বা হজাই কাছারীরা বলে যে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ তাহাদের আদিপুরুষ ছিলেন। মণিপুরীরা বলেন যে অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। আসামের মিকির জাতির দাবী কিন্তু অন্য সকল দাবীকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও কল্পনার ঔৎকর্ষ প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। উত্তর বঙ্গের কোচ জাতি বলেন যে তাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। বঙ্গদেশের কৈবর্ত্তেরা বলেন যে তাঁহারা মাহিষ্য। কিছুদিন হইতে সাহা, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞদিগের অনেকে আপনাদিগকে যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও সপ্তশতি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

প্রকৃত পক্ষে যাহারা হীন জাতি, যাহাদের হিন্দুসমাজে কোন উচ্চ অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসামের গণক এবং বঙ্গের কায়স্থ বৈদ্য কেন গোলমাল করেন তাহা বুঝা যায় না। ইহারা

সকলেই স্ব স্ব দেশে উচ্চ জাতি। আসামে ব্রাহ্মণদিগের পরেই গণকের পদ। এমন কি তাঁহারা তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের প্রায় সমকক্ষ। বঙ্গের গণকেরা ব্রাহ্মণ বৈদ্যের হুঁকা ছুঁইয়া দিলে যেমন হুঁকার জল ফেলিয়া দিতে হয় আসামে সেরূপ নহে। ব্রাহ্মণের যে আচার ব্যবহার গণকেরও তাহাই। গণকেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে নূতন কোন রূপ সংস্কার বা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই; নূতন কোন আচার অবলম্বন করিতে হয় না। কেন না কি বঙ্গে কি আসামে গণকেরা চির-কালই উপনয়ন সংস্কারবিশিষ্ট এবং দশাহ অশৌচ পালন করেন। তবে আসামের গণকেরা কেন চীৎকার করিয়া জানাইতেছেন তাঁহারা খাঁটি ব্রাহ্মণ। গবর্ণমেণ্ট তাঁহা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেও অন্য ব্রাহ্মণেরা কি কখনও তাঁহাদিগকে লইয়া এক পংক্তিকে আহার করিবেন—না তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিবেন? আর বঙ্গদেশের গণকেরা যে চেষ্টা করিতেছেন সেই চেষ্টা সফল হইলে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি তাঁহা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিলেও তাঁহারা কি বঙ্গের মহাশক্তিশালী ব্রাহ্মণদিগের কাছে ঘেঁসিতে পারিবেন?

আর বঙ্গের কায়স্থ বৈদ্যেরা? তাঁহারা ত চিরদিনই প্রধান জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। কি বিদ্যাবুদ্ধি, কি ধনমান সর্ব্ববিষয়েই তাঁহারা সমাজের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি কায়স্থবৈদ্যগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদিগকে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা করিতেছেন। দিন্—তাহাতে ক্ষতি নাই বরঞ্চ ভালই, কেননা ইহা প্রমাণ হইয়া গেলে ইহাতে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে। কিন্তু বৈদ্যগণ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দিলেও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে স্বজাতি বলিয়া বরণ করিয়া লইবেন কি? আর কায়স্থগণও ঘোড়ায় চড়িয়া কোমরে তরবারি বাঁধিয়া বিবাহ করিতে গেলেও প্রকৃত ক্ষত্রিয়দিগের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিবেন কি। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আমূল সংস্কার না হইলে এরূপটা হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

প্রকৃতপক্ষে, অবনত জাতীয় লোকেরা যে চেষ্টা করিতেছে সেই চেষ্টার পরিণতি তাহাদের নামান্তর গ্রহণ মাত্র। আমি ত ইহাতে প্রকৃত জাগরণের কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। বহুকালের জাতীয় নিদ্রা এইরূপেই অল্পে অল্পে ভাঙ্গে একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা জাপানের কথা স্মরণ করিবেন। গত পঞ্চাশ বৎসরে চণ্ডালেরা নমশূদ্র নাম গ্রহণ ব্যতীত আর কি করিয়াছে? কিন্তু ঠিক সেই পঞ্চাশ বৎসরে জাপানের লোক কি করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

অবনত জাতিসকল নাম পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কি কিছুই করে নাই? করিয়াছে কিন্তু আর যাহা করিয়াছে তাহাতে নিজের এবং দেশের অপকার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। চণ্ডালেরা পূর্ব্বে বন্য শূকরের মাংস খাইত। এই মাংস আহরণ করিবার জন্য তাহারা দল বাঁধিয়া মৃগয়া করিত। এইরূপে দলবদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় বীরভাব (esprit de cops) অনুশীলিত হইত, তাহাদের শৌর্য্য,

উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি পুরুষোচিত সদ্‌গুণের বিকাশ হইত, মাংস ভক্ষণ দ্বারা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি হইত, শস্যাদির শত্রু শূকরকুলেরও হ্রাস হইত। তাহাদের মধ্যে ধনী ছিল না সুতরাং বিনামূল্যে মাংস ভক্ষণ তাহাদের একটা মহা বিলাস ছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল তাহারা বরাহ মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে উচ্চবংশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া জগৎকে জানাইবে যে তাহারাও উচ্চবংশীয়। তাহারা কখনও ধনবান্ ছিল না; সুতরাং ক্ষেত্রকর্ষণ ভিন্ন তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য জাতীয় লোকের চাকরী করিত এবং আরও নানারূপ কাজ করিত। কিন্তু এখন তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির কাজ করে না, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির অন্নও গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণেরাই তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন অথচ ব্রাহ্মণের প্রতি তাহাদের কোনরূপ দ্বেষ নাই—তাহাদের যত আক্রোশ ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি। ধন্য মনুষ্য চরিত্র। পূর্ব্বে চণ্ডালেরা বিনীত ছিল কিন্তু এখন তাহাদের আচরণ দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা ভাবে যে বিনয় দেখাইলেই তাহারা যেন হীন জাতি ইহাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এখন তাহারা ভদ্রলোকের প্রতি "আপনি" শব্দ ব্যবহার করে না—সকলকেই "তুমি" বলে। প্রায় এইরূপে অন্য যে সকল অবনত জাতি আপনাদিগকে বড় বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে তাহারাও জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া নিজের অর্থাগমের পথ রোধ করিয়া নিজের ও দেশের ক্ষতি করিতেছে। মালো নামে এক মৎস্যজীবী জাতি আছে—তাহাদের পুরুষেরা মাছ ধরিত, স্ত্রীলোকেরা তাহা হাটে বাজারে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। সম্প্রতি তাহারা এই নিয়ম করিয়াছে যে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা আর বাড়ী বাড়ী মাছ বিক্রয় করিতে যাইবে না। এই নিয়মে তাহাদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহাদেরও কষ্ট হইয়াছে, অন্য জাতীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও অসুবিধা হইয়াছে। উন্নত কায়স্থ জাতি উন্নততর হইতে চেষ্টা করিয়াও অল্প সামাজিক ক্ষতি করেন নাই। তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইবেন হউন, সে ত ভালই, কিন্তু তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল বৈদ্যজাতিকে হীন বলিয়া প্রমাণ করা, বৈদ্যদিগকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া এবং বৈদ্যদের বিরুদ্ধে জাল শাস্ত্রবচন রচনা করা। পণ্ডিতপ্রবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার পুস্তকে কেবল যে সেই জাল ধরিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, গালাগালিরও উত্তর দিয়াছেন। সুতরাং এরূপ করায় কেবল পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাবই উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া সমাজের শক্তির হ্রাস ও উন্নতির পথ রোধ করে। যদি এইরূপে সর্ব্বত্র উনপঞ্চাশৎ অনিল প্রবাহিত হয় তাহা হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কায়স্থ, বৈদ্য, গণক, সাহা প্রভৃতি জাতিকে যথাক্রমে, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিরূপে মানিয়া লইতে গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিয়াছেন। তবে যে গবর্ণমেণ্ট কৈবর্ত্ত, হাড়ি, ডোম ও চণ্ডালকে মাহিষ্য, বুতিয়ান, নদীয়াল ও নমশূদ্র রূপে স্বীকার

করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে মাহিষ্য, বুড়িয়ান, নদীয়াল ও নমশূদ্র নামে কোন জাতি ভারতবর্ষের কোথাও নাই সুতরাং এই সকল নাম কোন হীন জাতিকে দিলে অন্য কোন উচ্চতর জাতি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে না।

হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপ নূতন আকার ধারণ না করিলে, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে এবং তাঁহাদের অঙ্কিত গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে হীন জাতির অবস্থার উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তিন বৎসর হইল একদিন কয়েকটী ভদ্রলোক অবনত জাতির উন্নতি কিরূপে হইতে পারে সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন বলিলেন "হীন জাতির জল কখনই চল হইতে পারে না।" আর একজন বলিলেন "হীন জাতিকে আমরা যদি চিরদিনই অস্পৃশ্য করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে তাহারা হিন্দুসমাজে থাকিবে কেন? তাহারা যদি হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া যায় হিন্দু বলিতে মুষ্টিমেয় লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুর অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইবে।" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন "লোপ পায় পাউক। তাহা বলিয়া কি আমি পিতৃশ্রাদ্ধ কালে অস্পৃশ্য জাতির জল ব্যবহার করিয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করিব—না নিজের শরীর অপবিত্র করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব? মৃত্যু ত অপরিহার্য্য, হিন্দু সমাজকেও একদিন মরিতে হইবে। কিন্তু মরিবার ভয়ে কি পাপাচরণ করা উচিত? হিন্দুশাস্ত্রের শাসন অমান্য করিয়া অস্পৃশ্যদিগকে সমাজ ভুক্ত করিয়া লওয়াই হিন্দুসমাজের আসল মৃত্যু। যদি হিন্দু ধর্ম্মের ব্যবস্থাই না মানিলাম তাহা হইলে হিন্দুত্ব কোথায় রহিল? হীন জাতিরা হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া গেলে বরং সমাজ বললাভ করিয়া দীর্ঘ জীবন ভোগ করিবে। বিষদুষ্ট হাত পা কাটিয়া ফেলিলে সমস্ত শরীরের উপকারই হয়। হীনজাতিরা অন্যধর্ম্ম অবলম্বন করিবে বলিয়া ভয় দেখায় কেন। একেবারে হিন্দুসমাজ ছাড়িলেই ত পারে।" ইত্যাদি অনেক কথা সেই ভদ্র লোকটি বলিলেন! গোঁড়া হিন্দুমাত্রেরই এই যুক্তি। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহা অযুক্তি বলিয়া বোধ হয় না। তবে মনুষ্যোচিত যুক্তির কথা ভিন্ন। প্রচলিত হিন্দুত্বও বজায় থাকিবে, হীনজাতিও চল হইবে এরূপ হইতেই পারে না। হয় হিন্দু ধর্ম্মের নূতন সংস্করণ করিতে হইবে নতুবা হীন জাতির মায়া ত্যাগ করিতে হইবে।

কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষিত একটী হীন জাতীয় যুবককে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তোমরা যখন হিন্দুসমাজের অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ কর, যখন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাদিগকে ঘৃণা করেন অথচ তোমরা মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান হইলে তোমাদের প্রতি অধিক শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন তখন তোমরা একেবারে এই সমাজ ছাড়িয়া মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান হওনা কেন?" যুবকটী বলিল "লোকে ত কেবল ঐহিক বিষয়ের চিন্তা করিয়াই সকল কাজ করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িলে পারত্রিক উদ্ধার সাধন হইবে কি রূপে?" এই কথা শুনিয়া কাঁদিব

কি হাসিব বুঝিতে পারিলাম না। যে হরীশ বাবু তাঁহার বৈঠকখানা হইতে যদুকে কান ধরিয়া ও চড় মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন তিনিই সেই যদুকে রাজদ্বারে সম্মানিত করিয়া দিবেন এরূপ আশা করা ও যে হিন্দুধর্ম্ম হীন জাতিদিগকে পতিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই হিন্দুধর্ম্মই তাহাদের পারত্রিক মঙ্গলের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এরূপ আশা করা একই রূপ বাতুলতা। যদুর মহত্ব থাকিলে সে হরীশ বাবুকে ক্ষমা করিতে পারে কিন্তু মনে মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র থাকিলেও সে হরীশ বাবুর অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে পারে না।

শূদ্র বেদধ্বনি শুনিলে তাহার কানে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিতে হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণের আসনে বসিলে তাহার গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ দিয়া ক্ষত করিয়া দিতে হয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদের ইহাই শাসন। একজন শূদ্র তপস্যা করিতেছিল বলিয়া এক ব্রাহ্মণের কথায় রামের মত একজন রাজাও স্বহস্তে তাহার শিরশ্চেদন করিলেন। তথাপি আমরা অনেক সুশিক্ষিত শূদ্রকে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। ইহা দেখিয়া আমার মনে পড়ে যে উইল্‌বর্ ফোর্সের সময়ে অনেক দাস দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিল।

শাস্ত্রে বলে দাসের মুক্তি নাই। বাস্তবিক অমুক্ত জীবকেই দাস বলে। দাসত্ব দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ইচ্ছানুসারে চলিতে ফিরিতে বা অন্য কোন কার্য্য করিতে না পারিলে শারীরিক দাসত্ব হয়। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের শারীরিক দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। আমরা এখন যেমন স্বাধীন হইয়াছি পূর্ব্বে কখনও তেমন স্বাধীন ছিলাম না। দেশীয় রাজাদের রাজ্যের লোকও তেমন স্বাধীন নহে। মাড়বারীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে রাজপুতানায় এখনও কোন প্রজাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ একটা বড় ও ভালবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হয় না। দক্ষিণাপথের কোন কোন জাতিকে এখনও প্রকাশ্য রাজপথে চলিতে দেওয়া হয় না। পঞ্জাবের হীন জাতিরা ভাল পরিষ্কার কাপড় পরিয়া বাহির হইতে পায় না। এই সমস্তই প্রকৃত শারীরিক দাসত্ব। ইহা হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিয়াছি। এখন যে দাসত্ব আছে তাহা মানসিক এবং সে দাসত্বের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা পুত্রবান্ তাঁহারা উত্তরাস্য হইয়া আহারে বসিতে পারেন না। যাঁহাদের পিতা জীবিত আছেন তাঁহারা দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া খাইতে পারেন না, আমরা দিন বা ক্ষণ বিশেষে বাড়ীর বাহির হইতে পারি বা পারি না, কোন কোন জলাশয় আমাদের পার হইতে নাই, নবমী তিথিতে আমরা লাউ খাইতে পারি না, আমরা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া আমরা টিকটিকির আদেশে চলা ফেরা করি। এইরূপ অশেষ প্রকারে আমরা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ইহার জন্য আমরাই দোষী। সমাজও এখন এই সকল কার্য্যের জন্য আমাদিগকে মারধর করে না। হিন্দুসমাজ চৈতন্যকে প্রহার করিয়াছিল, রামমোহনকে প্রহার করিতে চাহিয়াছিল এবং দয়ানন্দকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে সব অত্যাচারও নাই। তবুও

আমরা ভয়েই মরি। হায়রে! আমাদের আবার জাতীয় জাগরণ!

পঞ্জাবের হিন্দুরা পানীয় জলের কূপ মুসলমানকে স্পর্শ করিতে দেন, কিন্তু হীন-জাতীয় হিন্দুকে স্পর্শ করিতে দেন না। একবার এক গ্রামের তিন চারিশত হীন-জাতীয় লোক জলকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চ হিন্দুদিগের কূপ হইতে জললাভ করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমান হইলেন এবং কূপ স্পর্শ করিতে পাইলেন। সম্প্রতি তাঁহারা শুদ্ধি নামক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আর্য্যসমাজে উঠিয়াছেন।

এক চিকিৎসক যখন কোন রোগীকে অসাধ্য বলিয়া প্রকাশ করেন তখন অন্য চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা করান যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্ম যখন চণ্ডাল, সাহা, দ্বিজবন্ধু প্রভৃতিকে অস্পৃশ্য ও পতিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন তাঁহাদের উচিত যে তাঁহারা বড় বড় জাতীয় সভা আহ্বান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের যে নির্ম্মম নিগড়ে তাঁহারা সংবদ্ধ তাহা ভগ্ন করেন এবং আর্য্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মসম্প্রদায় প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় উৎপীড়িত ও সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে, মনুষ্যের প্রাপ্য সর্ব্বপ্রকার ন্যায্য অধিকার দিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া আছেন সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ইহাতে তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজকেও ত্যাগ করিতে হইবে না,—তাঁহারা একেবারে অহিন্দু হইবেন না—অথচ গোড়া হিন্দুধর্ম্মের অত্যাচার হইতেও মুক্তি লাভ করিবেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

প্রবঞ্চিতা

কা'দের প্রাণের অর্ঘ্যে সেজে ওগো রাজার
নন্দিনী,
রূপ দেখে আর মিষ্ট কথায় হ'লে শঠের
বন্দিনী?
যা'তে তা'দের মন ভুলালে,
জান কি কোন্ রাজদুলালে
বুকের রুধির পাঠিয়ে দিল তোমার চরণ
রঞ্জনে?
কোন্ নৃপতি ছদ্মবেশে
গড়লো নূপুর হেথায় এসে?
কারিগরের নামটি বাজে তাহার মধুর
শিঞ্জনে!

সূক্ষ্ম বুকের স্নায়ু দিয়ে
বসন দিল বিরচিয়ে,
কোন্ যুবরাজ সংগোপনে নাম লিখেছে
অঞ্চলে?
তোমার বাগে মালীর কাজে
তরুণ কবি ছদ্মসাজে,
প্রণয় ফুলে গেঁথে মালা গলায় দিল
কৌশলে,
সে সব তুমি খোঁজ নিলে না, ওগো রাজার
নন্দিনী!
প্রণয়ীজন ফেলে হ'লে অপ্রেমিকের
বন্দিনী।

শ্রীকালিদাস রায়।
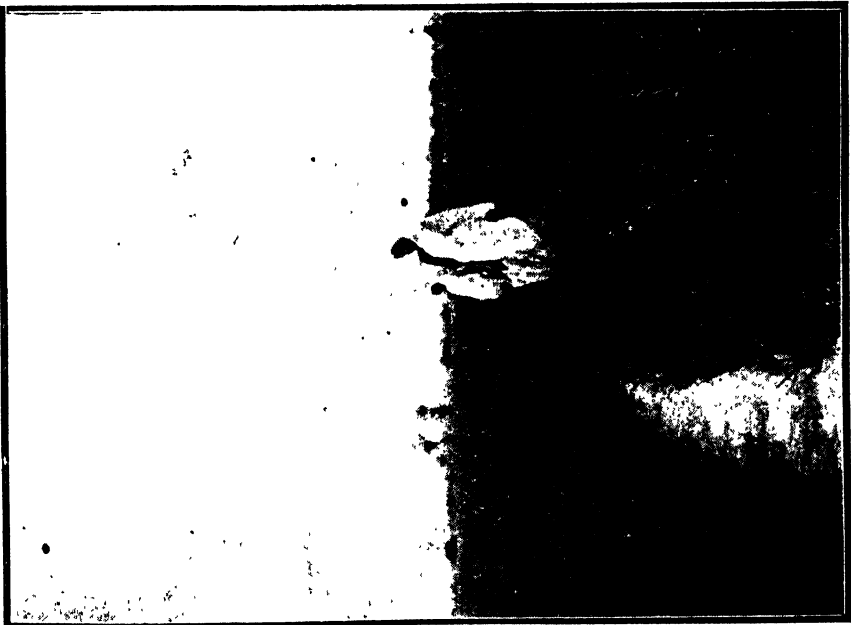
বাঙ্গালার পল্লীদৃশ্য

বরফ-গলা

১

হিমালয়ের শিখর পরে
জমাট তুষার ভরা,
গল্‌বে সেও কোন দিনে
প্লাবিত করে ধরা !
আমারি মন কঠিন রবে,
শক্ত পাষাণ চেয়ে ?
নির্ঝরিণী ঝর্‌বে না তার
হৃদয়-রন্ধ্র বেয়ে ?

শূন্য থেকে শূন্য পরে
লাফিয়ে পড়ে হেসে
গহন বনে, কাঁটায় সেজে
চল্‌তে ভেসে ভেসে,
ললিত ভীম গানের রোলে
কাঁপিয়ে দিগন্তর,
টপ্‌কে' শিলা, উছ্‌লে' ফেণা
পেরিয়ে তেপান্তর
মিশ্‌বে নাক সাথী সনে
সাগর পথের যাত্রী
হরিৎ ভরিৎ দুকূল করে
কি দিবা কি রাত্রি ?

বরফ-গলা হৃদয় আমার
নূতন সুরে 'গা'
একটি শুধু মূর্চ্ছনা তার
নীচের নিয়ে যা।

২

পলকে পলকে ছলকে ছলকে
বহিয়া চল্‌রে মন
থ'ম্‌কে থ'ম্‌কে দমকে দমকে
ঠারিস্‌নে এমন !
যদি থরে থরে নিথর পাথরে
বুক চাপে—সরা, সরা !
চল্‌ চল্‌ চল্‌ তরল সচল
কলগানে সদাভরা !

কভু বা নিঝর শুধু ঝর ঝর
অম্বর পটে আঁকা
শুভ্র উজল রূপ ঝলঝল
ভৈরবী গতি বাঁকা !
বিগল তড়িৎ কভু বা সরিৎ
স্নিগ্ধ সরল রেখা,
বনের হিয়ায় আঁধার শিয়ায়
মোহন রজত লেখা !

কান্তারে দেশে আলুথালু বেশে
এলায়িত বেণী নদী
দুকূল ছাপিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া
কেঁদে চল্‌ নিরবধি !

কভু গল্‌ গল্‌ হাসি কল কল
সখি সনে উন্মাদ
সাগর মেলায় বহে যা হেলায়
কাকলিয়ে পূরি সাধ।

ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌ ছলল্‌ ছলল্‌
মনরে উছিয়ে চল,
লীলাময়ী রূপ অতি অপরূপ
ভাবে সদা ঢল ঢল !

শ্রীসরলা দেবী।

শান্তিনিকেতন

(গল্প)

"বসন্তের এই সুন্দর সন্ধ্যায় এই বিজন স্থানে, একাকী যোগাসনে বসিয়া কি করিতেছি জিজ্ঞাস্য করিতেছ? তুমি কি অন্ধ? তোমার চক্ষু নাই? দেখিতে পাইতেছ না যে দেবী পূজা করিতেছি? নারীই সংসারের বিষ মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, কিন্তু এক নারীই আমার জীবনের সুধা ও পরিত্রাতা। তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার চিতা পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া এই ঘৃণিত জীবন ধন্য করিতেছি।

কি বলিতেছ? আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ? তোমার হৃদয় মন এক মুহূর্ত্তেই আমাকে সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছ? তোমার হৃদয়ের পূজা, প্রাণের প্রেম,. তোমার ধন রত্ন সকলই আমার চরণে ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত আছ? প্রাণের প্রেম? হাঃ হাঃ পুরুষের প্রাণের প্রেম! প্রেম কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান কি? তোমরা জান শুধু শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা। নারীর হৃদয় লইয়া ক্ষণিকের খেলা। মোহের বশে দুদিনের জন্য তাহাকে পৃথিবীর সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া ধরা, তারপর দুইদিন যাইতে না যাইতেই অবসাদ! তারপর পদাঘাতে তাহার হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিয়া, পদলুণ্ঠিত ভগ্ন হৃদয় লইয়া গর্ব্বভরে বিজয় পতাকা উড়াইয়া আনন্দ করা, এই ত তোমাদের ভালবাসা!

কিন্তু সেই, অটল, গভীর অতলস্পর্শী প্রেম, সেই হৃদয় প্রশস্তকারী আপনাহারা প্রেম, সেই আপনা ভুলিয়া সর্ব্বস্ব দান করা প্রেম, তাহা কাহাকে বলে জান কি? যে প্রেম ভাল মন্দ জানে না, যে প্রেম পাপপুণ্য জানে না, যে প্রেম প্রেমাস্পদের বিচার জানে না, যে প্রেম শুধু জানে "আমি ভালবাসি" সে প্রেমের অর্থ জান কি?

হাঁ! আজ তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব দান করিবার জন্য প্রস্তুত, আজ আমাকে হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থান দিবার জন্য তোমার প্রাণ উন্মুখ। কিন্তু কাল—কাল যদি আমি ভগ্ন হৃদয়ে তোমার দ্বারে ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিয়া মরি তাহা হইলে তুমি ফিরিয়া চাহিবে কি? না রণজয়ী বীরের মত, বিজয় পতাকা উড়াইয়া অন্য হৃদয় জয় করিবার জন্য মহাসমারোহে যাত্রা করিবে?

পুরুষের প্রণয় যে কি তাহা আমার শিরায় শিরায় লেখা আছে। এই বিংশতি বর্ষ বয়সে আমি যোগিনী কেন? তাহা তোমারই মত একজনের জন্য। সেও একদিন তাহার হৃদয়ের পূজা প্রাণের প্রেম আমার চরণে সমর্পণ করিয়াছিল। কেবল একটি জিনিষ সে দান করে নাই সেটি শ্রদ্ধা।

আমার জীবনের কাহিনী শুনিতে চাহিতেছ? তবে শোন। বৃথা বাক্যে ব্যয়ে বেশী সময় নষ্ট করিবার সময় আমার নাই

সুতরাং সংক্ষেপেই জীবন কাহিনী বলিব। কিন্তু একটু সরিয়া ঐ পাথরের উপর বোস—তোমার ছায়া দেবীর চিতা স্পর্শ করিতেছে।

চাষার মেয়ে ছিলাম। চমকিয়া উঠিলে কেন? চাষার মেয়ের এত রূপ সেই কথা ভাবিতেছ? আর একজনও একদিন ঐ কথা ভাবিয়াছিল। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া ছিলাম। পিতা অনেক বয়সে আমাকে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। তিনি পত্নীশোক ভুলিয়া আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। নিতান্ত শৈশবের কথা মনে নাই, কিন্তু জ্ঞানাবধি মনে আছে অত্যন্ত প্রত্যূষে উঠিয়া পিতা রন্ধন করিয়া আমাকে আহার করাইতেন। তারপর নিজে আহার করিয়া ক্ষেতে যাইতেন। আমিও সঙ্গে যাইতাম। সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিয়া পিতা পুনরায় রন্ধন করিতেন। আহারাদি হইলে পিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তাঁহার নিকট গল্প শুনিতে শুনিতে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িতাম তাহা জানি না। পিতার স্নেহে মাতার অভাব কখনও বোধ করি নাই। আমার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পিতা বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইলেন। আমরা দরিদ্র হইলেও গৃহে ধান চাউল ও সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল। তাহা দ্বারা কোন ক্রমে সংসার চলিতে লাগিল।

পিতার ব্যাধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে চিকিৎসক ডাকিতে কৃতসংকল্প হইলাম। শুনিয়াছিলাম কলিকাতার একটি বাবু আমাদের গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছেন, তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুদক্ষ। ক্ষেতের একটি বালক দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ দিলাম। কি কুক্ষণেই যে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলাম তাহা জানি না। তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

তিনি প্রত্যহই পিতাকে দেখিতে আসিতেন। গৃহে অন্য কেহ না থাকাতে পিতার শয্যাপার্শ্বে আমাকেই উপস্থিত থাকিতে হইত। আমি কখনও গ্রামের বাহিরে যাই নাই, গৃহের বাহিরেও বড় যাই নাই। অপরিচিত পুরুষ দেখা ও বাক্যালাপ করা আমার জীবনে এই প্রথম। ডাক্তার বাবুর সুন্দর চেহারা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তিনিও প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে আমাকে ডাকিয়া সর্ব্বদাই বাক্যালাপ করিতেন।

পিতার ব্যাধি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনিও বুঝিয়াছিলেন তাঁহার রক্ষা নাই। একদিন পথ্য হস্তে পিতার গৃহাভিমুখে যাইতেছি, দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলাম পিতা বলিতেছেন,—"ডাক্তার বাবু! এ যাত্রা আর রক্ষা নাই জানি। মেয়েটার জন্য বড় ভাবনা হয়। তার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আর কোন দুঃখু থাকত না।" পিতার কণ্ঠস্বর বেদনা পূর্ণ! তাহার উত্তরে ডাক্তার বাবু যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি পিতাকে জানাইলেন যে আমার রূপে তিনি মুগ্ধ পিতার সম্মতি পাইলে আমাকে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

সবিস্ময়ে পিতা বলিলেন "আপনি—ভদ্রলোক—চাষার মেয়ে বিয়ে করবেন?" তদুত্তরে তিনি পিতাকে জানাইলেন, তিনিও ত

জাতিতে চাষা; তাঁহার যখন কেহ নাই ও তিনি এই গ্রামেই চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন তখন ইহাতে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই।

আনন্দে বিহ্বল হইয়া পিতা বলিলেন —"পরমেশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমি আর গৃহে প্রবেশ করিলাম না। সাবুর বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আপন শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। দুঃখ ও আনন্দ যুগপৎ আমার হৃদয়ে তুফান তুলিয়া দিল।

আনন্দাতিশয্য দুর্ব্বল শরীরে সহ্য হইল না। সহসা রাত্রে পিতার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িল। পরদিন সকালে, আমার হৃদয়ের দেবতার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া, আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।

এক মাসের মধ্যে শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ প্রভৃতি শেষ হইল। আমাকে তিনি বিবাহ করিলেন। বিবাহ কাহাকে বলে জানি না বিবাহ কখনও দেখি নাই। একদিন তিনি পুরোহিত লইয়া আসিয়া বলিলেন "আজ বিবাহ।" পুরোহিত তাঁহার হাতে আমার হাত দিয়া মন্ত্র পড়াইলেন। দুই বৎসর বড় সুখে কাটিল,—সে সুখের তুলনা নাই। এই দুই বৎসরে তাঁহার নিকট একটু একটু লেখাপড়া শিখিলাম। চাষার মেয়ে ভদ্র গৃহের উপযুক্ত হইলাম। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে নয়নের আনন্দ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তৃতীয় বৎসরের মাঝামাঝি, একদিন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। এক মাসের মধ্যেই ফিরিবেন। বিবাহ হইয়া অবধি তাঁহার কাছ ছাড়া হই নাই। আসন্ন বিরহ কল্পনায় আমি বড়ই কাতর হইলাম। তিনি আমাকে বক্ষে লইয়া, আদর করিয়া, নিদ্রিত পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিলেন। সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা! ছয় মাস কোন সংবাদ পাইলাম না। তাঁহার ঠিকানা জানি না— পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে পারিলাম না। ভাবনা চিন্তায় শয্যাশায়ী হইলাম।

ছয় মাস পরে একদিন একখানা পত্র পাইলাম। আনন্দে অধীর হইয়া পত্র খুলিলাম। পড়িয়া বজ্রাহত হইলাম। আমি তাঁহার পরিণীতা পত্নী নহি। যে বিবাহ দিয়াছিল সে পুরোহিত নহে,— তাঁহারই এক বন্ধু,—বিবাহ অসিদ্ধ। তিনি পূর্ব্বেই কোন জমীদারের একমাত্র সন্তানের পাণিগ্রহণ করিয়া জমীদার ভবনেই বাস করিতেন। শ্বশুরের সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে এই দুই বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ পত্রে শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পত্রে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে আমাকে তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিবেন না—মধ্যে মধ্যে আমাকে দর্শন দিবেন। এবং আমাদের মাতা পুত্রের ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যয় ভার তাঁহার। পত্রে কিছু অর্থ ছিল। পত্র পড়িয়া বজ্রাহত হইলাম। আমার সমস্ত গর্ব্ব, আনন্দ, সমস্ত আশা ভরসা এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইল।

শ্রান্তি বোধ করিতেছ কি? না শেষ পর্য্যন্ত শুনিবে? ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে? আচ্ছা তবে শোন,—

পত্র পাইয়া রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত প্রায় হইলাম। তাহাকে ও তাহার পত্নীকে অভিশাপ দিয়া তখনই পত্রের উত্তর দিলাম। তাহার প্রেরিত অর্থ ফিরাইয়া দিয়া জানাইলাম ভবিষ্যতে আর অর্থ প্রেরণ করিয়া বা আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া যেন সে আমার অবমাননা না করে।

এক মাস পরে শরতের এক নির্ম্মল প্রভাতে এক শুভ্রবসনা করুণাময়ী রমণী মূর্ত্তি আমার কুটিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা মাতা পুত্রে তখন রোগ শয্যায়, জীবনের আশা মাত্র নাই। সেই করুণাময়ী তাঁহার সমস্ত করুণা ঢালিয়া দিয়া আমাদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম,—"দিদি, তুমি যেই হও এই ঘৃণিতার জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও না,— আমার মরণই শ্রেয়!"

আমার হাত দুটি ধরিয়া, কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—

"ভগিনি! মৃত্যু কামনা করা মহাপাপ! দয়াময়ের এই বিপুল বিশ্বে কাহারও জীবন ঘৃণিত নহে। প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সকলকেই তাঁহার শীতল ক্রোড়ে স্থান দেন।"

এ কি আশার বাণী শুনিলাম! আমার সমস্ত শরীর মন শীতল হইয়া গেল। পাপী তাপী সকলকেই তিনি তাঁহার শীতল ক্রোড়ে স্থান দেন! তবে আর মৃত্যুকামনা করিব কেন?

তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম "দিদি! তুমি কে? দেবীর মত এই অভাগিনীর কুটিরে কোথা হইতে আগমন করিলে?" মুখ নত করিয়া বিষণ্ন বদনে তিনি বলিলেন--

"দেবী নই তোমারই মত দুর্ভাগিনী নারী আমি। যাইবার পূর্ব্বে পরিচয় দিব আজ নহে।"

আমরা রোগমুক্ত হইলে তিনি যেদিন বিদায় প্রার্থনা করিলেন, আমি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলান "দিদি! পরিচয় দিবে বলিয়াছিলে।"

তিনি বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে সজল নয়নে বলিলেন, "ভগিনি! তোমার পুত্রের পিতা যিনি আমি তাঁহারই দাসী ছিলাম।"

আমার মনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত! নারীহৃদয় এত মহান! তিনি উচ্চে আর আমি কত নীচে! যাহার চরণ ধূলারও যোগ্য নই তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছি! আমার অভিশাপেই আজ এই করুণাময়ী শুভ্রবসনধারিণী! আমি যাহাকে ক্ষমা করিতে পারি নাই সেই অপরাধী স্বামীকে তো তিনি ক্ষমা করিয়াছেন! শুধু তাই নহে স্বামীর অপরাধের বোঝা আপন স্কন্ধে বহিয়া লইয়াছেন।

আমি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম,—"দেবি! আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল—চিরজীবন তোমার সেবা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

তিনি আমাকে গৃহে আনিয়া ভগিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন! কিন্তু পুণ্যাত্মা সতীলক্ষ্মী বেশী দিন এ পাপ পৃথিবীতে থাকিবেন কেন? এক বৎসর যাইতে না

যাইতে তিনি বৈধব্য যন্ত্রণা এড়াইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। আমার জীবনের কাহিনী শুনিলে তো? এখন যা'ও—আমার পূজার ব্যাঘাত হইতেছে। যে কখনও পুরুষের প্রণয় কি তাহা জানে নাই, তাহাকে হৃদয়ের পূজা প্রাণের প্রেম সমর্পণ কর গিয়া, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থের কাঙ্গালিনীও নহি! ঐ যে দাসদাসীপরিপূর্ণ বৃহৎ অট্টালিকা, ফলফুলে শোভিত সুন্দর উদ্যান, পুষ্প বৃক্ষ বেষ্টিত, মর্ম্মরবেদীশোভিত দীর্ঘিকা দেখিতেছ,—ঐ সকল কাহার জান? ঐ সকল আমার ও আমার পুত্রের। দেবী তাঁহার বিষয় সম্পত্তি আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু ঐশ্বর্য্য আমাকে সুখদানে অক্ষম।

এই যে স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিতেছ,—ইহা তাঁহারই স্বর্ণমূর্ত্তি, তাঁহার চিতাপার্শ্বে স্থাপন করিয়াছি। নিত্য দুই সন্ধ্যা এই সুবর্ণ মূর্ত্তি পূজা করিয়া, এই চিতা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া পরম শান্তি লাভ করি। আর এই যে ক্ষুদ্র কুটির দেখিতেছ, ইহাতেই আমি বাস করি। এই স্থানই আমার শান্তি নিকেতন।

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী।

দান

সুযশ তব ভুবন হতে গগন নে'ছে হরি,
কীর্ত্তি তোমার বসুমতীর অঙ্গ নিল ভরি,
সুদূর হতে শ্রবণ-পথে পশিল তব নাম,
অনেক আশে তোমার পাশে এসেছি যশধাম।
ত্রিপদ ভূমি আমারে তুমি দিবে কি মহারাজ?
আশীষ করে ফিরিবে ঘরে দ্বিজের সুত আজ।
ইহার সাথে চাহিছ দিতে রত্ন শত দান,
তুষ্ট হ'নু ধন্য তুমি মহৎ তব প্রাণ।
আসন করে পূজার তরে বসিতে চাহি ঠাঁই,
—ব্রাহ্মণের প্রয়োজনের অধিক নিতে নাই।
চরণ মম ক্ষুদ্রতম তাহাতে কিবা ফল,
বৃহৎ হবে ইহাই যদি দানের থাকে বল!

হে রাজা! যদি সময় চাহ—ক্ষান্ত রহ আজ,
দুঃখ নাহি প্রদানে পরে, ভাবিয়া-করা-কাজ;
দ্বিপদে মম পূর্ণ হোল স্বর্গ বসুমতি
তৃতীয় পদ কোথায় রাখি দেখাও মহীপতি!
তৃতীয় পদ হেরিতে চাহ? নাভিতে হে'র অই!
কোথায় তুমি রহিবে যদি পাতালও আমি লই!
ধন্য তুমি, মহৎ প্রাণ ধন্য দানবীর!
ধন্য হোল চরণ মম পরশি পূত শির,
ভক্তি ডোরে বন্দী করে রাখিলে মোরে রাজা
দণ্ড তব লইনু মানি—আসিয়া দিতে সাজা।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

রাগ ও অনুরাগ

ডাগর ডাগর আঁখি, গাল ঘন লাল,
ক্রোধভরে বধূ বলে, বাড়ী যাব কাল।

মুচ্‌কি হাসিয়া ধীরে কহিলেন স্বামী
বিষাদে শ্বশুরালয়ে চলে যাব আমি!

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংক্রামকতা প্রতিষেধের বিশেষ বিধি।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য যে সকল বিশেষ বিধির প্রতিপালন আবশ্যক, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিধির উল্লেখ থাকিলেও একত্রে সন্নিবিষ্ট হইলে সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, এই বিবেচনায় তাহাদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথার পুনরুল্লেখ করা হইল।

কলেরা (Cholera)—১। কলেরা মহামারী-রূপে আবির্ভূত হইলে পেটের অসুখ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। একবার মাত্র পাতলা দাস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ জল-মিশ্রিত সল্‌ফিউরিক্‌ এসিড্‌ (Dilute Sulphuric acid) ১০ ফোঁটা এবং ক্লোরোডাইন্‌ (Chlorodyne) বা টিংচার্‌ ওপিয়ম্‌ (Tincture of Opium) ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা একত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাত্রা; বালকদিগকে বয়সের প্রতি বৎসর হিসাবে আধ ফোঁটা করিয়া উক্ত দুইটী ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তবে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালককে অহিফেন সেবন করিতে দিবে না। প্রয়োজন হইলে অগ্রে ঔষধ সেবন করাইয়া পরে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে।

২। বিকৃত বা দুষ্পাচ্য খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এ সময়ে কোন খাদ্য-দ্রব্য (যেমন ফলমূলাদি) কাঁচা অবস্থায় না খাওয়াই ভাল। তরকারি, মাছ, যাহা কিছু বাজার হইতে আসিবে, পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরে উহাদিগকে কুটিতে দিবে। সকল দ্রব্যই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে ভক্ষণ করিবে। বাজারের মিষ্টান্ন এ সময়ে ব্যবহার না করাই মঙ্গল। সকল খাদ্য-সামগ্রী এরূপ ভাবে রাখিবে যে তাহাদিগের উপর মাছি বসিতে না পারে।

৩। পানীয় জল ও দুগ্ধ ১৫ মিনিট কাল উত্তম রূপে ফুটাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিবে, যাহাতে তন্মধ্যে কোন মতে ধূলি পড়িতে বা মাছি বসিতে না পারে। যে জলে মুখ ধুইবে, তাহাও যেন ফুটাইয়া লওয়া হয়। ফিল্টারের উপর এ সময়ে বিশ্বাস করিবে না। তৈজসপত্র সংস্কৃত হইবার পর উহাদিগকে ফুটন্ত জলে পুনরায় ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে।

৪। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কলেরা রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার সেবা করিলে কলেরা রোগ হয় না। রোগীর বমি ও মলের মধ্যে ঐ রোগের বীজ অবস্থিতি করে; উহারা কোন রূপে খাদ্য

বা পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে ঐ রোগের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এই রোগে মল ও বমির সহিত তৎক্ষণাৎ কোনরূপ বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহাকে শুষ্ক খড় বা করাতের গুঁড়ার উপর ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য বিশোধক ঔষধের অভাবে উহার সহিত চূণ মিশ্রিত করিয়া কলিকাতা সহরের ন্যায় সে সকল স্থানে বদ্ধ ড্রেন্ আছে, তন্মধ্যে উহা ফেলিয়া দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তবে খোলা ড্রেন্, কাঁচা নর্দ্দামা বা জমির উপর ফেলিয়া দেওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। রোগীর মলস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি একদিন বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া একঘণ্টা কাল জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে উহারা নির্দ্দোষ হইয়া যায়। বিশোধক ঔষধে ভিজাইবার পর সাবান জলে কাচিয়া লইলেও উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়, তবে জলে ফুটাইয়া লইলেই এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। এই সকল বস্ত্রাদি কোন পুষ্করিণীর জলে কাচা উচিত নহে। পল্লীগ্রামে বাটী হইতে বহুদূরে মাঠের মধ্যে গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে সংক্রামক রোগের মলমূত্রাদি প্রোথিত করা যাইতে পারে। তবে নিকটে কোন জলাশয় থাকিলে এরূপ ব্যবস্থায় অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে খড়ের উপর মলমূত্রাদি ঢালিয়া পুড়াইবার দিবার যে ব্যবস্থার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সহজ-সাধ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্।

৫। যাঁহারা রোগীর পরিচর্য্যা করিবেন অথবা সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা যেন বিশোধক ঔষধ ও সাবান জলে হাত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ বা স্পর্শ করেন। রোগীর গৃহের মধ্যে কোনরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। আমি জানি যে একজন ডাক্তার কলেরা রোগী দেখিয়া হাত না ধুইয়া সেই হাতে পান খাইয়াছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ঐ রোগে আক্রান্ত হন এবং অনেক কষ্টে তাঁহার প্রাণ-রক্ষা হইয়াছিল। যাঁহারা রোগীর পরিবার-ভুক্ত নহেন, তাঁহাদিগের, রোগীর বাটীতে কোনমতেই জল পান বা কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। যাঁহারা পরিবার-ভুক্ত, তাঁহারা রোগীর গৃহ হইতে দূরে, হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া, পরিষ্কৃত স্থানে অত্যুষ্ণ জলে ধৌত বাসনে পক্কখাদ্যাদি গ্রহণ করিবেন।

৬। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় "খালি পেটে" থাকা উচিত নহে। আমাদের পাকস্থলীতে (Stomach) যে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) নামক অম্লগুণ-সম্পন্ন পাচক রস নির্গত হয়, কলেরার বীজ উহার সংস্পর্শে আসিলে শীঘ্র মরিয়া যায়। "খালি পেটে" থাকিলে এই রস নিঃসৃত হয় না, কিছু খাদ্য ভক্ষণ করিলেই ঐ রস নিঃসারিত হইতে থাকে। সুতরাং তখন ঘটনাক্রমে দুই দশটা কলেরার বীজ উদরের মধ্যে প্রবেশ করিলেও অম্লরস-সংযোগে উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পেট খালি থাকিলে ঐ সকল বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের (Small Intestine) মধ্যে গমন করে এবং তথায় অনুকূল কারণ

সংযোগে উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়।

৭। বাটীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে কোনরূপ আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিতে দিবে না। ইহাতে মাছির উপদ্রব হয় এবং মাছি দ্বারা কলেরার বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবাহিত ও খাদ্য-দ্রব্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকে।

৮। পয়ঃপ্রণালী, পাইখানা প্রভৃতি স্থান সর্ব্বদা ফেনাইল্ দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত রাখিবে।

৯। শরীর ও মন সর্ব্বদা সচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিবে। কলেরা রোগীর সেবা করিবার প্রয়োজন হইলে কলেরা রোগকে কখন ভয় করিবে না। রোগ নিবারণের জন্য যে স্বাভাবিক শক্তি আমাদের শরীরে নিহিত আছে, শরীর ও মনের অবসন্নতা হেতু তাহা নিস্তেজ হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

১০। অনেক সময়ে সোডা ওয়াটর্, লেমনেড্ প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য দূষিত জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল পানীয় গ্রহণ করিয়া সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বিশ্বস্ত কারখানায় প্রস্তুত হইলে এই সকল পানীয় গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই—তাহা না হইলে এ সময়ে এই শ্রেণীর পাণীয় গ্রহণ করা উচিত নহে। বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক সময়ে অপরিস্কৃত জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এ সময়ে বরফ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

১১। কলেরার "টিকা" (Inoculation) লইলে কিছু দিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। ইহাতে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না, সুতরাং মহামারীর সময়ে যাহারা কলেরা রোগীর সংস্রবে আসিবে, অথবা বাটীর মধ্যে কলেরা রোগের আবির্ভাব হইলে সেই পরিবারস্থ লোকেরা, "টিকা" গ্রহণ করিলে, আত্মরক্ষা সম্পাদন ও রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ, উভয় বিষয়েই সুফল লাভ হইতে পারে।

টাইফয়েড্ জ্বর (Typhoid fever)—১। কলেরার ন্যায় টাইফয়েড্ জ্বরেও মল এবং মূত্রের সহিত রোগের বীজ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং কলেরার ন্যায় এই রোগেও মলমূত্রাদির সংক্রামকতা দোষ বিশোধক ঔষধের দ্বারা নষ্ট করিয়া উহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই রোগের পরিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সংক্রামকতা-দুষ্ট জল বা দুগ্ধ পান করিয়াই এই রোগের বিস্তার সংঘটিত হয়, সুতরাং কলেরা রোগে যেমন পানীয় জল, দুগ্ধ প্রভৃতি উত্তমরূপে ফুটাইয়া পান করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য। অনেক সময়ে অবিরাম জ্বর হইলে উহা টাইফয়েড্ জ্বর কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা চিকিৎসকের পক্ষেও দুরূহ হইয়া উঠে। অধুনা রক্ত-পরীক্ষা দ্বারা কোন জ্বর প্রকৃত টাইফয়েড্ জ্বর কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে। যাহা হউক; দুই তিন সপ্তাহ স্থায়ী অবিরাম জ্বর হইলেই উহাকে টাইফয়েড্ জ্বর মনে করিয়া উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা

প্রতিপালন করিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না।

২। জ্বর ভাল হইয়া গেলেও কিছু দিন রোগীর মল মূত্রের মধ্যে, এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আরোগ্য হইবার পরেও উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

রক্ত-আমাশয় (Dysentery)—১। এই রোগের বীজ মলের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং অধিকাংশ স্থলেই দূষিত পানীয় জলের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে। বালকবালিকাদিগের রক্ত-আমাশয় রোগ হইলে উহাদিগের মল যথাতথা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং নানা কারণে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় জল উহাদ্বারা দূষিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঐ রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে রক্ত-আমাশয় সংক্রামক নহে এবং তাঁহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই রোগ সম্বন্ধে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন না। কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর সম্বন্ধে মলাদি বিশোধন করিবার এবং পানীয় জল, খাদ্য প্রভৃতি বিশুদ্ধ অবস্থায় গ্রহণ করিবার যে সকল ব্যবস্থাপালন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই রোগ সম্বন্ধেও সেই সকল প্রযোজ্য।

যক্ষ্মা (Phthisis)—১। রোগীকে সর্ব্বদা খোলা জায়গায় রাখিবে। দেহ গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া খোলা বারাণ্ডায় বা দালানে রাত্রিকালে শয়নের ব্যবস্থা করিবে এবং দিবাভাগে বাটীর বাহিরে ছায়াযুক্ত মুক্ত স্থানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবে। যদি ঘরের মধ্যে থাকিতেই হয়, তাহা হইলে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে।

২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর পরিত্যক্ত কফের সহিত নির্গত হয়। রোগী যথা তথা কফ ফেলিলে উহা শুষ্ক হইয়া ধূলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং রোগ-বীজ-মিশ্রিত ধূলি উড়িয়া নিশ্বাসের সহিত অপরের ফুস্ফুসে অথবা খাদ্যদ্রব্যের সহিত অপরের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এজন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে বিশোধক ঔষধ রাখিয়া তন্মধ্যে কফ পরিত্যাগ করা উচিত এবং উহা ভূমিতে না ফেলিয়া ড্রেনের মধ্যে অথবা গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পুতিয়া ফেলিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কফ মুছিবার জন্য যে সকল বস্ত্রখণ্ড রোগী ব্যবহার করিবে, তাহা বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। খবরের কাগজের উপর কফ ফেলিয়া উহাকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিলে এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তি কখনই এক বিছানায় শয়ন করিবে না। নিতান্ত অসুবিধা না হইলে রোগীর সহিত এক ঘরেও রাত্রি যাপন করিবে না।

৪। মানুষের ন্যায় গোরুরও যক্ষ্মা হইয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্ত গোরুর দুগ্ধ পান করিয়া মানুষের যক্ষ্মা হইতে পারে, ইহা অনেকানেক খ্যাতনামা চিকিৎসক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যক্ষ্মাগ্রস্ত দুগ্ধবতী গাভীর বাঁটে ঐ রোগের গুটী অবস্থিত থাকে; দুগ্ধ দোহন করিবার

সময় গুটী হইতে রোগের বীজ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এজন্য দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। কলিকাতায় অধিকাংশ লোকেই গোয়ালার দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং গাভীর স্বাস্থ্যের অবস্থা তাঁহাদের জানিবার সুবিধা হয় না। যদি দুগ্ধের মধ্যে যক্ষ্মার বীজ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহাকে ১৫ মিনিট কাল ফুটাইয়া লইলেই উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব বাজারের দুধ একবার উথলিয়া উঠিলেই উহাকে নামাইবে না, কিছুক্ষণ উহাকে ফুটিতে দিলে উহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে।

৫। অনেক সময়ে মাছি দ্বারা এই রোগের বীজ খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে; উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিলে রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং খাদ্য-সামগ্রীতে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৬। যক্ষ্মা-রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির এক স্থানে এক সঙ্গে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ। যে সকল ভোজন-পাত্র যক্ষ্মা-রোগী দ্বারা ব্যবহৃত হইবে, তাহা বিশোধক ঔষধ ও উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত না করিয়া সুস্থ ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে। যক্ষ্মা-রোগীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য বা পানীয় অপর কাহারও গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ।

৭। যক্ষ্মা পীড়িতা মাতা শিশু সন্তানকে স্তনপান করাইবেন না। ইহাতে মাতার শরীর শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রুগ্না মাতার দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরও ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

৮। পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যাহার যক্ষ্মার সূত্র-পাত হইয়াছে, তাহার বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যক্ষ্মারোগী বিবাহ করিলে তাহার স্বাস্থ্য শীঘ্র ভগ্ন হয় এবং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যক্ষ্মারোগীর সন্তান-সন্ততির মধ্যেও ঐ রোগ-প্রবণতা অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও ব্যাধিযুক্তা কন্যার বিবাহ দিলে যে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ একত্র সহবাসের জন্য স্ত্রী হইতে স্বামীর বা স্বামী হইতে স্ত্রীর শরীরে যক্ষ্মারোগের সূত্র-পাত হইবার ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে।

ডিপ্থিরিয়া (Diptheria)—১। যাঁহারা ঐ রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের মুখ বা চোখের মধ্যে রোগীর থুথু বা কফ যাহাতে না প্রবেশ করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই রোগের বীজ কাশিবার সময় রোগীর গলা হইতে কফের সহিত নিঃসৃত হয়। যদি কোন প্রকারে রোগ-বীজ মিশ্রিত কফ সুস্থব্যক্তির চোখে বা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২। এই রোগে রোগীর গলার মধ্যে ঔষধ লাগাইবার প্রয়োজন হয় এবং ঔষধ লাগাইবার সময়ে রোগী অত্যন্ত কাশিতে থাকে। যিনি ঔষধ লাগাইবেন, তিনি যেন একখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা নিজ নাসিকা ও মুখ আবদ্ধ করিয়া গলায় ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা করেন, নতুবা ঐ সময়ে তাঁহার

মুখের মধ্যে রোগের বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

৩। যে ঘরে রোগী থাকিবে, তাহার সন্নিকটে ছোট ছেলেমেয়েদের কখনই আসিতে দেওয়া উচিত নহে। সুস্থ বালক-বালিকাগণকে বাটী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়।

৪। গৃহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করিবে। রোগীর গৃহ কখনই বদ্ধ রাখিবে না, কারণ এই রোগের বীজ নিশ্বাস দ্বারা বায়ু মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বায়ুকে দূষিত করে।

৫। ড্রেনের গ্যাস্ যাহাতে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকে দূষিত না করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অনেকে অনুমান করেন যে ড্রেন হইতে উত্থিত গ্যাসের মধ্যে এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে।

৬। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের সংস্পর্শ হইতে মনুষ্য শরীরে রোগ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা।

প্লেগ্ (Plague)—১। বাটীর সর্ব্বত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্নাবস্থায় রাখিবে। যাহাতে বাটীর প্রত্যেক গৃহে সমস্ত দিন যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। অব্যবহার্য্য সামগ্রী ও আবর্জ্জনাদি বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে এবং গৃহের মধ্যে ইঁদুরের গর্ত্ত থাকিলে উহা ইট ও সিমেণ্ট্ মাটী দ্বারা শক্ত করিয়া বুজাইয়া দিবে। ইঁদুর মারিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সাধন করিতে বিলম্ব বা আলস্য প্রদর্শন করিবে না।

২। মানুষের প্লেগ্ হইবার পূর্ব্বে ইঁদুরের প্লেগ্ হইতে দেখা যায়। যখন দেখিবে যে বিনা কারণে বাটীতে ইঁদুর মরিতেছে, তখনই বুঝিবে যে উহারা প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলেই অবিলম্বে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে এবং সমস্ত বাসগৃহ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া ও চূণ ফিরাইয়া সমস্ত দরজা জানালা কিছু দিনের জন্য খুলিয়া রাখিলে পর তবে উহা পুনরায় বাসের যোগ্য হইবে। বাটীতে ইঁদুর মরিতে আরম্ভ হইলে ফাঁকা জায়গায় চালা বাঁধিয়া কয়েক দিন বাস করিলে পরিবারস্থ কাহারো প্লেগ্ হইবার সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু এরূপ অবস্থায় বিলম্ব করিয়া বাটীত্যাগ করিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে।

৩। মৃত ইঁদুর কখনই হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না। অজ্ঞতাবশতঃ মৃত ইঁদুর স্পর্শ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের প্লেগ্ রোগ হইয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে। মৃত ইঁদুর চিম্‌টার দ্বারা ধরিয়া ফাঁকা যায়গায় খড়ের উপর কেরোসিন্ তেল ঢালিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। মৃত ইঁদুর কখনই রাস্তা ঘাটে ফেলিয়া দিবে না। যে স্থানে মৃত ইঁদুরের দেহ পতিত থাকে, তাহা ফেনাইল্ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে।

৪। প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করিতে বা তাহার সেবা করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অন্যান্য সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত যে সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন, প্লেগ্ সম্বন্ধেও তাহাই প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে লোকের

সংস্কার ছিল যে প্লেগ্ রোগীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে অথবা উহাকে স্পর্শ করিলেই, প্লেগ্ হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য বাটিতে কাহারো প্লেগ্ হইলে নিতান্ত আপনার লোক ব্যতীত অপর সকলেই তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিত। এমন কি, মহামারীর প্রথমাবস্থায় অনেক স্থলে কোন কোন চিকিৎসককেও রোগীর চিকিৎসা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতে দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এই ভ্রান্ত ধারণা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। অধিকাংশ স্থলেই ইঁদুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা মনুষ্য শরীরে প্লেগ্ সংক্রামিত হইয়া থাকে; প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ করিলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয় না। তবে শরীরের মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে প্লেগ্ রোগীকে স্পর্শ না করাই উচিত এবং প্লেগ্ রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষার সময়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে যাহাতে কোনরূপ ক্ষত না হয় বা আঁচড় না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্লেগ্ রোগীর নিউমোনিয়া (Pneumonia) হইলে উহার থুথু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। এই উপায়ে রোগী হইতে চিকিৎসকের শরীরে প্লেগ্ সংক্রামিত হইবার ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। নিউমোনিয়াগ্রস্ত প্লেগ্ রোগীর নিশ্বাস ও কফ দ্বারা এই রোগের বীজ বায়ুমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৫। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে পর অন্ততঃ ১ মাস কাল তাহার পৃথক্ গৃহে বাস করা এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্রবে না আসাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, রোগারোগ্যের পর ১০ দিন তাঁহাদের পৃথক্ হইয়া থাকিলে ভাল হয়।

৬। যে সকল স্থানে প্লেগ্ হইতেছে, তথা হইতে আনীত বস্ত্র, শয্যা, পুস্তক বা শস্য রাখিবার থলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। যে পোকার (Rat flea) দংশন দ্বারা প্লেগ্ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা এই সকল সামগ্রী দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে।

৭। প্লেগের সময়ে পায়ে মোজা ও জুতা দেওয়া থাকিলে অনেক সময়ে উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। এজন্য প্লেগের সময়ে কাহারও খালি পায়ে থাকা উচিত নহে।

৮। যাঁহারা প্লেগাক্রান্ত স্থানে থাকিবেন অথবা প্লেগ্-রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারা প্লেগের "টিকা" লইলে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সময়ে এক প্রকার নিরাপদ্ থাকিতে পারিবেন। যদিও প্লেগের টিকার রোগনিবারিণীশক্তি অধিক দিন স্থায়ী নহে, তথাপি উহা দ্বারা সেই সময়ের মত আত্মরক্ষা করিতে এবং রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিতে পারা যায়। সুব্যবস্থা পূর্ব্বক এই টীকা লইলে কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না, অথচ যাঁহারা টিকা লইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐ রোগে আক্রান্ত হন না অথবা আক্রান্ত হইলেও সহজে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

সুতরাং প্লেগের টিকা যে সময়োপযোগী ও উপকারী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা ইহার রক্ষণীশক্তি নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। প্লেগের টিকা লইতে সাধারণ লোকে অত্যন্ত ভয় পাইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

হাম, বসন্ত ইত্যাদি—১। এই সকল রোগ স্পর্শ দ্বারা, অথবা বস্ত্র, শয্যা বা বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও (বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের) কদাচ রোগীর গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে অথবা রোগীর বস্ত্র বা শয্যাদির সংস্পর্শে আসা অকর্ত্তব্য। বাটীতে এই সকল রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সুস্থ বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা উচিত। যাঁহারা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা একখানি মোটা চাদর গায়ে মুড়ি দিয়া গৃহের মধ্যে যাইবেন এবং বাহিরে যাইবার সময় ঐ চাদরখানি রোগীর গৃহের বাহিরে রাখিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় হস্তপদ সাবান জলে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত নহে।

২। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে সাবান ও ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে কাচিয়া ধোপার বাটীতে পাঠাইবে, নচেৎ সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সকল রোগ ধোপার বাটীর কাপড় দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে যতদিন না রোগী আরোগ্য লাভ করে, ততদিন ধোপার বাটীতে কাপড় দেওয়া, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া এবং পরিবারস্থ কাহারো কোন স্থানে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গমন করা নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি অনেকাংশে নিবারিত হইত। কিন্তু বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে এই প্রাচীন প্রথার উপকারিতা অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়।

৩। যে পরিবারের মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ দেখা দিবে, সেই বাটীর বালক বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। এই বিষয়ের অনবধানতা প্রযুক্ত বিদ্যালয় হইতে অনেক সময়ে হাম, পানবসন্ত প্রভৃতি রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে।

৪। যে বাটীতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে, সেই পরিবারের সকলেরই টিকা (Vaccination) লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বাটীর মধ্যে যদি ১ মাসের শিশুসন্তানও থাকে, তথাপি তাহারও সেই সময়ে টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে টিকা হইয়াছে বলিয়া এ সময়ে নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ উচিত নহে। যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবে, তাহারা, এমন কি, প্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত টিকা লইলে, রোগের পরিব্যাপ্তি সবিশেষ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। এই সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে থাকে, তখনই উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ প্রবল ও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে

থাকে। অতএব সেই সময়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। রোগীর গৃহের জানালা দরজায় কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে সিক্ত পর্দ্দা খাটাইয়া দেওয়া উচিত এবং রোগীর গাত্রে সর্ব্বদা কার্ব্বলিক্ তৈল (১ ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড্ ও ৯ভাগ নারিকেল তৈল) উত্তমরূপে লাগাইয়া রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, শরীরের ব্রণ-ক্ষতাদি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, ক্ষতাদির দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং তন্মধ্যস্থিত রোগবীজও নষ্ট হয়, 'ছাল' দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া বায়ুসাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না এবং ঘায়ে মাছি বসিতে পাবে না, সুতরাং রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। রোগ-আরোগ্য হইলে যতদিন না সমস্ত "ছাল" উঠিয়া যায়, ততদিন রোগীকে সুস্থব্যক্তির সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। কয়েক দিন স্নান করিবার পর সুস্থব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

৭। বস্ত্র, শয্যাদি, রোগীর গৃহ ও গৃহসজ্জা পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে উত্তমরূপে বিশোধন না করিলে রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

জলাতঙ্ক রোগ (Hydrophobia)—ক্ষিপ্ত কুক্কুর বা শৃগালের মুখের লালার মধ্যে এই রোগের বীজ অবস্থিতি করে। দংশন কালে উহা ক্ষত মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পথ দিয়া মস্তিষ্কের দিকে মৃদুগতিতে পরিচালিত হয় এবং অল্পাধিক কাল ব্যবধানে মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া ভীষণ রোগলক্ষণ প্রকাশ করে। এই রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশিত হইলে মৃত্যু সুনিশ্চয়—এই রোগ কখন নীরোগ হইতে দেখা যায় নাই। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে বানর, বিড়াল, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগের জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয়; তখন উহাদিগের লালার মধ্যেও ঐ রোগের বিষ বিদ্যমান থাকে এবং তাহারা মনুষ্য বা অন্য প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগেরও ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই ভয়ানক রোগের কোন সুচিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, কুকুরে কামড়াইলেই জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না; কুকুর ক্ষিপ্ত না হইলে এই রোগ জন্মিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। পুনশ্চ ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলেই যে জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে অনেক লোককে এক সময়ে দংশন করিলে তাহার বিষ ক্রমে ঝরিয়া যায়, সুতরাং যাহারা প্রথম-দষ্ট হয়, তাহাদেরই ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; যাহাদিগকে পরে কামড়ায়, বিষের অসদ্ভাব হেতু তাহাদিগের মধ্যে অনেক সময়ে উক্ত রোগ প্রকাশ পায় না। বিশেষতঃ দেহ বস্ত্রাদি আবৃত থাকিলে বিষ বস্ত্রের উপর লাগিয়া যায়, দংশন-জনিত ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় না, সুতরাং এরূপ স্থলে ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলেও ঐ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। বোধ হয় এইরূপ রোগীর চিকিৎসাদ্বারা দেশীয় ঔষধ বিশেষ আরোগ্য সম্পাদন সম্বন্ধে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রকৃত জলাতঙ্ক রোগ এই ঔষধের দ্বারাই উপশমিত হয় না। লোকে মিথ্যা

আশায় প্রতারিত হইয়া প্রকৃত চিকিৎসার উপায় থাকিতেও উহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র সুচিকিৎসা, স্বনাম-খ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর্ (Pasteur) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা সিমলা শৈলের নিকট কসৌলি নামক স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কন্নুর নামক নগরে গভর্ণমেণ্ট্ সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। একবার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার হয় না, কিন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এই চিকিৎসাধীন থাকিলে ক্ষিপ্ত-কুক্কুর-দংশন-জনিত দেহ-প্রবিষ্ট রোগের বিষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জলাতঙ্ক রোগ একেবারেই প্রকাশ পায় না। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা হইলে এই ভীষণ রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট্ বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের সাতিশয় কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পুনশ্চ গভর্ণমেণ্ট হীনবস্থ লোকের জন্য কসৌলি যাতায়াতের রেলভাড়া পর্য্যন্ত দিবার এবং তথায় বিনা ব্যয়ে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আহারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ চারি আনা প্রদান করিয়া থাকেন। কসৌলি যাইতে হইলে হাবড়ায় রেলগাড়ীতে উঠিয়া কাল্‌কায় (Kalka) নামিতে হয় এবং তথা হইতে পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা হাত-গাড়ি (Rick-shaw) সাহায্যে ৯ মাইল পথ শৈলারোহণ করিয়া চিকিৎসালয়ে পৌঁছিতে হয়। রাত্রে হাবড়ায়, পঞ্জাব মেলে উঠিলে তৎপরদিন রেলে এবং তার পর দিন বেলা ২।৩ টার সময় কসৌলি পৌঁছান যায়। পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের তথায় থাকিবার বড় অসুবিধা ছিল, এখন দুই চারিটী বাসা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। যাইবার পূর্ব্বে চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়কে জানাইলে, এই সকল বাসাবাড়ী খালি থাকিলে, তিনি তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। চাল, ডাল, ঘৃত, আলু, মৎস্য প্রভৃতি সাধারণতঃ যে সকল খাদ্য-দ্রব্য আমরা ব্যবহার করি, সে সকলই সে স্থানে পাওয়া যায়, তবে চাকর ও রসুইকর ব্রাহ্মণ সেখানে মিলে না, এখান হইতে সঙ্গে না লইয়া গেলে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। শীতকালে সেখানে শীত অধিক হয়, এজন্য ভিতরের ও উপরের গরম কাপড়, জামা ও কম্বলাদি যথা পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। কসৌলি অতি স্বাস্থ্য-প্রদ স্থান, সেখানে অসাবধানতা হেতু ঠাণ্ডা না লাগাইলে কোন অসুখ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই রোগের চিকিৎসা-প্রণালী অতি সহজ। সকল রোগীকেই বেলা দশটার সময় একবার হস্পিটালে যাইতে হয়। সেখানকার সাহেব-ডাক্তার সূচল পিচকারির দ্বারা পেটের ত্বকের মধ্যে একবার মাত্র ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহাতে সামান্য সূচ-ফোঁটার অধিক যন্ত্রণা হয় না। দুই একদিন চিকিৎসার পর ছোট ছোট বালকবালিকারাও এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাদের নাম ডাকিলেই আপনাপনি পেটের কাপড় খুলিয়া পিচকারির ঔষধ লইবার জন্য বিনা সঙ্কোচে ডাক্তারের নিকট গমন করে। যে স্থান ফুঁড়িয়া ঔষধ

দেওয়া হয়, তথায় দুই এক দিন অল্প বেদনা থাকে, কিন্তু জ্বরজ্বালা কিছুই হয় না। দুই একদিন পরে রোগী সচ্ছন্দে সকল কার্য্যই করিতে পারে। আমি স্তন্যপায়ী শিশুগণকে এই চিকিৎসাধীন থাকিতে দেখিয়াছি, তাহাদের কোন অসুখ হইতে দেখি নাই। আমি একটী ছয় বৎসরের বালক লইয়া এই চিকিৎসার জন্য কসৌলি গিয়াছিলাম এবং তথায় প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিয়া পাষ্টুর্ মতে চিকিৎসা সম্বন্ধে সকল বিষয়ই ভালরূপে দেখিবার আমার অবকাশ হইয়াছিল। অনেকে এই চিকিৎসাসম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও স্থানীয় অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন বলিয়া তথায় রোগী লইয়া যাইতে ভয় পাইয়া থাকেন; তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই, ইহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি এস্থলে এই কথাগুলির অবতারণা করিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ হইয়া যায়, তৎপরে রোগী সচ্ছন্দে নামিয়া আসিতে পারেন। যদি দংশন গুরুতর হয়, অথবা মস্তক, মুখ বা মস্তকের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দংশন ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে প্রথম প্রথম দুই বেলা ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় এবং চিকিৎসা শেষ হইতে ২। ৪ দিন বেশী সময় লাগে।

এক্ষণে কুক্কুরে দংশন করিলে চিকিৎসার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

১। কুক্কুরে দংশন করিলে উষ্ণ জলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধৌত করিয়া নাইট্রিক্ এসিড্ বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ (Strong Nitric or Carbolic Acid) সরু তুলির সাহায্যে ক্ষত প্রদেশের অভ্যন্তরে ৩।৪ বার প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই সকল ঔষধ লাগাইলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে, কেন না ইহাদিগের প্রয়োগে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সূচল লৌহখণ্ড লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ঐ স্থান পুড়াইয়া দিলেও বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

২। কিন্তু শুদ্ধ এই ঔষধ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে ২।১ দিনের মধ্যে সুযোগ্য অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা দষ্ট স্থানে যতদূর পর্য্যন্ত দাঁত প্রবেশ করিয়াছে, তত খানি মাংস অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। অস্ত্রজনিত ঘা শুকাইতে দেরী হয় না। দংশনের অব্যবহিত পরে এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে অন্য কোন রূপ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এই রোগের বিষ কিছু দিন দষ্ট স্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং অস্ত্র সাহায্যে ঐ স্থানের মাংস তুলিয়া লইলে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

৩। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কুকুরে কামড়াইলেই যে জলাতঙ্ক রোগ হইবে, এমন কোন কথা নাই। অধিকাংশ স্থলেই কুকুরের ক্ষিপ্ততা থাকে না, সুতরাং কোন চিকিৎসা না হইলেও ঐ ব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না। এরূপ স্থলে খরচ পত্র করিয়া কসৌলি যাইয়া চিকিৎসা করিবার কোন আবশ্যকতা হয় না। যে কুকুর দংশন করিয়াছে, কামড়াইবার পর ১০ দিন তাহাকে লৌহ-শিকলে আবদ্ধ করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। যদি ঐ কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়

জানিবে যে উহা ক্ষিপ্ত নহে। এরূপ স্থলে কসৌলি যাইয়া পাষ্টুরের মতে চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন হয় না, তবে দংশিত স্থান নাইট্রিক্ বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ প্রয়োগ দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে মৃত কুকুরের মুণ্ডটী বেল্‌গাছিয়া পশু-চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠাইবে। তথায় পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে কুকুর ক্ষিপ্ত কি না। কিন্তু এই পরীক্ষা-ফলের অপেক্ষা না করিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব, কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য গমন করিবে। দংশন মস্তকে, মুখে বা শরীরের ঊর্দ্ধভাগে হইলে অতিশয় বিপজ্জনক বলিয়া জানিবে এবং কাল বিলম্ব না করিয়া কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য প্রস্থান করিবে। পদদেশে দংশন হইলে কিছুকাল বিলম্ব লইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ এই রোগের বীজ কিছুদিন ক্ষত স্থানে আবদ্ধ থাকে, তৎপরে আস্তে আস্তে মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং মস্তক হইতে ক্ষত স্থান যত দূরে অবস্থিত হইবে,ততই রোগের তীক্ষ্ণতার হ্রাস এবং প্রকাশ হইবার বিলম্ব হইয়া থাকে। যাহা হউক, যদি কুকুর ক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, অথবা যে কুকুরে কামড়াইয়াছে, তাহার কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একদিনও বিলম্ব না করিয়া কসৌলি চলিয়া যাওয়া উচিত।

৪। যে ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইবে, তাহার নিকট ঐ রোগ সংক্রান্ত কোন গল্প করিবে না। কোনরূপে তাহার মন যাহাতে উত্তেজিত না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কথাবার্ত্তায় ও কার্য্যে তাহার হৃদয়ে যাহাতে ভয়ের সঞ্চার না হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। অনেক স্থলে শুদ্ধ ভয় পাইয়া রোগীকে এরূপ উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে যে চিকিৎসক পর্য্যন্ত ঐ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে কুকুর ক্ষিপ্ত নহে এবং রোগের মিথ্যা লক্ষণ ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

(সম্পূর্ণ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

চাউক্-ওয়াইঙ্গ্ পাগোদা

সোয়ে-ডেগন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাগোদা ব্যতীত রেঙ্গুনের নিকটে আরও পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাগোদা আছে। বৎসরে একদিন এই সকল পাগোদার পাদদেশে মেলা বসে এবং সেদিন ব্রহ্মদেশবাসিগণ গো-যান, নৌকা এবং রেলযোগে উৎসবার্থ তথায় সম্মিলিত হয়। উপ-রোক্ত পাঁচটী পাগোদার মধ্যে চাউক্-ওয়াইঙ্গ্ পাগোদা সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশবাসীদের মধ্যে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

পুরাকালে ইয়ে-গিনু (১) নামক ক্ষুদ্র নগরের অধিপতির সা সোয়ে বুয়িন্ নামক এক পরম রূপবতী যুবতী কন্যা

---

(১) জোয়ারের সময় ইরাবতী নদীর স্রোত নগরকে স্পর্শ করিতে পারিত না বলিয়া নগরের নাম ছিল ইয়ে-গিন অর্থাৎ স্রোতঃ-মুক্ত।

ছিল। বহু যুবক তাহার পাণিপ্রার্থী হইলেও, যুবতী কাহাকেও কোনও প্রকার উৎসাহ প্রদান করিত না। প্রত্যাখ্যাত যুবকগণ নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কিন্তু কিছুকাল পরে যুবতী এক অপরিচিত সুন্দর যুবককে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। উভয়ের পরিচয় অত্যল্পকাল মধ্যে গভীর ভালবাসায় পরিণত হইল। অবশেষে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল। যথা সময়ে যুবতী একটী সন্তান প্রসব করিল। যুবক অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে সূতিকাগৃহে প্রসূতি ও সন্তানের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সুখ বহুদিন স্থায়ী হইল না, কারণ ইতোমধ্যে যুবকের কর্ম্মফলভোগের সময় উপস্থিত হইল। সন্তানজন্মের সপ্তাহকাল মধ্যে একদিন যুবক প্রসূতি ও শিশুকে শুশ্রূষা করিতেছিল। এমন সময় যুবক ক্রমাগত তিন-বার সংজ্ঞাহীন হইয়া আসন হইতে ভূমিতে পতিত হইল। তখন সহসা অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা একে একে তাহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল, এবং সে বুঝিতে পারিল তাহার কর্ম্মফল ভোগের সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তাহার শারীরিক ও মানসিক যাতনা যুবতীর মাতার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। যুবতীর মাতা পুনঃ পুনঃ তাহার আকস্মিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, যুবক বলিতে লাগিল :—

"ক্ষবি নগরের অনতিদূরবর্ত্তী কোনও গ্রামে পোঁ-ট-লাবান্ নামক এক বৃদ্ধ ও মে জে নাম্নী তদীয় পত্নী বাস করিত। তাহারা ধীবরবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিত। একদিন বহুমৎস্যসহ একটি জ্যোতির্ম্ময় ডিম্ব তাহাদের জালে পতিত হইল। ডিমটী ধীবরদম্পতি সযত্নে রাখিয়া দিল। কালক্রমে ডিম্ব হইতে একটী কুম্ভীর শাবক নির্গত হইল। তৎকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া কুম্ভীর শাবকের নাম ঙা মো (২) ইয়েইক্ (গগন-ঘনশ্যাম) রাখা হইল। ধীবরদম্পতি কুটীর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় খনন করিয়া তন্মধ্যে শাবকটীকে রাখিয়া দিল। তাহারা সন্তানস্নেহে কুম্ভীর-শাবককে লালন পালন করিতে লাগিল। ক্রমে কুম্ভীর-শাবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। ক্ষুদ্র জলাশয়ে এখন আর তাহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। তখন গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতে একটী বংশনির্ম্মিত ঘের প্রস্তুত হইল এবং কুম্ভীরশাবককে তথায় স্থানান্তরিত করা হইল। এই ঘের প্রস্তুত করিতে একশত বংশখণ্ডের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ওয়া-টইয়া (বংশ-শত) রাখা হইল।

"পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলে কুম্ভীর শাবক বংশ-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া মুক্তভাবে নদীজলে বিচরণ করিতে লাগিল। ধীবরদম্পতি তথাপি উহাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিত এবং স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিত।

"একদিন বৃদ্ধ ধীবর খাদ্যদ্রব্য লইয়া কুম্ভীরশাবকের সমীপবর্ত্তী হইলে, কুম্ভীরশাবকের পাশব প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ ধীবরকে বধ করিয়া তাহাকে উদরসাৎ করিল। তৎপর সেই অকৃতজ্ঞ কুম্ভীরশাবক ঙা মো ইয়েইক্ তথা হইতে রেঙ্গুন নদীতে গমন করিল। রেঙ্গুন নদীতে তিনটী কুম্ভীরণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কুম্ভীরণীত্রয় ঙা মো ইয়েইক্‌কে তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। ঙা মো ইয়েইক্ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়োল্লাসে নদীমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং নদীর সর্ব্বত্র স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিল।

"ঙা মো ইয়েইক্ কুম্ভীর হইলেও কোন পল্লীদেবতার অনুগ্রহে যে কোন জন্তুর রূপ ধারণ করিতে পারিত। যখন সে ইয়ে-গিন নগরের সমীপে উপস্থিত হইল, তখন এক সুন্দর যুবাপুরুষের রূপ ধারণ করিয়া নগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিল। যুবতীর গর্ভে তাহার এক সন্তান জন্মিল—"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া নগরাধিপপত্নী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন —"বৎস, গল্পটীর সহিত তোমার জীবনের বহুপরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে।"

বিষণ্ণচিত্ত যুবক উত্তর করিল, "মাতঃ, বস্তু ও ব্যক্তি

(২) মো অর্থে আকাশ, বৃষ্টি। সংস্কৃত "মেঘ" শব্দের অপভ্রংশ।

সম্বন্ধীয় ঘটনা-পরম্পরার সাদৃশ্য এ জগতে বিরল নহে।"

"সত্য কথা। যাহা হউক, তোমার গল্প বলিয়া যাও। শেষটা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে।"

যুবক তখন বলিতে লাগিল—

"যখন ঙ্গা মো ইয়েইকের স্ত্রী সূতিকাগৃহে, তখন ডেগন (৩) নগরবাসী মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ তিনবার ঙ্গা মো ইয়েইক্‌কে স্মরণ করিল। প্রতিবার স্মরণমাত্র ঙ্গা মো ইয়েইক্ সংজ্ঞাহীন হইয়া আসন হইতে ভূমিতে পতিত হইল—"

ভীতিবিজড়িতকণ্ঠে নগরাধিপপত্নী বলিয়া উঠিলেন—

"কি সর্ব্বনাশ! দেখিতেছি এ গল্পের নায়ক স্বয়ং তুমি। কিন্তু উপরোক্ত ডেগনবাসী মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ নামক ব্যক্তিটী কে?"

পূর্ব্ববর্ণিত বৃদ্ধ ধীবর অকৃতজ্ঞ কুম্ভীরশাবকের নির্ম্মম কবলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন পরজন্মে এই নিদারুণ অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ নিতে পারে। সে ডেগননগরে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিল। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তক্ষঃশীলা নগরে গমন করিয়া "কুম্ভীরকণ্ঠচ্ছেদ" নামক বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ডেগনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দৈবক্রমে সে একদা ওয়া-টইয়া গ্রামে গমন করাতে তাহার পূর্ব্বজন্মের কাহিনী স্পষ্টভাবে তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সে ঙ্গা মো ইয়েইকের অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল। মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ তিনবার স্বীয় মায়াযষ্টি দ্বারা নদীজলে আঘাত করিয়া ঙ্গা মো ইয়েইক্‌কে তৎসমীপে আহ্বান করিল। তিনবারই ঙ্গা মো ইয়েইক্, যেন অদৃশ্য লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

ঙ্গা মো ইয়েইক্ তদনন্তর তাহার প্রিয়তমা পত্নী ও স্নেহশীলা শ্বশ্রূমাতাকে বলিল যে মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গের আহ্বান পালন করা ব্যতীত তাহার আর গত্যন্তর নাই।

ঙ্গা মো ইয়েইক্ পুনরায় কুম্ভীরের রূপ ধারণ করিয়া মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলে, মঙ্গ্ পাউক্ চাইঙ্গ্ তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গ জলে ও অর্দ্ধাঙ্গ স্থলে রাখিতে আদেশ করিল এবং তৎপর মন্ত্রবলে তাহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে ঙ্গা মো ইয়েইকের ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

তদীয় শোকবিহ্বলা পত্নী ও শাশুড়ী তাহার কুম্ভীর-দেহ সমাধিস্থ করিয়া, কর্ম্মফলের সেই নিদারুণ অভিনয় স্থানে, এক প্রস্তর স্তূপ স্থাপন করিল। তজ্জন্য অদ্যাপি সেই স্তূপ চাউক্-ওয়াইঙ্গ্ (৪) বা প্রস্তর-বেষ্টিত স্তূপ নামে পরিচিত এবং অদ্যাপি বৎসরে একদিন তথায় এক মেলা বসিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশবাসীদের বিশ্বাস ইয়ে-গিন্ নগরে এখনও ঙ্গা মো ইয়েইকের বংশধরগণ বাস করিতেছে এবং হরিদ্রা কুম্ভীর জাতির অপ্রিয় বলিয়া, অদ্যাপি তাহারা হরিদ্রা ব্যবহার করে না।

এক সময়ে ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র "ঙ্গা-মো-ইয়েইক্—মা-সোয়ে-বুইন" নামক নাটকের অভিনয় হইত। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে ব্রহ্মদেশবাসীগণের যে কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস এই গল্পটি তাহারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স।

(৩) ডেগন রেঙ্গুনের প্রাচীন নাম। এজন্যই রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ পাগোদার নাম সোয়ে (স্বর্ণ) ডেগন-পাগোদা।

(৪) অনেকে এই পাগোদাকে "চাইক্-ওয়াইঙ্গ্" পাগোদা বলে। ফেলেঙ্গ্ ভাষায় চাইক্ অর্থে পাগোদা। সুতরাং "চাইক্-ওয়াইঙ্গ্" অর্থাৎ পাগোদা।

তাণ্ডব-নৃত্য

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১২)

মারাঠাদেশ (দক্ষিণ) ও মারাঠী

গুজরাটের চেয়ে মারাঠাদেশের সঙ্গে আমার সমধিক পরিচয়। আমার সর্ব্বিসের প্রথম ভাগ গুজরাটে কাটানো যায়, অবশিষ্ট ভাগ সিন্ধুদেশ, কানাড়া, কোঙ্কণ ও দক্ষিণে অতিবাহিত হয়। পুণা, আহমদনগর, নাসিক, ধূলিয়া, সোলাপুর, সাতারা এই সকল প্রদেশ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত, কোর্টের ভাষা মারাঠী।

পুণা

পুণানগরী মুলা ও মুটা, এই দুই নদীর সঙ্গমে সংস্থাপিত, এই পুণ্যসঙ্গমে পুণার বিশেষ মাহাত্ম্য। একটি বাঁধ বেঁধে স্রোতের জল আট্‌কে রাখা হয়েছে, তাই নদী দুটি এ অঞ্চলের আর আর নদীর মত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় না, বারমাস পূর্ণ থাকে। বর্ষায় বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জল উথলে পড়ে, দেখতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুন্দর দেখায়। বাঁধের ধারে ছোটখাট একটি সুন্দর বাগান পুরবাসীদের সান্ধ্য সম্মিলনের স্থান। পুণা পেশওয়াদের রাজধানী ছিল, সেই প্রাচীন পেশওয়াই ভাগ সহরের অভ্যন্তরে। সেকালের কতকগুলি ইমারতের মধ্যে আসল যে রাজবাটী (বুধবার বাড়া) তা কোন দুরাত্মার কুচক্রে পড়ে পুড়ে গিয়েছে—ঐ ভাগের আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাতে পুরাণো পেশওয়াই গৌরবের কোন চিহ্ন নেই। প্রশস্ত পথ ঘাট, কালেজ জেল হাঁসপাতাল সার্ব্বজনিক সৌধ

মুলা মুঠা সঙ্গম—পুণা

সমন্বিত যে অঞ্চল তাই নব্য পুণা সহর। ইহার প্রান্তবর্ত্তী ঐতিহাসিক ক্ষেত্র খিড়কী ও পার্ব্বতী-মন্দির উল্লেখযোগ্য। খিড়কী এইক্ষণে ইংরাজ-সেনানিবাস। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের মূলে যে সকল যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে খিড়কীর যুদ্ধ তার মধ্যে গণনীয়। এই যুদ্ধে পেশওয়ার পতন ও পুণা ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। যে স্থান হতে পেশওয়া বাজিরাও এই শেষ যুদ্ধের বাজী সোৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করছিলেন সে এই পার্ব্বতী-মন্দির। বাজী হেরে পেশওয়ার চির বনবাস!

পুণার বিদ্যামন্দির—ফরগুসন কালেজ

পুণার ভূষণাস্পদ অনেক জিনিস আছে, আর সব ছেড়ে দিলেও এই বিদ্যালয়গুলি তার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ বলা যেতে পারে। পুণায় কালেজ চারিটি—দক্ষিণ, ফরগুসন, কৃষি ও এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ।

দক্ষিণ কালেজ ভারতের অপরাপর ইংরাজি কালেজের ছাঁচে গঠিত, ফরগুসন কালেজই এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ অনেকটা আমাদের বোলপুর বিদ্যালয়ের প্রতিচ্ছবি ব'লে আমার মনে হয়; গুরুকুলে অধ্যয়নের যে উপকারিতা এর ভিতরে তা কতক অংশে লাভ করা যায়। এই কালেজের বিশেষত্ব এই যে, এর যে ২০ জন অধ্যাপক আছেন তাঁরা সবাই আপন আপন ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত, অথচ প্রত্যেকে আপনার যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য বেতনেই সন্তুষ্ট। এঁরা সকলেই ২০ বৎসর কাল স্বল্প বেতনে অধ্যাপন কার্য্যে প্রতিশ্রুত। কালেজটি প্রেসিডেন্সির অন্যান্য কালে‍ের তুলনায় কোন অংশেই হেয় নয়—এর ছাত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ৯৫০। অনেকানেক ছাত্র কালেজ

বাঁধ উদ্যান—পুণা
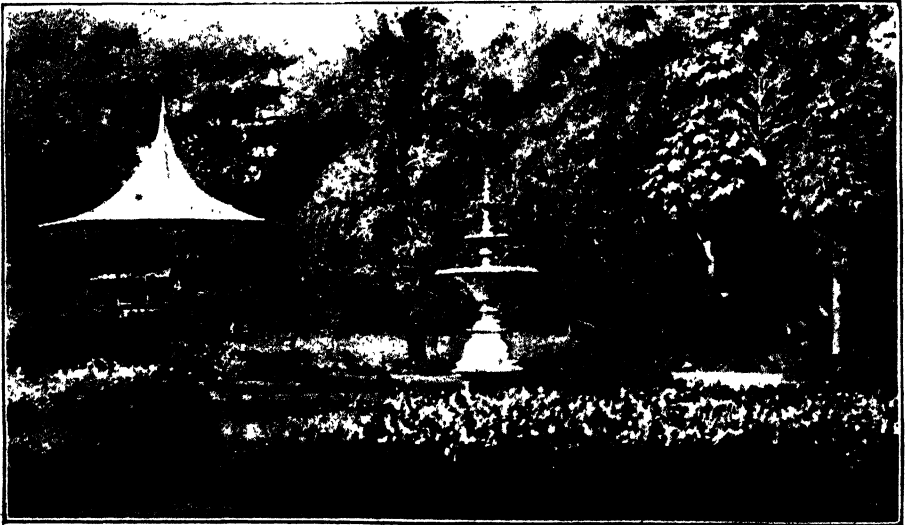
সংলগ্ন হোষ্টেলে বাস করে—অধ্যাপক কানিট-কর তাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। আশপাশে ভূমির অভাব নাই। তাতে ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার জন্যে ক্রীড়াক্ষেত্র রয়েছে—তা ছাড়া বাকী জায়গায় ছয়জন অধ্যাপকের বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়েছে এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শেখবার জন্যে একটি ছোটখাট বাগান আছে। এই সকল পবিত্র চরিত্র সদ্‌গুরুর সহবাসলাভ বিদ্যার্থীদের সামান্য লাভ নহে। অধ্যাপকদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ কার্য্যকর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ছাত্রগণ যাতে সংযম অভ্যাস করতে পারে, আত্মনির্ভর শিক্ষা করতে পারে, সে বিষয়ে অধ্যাপকদের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। ছাত্রজীবনের যা কিছু প্রয়োজন তা যোগাবার ভার তাদের নিজেদের হাতেই অর্পিত—তাদের আপন আপন কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা আপনাদেরই ক'রে নিতে হয়। একটি ব্যায়াম-সভা তাদের হাতে ভালরূপই চলছে। তাদের পুস্তকালয়, পাঠগৃহ তারা নিজেদের ভিতরেই দেখে শুনে পরিচালন করছে। বোলপুর বিদ্যালয়ের কার্য্যব্যবস্থাও কতকটা এইরূপ। Times of India পত্রের পুণার সংবাদদাতা এই কালেজ সম্বন্ধে লিখছেন—

"য়ুরোপে শিক্ষাশাস্ত্রের যেমন উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির আদর্শে ফরগুসন কালেজে শিক্ষার নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ক্ষুদ্র স্কুল নহে কিন্তু বাস্তবিক একটা বড় কালেজ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করা ইহার লক্ষ্য নহে; কিন্তু ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতি অধ্যাপকদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয়। এই কালেজ পরিদর্শন করিলে মনে হয় যেন পাশ্চাত্য বড় বড় য়ুনিবর্সিটির উচ্চ-শিক্ষার বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে এই কালেজে এইক্ষণে ১৫ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র হোষ্টেলের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।"

এঞ্জিনিয়রিং কালেজ

ভারতবর্ষে এঞ্জিনিয়রিং শিক্ষার যে সকল স্থান আছে তার মধ্যে পুণা-এঞ্জিনিয়রিং কালেজ একটি প্রসিদ্ধ। এই কালেজের অধীনে ছুতার, কামার ও আর আর বড় বড় কলকারখানার দোকান আছে, তাহাতে ছাত্রগণ নানাবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা করে এবং তাদের হাতের কাজ বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। দেখতাম অনেক বাঙ্গালী ছাত্র এখানে এসে অধ্যয়ন করছে, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমাদের একটি আত্মীয়কে সেই কালেজে দেবার ইচ্ছা ছিল। সেখানে তাকে ভর্ত্তি করে দেওয়া গেল, পুণায় থাকবার এমন সুবিধা করে দিলাম যা অন্য কোন বিদেশী ছাত্রের সহজে হয় না—স্বয়ং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ছেলেটিকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হলেন। সবই হল কিন্তু দৈব প্রতিকূল। তাকে কি একটা রোগে ধরলে, বৈদ্যশাস্ত্রে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শেষে জানা গেল সে রোগের নাম Home Sickness, কিছুতেই ওদেশে তার মন টিঁকলো না। মার কোলে ফিরে এসে ছেলে তবে নিস্তার পায়। পৃথিবীতে দু রকম লোক আছে, কেউ কেউ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে

উজান বয়ে যেতে অক্ষম। কেহ বা অবস্থা যেমনই হোক্ তাকে আপনার মনের মতন করে গড়ে নিতে পারেন, যিনি আত্মবলে আপনি আপনার ভাগ্যবিধাতা। প্রকৃতি ও আত্মশক্তি, দৈব ও পুরুষকার, মানুষের এই দুই ভাগ্য-সূত্রধার। এদের মধ্যে আত্মবান্ পুরুষই ধন্য।

"দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা"

এই উপদেশ মত কার্য্য কর, কৃতী হবে—মানুষ হবে।

গোবিন্দ বিঠ্যল কড়কড়ে

গোবিন্দ কড়্কড়ে পুণা দক্ষিণ) কালেজে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের অনেক কালের বন্ধু। যখন প্রথম বিলাতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের

গোবিন্দ বিঠ্যল কড়কড়ে

বাড়ীতে বাস করি তখন তাঁর সহিত সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হত—সে ত ৫০ বৎসরেরও আগেকার কথা। আমার বোম্বাই প্রবাস কালে আমরা বরাবর বন্ধুত্বসূত্রে বাঁধা ছিলাম—আজ পর্য্যন্ত তা অটুট রয়েছে।

মারাঠী জাতির অনেক পদবীই বাঙ্গালীর পক্ষে কৌতুকাবহ কিন্তু নাম ছাড়াও গোবিন্দ কড়কড়ের অনেকগুলি ভাবসাব হাস্যরসাত্মক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে খৃষ্টান, ব্যবসায়ে অধ্যাপক, এবং স্বভাবে কিঞ্চিৎ পাগল। এমন কি, চাকর ও ছেলেদের মহলে তিনি "পাগলা সাহেব" বলেই খ্যাত ছিলেন। "ছিলেন" শুনে যেন কেউ না মনে করেন যে বেচারা গোবিন্দ ইহলোকে নাই। আশা করি আমাদের এই পুরাণো বন্ধুটি সুস্থ শরীরে ও শান্তচিত্তে তাঁর নির্জ্জন অবসর-প্রাপ্ত জীবন যাপন করছেন। তবে বহুদিন তাঁর কোন খবর পাই নি। এক একবার তাঁর সহাস্য গৌরবদন দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে পরিবারের নবাগতগুলিকে পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বয়সে তাঁর খিড়কিস্থিত কোটর থেকে তাঁকে কলকাতায় টেনে আনা শক্ত ব্যাপার।

গোবিন্দের জীবনী একটু নতুন রকমের। তাঁর পিতা বোম্বাই প্রদেশের কোন আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন কিন্তু এক সময়ে তহবিলের কিছু গোলযোগ হওয়ায় তিনি ফেরার হন। সেই সময়ে বালক গোবিন্দ সহরের কলেক্টর সাহেবের নিকট যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। এই সুদর্শন বালকটিকে দেখে কলেক্টর Tucker সাহেবের মমতা হয় এবং তিনি ওঁর শিক্ষার

বন্দোবস্ত করে দেন ও অর্থের সাহায্য করেন। পরে ছুটিতে বিলাত যাবার সময় বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে যান—বিলাত গিয়ে গোবিন্দ কেম্ব্রিজ য়ুনিবসিটিতে অধ্যয়ন করেন। সেখানে সম্মানের সহিত অঙ্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে এসে অনেক চেষ্টার পর তিনি পুণার দক্ষিণ কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং সেই পদেই জীবনের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি বিপত্নীক হন ও পুনরায় কখনো দারপরিগ্রহ করেন নি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করলে ছেলেদের বলতেন—"সে খবর পেয়ে আমি মূর্চ্ছা যাই!" আর তাঁর গুটিকয়েক দাঁতের অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বলতেন স্ত্রী ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর সেই বাল্য-সঙ্গিনীকে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় মনে আছে মাত্র, তা অন্য সময় স্বীকার করতেন। পরে এক সময়ে কোন স্বদেশিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন। সেই সূত্রে বলেন "I had a narrow escape—The girl was so volatile and changeable."

বিলাতে সাহেবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই হোক্ কিম্বা যে কারণেই হোক্, তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস কি জানি না কিন্তু পোষাক ও আচার অভ্যাসে সাহেব হলেও তিনি মনে মনে অনেক বিষয়ে স্বদেশী, এবং পুণার হিন্দুসমাজের অনেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশেষতঃ স্বদেশী সঙ্গীতের তিনি যথার্থ অনুরাগী ভক্ত। তাঁর উদ্যোগে আমরা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক ভাল গাইয়ের গান শুনেছি। গান শুনতে শুনতে তিনি যেরূপ উৎসাহে মত্ত হয়ে বাহবা দিতেন, এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ করতেন, তা দেখে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হ'য়ে পড়ত। তাঁর নিজের বেশ সুর-জ্ঞান আছে, গলাও ভাল। কিন্তু হলে কি হবে, কোন গানের দুগাইন, কোন গানের আস্থায়ী মাত্র গেয়ে হুঙ্কার দিয়ে শেষ করে দেন, অর্থাৎ তাঁর বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত। এক একটা তান কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁর মুখে লেগে থাকত, তার পরে থেমে যেত। আমাদের একেলে বাঙ্গলা গান বা গলা তাঁর পছন্দ হত না এবং আমাদের মধ্যে যাদের ভাল গাইয়ে মনে করি তাদেরও গান শুনে তিনি ব্যঙ্গ সহ-কারে নকল করতেন, ও বলতেন "সপ্ত সুরের" তোমরা কিছুই জান না। আমাদের পরিবারকে তিনি আরো নানা প্রকার ঠাট্টা করতেন। যথা "Just like the Tagore family they make ten different engagements at the same time." ইত্যাদি।

তাঁর নিকট-আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে, তাদের কাউকে আমরা দেখিনি, তবে শুনেছি বটে যে বিপদ আপদে তাদের সাহায্য করেন। নিজেই বলতেন যে তাদের আমি নিয়মিত টাকা পাঠাই, বলে দিয়েছি যে আমার কাছে এসে কেউ জ্বালাতন করো না! মুখে যাই বলুন পরদুঃখে তিনি কাতর আর দানে মুক্তহস্ত, আমাদের কোন জামাতাকে নতুন বিবাহের পর দেখে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন এই করলেন যে

"তোমার গরীব আত্মীয়দের সাহায্য করতে হয় কি না?—" বোধ হয় নিজে সে বিষয়ে ভুক্তভোগী!—বহুকাল একক জীবন যাপন করায় ইংরাজসমাজ-খ্যাত চিরকুমারীর ন্যায় তাঁর কতকগুলি পারিপাট্যের অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। ঘরের আসবাবগুলি একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। আমার ছেলেমেয়ের মধ্যে যার বিয়ে আগে হবে তাকে অমুক আসবাবটি দেবেন বলে লোভ দেখাতেন। তাদের সঙ্গে কতরকম মুখভঙ্গী করে ঠাট্টাতামাসা করতেন তা বলে শেষ করা যায় না। পঞ্চাশোর্দ্ধেও কতকগুলি বিষয়ে তিনি যেন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলেন। কতবার আমরা তাঁর আতিথ্য স্বীকার করে তাঁর সঙ্গ উপভোগে আমোদে দিন কাটিয়েছি। তাঁর ঘর দুয়ার, খাবার বন্দোবস্ত সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। "আজ্ না" (অর্জ্জুনা) একটি পুরাতন ভৃত্য কথায় কথায় তার ডাক পড়ে। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সাজটিও দেখবার জিনিস! গায়ে কোট নেই, মাথায় একটি লম্বা রাজটুপী, পায়ে চটিজুতা, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য নাটেকর নামক তাঁর সুগায়ক বন্ধু গৃহে উপস্থিত; গায়কের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহও সপ্তমে চড়ে উঠেছে। আমরা এক একবার মনে করতেম এ পাগল কালেজে গম্ভীরভাবে অধ্যাপনা করেন কিরূপে! কিন্তু মস্তিষ্কের গোলে তাঁর কাজের কোন প্রকার গোল হয়েছে বলে ত কখন শুনি নি। ছাত্রেরা তাঁকে খুব ভালবাসত দেখতুম। তাঁর সংসারে ভালবাসার জিনিসের মধ্যে ছিল কতকগুলি গরু বাছুর। বারান্দায় দরমার ব্যাড়ার জানালার মধ্য দিয়ে তারা কখনো কখনো মুখ বাড়িয়ে দিত আর তিনি তাদের কত আদর করতেন—আর ছেলেদের বলতেন "এই দেখ, একেই ত বলে সংসার!" বাস্তবিক, এ ভিন্ন তিনি অপর কোন সংসার কখনো করেন নি। কোন একটি বন্ধুর ছোট ছেলের মৃত্যু হওয়ায় বড় ছেলেটিকে তার বাপ মা সিবিল সার্ব্বিস ছাড়িয়ে কাছে রাখবার জন্য ব্যস্ত শুনে গোবিন্দ্ "বলেছিলেন এ আবার কি পাগলামি। ছেলে ত মানুষের গিয়েই থাকে।" তার পরে যখন তাঁকে বোঝানো হল যে তাঁর গরু বাছুরের মধ্যে একটি সবে ধন নীলমণি! বাছা যদি মারা যায় তাঁর কি রকম কষ্ট হয়, তখন যেন পুত্রশোকের মর্ম্ম কতকটা উপলব্ধি করতে পারলেন।

আমাদের কাছে তিনি মধ্যে মধ্যে এসে থাকতেন, বিশেষতঃ কোন স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে হাওয়া বদল করতে যাবার সময় সানন্দে সঙ্গ ধরতেন। এইরূপে একবার সিমলা পাহাড়ে অবস্থান কালে তাঁর গাল রক্তবর্ণ হয়েছিল। তাঁর গাল লাল হয়েছে বলে তাঁর মহাভাবনা উপস্থিত এবং আয়নায় মুখ দেখে আমাদের গাল দেখিয়ে ক্রমাগত বলতেন "I say why are my cheeks so red"—যেন ভারি একটা অসুখের চিহ্ন! আমরা তাঁর সঙ্গে ইংরাজিতেই বাক্যালাপ করতেম, আর আমাদের বাঙ্গলা কথা শুনে তিনি "হচ্ছ কচ্ছ" বলে ঠাট্টা করতেন। আপনার মনে বকা তাঁর এক পাগলের অভ্যাস। বেঁটেখাট সুন্দর মানুষটি, হ্যাট কোট পরে, লাঠিটি দুই হাত দিয়ে আড়াভাবে কোমরের পিছনে এঁটে ধরে যখন আমাদের সঙ্গে ব্যাড়াতে বেরতেন, তখন পাহাড়ে রাস্তায়

বাঁদরগুলি দেখে তাদের সঙ্গেই আলাপে প্রবৃত্ত হতেন "আরে, কায়সা হ্যায়, তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায়" ইত্যাদি। না হয় একলাই অগ্রসর হয়ে মাথা নীচু করে অন্য মনস্কভাবে বকে যেতেন—কখনো সেকালের কোন নামজাদা সাহেবের গালভরা নাম, যথা Sir Alexander Coburn কিম্বা নিজের জীবনের ঘটনা স্মরণে I owe every thing I have in this world to Mr Tucker." সেই যে টকার সাহেব তাঁর সাহায্য করেছিলেন, সে কথা তিনি জীবনে ভোলেন নি, এবং চিরকাল তাঁর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা পোষণ করেছেন। এ বড় সাধারণ সদ্‌গুণ নয়। তাঁর টাকা শোধ করে দিয়েছেন, শুধু তা নয় তাছাড়া টকারের ছেলেমেয়ে যার যখন কোন টাকার দরকার, জানবামাত্র অকাতরে তাদের সাহায্য করেছেন। এরূপ যাবজ্জীবন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে বিরল। পাওনাদার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে উল্টো তার উপরেই ঋণীর তম্বী, উপকারের প্রত্যুপকার অনেক স্থলে এইরূপই দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কেউ কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করলে তিনি বলতেন, "কৈ, আমিত ওর কখনো কোন উপকার করেছি ব'লে মনে পড়ে না, তবে আমার পরে চটেছে কেন ?"

গোবিন্দ কড়কড়ের জীবন, মন, ধরণ ধারণ সবই একটু অসাধারণ। তাঁর মজার রকম সকম দেখে আমরা মুখে তাঁকে পাগল বলে ঠাট্টা করি বটে, কিন্তু সে পাগল বেহারী চক্রবর্ত্তীর গানের 'পাগল মানুষ' স্মরণ করিয়ে দেয়—

> পাগল মানুষ চেনা যায়—
> ও তার হাসি হাসি মুখশশী,
> খুসী ফোটে চেহারায়।(১)

সাতারা

সোলাপুর হইতে সাতারায় আমার বদলি হয়। সাতারা শিবাজী ও তাঁহার বংশধর রাজগণের বাসস্থান। এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আমার সর্ব্বিসের শেষ তিন বৎসর অতিবাহিত হয়। সেখানেই আমি কার্য্য শেষ করে ১৮৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করি। শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ঐ দেশে কাটাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভগবানের মর্জ্জী অন্যরূপ। নানা কারণে কর্ম্মত্যাগ করে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলেম। গৃহে আমার জীবনস্রোত অন্য দিকে ফিরে গেল, সেই স্রোতে আমার এখনকার এই বয়সে এসে পৌঁছেছি!

আহার প্রণালী

সাতারায় মারাঠীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার দেখা শুনা ও বন্ধুভাবে মেলামেশা হত। কখনো বা কোন মারাঠী বন্ধুর বাড়ী ভোজনের নেমন্তন্নে যেতে হত। এদেশের ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিরামিষ ভোজী, মাছ মাংসের কোন পাঠই নেই। সামান্যতঃ বলতে গেলে বোম্বাইবাসীরা রুটিখোর, বাঙ্গালীদের মত ভাতজীবী নয়। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোঙ্কন, কানাড়া প্রভৃতি স্থানে

(১) গোবিন্দ কড়কড়ের এই জীবনচিত্র আমার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

যেখানে বর্ষার প্রাচুর্য্য বশতঃ প্রচুর ধান জন্মে ভাতই সেখানকার লোকদের প্রধান আহার। তদ্ব্যতীত, বাজরী, জোয়ারী, গম প্রভৃতি যেখানে যেরূপ শস্য জন্মে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। তবে এটা মানতে হবে যে ভাত সকল স্থানেই উপাদেয়, ভদ্র লোকদের ভাত ও 'বরণ' (ডাল) ভিন্ন চলে না। রান্না অনেকটা আমাদের ধরণ, কেবল তরকারিগুলি ঝালপ্রধান আর আমাদের মত ওদের কোন মিশ্র তরকারী রান্না হয় না। আহারের সময় কার পর কি খেতে হয় এমন বিশেষ কোন নিয়ম নেই। আমাদের যেমন তিক্ত হতে আরম্ভ করে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' একটা নিয়ম আছে, ওদেশে মিষ্টি ঝাল লোন্তা যখন যাতে অভিরুচি তাই গ্রহণে কোন বাধা নেই। মিষ্টে অরুচি হলে টক ঝাল, ঝালে অরুচি হলে আবার মিষ্ট, ঝালের মুখ মিষ্ট করে আবার লোন্তায় এসে পড়া যায়। কোন মারাঠী কিম্বা গুজরাটী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলে কখন্ কোন্ জিনিস খেতে হবে—কোথা হতে আরম্ভ কোথায় গিয়ে শেষ, এ এক সমস্যা। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে তরকারী আর নানা রকম চাট্নী, অম্বলের জায়গায় 'পঞ্চামৃত,' (এক রকম পাঁচ মেশালো অম্ল মধুর ঝোল), আর 'কড়ি' একরকম মসলামাখা টক দধির পাক। মিষ্টান্নের মধ্যে 'শ্রীখণ্ড' মারাঠীদের পরম উপাদেয় সামগ্রী, জাফরাণ যুক্ত মিষ্ট দধি দিয়ে প্রস্তুত। মিষ্টান্নের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল ওদেশে ছানার চলন নেই, সুতরাং ওরা সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি ভাল ভাল মিষ্টান্ন হতে

পার্ব্বতী মন্দির
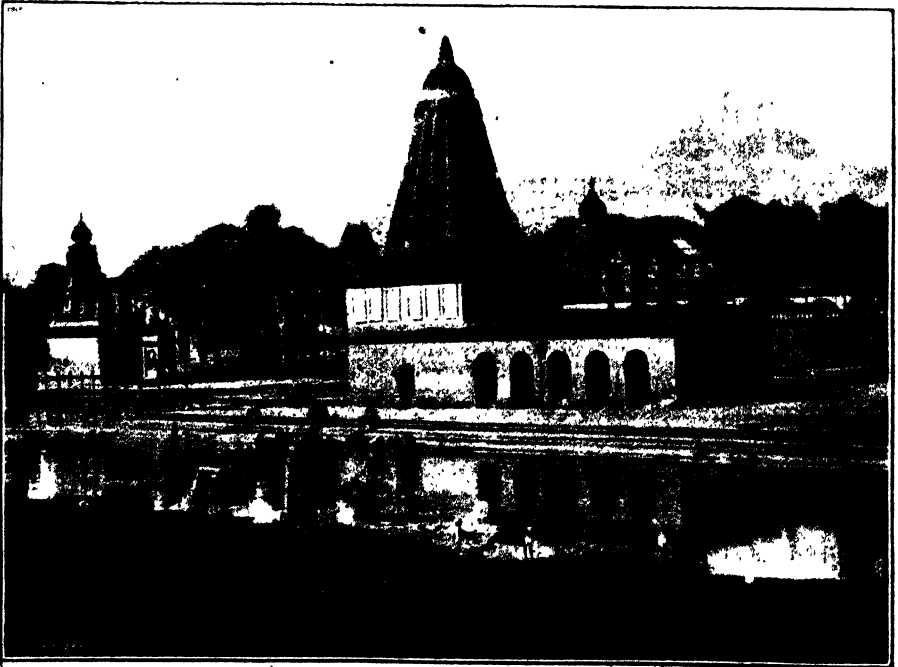
বঞ্চিত। কোন বাঙ্গালী ময়রা ও অঞ্চলে মিষ্টান্নের দোকান খুল্লে বোধ করি বিলক্ষণ এক হাত লাভ করতে পারে। আহারের সময় মারাঠী গৃহস্থ রেশমের পট্টবস্ত্র (সোলা) পরিধান করেন। আহারান্তে ইংরাজী ভোজের After dinner Speech-এর ধরণে কিছু বলা একটা মারাঠী রীতি আছে সেটা আমার খুব ভাল লাগত। বক্তৃতা না হোক্ কোন সংস্কৃত বা মারাঠী শ্লোক কিম্বা গীতের একচরণ—এইরূপ যাঁর যা ইচ্ছা আবৃত্তি করেন, তাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতমণ্ডলীর বেশ আমোদ হয়। ডাক্তারে বলে যে আহারের সময় হাসিখুসি মিষ্টালাপে পরিপাকের সাহায্য হয়; অতএব উক্ত নিয়ম বৈদ্যশাস্ত্রসম্মত বলতে হবে।

বিবাহ ও ভোজনবিচার হিন্দুয়ানীর এই দুই দুর্গপাল। বাঙ্গালাদেশে ভোজন বিচারের নিয়ম অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে মনে হয়—অন্ততঃ কলকাতায়। আমরা সহুরে মানুষ কলকাতার কথাই বলতে পারি। কিন্তু বোম্বায়ে দেখতে পাই এই অন্তর্জাতিক ভোজনের সবে মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। "আর্য্যসঙ্ঘ" (Aryan Brotherhood) নামে ওদেশে মাননীয় জষ্টিস চন্দবারকরের নেতৃত্বে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা জাতভাঙ্গা পণে কার্য্যারম্ভ করেছেন। তাঁদের উদ্যোগে সম্প্রতি ঐরূপ একটা মিশ্রভোজ দেওয়া হয়—"প্রীতিভোজন"। কিন্তু এই প্রীতি ভোজন তাঁদের জাতভাইদের অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। তারা সভাসমিতি ডেকে তিলকে তাল করতে উদ্যত হয়েছে। মজা. এই যে, দুজন মাহার জাতীয় ভদ্রলোক এই ভোজনে যোগ দিয়েছিল, শুনছি নাকি তাদের নিজের জাত থেকে বহিষ্কৃত করবার হুকুম জারী হয়েছে, অথচ মাহার জাত অন্ত্যজ বলে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য। যা হোক্ মারাঠীদের মধ্যে এই জাতিভেদের বাধা অতিক্রম করবার এক সহজ উপায় আছে। আমি দেখেছি যে বিভিন্ন জাতের মিশ্রভোজনে তাদের কোন আপত্তি নেই, কেবল স্বতন্ত্র পংক্তিতে আসন দেওয়া চাই। এই নিয়মে কোন মুসলমানও হিন্দুভোজে যোগ দিতে পারেন, খালি পংক্তিভেদের ব্যবস্থা করলেই হ'ল। এই নিয়ম আমাদের orthodox হিন্দুসমাজে প্রচলিত হলে মন্দ হয় না। এই সামান্য রাস্তাটুকু খুলে গেলেও যথালাভ মনে করা যায়।

মিশ্রভোজন থেকে স্ত্রীপুরুষের একত্র ভোজন মনে পড়ল। আমরা ইংরাজদের ভোজনগৃহে নরনারীর মেলা দেখতে পাই। য়ুরোপীয় সভ্যজগতের এই সাধারণ রীতি। পারসী বিদ্বন্মণ্ডলী এই রীতি অবলম্বন করেছেন। মারাঠীসমাজ এখনো অতদূর এগোতে পারে নি, তবে পরিবেশনের বেলায় গৃহিণীর আগমনেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করা যায়। আমাদের মত নয় যে, কোন গৃহস্থের গৃহে নিমন্ত্রণে গেলে গৃহকর্ত্রী পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাঁর হাতের বালাগাছটি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে না।

সাতারায় এখনকার রাজা যিনি (শিবাজী রাজার বংশধর) শুনতেম তিনি দুর্ব্যসনরত নিতান্ত অপদার্থ জীব, নেশার ঘোরে কোথায় পড়ে আছেন তাঁর দেখা পাওয়া ভার।

পুরাতন রাজবাটী—সাতারা

[তাঁর বসতবাটী দেখতে যেতেম, সেখানে এক জলপ্রাসাদ আছে আর একস্থানে শিবাজীর বাঘনখ ও পরিধেয় বর্ম্ম যত্নের সহিত রক্ষিত হয়েছে। অতীত গৌরবের সেই একটি মাত্র নিশান সাতারায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সাতারার পুরাতন রাজভবন এখন আদালত গৃহে পরিণত হয়েছে।

সাতারায় আমরা মাঝে মাঝে পার্টি দিতেম, তাতে প্রাচীন ও নব্যদলের আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে হ'ত। নিমন্ত্রিতের মধ্যে উকিল, সবজজ আর কোন কোন বাহিরের লোকও থাকতেন। উকিল প্রধান দুইজন ছিলেন—করন্দেকর ও সহস্র বুদ্ধি। "সহস্রবুদ্ধি" যেমন নাম কাজেও তেমনি পটু। মক্কেল জাহাজের এই দুই মাঝি। এমন মকদ্দমা নেই যাতে এই দুজনের সাহচর্য্য না থাকত। সবজজ বৃদ্ধ মারাঠী (২) ছিলেন তাঁকে বেশ মনে পড়ে। মতে তিনি ব্রাহ্ম, প্রার্থনা সমাজে বক্তৃতাদি দিতেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলে গণ্য নন। তিনি ও তাঁর তিন কন্যা আমাদের কাছে সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করতেন। ছোটটি এমন চুলবুলে যে ল্যাজ ধরে হাতীর পীঠের উপর চড়ে বসা তার এক মুহূর্ত্তের মামলা। আমাদের সাতারা প্রবাস বেশ সুখে কাটানো গিয়েছিল। তখন সেখানে

(২) ইনি মারাঠী ভাষায় বালকদের জন্যে Science Series রচনা করেছেন। বাঙ্গালায় স্কুলপাঠ্য এমন ভাল Series নাই, হওয়া আবশ্যক।
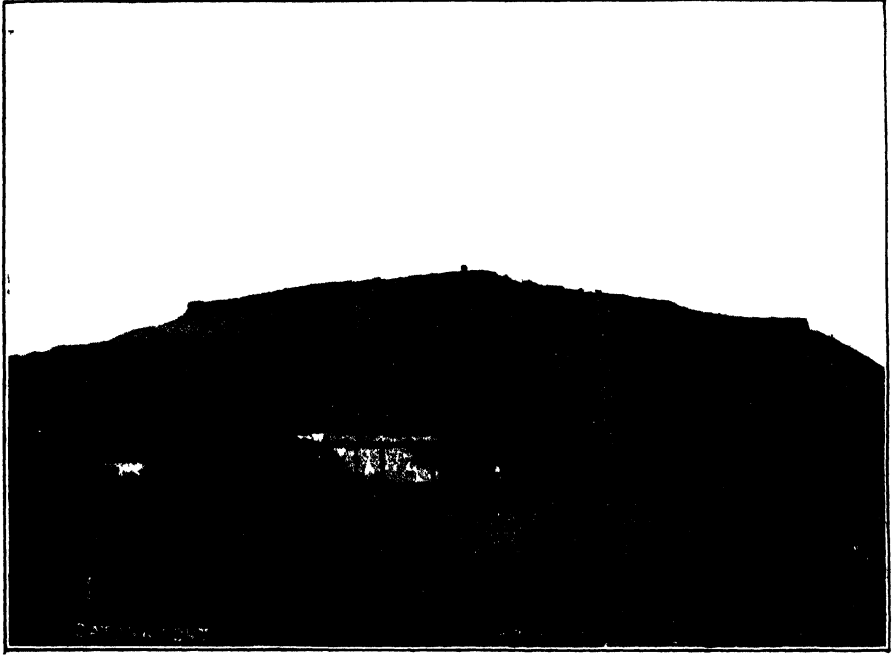
সাতারার দুর্গ

প্লেগও ছিল না আর "সিডিস্যান" মকদ্দমারও সূত্রপাত হয় নি—এ সব উৎপাত আমি চলে আসবার পরে হয়েছে। সাতারা একটি ঐতিহাসিক শোভনপুরী। দূরে পাহাড়ের দৃশ্য, আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর, আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে মহাবলেশ্বর পাহাড় হাতের কাছে, যখন ইচ্ছা যাওয়া যেত। Union Club ও সঙ্গীতসমাজ, এই দুইটি জায়গা দেশী লোকদের মিলনের স্থান ছিল। সঙ্গীতসমাজে মাটঙ্গে বাওয়া নামক একটি অন্ধ গায়ক গান শেখাতে যেতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতেও শেখাতে আসতেন।

উৎসব

মহারাষ্ট্র দেশে পূজাপার্ব্বণ উৎসবাদি আমাদেরই মত; কেবল উৎসব বিশেষের মাহাত্ম্য গণনায় তারতম্য দেখা যায়। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব এদেশে নাই। যদিও নবরাত্রি উপলক্ষে কোন কোন হিন্দুগৃহে দুর্গাপূজা হয়, তথাপি বোম্বাইবাসীদের মধ্যে ইহার তেমন মাহাত্ম্য নাই। বিজয়াদশমীই (দশারা) শারদোৎসবের বিশেষ দিন। সে দিন হিন্দুগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমী-পত্রের আদান প্রদান হয়। কথিত আছে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশ কালে এই দিনে শমীবৃক্ষতলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে শমীপূজা করেছিলেন। তা থেকে এ অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে শমীপূজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধু দেশেও এই প্রথা দেখেছি। মারাঠী দেশে দশারার বিশেষ মাহাত্ম্য কেন না এই সময়ে

বর্গীরা শস্ত্রার্চ্চনা করে মহাসমারোহে যুদ্ধ যাত্রায় বেরতো। দশারায় অশ্ব সকল চিত্র বিচিত্র ফুলের মালায় সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় লোকেরা মেষ মহিষাদি বলিদানে মেতে যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রকাশ্যে পশুবলি হয় না কিন্তু দেবী রুধিরপ্রিয়, গোপনে কি কাণ্ড হয় কে বলতে পারে? তার নমুনা আমি যা কারওয়ারে পেয়েছি তা যদি সত্যি হয় তার থেকে অনুমান অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে। কার-ওয়ারে আমার একটি পরিচিত ব্রাহ্মণের বাড়ী দুর্গোৎসব হয়েছিল। উৎসবের পর সেই বাটীর এক ভৃত্য বালহত্যা অপরাধে সেসনে সোপর্দ্দ হয়। বিচারস্থানে বালহত্যার কারণ এই বলা হয় যে গৃহিণী পুত্রসন্তান কামনা করে দেবীর কাছে নরবলি মানৎ করেছিলেন সেই মানৎরক্ষা মানসে ভৃত্যকে দিয়ে এই কাণ্ড করান হয়। প্রমাণ হ'ল যে আরতির সময় বালকটীকে দেবীর সম্মুখে ধরা হয়েছিল, পরদিন প্রভাতে গৃহপ্রাঙ্গণে বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। খুনের উদ্দেশ্য চুরি নয়, কেন না বালকটির অঙ্গের আভরণ যেমন তেমনি ছিল, তা হরণ করবার কোন চেষ্টা করা হয় নি; অপর কোন উদ্দেশ্যও প্রকাশ পায় নি।—বলি অনুমান নিতান্ত অমূলক বলে বোধ হ'ল না।

দশারার পর দেওয়ালী। ইহাই বোম্বাই বাসীদের প্রধান উৎসব। সাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ দিয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ নিজ গৃহে রোসনাই দিয়ে উৎসবে মত্ত হয়। ধনত্রয়োদশী হতে এই উৎসবের আরম্ভ ও অমাবস্যায় শেষ। বাঙ্গালাদেশে এ সময় কালীপূজা হয়, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী। অমাবস্যার দিন বিক্রম সম্বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনই উৎসবের প্রধান দিন। সেই দিনই চারিদিকে রোসনাইয়ের ঘটা। সেই দিন বণিকদের বহিপূজনের দিন। তারা তাদের পুরাতন হিসাবপত্র গুটিয়ে দানধ্যান দেবার্চ্চনায় উৎসব সম্পাদন করে ও নবোৎসাহে নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভক্ত-চূড়ামণি পবননন্দনের পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু মারাঠীদের মধ্যে খুবই চলিত; এমন কি, মারুতি-মন্দির মারাঠী পল্লীচিত্রের এক প্রধান অঙ্গ। গণেশ ঠাকুরেরও মানমর্য্যাদা সামান্য নহে। আমাদের দেশে গণেশ ঠাকুরের জন্যে স্বতন্ত্র উৎসব নাই, ওদিকে গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পূজা ও বিসর্জ্জন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দোলযাত্রার সময় (হোলী) আবীর খেলা আমোদ প্রমোদ সর্ব্বত্রই সমান। মহ্লাররাও গাইকওয়াড় এই খেলায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে তিনি একবার এক হাতীর উপর ক্ষুদ্র কামান বসিয়ে সেখান থেকে একদল নর্ত্তকীর উপর আবীর বর্ষণ করেছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর স্রোতে এক বেচারী প্রাণসঙ্কটে পড়েছিল!

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে বোম্বায়ে যমদ্বিতীয়া কহে। ভাই বোনের মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ভাই ভগিনী-গৃহে ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়। ভগ্নী ভায়ের কপালে

তিলক দিয়ে তাকে বরণ করে, অনন্তর ধনরত্ন উপহার দানে ভগ্নীর স্নেহের প্রতিদান ও পরিতোষ সাধন করতে হয়।

গানবাজনা

বাঙ্গালীরা যেমন গানবাজনাভক্ত আমি যতদুর দেখেছি মারাঠীরা তেমন নয়। বাঙ্গালী আমোদপ্রিয় সৌখীন জাতি, মারাঠীদের প্রকৃতি অন্যতর। তারা ব্যবসায়ী Practical লোক, কলাবিদ্যার প্রতি তাদের ততটা অনুরাগ নাই। আমার একজন মারাঠী বন্ধু বলেছিলেন—তিনি কলকাতায় গিয়ে দেখলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তামাক ও সঙ্গীত প্রিয়, যে বাড়ীতে যাও একটি হুকা ও তানপুরা। তাই ব'লে ওদেশে গীতবাদ্যের চর্চ্চা বা আদর নেই তা নয়। তবে আমার মনে হয় যে, সঙ্গীতবিদ্যা প্রায়ই পেশাদার লোকেদের মধ্যে বদ্ধ, ভদ্রলোকের মধ্যে গীতবাদ্যে সুনিপুণ অতি অল্প লোকই দেখা যায়।

সামান্যত বলা যেতে পারে এ দেশের গীতের আদর্শ হিন্দুস্থানী খেয়াল ধ্রুপদ। এই সাধারণ নিয়ম, স্থানে স্থানে রূপান্তরও দৃষ্ট হয়। মারাঠীদের মধ্যে সাকী, দিণ্ডি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি দিশী ছন্দে নূতন ধরণের গান ও তান শুনা যায় আর 'লার্ডনী' নামক একপ্রকার টপ্পা আছে তাহাই খাঁটী প্রাদেশিক জিনিস। আমাদের দেশের খোল কর্ত্তাল সমেত সঙ্কীর্ত্তনের মত সমবেত ধর্ম্মসঙ্গীত ওদেশে শুনি নাই। ওদেশের 'কথা' কতকটা আমাদের কথকতার অনুরূপ। কিন্তু এ দুয়ে একটু প্রভেদও আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ হতে হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস বিবৃত করে বলা বাঙ্গলা দেশের কথকতা; আর এদেশের কথা আদ্যোপান্ত একটি ভাবসূত্রে গাঁথা, সেইটি বিস্তার করে শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত করা কথার উদ্দেশ্য। একটি নীতিসূত্র অবলম্বন করে গান ও উপন্যাসচ্ছলে তার ব্যাখ্যা করার নামই কথা। এই প্রসঙ্গে যে সকল কবিতা ব্যবহৃত হয় তা তুকারাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যখনি হইতে সংগৃহীত। আমি একবার এক জায়গায় কথা শুনেছিলাম, তাতে বিনয়ের মাহাত্ম্য, অবিনয়ের অনর্থ সুন্দররূপে দেখানো হয়েছিল; যে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছিল তা তুকারামের এই অভঙ্গ :—

লহান পণ দে গা দেবা
মুঁগী সাখরেচা রবা।
ঐরাবতী রত্ন থোর
ত্যাশী অঙ্কুশাচা মার॥
জ্যাচে অঙ্গী মোঠেপণ
তয়া যাতনা কঠিন॥
তুকা ম্হণে জান্
হ্বাবেঁ লহানাহুনি লহান॥

দেহ দেব নম্রপনা,
মুগী (৩) পায় মিষ্ট কণা।
ঐরাবত হস্তীরাজে
অঙ্কুশের মার বাজে।
যার দেহে অহঙ্কার
কঠিন যাতনা তার।
তুকা কহে জান সবে
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হবে॥

(৩) পিঁপড়া।

এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে উপন্যাস ও গান থাকে, ধূয়ায় শ্রোতৃবর্গ কথকের সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেয়। অতঃপর কথকঠাকুরের বন্দনাদির পর সভাভঙ্গ হয়। মারাঠী দেশে কথা ও কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গীণ অস্ত্র। কীর্ত্তন-সভায় আমোদ ও শিক্ষা দুইই একত্রে সংসাধিত হয়। সাধু তুকারাম স্বয়ং কীর্ত্তনকলায় পরিপক্ক ছিলেন। তাঁর মাধুরীময় সঙ্কীর্ত্তন শুনতে লোকেরা দেশ দেশান্তব হতে আসত। শিবাজী রাজাও অবসরক্রমে সেই সভায় উপস্থিত হতেন। মগীপতিকৃত ভক্তলীলামৃত গ্রন্থে আছে যে তুকারামের উপদেশ ও সংসর্গগুণে মহারাজের বৈরাগ্যোদয় হয়েছিল; এমন কি, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকতেন। তুকারাম আবার সদুপদেশ দিয়ে তাঁকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

এক্ষণকার কালে রুচির পরিবর্ত্তন যেমন বাঙ্গালাদেশে দেখা যায় ওদিকেও তেমনি। এখন সর্ব্বত্র নাটকের পালা পড়েছে, যাত্রা কথা কীর্ত্তন এ সব কারো ভাল লাগে না। মারাঠীদের মধ্যেও ভাল ভাল নাটকমণ্ডলী আছে, তারা শকুন্তলা, মৃচ্ছকটী, নারায়ণরাও পেশওয়া বধ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে। ওদেশে সে সব নাট্যকারদের পশার ভারী। এই সকল নাট্যে গণপতি সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর নৃত্যগীত হবার পর রীতিমত কথারম্ভ হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে ময়ুরবাহনা বীণাপাণি নৃত্য করতে করতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। ওদেশে সরস্বতীর বাহন—ময়ুর।

গিলগিটদিগের বিবাহ উৎসব

গিলগিটদিগের বিবাহপ্রণালী অত্যন্ত কৌতুকজনক। বালকগণ ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে পিতামাতারা পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হন। তাঁহারা কোন পাত্রীর সন্ধান পাইলে গ্রামের প্রধানগণকে সংবাদ দিয়া এবং পাণ্ডাদিগকে ভোজ্যদ্রব্যে পরিতুষ্ট করিয়া কন্যার পিতামাতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। প্রধানমহাশয়েরা এই প্রীতিকর সংবাদ লইয়া কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হন। কন্যার পিতা তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ২।৩ দিন ভোজন করান এবং স্বীয় গ্রামের প্রধানদিগকে ও আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করিয়া একটী মজলিসে এই বিষয়ের মীমাংসা করেন। পরে কন্যার পিতার সম্মতি পাইলে উভয়পক্ষ তাহাদের রীতি অনুসারে একখানি প্রার্থনাপত্র পাঠ করে। এইরূপে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। এই নূতন আত্মীয়তার নিদর্শন স্বরূপ বরের পিতা কন্যার পিতাকে নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি উপঢৌকন প্রদান করে—

ধুতি—৫ গজ। সূচ ১টী,
ছুরি—১ খানা। দড়ি ১ গাছি।

তৎপর বিবাহউৎসবের দিন স্থির হইলে বরের পিতা গৃহে ফিরিয়া আইসেন। বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবসের একপক্ষ পূর্ব্বে বরের পিতা বা অভিভাবক তিন তুলু (১তুলু—৮মাসার সমান) স্বর্ণ লইয়া পাত্রীপক্ষের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এই স্বর্ণ কন্যার পিতাকে

প্রদান করেন এবং শোভাযাত্রায় কতজন লোক সঙ্গে করিয়া কবে উপস্থিত হইতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লন। বাড়ী আসিয়া বরের পিতা আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ শেষ করিয়া চারিসের পরিমিত ঘৃত কন্যার আলয়ে পাঠাইয়া দেন। এই 'ঘি' কে তাওয়াই ঘৃত বলে। এই ঘৃত না পৌছান পর্য্যন্ত বিবাহের এক অঙ্গ "তাও" (Pan) উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে না; এবং বিলম্বে পৌছিলে বরপক্ষকে ১তুলু স্বর্ণ দণ্ডস্বরূপ দিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস রজনীতে সমস্ত গ্রামবাসীগণের সম্মুখে ৮টার সময় এই উৎসব সম্পন্ন হয়। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ লৌহকটাহ স্থাপন করিয়া "কাছারী" কিম্বা 'বাবুসী'বংশীয় কোন ব্যক্তি ঘৃত, আটা এবং চিলিবৃক্ষের বীজ ও পাতা লইয়া ছুটিয়া আইসে এবং দ্রব্য গুলি কটাহে রাখিয়া অল্প অগ্নি দ্বারা উত্তাপ দিতে থাকে, কটাহস্থ দ্রব্যগুলি হইতে ধুম নির্গত হইলে পর লোকটি উভয় হস্তে কটাহের হাতনি ধরিয়া কটাহটি মস্তকোপরি উত্তোলন করে, এই সময় অদ্ভুত রবে বাদ্য বাজিয়া উঠে এবং বাজনায় তালে তালে নৃত্য করিয়া কটাহধারী ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়। নৃত্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোক সকল করতালি দিয়া সমস্বরে নিম্নলিখিত গানটি গাহিতে থাকে—

ইহা 'বাইর গুলের' তাও

(ক) দিবনা রাখিতে মাটীতে, কাউকে নিজেই রাখিব তাও।

(খ) ইহা 'মালিক' প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি

(গ) ইহা রাজোপযুক্ত তাও দিবনা, রাখিতে ইত্যাদি

(ঘ) ইহা সংসার উপযোগী তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি

(ঙ) ইহা 'শামীর' প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি

(চ)ইহা 'ম্যাকপান' প্রধানের তাও,দিবনা রাখিতে ইত্যাদি

(ছ) ইহা"মাঘলট"প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি

(জ) ইহা "খানা" রাজার তাও, দিবনা রাখিতে—ইত্যাদি

(ঝ) ইহা ধার্ম্মিক 'গীরখির' তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি

(ঞ) ইহা 'মারিও'প্রধানের তাও, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি

(ট) যদিও"নীলু"তাওয়ের কর্ত্তা, দিবনা রাখিতে ইত্যাদি।

পুরুষগণ যখন এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে মত্ত থাকে, সেই সময় স্ত্রীলোকগণ নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে থাকে—

(ক) এই 'রক্ত প্রবাল' বাইর গুলের
দিবনা গাঁথিতে অন্য কাউকে,
নিজেই গাঁথিব আমি।
(খ) এই 'প্রবাল ভাণ্ডার' মালিকা প্রধানের
দিবনা গাঁথিতে অন্য কাউকে,
নিজেই গাঁথিব আমি।

এই গানটী শেষ হইলে 'কটাহধারী' এক

(ক) (খ) Bairgul and Malik—Chief of Kashmir.
(ঙ) Shameer—The chief of Kashmir.
(চ) Magpan—The chief of Skardu.
(ছ) Mughlot—The chief of Nagir.
(জ) Khana—The Raja of Yasein.
(ঝ) Girkhi—The Ruller of Hunza.
(ঞ) Maryo—The son of Machat.
(a celebrated person of Rono Family)

মুহূর্ত্তের জন্য কটাহখানি চুল্লির উপর স্থাপন করে, এবং পুনরায় তাহা দুই হস্তে মাথার উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া নৃত্যগীতে মত্ত হয়। তৎপর স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে একজন কুমারীকে বাহির করিয়া আনিয়া, সেই কটাহটীর ভার অর্পণ করিয়া অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত তাহাকে ৫খানি পিষ্টক ভাজিতে অনুরোধ করে। পাঁচখানি পিষ্টক প্রস্তুত হইলে কুমারী অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের উপর সমবেত লোকগণের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করে; এবং তাহারাও আহ্লাদের সহিত সেই ভার গ্রহণ করে। স্ত্রীলোকগণ রন্ধনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে পর, তাহারা অন্য একটী গৃহে গমন করিয়া সমস্ত রাত্রি নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করে! এই রাত্রিকে "তাওয়াই রাত" বলে।

যদি বরকে কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে কন্যার বাড়ীতে যাইতে হয়, তাহা হইলে শোভাযাত্রার দিবস প্রত্যূষে বর স্নান করিয়া যতদূর সম্ভব ভাল পোষাক পরিধান পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গীতটী একবার উচ্চারণ করিলে পর, তাহার অনুচরগণ সমস্বরে সেই পংক্তিটী পুনরাবৃত্তি করে—

"প্রণমিব আগে মায়ের চরণে স্তন্য দিয়েছেন যিনি।"

তৎপর বর তাহার মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া আসিলে পর বরযাত্রীগণ নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করে—

ওরে পাথর তুই ভারী হ, শুভদিন আজ এসেছে,
ওরে পাথর তুই ভারী হ, সোনার সঙ্গে তোর ওজন হবে।

সন্ধ্যার সময় যখন বরযাত্রীগণ তাহাদের গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন বিকটস্বরে উল্লাস ধ্বনি করিয়া আপনাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। কন্যাপক্ষও সেই রাসভ-বিনিন্দিত আনন্দ ধ্বনির একটী অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া, বরপক্ষকে সম্ভাষণ করিবার মানসে বাহির হইয়া আইসে। পরে উভয় পক্ষ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছড়া, কবিতা ও সঙ্গীত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সেই সকল গানে কেবলমাত্র তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এবং গ্রামের প্রধানগণের মহত্ব ও বীর্য্যকাহিনী থাকে। অতিগর্ব্বের সহিত এইরূপ গান গাহিয়া একে অন্যকে পরাজিত করিবার অভিলাষে, কন্যাকর্ত্তার বাড়ীখানি মুখরিত করিয়া তোলে। তৎপর আহারাদি সম্পন্ন হইলে নৃত্যগীতাদিতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটায়। একজন মল্ল শোভাযাত্রার সময় বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; পরদিন প্রাতঃকালে সেই মল্ল বিবাহের মন্ত্র পাঠ করে। কন্যার পিতা সেই সময় কন্যার জন্য গহনা কাপড় চোপড় এবং থালা বাসন ইত্যাদি লইয়া আইসে। কন্যার পিতা সঙ্গতিপন্ন হইলে কন্যাকে এই সকল বস্তু প্রদান করিবার জন্য বরের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া লয় না। কিন্তু মূল্য না দিলে স্বামীর আর স্ত্রীয় সম্পত্তির উপর কোন প্রকার দাবী থাকে না, তখন স্বামীর সম্পত্তি স্ত্রীর বলিয়া গণ্য হয়, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইচ্ছানুসারে পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে।

কোন দরিদ্র পিতা বিবাহের উপকরণাদি অর্থাৎ থালা, ঘটী, বাটী ইত্যাদি কন্যার সহিত প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, বরের পিতা কন্যার পিতার নির্দ্দেশ মত সেই মূল্যের কোন জিনিষ কন্যার পিতাকে দান

করে, এবং সেই দানের জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সম্মতি ভিন্ন অন্য বিবাহ করিতে পারে না। এই প্রথাকে "কালকমালক" বলে।

উৎসব সমাপনান্তে বরযাত্রীগণ গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পাত্রীকে বরের ঘরে যাইতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত এই সঙ্গীতটী গাহিয়া থাকে—

ওগো মায়ের হৃদয়-নন্দা, বাহির হয়ে এস গো,
ওগো জলের অধীশ্বরী, কেন দেরী করগো,
এস ওগো স্বর্ণ কুন্তলা, কেন দেরী করগো,
মুক্তাদন্ত-চন্দ্রাননী কেন দেরী করগো।

গান শেষ হইলে উচ্চরবে ক্রন্দনপরায়ণা কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনে, এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সকলে মিলিয়া পুনরায় নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে থাকে—

কেঁদোনা কেঁদোনা ফুলকুমারী,
গায়ের বরণ মলিন হবে,
পাহাড়ের উপর যাইবে তুমি
গায়ের বরণ মলিন হবে।
কাঁদিলে তোমার পুড়িবে হৃদয়
গায়ের বরণ মলিন হবে!"

গিলগিটে সিনাকি নামক স্থানে "কাও" নামক আর একটি প্রথা প্রচলিত আছে। কোন যুবক কোন যুবতীর প্রেমে পড়িলে যদি যুবকের পিতা মাতা সেই যুবতীর সহিত বিবাহ দিতে অসম্মত হন, তবে যুবক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া বলে—"যদি আমার সহিত অমুক বালিকার বিবাহ দেওয়া না হয় তবে আমি কাও করিব। সকলকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবার অভিলাষে সে গ্রামের বাহিরে গিয়া একটী বন্দুকের আওয়াজ করে। তৎপর সকলে সেই স্থানে সমবেত হইলে পুনরায় সেই 'কাও' করিবার কথা বলে, এবং সুযোগ পাইলে কয়েকজন লোকের সম্মুখে সেই কন্যাটীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার জামার বা কাপড়ের একটু অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া বলে—'তুমি আমার'।

এই 'কাও' করিতে পারিলে যুবকের পিতামাতা বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এস্থলে কন্যার পিতা বরের অবস্থানুসারে ইচ্ছানুরূপ অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারে। 'কাও' হইয়া গেলে পর যদি সেই কন্যার সহিত অপর কাহারও বিবাহ হয় তবে যুবক সেই বালিকার ও তাহার স্বামীর প্রাণবধ করিতে সতত চেষ্টিত থাকে এবং অনেক সময়েই কৃতকার্য্য হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

স্বামী সত্যদেব সরস্বতী

১

কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা ৺সত্যদেব সরস্বতী বঙ্গদেশে আগমন করেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুশীলন ইচ্ছায় কাশীধামে উপস্থিত হন। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, ঠিক জানা যায় না, তবে অনেকে

অনুমান করেন, বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশবর্ষীয় এই সুন্দর বালককে দেখিয়া বারাণসীর এক শাস্ত্রবিশারদ সন্ন্যাসী বুঝিতে পারেন, যে এই বালক কালে অদ্বিতীয় জ্ঞানী হইবেন। তিনি বালককে নিজ শিষ্যরূপে গ্রহণ করতঃ শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন। অতি অল্পকাল মধ্যে বালকের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে তিনি মুগ্ধ হন। বালকের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং অচিরে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জ্ঞানী পুরুষরূপে বারাণসী ধামে পরিচিত হইলেন।

ক্রমে তিনি গুরুদেবের নিকট হইতে নানারূপ যোগ অভ্যাস শিক্ষা করেন ও উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুদেব তাঁহার নাম রাখেন—"স্বামী সত্যদেব সরস্বতী"।

পাঠ সমাপনান্তে সত্যদেব গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণান্তর দেশ পর্য্যটনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। আশীর্ব্বচনে অভিষিক্ত করিয়া গুরুদেব সত্যদেবকে বিদায় দান করিলে পর সত্যদেব নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে হুগলী জেলার সুবিখ্যাত গুপ্তিপাড়া গ্রামে উপস্থিত হন।

গুপ্তিপাড়ার বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। কিন্তু চিরকাল এই গ্রামের এরূপ অবস্থা ছিল না। তৎকালে নদীয়া জেলার উলা (বর্ত্তমান বীর নগর) ও হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম ছিল। দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন উদ্দেশ্যে তথায় সমবেত হইতেন। সে সময় গুপ্তিপাড়ায় অন্যূন ৪০খানি টোল ও প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র নরনারীর বসতি ছিল। সুদূর বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ শিক্ষালাভার্থে এইস্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এবং অদূরবর্ত্তী নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ও শান্তিপুরেরও অনেক বিদ্যার্থী এই স্থানে অধ্যয়ন করিতেন। ৺বানেশ্বর তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহানুভবগণ কর্ত্তৃক টোলের পরিচালনা কার্য্য সম্পাদিত হইত। মহামতি হাণ্টার তাঁহার "গেজেটিয়ার" মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন "Guptipara was a seat of learning............।

কালের বিচিত্র গতির আবর্ত্তনে—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ও ভীষণ মহামারীতে * গুপ্তিপাড়া ধ্বংসোন্মুখ। দেশ জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া পরিপূর্ণ। বহু অট্টালিকা জনশূন্য অবস্থায় বনমধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও দক্ষিণদিকে ক্ষুদ্রকায়া বেহুলা নদী—লক্ষীন্দরের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কুলুকুলু নাদে বহিয়া যাইতেছে।

সত্যদেব গুপ্তিপাড়ায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণপুর নামক পল্লীতে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। এই পল্লী,—গ্রামের পূর্ব্ব সীমায়, গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গা কিছু দূর দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন এবং কৃষ্ণপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠাকুরপাড়া হইয়াছে।

যে স্থানে সত্যদেব কুটীর নির্ম্মাণ করেন তথায় আম্র, কাঁঠাল ইত্যাদি কতকগুলি বৃক্ষ ছিল। লোকালয় তথা হইতে কিছু

* ১৭৬৯ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ

দূরে। সত্যদেব অধিকাংশ কালই বৃক্ষতলে যাপন করিতেন। অনেকেই তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণার্থে আগমন করিতেন। সন্ন্যাসী সকলের সহিত সমভাবে বাক্যালাপ করিতেন। যে বৃক্ষতলে তিনি অবস্থান করিতেন তাহার অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পথ ছিল। সেই পথে বহু নরনারী ভাগীরথী তটে গমনাগমন করিত। পথের অপর পার্শ্বে একখণ্ড কর্ষিত ভূমি ছিল, বীজ তখনও রোপিত হয় নাই। একদিন সত্যদেব সেই কর্ষিত ভূমিতে একখণ্ড কঠিন মৃত্তিকায় মস্তক রক্ষা করিয়া ও আর একখণ্ড মৃত্তিকা, দুই হাঁটুর মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। হেনকালে দুইটী স্ত্রীলোক কক্ষে কলসী লইয়া জলার্থে সেই পথে যাইতেছিল। সন্ন্যাসীকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া, একজন অন্য জনকে বলিল—দেখ, ঠাকুর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু "আয়েস"টুকু এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

স্ত্রীলোকের এইকথা শুনিয়া সত্যদেব মনে মনে বলিলেন—কথা ঠিক। বাস্তবিক তিনি ঐরূপ অবস্থায় শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ সুখবোধ করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি সুখান্বেষী, এ কথা স্মরণ করিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। স্ত্রীলোক দুইটী চলিয়া গেলে মাটির চাপ দুইখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কর্ষিত ভূমিতে শয়ন করিলেন। জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে সন্ন্যাসীর শয্যার পরিবর্ত্তন দেখিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক প্রথমাকে বলিল—সন্ন্যাসী যে 'আয়েষী' শুধু তাহাই নহে, ইহার আবার বিলক্ষণ রাগও আছে। কারণ 'আয়েষী' বলা হইয়াছিল বলিয়া ইনি 'মাটীর চাপ দুইটী' ফেলিয়া দিয়াছেন।

স্ত্রীলোক দুইটীর ব্যবহারে সত্যদেব বিশেষ চমৎকৃত হইলেন ও স্থির করিলেন যে ঐ স্থানই তাঁহার সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। কারণ যে স্থানে সাধারণ স্ত্রীলোকও কার্য্যের সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারে, সে স্থানে নিশ্চয়ই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। তথায় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তদবধি সত্যদেব ঐ স্থানে থাকিয়া ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

২

গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির সুবিখ্যাত। প্রবাদ এই, দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র স্বেচ্ছায় সত্যদেবের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। প্রবাদটি নিম্নে বিবৃত হইল।

শান্তিপুরের "গড়" নামক পল্লীতে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ সপরিবারে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ পরম ভক্ত, শুদ্ধাচারী, ক্রিয়া কর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্। গৃহে শালগ্রাম শিলা নিত্য পূজিত হইত। অতিথি কখন তাঁহার গৃহে বিমুখ হইতেন না। সপরিবারে উপবাসী থাকিয়াও অতিথির পরিচর্য্যা করিতেন। পরিবারবর্গের মধ্যে, তিনি নিজে, ব্রাহ্মণী, একটী পুত্র ও একটী বিবাহিতা কন্যা।

একদা নিশীথে নিদ্রাবস্থায় ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার গৃহে এক দিব্য-কান্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন—তুমি আমাকে নিত্য পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমি তোমার পূজায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এখন অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি। গুপ্তিপাড়ায় আমার পরম ভক্ত সত্যদেব

অনুমান করেন, বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশবর্ষীয় এই সুন্দর বালককে দেখিয়া বারাণসীর এক শাস্ত্রবিশারদ সন্ন্যাসী বুঝিতে পারেন, যে এই বালক কালে অদ্বিতীয় জ্ঞানী হইবেন। তিনি বালককে নিজ শিষ্যরূপে গ্রহণ করতঃ শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন। অতি অল্পকাল মধ্যে বালকের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে তিনি মুগ্ধ হন। বালকের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং অচিরে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জ্ঞানী পুরুষরূপে বারাণসী ধামে পরিচিত হইলেন।

ক্রমে তিনি গুরুদেবের নিকট হইতে নানারূপ যোগ অভ্যাস শিক্ষা করেন ও উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন। গুরুদেব তাঁহার নাম রাখেন—"স্বামী সত্যদেব সরস্বতী"।

পাঠ সমাপনান্তে সত্যদেব গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণান্তর দেশ পর্য্যটনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। আশীর্ব্বচনে অভিষিক্ত করিয়া গুরুদেব সত্যদেবকে বিদায় দান করিলে পর সত্যদেব নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে হুগলী জেলার সুবিখ্যাত গুপ্তিপাড়া গ্রামে উপস্থিত হন।

গুপ্তিপাড়ার বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। কিন্তু চিরকাল এই গ্রামের এরূপ অবস্থা ছিল না। তৎকালে নদীয়া জেলার উলা (বর্ত্তমান বীর নগর) ও হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম ছিল। দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন উদ্দেশ্যে তথায় সমবেত হইতেন। সে সময় গুপ্তিপাড়ায় অন্যূন ৪০খানি টোল ও প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র নরনারীর বসতি ছিল। সুদূর বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ শিক্ষালাভার্থে এইস্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এবং অদূরবর্ত্তী নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ও শান্তিপুরেরও অনেক বিদ্যার্থী এই স্থানে অধ্যয়ন করিতেন। ৺বানেশ্বর তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহানুভবগণ কর্ত্তৃক টোলের পরিচালনা কার্য্য সম্পাদিত হইত। মহামতি হাণ্টার তাঁহার "গেজেটিয়ার" মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন "Guptipara was a seat of learning............।

কালের বিচিত্র গতির আবর্ত্তনে—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ও ভীষণ মহামারীতে * গুপ্তিপাড়া ধ্বংসোন্মুখ। দেশ জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া পরিপূর্ণ। বহু অট্টালিকা জনশূন্য অবস্থায় বনমধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও দক্ষিণদিকে ক্ষুদ্রকায়া বেহুলা নদী—লক্ষ্মীন্দরের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কুলুকুলু নাদে বহিয়া যাইতেছে।

সত্যদেব গুপ্তিপাড়ায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণপুর নামক পল্লীতে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। এই পল্লী,—গ্রামের পূর্ব্ব সীমায়, গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গা কিছু দূর দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন এবং কৃষ্ণপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠাকুরপাড়া হইয়াছে।

যে স্থানে সত্যদেব কুটীর নির্ম্মাণ করেন তথায় আম্র, কাঁঠাল ইত্যাদি কতকগুলি বৃক্ষ ছিল। লোকালয় তথা হইতে কিছু

* ১৭৬৯ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ

দূরে। সত্যদেব অধিকাংশ কালই বৃক্ষতলে যাপন করিতেন। অনেকেই তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণার্থে আগমন করিতেন। সন্ন্যাসী সকলের সহিত সমভাবে বাক্যালাপ করিতেন। যে বৃক্ষতলে তিনি অবস্থান করিতেন তাহার অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পথ ছিল। সেই পথে বহু নরনারী ভাগীরথী তটে গমনাগমন করিত। পথের অপর পার্শ্বে একখণ্ড কর্ষিত ভূমি ছিল, বীজ তখনও রোপিত হয় নাই। একদিন সত্যদেব সেই কর্ষিত ভূমিতে একখণ্ড কঠিন মৃত্তিকায় মস্তক রক্ষা করিয়া ও আর একখণ্ড মৃত্তিকা, দুই হাঁটুর মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। হেনকালে দুইটী স্ত্রীলোক কক্ষে কলসী লইয়া জলার্থে সেই পথে যাইতেছিল। সন্ন্যাসীকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া, একজন অন্য জনকে বলিল—দেখ, ঠাকুর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু "আয়েস"টুকু এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

স্ত্রীলোকের এইকথা শুনিয়া সত্যদেব মনে মনে বলিলেন—কথা ঠিক। বাস্তবিক তিনি ঐরূপ অবস্থায় শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ সুখবোধ করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি সুখান্বেষী, এ কথা স্মরণ করিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। স্ত্রীলোক দুইটী চলিয়া গেলে মাটির চাপ দুইখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কর্ষিত ভূমিতে শয়ন করিলেন। জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে সন্ন্যাসীর শয্যার পরিবর্ত্তন দেখিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক প্রথমাকে বলিল—সন্ন্যাসী যে 'আয়েষী' শুধু তাহাই নহে, ইঁহার আবার বিলক্ষণ রাগও আছে। কারণ 'আয়েষী' বলা হইয়াছিল বলিয়া ইনি 'মাটীর চাপ দুইটী' ফেলিয়া দিয়াছেন।

স্ত্রীলোক দুইটীর ব্যবহারে সত্যদেব বিশেষ চমৎকৃত হইলেন ও স্থির করিলেন যে ঐ স্থানই তাঁহার সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। কারণ যে স্থানে সাধারণ স্ত্রীলোকও কার্য্যের সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারে, সে স্থানে নিশ্চয়ই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। তথায় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তদবধি সত্যদেব ঐ স্থানে থাকিয়া ভগবৎ চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

২

গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির সুবিখ্যাত। প্রবাদ এই, দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র স্বেচ্ছায় সত্যদেবের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। প্রবাদটি নিম্নে বিবৃত হইল।

শান্তিপুরের "গড়" নামক পল্লীতে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ সপরিবারে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ পরম ভক্ত, শুদ্ধাচারী, ক্রিয়া কর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্। গৃহে শালগ্রাম শিলা নিত্য পূজিত হইত। অতিথি কখন তাঁহার গৃহে বিমুখ হইতেন না। সপরিবারে উপবাসী থাকিয়াও অতিথির পরিচর্য্যা করিতেন। পরিবারবর্গের মধ্যে, তিনি নিজে, ব্রাহ্মণী, একটী পুত্র ও একটী বিবাহিতা কন্যা।

একদা নিশীথে নিদ্রাবস্থায় ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার গৃহে এক দিব্য-কান্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন—তুমি আমাকে নিত্য পূজা করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমি তোমার পূজায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এখন অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি। গুপ্তিপাড়ায় আমার পরম ভক্ত সত্যদেব

সরস্বতী অবস্থান করিতেছেন। আমার শিলামূর্ত্তি তাঁহার নিকট রাখিয়া আইস।

ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বহু মিনতি করিলেন ও যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তজ্জন্য নানারূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পূজা কালীন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল,—ঠাকুর ঘরে যেন কেহ বলিতেছেন—আমাকে এই স্থান হইতে সত্যদেবের নিকটে রাখিয়া আইস। পূজা সাঙ্গ করিয়া, ব্রাহ্মণ ভক্তি-ভাবে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—দেবতা, আমি তোমাকে কখনই ছাড়িয়া দিব না। তুমি যখন দয়া করিয়া আমার সহিত কথা কহিতেছ, তখন আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি যতদিন বাঁচিব তোমাকে আমার গৃহে রাখিব। দুই তিন দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা গৃহ হইতে বাহির করিলেন না। পরদিবস যখন তিনি গভীর পূজায় মগ্ন তখন শুনিলেন, কেহ যেন বলিতেছেন—যদি তুই আমার আজ্ঞা পালন না করিস্, তাহা হইলে তোর সর্ব্বনাশ হইবে। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়, হউক, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে কখনই ছাড়িব না। পূজাকালীন ২।৩ দিন পুনরায় তিনি এইরূপ স্বর শ্রবণ করিলেন, কিন্তু একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। কয়েক দিন পরে তাঁহার পুত্রের পীড়া হইল ও সেই পীড়াতেই অল্পদিন মধ্যে তাহার জীবন শেষ হইল। ব্রাহ্মণ ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভক্তের হৃদয় ইহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি যথাবিধি ঠাকুরের পূজা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন মধ্যে ব্রাহ্মণীর ও তৎপরে জামাতার মৃত্যু হইল। সংসারে তিনি ও একমাত্র বিধবা কন্যা দেবসেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কন্যাকে নানারূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে বিশেষ ভক্তির সহিত দেবসেবা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ব্রাহ্মণও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কন্যাকে বলিলেন—দেখিও মা আমি আজীবন দেবসেবা করিয়া আসিয়াছি, এখন যাইবার সময় তোমাকে বলিতেছি যে আমার গৃহ-দেবতা যেন তোমার জীবন থাকিতে কখনও গৃহ-ছাড়া না হন। তুমি বিধবা, নিজে দেবতার পূজা করিবে ও তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিবে।

কন্যা পিতার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। একদা তিনিও স্বপ্ন দেখিলেন যে ঠাকুর তাঁহাকে সত্যদেবের নিকট রাখিয়া আসিতে আদেশ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—আমার পিতা আজীবন আমাকে তোমার সেবা করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি কোন মতেই তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। কন্যা তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। যাহাতে পূজার কোনরূপ ত্রুটি না হয় এজন্য তিনি বিশেষ সাবধান হইলেন। দেব-সেবা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

৩

এদিকে সত্যদেব একদা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন—ভগবান তাঁহাকে বলিতে-ছেন—শান্তিপুরের "গড়" নামক পল্লীতে ব্রাহ্মণ বাটীতে যে শিলামূর্ত্তি আছেন তাহা যেন তিনি লইয়া আসিয়া নিজ কুটীরে প্রতিষ্ঠা করেন।

পরদিবস প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সত্যদেব শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুপ্তিপাড়া হইতে ঠিক উত্তরে শান্তিপুর এবং ভাগীরথী উভয় গ্রামের সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। গঙ্গা পার হইয়া সত্যদেব দ্বিপ্রহরকালে স্বপ্নাদিষ্ট গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। গৃহে সন্ন্যাসী অতিথি সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকন্যা কিছু চিন্তিতা হইলেন। সত্যদেব তাঁহার চিন্তা দুর করিয়া কহিলেন তিনি ঐ দিবস তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিবেন।

দেবতার ভোগ-নিবেদন-কার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণকন্যা সন্ন্যাসীকে আহার্য্য প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করিয়া হস্তে জলগণ্ডূষ লইয়া ব্রাহ্মণকন্যাকে বলিলেন—মা, আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী; তোমার গৃহে আমি আজ অতিথি, কিন্তু দক্ষিণা না লইয়া ভোজন করিতে পারি না।

ব্রাহ্মণকন্যা বলিলেন—বাবা, আমি দরিদ্র, কিন্তু তুমি আমার গৃহে অতিথি। অতিথিসেবা হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। তুমি কিরূপ দক্ষিণা প্রার্থনা করিতেছ তাহা জানিতে পারিলে ও আমার অবস্থানুযায়ী হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রদান করিব।

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন—মা, তোমার গৃহের শালগ্রাম শিলা আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। অন্য কোন দক্ষিণা আমার প্রার্থনীয় নহে।

ব্রাহ্মণকন্যা কিয়ৎকাল নির্ব্বাক রহিলেন। তৎপরে তাঁহার পিতার স্বপ্নকথা ও শেষ অনুরোধ বর্ণনা করিয়া কহিলেন—দেব, তুমি শালগ্রাম শিলার পরিবর্ত্তে অন্য দক্ষিণা প্রার্থনা কর। আমি প্রাণপাত করিয়াও তোমার প্রার্থনা পূরণ করিব।

কিন্তু সন্ন্যাসী শিলা ব্যতিরেকে অপর কিছুর জন্য গৃহীর গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যাকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দান করিয়া, তাঁহার দক্ষিণা মঞ্জুর করিতে বলিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যা তখন গভীরচিন্তায় মগ্ন।

তখন সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন—দেখ মা, যদি আমার প্রার্থনা মত দক্ষিণা দান করিতে তোমার আপত্তি থাকে তবে তুমি তাহা না দিতে পার। আমি তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব না বা তজ্জন্য তোমার কোন প্রকার বিরক্তি উৎপাদন করিব না। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র, তোমার গৃহে অতিথি। যদি আমার ঈপ্সিত দক্ষিণা প্রাপ্ত না হই তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না, কিন্তু অভুক্ত অবস্থায় আমাকে এইস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

এখন আমরা অতিথিকে অর্দ্ধচন্দ্র দানে বিদায় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু সে সময় নরনারীর চিত্তবৃত্তি এরূপ ছিল না। অতিথি-সেবা তৎকালে হিন্দুর পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। অতিথি উপবাসী অবস্থায়

গৃহ হইতে চলিয়া গেলে গৃহী ঘোর অমঙ্গল আশঙ্কা করিত ও মহাপাপে পতিত হইবার ভয়ে শিহরিয়া উঠিত।

একদিকে পিতার নিকট প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে আহার্য্য সমীপে উপবিষ্ট অতিথি ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীর অভুক্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন—এই দুই চিন্তা ব্রাহ্মণকন্যাকে নিরতিশয় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, হিন্দুর গৃহ হইতে অভুক্ত অবস্থায় অতিথি ফিরিয়া যাইবে—ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না। তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন—তুমি আহার কর আমি অতিথিসেবাব্রত পালন করিব। সন্ন্যাসী আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণকন্যা তখন অতিথিকে দক্ষিণা প্রদানের উদ্যোগউদ্দেশ্যে দেব-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমনাদি সাঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার দক্ষিণা লইয়া আসিল না। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যার অনুসন্ধানে দেব-গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কেহ দ্বার মুক্ত করিল না। তিনি দ্বার ঠেলিলেন। ঠেলিবামাত্র তাহা মুক্ত হইল। গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন—যোগাসনে উপবিষ্টা ব্রাহ্মণকন্যার করদ্বয় বক্ষে নিবদ্ধ, চক্ষু মুদ্রিত—এই অবস্থায় তাঁহার উৎক্রান্তি ঘটিয়াছে।—সম্মুখে শিলা-মূর্ত্তি বিদ্যমান। এইরূপ ঐকান্তিকী ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে বিহ্বল হইয়া মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ও পরে পল্লীর কয়েক ব্যক্তিকে তথায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসিলেন। তাহারা ব্রাহ্মণকন্যার দেহ সৎকারার্থে লইয়া গেল। সন্ন্যাসী শিলা-মূর্ত্তি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সত্যদেব কতদূর ভক্তপুরুষ ছিলেন, এই প্রবাদবাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৪

শান্তিপুর হইতে আসিয়া সত্যদেব গুপ্তিপাড়ায় নিজ আশ্রমে শিলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, আর্ত্তের সাহায্য, পীড়িতের শুশ্রূষা তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম ছিল। গ্রামের নরনারী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত ও তাঁহার আশ্রমদেবতার পূজার নিমিত্ত রাশি রাশি দ্রব্য সামগ্রী তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত। তিনি ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রামবাসী ও দীনদুঃখীগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। আজীবন তিনি দেবসেবায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার আশ্রম দেবতা শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ নামে পরিচিত হইলেন।

যে স্থানে স্বামী সত্যদেবের কুটীর ছিল তাহার অনতিদূরে এখন শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্রের সুবৃহৎ মন্দির বিদ্যমান। এইস্থানে আরও কয়েকটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। মন্দিরের অভ্যন্তর দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর সুন্দরভাবে চিত্রিত। মন্দিরটী এরূপ নিপুণতার সহিত চিত্রিত যে দেখিলে মনে হয় সবেমাত্র ইহার চিত্রাঙ্কণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তন্মধ্যে মর্ম্মর বেদী, তদুপরি শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণের অপরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত।

অন্য মন্দিরগুলির মধ্যে একটীতে জগন্নাথ,

বলরাম ও সুভদ্রা, অন্যটীতে কৃষ্ণপ্রস্তর বিনির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের ও শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত শ্রীরাধার মূর্ত্তি। এই মন্দির কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির বলিয়া অভিহিত। অপর একটীতে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের এক পার্শ্বে হনুমান ও অপর পার্শ্বে জাম্বুবান করযোড়ে দণ্ডায়মান। আর একটী মন্দিরে গৌর ও নিতাই অধিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য মূর্ত্তিগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও সুচিত্রিত। এতদ্ভিন্ন একটী কক্ষে বহু শালগ্রাম শিলা ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন মূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে একটীর বহির্ভাগ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত।

৺বৃন্দাবনচন্দ্র এখন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। স্বামী সত্যদেব তাঁহার প্রথম মোহান্ত। অনেকে অনুমান করেন এই সকল সুদৃশ্য মন্দিরাদি তাঁহার পরবর্ত্তী মোহান্তদিগের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের সে শিলামূর্ত্তি এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে ও তৎ পরিবর্ত্তে তাঁহার পরবর্ত্তী মোহান্ত কর্ত্তৃক, এই ভোগমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া আজও—নরনারী ভক্তিভাবে স্বামী সত্যদেব সরস্বতীর বিষয় চিন্তা করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ

(ইংরাজি হইতে)

ফস্টাইনের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ভিনিসে। প্রথম আমি তাহার একখানি ক্ষুদ্র হস্ত দেখিতে পাই। সেই সুন্দর হস্তের চম্পক কলির ন্যায় সুগঠিত অঙ্গুলিগুলি জলের উপর ন্যস্ত ছিল। আমি মনে মনে সেই সুগঠিত হস্তের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; ক্রমে আমার বজরাখানি তাহার বজরার পার্শ্বে আসিবামাত্র চকিতের মত হস্তখানি অপসৃত হইল; সঙ্গে সঙ্গে জানালার পরদাখানিও সরিয়া গেল; কি দেখিলাম? দেখিলাম পরীর মত সুন্দরী ফসটাইন্ ঈষৎ হাস্যে রঞ্জিত মুখে আমারই দিকে চাহিয়া আছে? এমন রূপ বুঝি স্বর্গের অপ্সরারও বাঞ্ছনীয়। কুঞ্চিত স্বর্ণকেশদাম সেই সুন্দর মুখখানির চারিদিক বেড়িয়া আছে; কুটিল ভঙ্গিমাপূর্ণ সুনীলনয়ন দুইটি হাস্যোজ্জ্বল। সৌরচুম্বিত পদ্মরাগ তুল্য লজ্জারক্তিম সুপুষ্ট কপোল; পক্কবিম্বাধর হাস্যরঞ্জিত! আমি মাঝিদিগকে বজরা বাঁধিতে বলিলাম; ধীরে ধীরে তাহার বজরাখানি আমার বজরার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

জানালার সম্মুখে তাহার বদনখানি একটী প্রস্ফুটিত কমলের মত শোভা পাইতেছিল। আমি অনিমেষ লোচনে সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলাম। কি উন্মাদনা, কি উত্তেজনাপূর্ণ সে রূপ! কিন্তু এত সৌন্দর্য্যেও তাহার একটী দোষ মোচন

করিতে পারে নাই,—সেটী তাহার নয়নের কুটিল ভাব! আমি তাহার সহিত কথা কহিলাম, অভিবাদন করিয়া বলিলাম—"মাদাম—আমি কি—"

"মাদাম নহি—আমি কুমারী, ২৫বৎসর বয়সেও কুমারী—আজীবন কুমারীই থাকিব।" এই কথা বলিয়াই সে মাঝিদিগকে বজরা চালাইতে বলিল; চকিত চমকের ন্যায় বজরাখানি আমার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে চলিয়া গেল। আমিও বজরা ছুটাইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম এবং কয়েক মিনিট পরেই আবার তাহার বজরার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ফস্‌টাইন্‌ আবার হাসিল।

"আবার কি চাও তুমি?"

"আলাপ করতে চাই"

"আলাপ ত আগেই হয়েছে?"

"আমি জানতে চাই তুমি কে?"

"আমি ফস্‌টাইন্‌।"

তাহার নামটী শুনিয়া আমার একটী পুরাতন ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। ততক্ষণে তাহার বজরাখানি আবার চলিতে লাগিল।

আমার নাম এন্‌টোনিনাস্‌। প্রাচীন ঘটনায় এন্‌টোনিনাস্‌ আর ফসটাইনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। সে কথা মনে হওয়ায় আমার একটু হাসি পাইল। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ফস্‌টাইন্‌! এত তাড়া কিসের? দাঁড়াও না, আমিও ত যাব।"

আবার দুখানা বোট পাশাপাশি লাগিল, সে হাসিয়া বলিল, "আমি কে জান্‌তে চাও? আমি একজন সাপুড়িয়া;—লোকের কাছে আমি এতেই বিখ্যাত! আপাততঃ আমি রোম থেকে আসছি, আবার এক পক্ষের মধ্যেই সেখানে ফিরব। তারপর একবার প্যারী, পরে একবার লণ্ডন যাবারও ইচ্ছে আছে। তুমি দেখ্‌চি ইংরেজ!"

আমি তাহাকে আমার নাম ও ঠিকানা বলিলাম, সেও আমায় তাহার পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিল। শুনিলাম সে গ্রাণ্ড কেনেলের পরপারে একটী বাসা ভাড়া লইয়াছে। আরও শুনিলাম ভিনিসে সে দিনকয়েক বিশ্রাম লাভের জন্যই আসিয়াছে; কাজ কর্ম্মের জন্য মাত্র দুইজন ভৃত্য তাহার সহিত আসিয়াছে। ভিনিসে আমার দিনগুলা নিঃসঙ্গ-ভাবেই কাটিতেছিল; তাহাকে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করিলে সে সানন্দে তাহা গ্রহণ করিল। শুনিলাম তাহাকেও তেমনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতে হয়। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমরা দুইজনে একত্রে আহারে বসিলাম।

আমি বলিলাম,—"একটা কোন হোটেলে থাকলে তোমার বেশ সুবিধে হ'ত ত' ফস্‌টাইন্‌!"

"তা' হ'ত বটে কিন্তু তারা আমার বন্ধুদের সেখানে জায়গা দিতে বড় নারাজ! বিশেষতঃ ষ্টিফেনোকে। বন্ধুরা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়। আমার যা কিছু অর্থ সম্পদ সকলই তাদের জন্য। আমার সঙ্গে থাকতে না পেলে তারা মনে বড় কষ্ট পায়। আমি যদি একবার তাদের ছেড়ে যাই তা' হ'লে আর পাব না; তখন আমার দুর্দ্দশা কি হবে?

"কারা তোমার বন্ধু ফস্‌টাইন্‌?"

"তারা আমার সমব্যবসায়ী, আবার

তারাই আমার ভৃত্য! আমার প্রত্যেক আদেশ তারা নতশিরে পালন করে। তারাই আমার যশ তারাই আমার অর্থ; আমি সাধারণ রমণীর মত থাকি বটে কিন্তু আমার মত ধনী খুব কমই আছে! বন্ধুরা আমার, যা কিছু উপার্জ্জন করে সবই আমার হাতে দেয়; আর তার পরিবর্ত্তে আমি তাদের স্নেহ করি, ভরণ পোষণ করি।"

আমি তাহার এ কুহেলিকাপূর্ণ আত্ম-পরিচয়ের কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কুমারী ফস্‌টাইন্ আর কিছু বলিল না। আমার মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল; তাহাকে আরও ভালরূপে জানিব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। আমি তাহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে স্পষ্ট অসম্মতি জানাইয়া বলিল,—" তাতে আমার বন্ধুরা বড় অসন্তুষ্ট হবে; তা ছাড়া—" কুমারীর নেত্রে ভয়ের ছায়াপাত হইল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল,—" তা' ছাড়া তাতে তোমারও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে!"

"তা হ'ক আমি বিপদকে ভয় করিনা।"

"আমারও একটু বাধা আছে; ষ্টিফেনো আমার পুরুষ বন্ধুদের বড় একটা পছন্দ করে না।"

"এই অদ্ভুত ষ্টিফেনোটী কে কুমারি!"

সে কোন উত্তর দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল,—"কিন্তু বোধ হয় আমি মধ্যে মধ্যে তোমার এখানে এসে দেখা ক'ত্তে পারি, কিন্তু একটা কথা আছে।" কুমারী একবার ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"তুমি কিন্তু আমায় প্রণয়ের চোক্ষে দেখো না।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া হাস্য দমন করিতে পারিলাম না। সহাস্যে বলিলাম, —"কিন্তু মনে কর, তা' যদি অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তাতে বিপদটা কি শুনি।"

"আমিও হয়ত তাতে অভিভূত হ'য়ে প'ড়তে পারি!"

"বেশত তাতেই বা এমন দোষটা কি?"

কুমারী অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল,—"ষ্টিফেনো।"

আমি বাধ্য হইয়া এ বিষয়ের তর্ক ত্যাগ করিলাম। তাহাকে বলিলাম,—"তুমি আমার কথায় বিশ্বাস ক'ত্তে পার। যখন তোমার ইচ্ছে হ'বে তখুনি আমার এখানে আসতে পার তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

সেও প্রতিদিন আসিত। বালকের ন্যায় নিষ্পাপ আমোদে আমাদিগের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত। ফস্‌টাইন্ নৃত্য গীতে বেশ পারদর্শী ছিল। নির্দ্দোষ আমোদে সর্ব্বদা আমায় সে উৎফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত। অবশেষে একদিন শুনিলাম, পরদিবস সে রোমনগরীতে যাইবে। অন্য দিবস বৈকালে সে বেশ প্রফুল্ল থাকিত কিন্তু এই বিদায় উপলক্ষে সেদিন তাহার মন অবসাদগ্রস্ত দেখিলাম।

আমি স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, —"আমায় ছেড়ে যেতে হ'বে ব'লে কি তোমার কষ্ট হ'চ্চে?"

"হৃদয়ে আমার যেটুকু নারীত্ব আছে সেটুকু হাহাকার ক'রে কাঁদছে, কিন্তু বাকি

যেটুকু সাপ সেটুকু সাগ্রহে বাধা দিচ্চে তাতে।" বলিতে বলিতে কুমারী নেত্রাসারে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম কুমারীর সহজ জ্ঞান আছে ত'? কিন্তু তাহার সেই সাপের কথা শুনিয়া তাহার জ্ঞান আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। কুমারী চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিল,--

"শোন এন্‌টনিয়ো! তুমি একদিন আমায় সাপ ব'লে ঠাট্টা ক'রেছিলে মনে আছে?" সে কথা আমার বেশ স্মরণ ছিল; তাহার সেই সর্পের ন্যায় বক্র গতি, অদ্ভুত প্রকারে মস্তক আন্দোলন করিবার অভ্যাস, মধ্যে মধ্যে সেইসুন্দর চক্ষুর কুটিল অথচ ভাবহীন দৃষ্টি প্রভৃতি দেখিলে তাহাকে সর্প বলিয়াই মনে হইত। কুমারী তাহার বক্ষের একস্থানের বস্ত্র কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া বলিল,—"এই দেখ সাপের চিহ্ন!"

আমি বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই সর্পাকৃতিটী দেখিতে লাগিলাম। সেটি ঠিক একটী নিপুণ চিত্রকরের তুলিকানিঃসৃত নিখুঁত গোখুরা সর্পের চিত্র; তাহা এতই স্বাভাবিক যে চিত্র বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব। কোন উপায়ে যে সেটি কুমারীর দেহ হইতে অপসৃত করা যাইতে পারে তাহা মনে হইল না। দগ্ধ করিলেও সে চিহ্ন মুছিবার নহে।

সে বলিতে লাগিল,—"আমার জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে আমার মা একটি গোখুরা সাপের ভয়ে অস্থির হ'য়ে পড়েন। স্বপ্নে জাগরণে তাহার হাত হতে তিনি নিস্তার পান নাই। অবশেষে যখন আমি মাতৃহারা হ'য়ে পৃথিবীতে এলাম সেইক্ষণ থেকেই এই সাপের ছবি আমার বুকে অঙ্কিত; এ কৃত্রিম নয়, আজন্ম আমি এই ছবি ব'য়ে আসচি; এ ছবির চিত্রকর প্রকৃতি! ক্রমে আমি বড় হ'তে লাগলুম কিন্তু কোন দিন সাপকে ভয় করিনি।—আর সাপও আমার কাছে আসতে অসম্মত হয়নি। ডাকলেই তারা আমার কাছে আসতো, আমিও তাদের পালন ক'রে আসছি। আমার কাছে অনেকগুলি সাপ আছে, তাদের মধ্যে একজন রাজাও আছে সেটি গোখুরা! আমার পিতা বল্লেন "সাধারণের কাছে তুমি সাপের খেলা কর।" আমি তাঁর ইচ্ছাতেই কাজ ক'রলুম; সাফল্যও যথেষ্ট লাভ ক'রলুম। অনেক টাকাও উপার্জ্জন হ'ল। প্রায় দু'বছর হ'ল পিতা মারা গেছেন আমিও সেই থেকে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি।

এ পর্য্যন্ত আমি কাকেও প্রণয়ের চোখে দেখিনি, কিন্তু—কিন্তু এখন— —!" কুমারী হস্তের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,— "ফস্‌টাইন্! কাল তবে তোমার যাওয়া স্থির?" সে মস্তক আন্দোলন করিয়া সম্মতি জানাইল। আমি বলিলাম—"বেশ যতক্ষণ এখানে আছ আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। তোমার বন্ধুদের যদি ছেড়ে থাকতে না চাও ত' এইখানে নিয়ে এস। আমার ঘরে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে তারা অনায়াসেই থাকতে পারে। আর চাই কি আজ রাত্রে আমায় একবার খেলাও দেখতে পার।"

সে তাহাতে সম্মত হইল। তাহার পর বলিল,—"কিন্তু ষ্টিফেনো সর্ব্বজ্ঞ; বড় হিংসুকেও

বটে। একবার একটা লোক আমায় চুম্বন ক'র্ত্তে চাওয়াতে সে তাকে হত্যা ক'রেছিল।"

বরাবরই আমার ধারণা ছিল ষ্টিফেনো আলাপ করিবার উপযুক্ত লোক নহে। কিন্তু তবু আমি তাহার প্রতিহিংসা সহ্য করিব স্থির করিলাম। বোধ হয় ফস্‌টাইনও সেইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় ফস্‌টাইন্ তাহার ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিল। একে একে তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স হইতে সর্প বাহির করিতে লাগিল। দেখিলাম সকলেরই এক একটী নাম আছে, সেই নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্রই তাহারা নত শিরে তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। তাহার কথায় তাহারা ফস্‌টাইনের মস্তকে উঠিয়া সজীব গহনার মত ফণা বিস্তার করিয়া রহিল; অপরগুলি তাহার বাহু বেষ্টন করিয়া নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহার পর সে গান গাহিতে আরম্ভ করিলে তালে তালে সর্পগুলি নৃত্য করিতে লাগিল।

দেখিলাম সকল সর্পগুলিই তীব্র বিষধর। সকল সর্পের আমি নাম জানি না, কিন্তু তন্মধ্যে গোখুরা ও অন্যান্য জাতীয় ভীষণ বিষধর সর্পেরও অভাব ছিল না। মানবের ক্ষণভঙ্গুর দেহের নিপাত করিতে তাহাদিগের একটি স্পর্শনই যথেষ্ট। তাহাদিগের ক্রীড়া-ভঙ্গী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইলেও তাহাতে যথেষ্ট ভয়ের কারণ ছিল, কারণ কোন সর্পেরই বিষদন্ত ভঙ্গ করা হয় নাই।—সকল গুলিই তাজা, সকল গুলিই ভয়াবহ। খেলা শেষ হইলে ফস্‌টাইন্ তাহাদিগকে পুনরায় বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করিল। মানুষের সহিত লোকে যেরূপ কথা কহে ফস্‌টাইন তেমনি ভাবে সর্পের সহিত আলাপ করিতে লাগিল; তাহার পর একটি সুবৃহৎ গোখুরা সর্পকে লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সহকারে ব্রততী যেরূপ জড়াইয়া থাকে সেই বিষময় গোখুরাটি তেমনি ভাবে কুমারীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল।

সে দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,—"এইটি রাজা।"

সর্পটী আমায় দর্শন করিবা মাত্র ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে করিতে লাগিল এবং স্বভাব সিদ্ধ বক্র গমনে আমার দিকে অগ্রসর হইল।

সে উৎকণ্ঠিত ভাবে ডাকিল,—"ষ্টিফেনো!"

তবু ভাল, ষ্টিফেনো তবে শাপের নাম!

ষ্টিফেনো একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, ফণাবিস্তার করিয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়া একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কুমারীর দিকে অগ্রসর হইল। কুমারী সাগ্রহে তাহাকে তুলিয়া লইল। ভয়ে তখন তাহার মুখ খানি শবের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

"কোনটা বন্ধুর বাড়ী আর কোনটা শত্রুর বাড়ী তা তোমার বোঝা উচিত ষ্টিফেনো! তোমার হিংসারও একটা সীমা থাকা উচিত। ওগো আমার প্রভু! ওগো শাপের রাজা! কোথায় তোমার রাজার মত উদার হৃদয়?" বড় আগ্রহ ভরে, বড় একাগ্রতার সহিত কুমারী ষ্টিফেনোকে কথা গুলি বলিতেছিল। আমি তাহার দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া

বলিলাম,—তোমার ও অসভ্য বন্ধুটীকে রেখে এস।"

কুমারী হস্তের ইঙ্গিতে আমায় দূরে সরিয়া যাইতে বলিয়া বলিতে লাগিল,—"এর কাছে এস না; আগে থেকেই এ রেগে আছে আর একটু রাগলেই তোমার প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হ'য়ে প'ড়বে।" তাহার পর সর্পকে বলিতে লাগিল,—"ষ্টিফেনো, প্রভু আমার! কেন তুমি মিছে সন্দেহ কচ্চ? তুমি ভিন্ন আমি জগতের আর কাকেও ভাল বাসি না। সে কথা এখন থাক, একবার নাচ, ঐ এক জন বন্ধু তোমার নাচ দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।"

কুমারী মাটিতে বসিয়া একটী চাবি বাজাইতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ সর্প অত্যদ্ভুত নৃত্য আরম্ভ করিল।—এমন ভয়াবহ দৃশ্য আমি জীবনে কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই।

নৃত্য শেষ হইলে কুমারী ষ্টিফেনোকে বলিল,—"এই বার আমায় বল, তুমি আমায় কত ভাল বাস!"

সর্পটী তাহার সুবিস্তৃত ফণাটী কুমারীর লজ্জা রক্তিম কপোলে স্থাপন করিল। কুমারী সেটি মুখের অতি সন্নিকটে ধরিয়া বলিল,—"চুম্বন ক'রবে কি প্রিয়তম! তোমার একটী চুম্বনেই কিন্তু আমি ম'রে যাব।"

প্রণয়িনীর ন্যায় সে সর্পের সহিত নানারূপ আলাপ করিতে লাগিল। কি ভয়াবহ সে স্বয়ম্প্রণয়! বহুবার আমার অন্তরাত্মা ভয় ও বিস্ময়ে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যতক্ষণ না সেটী বাক্সের মধ্যে অবরুদ্ধ হইল ততক্ষণ আমি স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারি নাই। অবশেষে সেটী বাক্সে অবরুদ্ধ হইল, আমরা সন্ধ্যাভোজনে নিযুক্ত হইলাম।

ভোজন শেষে আমি সর্পের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ছিলাম। আমি তখন ফস্‌টাইনের কথা ভাবিতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। দীর্ঘ কাল সর্পের সহিত বাস করায় সে কিন্তু আমার মত সর্পের কথা একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আমার সে কথা মনে না থাকার আরও কারণ ছিল। কুমারী তখন তাহার সেই সুকোমল দেহযষ্টি আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া কপোলে কপোল স্থাপন করিয়া বসিয়া ছিল কাজেই জগৎ তখন আমার দৃষ্টির বহির্ভূত। কক্ষের বহির্ভাগে সর্পগুলি তখন বাক্সের মধ্যে সুখে নিদ্রা ভোগ করিতেছিল।

কুমারী অনুচ্চ স্বরে বলিল,—"আমি যে এমন ক'রে তোমার কাছে ব'সে আছি এ কথা একবার জানতে পারলে ষ্টিফেনো কি ক'রবে জান? খুব সম্ভব কাল সকালে সে সব কথা জানতে পারবে, আর তখন তোমায় মারবার সুযোগ খুঁজবে। আমি কিন্তু রোমে না পৌছে ওকে আর বার ক'রব না।"

"কি পাগলের মত বোকচ তুমি?"

"না প্রিয়তম! তুমি জাননা ওকে। আমার বুকের সেই সাপের ছবির কথা ম'নে নেই? আমি জন্মাবার আগে ষ্টিফেনোরই ছিলুম;—একথা কল্পনা মনে ক'রনা, মা একদিন রাত্রে নিজে এসে আমায় ব'লে গেছেন! ষ্টিফেনোই আমার সতীত্বের একমাত্র রক্ষক। তোমার মনে আছে বোধ হয় যে মা একটা সাপের ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন?—সেটী মেদি সাপ; শেষে মা একদিন সেটাকে

মেরে ফেলেন। সেটা ষ্টিফেনোর অর্দ্ধাঙ্গী ছিল; মৃত্যুর পর তার আত্মা আমার শরীরে প্রবেশ করে। আমি একদিন একটা বনের ভিতর বেড়াচ্ছিলুম এমন সময় ষ্টিফেনো এসে আমার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ল। আমি তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম। সেই রাত্রেই মা আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে সকল কথা ব'লে যান। ষ্টিফেনোর বংশ খুব প্রাচীন ও পূজ্য। ওর পূর্ব্বপুরুষরা পাঁচফণা সাপ। এত দিনে আমি তার বিশ্বাস হারিয়েছি; কি জানি কি প্রতিশোধ সে নেবে!"

আমি অজস্র চুম্বন দানে তাহার ভয় ও উদ্বেগ দূর করিলাম। সে কি পাগল?—কিন্তু তাহা হইলেও সে যে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের প্রণয়িনী হইতে পারিত;—এমনি নিখুঁত তাহার রূপ! আর সে পাগল হইলেও প্রণয়ের বলে যে তাহাকে আমি আরোগ্য করিতে পারিব তাহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। প্রাতে আমি তাহার জন্য কিছু ফল আনিতে যাইতেছিলাম, কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাহার নয়ন পল্লব উন্মুক্ত হইল; দেখিলাম তাহাতে ভাবহীন অদ্ভুত দৃষ্টি খেলিয়া বেড়াইতেছে; বদন কষ্ট-ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যময়। অঙ্গুলিগুলিও দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ!

আমি নিরাশ ব্যাকুল স্বরে ডাকিলাম,—"ফস্‌টাইন্!"

কোন উত্তর পাইলাম না; তাহার দেহে একটু স্পন্দনও অনুভূত হইল না। তাহার বক্ষের উন্মুক্ত অংশে সেই সর্পের চিত্র লক্ষিত হইল। ক্ষণমধ্যে আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম সেই চিত্র বাস্তবে পরিণত হইল। তাহার হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে সর্পের সুবিস্তৃত ফণা উত্থিত হইতেছিল। তাহার ক্রোধ রঞ্জিত ভীষণ দৃষ্টি তখন আমারই উপর সংবদ্ধ!

"সে সেই সর্পরাজ—ষ্টিফেনো!"

উদ্বেগআকুলিত স্বরে আমি আবার ডাকিলাম,—"ফস্‌টাইন্!"

প্রত্যুত্তরস্বরূপ সেই ভয়াবহ সর্প ভূমে অবতরণ করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দ্রুতপদে আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

আমার শয়ন কক্ষে একটী পিস্তল ছিল ক্ষিপ্র হস্তে সেইটী লইয়া পুনরায় সর্পের সম্মুখীন্ হইলাম। পিস্তলের ধূম ও অগ্নি উদ্গীরণের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিফেনোর প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। দ্রুতপদে ফস্‌টাইনের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাহার দেহ তখন তুষারশীতল; প্রাণপক্ষী বহুক্ষণ সে দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছিল। ষ্টিফেনো তাহার জাতীয় স্বভাবসুলভ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হর্ষবর্দ্ধন

(সিলভ্যা লেভির ফরাসী হইতে)

খুব সম্ভব বড় বড় রাজাদের রাজসভায়, কালিদাসের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারীস্বরূপ কতকগুলি কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সঠিক্ কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না এইরূপ যে কয়েকটি কবির নাম আমাদের কাল-পর্য্যন্ত কোনপ্রকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বোধ হয় তাঁহাদিগকে ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু যে কবির আবির্ভাবকাল সঠিক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাঁহার পরিচয় লাভ করিতে হইলে একেবারে শতবর্ষকাল অতিক্রম করিতে হয়। রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবাদির ফলে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য শিপ্রা নদীর তীর হইতে গঙ্গাতীরে —উজ্জয়িনী হইতে কান্যকুব্জে, চলিয়া গিয়াছিল। তখনকার কবি শুধু একজন রাজার সভাকবি ছিলেন না, পরন্তু একজন পরাক্রান্ত রাজার সভাকবি—সমস্ত উত্তর-ভারতের একছত্র-অধিপতির সভাকবি ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন —যিনি শীলাদিত্য নামেও পরিচিত—তিনি ধর্ম্মবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, সেই যুগের তাবৎ মনীষীগণকে আপনার সমীপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরম ভক্ত বাণ ও ময়ুর, এবং জৈন আচার্য্য মাতঙ্গদিবাকর—উঁহাদের উভয়ের প্রতিই তিনি সমান আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী হিউএন্-সাং যখন তাঁহার পুণ্য-ভ্রমণপথে বাহির হইয়া কনৌজে আসিয়া থামিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রভূত সম্মান-সহকারে গৃহীত হন। সাহিত্যিক অনুরাগ বশতঃ শ্রীহর্ষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কেন না, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পুলিকেশী তাঁহাকে পরাভূত করেন! কিন্তু তাঁহার বিজেতার নাম ইতিহাসে বিলুপ্তপ্রায়—পক্ষান্তরে সাহিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষের নাম সাহিত্যগ্রন্থে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বাণ কবি কবিত্বময় গদ্যে আখ্যায়িকার আকারে হর্ষচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের অষ্টঅধ্যায়মাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। হয়ত গ্রন্থকার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অথবা কালপ্রভাবে শেষাংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। ইতিহাস এই গ্রন্থ হইতে বড় একটা লাভবান হইতে পারে নাই। ভাগ্য-ক্রমে, চীনীয় পরিব্রাজক হিউএন-সাং তাঁহার স্মৃতিলিপি-গ্রন্থে কনৌজ রাজ্যের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে, আমরা জানিতে পারিয়াছি —শ্রীহর্ষদের ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, এবং ৬৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

শ্রীহর্ষ বুদ্ধের সম্মানার্থে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন (অষ্টমহাশ্রীচৈত্য স্তোত্র)। দশম শতাব্দীতে লিখিত উহার একটি চীনীয় অনুবাদ বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত তিনখানি নাটক আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে: রত্নাবলী, প্রিয়দর্শী, ও নাগানন্দ।

উহা যে রাজ লেখনী-প্রসূত তাহার প্রমাণ প্রস্তাবনার এক-একটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি ..ইত্যাদি" (রত্নাবলী প্রিয়দর্শী, নাগানন্দ) কিন্তু বহুদিন হইতে একটা কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে, এবং বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক উহা সমর্থিত হইয়াছে যে রাজা শ্রীহর্ষ উক্ত নাটকগুলির রচয়িতা নহেন। "কাব্য প্রকাশ" শুধু রাজার দাতব্যতার কথা স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন,— "রাজা বাণ কবিকে প্রভূত অর্থদান করিয়াছিলেন" ইত্যাদি... ;" কিন্তু ভাষ্যকারেরা সকলেই উক্ত বাক্যটির সম্বন্ধে একটি কাহিনী বিবৃত করিয়া থাকেন:—শ্রীহর্ষ বাণ কবির নিকট হইতে মূল্য দিয়া "রত্নাবলী" নাটক খানি ক্রয় করেন। ভাষ্যকারদিগের ঐকমত্য সত্ত্বেও উহা হইতে কিছুই সপ্রমাণ হয় না। খুব সম্ভব উহারা পরস্পরের অবিকল নকল করিয়াছে। নাট্য-সাহিত্যে হর্ষের নাম নাট্য-অঙ্গ "নাটিকার" সহিত জড়িত। রত্নাবলীও প্রিয়দর্শিকা উভয়ই উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এই দুই নাটিকার আখ্যান-বস্তুটি রাজা বৎস-উদয়নের যুগ হইতে গৃহীত। এই চপলচিত্ত নৃপতির প্রেম-লীলা উক্ত দুই নাটিকাতেই বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভাস-কবিও উহা নাট্যাকারে প্রদর্শন করেন। কালিদাসের নাটকে, বিশেষত মালবিকাগ্নিমিত্রে যে সকল অবস্থা, যে সকল ঘটনা, বর্ণিত হইয়াছে, যে সকল নাট্য-কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে, হর্ষ অসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু মৌলিক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকারদিগের রচনাবলীর —বিশেষত ভাস-কবির রচনাবলীর অনুসরণে বা অনুকরণে লিখিত। যেমন মনে কর, অগ্নিদাহের চিত্রটি। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে নাটকীয় উদ্‌ভাবনা-শক্তি সাধারণের নিকট তেমন সমাদৃত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এবং সেইজন্য হর্ষও ঘটনার বিচিত্র সম্মিলন প্রদর্শন করিয়া দর্শনকগুলীকে বিস্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই। মালবিকার আখ্যানবস্তুর অবিকল পুনরাবৃত্তি রত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়। কেবল নামগুলিই পৃথক। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুইস্‌দিগের গার্হস্থ্য জীবন

আল্পসের (Alps) বরফপ্রাচীরঘেরা ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ড য়ুরোপের নক্সায় বাস্তবিকই এতটুকু এক টুক্‌রা স্থান ব'লেই মনে হয়। কারণ হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় সুইজারল্যাণ্ড সমতল এবং নিম্নভূমি না হওয়ায় সাধারণ নক্সায় ইহার আয়তন এবং জমির পরিমাণ ঠিক বোঝা যায় না। তার পর, ইহার আকাশভেদী পর্ব্বতমালা, অনন্ত তুষার ক্ষেত্র, বরফগলা নদী, হিম-ভরা অন্ধকার গিরিকন্দর, পাহাড়ের কোণে আধ ঘুমন্ত হ্রদ, কুয়াসাচ্ছন্ন ফার (Fir) পাইনের জঙ্গল, সুন্দর ঝরণা, জলপ্রপাত

প্রভৃতি এ'কে প্রকৃতির এক রম্য কানন আর কবির দেশ করে রেখেছে।

বসন্তকালে যখন মাঠ-আলো-করা, আঙুর ভরা ক্ষেত থেকে দক্ষিণা পবন তার সুরভি টুকু চুরি করে' নিয়ে বেড়ায়, যখন সুইস্‌রা জাঁকাল পোষাক পরে, মেয়ে পুরুষে দলে দলে, নেচে গেয়ে, ডালা ভ'রে ভ'রে আঙুর তুলে বেড়ায়, তখন কে বিশ্বাস করবে যে আর কিছুদিন পরেই এ সব জায়গা শীত, কুয়াসা, অন্ধকার, বৃষ্টিতে ডুবে যাবে! এখানকার কৃষকদিগের প্রধান ফসল হোচ্চে—আঙুর। সমস্ত পাহাড়ময় আঙুরের ক্ষেত। সে এক দৃশ্যই চমৎকার! বিশেষতঃ যখন গাছ ভরে' ভরে' লাল লাল গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফুল ধরে! ভাল আঙুর ক্ষেতের এক একর (Acre প্রায় ৩ বিঘা) জমির দাম প্রায় ৭৫০০৲। কিন্তু সে আঙুর মোটে ।৶০ আনায় সের বিক্রয় হয়। একে ত মজুরি এদেশে সস্তা, তার উপর এরা এত মিতব্যয়ী যে কোনও জিনিষ টুকু বৃথা নষ্ট করে না। আঙুরের পাতা, ডাঁটা, বোঁটা, গরুদের খেতে দেয় আর তার রস বার করবার পর যে শিটা গুলো থাকে, সে গুলো শুকিয়ে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করে। কোথাও কোথাও আঙুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে, অল্প মকাইএরও চাষ করে। এদের বিখ্যাত মদ এই আঙুরের রস থেকেই হয়। কখনকখনও ক্ষেতের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত ক'রে, তার মধ্যে মদ তৈয়ারী করবার জন্য আঙুর গুলোকে পচতে দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে, তারা প্রাণ ভ'রে এই আঙুর রস পান করে। এক বর্গ ফুট্ জমিতে বছরে প্রায় দু' বোতল মদ হয়। মদ তৈয়ারী ক'রে তারা সে মদ বোতলে পূরে মাটির ভিতরে এক ছোট কুট্‌রীর মধ্যে বোঝাই করে' রাখে। তাতে মদ ভাল থাকে এবং শীঘ্র নষ্ট হয় না। ওরূপ এক বোতল মদ অনায়াসে ৫০।৬০ বছর থাকে। সুইস্‌দের বিশ্বাস যে নিয়মিত রূপে প্রত্যহ এই মদ খেতে পারলে যক্ষ্মা রোগীরা অনায়াসে ব্যাধিমুক্ত হতে পারে। সুইস্ কৃষকদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই দারিদ্র্য রাক্ষসীর হাত হ'তে দূরে বাস করে। হাটবারে, তারা স্ত্রী পুরুষে গাড়ী বোঝাই হ'য়ে, নানা রকম ভাল ভাল পোষাক প'রে বেচা কেনা কর্ত্তে যায়। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল; শরীর স্বাস্থ্যবান্। ফার আর পাইন্ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পাহাড়ে রাস্তা বেয়ে সুইস্‌দের গ্রাম্য কুটির গুলাতে পঁহুছান যায়। পাহাড়ের উপরে আশে পাশে চারদিকে জমীতে লতান ছোট সবুজ গাছে লাল লাল ষ্ট্রবেরী ফল (Strawberry) আর নীচে পাহাড়ের গায়ে ধব্‌ধবে সাদা নারসিসাস্ (Narsisus) ফুল ফুটে হাওয়ায় ঢেউ খেল্‌তে থাকে। তাদের কুটির গুলি পাইন্ কাটের তৈয়ারী; উপরে খুব পাতলা, পাতলা, তক্তা দিয়া ছাওয়া। পাছে, সে গুলা ঝড়ে উড়ে যায় সেইজন্য তার উপর ভারী ভারী পাথর চাপান। সুইস্‌দের বাড়ীর প্রধান সৌন্দর্য্য হোচ্চে তা'দের কারুকার্য্য খচিত সুন্দর সুন্দর জানালায়। তা'দের গৃহ পালিত পশুদের মধ্যে গরু আর ছাগলই প্রধান। এক একটা রাখাল বালক প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী থেকে সমস্ত গরু গুলি নিয়ে দূর পাহাড়ের উপরে চলে

যায়। সারা দিন তা'র উপরে গরু চরিয়ে বেড়ায়, আর সূর্য্যাস্তের আগেই ভেঁপু বাজাতে বাজাতে পল্লী অঞ্চলে নেমে আসে। অনেক দূর হতে গৃহস্থের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সে বাঁশীর রব শুনে বুঝতে পারে, যে তাদের গরুরা ফিরে আস্‌ছে। তারা ফিরলে ছেলে মেয়েরা বাছুরদের গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে আদর করে। এই রাখালবালকেরা দুধ আর আলু খেয়েই প্রায় দুবেলা কাটিয়ে দেয়। গ্রীষ্মকালের ক' মাসের মধ্যে এক একটা গরুর দুধ থেকে প্রায় ১ মণ ১।০ মণ করে পনীর উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে, বিবাহের সময় বর এবং কনের বন্ধু বান্ধবেরা সকলে মিলিত হোয়ে একটা প্রকাণ্ড পনীর স্তূপ তাদের উপহার দিত। এবং সেই জমাট পনীর-পিণ্ড বংশানুক্রমে পিতা হ'তে পুত্র ভোগ দখল করত। তাতেই তাদের সন্তান সন্ততি প্রভৃতির, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি স্মরণীয় ঘটনা সকল লেখা থাকত। ১৬৬০ খৃঃ অব্দের কোনকোনও পুরাতন পনীরপিণ্ড এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এ দেশের কোন কোন স্থানে এই পনীরই লোকদের প্রধান খাদ্য। এবং সেখানে মজুরদের পারিশ্রমিকের জন্য পয়সার পরিবর্ত্তে পনীরই দেওয়া হয়। যখন টাট্‌কা পনীর বেশী পরিমাণে খেয়ে কারও পেটের পীড়া হয়—তখন তাকে খানিকটা পুরাতন পনীর দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস যে, এতেই তার অসুখ সেরে যাবে। পনীর পিণ্ড যত বড় হয়, ততই ভাল এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। কাউকে কাউকে ২ মণ ২।০ মণ ওজনের এক একটি পিণ্ড কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এক মাত্র ফ্রান্সই, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের নিকট থেকে বৎসরে প্রায় ৩৮০০০ মণ পনীর ক্রয় করে। গৃহস্থবাটিতে কোনও অতিথি অভ্যাগত এলে গৃহস্বামী তাকে যত্ন করে অতি পুরাতন পনীরের প্রস্তুত খাদ্য খেতে দেয়। মান্ধাতার আমলের গমের রুটি আর বহু কালের শুষ্ক শূকরের মাংসও তাদের প্রিয় খাদ্য। সুইস্‌রা মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য (Confection) খুব বিখ্যাত। এ জন্য য়ুরোপ ময় তাদের একটা সুনাম আছে। য়ুরোপের বড় বড় সহরের ধনী লোকের গৃহে এবং হোটেলে সুইস্ হালুইকার (Pastry Cooks) নিযুক্ত আছে। ভাল ভাল কেক্, নানা রকম ফলের উৎকৃষ্ট পিটে তারা সারা দিনই খায়। এবং দিনের মধ্যে অনেকবার কফি পান করে। সুইস্‌রা খুব ভাল শীকারী। তারা বন্দুক নিয়ে অ্যাল্পস্ পাহাড়ে শ্যাময় হরিণের (Chamois) অনুসন্ধানে বেড়ায়। একবার, একটি সুইস্ যুবা একটা শ্যাময় লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ গভীর 'খদের' মধ্যে পড়ে যায়। এবং সেখানে উপরে বা নীচে কোনও দিকে পা' বাড়ান সম্ভব না হওয়ায় তিন দিন তিন রাত্রি সেইরূপ অবস্থায় সেইখানে পড়ে থাকে। চতুর্থ দিনে সৌভাগ্য ক্রমে, একদল শিকারী সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে দড়ির সাহায্যে টেনে উপরে তোলে।

আর একবার আর একজন শিকারী পদস্খলিত হয়ে হঠাৎ প্রায় ১৩০০ ফুট নীচে এক পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যায়।

সন্ধ্যার সময়ও পুত্র গৃহে ফিরল না দেখে তার পিতা পুত্রের খোঁজে বার হয়ে দেখেন যে পাহাড় থেকে নীচে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করে শোকার্ত্ত পিতা প্রায় ৬ ক্রোশ পথ বয়ে গৃহে ফিরলেন। অ্যাল্পস্ দূর হতে দেখতে শুধু শোভার ভাণ্ডার! তথায় শুধু তুষার স্তূপ, আলোর খেলা, মেঘের লীলা আর কুয়াসা বৃষ্টির ছড়াছড়ি। কিন্তু প্রতিদিন এর কোণে ঐরূপ কত ভীষণ আকস্মিক ঘটনা ঘটছে তার নির্ণয় কে করে!

সুইস্‌রা লাভের আশাতেই শ্যাময় শিকারের জন্য প্রাণপণ করে না। এটা তাদের জাতীয় ক্রীড়া। এতে প্রচুর আনন্দ পায় ও যথেষ্ট সাহস দেখাতে পারে। গরুছাগল ছাড়া সুইস্‌দিগের গৃহে অশ্বতর (mules) একটা সম্পত্তি বিশেষ। পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ খাড়াই পথের উপর দিয়ে জিনিষপত্র বহন করতে এরকম প্রাণী আর দ্বিতীয় নেই। সুইসদিগের প্রধান খাদ্য হচ্ছে দুধ। প্রায় সকলের গৃহেই দুগ্ধবতী কোনও না কোন রকম পশু আছে। যারা নিতান্তই গরীব এবং হতভাগা তাদেরই গোয়াল এই শ্রেণীর পশু শূন্য। এইরূপ মন্দভাগ্যদের জন্য আগষ্ট মাসের প্রতি তৃতীয় রবিবারে বিনামূল্যে দুধের ননি (cream) বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

নির্জ্জন আল্পসের গ্রাম্য কুটিরের মধ্যেই কেবল খাঁটি সুইস্ ভাব দেখতে পাওয়া যায়। সহরে, বিজাতীয় সভ্যতা এবং কৃত্রিমতা-পূর্ণ সুইজারল্যাণ্ডে অভাব বা দারিদ্র্য অতি অল্প লোকেই অনুভব করে। কারণ, তারা স্বাধীন, কষ্টসহিষ্ণু, মিতব্যয়ী এবং অল্পে সন্তুষ্ট। গগনস্পর্শী আল্প্‌স্ এবং তার বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাস তাদের শরীর ও মনকে দৃঢ় করেছে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতীয় সমর তাদের আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়েছে। তাদের জাতীয় চরিত্র হতেই তাদের দেশের আইন কানুন রচিত হয়েছে। কোন লোকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বা না হওয়া তার নিজের ইচ্ছা এবং সাধ্যের উপর নির্ভর করে। যদি তার কোনরূপ বিষয় সম্পত্তি না থাকে, অথবা যদি সে মনে করে, যে তার নিজের বাসগৃহ, আগুন এবং দস্যু তস্করের হাত হতে রক্ষা করবার যথেষ্ট শক্তি তার নাই তা হলে সমাজ তাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে না। প্রত্যেক পুরুষেরই নিজের এক দফা সৈনিক পোষাক (uniform) এবং অস্ত্র, একগাছি কুঠারী, একটি বাল্‌তি এবং একটি মই থাকা চাই-ই-চাই। এইরূপে প্রত্যেকেরই বাল্যকাল হতে দায়িত্ব জ্ঞান জন্মে। সুইস্ মহিলারা সূচী কার্য্যে এবং অন্যান্য শিল্পকার্য্যে বেশ সুনিপুণ। নানারূপ গৃহকার্য্যেও তাদের বেশ দক্ষতা দেখতে পাওয়া যায়।

বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিকট এক এক খানি পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ না থাকলে পুরোহিত মহাশয় তাদের বিবাহ দিতে আইন অনুসারে অসমর্থ। সুইজার-ল্যাণ্ডে পুত্রকন্যারা পিতার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিরই সমান ভাগ পায়। এমন কি

কোন একটি গাছের ফলও তারা সমান অংশে ভাগ ক'রে নেয়। পিতার একখানি চেয়ার বা একটি টেবিলও তারা করাতে কেটে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে কুণ্ঠিত হয় না। সাধারণ কলহ বিবাদ যে সুইস্‌দের মধ্যে নাই, এমন কথা বলা যায় না। প্রয়োজন হলেই তারা উকীলের শরণাপন্ন হয়। সুইস্‌রা যদিও বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান্ তথাপি তারা রোগ পীড়া হতে একেবারে মুক্ত নয়। গলগণ্ড জাতীয় রোগই এখানে বেশী প্রবল। এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যেই সাধারণত গলগণ্ড বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

ইহারা কাঠের খোদাই কার্য্যে, নানারূপ সুন্দর সুন্দর জরীর কার্য্যে এবং ঘড়ী প্রস্তুত কার্য্যে খুব সুনিপুণ। প্রত্যেক বৎসরেই জিনাভা (Geneva) এবং বার্ণনগরে (Berne) প্রকাণ্ড শিল্প প্রদর্শনী হয়; তাতে সুইস্‌জারল্যাণ্ডের প্রতি প্রদেশ থেকে নানারূপ উৎকৃষ্ট জিনিষের আমদানি হয়ে থাকে। অধিকাংশ সুইস্ প্রাপ্তবয়স্ক হলেই কোনরূপ শিল্প শিক্ষার জন্য কিছুকাল বিদেশে গিয়ে অতিবাহিত করে এবং শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত করে স্বদেশে ফিরে আসে। তখন তারা নিজের কারখানা খুলে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে, উপার্জ্জিত অর্থ কিরূপে সঞ্চয় করে রাখতে হয় তাও সুইসরা বিলক্ষণ জানে। সুইসদের মধ্যে একটি প্রবাদ চলিত আছে যে "একজন সুইস্‌কে ঠকাতে দশটা ইহুদীর (Jew) দরকার" এবং যেহেতু সুইস্‌দের মধ্যে জেনেভার লোকেরা বেশী চালাক সেইজন্য "একজন জেনেভিয়কে ঠকাতে দশটা সুইসের দরকার।"

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত

ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের একটী ঐতিহাসিক প্রমাণ

স্বদেশের ন্যায় মনুষ্যের আর কোন স্থানই অধিক প্রিয় নহে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই সুপ্রচলিত প্রবাদ বাক্যে স্বদেশ স্বর্গেরও উপরে স্থান পাইয়াছে। আর্য্যগণ আপনাদের অধিবাসস্থান হইতে যখন অন্যত্র বাসের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মনে যে জন্মভূমির মধুর স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহাদের অগ্রগতিতে তাঁহারা এই স্মৃতিই বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। এই অগ্রগতিতে তাঁহারা স্বদেশ হইতে যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন ততই স্বদেশ-স্মৃতি তাঁহাদের নিকট অধিক প্রিয় হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা স্বদেশের স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করিয়া আপনাদের স্বদেশবিচ্ছেদকষ্টের লাঘব করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই স্মৃতি-চিহ্ন এরূপই অক্ষয়াক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে যে

প্রস্তরাঙ্কিত লিপি অপেক্ষাও এই লিপি এখনও স্পষ্টতর দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়টী স্মৃতিচিহ্ন—কুরুজাঙ্গল, কুরাম্ (গিরিশঙ্কট) ও কারাকুরাম্ (পর্ব্বত মালা) নামে পরিচিত। কুরুজাঙ্গলের আদিতে আমরা যে কুরুশব্দের যোগ দেখিতে পাই—তাহা হইতেই বুঝিতে পারি যে কুরুনাম হইতেই ইহার উৎপত্তি। এই কুরুনাম আবার আর্য্যদিগের আদিনিবাস উত্তরকুরু নাম হইতেই আসিয়াছে। কুরাম্ ও কারাকুরাম্ যে কুরু শব্দেরই অপভ্রংশ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান্ হয়। পুরাণে আমরা উত্তরকুরুকে কুরু নামেও উল্লিখিত দেখিতে পাই। উভয়ই জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং উভয়ই যে অভিন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব উত্তরকুরু নাম হইতেই যে, কুরুজাঙ্গল, কুরাম্ ও কারাকুরাম্ প্রভৃতি নাম হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হয়। গ্রীকদিগের দ্বারা কুরুশব্দের বিকৃতিতেই কুরাম্ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—কারণ প্লিনির লেখায় উত্তরকুরু 'অত্তকোরম্' রূপে বিকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে! "প্লিনি 'অত্তকোরম্' নামে একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহার সহিত সংস্কৃত উত্তরকুরুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়॥"

এই প্রকারে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইলে পর যথায় তাঁহাদের নিষ্কণ্টক উপনিবেশ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহার নামও তাঁহারা স্বদেশের নামানুসারে 'কুরু' দেশ রাখেন। সুপ্রসিদ্ধ 'কুরুক্ষেত্র' এই কুরুদেশেরই বিভাগ বিশেষ। এই কুরুক্ষেত্র নামেও আর্য্যদিগের আদিনিবাস উত্তরকুরু বা কুরুর যোগই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পুরাণে 'কুরুক্ষেত্র' নামের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহাতে ইহা কুরুবংশীয়দিগের আদি পুরুষ কুরুনামক রাজকর্ত্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়াই এই নাম হইয়াছে জানিতে পারা যায়। ইহাতে অপর একটী ঐতিহাসিক সত্যেরও সন্ধান আমরা পাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আর্য্যগণ আপনাদের নবাবিষ্কৃত স্থান সকলেরই কেবল স্বদেশের নামে নামকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কিন্তু উত্তরকুরু বা কুরুর নামে তাঁহারা নিজেদের পরিচয় দিয়া তবেই সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উত্তরকুরুবাসী দিগেরই বংশধর তাহারই পরিচয় দিবার জন্যই তাঁহারা আপনাদিগকে কুরুনামে আখ্যাত করিলেন। কুরুনামক রাজাকে কুরুবংশের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করা হয়—তাহা অনুমানমূলক বলিয়াই মনে করা হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত রেগোজিন (Ragozin) এ সম্বন্ধে তদীয় 'বৈদিক ভারত' (Vedic India) নামক গ্রন্থে "এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্যই প্রতিপন্ন করিতেছে। এখানে আমরা সেই মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিতেছি;—

"তাঁহার (ত্রসদস্যুর) বংশীয় লোকেরা ক্রমে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কুরুনামে পরিচিত হইল। এই কুরুগণ দেশে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাকাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। এই নাম পরিবর্ত্তন যথারীতি

বংশ সম্বন্ধীয় একটী উপকথা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে কুরু, কুৎসের প্রদৌহিত্র ছিলেন এবং তিনি এরূপই মহীয়ান্ রাজা ছিলেন যে সমগ্র জাতিই তাঁহার নামেই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল"।(১)

ত্রসদস্যু কুৎসের দৌহিত্র ছিলেন। কুরু তাহা হইলে ত্রসদস্যুরই পুত্র হন। কুৎস ও ত্রসদস্যু উভয়ই বৈদিক নাম। কিন্তু কুরু-নামের কোন উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় না। অথচ ইহার স্বজাতীয় লোকসকলকে, মহাভারতে কুরু নামে অভিহিত দেখা যায়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে 'কুরু' নামটী ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না; সম্ভবতঃ উত্তরকুরুবাসী বলিয়া ইহা আর্য্যদিগের জাতীয় নামই ছিল। জাতীয় নাম বলিয়াই ইহার সম্বন্ধে আর কোন পূর্ণ বিবরণ দেখা যায় না।

এই কুরুগণ এরূপই প্রসিদ্ধিলাভ করেন যে বিদেশেও, ইহাদেরই নামানুসারে প্রাচীন ভারতবর্ষ 'কুরুদেশ' বলিয়া পরিচিত হয়। তাহাতেই আসিরিয়ার ইতিহাসে ভারতবর্ষকে আমরা কুর বা কুড় (Kur-kurra) নামে উল্লিখিত দেখিতে পাই। (২) প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমিও উত্তরকুরুকে ওত্তরকোর্হ লিখিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) আসিরীয়দিগের 'কুড়' ও টলেমির 'কোর্হ' এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্যই লক্ষিত হয়।

বর্ত্তমানে আমরা যেমন পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকদিগের স্বদেশের নামানুসারে নিউ ইংলণ্ড (New England), নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্ (New South Wales) প্রভৃতি উপনিবেশ স্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই; কুরুদেশও তদ্রূপ আর্য্যদিগের আদি জন্ম-ভূমি উত্তরকুরু বা কুরুর নামে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ।

"উত্তর কুরু" নামে পরিজ্ঞাত আর্য্যদিগের আদি নিবাস প্রথম "কুরু" নামেই কথিত হইত বলিয়া বোধ হয়। আমরা উত্তরকুরুর উল্লেখ পুরাণাদিতে যেখানে যেখানে পাই সেখানে সেখানেই 'উত্তর' বিশেষণটী কুরুর সঙ্গে একত্র যুক্ত না থাকিয়া ইহা হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, এবং কোনস্থানে আমরা 'উত্তর' বিশেষণ ছাড়া কেবল 'কুরু' শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাই। এখানে আমরা এক মৎস্য পুরাণেরই দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিব।

আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার এক

---

(১) "But his people gradually changed its name, and become known as the kurus, who take such a prominent positioa in the country as depicted in the great epics. This change of name is explained as usnal by a geneological fiction. Kuru, we are told, was a great-grandson of Kutsa and was so great a king that his entire people was hence forth named after him." Vedic India p. 333.

(২) See The Ruling races of Prehistoric times by J. F. Hewitt Vol. I Index p 596.

(৩) বিশ্বকোষ—"টলেমি ওত্তর কোর্হ (Ottaro Korrha) নামক একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সংস্কৃত উত্তরকুরু শব্দের রূপান্তর মাত্র।" (Ptolemy Geog Vi. 16).

স্থত্রে পৃথকভুক্ত বিশেষণের সহিত কুরু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—অপর স্থলে বিশেষণ নিরপেক্ষ হইয়া কেবল 'কুরু' শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে যথা :—

"ভদ্রাশ্বং ভারতঞ্চৈব কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥" ৪৪

মৎস্যপুরাণ ১১৩ অধ্যায়।

"উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণাদিক্রমে ভারত, ভদ্রশ্ব, কেতুমাল, ও পুণ্যাত্মা জনগণের বাস ভূমি উত্তর কুরুপ্রদেশ অবস্থিত।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

"উত্তরে চাস্য শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥" ৬৯

মৎস্যপুরাণ ১১৩ অধ্যায়।

'ইহার শৃঙ্গের উত্তরে দক্ষিণে সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত 'কুরু'বর্ষ ইহা পুণ্যসিদ্ধজনে নিষেবিত।"

ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আর্য্যদিগের মূলস্থান 'কুরু' নামেই প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ ছিল। পরে ভারতবর্ষে আর্য্যগণ তাঁহাদের মূল স্থানেরই নামানুসারে 'কুরুদেশ নামক উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেই তাহা হইতে তাঁহাদের মূল স্থানকে পৃথকভূত করিবার জন্যই তাঁহাদের উপনিবেশ হইতে ইহার অবস্থান উত্তরদিগ্বর্ত্তী বলিয়া উত্তর-দিগ্বাচী 'উত্তর' বিশেষণের যোগে ইহাকে 'উত্তরকুরু' আখ্যা দ্বারা বিশেষিত করা হয়। কোশলরাজ্যের 'উত্তর কোশল' আখ্যাও এই প্রকারেই উৎপন্ন দেখিতে পাই।

কুরুগণ যে ভারতীয় আর্য্য ঔপনিবেশিক-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন, বেদে আমরা কুরুবংশীয় যযাতির বংশধর যদু, অনু, তুর্ব্বসু প্রভৃতির উল্লেখ হইতেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। অপর কোন বংশীয় কাহারও আমরা এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য্য উপনিবেশ সকলের সন্নিবেশক্রম দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে "কুরু"দেশই প্রথম উপনিবেশ। ভারত-বর্ষের উত্তর পশ্চিম হইতেই যে আর্য্যগণ প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক সত্য।

মহর্ষি মনু তদীয় সংহিতায় আর্য্যাধিকারের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সত্যেরই পোষকতা পাওয়া যায়। তিনি যে প্রথম দুইটী আর্য্যাধিকারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাঞ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ" ॥ ১৯

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

'সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেব নদীর মধ্যস্থলে যে দেবনির্ম্মিত দেশ তাহা 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া কথিত হয়।'

'কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, (কান্যকুব্জ), মথুরা এই কয়টী 'ব্রহ্মর্ষি'দেশ। ইহা ব্রহ্মা-বর্ত্তেরই সন্নিধানবর্ত্তী।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণের 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' ও 'ব্রহ্মর্ষি' এই নামসাদৃশ্য এবং উভয়ের সবিশেষ নৈকট্য হইতে উভয়টিই যে মূলে একই উপনিবেশ ছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ শেষোক্ত শ্লোকের পর আমরা যে একটি

শ্লোক প্রাপ্ত হই তাহা হইতে ইহার যথেষ্ট সমর্থনই পাওয়া যায় যথা —

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং
সর্ব্বমানবাঃ" ॥২০

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

'এই দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবস্থার শিক্ষা করিবে।'

এস্থলে ব্রহ্মর্ষি দেশকে যে সকলদেশেরই আদর্শ ব'লিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতেও ইহা সর্ব্বাদি আর্য্যোপনিবেশ না হইলেও যে সর্ব্বপ্রধান আর্য্যোপনিবেশ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে আর্য্যদিগের উপনিবেশ অন্যত্র যেখানেই থাকুক্ না কেন ভারতবর্ষে কুরুদেশেই ইহা প্রথম দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ বেদ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্তে বা পঞ্জাবে বাসকালে আপনাদের অধিকার লইয়া প্রবল কলহে মত্ত ছিলেন—কেহই নিষ্কণ্টক অধিকার স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৈদিক পঞ্চজাতি ও দশ জাতির যুদ্ধের বর্ণনাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ।

প্রথম উপনিবেশেরই প্রতি যে একটা উচ্চ চিরশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা হইবে তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কুরুক্ষেত্র আর্য্যদিগের কেবল প্রথম উপনিবেশ ছিল তাহা নহে—পরন্তু ইহার নামের দ্বারা তাঁহাদিগের মাতৃভূমি উত্তরকুরুর সহিত সংযুক্ত থাকাতে ইহার প্রতি আরও অধিক শ্রদ্ধার ভাব পোষিত হইত; তাহাতেই ইহা তাঁহাদিগের নিকট পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই তাঁহাদিগের নিত্য জপনীয় স্নানমন্ত্রে তাঁহারা ইহাকে তাঁহাদের প্রথম পরমতীর্থরূপে স্মরণ করিয়া থাকেন যথাঃ—

"কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণিচ।
তীর্থন্যেতানি সর্ব্বাণি স্নানকালে ভবন্তীহ॥"

এই প্রকারে আর্য্যগণ তাঁহাদিগের আদি জন্মভূমির ইতিহাসের সহিত ভারতোপনিবেশের ইতিহাস আশ্চর্য্যরূপে সংগ্রথিত করতঃ ইহাকে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় করিয়া রাখিবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিজয়া দশমী *

এ কোন্ দশমীর তিথি? তাহা পূর্ব্ব সন্নিবিষ্ট বিশেষণেই প্রকাশ—বিজয়া দশমী। বার মাসে চব্বিশটি দশমী আসিয়া থাকে, তাহার মধ্যে তেইশটি নির্ব্বিশেষণ—একটি দশমী মাত্র জয়সঙ্কেতে পূর্ণ। পুষ্পবিকাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরোদ্গম হয় বসন্তানিল বহে; বৃষ্টিবর্ষণের পূর্ব্বে মেঘরাশি আকাশে পুঞ্জীভূত হয়, বিদ্যুৎ চমকায়; ধূমোদ্গমের পূর্ব্বে

* মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে তাঁহার 'মর্য্যাদা' নামক হিন্দী মাসিক পত্রিকার জন্য ইহা লিখিত হয়। 'হিন্দী' পত্রিকার পাঠক ও বাঙ্গলা পত্রিকার পাঠক এক নহে, সেইজন্য ইহা ভারতীতেও প্রকাশিত হইতেছে।

অরণিতে অগ্নির আবির্ভাব হয়। এইরূপে কার্য্যকারণ প্রায়শঃ ঘটনাপারম্পর্য্যে আত্মবিকাশ করে। বিজয়াদশমী উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন্ জাতীয় অনুষ্ঠান দেখা যায়? কাহার পশ্চাতে এই জয়দায়িনী দশমীর অভ্যুদয়—তাহার দিকে ফিরিয়া দেখ। মহালয়া—অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণই বিজয়ার পূর্ব্বগামী মহানুষ্ঠান।

হে হিন্দু এ তথ্যের গভীরতা ও সার্থকতা-বিষয়ে ধ্যানশূন্য হইও না। যদি বিজয় চাও, যদি তেইশবার নিষ্ফল হইয়াও চব্বিশ বারের বারও অন্ততঃ সফলতা কামনা কর তবে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তির ধ্যানে অবগাহিত হও, সেই সকল মহৎকার্য্যকলাপের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হও, বিশ্বাস কর যে সে সকল তোমার আমার মত রক্তমাংসের শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণের দ্বারা তাঁহাদের তর্পণ কর। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, কেবলমাত্র ভৌতিক পিণ্ড ও জলদান করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিও না। তদপেক্ষা কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনা গ্রহণ কর। প্রথমতঃ জান তাঁহাদের কীর্ত্তিমার্গ কোন্ কোন্ দিশায় রেখা কাটিয়া গিয়াছে, জাতীয় ইতিহাসের অনুশীলন, অনুসন্ধান ও গঠন কর। তারপর সেই ঐতিহাসিক অতীতকে বর্ত্তমানে সত্য করিয়া তোল। তেমনি সাহসিক, তেমনি বাণিজ্যদক্ষ, তেমনি সুনাবিক, তেমনি দিগ্বিজয়ী, তেমনি সহিষ্ণু, জ্ঞানী, তেমনি কর্ম্মী হও। তাঁহাদের মার্গানুসরণ—তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহাদের প্রকৃত উপাসনা, তাঁহাদের প্রতি প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা।

জানিও এই পিতৃপূজার প্রভাবেই জাপানীরা এত বড় স্বদেশভক্ত, সফলপ্রয়াস ও বিজয়শালী জাতি হইয়াছে। তোমরাও পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণের মরা কাঠামোখানা ফেলিয়া তাঁর জীবন্ত প্রাণের ভিতর পৌছাও। এই পূর্ব্বপুরুষ প্রীতি ও পূর্ব্বপুরুষ তর্পণেচ্ছা তোমাদের মাতৃভূমির জন্য সমস্ত কার্য্যে প্রেরণা দান করুক্। যে সকল বড় বড় মহাপুরুষেরা এই ভারতভূমে লয় পাইয়াছেন—রাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌতম, কৌটিল্য, অশোক প্রভৃতি—তাঁহাদের তেজের অংশ আবার তোমার শরীরে ও আত্মায়, তোমার কার্য্যে ও ভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে এই তোমার উচ্চ অভিলাষ হউক, তাঁহাদের আদর্শে পরিক্ষীণ হইবে না—এই মহা লক্ষ্য হউক। পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পার, কিন্তু যতবার পড়িবে আবার উঠিবে, আবার সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি উৎপতিত করিবে—এই চেষ্টা, এই দুরূহ বাসনাই তোমাকে জাতীয় মৃতকল্প অবস্থায় সঞ্জীবিত রাখুক্। তাঁহাদের তর্পণ, তাঁহাদের প্রসন্নতা, তাঁহাদের অভিনন্দন মাথায় রাখিয়া অগ্রসর হও; যদি ইহা পার তবে এই পুণ্য দশমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় বিজয়শ্রী তোমারও করতলগত হইবেন। বৎসরান্তে একবার ভাবিও, কি করিলাম? তাঁহাদের পথে চলিয়াছি কি? কি কেবল নিজেরই সঙ্কীর্ণ স্বার্থের চক্রে ঘুরিয়া মরিয়াছি? বিজয়পথের যাত্রী হইয়াছি কি পরাজয় কোটরে আবদ্ধ আছি?

শ্রীসরলা দেবী।

কেল্লা বোকাই নগর

(১)

ময়মনসিংহ জিলায় বোকাই নগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ সহর হইতে উহা ১৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। একদিন যে স্থান ধনে, জনে, ঐশ্বর্য্যে ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিল এক্ষণে তাহার সে শোভা সমৃদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে। শত শত লোকের কোলাহলে যে স্থান সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত এখন তাহা সম্পূর্ণ নীরব। সেই প্রাচীনতার নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীর, গৃহভিত্তি, সেতু, বুরুজ প্রভৃতি দুর্গের কঙ্কাল চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যে স্থানে বহুতর শিল্পী, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারীর আবাস ছিল এক্ষণে তথায় কতিপয় দূরবস্থ মুসলমান মাত্র বাস করিতেছে। কালের গতি এইরূপই পরিবর্ত্তনশীল।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেলের ১৭৭৯খ্রীঃ অব্দকৃত মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটে বোকাই নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালের আবর্ত্তনে এক্ষণে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রায় ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াছে। কোন্ সময়ে বোকাইনগর স্থাপিত হয় তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। ইতিহাস আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইক্তার উদ্দিন উজবেগ তুগ্রল খাঁ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলে কামরূপরাজ পলায়ন করেন। এই সময় কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গারো পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে সুসঙ্গ, মদনপুর ও বোকাই নগর প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। পলায়মান কামরূপাধিপতি পরে তুগ্রল খাঁকে হত্যা করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু গারো পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগ আর শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি তখন ভূক্রা নামে অভিহিত হইত। অসভ্য কোচ গারো, হাজং প্রভৃতিই এই সমস্ত স্থানের অধীশ্বর ছিল। বোকাই নগরে প্রতাপশালী অধীশ্বরের নাম বোকা কোচ ছিল। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম বোকাইনগর হইয়াছে। সেই জ্ঞানালোক শূন্য অসভ্য ভূপতির হৃদয়ে যে মহত্ব বিরাজিত ছিল, বর্ত্তমান কালে অনেক জ্ঞানগর্ব্বিত সভ্যতাভিমানীরও তাহা দেখা যায় না। বোকা কোচের পর কোচ বংশীয় আরও কেহ রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে ভালরূপ অবগত হওয়া যায় না।

বোকাইনগর ময়মনসিংহ পরগণার অন্তর্গত খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকেরা বঙ্গদেশে শাসন বিস্তার আরম্ভ করেন। এই সময় খিজিরপুরের দেওয়ান ঈশা খাঁ পরগণা ময়মনসিংহ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে এতদ্ অঞ্চল কম্পিত থাকিত। ঈশা খাঁ কখনও স্বাধীন ভাবে কখনও মোগলের অধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা

করিতেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সময় বঙ্গীয় ভূক্রাগণের বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া উঠে। জনপ্রবাদে জানা যায় যে এই সময় খাজে ওসমান নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ একদল সৈন্য লইয়া ব্রহ্মপুত্রের উপকণ্ঠ বোকাইনগরে ছাউনী স্থাপন করে। শত্রুর দুষ্প্রবেশ্য করিবার জন্য ক্রমে এই স্থান দুর্গরূপে নির্ম্মিত হয়। খাজে ওসমানই এই দুর্গের স্থাপয়িতা। সৈন্যাবাস স্থাপিত হইলে পর একটী কাননগুর কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। বোধ হয় ভূক্রাগণের কার্য্যকলাপ দর্শন ও ক্রমে এতদ্দেশ অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিবার মানসেই মোগলরাজ এইরূপ একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণ লইয়া ঈশাখাঁর সহিত মোগল রাজের কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। গ্রামটির দৈর্ঘ্য অনুমান একক্রোশ ও প্রস্থ অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইবে। তন্মধ্যে কেল্লার স্থানটী অর্দ্ধবর্গ মাইলের কম হইবে না। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত উচ্চ মৃৎ প্রাচীর ও সুগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন বিদ্যমান, কিন্তু পরিখার নিম্ন ভূমি শুষ্ক হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদ বোকাই নগরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এখনও এমন পল্লীবৃদ্ধ জীবিত আছেন, যাঁহারা ময়মনসিংহ নগরের ছয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত রাজগঞ্জ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত দেখিয়াছেন। অতএব এইরূপ গতি পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। সে সময়ে ব্রহ্মপুত্রের এক ক্ষুদ্র শাখা কেল্লার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা এখন বড় বিলা নামে পরিচিত। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উহাতে জল থাকে না। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পারে দুইটী করিয়া চারিটী মাটীর স্তূপ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকেরা ঐ গুলিকে বুরুজ বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উহাদের উপরিভাগে স্থাপিত কামান শ্রেণীর মধ্যে কালু ও ফতু নামক অতি বৃহৎ দুইটী তোপ ছিল। দুর্গের আরও কয়েকটী বুরুজের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। দুর্গের পার্শ্বে যে একটী উচ্চ ভূমি দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে ঐ স্থানে কেল্লাদারের আবাস ও দেওয়ানখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উলুবনে আবৃত কিন্তু তবুও স্থানটীর বিশেষত্ব বুঝা যায়।

বাদসাহ সাজাহানের রাজত্ব সময়ে সাহিন খাঁ নামক জনৈক কেল্লাদার দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। কেল্লাদার সেকালের ফৌজদারের ন্যায় রাজ সম্মান পাইত। কেল্লা হইতে বহির্গত হইবার সময় তাঁহার সম্মানার্থ আড়ানী, ছাতা ও তুরিভেরী প্রভৃতিও সঙ্গে যাইত। কেল্লাদার সাহিন খাঁর প্রতিষ্ঠিত একটী মস্‌জিদ অদ্যাপি অতীত কালের সাক্ষ্য দিতেছে। মস্‌জিদটী বহুকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে পার্শ্বের একটী দেওয়াল ব্যতীত সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছে। প্রাচীন ইষ্টক গুলি অতীব দৃঢ়। দেওয়ালের বহির্দ্দেশে ইষ্টক গুলির গাত্রে এক প্রকার প্রলেপ আছে। ইহা ঠিক চীনে মাটীর প্রলেপের মত দেখা যায়। বোধ হয় ইহাই

কোন স্থানের আস্তর ছিল। এইরূপ সুন্দর ইট ২।১ খানি ময়মনসিংহের সাহিত্যপরিষদে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মস্‌জিদ্‌টীর দ্বারদেশে অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারে "লা এলাহা ইলাল্লাহ্ মহম্মেদো রসুল উল্লাহ ……… দরজমানে বাদশা সাজাহান" এই কথাগুলি পারস্য অক্ষরে ক্ষোদিত ছিল। অধিবাসীগণ প্রাচীন কীৰ্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক কতক দূর সংস্কৃত করেন। কিন্তু বর্ষার প্রাবল্যে নূতন নির্ম্মিত স্থান পুনরায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে একটী প্রাচীন দেওয়াল ও কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ মাত্র রহিয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখস্থ বৃহৎ দীর্ঘিকাটীর জল বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ব্যবহারোপযোগী হয় না। সাধারণের নিকট ইহা "সাহিন খাঁর তালাও" বলিয়া পরিচিত। সাহিন খাঁ মুসলমান রীতি অতিক্রম করিয়া মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে এই জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ও সহধর্ম্মিণীগণ এই ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় মস্‌জিদের পূর্ব্বদিকে আরও একটী পুষ্করিণী খনন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুইটি দীর্ঘিকাই একরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মস্‌জিদের পশ্চিম দিকের পুষ্করিণীর পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র মঠ কালের কঠোর হস্ত হইতে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার গঠনপারিপাট্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর। বটবৃক্ষের তাণ্ডবে মন্দিরটি ফাটিয়াছে কিন্তু তবুও ইষ্টকগুলি জমাট অবস্থায় আছে। "চান্দের তালাও" নামে আর একটি পুষ্করিণী এই মন্দির পার্শ্বে রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন চাঁদ রায় নামে কোন এক হিন্দু সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। আবার কাহারও মতে পরগণা ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র চান্দ রায় এই মঠ স্থাপিত করেন। ইহাতে কোন বিগ্রহ ছিল কি না তৎ সম্বন্ধে নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

চাঁদের মন্দির—বোকাই নগর
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঠাকুর কর্ত্তৃক গৃহীত।

ছিল। এই মন্দিরটী দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৮ হাত। মুসলমান অধিকার সময়ে যে বোকাই নগরে এইটি স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ সম্ভব মনে হয় না। বোধ হয় তাহার পরবর্ত্তী সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল।

(কুমার) শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

'সমসাময়িক ভারত' ও 'ইংরাজের কথা'

(সমালোচনা)

ইতিহাস, অর্থনীতি ও প্রত্নতত্ত্বের লেখকগণের মধ্যে অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি পঞ্চবিংশ খণ্ডে সমাপ্য 'সমসাময়িক ভারত' নামক এক বৃহৎ গ্রন্থাবলী প্রণয়নে ব্রতী হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

এই গ্রন্থাবলী চারিটী কল্পে বিভক্ত হইবে। প্রথম কল্প সাতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া মেগস্থেনিস প্রমুখ গ্রীক ও রোমান লেখকগণ প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যে সকল মুল্যবান বৃত্তান্ত বলিয়া গিয়াছেন, উপযুক্ত পাদটীকা ও মানচিত্র প্রভৃতিসহ তাহাই বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয় কল্পে বহুচিত্র সুশোভিত চৈনিক পরিব্রাজকগণের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত ও তৃতীয় কল্পে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের এবং চতুর্থ কল্পে ইউরোপীয়ান পর্য্যটকগণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইবে। মাননীয় কাশিম বাজারাধিপতি দ্বিতীয় কল্পের ছবির ব্যয়ভার বহন করিবেন। ব্যাপার প্রকৃতই বিরাট।

আমরা আপাততঃ সমালোচনার্থ দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিশ্বকোষপ্রণেতা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। প্রথম খণ্ডে ৩১জন গ্রীক ও রোমান লেখকগণের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথাযথ পাদটীকা দ্বারা গ্রন্থখানি সুশোভিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিবেদনে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মেগস্থেনিসের মুল্যবান বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতের একখানি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সুদীর্ঘ ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবতারিত হইয়াছে।

প্রথম দুইখণ্ড দেখিয়া আমাদের স্পষ্টই মনে হয় যে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইলে লেখক বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত পুষ্টিসাধনে সক্ষম হইবেন। আমরা কায়মনোবাক্যে গ্রন্থকারের সফলতা প্রার্থনা করি। এবং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই গ্রন্থাবলী ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

দুইখণ্ড সমসাময়িক ভারতের সহিত আমরা গ্রন্থকারের ইংরাজের কথা নামক একখানি গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজীতে যেমন Readings from History আছে—এই গ্রন্থে সেই অনুকরণে ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের সমাবেশ হইয়াছে। ইতিহাসজ্ঞ ও সাধারণ পাঠক উভয়েই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিবেন। রচনাগুলির মধ্যে গ্রন্থকারের পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য ইহার দ্বাদশ খানি ছবি। ছবিগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। ইহার কয়েকখানি ভারতীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ছবিগুলির সংগ্রহে যে গ্রন্থকারকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

গ্রন্থখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত।

শবরী

(রামায়ণী কথা)

শবরী চণ্ডালকন্যা। সে যে কি করিয়া ঋষিদের আশ্রম তপোবনে আশ্রয় পাইল, সে কথা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আশ্রমবাসী ঋষিরা, কুমারী-কুমাররা, অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীরা, কেহই তাহার দিকে চাহিয়া দেখিত না, ডাকিয়া শুধাইত না।

সদ্যঃস্নাত শুভ্রপূত ঋষিকুমারগণ মধুর মন্ত্রগাথা গাহিতে গাহিতে পম্পাতীরে কাশস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে আশ্রম-ধেনু চরাইতে যাইত; কোন দিন পথে, কোন দিন বা মাঠেই শবরীর সঙ্গে দেখা হইত। শুধু দেখাই মাত্র, তাহারা হেলাভরে চলিয়া যাইত। শবরী পথের পাশে সন্তর্পণে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। হোমের ইন্ধন বহিয়া, কাশের গুচ্ছ বাঁধিয়া যখন তাহারা আশ্রম কুটীরে ফিরিত, শবরী তখন আরও দূরে তমালের আড়ালে আপনাকে লুকাইত। আশ্রম কুমারীরা সখীতে সখীতে তরু-আলবালে সলিল সিঞ্চন করিত, শবরী শুধু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। স্নানের সময় কুমারীদল পম্পাপথ মুখর করিয়া মৃণ্ময় কলসী বহিয়া চলিয়া যাইত। তাহাদের শিথিল কবরী হইতে পথে পথে কোমল শিরীষগুচ্ছ ঝরিয়া পড়িত, বাহু যুগল বল্কলবাস মাঝে মাঝে খসাইয়া দিত, ইঙ্গুদি-তৈল গন্ধবিধুর পথের আকাশ বারেক মূর্চ্ছনাবিভোর হইয়া পড়িত, শবরী ধীরে ধীরে পর্ণকুটীরখানির দ্বার অর্দ্ধমুক্ত করিয়া অলক্ষ্যে শুধু দেখিত। আপনার মৃৎকলসীটি টানিয়া কোলে তুলিয়া লইত। কলসীর সাধ পূর্ণ হইত, নয়নজলে ভরিয়া সে আবার আপন স্থানে আসিয়া বসিত।

এমনি করিয়া মানবপ্রকৃতি শবরীর বাল্যজীবনের উপর আপনার কঠিন দণ্ড প্রচার করিল।

কৃত্রিমতা শবরীকে যতই দূরে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল, অন্তরের দেবতা ততই তাহাকে আপনার শুভ্র কোলে টানিয়া লইতে লাগিলেন।

আকাশে ঢাকা শব্দময়ী ধরণী যে সঙ্গতির মাঝারে আপনার বিশ্রামবাসর রচনা করিয়াছে, সেই সঙ্গতির অনাহত রাগিনীর ঝঙ্কার শবরীর কণ্ঠ পূর্ণ করিয়া দিল। শবরী দিন দিন সেই আশ্রম-প্রকৃতির অন্তরে আপন পুণ্যগীতির ধারা ছড়াইতে লাগিল।

মানুষের গড়া শাসন, গড়া বন্ধন শবরীকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে আপন গীতি-তরঙ্গে আপনি ভাসিয়া চলিল; অন্যকেও ভাসাইবার জন্য ব্যাকুল হইল।

যে ঋষিকুমারদের দেখিয়া সে একদিন সন্তর্পণে পথপ্রান্তে তৃণটি হইয়া সরিয়া দাঁড়াইত, শবরী আজ আর তাহা করিল না, সকলকে আপন কুটীরে আহ্বান করিতে ছুটিল। যে তমালের আড়াল একদিন তাহাকে আশ্রম-কুমারীদের চকিত নয়নের আড়ালে লুকাইয়া রাখিত, আজ আর সে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না। শবরী তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিল।

কিন্তু বন্ধুত্ব অনাদৃত হইয়া ফিরিল।

শবরী তখন গোপনে আশ্রম-পিতা ঋষিদের নীরব সেবায় রত হইল। সে সেবা দূর হইতে—কেন না সে যে চণ্ডাল!

নিশার পাখী পম্পাপথে শালতমালের শাখে বসিয়া বনফল ভক্ষণ করিত। ভোজনের শেষ পথের মাঝে ভুক্তাবশেষ ছড়াইয়া যাইত। ঊষার আলোক ফুটিতে না ফুটিতে শবরী কুটীর ত্যাগ করিয়া আপন হাতে পম্পাপথ পরিষ্কার করিত। কেহ জানিত না, দেখিত না, দেখিয়াছিলেন একজন, চিনিয়াছিলেন একজন, ঋষি মতঙ্গ। তিনি শবরীর দীক্ষাগুরু হইলেন। শবরীর প্রিয় দর্শনের পথ তিনি দেখাইয়া দিলেন।

দেওয়ার সার্থকতা পাওয়াতে নয়, দেওয়াতেই। শবরী সেই মন্ত্রেরই ত সাধক। এই মন্ত্রেই তাহার আসন পাতা হইয়াছে। বাসরের ফুল ফুটিয়াছে, প্রিয়তম আসিবেন।

প্রিয়তম আসিলেন, চণ্ডাল শবরীর চণ্ডালত্ব ঘুচিয়া গেল। পম্পায় পাপের রক্তিমস্পর্শ শ্যামতনুর অবগাহনে আবার পবিত্র হইল। মানুষের গড়া অনার্য্যত্ব—ভেদের শৃঙ্খল, ভেদের বেড়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই অধর্ম্ম নাশের জন্যই ত দেবীর চণ্ডালত্বের অভিনয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রভাতে *

গড়িয়ে যায় গো হৃদয় আমার
নীল আকাশের গায়
সকল ফেলে', পাগল সে আজ
কোথায়—কি ধন চায়?
সাগর আসে লহর তুলি'
আমার কোলের কাছে,
কিরণমাখা ঢেউগুলি, মোর
জ্বল্‌ছে বুকের মাঝে;
অমল ঊষা হিরণ আভা
ঢাল্‌ছে জগৎ ব্যেপে';
পাল ফুলিয়ে মনের তরী
চল্‌ল কোথায় কেঁপে'?

স্নিগ্ধ মধুর বইছে বাতাস;
স্বচ্ছ গগন-গায়
এমন করে' উধাও হ'য়ে
এ মন কোথায় ধায়?

* * *

আজকে তৃষার পাইনা সীমা!—
আপনা-বিভোর আমি,
সোনার ঊষার সুখ-সায়রে
তলিয়ে যাইগো নামি'!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

* পুরী, পাথার প্রান্তে রচিত।

সমালোচনা

আকাশের গল্প। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য পাঁচ সিকা। এই গ্রন্থে আকাশস্থিত জ্যোতিষ্কাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষা স্পষ্ট, সহজ ও সরল। পুস্তকখানি রচনার গুণে সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য্য প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, "গ্রন্থকার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অভাব দূর করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র।" তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসার্হ। লঘু সাহিত্য লইয়া মজিয়া থাকা জাতীয়তার পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে, তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়া বিজ্ঞান বা দর্শনাদি বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গসাহিত্য চিরদিন ঋণী থাকিবে। বালকগণের জন্য রচিত হইলেও সাধারণ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জগতের বহু অজ্ঞাত কাহিনীর পরিচয় লাভ করিবেন। গ্রন্থকার এক অজানা লোকের চাবি খুলিয়া দিয়া একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে; সেগুলি যে বিষয়-বোধে যথেষ্ট সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরব জাতির ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শেখ মফিজ উদ্দিন আহমদ, দলগ্রাম, পোঃ তুষভাণ্ডার, রংপুর। কলিকাতা ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ মাত্র। এখানি সৈয়দ আমির আলি রচিত History of the Saracens গ্রন্থের অনুবাদ—প্রথম খণ্ডের সমালোচনা পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানি দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ড পরে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। এই খণ্ডে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের ইতিবৃত্ত, তাঁহাদের শাসননীতি প্রভৃতি সঙ্কলিত হইয়াছে। অনুবাদকের সাহিত্যানুরাগ প্রশংসার্হ। তাঁহার ভাষাও ভাল, অনুবাদ বলিয়া কোথাও মনে হয় না। ছাপা কাগজ পরিষ্কার। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

মন্দিরা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। চট্টগ্রাম, চট্টেশ্বরী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক।

নারী পঞ্চ-চত্বারিংশ। শ্রীমতী শরৎকুমারী সিংহ কর্ত্তৃক বিরচিত। কানপুর, মলরোড, শান্তি-আশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কয়েকটি উপদেশ গদ্যে-পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখিকার উদ্দেশ্য সাধু। এ গ্রন্থ বালিকাদিগের পাঠ্যস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি।

আদর্শ লিপিমালা। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, বণিক প্রেসে মুদ্রিত মূল্য এক টাকা। পত্র-লিখন-প্রণালী শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজী Letter-Writerএর আদর্শে এই গ্রন্থখানি রচিত। এই গ্রন্থে "পত্রলেখন-প্রণালীর" যে ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে—সেটুকু বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও উপভোগ্য হইয়াছে। তবে "পারিবারিক পত্রের আদর্শ" বিভাগে যে সকল পত্রের নমুনা দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। সরলতা ও সহজ মুক্ত-প্রাণতাই পত্রের প্রাণ, বিশেষতঃ পারিবারিক সম্পর্কে। সেখানেও যদি পণ্ডিতী ভাষার প্রচলন হয়, তবে আর দুঃখের সীমা থাকে না। স্ত্রীকে যদি এ কালে "ভবদীয় প্রণয়াভিমানিনী" "মমাশ্রয়েষু" বলিয়া স্বামীর নিকট পত্র লিখিতে হয়, তাহা হইলে অভিধান খুলিয়া লেখা ভিন্ন উপায় নাই। লেখক মহাশয় কি তাহারই সমর্থন করেন? গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে বঙ্গের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির পত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, সরল ভাবই তাঁহাদের পত্রের প্রাণ। পরস্পরের

মধ্যে বঙ্গভাষায় চিঠিপত্র লিখিবার প্রথার তেমন প্রচলন নাই বলিয়া লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পিতা পুত্রের নিকট পত্র লিখিতেও মাতৃভাষা বর্জ্জন করেন। ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের কথা কি হইতে পারে?" কথাটা ঠিক—খুবই ঠিক! গ্রন্থের ছাপা কাগজ বেশ হইয়াছে।

সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনীয়সের আত্মচিন্তা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ কর্তৃক অনুবাদিত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা। ভারতমহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। প্রাচীন রোমের সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনীয়স আদর্শ নৃপতি ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী লেখক রেণাঁর মতে "তিনি মানব প্রকৃতির গৌরবস্বরূপ ছিলেন; কোনও বিপ্লব, কোনও উন্নতি কোনও আবিষ্ক্রিয়াই তাঁহার ধর্ম্মকে পরিম্লান করিতে পারিবে না।" তাঁহার ধর্ম্মও ছিল বিশ্বজনীন। ভারতীয় মহাজনপ্রোক্ত অনুশাসনের সহিত তাঁহার উক্তির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। মূল গ্রন্থ গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। রজনী বাবু মূল গ্রীক্ হইতে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সূচনাতে রজনীবাবু সম্রাটের জীবনী ও ষ্টয়িক দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন; পরে সম্রাটের উক্তিগুলির অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সাধু বিষয়ের গাম্ভীর্য্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরিশিষ্টের ভারতীয় সাহিত্য হইতে সম্রাটের উক্তির অনুরূপ শ্লোকাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা রজনী বাবুর সাহিত্যানুরাগের যেমন পরিচয় পাইয়াছি, তেমনই তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভালো। এ গ্রন্থের সমাদর বাঞ্ছনীয়।

কবিতা-প্রসূন। শ্রীযুক্ত বলহরি ঘোষ প্রণীত। কাটোয়া এডওয়ার্ড প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীসুধাহরি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। ইহা কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতার না আছে ভাব, ছন্দে না আছে সুর,—তবু কবিতা লিখিতে হইবে! এ বিড়ম্বনা কেন?

আমার অশ্রুমালা। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। হাওড়া কর্ম্মযোগ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-পুস্তক। পত্নীবিয়োগ-বেদনায় অধীর কবির মর্ম্মোচ্ছ্বাস! এইরূপ অসংযত হা-হুতাশ ও শোকাতুর প্রলাপ দরবারে বাহির না করিলেই ভাল হইত। শোক পবিত্র; তাই এ গ্রন্থের অধিক আলোচনা করিলাম না। ভগবান লেখককে প্রকৃতিস্থ করুন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

শুক-শূদ্রক-পরিচয়।
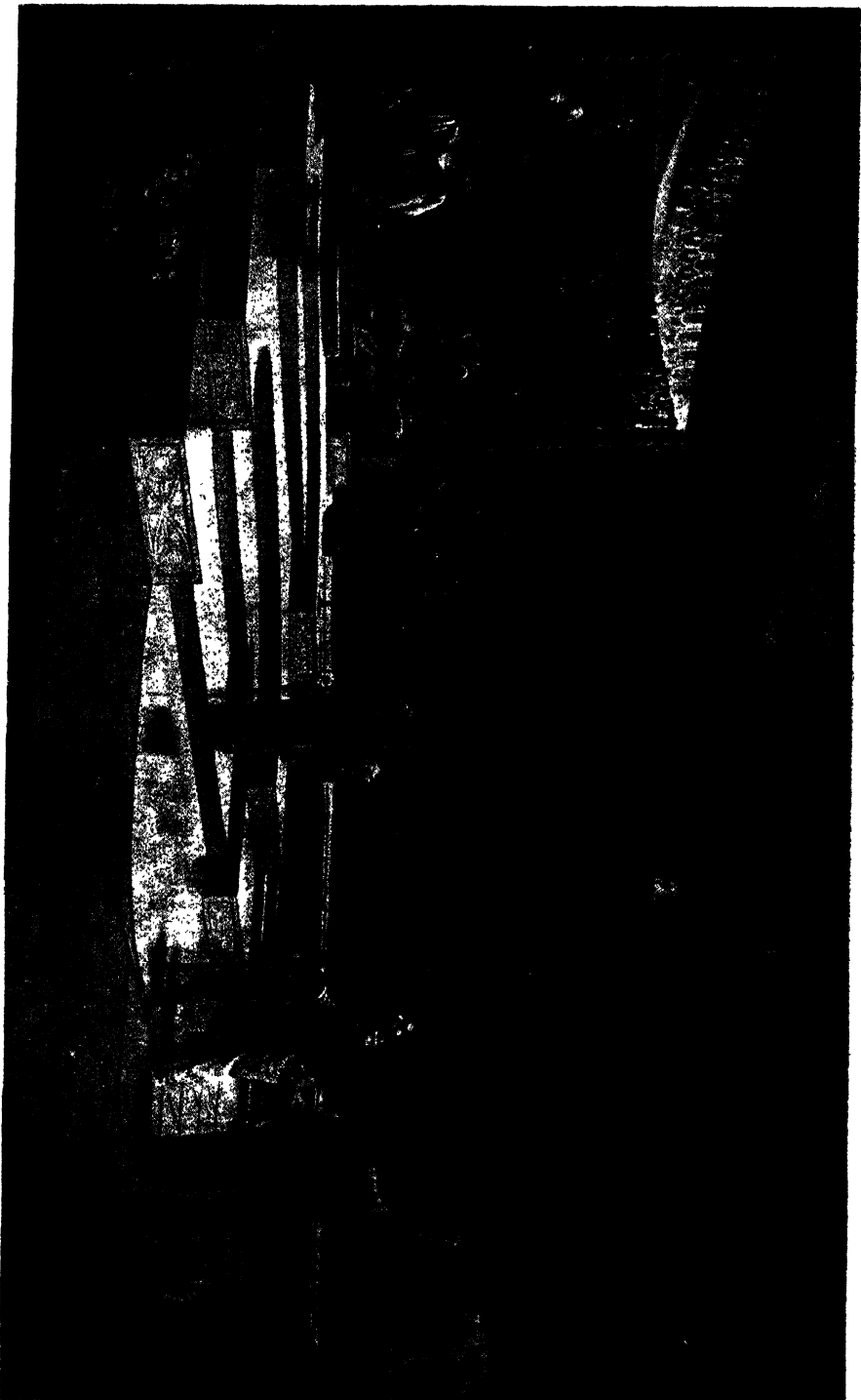
ভারতী

৩৭শ বর্ষ]　　　পৌষ, ১৩২০　　　[৯ম সংখ্যা

বাগ্‌দত্তা

(৪৪)

অত্যন্ত উত্তেজনার পরেই একটা গভীর অবসাদের আক্রমণ অনিবার্য্য। যুদ্ধের সময় যতটুকু উদ্দীপনা সৈনিক হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে যুদ্ধ জয়ের পর সেরূপ থাকে না, তখন হয়ত শোণিত-প্লাবিত রণভূমের ভয়ানক দৃশ্য তাহার কম্পিত জয়োল্লাসের মধ্যে একটা অতি তীব্র অনুশোচনা জাগাইয়া তোলে। শচীকান্তের অবস্থা প্রায় এইরূপই দাঁড়াইয়াছে।

বরবেশে গাড়িতে বসিয়া সে কেবল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে গতিশীল বহির্জগতের দিকে চাহিয়া রহিল। পৃথিবীটা যেন প্রলয়ের সূচনা লইয়া মহাবেগে ছুটিতেছে;—পথঘাট, গাছ ধূমাস্পষ্ট জলাভূমি সব সেই বেগের সহিত ছুটিয়া চলিয়াছে! সে চমকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, নিজেও যেন সে কাহার কঠিন মুষ্টি মধ্যে ধৃত হইয়া তেমনই বেগে আকৃষ্ট হইতেছিল,—থামিবার শক্তি নাই! গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে দুইটা পুলিসের লোককে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে সহসা কাঁপিয়া উঠিল,—তাহারা যেন তাহাকে ধরিবার জন্যই কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে—এইরূপ যেন সহসা তাহার মনে হইল। গোশকটমাত্র বরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—সে গাড়িতে না উঠিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া ষ্টেশনের একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইল। হিমে থামটা শীতল হইয়া রহিয়াছে, তাহার ললাটের ঘর্ম্ম যেন অকস্মাৎ সেই শীতলস্পর্শে জমিয়া আসিল, শিশির ডাকিল "এসো হে বর!" শচীকান্ত তাহার অসহায় দৃষ্টি কোনমতে তাহার দিকে ফিরাইল "এখনও এ বিয়ে বন্ধ করা যায় না শিশির?"

"পাগল!"

"শোন শিশির,—না ভাই চেষ্টা কর, কাজ নাই—কি জানি কি উচিত ঠিক বুঝতে পারচিনে যে।"

শিশির একটা তামাসা করিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইল, সবিস্ময়ে শুধু তাহার হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল "অসুস্থ বোধ কর তো এসে গাড়িতে একটু শুয়ে পড়ো—সেরে যাবে।"

দুর্ব্বল শিশুর মত সে নীরবে আজ্ঞা পালন করিল, শরীরে বা মনে এতটুকু বল ছিল না যে যদ্দ্বারা ইহার বিপরীত কিছু করিতে পারে।

শিশির পাশে বসিয়া কত কথা বলিল, সভয় প্রশ্নে বারম্বার কুশল জিজ্ঞাসা করিল সে কোন জবাব করিতেও সক্ষম হইল না, কেবলই তাহার মনে হইতেছিল কে যেন তাহাকে সেই অন্ধকারের ছায়ায় ছায়ায় অনুসরণ করিতে চলিয়াছে, সেই অদৃশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার অন্তঃস্থল ভেদ করিতে লাগিল এবং একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

তারপর সমুদয় বাধা বিপত্তি একদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টি হয় নাই, কনের সলজ্জ নেত্র পিপাসু বরের নেত্রে তড়িৎস্ফুরণ করিল না। এতই বুঝি সে আত্মহারা হইয়াছিল যে পাছে তাহার আনন্দ ব্যক্ত হইয়া যায় তাই সাহস করিয়া চাহিতে পারে নাই! কিন্তু বিবাহ মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইতেই সর্পদংষ্ট্রবৎ কন্যা অকস্মাৎ ঝড়মড়িয়া অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিল, পার্শ্ববর্ত্তীর পানে দুইনেত্র বিস্তৃত করিয়া চাহিল, তারপর সহসা তাহার মস্তক সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, সে পতনোন্মুখ হইল।

যখন বিবাহ হইল তখন লগ্নের কোন চিহ্নই ছিল না, শুক্রতারা তখন নিবিয়া গিয়াছে, এবং সোনায় মেশানো শ্বেত বসনের ঘোমটাপরা উষা তাহার বিস্মিত চক্ষু মেলিয়া রক্তবসনা কনের চন্দন চর্চ্চিত মুখের মৃত্যুবিবর্ণতা সন্দর্শন করিয়া সহানুভূতির শিশিরাশ্রু মোচন করিতেছিলেন। যখন করালীচরণ বীতসংজ্ঞ, কমলার হিম হস্ত টানিয়া আনিয়া বরের শিথিল করে স্থাপন পূর্ব্বক সম্প্রদানমন্ত্র পাঠ করিল, তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ শিহরিয়া বর সেই হাত খানা নিজের হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়া ডাকিল "শিশির!"

ছিঃ, কি করচো শচি!"

"না ভাই না, আমায় রক্ষা কর, তোমরা জানোনা আমি—"

"ক্ষেপে গেলে নাকি! বসো বসো আর সময় নাই, সূর্য্য ওঠে বলে।" প্রায় তাহাকে চাপিয়া বসাইয়া শিশির তাহার পার্শ্বে বসিল, অস্ফুট স্বরে সে আত্মগত কহিল "কি পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে! মেয়ের চিরকালে হিষ্টিরিয়া আছে, ভয় কি!"

গৃহে ফিরিয়াও সে দ্বিধা সে সঙ্কোচ কাটিল না, নববধূর কথা ভাবিতে গেলেই কেবল সেই রক্তহীন অচেতন মুখ ও তাহার হিমশীতল স্পর্শ মনে পড়িয়া একটা অশান্তির সঞ্চার করে, তথাপি মনের নিভৃতে একটা সুখের আলোও ফুটিয়া উঠিয়াছে, সাধনার ধন আজ প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে।

সেদিন প্রথম ফাল্গুনের ঈষৎ শীতোষ্ণ বাতাসে মুকুলদাম শিহরিয়া উঠিতেছে, আম্রমুকুলের মদগন্ধলুব্ধ মধুকর গুন্‌গুনিয়া ফিরিতেছিল, বসন্তের চিরসখাও সেদিন নীরব ছিল না, উদ্যানের সর্ব্বত্র একটা হাসিখেলা মাতামাতিরই চিহ্ন; আকাশের নীলটাও সেদিন রূপালি কাজ করা পুঞ্জমেঘে বারাণসী সাড়ীর মত দেখাইতেছিল। জানালার নিকট বসিয়া

শচীকান্ত একদৃষ্টে সেই শোভাময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়াছিল, বহুদিন পরে আজ যেন আবার প্রাণের মধ্যে এই কুহকিনীর উন্মাদনকারী মূর্ত্তি ছায়াপাত করিয়াছে। বাহিরে মাঠে মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিতেছে, বাতাসে বিবিধ ফুলফলের গন্ধ ভাসিতেছে, অন্যমনে সে গুণগুণ করিয়া একটা সঙ্গীতের একটা চরণ ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল "জনম জনম হম্ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল!"

ক্রমে জানালার মধ্য দিয়া তরল রজত ধারা ঢালিয়া চাঁদ উঠিলেন, জানালার ঠিক সম্মুখেই একটা বড় নক্ষত্র কাহার দীপ্ত নেত্রের মত জ্বলজ্বলিয়া উঠিল, অল্প শীতানুভব করিয়া শচীকান্ত একখানা র‍্যাপার টানিয়া গায়ে দিল, তারপর আবার সেই জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সুবর্ণোজ্জ্বল হরিৎক্ষেত্র জ্যোৎস্নাতরঙ্গে ঈষৎ তরঙ্গিত হইতেছে, চাঁপা গাছের ডাল নাড়া দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল, অগণ্য নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রালোকে ম্লানায়মান,—আজ প্রলোভন অদম্য হইল।

শচীকান্ত ধীরে ধীরে দুইটা ঘর পার হইল, সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে দেখিল কল্যাণী উপরে উঠিতেছে, সে দাঁড়াইল, "তোকেই খুঁজছিলাম।"

"ওঃ," কল্যাণী যেন আর কিছু কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, এইমাত্র সে মায়ের কাছে কতগুলা বকুনি খাইয়া আসিয়াছে। গিরিজা সুন্দরী আজকাল বড়ই চটিয়া আছেন কাজেই কারণে অকারণে তিরস্কৃত হওয়া এখন এ বাড়ীতে অনিবার্য্য, বিশেষতঃ কল্যাণীর পক্ষে।

শচীকান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল তাই সে নিজে হইতে কিছু বলিতে পারিল না, দাঁড়াইয়া রহিল, তখন হঠাৎ কল্যাণীর মনে হইল হয়ত দাদার কিছু বলিবার আছে। সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি দাদা!" "এমন কিছু না ফুলশয্যার দিন বদলানর জন্য মাসিমা চটেচেন—না?"

"তা একটু চটেচেন বৈকি, সে ভুলে যাবেন এখন—"

"কেন তাহলে আর তাঁকে বিরক্ত করা—আজই না হয়—" কল্যাণী গালভরা হাসির সহিত তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল "বেশ তো মাকে বলিগে"।

শচীকান্ত জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে চাহিল। এই পাঁচদিন ধরিয়া সে কেবলই মনে মনে পিছাইয়াছে; আজ সবলে সমস্ত বাধা কাটাইয়া নিজের চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তুলিল, সেই হিমহস্ত আর তেমন করিয়া তাহার পা দুখানা চাপিয়া ধরিল না, সহজ ভাবেই সে জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার নববধূর সম্মুখে দাঁড়াইল, নূতন ভাবের আলোড়নে বক্ষ শুধু তখন বেগমান্ হইতেছিল।

কমলা কোনদিকে চাহিয়া দেখে নাই, মাটির গড়া প্রতিমার মত সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল, জীবনী শক্তি যেন তাহার মধ্যে নাই, প্রচণ্ড আঘাতে এইবার তাহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

জানালার ঠিক সম্মুখেই সবুজ বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া শিশুচন্দ্র প্রসন্নমুখে উঠিয়াছেন।

সেই আলোটা কমলার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে যেন দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছিল।

শচীকান্ত অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল "কমলা!" কমলা তড়িতাহতের মত একবার চমকিয়া আশাপূর্ণ যুগলনেত্র পূর্ণ বিকশিত করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল, পরক্ষণে ঘোর হতাশার বজ্র যেন তাহার মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে এমনই অসহায় তাহাকে দেখাইল, বুঝি শেষ সংশয় টুকুর এই সঙ্গে সমাধি হইয়া গেল।

"কমল, এ জীবনে যে এদিন ফিরে পাবো সে আশা আমার ফুরিয়েই ছিল, এ সুখের ঋণ কার কাছে শোধ করবো? কখনও ঈশ্বর মানিনি কিন্তু আজ তাঁর কথা ভাবতে ইচ্ছে হচ্চে, মনে হচ্চে বোধ হয় তাঁরই অসীম দয়া তোমাকে আমার পার্শ্বে এনে দিলে। তিন বৎসর প্রায় গত হলো, কত খুঁজেচি, কত কেঁদেছি কোন্ অতলে তলিয়ে ছিলে কোথাও খুঁজে পাইনি—"

আবেগ ভরে সে আরও কত কথা বলিয়া গেল, কিন্তু নববধূ বোঁধ হয় ইহার একটাও বুঝিতে পারিল না, সে যেমন তেমনি নিস্পন্দ লোচনে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি বর্দ্ধিত হইতেছিল, কর্ম্মগৃহের কোলাহল মন্দীভূত হইতে লাগিল, বাতাস শীতল হইয়া আসিল, বিশ্ববিস্মৃত শচীকান্ত মুগ্ধনেত্রে অবগুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল—কোথায় ক্ষোভ, কিসের লজ্জা এ সুখের তুলনা নাই!

চেতনা লাভে যেন আর একটু সরিয়া গিয়া মুগ্ধকণ্ঠে ডাকিল "কমলা!" সাদরে হাতখানি হাতে তুলিয়া লইল "আমার কমল!"

আগ্নেয় গিরির ধাতু নিঃস্রববৎ জ্বালাদিগ্ধ কঠিন স্বরে কমলা সহসা তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমি আমার কেউ নও!" সবেগে হাত টানিয়া লইয়া সে বিদ্যুৎবেগে সরিয়া গেল।

ভোরের বেলা বাহিরে আসিতেই কৌতুক-ময়ী কল্যাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বউ কথা কয়েচে দাদা?" শচীকান্ত এ প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীণ হাসিয়া "তোদের বউকে জিজ্ঞাসা করিস্" বলিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল, কাহারও কাছে তাহার যেন মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

কল্যাণী অনেক অনুসন্ধানে পাঁশের স্নানা-গার হইতে বধূকে টানিয়া বাহির করিল, সেই দৃষ্টি, সেই একই ভাব! বুঝিল তাহার দাদা এইজন্য তেমন বিষাদের হাসি হাসিয়া-ছিলেন, একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "কি তোমার রকম সকম ভাই।" কমলা অর্থহীন দৃষ্টিতে কেবল একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র। সে দৃষ্টিতে কিছুই ছিলনা—তথাপি যেন অনেক ছিল! কল্যাণী দুই পদ পিছাইয়া গেল।

মনের ঝাল মনে মারিয়া গিরিজাসুন্দরী যথাকৃত্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন এই জন্যই শচী বাপ ভাইকে জানাতে দেয়নি—বুঝেছি, একে 'ডোমের চুপড়ি' ধুয়ে তোলা—তায় অমন ধেড়ে মেয়ে! ওঁরা কি এ অনাচার ঘটতে দিতে পারেন! তা যা হোক যা হবার হয়েই গেছে তা বল্লে আমি কেন ওদের একটা খবর অবধি না দিই; মনেই বা করবে কি?

ভক্তিনাথকে পত্রে যথাসম্ভব সংবাদ পাঠাইয়া বৌভাতের মধ্যে সপরিবারে আসিতে লিখিলেন। বলিলেন,

"আমার তো দুজনেই সমান আমি কেন তার সঙ্গে এতটা তফাৎ করি।"

বড় বধূ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, মাসির এতখানি দৌলত ভোগ করিতে লাগিল ছোটবাবু আর তাহাদের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথাপরম্! মনে মনে গস্‌গসিয়া কাহারও সহিত ভালরূপে একটা কথাও কহিতে পারিলেন না, ভাবিলেন এ'কেই বলে কলিকাল, যে দেবতা বামুন মানলে না সেই হলো রাজেশ্বর আর আমরা যে ভিটেয় সাঁজ জ্বালচি, বার মাসে তের পার্ব্বণটি বাদ দিচ্চিনে একচোখো ঠাকুর কি চোখের মাথা খেয়েচে এসব দেখতে পায় না?"

কল্যাণীর কাছে পরিচয়ের আবশ্যক করে না; সে হাসি মুখে ভ্রাতৃজায়াকে প্রণামপূর্ব্বক হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল "কেমন জা হয়েচে দেখ্‌সে বৌদি, এমন কখনও দেখনি।"

বড় বধূর কাণে শচীকান্তের স্ত্রীর এতটা প্রশংসা সহিল না, তিনি মুখ টিপিয়া একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিলেন "রূপ যদি বল্লে তো বলি, আমাদের ওখানে মনীশ ঠাকুরপোর সঙ্গে বাক্‌দত্তা একটি মেয়ের যেমন রূপ দেখেচি এমন আর কোথাও দেখব না, মেয়েটির নাম কমলা, তা নামেও যা কাজেও তেমনি একেবারে যেন লক্ষ্মী—'ওমা এ কে?' এই কি বউ নাকি? অ্যাঁ! সেকি! এই তো সেই কমলা!"

(৪৫)

মস্ত বড় একটা ফাঁড়া আসিয়া যখন কাটিয়া যায় তাহার পর কিছুক্ষণ মনের মধ্যে বড় একটা উদারতার হাওয়া বহিতে থাকে। ছোট খাট অশান্তি সেই বড় বিপদের ভিতর লীন হইয়া যায়, নূতন স্বাস্থ্য লাভের মত হৃদয়ে নবীন শান্তির উদ্বোধন করিয়া নবজীবন গঠিত করে, মনে আর কোন বিক্ষোভ যেন সে সময়ে স্থান পায় না।

নন্দকিশোর প্রবল ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পূর্ব্বের সকল আঘাত ভুলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে ইন্দুভূষণের কাছ হইতে বোঝা পড়া চুকাইয়া তাহাকে যথাসম্ভব প্রসন্ন মুখে বিদায় গ্রহণ করিতে দেখিয়া ঈষৎ লঘু চিত্তে বিন্ধ্যবাসিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন "ইন্দু ছেলেটির জন্য মনটা খারাপ হয়ে গ্যালো, বড় চমৎকার ছেলেটি। যাহোক যা হবার নয় তার জন্য আপশোষ বৃথা, তা আমি তাকে একেবারে ছেড়ে দেবোনা; তার সকল সাহায্যের ভার নেবো। এখন তুমি কি বলো বিন্ধ্য? গৌরীর বিবাহ বন্ধ হবে—না, এই সময় দিয়ে ফেলাই যাবে?" বিন্ধ্যবাসিনী একথাটা বার বার ভাবিয়াছিলেন তাই চট্ করিয়া বলিলেন "এখনি বর কোথায় পাবেন?" নন্দকিশোর কহিলেন "তা ঠিকই আছে, তোমায় একটি কাজ করতে হবে, সত্যর মাকে একখানি চিঠি লিখে সব কথা জানাও, ও তাঁদের মত জিজ্ঞাসা কর, এই দিনেই বিয়ে হলে বাইরে অতটা গোল হবে না, আর দিতেই তো হবে একদিন।" বিন্ধ্যর মনেও এই ইচ্ছাটা একবার উঁকি মারিয়াছিল কিন্তু তিনি ইহাকে আমল দিতে সাহসী হন

নাই। এখন ভগিনীপতির কথার উত্তরে কহিলেন "সত্যর সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

"ক্ষতি কি? তারা যদি দেয়।"

"তা দিলেও দিতে পারে, শিবনারাণ্ বাবু চমৎকার লোক,—ধরলে 'না' বল্‌তে পারবেন মনে হয় না, কিন্তু"

"কি?"

"তাঁরা যে বউকে বাপের বাড়ী রাখেন এমন তো মনে হয় না, অবস্থাপন্ন লোক.তাঁরা – তাতে পাঁচটা নয়।"

"বেশ তো কার না সাধ মেয়ে শ্বশুর ঘর করে?"

বিন্ধ্যবাসিনী একটু বিস্ময় বোধ করিলেন "আপনার যখন আর কোন অবলম্বন নেই তখন—"

অন্ধকার রাত্রে ঘনমেঘের বুক চিরিয়া যেমন ক্ষণপ্রভা চমকিত হয় তেমনি এক ফোঁটা শুষ্ক হাসি নন্দকিশোরের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়াই মিলাইল, তিনি কহিলেন "আমি কে বিন্ধ্য! চির আবর্ত্তনশীল সংসার চক্রের আবর্ত্তনবেগের বিরুদ্ধে বাধা দেবার আমার কি শক্তি আছে? কারই বা আছে? দেখ কোথা থেকে কোথায় ব্যাপার গড়াল, বিধাতার খেলা তুমি আমি উপলক্ষ্য হয়ে খেলে যাই বই তো নয়, কেন খেলি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন যাই! কে নিয়ে যায়? আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হস্ত আমাদের টেনে নিয়ে যায় তবে না যাই! তবে? কি হবে তটশায়ী তরঙ্গের বেগে বাধা দিয়ে? যা বিধাতার বিধান তারই সাহায্য করতে যাওয়া ভাল। ঐশী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালে নিজের ধ্বংস অনিবার্য্য।"

নন্দকিশোর চুপ করিলেন; তাঁহার কণ্ঠের মৃদু কম্পনে মনের আঘাত ব্যক্ত হইল,—গৌরী যে তাঁহার কন্যা নয় এ আকস্মিক সংবাদের বিহ্বলতা ও ব্যথা এখনও তাঁহার মন হইতে ঠিক কাটিয়া যায় নাই। নিজের মনকে তিনি নিজেই কত বার প্রশ্ন করিতেছিলেন আমি যে তার মুখে কাদম্বিনীর পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিতে পাই তাও কি আমার ভ্রান্তি! হইবে, মরীচিকা বোধ হয় ইহাই!

গৌরীর মনে যে তাঁহার প্রতি ভালবাসার একটা কোথায় অভাব রহিয়া গিয়াছে আর তাহার প্রকৃত কারণ তাঁহাদের নিঃসম্পর্কতা ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত দ্বিগুণ বেদনা বোধ করিল। শেষে নিজেকে তাহার সুখের কাছে উৎসর্গ করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন। বিন্ধ্যও কি এ ঘটনায় ব্যথা পায় নাই? পাইয়াছিল বই কি, কিন্তু তথাপি তাহার ব্রহ্মচর্য্যপূত নিষ্কাম চিত্তে যে বাৎসল্য এই অনাথার জন্য আজীবন সঞ্চিত রহিয়াছে সেখানে তো কোন প্রতিদানের আশা সে কোন দিন রাখে নাই, তাই তাহার স্নেহউৎসের বেগ যেমন তেমনই রহিল, সে মনে মনে বলিল "নাই হউক সে আমার বোন ঝি, তবু সে আমার সেই গৌরীই ত।"

একটু নীরব থাকিয়া নন্দকিশোর পুনশ্চ বিষাদপূর্ণ স্বরে কহিলেন "অন্তর্যামী বুঝি এই অন্তরের অপরাধের দণ্ড পাঠিয়ে ছিলেন। 'আমার' বলে আমি একেবারে মোহে অন্ধ হচ্ছিলাম তাই বুঝিয়ে দিলেন যাকে নিজের বলে কাছছাড়া করতে ভয়

পাচ্ছ সে তোমারই নয়। আর না বিন্ধ্য, যা জড়িয়ে ফেলচি সে আর খুলতে পারবো না কিন্তু এর বেশি আর কাজ নেই। আমি কে? আমার সুখ দুঃখ এ জগতের নিয়মের কাছে কতটুকু? নিজেকে আর বাড়াতে চাইনে।"

কথা কয়টার মধ্যে ত্যাগশীল পিতৃহৃদয়ের মর্ম্মব্যথা স্নেহময়ী বিধবার বক্ষে বাজিল, তিনি একটা অছিলায় নিজেকে দমনের প্রয়াসে উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু গৌরী খবরটা পাইয়া তেমন সুখী হইতে পারিল না, সে ভাবিল এ কি রকম! সত্যদা আমার—ওমা সে যে বড় বিশ্রী! ছি ছিঃ না,—সে ভাল হবে না। বরকে সবাই লজ্জা করে, ঘোমটা দেয়, আমি ত সে সব কিছুই পারব না, আমার ওরকম করতেই লজ্জা করবে, আর হাসি পাবে। কি যে ওঁরা সব ঠিক করেন! মাসিমাকে গিয়া বলিল "বিয়ে না হলেই তো হয় মাসিমা, হয় না?"

বিন্ধ্য তাহাকে কোলে টানিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া মনের ঈষৎ ভারটুকু লাঘব করিয়া ফেলিলেন, হাসিয়া কহিলেন "তাকি হয় রে পাগলি হিন্দুর ঘরে বিয়ে না হলে হয় না।" আর কিছু বলা যেন কঠিন হইয়া উঠিল, বিশেষ সত্যর নামটা মুখে বাধিতেছিল।

(৪৬)

পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, দেড় বৎসরে শিবনারায়ণের সংসারে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে পরিবর্ত্তনে শিবনারায়ণকে বৃদ্ধ করিয়া করুণাময়ীকে পেষিত করিয়া ও সত্যকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল, কেবল একমাত্র মনীষের কোমল চিত্তের উপরেই সেই ক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল কাল তাহার বর্ণতুলিকার টান টানিতে কাতর হইয়াছিল, তাই সে এখনও তেমনি অপরিবর্ত্তিত। সেই পঠনপাঠন, সেই গুরুসেবা, স্নেহাস্পদে প্রীতি, সেই হাসিমুখ, সবই যেন সেই। এত বড় একটা ভাগ্য পরিবর্ত্তনে তাহাকে এতটুকু বদল করিতে পারে নাই যেন। তাহাকে দেখিয়া শিবনারায়ণ নিজের অনুতাপকষায়িত জর্জ্জর হৃদয়ে গভীর বিস্ময় অনুভব করিতে করিতে মুগ্ধচিত্তে ভাবিতেন "ধন্য তুমি মনীশ, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ" সে তোমাকেই দেখিলাম!"

কমলার দুদিনের স্মৃতি করুণাময়ীকে সব চেয়ে কাতর করিয়াছিল। কোন কোন মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যাহা তাহাকে দুইটা দিনেই একজনের কাছে চিরপরিচিত করিয়া তুলে, আবার চিরপরিচিতের মধ্যেও দুজনে একটা এমন কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায় যদ্দ্বারা আজন্মের সহবাসেও তাহাদের পরস্পরের নৈকট্য অনুভূত হয় না। ইহাকেই প্রাচ্যজ্ঞানীগণ কর্ম্মবন্ধন কহিয়া থাকেন। পতিপত্নীর সম্বন্ধে বহুস্থলে এ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোথাও পিতা পুত্রে মাতাকন্যায়, সহোদরে সহোদরায় এই ভাব সুব্যক্ত। করুণাময়ী অনাথা সখীপুত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বধূরূপে কন্যাহীনগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া এমনই সুখ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্তানাপেক্ষাও অধিক স্নেহাস্পদ মনীশের বধূরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে এতখানি ভালবাসিয়াছিলেন যে করালীচরণের হীনতায় স্বামীর উচিত কোপকেও তিনি

সেই জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিতে না পারিয়া গোপনে তাহার সহিত রফা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মেয়েমানুষের কথা বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব সে কানেও তুলিল না কমলাকে তাঁহার কক্ষচ্যুত করিয়া লইয়া গেল। রমণীর আর সাধ্য কি ক্রন্দনের বন্যায় বুক ভাসিল মাত্র।

শিবনারায়ণ নিজেও বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হীনচিত্ততার সংস্রব মহৎ হৃদয় সহিতে পারে না, তাই এতবড় একটা ঘৃণিত অভিনয়ের অভিঘাতে তাঁহাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সাধু লোকের ক্রোধ কাগজে লাগা আগুনের মত যেমনই জ্বলে তেমনই শীঘ্র নিবিয়া যায়, তাহার আঁচে একটা ফোস্কা লাগিতে পারে, কিন্তু দগ্ধ করে না। ঘণ্টা দুই চার পরেই ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন "মেয়েটাকে যথার্থই নিয়ে যেতে দিলেম এতো ভাল হ'লনা একবার যাব নাকি? করুণাময়ীর প্রাণ ত ইহাই চাহিতেছিল, তিনি সহর্ষে কহিয়া উঠিলেন "গেলে হতোনা, কি জানি যে রকম লোক হয় ত টাকা পেলে আর কোথাও মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেবে।"

"সে ভয় আমি করিনে, তাতে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, বংশজের ঘরে কে অত বড় খাঁই মেটাতে পারবে? অবস্থাপন্ন ঘরে কেউ আর টাকা দিয়ে ছেলের বিয়ে দেয় না, যত সুন্দরী মেয়ে হোক, টাকাই খোঁজে। তা ছাড়া মেয়েও ত ছোট নয় আর বোধ হয় খুব সেয়ানাও আছে সে কি সে রকম দেখলে তোমায় খবর না দেবে ভেবেচ?"

পরদিন শিবনারায়ণ ত্রিবেণী গিয়া করালীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন, "যাহা চাহিয়াছিলে দিব কমলাকে পাঠাইয়া দাও।"

করালীচরণের ক্রমেই চোখ ফুটিতেছিল লোভেই লোভ বাড়াইয়া চলে সে তৎক্ষণাৎ কহিল "তিনটি হাজার টাকা চাই, তাছাড়া আমার বাড়ীতেই বিয়ে হবে খরচাটাও আগাম দেবেন, এর এককড়া কমে চলবে না।"

অতি ক্রোধে আবার শিবনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন, তিনি বুঝিলেন দর ক্রমে বাড়িতেই থাকিবে, মনে মনে বলিলেন "তবে দেখ আমিও তোমায় জব্দ করব, দিন কত চুপচাপ থাকবো—গরজ না দেখলে তখন সেধে এসে যা বলবো তাই নিয়েই মেয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের বলিয়া আসিলেন সেখান হইতে সর্ব্বদাই কমলার তত্ত্ব লইয়া সংবাদ পাঠাইবে। কিন্তু একদিন যখন খবর আসিল করালীচরণ সপরিবারে হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছে তখনই তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, প্রথম কয়দিন করুণাময়ীকে খবরটা জানাইতে পারিলেন না, নিজেই চারিদিকে সংবাদ লইতে লাগিলেন, শেষে ভক্তিনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল,—কিন্তু কোন ফলই ফলিল না, করালী আসিল না শিবনারায়ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে সহসা একেবারে সকল সংবাদই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভক্তিনাথ মর্ম্মাহত চিত্তে রত্নপুকুর হইতে ফিরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙ্গা তক্তোপোষে অধোমুখে বসিয়া পড়িলেন।

আর বড়বধূ ছেলে কাঁখে করিয়া পাড়ার প্রতি গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ছোট কর্ত্তার অপূর্ব্ব-কীর্ত্তি দেশরাষ্ট্র করিয়া মনের বিষ মিটাইতে লাগিলেন। শেষে যোগ করিলেন, "কেমন এখন মুখে চুণকালি পড়েচে তো? ভাই বল্‌তে ঠাকুর একবারে দিশেহারা হন যে! মনে করেন কুঁদুলে মাগীরই যত দোষ, ওর লক্ষ্মণ ভাই পাকা ফলটি ধরেই থাকেন, মুখে ছোঁয়ান না। দর্পহারী মধুসূদন কেমন দর্পচূর্ণ করেচেন? ভাই কত বড় ভাল এখন দেখুক!"

সংবাদটা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই গাঙ্গুলীপরিবারের উপর পড়িয়াছিল। করুণামন্নী এ দুর্দ্দৈবে এককালে স্তম্ভিত হইলেন, শিবনারায়ণ মর্ম্মের মাঝখানে একেবারেই যেন মরিয়া গিয়াছিলেন। এ কি হইল! সহস্রবার তাঁহার মন নীরববিস্ময়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল কাহার দোষে এরূপ হইল! নিজেকে মনীশের প্রতি কমলার প্রতি অবিচারী বোধ করিয়া আত্মধিকারে তাঁহার চিত্ত পীড়িত হইয়া উঠিল। কেন তিনি করালীচরণের উপর রাগ করিয়া কমলাকে ছাড়িয়া দিলেন। মনীশ যদি ভাবে—যদি সে পলকের জন্যেও মনে করে কাকার টাকাটাই বড় হইল?

সাপে ছুঁচা ধরার যে উপমাটা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এপরিবারের অবস্থা এখন ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যেই সবটা চাপা থাকিল, ওগরাইবার, ফোক্‌রাইবার সাধ্য যেন কাহারও ছিল না। এই অভূতপূর্ব্ব-অদ্ভুত নাটকের নায়ক এপরিবারের ইষ্টগুরু সার্ব্বভৌমমহাশয়ের আত্মজ!

তাই চাকদার প্রতি গৃহে যে সময় সেই ঋষিসন্তানের উদ্দেশ্যে কুৎসাগ্লানি বিদ্রূপ অভিশম্পাত বর্ষণ চলিতেছিল, এ গৃহের মধ্যে ঝটিকাপূর্ব্বের স্তব্ধ সমুদ্রের মত একটা ভীতিসঞ্চারী স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সত্য শুদ্ধ এ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছে।

যেদিন নন্দকিশোর কন্যার বিবাহের উমেদারী লইয়া গাঙ্গুলী গৃহে আগমন করিলেন সেদিন সদ্যবর্ষণের সজীবতায় দেশটা যেন তাজা হইয়া উঠিয়াছিল। মেঘযুক্ত আকাশখানা অনন্তের বিশাল বক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, ফুল বাগানের জলধৌত শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল কে যেন এখনই রং ফলাইয়া ইহা চিত্রিত করিয়া গেল, সার্সির উপর মুক্তা বিন্দুর মত বারিবিন্দু শোভমান, আর বাগানের ছায়াস্নিগ্ধ স্নেহরাশি মাখিয়া বাতাস সজল শীতল ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এবং সেই চির পরিচিত গৃহে শাদা আস্তরণ বিছান টেবিলটির নিকট নিজের কেদারাখানি দখল করিয়া পূর্ব্বের মতনই মনীশ প্রীতিপূর্ণ কৌতূহলে সেই ধৌতধূলি গৃহোদ্যানের দিকে চাহিয়াছিল। আজ ইহার প্রতি ধূসর কাণ্ডটি হইতে গাঢ় সবুজ পত্ররাজি পর্য্যন্ত যেন একটি নয়নলোভন সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সারি সারি জুঁয়ের গাছের আপ্রান্ত আধফোটা শ্বেত মুকুলে খচিত, ভক্তহৃদয়ের রক্তরাগে রাঙ্গাজবা বিশ্বলক্ষ্মীর পদতলে আত্মনিবেদন করিয়াছিল। মনীশ সেইদিকে চাহিতেই একটা অতি সুন্দর

উপমা স্মরণে আসিল। একদিন এমনই বর্ষণক্লান্ত মেঘের স্তিমিত আলোকে এক মহাকবি লিখিয়া গিয়াছেন "বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজবন নদীতীর জাতানি সিঞ্চন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈ যূঁথিকাজালকানি।

বিশ্ব রচনার আগাগোড়াই সৌন্দর্য্যপূর্ণ, ইহার কোথাও যেন দৈন্য নাই, তবে যত অভাব দিয়াই কি বিধাতা মানব চিত্ত গড়িয়াছেন! এই সামান্য বৃষ্টিটুকু জগতের কতখানি তৃপ্তি সাধন করিয়া গেল, কতখানি শোভা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিল, কিন্তু এ জীবনের মধ্যে উহার ক্ষীণধারা তো কই কোন পরিতৃপ্তি প্রদান করিল না! মনীশ আপনার মধ্যে অন্বেষণ করিল মনে তাহার কোন ক্ষোভ নাই সত্য কিন্তু আনন্দই বা কোথায়? ওই ছোট পাখীটীর মত, ওই জলধারাধৌত সবুজ লতাটির মত নম্রশান্ত চিত্ত তাঁহারই জয় গানে তো আগাগোড়া ভরিয়া নাই। কেন থাকে না? কিসের এ অতৃপ্তি! অমনই নির্ম্মল অম্লান হৃদয় লইয়া সে তো এ সংসারে এতদিন কাটাইয়া দিয়াছে তবে এতদিনে মনের মধ্যে এই কুয়াসার সূক্ষ্মজাল কোন সুযোগে প্রবেশ করিতে আসে? সে মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কপিসবর্ণ আকাশের পানে চাহিল, অসীম বিশ্বেশ্বরের সন্তান হইয়া হৃদয়ে এই অসীম সঙ্কীর্ণতা বহন করিয়া বেড়ান মানব জীবের পক্ষে একান্তই লজ্জাস্কর! কিসের দৈন্য! আপনার সত্বাকে সেই সত্য মঙ্গলে শান্ত সুন্দরে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই তো সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র স্ব বিশাল হইয়া উঠিবে, তবে কেন মুহূর্ত্তের তরেও মনে সঙ্কীর্ণ চিন্তার বিষণ্ণতা স্থান পায়? না না এ ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সে তৃপ্ত হইবে, আনন্দপূর্ণ রহিবে, মনের কোঁণেও অভাবকে স্থান দিবে না।

ধীরপদে কেহ কক্ষে প্রবেশ করিল, ডাকিল "মনীশ!"

"আজ্ঞে!". মনীশ ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া খুল্লতাতের সন্মুখীন্ হইল। শিবনারায়ণের মুখ অত্যন্ত ম্লান, মনের মধ্যে বোধ হয় একটা তুমুল ঝটিকা বহিতে ছিল। প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিতে বাধিয়া গেল, শেষে ঈষৎ আত্মদমন করিয়া কহিলেন নন্দবাবুর পালিতা কন্যার সঙ্গে সত্যর বিয়েতে তুমি মত দিলে মনীশ, তুমি যাতে খুসী হবে তাতে বাধা দিতে আমার সাধ্য নাই, কিন্তু এ আমার মহা প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে জেন মনীশ, তোমার চিরকৌমার্য্য আমার বুকে শেল বিঁধবে, সতুর বউএর দিকে আমি চেয়ে দেখতে পারব না।"

মনীশ কাতরকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কাকাবাবু!"

"না মনীশ তুমি আমায় কি বলবে? আমি কি জানিনে আমি কি করেছি! তোমার বাগ্দত্তা বধুকে কেন আমি তুচ্ছ মানে গর্ব্বে অন্ধ হয়ে পাষণ্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় নিতে হবে না। তুমি বলবে তোমার মনে তার জন্য এক বিন্দু ক্ষোভ নাই! তাতেই কি আমি কিছু সান্তনা পাবো? না না—সে আরও যন্ত্রণা! তোমায় আমি নিখুঁত দেখতে চাই যে, মনীশের হৃদয় মমতাহীন একথা আমায়

বিশ্বাস কে করাবে? আমার এ যন্ত্রণা যাবার নয়—এ পাপের ফল আমাকে ভুগতে হবেই।

মনীশ কি বলিবে কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না, কমলার জন্য তাহার যে ক্ষোভ কাকার মানসিক অবস্থার জন্য তাহা প্রায় চাপাই পড়িয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে সুযোগ পাইলেই একবার উঁকি দিতে চাহে মাত্র। কিন্তু এ কথা সে কেমন করিয়া এই স্নেহময় পিতৃব্যকে বুঝাইবে? নারী, বালক, অজ্ঞকে কতগুলো কথা সাজাইয়া বুঝান যায়, বিজ্ঞ প্রবীণকে কে বুঝাইবে? সে কতবার খুড়িমাকে বলিয়াছে হয় ত ভালই হইয়াছে; শচীর বাগ্দত্তার তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়াই উচিত ছিল। সে নিখিলনাথের নাম যদি শুনিত তাহা হইলেই গোড়া হইতে এত বড় ভুলটা ঘটিতে পারিত না! সে এই কথাটা দিয়া নিজের মনকেও ভাল করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল, নিজেকে বলিতেছিল তুমিই বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিলে সে নয়—সে ঠিকই করিয়াছে! কিন্তু তথাপি কি যেন একটা সংশয় জাগিয়া থাকে! কিন্তু তাহার এ সব কথা বেশিক্ষণ ভাবিবার অবসর নাই, যে চারিটি চোখের অনিমেষ স্নেহসজাগ দৃষ্টি তাহার মুখে চাহিয়া আছে তাহারা তাহার হাসি মুখে এতটুকু ছায়া পাত দেখিলে এখনি শিহরিয়া উঠিবে, তাই নিজেকে এতটুকু আমল দিতে সাহস করে নাই। তথাপি হায়! প্রকৃত স্নেহের কাছে কণামাত্র ফাঁকিও চলে না। সে কহিল "আমায় কি আদেশ করবেন বলুন আমি তো কখনও আপনার অবাধ্য হই নি।"

শিবনারায়ণ আর্ত্তকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিলেন "সেইজন্যই ত এত কষ্ট আমার মনীশ! যদি তুমি আধুনিক কালের ছেলেদের মতন হতে, যদি আমার পরে তোমায় বিরক্তির ভাব দেখতেম তাহলে হয়ত আমার পক্ষেও কৈফিয়ৎ খুঁজে পাবার ছিল, কিন্তু তা নও বলেই যে এ কষ্ট অসহ্য হয়েচে। তুমি সংসারী হবে না, ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাবে, কেমন করে আমি, তা দেখব মনীশ?"

"তবে আমায় আদেশ করুন—যাতে আপনি সুখী হন তাই বলুন!"

শিবনারায়ণ এতক্ষণে এ কথায় যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তার পর একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ শান্তস্বরে কহিলেন "তাই বা কেমন করে বল্‌বো মনীশ? সেদিন কাশীতে সার্ব্বভৌম মশাই যা বল্লেন তারপর তোমায় আর আমি কি বল্‌ব? একবার আমাদেরই জন্য তুমি নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন করেছিলে, তার ফলে এই মনস্তাপ, আবার জোর করে পাছে তোমায় অধিক অসুখের মধ্যে টেনে আনি তাই ভয় হয়। তাঁর কাছে তুমি বলেছ তুমি আমাদের আদেশে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ কিন্তু যদি সে আদেশ না পেতে হয় তাহলেই প্রকৃত সুখী হও! আমি তোমায় প্রকৃত সুখী দেখতেই ত চাই, আমার সুখ কিসে সে কথায় কাজ কি, তুমি কিসে সুখী হবে তাই আমার প্রয়োজন। লোকে এতে আমায় আরও নিন্দা করবে জানি, কিন্তু লোকের কথা বড় নয় তোমার সুখই আমার

সব চেয়ে বড়, সত্য কি মনীশ বিবাহে তুমি সুখী হবে না। কৌমারব্রত গ্রহণেই সুখী হবে মনে কর? বলো আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে ত কেউ কারুকে কোন দিন সঙ্কোচ করিনি, শুধু তুমি আমার সন্তান নও, উপযুক্ত সন্তান শাস্ত্রে বন্ধু নামে উক্ত হয়।"

মনীশ তখন নত নেত্র তুলিয়া চাহিল, তাহার সমস্ত হৃদয় স্থিরগাম্ভীর্য্যে যেন অকস্মাৎ সম্মোহিত হইয়া পড়িল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে অকপটে কহিল "যখন অনুমতি করচেন তখন বলাই সঙ্গত, যদি আপনি ও খুড়িমা মনে মনে কোনও ক্ষোভ না রাখেন তা হলে আমি চিরকৌমার ব্রত নিতেই চাই, সত্যর সন্তান আমাদের বংশ রক্ষা করবে। শুনেছি শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মচারী যদি বহু সন্তান স্থানীয় শিষ্যের শিক্ষকতা দ্বারা তাদের উন্নত করতে পারেন তবে তাঁদের গৃহস্থ ধর্ম্ম পালনও ঘটে। আমার ইচ্ছা আমি এইরূপেই গৃহধর্ম্ম রক্ষা করব, তবে আপনার ইচ্ছাই আমার সব।"

"তবে তাই হোক, তোমার সুখে ব্যাঘাত দেবো না, কিন্তু তোমার খুড়িমা যে কখনও এ দুঃখ ভুলতে পারবেন তা মনে হয় না। সত্যর বিয়ের কথা শুনে অবধি সে আরও কাতর হয়ে উঠেচে।"

শিবনারায়ণ চলিয়া যাইতে না যাইতে সত্য আসিয়া কহিয়া উঠিল "দাদা আমার পরে এ কি অবিচার করচো তুমি—সে হবেনা।"

মনীশ মুখ ফিরাইল "কি করেছি?"

"এই এই, তুমি ত জানো? সে হবে টবে না বলে রাখলাম, বেশ মজা ত নিজে আইবড় থাকবে আর আমায় বুঝি এমনই করে, না যাও, কক্ষণো আমি তা শুনচি নে।"

মনীশ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া সত্যকে কাছে টানিয়া লইল হাসিতে হাসিতে বলিল "বলিস কিরে! গৌরী সেই গৌঃ-গাবৌ"—

"হোগ্‌গে হোগ্‌গে আমার দরকার নেই তাকে, আমি বিয়ে করবোনা। তুমি যা করবে আমি কি জন্যে তা করতে পাবনা বলত?"

সত্যর চোখ দুইটা আর্দ্র হইতে ও ঠোঁট কাঁপিতে আরম্ভ হইয়াছিল, সে সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল। মনীশেরও দুই চোখে সহসা হুহু করিয়া একটা বন্যার বেগ ছুটিয়া আসিতে চাহিল; সে তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়া ভাইএর আরক্ত মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে ঈষৎ হাসিয়া কহিল "আমরা বল্‌চি বলে।"

"তোমায় কি কেউ কিছু বলেনি? বেশ ত আমিত আর তোমায় বিয়ে করতে বলচিনে তুমি আমি দুজনেই এক রকমে জীবন কাটাব, আমি কি এখন তেমনি অবাধ্য অমনোযোগী আছি যে তোমার কোন কাজেই লাগতে পারিনে?"

আর সামলান গেল না, এবার দুজনের রুদ্ধ অশ্রুই দুইদিক হইতে ঝর ঝর করিয়া একসঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। অবরুদ্ধবাক্ সত্য কাঁদিয়া দাদার কোলে মুখ গুঁজিল "দাদা আমি কি শুধু তোমার পড়ানর ছাত্র দুঃখের অংশী কি নই? তবে কেন তুমি যে পথ নিজের জন্য ঠিক করেচ তার মধ্যে আমার স্থান দিচ্চো না?"

গভীর আনন্দে মনীশের চিত্ত জোয়ারের সমুদ্রবৎ স্ফীত হইয়া উঠিল, সে পরম আনন্দে ভাইটির মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সকরুণ স্নেহে রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে কহিল, "তা যে হতে পারে না সতি! তুমি যদি এ দায়িত্ব বহন কর তবেই আমার মুক্তি ঘটে, কেননা পিতৃপুরুষের কথা ত ভুললে চল্‌বে না, নিজেই ত সবটা নই। তুমি তোমার দাদাকে সুখী করবার জন্য তার আদেশ পালন করবে কি বল?" ক্ষণপরে অস্ফুটস্বরে সেই ঔদ্ধত অবাধ্য বালক উত্তর করিল "তুমি যদি তাতেই সুখী হও দাদা তা হলে কি আমি না বল্‌তে পারি?"

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাণমুক্তি

বৌদ্ধেরা বলেন যে পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র, এখানে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল নিশ্চয়ই ফলিবে, কর্ম্মান্তে মৃত্যুর পর পুনরায় ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইব। ইহা সঙ্গত বিশ্বাস। এই প্রকাণ্ড কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যাও, তাহা হইলেই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তব্য সাধনই উপাসনা—ইহা ছাড়া অন্য উপাসনা নিষ্ফল!

হিন্দুশাস্ত্রে বলা হইয়াছে মনুষ্য হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই নিয়তির অধীন, আবার সেই নিয়তি কর্ম্মের অধীন সুতরাং দেবগণের উপাসনা না করিয়া কর্ম্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য কাজ করাকেই কর্ত্তব্যের উপাসনা বলে, তাহা করিলেই আমাদের ঈশ্বর হইতে পৃথক আমিত্বজ্ঞান যুক্ত জীবরূপে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সাধন হইল। কর্ত্তব্য কর্ম্মে লোকদিগকে চালিত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে—তাহাই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজ সুশৃঙ্খলরূপে চালিত হইবার হেতু।

যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তব্য পালন করেন ঈশ্বর তাহাদিগকে ভৌতিক নিয়মের অধীনে রাখিয়াই সাহায্য করেন। যথা একটা ভূমিকম্পে কতকগুলি বাড়ী পড়িয়া গিয়া বহুলোক চাপা পড়িয়া মারা গেল, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি এমন ভাবে রক্ষিত হইল যে তাহার গায়ে একটা আঁচরও লাগিল না। এরূপ ঘটনা ত আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। আবার একজন পাপী অত্যাচারী যিনি অন্যায় রূপে বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন হয়ত তাহার একটি সন্তানও জীবিত থাকিল না অথবা জীবিত থাকিলেও একটা ভয়ানক বদমাইস বা গুণ্ডা হইয়া সেই পিতার উপরই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল অথবা অন্যায় রূপে লব্ধ অর্থ কোন না কোন প্রকারে নিঃশেষ হইয়া গিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইল। কর্ত্তব্য পালন করিতে

অনেককে কষ্ট পাইতে দেখা যায় বটে কিন্তু প্রায় স্থলেই সে কষ্ট অন্য বহুলোকের সুখ আনয়ন করে সেইজন্য সে কষ্টেও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির আত্মপ্রসাদ জন্মে; এবং তাহা জগতে পুণ্যাদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকে।

হিন্দুরা বলিয়াছেন যে যেদিন তুমি অভ্যাসের দ্বারা আত্মপরের বিভিন্নতা ত্যাগ করিতে পারিবে, তখনই তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে অর্থাৎ ঈশ্বরে ও তোমাতে বিভিন্নতা জ্ঞান থাকিবে না অর্থাৎ ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পর যখন জীবদেহ মৃত্তিকায় বিলীন হয়, তখন আমরা উহাকে নির্জ্জীব জড় পদার্থ বলিয়া থাকি, বৌদ্ধেরা ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলেন আর বিজ্ঞান ইহাকেই ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাওয়া বলিবে।

এইরূপে সর্ব্বদাই কোটি কোটি জীব জন্তু, বৃক্ষ গুল্ম, লতা পাতা প্রভৃতির জন্ম মৃত্যু হইতেছে। এই জন্ম মৃত্যু ও বৃদ্ধি ক্ষয় ঈশ্বরেরই দেহাভ্যন্তরে ঘটিতেছে। যেমন আমাদের দেহের রক্তমধ্যস্থ শ্বেত-কণিকা যাহাকে ফেগাসাইট (Phagacyte) বলে তাহাদের কার্য্য দেখিলে পৃথক পৃথক জীবন্ত বস্তু বলিয়া বোধ হয়। তাহারা আমাদের রক্তে কোন প্রকার জীবাণু শত্রু প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে উদরস্থ করে, এবং এইরূপে আমরা অনেক রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করি। আবার আমাদের দেহনির্ম্মাণক কোষসমূহও ভিন্ন ভিন্ন জীবের ন্যায় হাত বাড়াইয়া রক্ত হইতে নিজ নিজ দেহপরিপোষক পদার্থ গ্রহণ করে এবং রক্তে শত্রু প্রবেশ করিলে এই সব হস্তগুলি ছিন্ন হইয়া যায় এবং ঐ একখানা ছিন্ন হস্তের পরিবর্ত্তে দুই তিনখানা নূতন হস্ত প্রস্তুত হইয়া তাহাদের অধিকাংশ পুনরায় ঐরূপে কর্ত্তিত হইয়া শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধের রক্তবীজের ন্যায় বলবান সৈন্য প্রস্তুত হইয়া শত্রু বিনাশ করে। এইরূপ অহরহঃ আমাদের দেহাভ্যন্তরে ক্রমাগত যুদ্ধ হইতেছে আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি না। যখন আমাদের দেহাভ্যন্তরের সৈন্যেরা এইরূপ যুদ্ধে পরাস্ত হয় তখনই আমরা পীড়িত হই; এই সকল সৈন্যগণ আমাদের দেহের অংশবিশেষ। এক সময়ে মনে করা যায় যে আমরা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আবার মৃত্যুর পরে (ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে) সে বিভিন্ন ভাব আর থাকে না। অনেকেই মনে করেন যে আমাদের একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে মৃত্যুর পরে তাহা পৃথক, হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, অথবা ঈশ্বরের শেষ বিচারের সময় পর্য্যন্ত কোথাও অবস্থান করে ও পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা ঘড়ীর আত্মা থাকায় ন্যায় কল্পনা মাত্র। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে তিনি তাঁহার মৃত বন্ধু বা স্ত্রীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কখনই একথা বলিবেন না যে ঐ সকল মৃত ব্যক্তিরা উলঙ্গ অবস্থায় তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। প্রকৃত দেহের সূক্ষ্ম দেহ থাকা অনুমান করা যাইতে পারে কিন্তু বস্ত্রালঙ্কারাদি জড় পদার্থের সূক্ষ্ম দেহ বা

আত্মা থাকা কেহই স্বীকার করেন না। সুতরাং সে অবস্থায় তাহাদের ঐরূপ দর্শন ভ্রম মাত্র তাঁহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বস্তুদর্শন দুই রকমে ঘটিয়া থাকে; এক প্রকার চক্ষুর মধ্যে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহার উপলব্ধি স্নায়ু দ্বারা চালিত হইয়া মস্তিষ্কের অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন ঘটায়; আর এক প্রকার চক্ষুর মধ্যে দিয়া প্রতিফলিত না হইয়া মস্তিষ্কের মধ্যে কোন কারণে ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইলে চক্ষু মুদ্রিত থাকিলেও সেই বস্তু বা ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত বলিয়া মনে হয়। ইহাকেই খেয়াল দেখা বলে। যাহার মস্তিষ্ক নাই তাহার আমিত্বজ্ঞান, কি দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ আস্বাদ প্রভৃতি কিছুই অনুভূত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তিকে ক্লোরোফরম "Chloroform" আঘ্রান করাইলে ক্রমে তাহার আমিত্বজ্ঞান লোপ হইয়া যায়। যদি তাহার উপরে আরো ক্লোরোফরম দেওয়া হয় তাহা হইলে এই আমিত্বজ্ঞান বা সর্ব্ব-প্রকার অনুভব শক্তি একেবারে লোপ হইয়া যায়, তদুপরি আরো ক্লোরোফরম দিলে তাহার মৃত্যু হয় অর্থাৎ এই সকল অনুভব শক্তি চিরকালের মত লোপ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি এমন পরিমাণে ক্লোরোফরম দেওয়া হয় যাহাতে মৃত্যু না ঘটে তাহা হইলে মস্তিষ্ক পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলে আমিত্বজ্ঞান ফিরিয়া আসে। কিন্তু অপরিমিত ক্লোরাফরম আঘ্রাণে একবার মৃত্যু ঘটিলে কোন দেহবিযুক্ত আত্মা যে আমিত্বজ্ঞান সহ আকাশে পরিভ্রমণ করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞানাচার্য্য "Metchni-kaff" তাহার গ্রন্থে বলিয়াছেন জ্ঞানযুক্ত আত্মা থাকা "Concious Soul" অসম্ভব অর্থাৎ আত্মার মস্তিষ্ক না থাকাতে তাহার আত্মজ্ঞান, "Conciousness" থাকা অসম্ভব। কেহ বলিতে পারেন সূক্ষ্ম দেহের ন্যায় সূক্ষ্ম মস্তিষ্কও আছে, সুতরাং সেই সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের আমিত্বজ্ঞান থাকা কেন অসম্ভব হইবে? তাহার উত্তর এই যে, আমিত্বজ্ঞান স্থূল মস্তিষ্কেরই আছে। সুতরাং সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের আমিত্বজ্ঞান থাকা বা সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক বা সূক্ষ্মদেহ থাকা কল্পনা মাত্র।

কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত একটী কুকুরের মস্তক ধারাল অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে অপর কুকুরের ধমনির পরিষ্কার রক্ত সঞ্চালন করিয়া সেই মস্তককে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়া ছিলেন। অথচ উহার দেহ অনেক পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ ঐ মস্তকের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত সঞ্চালন করা হইয়াছিল ততক্ষণ উহা জীবিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকাতে সে সেই দিকে তাকাইয়াছিল, পুনরায় অপর দিকে দাঁড়াইয়া উহার নাম ধরিয়া ডাকাতে সে সেই দিকে চক্ষু ঘুরাইয়াছিল। কিন্তু যখন ঐরূপ রক্তচালন কার্য্য বন্ধ করা হইল তখন সে মরিয়া গেল। ইহা দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে মস্তিষ্কই আমাদের আমিত্ব জ্ঞানের আধার, উহার ক্রিয়া লোপ হইলে কিম্বা কোন রকমে নষ্ট হইলে আর আমিত্ব জ্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক পচিয়া গলিয়া মৃত্তিকাতে

মিশিয়া গেলে আমিত্ব জ্ঞান কি প্রকারে থাকিতে পারে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং যদি মৃতব্যক্তির কোন রূপ সূক্ষ্ম দেহ থাকে তাহা হইলেও ঐ সূক্ষ্মদেহের আমিত্ব-জ্ঞান কিম্বা সুখ দুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না। সে অবস্থায় ঐরূপ সূক্ষ্মদেহ বা আত্মা থাকা বা না থাকা একই কথা। আমি অমুক ব্যক্তি ছিলাম ও মরিয়া গিয়া আমার আত্মা শূন্যে বিচরণ করিতেছে যদি এই জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে সেই আত্মা আমারই হউক বা অপরেরই হউক তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা দ্বারা কি এই প্রমাণ হইল যে সমুদয় কার্য্যই ভৌতিক নিয়মে হয় ও ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই? এরূপ অনুমান করিলে তাহাও ভুল, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, যে ভৌতিক নিয়মে সকল কার্য্য হইতেছে সেই নিয়ম বুদ্ধিমান। যাহারা নিরীশ্বরবাদী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যদি সমুদয়ই ভৌতিক নিয়ম তবে ইহার মধ্যে বুদ্ধি ও উদ্দেশ্য কোথা হইতে আসিল? ভ্রূণ দেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পরিপাক যন্ত্র এমন কৌশলে প্রস্তুত হয় যাহাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমাবেশ দেখা যায়, হৃৎপিণ্ডের কপাটসমূহের ও পরিপাক যন্ত্র সমূহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদের নির্ম্মাণকৌশল ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয়। পরমাণুমধ্যস্থ এই বুদ্ধিবিশিষ্ট ক্ষমতাই ঈশ্বর।

অনেকে ঈশ্বরেতে মানব গুণ (যথা দয়া ইত্যাদি) আরোপ করেন, যাহা দেহী ব্যতীত অর্থাৎ মস্তিষ্কশূন্য কোন পদার্থে আরোপ করা সঙ্গত নহে। সেইরূপ করিতে গেলে একটি দেহ, যে আকারেরই হউক, কল্পনা করিতে হইবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার আবাস স্থানও নির্ণয় করিতে হইবে, সে অবস্থায় এই অনন্ত সৌর জগতের এক কোণে পরমেশ্বরকে রাখিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে অতি ক্ষুদ্রভাবে কল্পনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মূল বিষয় তদ্বিপরীত, অর্থাৎ ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, জন্মলয়বিবর্জ্জিত মহাশক্তিশালী।

যত রকমের ধর্ম্ম দেখা যায় তন্মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখিলে হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চিন্তার ফল বলিয়া বোধ হয়। কোন ধর্ম্মে, এত গভীর গবেষণা দৃষ্ট হয় না। হিন্দুদের মধ্যে অনেক কথা পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল গুলিই সমাজ বন্ধনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে; কোন শাস্ত্রোক্তিই ঈশ্বর ও সমাজ বন্ধনের সহিত বিরুদ্ধ সম্বন্ধযুক্ত নহে।

(ডাক্তার) শ্রীনিবারণচন্দ্র সোম।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৩)

ইংরাজেরা মারাঠা দেশে অল্পে অল্পে কিরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল সে এক কৌতুহলপূর্ণ অপূর্ব্ব কাহিনী; তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইলে মারাঠারাজ্যের গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক। অন্য সকল প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, কিন্তু হাজার সংক্ষেপ করিলেও তাহা দুই তিন অধ্যায়ের কমে সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। পাঠকদের যদি ভাল না লাগে, তবে এ ভাগ ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন।

শিবাজী

মহারাষ্ট্র রাজ্যস্থাপন—শিবাজী রাজা

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগলসম্রাট ভারতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনও মোগল-যূপ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ-ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আল্লা-উদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। তাহার দেড়শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল-পরাক্রান্ত 'বামন' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বিজাপুর, আহমদনগর, গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমানরাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়-নগরের হিন্দুরাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মসলিম একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় হইতেই তাহাদের বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় ও তাঁহার পৌত্র সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল-রাজ্য ভুক্ত হয়।

বোম্বায়ে যখন ইংরাজ-

অধিকার স্থাপন হয়, বিজাপুর ও গলকণ্ডা তখনও স্বাধীন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাহাদের বশীকরণ মন্ত্রণা করিয়া অনেক চেষ্টায় সেই রাজ্যদ্বয়কে দিল্লীসাৎ করেন। ১৫ই অক্টোবর ১৬১৫ সালে বিজাপুর, বর্ষেক পরে গলকণ্ডা মোগলরাজ্যভুক্ত হয়, এইরূপ রাজ্যবিস্তারই মোগলরাজের অধঃপতনের কারণ হইল। মুসলমানদের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে মহারাষ্ট্রীরা মস্তক তুলিয়া উঠিবার সন্ধান পাইল। যদি দক্ষিণে মুসলমান রাজ্য সকল অক্ষুণ্ণ থাকিত তাহা হইলে হিন্দুরাজ্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ—ভারতের ইতিহাস হয়ত আর এক ধরণে সংগঠিত হইত। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-সাম্রাজ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল। এদিকে মোগলসূর্য্য অস্তোন্মুখ, ওদিকে কোথা হইতে কালমেঘ উঠিয়া অল্পকাল মধ্যে দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

শিবাজী ভোঁসলে

ঐ কালমেঘ শিবাজী ভোঁসলে। শিবাজী একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্ত উপন্যাসের মত মনোহারী। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে মহারাষ্ট্র ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তাঁহাকে দেখিতে মধ্যমাকৃতি কিন্তু সুগঠন ও গৌরবর্ণ—লক্ষ্যভেদী জ্বল জ্বল চক্ষু, কলম ধরিতে জানেন না কিন্তু সকল প্রকার শস্ত্রচালনায় বিলক্ষণ মজবুত, তীক্ষবুদ্ধি, দুরদর্শী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়পূর্ণ, উপায়ের খনি, ধূর্ত্তচূড়ামণি। তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল, জননীর চরণধূলি ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া কোন মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তাঁহার পিতা সাজাহী বিজাপুর সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। পুণায় তাঁহার জায়গীর, তথায় দাদাজী কোণ্ডু নামক আচার্য্যের হস্তে শিবাজীর শিক্ষার ভার সন্ন্যস্ত হইল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত বালকের উপর দ্রোণাচার্য্যের শাসন কতদিন খাটে? মাওলী বংশীয় চাষার দল তাঁহার সঙ্গী—লুটপাট ডাকাতি শিকার এই সকল কাজেই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ। খর্ব্বকায় অথচ দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মাওলীদের হস্তে অস্ত্র দিয়া শিবাজী তাহাদের মধ্য হইতে রামের বানরসৈন্যবৎ সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। পাহাড়ে দেশে তাঁহার জন্ম—পশ্চিমঘাঁট অঞ্চলে যে সকল প্রকৃতিগঠিত দুর্গ আছে তাহা একে একে হস্তগত করিতে লাগিলেন। পাহাড় দুর্গে তাঁহার বাস, লুটের মাল হইতে তাঁহার ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। যখন যেমন সুবিধা—কখন বিজাপুরের পক্ষ হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে, কখন মোগলসম্রাটের অধীনে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজকার্য্য সাধিয়া লইতেন। অবশেষে যখন নিজের বল বুঝিলেন—যখন দেখিলেন "পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে" (ডোঙ্গরাস্ লাবিলে দিবা) সকলি প্রস্তুত—তখন মুখোষ ফেলিয়া দিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

আফজুল খাঁ

ক্রমে শিবাজীর দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিল, বিজাপুর-সুলতান আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। শিবাজীকে দমন না করিলে সে সর্ব্বদমন হইয়া উঠিবে এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য

প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আফজুল খাঁ কোমর বাঁধিয়া শিবাজীকে ধরিয়া আনিতে বাহির হইলেন।

সে সময়ে শিবাজী মহাবলেশ্বর হইতে অনতিদূরে প্রতাপগড়ের পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া প্রকৃতির বলের উপর কৃত্রিম বল যোজিত হইয়াছে। শিবাজী এই দুর্গে ব্যাঘ্রের ন্যায় বসিয়া শিকার নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আফজুল খাঁ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। পথিমধ্যে তুলজাপুরের মন্দির আক্রমণ করিয়া হিন্দুদের যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। ম্লেচ্ছদের উপর হিন্দুদিগের জাতিবৈর দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শিবাজী চরমুখে সকল সংবাদ পাইতেছেন। আফজুল খাঁ অনেক সৈন্যসামন্তে পরিবৃত, তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, ছলে ও কৌশলে তাঁহাকে মারিতে হইবে। শিবাজী নবাব সাহেবের নিকট দূত পাঠাইলেন ও ভয়ের ভান করিয়া এই রূপ দেখাইতে লাগিলেন যে তিনি নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতে এখনি প্রস্তুত, কেবল প্রাণভয়ে ধরা দিতে নারাজ। খাঁ সাহেব যদি প্রতাপগড়ে অধীনের সাক্ষাৎকারে সম্মত হন তাহা হইলে মুখে সকল কথা হইবে! অবশেষে তাহাই সাব্যস্ত হইল। নবাব কোন দুরভিসন্ধি মনে না আনিয়া শিবাজীর সহিত সহজভাবে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন--একজন মাত্র সঙ্গী, পরিচ্ছদের মধ্যে এক পাতলা মসলিনের কাপড়, আর একটি সোজা তলবার—সে শুধু অলঙ্কারের জন্য,--ব্যবহারের মানসে নয়। বেহারাগণ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে পাল্‌কী নামাইল কিন্তু শিবাজী সেখানে নাই। দূর হইতে দুজন মানুষ দেখা যাইতেছে—ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে তাহাদের পদক্ষেপ। বাহিরে দেখিতে শিবাজী নিরস্ত্র কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি 'ভবানী' তলবার ও 'বাঘনখ' গুপ্তাস্ত্রে সুসজ্জিত। বাহিরে সামান্য শুভ্র বেশ কিন্তু ভিতরে তিনি লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত। শিবাজী ক্রমে অগ্রসর হইলেন—খাঁ সাহেব তাঁহার সঙ্গে দস্তুর মত কোলাকুলি করিতে গেলেন। কিন্তু শিবাজীর সে ভাল্লুকের আলিঙ্গন--তাঁহার হস্তে প্রচ্ছন্ন 'বাঘনখ' ছিল তাহার আঘাতে নবাবের উদর বিদীর্ণ হইল। বাঘনখে যাহা হইবার বাকী ছিল ভবানী খড়্গো তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন। (১)

এদিকে পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। কামানের শব্দে পাঁচবার দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত হইল। নীচে মুসলমান সেনা অপ্রস্তুত ভাবে ছিল, শিবাজীর মাওলীরা চারিদিক্ হইতে তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। প্রত্যূষে ১৫০০ অশ্বারোহী সেনা সদর্পে কুচ করিয়া পাহাড়ের নীচে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই দুর্দ্দশার কাহিনী বলিবার জন্য যে

(১) সুবিখ্যাত মারাঠী ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফের এইরূপ বর্ণনা। অন্য লেখকেরা বলেন যে উভয় পক্ষেরই মনে মনে দুরভিসন্ধি ছিল— কে কাহাকে ধরিতে পারে উভয়েরই এই মনোভাব। কেহ কেহ বলেন শিবাজীর উপর নবাবেরই প্রথম আক্রমণ—শিবাজীর আত্মরক্ষার্থে নবাবকে মারিতে হইল। কিন্তু গুপ্তাস্ত্রের ব্যবহার ও পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে সৈন্যের আক্রমণ—এই সকল দেখিয়া প্রচলিত প্রবাদই সমূলক বলিয়া অনুমান হয়।

ফিরিয়া যাইবে এমন অল্প লোকই অবশিষ্ট রহিল।

এই জয়লাভে শিবাজী সৌভাগ্য সোপানে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। শিবাজী এই জয়লাভের পর নিদ্রিত রহিলেন না। গিরিদুর্গ সকল হস্তগত করা তাঁহার যে সাধ তাহা অবাধে মিটাইতে পারিলেন।

আফজুল খাঁর পতনের পর পহ্নালার দক্ষিণ কৃষ্ণানদী তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ

আফজুল খাঁর বধ
(শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত)

শিবাজী রাজ্যসাৎ করিয়া লন। বিজাপুর হইতে দ্বিতীয়বার যে সৈন্যদল প্রেরিত হইল তাহাও পরাস্ত হইল। তৃতীয় যুদ্ধে শিবাজী বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া পহ্বালা দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিজাপুরের প্রবল সৈন্য সেই দুর্গ আক্রমণ করিল—পলায়ন ভিন্ন রক্ষা নাই। শিবাজী কৌশলক্রমে শত্রুহস্ত এড়াইয়া রঙ্গাণায় সরিয়া পড়িলেন। বিজাপুর সৈন্য তাঁহাকে ধরিতে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। সেই সঙ্কটে সেনানী বাজি প্রভু এক সহস্র মাগুলী লইয়া আগম নিগমের পার্ব্বত্য সুঁড়ী পথ আগলাইয়া রহিলেন। ৯ ঘণ্টা কাল তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার তৃতীয়াংশ সেনা মারা পড়িল তবুও তিনি অটল। অবশেষে তোপধ্বনিতে রঙ্গাণায় শিবাজীর নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবার সংবাদ পাইয়া নিরস্ত হইলেন। কিছু পরে তিনি নিজেও আহত হইয়া সহাস্য বদনে প্রাণত্যাগ করেন। বাজি প্রভুর এই বীরত্ব কাহিনী প্রাচীন গ্রীসের Thermopylæ রক্ষণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রঙ্গাণা পথের এই দুর্গম স্থান মারাঠা সমরের Thermopylæ থর্ম্মাপিলি।

ইহার পরেও কতবার বিজাপুর রাজা শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল, পরিশেষে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি বন্ধনে পরিত্রাণ পাইলেন। ফলে কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় কোঙ্কণ প্রদেশ এবং ভীমা হইতে বারণা নদী পর্য্যন্ত ঘাট-শ্রেণীর প্রদেশ সমূহ, দক্ষিণে ১৬০ মাইল পূর্ব্বে ১০০ মাইল ব্যাপিয়া শিবাজীর অধিকার-ভুক্ত হইল।

এখনো কিন্তু সকল শঙ্কট দূর হয় নাই—বিজাপুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আবার মোগলের কোপচক্রে পতিত হইলেন। এক ফাঁড়া গিয়া আর এক ঘোরতর ফাঁড়া উপস্থিত। এই বিষম শঙ্কট হইতে শিবাজী কি কৌশলে উদ্ধার পাইলেন তাহা বর্ণনাযোগ্য।

১৬৬২ সালে মোগলের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হয়। অতঃপর দক্ষিণের মোগল প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে শাসন করিতে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বাহির হইলেন। শিবাজীর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নবাব পুণায় আসিয়া আড্ডা করিলে শিবাজী তাঁহার সিংহগড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। নবাব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান—"তুমি মর্কট বানরের মত পাহাড়ের উপর বসে থাক—যুদ্ধের বেলায় কেল্লায় বন্ধ থেকে এগোতে সাহস কর না, এবার আমি তোমাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়ব না।" শিবাজী উত্তর করিলেন—"আমি বানর সত্য কিন্তু সেই রামসৈন্য বানরের জাত যারা রাবণ বধ করে লঙ্কা জয় করেছিল। আমি তোমাকে এমন জব্দ করব যে পালাবার পথ পাবে না।" বাস্তবিক তাঁহার কথাই ঠিক হইল। নবাব যে বাড়ীতে ছিলেন তাহা এক সময়ে শিবাজীর বাসগৃহ ছিল, নাম লালমহল, তিনি তাহার অন্তর বাহির অন্ধি সন্ধি সকলি ভাল করিয়া জানিতেন। সায়েস্তা খাঁ সেনা-পরিবৃত—বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য

যাহা কিছু করা যাইতে পারে কিছুই ত্রুটি করেন নাই। শিবাজী একরাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ তাঁহার দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সৈন্যদল স্থাপন করিয়া ২৫ জন মাওলীর সঙ্গে এক বিবাহের বরযাত্রী দলে মিশিয়া নগরে প্রবেশ লাভ করেন। কেহ কিছু সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে পিছনের এক দ্বার দিয়া নবাবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ এইরূপ আকস্মিক বিপদ দেখিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। শেষে আপনার শয়ন গৃহের গবাক্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়া খড়্গাঘাতে দুইটি মাত্র অঙ্গুলি হারাইয়া কোনমতে পার পাইলেন। এই উপপ্লবে নবাবের পুত্র ও অনুচরবর্গ মারা পড়ে। শিবাজীর চকিতের ন্যায় উদয়—চকিতের ন্যায় অন্তর্ধান। তাঁহার অনুচরগণের জয়ধ্বনি ও মসালের আলোকের মধ্যে তিনি মহাসমারোহে স্বীয় দুর্গে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত সাহসিক কার্য্যের আশাতীত ফল লাভ হইল। মোগল সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়া ছড়িভঙ্গী হইয়া পড়িল। ইহার পর সায়েস্তা খাঁ আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।

শিবাজীর সাহস এমনি বাড়িয়া উঠিল যে কিছুকাল পরেই তিনি চতুঃসহস্র অশ্বারোহীসহ হঠাৎ সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট তখন বিদেশীয়দের বাণিজ্য ক্ষেত্র ছিল। ছয় দিন ধরিয়া ইচ্ছামত নগর লুণ্ঠন করিয়া অগাধ ধনরত্নে তিনি তাঁহার রায়গড় কেল্লার ধনাগার পূর্ণ করিলেন। এই আক্রমণকালে ইংরাজেরা অতুল বিক্রম ও সাহসের সহিত আপনাদের কুঠী রক্ষা করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য ব্রিটিষ সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে!

আশ্চর্য্য পলায়ন

এই সকল ঘটনার কিছু পরেই দেখিতে পাই যে শিবাজী মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজীবের কুহকে পড়িয়া দিল্লীতে বন্দীকৃত হইয়াছেন। মোগল সেনাপতি জয়সিংহের সহিত মিলিয়া তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেন। এই ব্যাপারে মারাঠীরা এরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল যে দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া শিবাজীকে স্বহস্তে অভিনন্দন পত্র লিখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শিবাজী স্বীয় পুত্র শম্ভোজীকে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। গিয়া দেখেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কিছুই নয়, যেরূপ মানমর্য্যাদা পাইবার আশা ছিল তাহা পাইলেন না। রাজদরবারে তৃতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারদের সহিত একাসনে বসিতে হইল, বাদসা তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, এইরূপ ব্যবহারে শিবাজীর মনে এমনি মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল যে তিনি সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাসায় গিয়া দেখেন তাঁহার গৃহের চারিদিকে সিপাই সান্ত্রীর পাহারা, পলাইবার পথ নাই। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন দিল্লী আসিয়া ভাল কাজ করেন নাই, পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। তিনি পীড়ার ছল করিয়া শয্যাগত রহিলেন। কয়েকজন বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসিত, তাহাদের দিয়া বাহিরের মিত্রবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ হইল। তিনি

আর একটা ফন্দী করিলেন। ফকীর কাঙ্গালীদের মিষ্টান্ন ও আর আর দ্রব্য বিতরণ করা, নিত্য কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার এক কাজ হইল, ঐ সকল সামগ্রী বড় বড় চুবড়ী করিয়া পাঠান হইত। এইরূপে কিছুদিন যায়, এক রাত্রে তিনি নিজে একটা চুবড়ীর মধ্যে লুকাইয়া পুত্রটিকে আর একটায় পুরিয়া দুই বাহকের স্কন্ধে বাহির হইলেন, দ্বারপালেরা অভ্যাসবশতঃ ওদিকে বড় লক্ষ্য করিল না। তাঁহার শয্যায় একজন ভৃত্যকে রাখিয়া দিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়ন কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। তাঁহার জন্য একস্থানে অশ্ব প্রস্তুত ছিল তাহাতে চড়িয়া পুত্রকে সঙ্গে বসাইয়া লইয়া সেই যে একটানা চলিলেন আর কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। মথুরায় আসিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ভস্মলেপন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। পুত্রকে সেখানেই রাখিয়া গেলেন, বেচারা এমন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে আর নড়িবার শক্তি ছিল না। তথা হইতে আলাহাবাদ, আলাহাবাদ হইতে কাশী, কাশী হইতে গয়াতীর্থ, গয়া হইতে কটক, কটক হইতে হাইদ্রাবাদ, এইরূপে ৮ মাসের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রাজগড়ের কেল্লায় তাঁহার মাতা জীজাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। একদিন হঠাৎ দুই জন বৈরাগী জীজাবার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। জীজাবা তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলে, একজন দস্তর মত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অন্যজন পাগড়ী খুলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। মাথায় চিহ্ন দর্শনে আপনার পুত্রকে চিনিতে পারিয়া জীজাবা তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনেকদিন পরে পুত্রকে পাইয়া জিজাবার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেদিন কাঙ্গালীদিগকে অন্নদান, তোপধ্বনি ও বাদ্যোদ্যমের ধূম পড়িয়া গেল, নরনারী ছোট বড় সকলেই আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল।

এই প্রকারে অশেষ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শিবাজী অল্পে অল্পে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইল। 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' এই দ্বিবিধ কর আদায় করিবার পরওয়ানা প্রথম দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, পরে রীতিমত বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করিলেন। ৬ই জুন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা পদবী গ্রহণ করিয়া রাজগড়ে মহা ধূমধাম করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই উপলক্ষে আপনাকে স্বর্ণস্তূপে ওজন করিয়া স্বীয় দেহভার পরিমাণ স্বর্ণরাশি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করত অতুল খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ৫ই এপ্রেল ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়েসে রায়গড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যাধিকার সামান্য ছিল না। গুণ্ডাবী হইতে পাণ্ডা পর্য্যন্ত (ইংরাজ ও পোর্ত্তুগীসদের কোন কোন স্থান বাদে) কোঙ্কণের সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ; ওদিকে আবার পুণা হইতে জুনের পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত মারাঠা প্রদেশ—কত গিরি দুর্গ সমেত তাঁহার অধিকারভুক্ত; কারওয়ার অঙ্কোলা প্রভৃতি কতকগুলি সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে তাঁহার থানা; তাহা ছাড়া দ্রাবিড় তাঞ্জোর, কর্ণাটক, খানদেশ ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার বিজিত ভূখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত। দস্যুবৃত্তি

হইতে শিবাজীর জীবনের আরম্ভ—অসীম রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তিনি জীবনযাত্রা শেষ করেন।

শিবাজীর শাসন প্রণালী

শিবাজী রাজার অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাঁহার রাজ্যের আয়তন কতটুকু ছিল অল্পকালের মধ্যে সেই রাজ্য যে কি বিপুল বিস্তার লাভ করিল তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শিবাজীর শেষাবস্থায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার প্রতাপ অতুলন, তাপ্তীনদী হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান সকল রাজার রাজেশ্বররূপে তিনি একবাক্যে গৃহীত হইলেন।

শিবাজী রাজার রাজ্যলাভে যেমন চাতুর্য্য, রাজ্যসংগঠন ও শাসনকার্য্যেও তেমনি তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অর্জন ও রক্ষণ ক্ষমতা যাঁর একাধারে এইরূপ যোগক্ষেমসম্পন্ন মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শিবাজীকে সেই মহাপুরুষদের আসনে স্থান দিতে হয়। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী বিচার যোগ্য, অধুনাতন সভ্যজগতের মাপদণ্ড দিয়া মাপিয়া দেখিলেও তাহাকে হেয় জ্ঞান করা যায় না। সংক্ষেপে তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

প্রথম। এক একটি গিরিদুর্গ এক এক প্রদেশের কেন্দ্রস্থল

মারাঠী ইতিহাস (বখর) লেখকেরা বলেন শিবাজী রাজা ক্রমশঃ ২৮০ সংখ্যক গিরিদুর্গ হস্তগত করেন। এই সকল দুর্গ নির্ম্মাণ ও সংস্কার কার্য্যে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তাহাতে যত পরিশ্রম যতই অর্থব্যয় হউক না কেন কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতেন না। শত্রু আক্রমণ বল, আত্মরক্ষাই বল, মারাঠী রাজ্য স্থাপনের সময় প্রথম প্রথম দুয়েতেই এই সকল দুর্গের বিশেষ উপযোগিতা ছিল। এই সকল বন্ধনী মারাঠী সাম্রাজ্যের বন্ধন, বিপদের সময় ইহারাই রক্ষা-কবচরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সকল দুর্গ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে শিবাজী তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দুর্গরক্ষণে একজন মারাঠা হাওয়ালদার ও তাহার কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত ছিল। তাহার দেওয়ানী ও রেবেন্যু কার্য্যভার একজন ব্রাহ্মণ সুবেদারের হাতে—দুর্গের অধীনস্থ গ্রাম সমূহের কার্য্য তাহার অন্তর্গত। আর একজন প্রভুজাতীয় কর্ম্মচারী ধান্য ও রসদ যোগাইবার ও জীর্ণসংস্কারের কাজে নিযুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন তিনবর্ণের লোক এক কর্ম্মসূত্রে বাঁধা, পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য চলিত। নীচে রামোসী প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতীয় লোকেরা প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। দুর্গের আয়তন ও উপকারিতা অনুসারে দুর্গপালের সংখ্যা। এক একজন নায়কের অধীনে নয় জন সিপাই; বন্দুক, তলবার, বর্শা পট্টা—এই সকল অস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত। ইহারা সকলে আপন আপন পদ ও কর্ম্মানুসারে বেতনভোগ করিত। গিরিদুর্গ হইতে নীচে সমান জমিতে আসিলে তার অন্য প্রকার ব্যবস্থা।

শিবাজীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকদের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল উল্লিখিত নিয়মাবলী তাহার নকল মাত্র। পদাতিক সৈন্যদলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই ;

মহাবলেশ্বর ও শিবাজীর দুর্গ প্রতাপগড়।
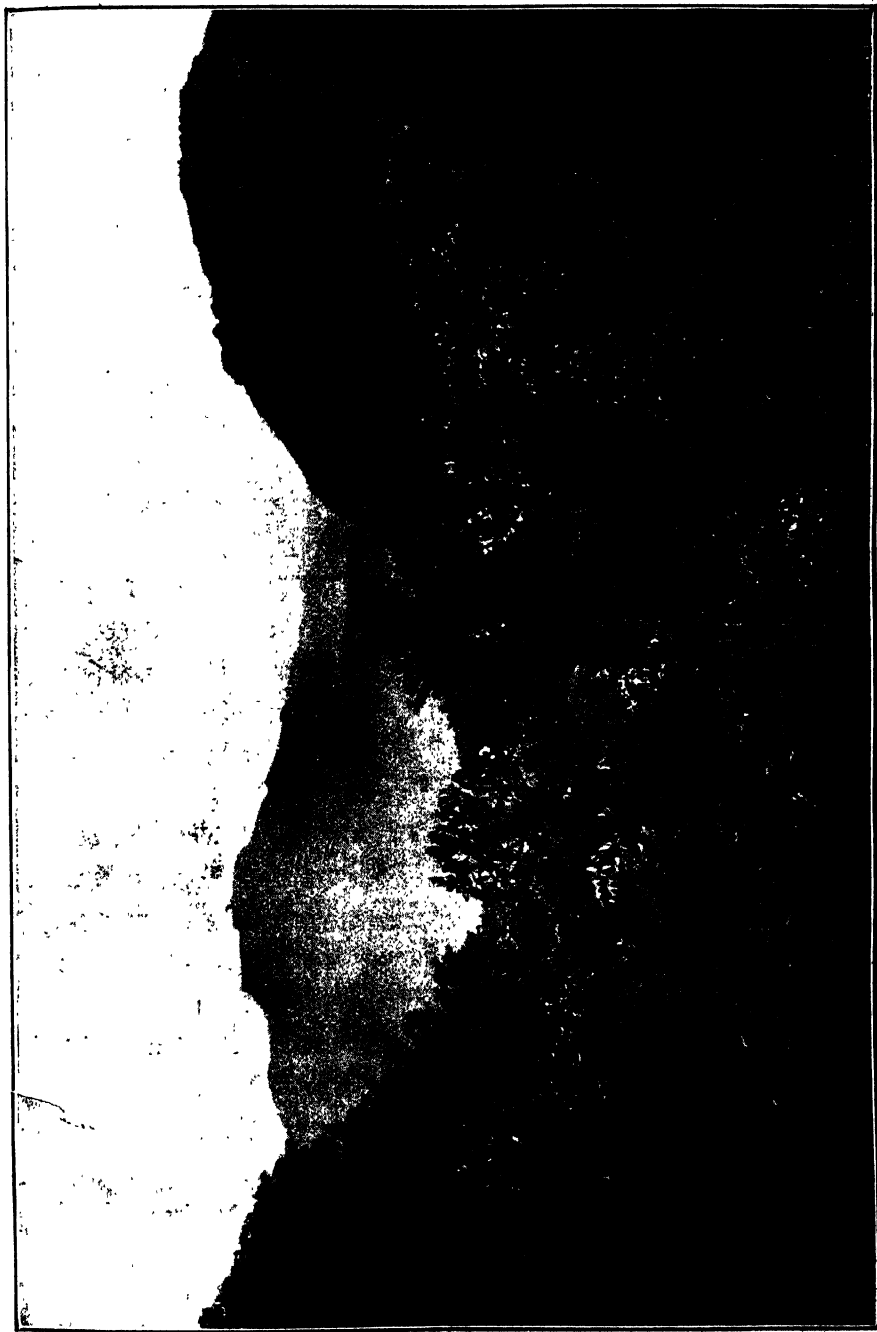
একজন নায়কের অধীনে ১০ জন সিপাই —নায়কের উপর হাওয়ালদার তার উপর জুমালেদার—একসহস্র সিপাইয়ের অধিনায়ক একজন 'হাজারী'—৭০০০ সেনানায়ক যিনি তাঁহার নাম সর্ণোবৎ। এই গেল মাওলী পদাতিক। ঘোড়সোওয়ার দলের নিম্ন-শ্রেণীর নায়ক সিলেদার, ২৫ সিলেদারের উপর একজন হাওয়ালদার, হাওয়ালদারের উপর জুমালেদার, দশ জুমালায় এক হাজারী, ৫ হাজারীর অধিনায়ক একজন সর্ণোবৎ। উচ্চশ্রেণীর মারাঠা সৈনিকের অধীনে এক একজন ব্রাহ্মণ সুবেদার ও অন্য জাতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। সৈনিকের উচ্চনীচ সকলেরই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন জায়গীর বা জমিদারী স্থাবর সম্পত্তি পুরস্কারস্বরূপ তাহাদের ভোগে আসিত না—ধান্য অথবা নগদ টাকাই তাহাদের বেতন। এই সকল কড়াক্কড় নিয়ম সত্ত্বেও শিবাজীর সৈন্যসংগ্রহে কোন বাধা ছিল না। আর আর সকল কাজের মধ্যে সৈনিকের কাজে লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। দশারার দিনে মাওলী, হেতকরী, সিলেদার প্রভৃতি লোকেরা দলে দলে জাতীয় পতাকা তলে মিলিত হইয়া শিবাজীর সৈন্যদল ভুক্ত হইত। দশারার উৎসব সৈন্যসংগ্রহের কাল,—শিবাজী রাজা ঐ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন।

দ্বিতীয়। অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা

সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবাজী অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা সংগঠন করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আটজন কর্ম্মচারী সেই সভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

১। পেশওয়া প্রধান মন্ত্রী (Prime minister)। রাজ্যের মুলকী, দেওয়ানী ফৌজদারী প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যভার তাঁহার হাতে, রাজার নীচেই তাঁর আসন।

২। সেনাপতি (সর্ণোবৎ) (Commnader-in-chief) সেনা বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ দুইজন স্বতন্ত্র ছিল।

৩। অমাত্য (মজুমদার) (Finance minister)। ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা। ইঁহাকে রাজ্যের সমস্ত হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইঁহার কার্য্যভার গুরুতর।

৪। সুর্ণীস (Minister of public records and correspondence) ইনি রাজ্যের পত্রব্যবহার বিভাগের কর্ত্তা। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইঁহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে সমস্ত মঞ্জুর হইত।

৫। ব্যক্কানিস (Private Secretary) ইঁহাকে শিবাজীর নিজস্ব দৈনন্দিন হিসাব ও কাগজপত্র রাখিতে হইত। রাজার গৃহরক্ষক সৈন্যদলের, তথা গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ভার ইঁহার উপর।

৬। সুমন্ত (ডবীর) Foreign minister) বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও অপরাপর বিদেশীয় রাজকার্য্য ইনি নির্ব্বাহ করিতেন।

৭। পণ্ডিতরাও (Minister of Education) স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। ধর্ম্ম দণ্ড বিজ্ঞান বিভাগ ও রাজ্যসম্বন্ধীয় ফলাফল গণনার ভার ইঁহার উপর ছিল।

৮। ন্যায়াধীশ (Chief Justice) অন্য হিসাবে (Law member) পণ্ডিতরাও এবং ন্যায়াধীশ ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক সভাসদকেই সেনানায়কতা করিতে হইত। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে যথোচিত সময় দিতে পারিতেন না। এইহেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একজন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। আবার প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অধীনে আটজন কনিষ্ঠ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত—যথা

১। দেওয়ান অথবা কারবারী

২। মজুমদার হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষক

৩। ফর্ণবীস সহকারী হিসাব পরীক্ষক

৪। সবনিস্ (দফতরদার)

৫। কর্কনিস (Commissary)

৬। চিটনিস্ (Secretary)

৭। জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ইঁহার হাতে থাকিত।

৮। পোটনিস খাতাঞ্চি

এই অষ্টপ্রধান সভা, শিবাজীর উদ্ভাবনী শক্তির ফল, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। এই শাসন প্রণালী পেশওয়ার আমলে রক্ষিত হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যভার পেশওয়ার হস্তেই গিয়া পড়িল। পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার পদ বংশানুগামী হইল। সেনাপতি সচিব সুমন্ত, পেশওয়া নিজেই সকলি একাধারে, সে সকল পদ নামমাত্র। পদগুলি বংশগত হইল সত্য, তার আনুসঙ্গিক মানমর্য্যাদা রহিল কিন্তু কাজের বেলায় শূন্য। অন্যান্য বীরেরাও পেশওয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। সিন্দে, হোলকার, গাইকওয়াড়, ভোঁসলে ইহারা সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদির রাজ্যভোগের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রণালী-বদ্ধ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটিল। ভাল মন্দ রাজার উপর প্রজার সুখ দুঃখ, রাজ্যের শ্রীসম্পদ সকলি নির্ভর। পেশওয়ার বংশধর রাজগণের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী যোগ্যপুরুষ তাঁহাদের হস্তে যতদিন রাজ্যভার ছিল ততদিন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের গৌরব ও সৌভাগ্য, পরে পেশওয়া বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেরও দুর্গতি হইল। কালক্রমে মারাঠী সাম্রাজ্যের একতা নষ্ট হইল, রাজ্যের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল!

তৃতীয়। যাহাতে বড় বড় পদ বংশানুগামী হইয়া বিকার প্রাপ্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য। বড় বড় পদ বংশগত করা শিবাজীর মনঃপূত ছিল না—স্বাভাবিক গুণ ও কর্ম্মযোগ্যতা অনুসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা এই তাঁর রাজনীতি। উচ্চপদ বংশগামী হইবার দরুণ রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটিল শিবাজীর পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যোগ্যতা অনুসারে কার্য্যভার অর্পণ ইহাই যথার্থ রাজধর্ম্ম।

চতুর্থ। বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা।

রাজকীয় কর্ম্মচারীদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের হাতে জায়গার জমিদারী সঁপিয়া দেওয়া, ইহা শিবাজীর মতবিরুদ্ধ

ছিল। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষের পারিতোষিক স্বরূপ জায়গীর ইনাম দিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শিবাজীর বিধানে পেশওয়া সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাই কারকুন পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রাজকোষ কিম্বা ধান্যভাণ্ডার হইতে বেতন পাইত। নির্দ্দিষ্ট বেতন নিয়মিত সময়ে দেওয়া হইত। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী জায়গীরদার জমিদার সৃষ্টি করা রাজ্যের হিতকর নহে, শিবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। আমাদের দেশে কেন্দ্রবর্জ্জনী শক্তি কেন্দ্রমুখী শক্তিকে সহজেই ছাড়াইয়া উঠে—শিবাজী এই গতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কার্য্য করিতেন। এই কারণে জায়গীরদারী প্রথার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি, জমিদারদের দুর্গনির্ম্মাণেরও নিষেধ ছিল। অন্যান্য রায়তের ন্যায় অরক্ষিত গৃহে বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। শিবাজী যে জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে তাঁহার সময় যে সকল বড় বড় লোক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই উত্তরাধিকারী-দের জন্য বৃহদায়তন ভূমি সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভূসম্পত্তিশালী বৃহৎ-পরিবার পত্তন শিবাজীর পরবর্ত্তী কালের প্রথা। শিবাজী যাহা কিছু ভূমিদানের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মক্ষেত্রে—মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দান ধর্ম্মের কার্য্যে নিয়োজিত হইত।

বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজনার জন্য দক্ষিণা দিবার নিয়ম ছিল। শিবাজীর রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চ্চা বড় একটা ছিল না কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত দক্ষিণাদি দানব্যবস্থার দরুণ ছাত্রগণ কাশী হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া আসিত, এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার হইল। পেশওয়ারাও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

পঞ্চম। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা। রাজা প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, জমিদারের মধ্যবর্ত্তিতা নাই, শিবাজীর এই নিয়ম ছিল। তাঁহার বিশ্বাস এই যে খাজনা আদায়ের কাজে মধ্যবর্ত্তী জমিদার নিয়োগ করা যত অনর্থের মূল। তাহার ফল এই হয় যে জমিদার বেশীর ভাগ খাজনা আত্মসাৎ করে, সরকারী তহবিলে অল্পই আসে, এইহেতু তিনি জমিদারী প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। তিনি যোগ্য বেতন দিয়া কমাবিসদার মহলকারী সুবেদার প্রভৃতি রেবেন্যু কর্ম্মচারী রাখিতেন—রায়তদের যাহার যাহা দেয় তাহার জন্য কবুলায়ৎ লওয়া হইত। ফসলের দ্বিতীয় পঞ্চম অংশ সরকারী খাজনার হার অবশিষ্ট রায়তের নিজস্ব থাকিত। তখন আদালতের কাজ বেশী ছিল না।—সুবেদার দেওয়ানী ফৌজদারী দুই কাজই করিতেন। তেমন কিছু বড় মকদ্দমা উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তের হাতে সমর্পিত হইত।

ষষ্ঠ। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট বা ইজারা দেওয়া রহিত করা। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট দিয়া জমিদার বা ইজারাদার নিয়োগ শিবাজীর নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। পেশওয়াই আমলেও এই নিয়ম অনেককাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল। শেষ বাজিরাওএর রাজ্যে যখন অরাজকতার একশেষ তখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল। ইজারদারী নিয়মে

রায়তের উপর অত্যাচারের সীমা রহিল না। ইজারদারেরা প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ন্যায্য দেনার উপর যতটা আদায় করিতে পারে সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিত না।

সপ্তম। সিবিল বিভাগের অধীনে সেনা বিভাগ রক্ষা করা। এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত, নহিলে সৈন্যপ্রতাপ রাজশক্তিকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়ে।

অষ্টম। জাতিনির্ব্বিশেষে কর্ম্মবিভাগ। ব্রাহ্মণ প্রভু মারাঠা উচ্চনীচ বর্ণের সম্মিশ্রণে রাজকার্য্য পরিচালন করা শিবাজীর নিয়ম ছিল; যাহাতে কোন এক বিশেষ জাতির প্রাধান্য নিবারিত হয়, স্বেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধ হয়, পরস্পরের একটা শাসন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাই উদ্দেশ্য। শিবাজীর পরে এই নিয়মটী রক্ষিত হয় নাই। পেশওয়াই অমালে ব্রাহ্মণেরই আধিপত্য দেখা যায়।

শিবাজীর যে শাসনপ্রণালী বর্ণিত হইল ব্রিটিশ রাজ্য শাসনপ্রণালী তাহার প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে। দেওয়ানী ও সৈনিক ভাগের পার্থক্য সাধন, সৈনিকের উপর দেওয়ানীর প্রভুত্ব স্থাপন, নির্দ্দিষ্ট বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ, বড় বড় পদ বংশগত না করিয়া যোগ্যতা অনুসারে জাতিনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে নিয়োগ, রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা, সভাপতির মন্ত্রণায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা, এই সমস্ত সুশাসন প্রণালী অবলম্বন করিয়া মুষ্টিমেয় ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে একছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিবাজীনির্দ্দিষ্ট শাসন-প্রণালীর অন্যথাচরণ করিয়াই পেশওয়া রাজ্য স্বীয় অধঃপতনের সোপান প্রস্তুত করিল! (২)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঋষি ও ব্রাহ্মণ

ঋষি ও ব্রাহ্মণ এক জাতি আমরা চিরকাল এই কথাই শুনিয়া আসিতেছি—কিন্তু এ প্রবন্ধে আমি দেখাইব যে ঋষি আর্য্যবংশসম্ভূত আর ব্রাহ্মণ মেজাই হইতে উৎপন্ন। ইরাণীগণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রাচীনকালে মেজাই বলিত। এই মেজাই জাতি পারস্য দেশের পশ্চিমভাগস্থ মিডিয়া দেশ হইতে আসিয়া ইরাণে বসবাস আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাণে ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

"অথর্ব্বণদিগের আগমন" আবেস্তায় প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে ইরাণে ঈশ্বরভক্তি ছিল না; কিন্তু আবেস্তালিখিত

---

(২) Rise of the Mahratta Power
by M. G. Ranade
Grant Duff's History of the Mahrattas.

ধর্ম্মের বিপরীত একটা ধর্ম্ম তথায় বর্ত্তমান ছিল। লোকেরা তখনও প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক ছিলেন।

এই ঘটনা কার্সেনি সংঘটিত কিংবদন্তিতে উক্ত হইয়া থাকে। কার্সেনি বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগকে অথর্ব্বণদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দিবেন না। কার্সেনি একজন পৌরাণিক নৃপতি, অথর্ব্বণদের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য তিনি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। হোম (সোম) তাঁহাকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার শক্তি হরণ করিয়া লন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, এই ব্রাহ্মণেরা কোনরূপ ঐশ্বরিক বলে তাঁহার প্রতিরোধ নষ্ট করিয়া লোকদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

আবেস্তা গ্রন্থে ইঁহারা "দেশ পর্য্যটক" নামে উক্ত হইয়াছেন এবং এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, রাঘ, অর্থাৎ মিডিয়াদেশে, অথর্ব্বণদের বাস ছিল। এখানে তাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্ম লইয়া থাকিতেন না, তাঁহারা বিষয় কর্ম্মেও লিপ্ত থাকিতেন।*

অথর্ব্ববেদ বহুকাল আর্য্যসমাজে গৃহীত হয় নাই। কালক্রমে অথর্ব্ববেদ বেদ মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িল ও অথর্ব্বণগণ "অথর্ব্বণ" নাম ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিলেন। তখনকার ইরাণী ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার বিশেষ প্রভেদ ছিল না; সুতরাং অথর্ব্বণগণ সহজে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। ইহা সত্বেও এই ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বরং ক্ষত্রিয় গণের নিকটে ইঁহারা প্রথমে জ্ঞান শিক্ষা করেন। তাঁহারা কিসে নিজেদের প্রভুত্ব,

* "The coming of the Athravans" is celebrated in the Avesta. They came from afar bringing piety into the countries. Before they emigrated from their distant homes into Eastern Iran piety had not dwelt there, but a creed different from that which is taught by the Avesta. The people still followed the old Arian religion of nature.

"The same fact is implied in the tradition which puts into the mouth of Kursani these words :—

"No more shall an Athravan come into my country to make proselytes." Kursani is apparently a legendary prince, who counteracts the missionary works of Athravans. It is further on related that Hauma vanquished him and deprived him of his power. This evidently means that the priest succeeded through Divine aid in breaking the resistance of that prince and gaining over his people to their new doctrine."

That the priests in the very epoch of Avesta were still in an unsettled condition and wandered through the country may perhaps be inferred from their appellation "wandering through the country," by which its seems the Athravans are designated in the test."

In Ragha, that is in Media, the Athravons had their homes. There resided the Zaralhushtrotema, and hence the priests had evidently emigrated to the east. In Ragha they had not only spiritual but even secular power." "Civilization of the Eastern Iran in ancient time" by Dr. W. Geiger.

ব্রাহ্মণত্ব, আর্য্যদের মধ্যে দৃঢ়ীভূত করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অথর্ব্বণগণ ক্রমশঃ ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমত এ দেশে প্রচলিত করেন। আর্য্যেরা বরাবরই বৈদিকধর্ম্ম মানিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ একটা নূতনধর্ম্ম, একটা নূতন সামাজিক প্রথা আসিয়া পড়িল। এই নূতন ধর্ম্ম, এই নূতন সামাজিক প্রথা আর্য্যগণ প্রথমে সহজে গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে প্রথমে অথর্ব্বণদিগের সহিত তাঁহাদের মহাবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। পরশুরাম নামে একজন অথর্ব্বণ নিজ দলবল সহ আর্য্যদের সহিত তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারই জয় লাভ হয়। অথর্ব্বণেরা একটি নূতন বেদ রচনা করেন। ইহার নাম অথর্ব্ববেদ। বিদেশী কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া তখনকার ভারতবাসীর মধ্যে শূদ্রগণের উপর এই ব্রাহ্মণগণের কোপানল অতি নৃশংস ভাবে নিপতিত হইয়াছিল। কারণ ব্রাহ্মণগণ দেখিল লোক সংখ্যায় শূদ্রজাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জাতি। ইহারা যদি লেখাপড়া শিখিতে পায়, যদি ইহারা আর্য্যদের সমকক্ষ হইবার জন্য আর্য্য ভাবে শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব তাঁহাদের প্রভুত্ব এই শূদ্র জাতির দ্বারা লোপ পাইবে। এই ভয়ে তাঁহারা শূদ্র জাতির প্রতি এত নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এবং শূদ্র জাতিকে এত কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু এক সময়ে এই শূদ্র জাতির দ্বারা ইহাদের ব্রাহ্মণত্ব ও প্রভুত্ব নির্ম্মূল হইয়াছিল।

আর্য্যরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন, অনার্য্যের সহিত তাঁহাদের বিশেষ শত্রুভাব ছিল। কিন্তু যখন অনার্য্যগণ শান্তভাব ধারণ করিলেন, আর্য্যরাও তাঁহাদের প্রতি শত্রুতাচরণে বিরত হইলেন। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যরা অনার্য্য কন্যা বিবাহ করিতেন। আর্য্যের ঔরসে দাসকন্যার গর্ভের সন্তানসন্ততিগণ আর্য্য ভাবে আর্য্য সমাজে গৃহীত হইতেন! এমন কি বেদ-মন্ত্র পর্য্যন্ত শূদ্র দ্বারা রচিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আর্য্যগণ শূদ্রগণের প্রতি কোনরূপ কঠোর ভাব দেখান নাই, বরং তাহাদিগের আর্য্য ভাবে শিক্ষিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পরে তাহাদিগকে আর্য্যদের সহিত একেবারে পৃথক করিয়া দিয়া, তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমরা ঋষির নাম শুনিয়া মনে করিয়া লই যে, ঋষিগণ গায়ে ভস্ম মাখিয়া, জটা বল্কল পরিয়া বনে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। এই ঋষিগণ অতি উগ্র স্বভাবাপন্ন, যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন, অমনি তাহাকে শাপ দিতেন, শাপ প্রভাবে সে কখনও পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত, কখনও বা নানাপ্রকার জন্তুর আকার ধারণ করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারাও সামাজিক জীব ছিলেন, আর্য্যঋষিরা বিবাহ করিতেন, তাঁহাদের পুত্র কন্যা হইত। যাঁহারা আর্য্যদের মধ্যে শিক্ষিত ও জ্ঞানী, তাঁহারা অতুল পরিশ্রমে ও

অতুল অধ্যবসায়ে নিবিড় অরণ্য মধ্যে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, তাঁহারা সরলপ্রকৃতির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আর্য্য ঋষিরা আর্য্য ও অনার্য্য মিশাইয়া একটি প্রকাণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন মাত্র এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে এই অথর্ব্বণগণ আসিয়া তাঁহাদের সমস্ত আশা অকালে নির্ম্মূল করিয়া দিল।

আমাদের ব্রাহ্মণগণের সহিত মেজাইদের নিম্নলিখিত বিষয় সকলে মিল দেখিতে পাওয়া যায়।—

প্রথম। নামে, ইরাণে এই মেজাইদিগকে অথ্রবণ বলিত এবং আমাদের দেশে প্রথমে ইঁহারা অথর্ব্বণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অথর্ব্ববেদই ইহার প্রমাণ। অথর্ব্ববেদ অর্থাৎ অথর্ব্বণদের বেদ। অথর্ব্বণ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ (মেদিনীকোষ)।

দ্বিতীয়। অথর্ব্ববেদের সহিত মেজাইদের Yashts এবং Vendidad-এর অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে অর্থাৎ অথর্ব্ববেদে যাদু, শাপ, শত্রু বধ করিবার মন্ত্র প্রভৃতির কথা লিখিত থাকায়, এবং অন্যান্য বেদের সহিত কোনরূপ মিল না থাকায়, আর্য্যগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহাকে মানেন নাই। অন্যান্য বেদগুলি প্রথমতঃ যাগযজ্ঞ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। * *

তৃতীয়। ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষার ভার এই ব্রাহ্মণগণ নিজহস্তে লইয়াছিলেন। শূদ্রগণ একেবারে বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইল। বৈশ্যগণ ক্রমে ক্রমে শূদ্র হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহাদেরও মধ্যে সকলেই লেখাপড়া শিখিতেন না, কেবল মাত্র কতিপয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সীমা বদ্ধ ছিল। প্রাচীন ইরাণেও এরূপ ভাবে বিদ্যাশিক্ষা প্রদত্ত হইত। ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, ও তাঁহাদের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন রূপ সুবিধাজনক নীতি বাক্য অতি যত্নপূর্ব্বক যুবকদের কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত। কারণ পারস্য দেশে মেজাইদের হাতে শিক্ষাভার ন্যস্ত ছিল, এমন কি রাজবংশের বালকেরাও তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষিত হইতেন। †

চতুর্থ। জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করা। অথ্রবণেরা পারস্য দেশের লোকদিগকে চারি জাতিতে বিরক্ত করিয়াছিলেন। যথা (১) Athrova(ব্রাহ্মণ) (২) Rathaistes (ক্ষত্রিয়)

---

* * "This work (Atharva Veda) was for a long time not acknowledged as a proper Veda * * because its contents, which consist chiefly of spell, charms, curses, mantras for killing enemies, &c, were mostly foreign to their other Vedas, which were originally required for sacrifices. On comparing its contents with some passages in the Yashts and Vendidad, we discover great similarity" (Hang's Essays.)

† "These convenient maxims of reverence and implicit faith. were doubtless imprinted with care on the tender minds of youths : since the Magi were the masters of education in Persia, and to their hands the children of the royal family were entrusted." (Gibbon's Decline and Fall of Roman Empire).

(৩) Vastriyo faluyant বৈশ্য, (৪) Huits (শূদ্র)। এই জাতি ভেদ আমাদের মতন। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্যতীত অন্য কাহারও ব্রাহ্মণহইবার অধিকার ছিল না এবং ব্রাহ্মণকন্যাকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ বিবাহ করিতে পারিত না। এই নিয়ম এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।‡ অথর্ব্বণেরা আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্যান্য জাতির সহিত বিবাহাদি করা একেবারে বন্ধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু ঋষিরা ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতেন। অথর্ব্ববেদে অথর্ব্বগণ (religious mendicants) ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী বলিয়া উক্ত। আবেস্তায় অথর্বণগণ দেশ পর্য্যটক উপাধিভূষিত। এ সব দেখিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মেজাইরা আমাদের দেশে আসিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীঅমৃতলাল মজুমদার।

কেল্লা বোকাই নগর

(২)

প্রাচীনতার নিদর্শন স্বরূপ কেল্লা বোকাই নগরে নিজামুদ্দীন আউলিয়া নামক এক সিদ্ধ পুরুষের সমাধি অবস্থিত। স্থানীয় লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায় যে, নিজামুদ্দীন আউলিয়া ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে আগমন করিলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী আশ্রম স্থাপিত হয়। উহাই নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা নামে পরিচিত। সিদ্ধ পুরুষ নিজামুদ্দীন আউলিয়া পরে দিল্লী অঞ্চলে গমন করেন এবং তথায় সমাধিস্থ হন। আমরা যে কবরটী দেখিতে পাই তাহাতে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দেহ স্থাপিত নাই। কেবল তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থেই শিষ্যবর্গ এই কবরটী প্রতিষ্ঠিত করেন।

দিল্লীতে সমাধিস্থ নিজামুদ্দীন আউলিয়া একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বদাউন জেলায় ১২৩৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সকরগঞ্জের সেখফকিরউদ্দিনের শিষ্য এবং সৈয়দ আহম্মদের পুত্র। মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে নিজামুদ্দীন আউলিয়া শ্রদ্ধাভাজন এবং বিখ্যাত সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত কবি আমীর খস্রুর গুরু বলিয়াও নিজামুদ্দীন আউলিয়ার জনসমাজে খ্যাতি আছে। আমীর খস্রু বাহলীক দেশ হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিমে পাতিয়ালা নগরে আসিয়া বাস করেন। যখন গায়েসউদ্দীন তোগলক ভারতের সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন সেই সময় আমীর খস্রু "তোগলক নামা" ইতিহাস প্রণয়ন করেন। সর্ব্ব সমেত খস্রু ৯৯ খানা গ্রন্থ লিখেন এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। শিষ্যের মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ব্বে ১৩২৫ খ্রীঃ অব্দে গয়াস

---

‡ "No one but the son of a priest may be priest, and the daughter of the members of the priestly caste may only be given in marriage within the caste, a custom which continues to this day" [Spiegels Avesta, iii 148].

পুরে (পুরাতন দিল্লী) নিজামুদ্দীন আউলিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। এই ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্য লইয়া বোকাই নগরে আসা অসম্ভব নহে।

অতঃপর দিল্লীনগর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে নিজামবাদ নামক স্থানে আর এক নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবর দৃষ্ট হয়। এই কবরের উপর পারস্য ভাষায় খোদিত ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের শিলা লিপি দেখা যায়। এরূপ প্রবাদ যে ঐ নিজামুদ্দীন হইতেই এই নগরের নাম 'নিজামবাদ' হইয়াছে। এই ব্যক্তিই বোকাই নগরে আসিয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কিম্বা মধ্যবর্ত্তী সময়ে ৩৬০ জন আউলিয়া (সাধু) পদ্মানদী পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে আগমন করেন। শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের প্রায় পরগণায় এক একজন আউলিয়ার সমাধি দেখা যায়। ইঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থই এতদঞ্চলে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সহিত শেষোক্ত নিজামুদ্দীনের অনেকদিনের পার্থক্য হইয়া পড়ে। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি বোকাইনগরে আসেন তাহা অনুমানের উপর স্থির করা কঠিন। অধিবাসিগণ এই সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বিবরণ দিতে পারেন না। আমরা বোকাই নগরের সন্নিকটে একটী নিজামাবাদ গ্রামও দেখিতে পাই। বোধ হয় দিল্লীর নিকটস্থ নিজামাবাদের অনুকরণে ইহার নামকরণ হইয়াছিল। ইহা হইতে শেষোক্ত
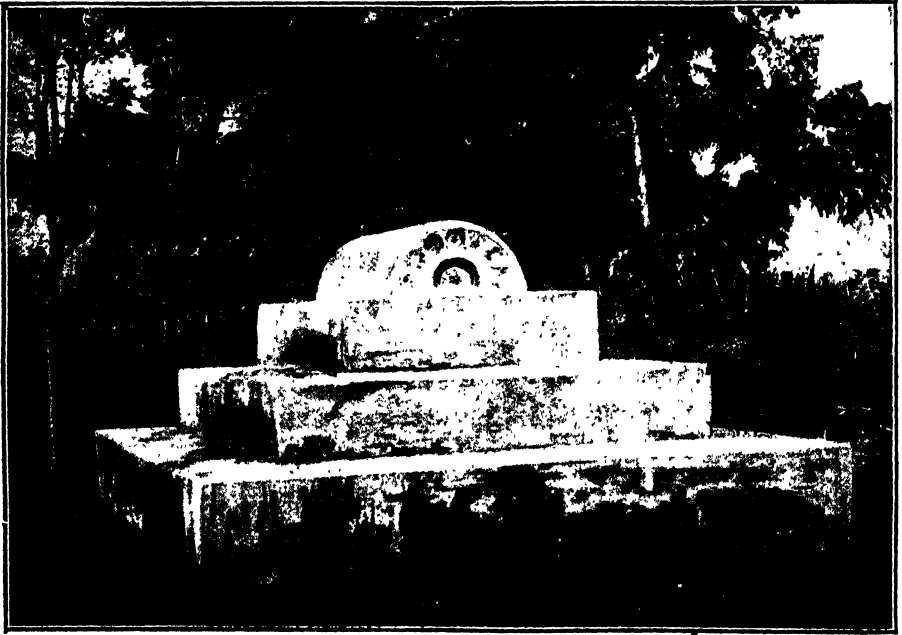
নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কবর—বোকাই নগর

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঠাকুর কর্ত্তৃক গৃহীত।

ব্যক্তিকে বোকাইনগরের সিদ্ধপুরুষ ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। এতদঞ্চলের অন্যান্য দরগার নিয়মপ্রণালীর সহিত ইহার ঐক্য হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত দরগারই ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। কাজেই আমরা কেবল কিংবদন্তির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বোকাই নগরের সমাধিক্ষেত্র এ অঞ্চলে একটী পবিত্র স্থান বলিয়া খ্যাত। কালের আবর্ত্তনে সমাধিটী নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় ইহার পুনঃসংস্কার হইয়াছে। সমাধিটী প্রাচীর বেষ্টিত, প্রাচীন প্রাচীরের কতকাংশ ও আলো দিবার প্রাচীন পাকা স্তম্ভটী এখনও বিদ্যমান আছে। প্রতিদিন দরগার জন্য নিযুক্ত ফকির সন্ধ্যার সময় আলো দিয়া থাকে। ইহার বেষ্টনীর দৈর্ঘ্য ১৫হাত এবং প্রস্থ ১০ হাত। এই দরগাটীকে যে কেবল মুসলমানগণই সম্মান করিয়া থাকেন এমত নহে হিন্দুগণও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। বেষ্টনীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকলেই সম্মানার্থ কুর্ণিশ (অভিবাদন) করিয়া থাকেন। সমাধির দক্ষিণ ভাগে বহুকালের একটী কূপ আছে। উহার জল এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রেণীবদ্ধভাবে বটবৃক্ষগুলি স্থানটীকে ছায়াসুশীতল ও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। দরগার সম্মুখস্থ ভূমিতে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের বৃহস্পতিবার ও রবিবারে মেলা বসে।

কেল্লার ভিতর দিয়া যে নদী প্রবাহিত

সেতু—বোকাই নগর

কুমার শ্রীমান্ হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক গৃহীত।

হইত তাহার উপরিস্থ একটী পাকা সেতুর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। নদীর চিহ্ন এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। সেতুটীর গঠন অতি সুদৃঢ়। উহার কতকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। তৃণ গুল্মের অত্যাচারে এই প্রাচীন কীর্ত্তিটী ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

মুসলমানাধিকারে আসিয়া বোকাই নগর শ্রীসম্পন্ন হয়। কেল্লাদার ও স্থানীয় অর্থশালী ব্যক্তিগণের উৎসাহে নানাবিধ শিল্পেরও বহুল উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে ঐ স্থানের বস্ত্র, বেত্রের কারুকার্য্য ও নানাবিধ সূচীকার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখনও থলিফাপটি, বেনেপটি, তামাকপটি, প্রভৃতি নাম পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে। কয়েকঘর তন্তুবায় অদ্যাপি এখানে বস্ত্রবয়ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব শিল্পগৌরব ও নগরবৈভব পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে বোকাই নগরের অবনতি আরম্ভ হয় তাহা জানা যায় না। বোকাইনগর গ্রাম জমিদারের অধীন নহে, ইহা কালেক্টরীর খাস্ মহালভুক্ত। কিছু দিন পূর্ব্বে যে স্থান ভীষণ হিংস্র জন্তুর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল এক্ষণে আবার তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। অধিবাসিগণ সমস্ত জঙ্গল কাটাইয়া স্থানটীকে চাষাবাদের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। গ্রামের অভ্যন্তরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৯টী কূপ ও ১৫টী পুষ্করিণীর চিহ্ন পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ময়মনসিংহ পরগণার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী কেল্লা বোকাই নগরের মধ্যে স্বীয় বাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। সেই বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর এক বংশধর আজও বাস করিতেছেন। বোকাই নগরের গোঁসাইবাটী বহুদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। রামগোপালপুর, গৌরীপুর, গোলোকপুর, ভবানীপুর, বাসাবাড়ী ও কালীপুর প্রভৃতি জমিদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণের বৃত্তি দ্বারা গোঁসাইদিগের ভরণ পোষণ ও স্থাপিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা চলিতেছে। ৺রাজরাজেশ্বরী কালীমূর্ত্তি ১৭০৭ শকাব্দে গৌরীপুরের স্বর্গীয় যুগলকিশোর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বহু অতিথি এই দেবালয়ে আশ্রয় পাইয়া সেই স্বর্গগত মহাত্মার পুণ্যপ্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছে।

(কুমার) শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

ভাষার উৎপত্তি

অভিব্যক্তিই (evolution) যদি সৃষ্টির নিয়ম হয়, তাহা হইলে বাক্‌শক্তি মানুষ অকস্মাৎ লাভ করে নাই। গ্রামোফোন্ রেকর্ডে যেমন ইচ্ছামত কতকগুলা কথা কৌশলে পুঞ্জীভূত করা থাকে এবং যখন ইচ্ছা তখনই উহাকে ঐ সকল কথা বলাইয়া লইতে পারা যায়, মানুষের মনটা ঠিক সেরূপ নহে। বাক্‌শক্তিশালী মানুষ জন্মাইবার পূর্ব্বে যে মূক মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যে মানুষটি কথার

সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে প্রথমে ইঙ্গিত ইসারা হইতে আরম্ভ করিয়া, যেমন কোষের সমবায়ে জীবদেহ প্রস্তুত হয়, সেইরূপে এক একটি কথা নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং পরে তাহার সন্তানেরা সমস্ত ভাষাটাকে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

কেহ কেহ (১) বলিয়া থাকেন বাক্‌শক্তি মানুষ এককালেই লাভ করিয়াছিল। প্রকৃত বিজ্ঞানের সহিত এই মতের যে সম্পর্ক, এই পৃথিবী ঈশ্বরের আদেশে ছয়দিনে সৃষ্ট হইয়াছিল, এ মতেরও সেই সম্পর্ক। কবিতার হিসাবে দুইই বেশ। কিন্তু বিশ্বনিয়মের যথার্থ মার্গানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানের নিকট উক্ত মতের কোন বস্তুত্ব নাই। যে অনুসন্ধানের দ্বারা বিজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত কবিত্বসুলভ মতকে অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে, সেই অনুসন্ধানের দ্বারা উহা ভাষা সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন মতকেও ক্রমশঃ বিদূরিত করিতেছে। ভাষা যে বিশ্বনিয়মের বহির্ভূত ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে। অভিব্যক্তি যেমন কোন জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনই সে তাহার একটু না একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই যাদুকর ভাষাতত্ত্বকে যখনই স্পর্শ করিয়াছে, তখনই উহা একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে মানুষের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদের আবশ্যক। কোন্ অবস্থার অধীনে পড়িয়া মানুষকে কথা বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, কোন্ নিয়মে মানুষ তাহার প্রথম বাক্যাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিল এবং কিরূপে মানুষ তাহার সেই আদিম ভাষাকে সংস্কৃত করিয়াছিল, এই সমস্ত আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবসকল জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার্থ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই হরিণ, বানর, পক্ষী এবং এমন কি মৌমাছি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলেই দলবদ্ধ হইয়া, সমাজ প্রস্তুত করিয়া বাস করে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে জীবন-সংগ্রামে সামাজিক জীবনই শ্রেয়ঃ। এই যে সমবায়, ইহা দৈহিক শক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত। কিন্তু মানসিক বল সংগ্রহ ও জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার প্রকৃষ্ট উপায় অন্যতর। মনে কর, কতকগুলা হরিণ এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃতভাবে ঘাস খাইতেছে। ইহাদের সকলেরই দৈহিক বল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা সমস্তই আছে। প্রত্যেকেরই দেখা শুনা প্রভৃতি স্ব স্ব জীবনরক্ষার্থ যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই আছে। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে শুধু এরূপ শক্তিই যথেষ্ট নহে। কারণ যখন শত্রু উপস্থিত হইবে, তখন অন্যান্য সঙ্গীরা আপনাপন জীবন রক্ষার্থ পলায়ন করিবে এবং আক্রান্ত হরিণকে তখন আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পরন্তু যদি তাহারা সকলে অনর্থ দূর করিবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করে, তবেই সেই

(১) "Our first parents received it by immediate inspiration."—Encyclopœdia Britannica, 8th Edition.

সামাজিকতা জীবন সংগ্রামের উপযোগী। এইরূপ সামবায়িক নিয়মবিশিষ্ট সামাজিক জীবের কতকগুলি অক্ষম হইলেও তাহারা জয়ী হইয়া থাকে।

এই সামবায়িকতা জীবের একটা শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। এই শক্তি সমাজস্থ জীবসমূহের পরস্পরের নিকট স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিবার শক্তি। এই শক্তি ব্যতীত সামাজিকত্বের কোন মূল্য নাই। যে সৈন্যদলে ইঙ্গিতের দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, সে সৈন্যদল শক্তিহীন। সংখ্যাই শক্তি, যদি কোন দলে ঐ শক্তির সহিত হস্তপদাদি সঞ্চালন, কোন শব্দ করণ, প্রভৃতি যে কোন উপায়েই হউক পরস্পরের মনোভাব জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা থাকে এবং অন্যদলে তাহা না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দলের জয় অধিকতর সম্ভব। এইজন্য ইঙ্গিতে মনোভাব জ্ঞাপন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অধীনে ইহার ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কালে প্রত্যেক জীবসম্প্রদায় তাহার জীবনের পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল।

ঐ সকল ইঙ্গিতই ভাষা এবং ঐ সকলই জীবের বাক্‌শক্তির অভিব্যক্তির প্রথম স্তর। যে উপায়ে এক মন হইতে অন্য মনে সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহারই নাম ভাষা। পৃথিবীতে যে দিন হইতে জীব একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইদিন হইতে ভাষার সৃষ্টি। জীবসকল একসঙ্গে বাস করে ও ভ্রমণ করে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে তাহারা পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে। ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে পিপীলিকার জীবন অত্যন্ত সামাজিক। তাহারা যে কয়েকটা অল্পসংখ্যক ইঙ্গিতের সাহায্যে তাহাদের কতকগুলা সাধারণ মনোভাব জ্ঞাপন করে, এমন নহে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাদের যথেষ্ট শক্তি আছে। সকলেই দেখিয়াছেন যে দুইটি পিপীলিকা যখন একত্র হয়, তখন তাহারা একটু দাঁড়ায় এবং তাহাদের সম্মুখের পদাদির দ্বারা পরস্পর একটু সম্ভাষণ করিয়া থাকে। এই হস্তপদাদি আস্ফালনে যে কি ভাষা ব্যক্ত হয়, তাহা এখনও অনুধাবনের বিষয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পৃথিবীতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভাষার অস্তিত্ব আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবগণের মনোভাবজ্ঞাপক অনেক প্রকার বাহ্যিক ইঙ্গিত আছে। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, গর্দ্দভের রাসভ, ময়ূরের কেকা প্রভৃতি রব সহজেই অন্য জীবে বুঝিতে পারে। একটি বানর তাহার মনোভাব প্রকাশের জন্য অন্ততঃ সাত প্রকার বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। পণ্ডিত ডারউইন কুকুরের স্বরে চারি কিম্বা পাঁচটি গ্রাম লক্ষ্য করিয়াছেন; যথা, শিকারকালে ব্যগ্রতাসূচক, ক্রোধসূচক, নিরাশাসূচক, আনন্দসূচক এবং রাত্রিকালীন চীৎকার। আবার যখন কোন দ্বার অথবা জানালা খুলিবার জন্য প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন হয়, তখন কুকুর একপ্রকার বিচিত্র শব্দ করিয়া থাকে।

এই সকল সঙ্কেত কথিত ভাষার তুল্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংবাদ জ্ঞাপনের যে কোন উপায়ই ভাষা। কিন্তু এই ভাষাই কথা নহে।

কথা দ্বারা ভাষা প্রচারিত হয় মাত্র। যথন দলের মধ্যে একটা হরিণ হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করে, তথন অন্য হরিণেরাও ঐরূপ করিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা। এই সঙ্কেতের অর্থ "শ্রবণ কর"। আবার যদি কোন হরিণ এমন কোন বস্তু দর্শন করে, যাহা তাহার পক্ষে সন্দেহজনক, সে তথন ঈষৎ অস্ফুট শব্দ করে। ইহা একটি কথা। এই কথার অর্থ "সাবধান"। কোন বিপদজনক বস্তু নিরীক্ষণ করিলে সে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার অর্থ "দৌড়িয়া পলাও"। এথানে তিন প্রকারের ভাষা দেখা গেল—সাঙ্কেতিক, অস্ফুট শব্দজনিত এবং চীৎকারজনিত।

বর্ত্তমান যুগের ভাষারও এই তিন উপাদান। এই তিনই ভাষার কেবল প্রধান উপাদান নহে, উহাই একমাত্র উপাদান। যে ভাষার বলে বাগ্মী ডিমস্থিনীসের নাম আজও সজীব—যে সাম গীতধ্বনিতে আজও ভারতবর্ষের আকাশ তরঙ্গিত, সে ভাষা বনবাসী জীবের অস্ফুট বাক্‌শক্তি হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বাক্যাবলী সৃষ্টির পূর্ব্বে মানুষ অঙ্গ সঞ্চালনাদির দ্বারা সাঙ্কেতিক উপায়ে মনোভাব জ্ঞাপন করিত। ইহার তিনটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। যে মানুষ আজন্ম সম্পূর্ণরূপে বধির, কথা বলিবার উপযোগী সমস্ত অঙ্গাদি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, সে মূক হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা, মানুষ বোবা হইলেই কালা হয়। কিন্তু ঠিক তাহা নয়, কালা বলিয়াই সে বোবা। যদি ভাষা মানুষের সহজ শক্তি হইত, তাহা হইলে বাক্‌যন্ত্রাদির অনাভাব সত্ত্বেও বধিরের মূক হইবার কোনই কারণ নাই। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতার জন্য তাহার বাক্‌যন্ত্রও নীরব। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, ভাষাটা কেবল অনুকরণের বিষয়—সমস্তটা শুনিয়া শেখামাত্র। কথার ভাষা শিথিতে পারে নাই বলিয়া মূকব্যক্তি সাঙ্কেতিক ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহার দ্বারা তাহার মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। মূকের নিকট সাঙ্কেতিক ভাষা চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণ অসভ্য মনুষ্য। মূক ব্যক্তি অপেক্ষা ইহাদের ভাষা আর একটু বিস্তৃত। মূক-বধিরের সাঙ্কেতিক ভাষার সঙ্গে কতকগুলি শব্দ (sound) যোজনা করিয়া ইহাদের ভাষা গঠিত হইয়াছে। মনের সব কথা ইহারা মুখে বলিতে পারে না। কতকটা ইঙ্গিতে ও কতকটা শব্দের সাহায্যে ইহাদের মনোভাব জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

শিশুর ভাষা আমাদের তৃতীয় প্রমাণ। সাধারণতঃ ইঙ্গিত ইসারা এবং কতকগুলি শব্দের সাহায্যে শিশু প্রথমে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে। শিশুর এই চেষ্টা সহজাত এবং স্বাভাবিক। ক্রমশঃ সে সমস্ত ভাষাটা শুনিয়া ও দেথিয়া অনুকরণ করে। কথার ভাষা কৃত্রিম কিন্তু ইঙ্গিতের ভাষা স্বাভাবিক।

পরিণত বয়স্ক মনুষ্যের ভাষাতে শিশুর এই ক্ষুদ্র ইঙ্গিতের ভাষা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। চিন্তার বিষয়টি যথন উন্নত নহে এবং বক্তব্য বিষয় বাগ্মিতার প্রত্যাশী নহে

তখন উহা প্রধানতঃ ইঙ্গিতের সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। বক্তৃতাকালে বাগ্মী যতই উন্নত চিন্তার বিষয় বলিতে থাকেন, তাঁহার হস্তপদাদি ততই নিশ্চল হয়। ইঙ্গিতের ভাষা তখন মনোভাব জ্ঞাপন করিবার উপযুক্ত নহে। তখন তাঁহার সমস্ত চিন্তার বিষয়টা বাক্যের (word) ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। আবার যতই তিনি চিন্তার নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে থাকেন, ততই তাঁহার হস্তপদাদিও ক্রমে সঞ্চালিত হইতে থাকে। বাক্যের ভাষায় যাঁহার যত বেশী অধিকার, তিনি ততই উৎকৃষ্ট বক্তা। ইঙ্গিতের ভাষা অনেকটা বিষয় (objective) চিন্তার কথা প্রকাশ করে। কিন্তু বিষয়ী (subjective) চিন্তা ব্যক্ত করিতে বাক্যের ভাষার প্রয়োজন।

শৈশবাবস্থায় ভাষা কতকগুলি ইঙ্গিতের সমষ্টি ছিল। পরে ঐ সকল ইঙ্গিতের সহিত কতকগুলি শব্দ (sound) যোজিত হইল। কিন্তু এই ভাষার বিস্তার অত্যন্ত কম। এক সময়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল, যখন উক্ত ভাষার দ্বারা সমস্ত মনোভাব প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর দুইজন অসভ্য মনুষ্য অন্ধকার রাত্রে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করিতে চায়। তখন সে কি করিবে? সে সময় ইঙ্গিতের ভাষা নিষ্ফল। সুতরাং তখন সে নিশ্চয় কোন প্রকারে কয়েক প্রকার শব্দ একত্র করিয়া এক একটি কথার (word) সৃষ্টি করিল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কথার সৃষ্টি সে কেমন করিয়া করিল? মনে কর একদল গরু বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে। এমন সময় অগ্রবর্ত্তী গরু দূরে সিংহের গর্জ্জন শুনিতে পাইল। সিংহের সেই শব্দ একটি ভাষা। 'সিংহ' এই কথা বলিলে আমরা যে দ্রংষ্ট্রা নখরযুক্ত কেশরী বুঝিয়া থাকি, উহার ঐ গর্জ্জন হইতে গরুটি তাহাই বুঝিল। এখন সেই গরু একটা কোনরূপ শব্দ করিয়া তাহার দলস্থ অন্য গরুগুলিকে জানাইল যে সম্মুখে কোন একটা বিপদ উপস্থিত। কিন্তু ইহা যে সিংহসম্ভূত বিপদ, না অপর কোন বিপদ, তাহা অবশ্য সে জানাইতে পারিল না। এরূপ জানাইতে হইলে সেই সিংহের শব্দটি তাহাকে অনুকরণ করিতে হইত। কিন্তু সেরূপ করা এ জন্তুর ক্ষমতার বহির্ভূত। এই গরুগুলি যদি গরু না হইয়া সে কালের মানুষ হইত, তাহা হইলে এ অবস্থায় অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি নিশ্চয় সেই সিংহের শব্দ অনুকরণ করিয়া সহচর দিগকে জানাইত যে সিংহ উপস্থিত। বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি, প্রবহমান স্রোতের শব্দ, মধুকরের গুঞ্জন, পক্ষীর কাকলি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ এই গুলিকে বুঝাইত। যে সকল বস্তুর সহিত কোন না কোন একটা শব্দ যে কোন প্রকারেই হউক সম্পর্কিত হইয়া আছে তাহাদের বিষয় এইরূপে ভাষামধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

একটি শিশুর ভাষা-শিক্ষা গোড়া হইতে অনুধাবন করিলে উক্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিশু প্রথমে তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করে। এ সময় যদি সে কোন বস্তু হইতে কোনপ্রকার শব্দ শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ

সেই শব্দকেই ঐ বস্তুর নাম স্থানীয় করিয়া লয়। সে ঘড়িকে বলে টিক্ টিক্, হংসকে বলে পাঁক্ পাঁক্, কুকুরকে বলে ঘেউ ঘেউ, ছাগলকে বলে ভ্যা ভ্যা ইত্যাদি। মানুষের সভ্যতা ক্রমে যতই বাড়িতেছে, জীবন-সংগ্রামের ব্যাপার ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং নিয়তই নূতন কথার সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপে শব্দ হইতে কথার সৃষ্টি হয়। আদিম মানবও ঐরূপে শব্দ হইতে কথার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ এক একটা শব্দের মধ্যে যে কতখানি ভাষা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ জানেন। এখন শত শত কথার জন্মের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সরাইকে "হি হি হাউস" বলে—অর্থাৎ হাসির ঘর অথবা আমোদের স্থান। অদ্যাপি অনেক স্থলে দেখা যায় যে বহুবচন বুঝাইতে হইলে একই কথা দুইবার বলা হয়; যথা—পুনঃ পুনঃ, বার বার শত শত, হাজার হাজার ইত্যাদি। বহুবচন বুঝাইবার এরূপ নিয়ম বোধ হয়, সংখ্যাবাচক শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বে হইয়াছিল। বিশেষ্যের ন্যায় অনেক ক্রিয়াপদও ঐ একই নিয়মে শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; যথা, নাসিকার মধ্যে একপ্রকার অনুভূতি উপস্থিত হইলে আমরা 'হ্যাঁচ্' করিয়া শব্দ করিয়া থাকি। সেইজন্য ঐ কার্য্যকে আমরা হাঁচি বলিয়া থাকি।

ভাষার সব কথাই যে এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এমন নহে। শব্দ হইতে উৎপন্ন কথা বা নামগুলি ব্যতীত ভাষায় হাজার হাজার কথা বর্ত্তমান আছে। যিনি ঘড়ি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি উহাকে 'টিক্ টিক্' না বলিয়া ঘড়ি বলিয়াছেন। এই সকল আধুনিক কথা মানুষের জ্ঞানের যুগে হইয়াছে। ইহাদের আবিষ্কর্ত্তারা তাঁহাদের পিতামহগণ অপেক্ষা আরও একটু তলাইয়া বুঝিতেন ও দেখিতেন। তাহা না হইলে যদি দুইটা বিভিন্ন বস্তু একই প্রকার শব্দ করিত, তাহা হইলেই গোল বাধিয়া যাইত। কিন্তু পুরাকালে শব্দজনিত কথা ভিন্ন অন্য কথাগুলি কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা চিন্তার বিষয়। হয়ত ঐ কথা সমূহের মধ্যে অনেক-গুলি শব্দোৎপন্নই বটে এবং এক্ষণে ঐ সকল কথার শব্দ-সম্পর্ক হারাইয়া গিয়াছে। অথবা ঐ সম্পর্ক তখন এরূপভাবে ঘুরাইয়া ধরা হইয়াছিল যে, এখন উহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সভ্যতা যতই উন্নত হইতে লাগিল, পুরাতন কথাগুলিকে ততই নূতন কথার সহিত সংযুক্ত করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া তাহাদিগকে নূতন আকার প্রদান করা হইল। তদ্ব্যতীত অনেকানেক কথা লোকে ইচ্ছামত সৃষ্টি করিয়াছে। এই কথা সৃষ্টি কোন বাঁধা নিয়মের অন্তর্গত নহে। দেখা যায় যে, এক এক দেশের ছেলেরা এক এক প্রকার খেলার জন্য নানারূপ কথার সৃষ্টি করে। ঐ কথায় একটা ভাষা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের অর্থের সহিত ঐ কথাগুলির কোন ধাতুগত সম্বন্ধ নাই। যদি সকলেরই এইরূপ নূতন নূতন কথা সৃষ্টি করিবার অধিকার থাকে এবং যখন সময় সময় নূতন কথা প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হয়, তখন মানুষ যে ইচ্ছামত কতকগুলা কথা ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভাষাতত্ত্ববিদের এত

বিপদ—এই জন্যই তিনি নিয়ত খেই হারাইয়া ফেলেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা কেন বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কথা অনুসারে তাহার কতকটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর, একটা লোক অদৃষ্টক্রমে কোন কারণে তাহার স্ত্রী ও শিশু-সন্তানগুলির সহিত এক নির্জ্জন বনে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ঐ শিশুসন্তানেরা পিতৃমাতৃহীন হইল। তার-পর তাহারা বনের ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। পিতামাতার নিকট যে অল্পসংখ্যক কয়েকটা কথা শিখিয়া-ছিল, সে সময় তাহারা তাহাদের জীবনযাপন করিবার জন্য কিছুদিন সেই কথা কয়টা ব্যবহার করিল। কিন্তু ক্রমে তাহারা যতই বড় হইতে লাগিল, ততই তাহাদের নূতন কথার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তখন তাহারা ইচ্ছামত নূতন কথার সৃষ্টি করিল। এই কয়টি শিশুর সংসার ক্রমে যখন বৃদ্ধি পাইয়া একটি জাতিতে পরিণত হইল, তখন আরও বেশী কথার প্রয়োজন হইল এবং আরও কতকগুলি কথার ইচ্ছামত সৃজন হইল। এইরূপে একটি নূতন ভাষা জন্মগ্রহণ করিল।

ভাষার বিভিন্নতা আবার দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপর কতকটা নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত গল্পটি ধরা যাইতে পারে। উক্ত শিশুগণ অরণ্যে বাস করিত। যদি তথায় আহারীয় দুষ্প্রাপ্য হইত, অথবা তথাকার জলবায়ু তাহাদের পক্ষে দুঃসহ হইত, তাহা হইলে শৈশবকালে পিতৃমাতৃবিচ্ছেদের পর তাহাদের বাঁচিয়া থাকা এক প্রকার অসম্ভব হইত। তাহা হইলে সে স্থানে আর নূতন জাতি অথবা নূতন ভাষার সৃষ্টি হইত না। পরন্তু যদি ঐ স্থান সর্ব্বতোভাবে বাসের পক্ষে উপযুক্ত হইত এবং আহার্য্য অনায়াস-লভ্য হইত, তাহা হইলে তথায় ঐরূপে একটা নূতন ভাষার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন ইউরোপে আহার্য্য যখন বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন কোন বিশেষ সুবিধা নহিলে ঐরূপ নিঃসহায় শিশু কয়টি বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। সেই জন্যই সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে মোটের উপর প্রায় কেবল চারি পাঁচ প্রকারের ভাষা বর্ত্তমান। কিন্তু আমেরিকার কালিফোর্নিয়া দেশের জলবায়ু অতি চমৎকার। সেখানে অর্দ্ধেক বৎসর বৃষ্টি হয় না। তুষার কিম্বা বরফ তথায় নাই বলিলেই হয়। বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই শত দিন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে। তথায় ফলফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সেখানে অন্ততঃ উনিশটি বিভিন্ন ভাষী জাতি বাস করে। তাই বলিতেছিলাম ভাষার সংখ্যার উপর দেশের ভৌগোলিক অবস্থার একটা মস্ত সম্পর্ক আছে।

মানুষ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুসমূহের সম্বন্ধে যতই বেশী জ্ঞানলাভ করিতে লাগিল, অন্যান্য মনুষ্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, তাহার জীবন যাত্রা যতই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই সে নূতন কথা সংগ্রহ করিয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিল্প, প্রত্যেক বিজ্ঞান, প্রত্যেক

দর্শন তাহার নিজের কথায় ভাষার ভাণ্ডারের এক একটা কক্ষ পূর্ণ করিয়া তুলিল। ভাষার এইরূপ অভিব্যক্তি নিয়তই চলিতেছে এবং চিরকালই চলিতে থাকিবে। ঈশ্বরই মানুষকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে সমাজস্থ সকলের সহিত মনোভাব প্রকাশ করিবার কৌশল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সেইজন্য ঈশ্বর মানুষকে ভাষাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে কথা প্রদান করেন নাই—কথা গড়িয়া ভাষা সৃষ্টি করিবার সমস্ত শক্তিগুলি দান করিয়াছেন। তিনি মানুষকে কথা বলিবার যন্ত্র বিশেষ করেন নাই। মানুষ নিজে তাহার প্রয়োজনীয় ভাষা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে।

ভাষার ন্যায় লিখনপ্রণালীও ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ইজিপ্ট্ দেশে "মানুষ" এই কথা লিখিতে হইলে, একটা মানুষের ছবি আঁকা হইত। উচ্চারিত শব্দ অনুসারে বস্তুর নাম-করণ এবং আকৃতি চিত্রিত করিয়া কথা লেখা দুইই ঠিক একই প্রণালী। পরে সময় বাঁচাইবার জন্য ঐ লিখন প্রণালীকে সংক্ষিপ্ত করা হইল। তখন চিত্রগুলি কতকগুলা সরল রেখাপাতের দ্বারা বুঝান হইত। চীনদেশে একখণ্ড জমি লিখিতে হইলে একটি সমবাহু চতুর্ভুজ আঁকা হইত। দুইটি সরল রেখা স্থূল কোণে মিলিত হইলে ঘর বা ঘরের ছাদ বুঝাইত। কিন্তু এ উপায়ে কেবল বস্তুবাচক বিশেষ্য পদগুলি বুঝান যাইতে পারে মাত্র। পরে এই সকল উপায় হইতে কৌশলে গুণবাচক বিশেষ্য পদও লেখা হইত। একত্র একটি মানুষ ও একখণ্ড জমির চিত্রে সম্পত্তি বা ধন বুঝাইত। ধনশালী হইলেই সুখী হয়। সুতরাং ঐ চিত্রের অর্থ সন্তুষ্টি। আবার একজন স্ত্রীলোকের ছবির উপর ছাদের চিত্র অঙ্কিত করিলে বুঝাইত, গৃহস্থ স্ত্রীলোক—শান্তিময়ী স্ত্রীলোক। অতএব উক্ত চিত্রের অর্থ শান্তি বা বিশ্রাম।

মানুষের জ্ঞান যতই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, লিপিশিল্প ততই উন্নতি লাভ করিল। অল্প দূরস্থিত বন্ধুর নিকট মনোভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য মানুষ কথা কহিতে শিখিয়াছিল। সভ্যতার দিনে যখন সমস্ত পৃথিবীর সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইল, তখন এক দেশ হইতে অন্য দেশে সংবাদ প্রেরণের জন্য আর এক প্রকার ইঙ্গিতের ভাষা—টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হইল। টেলিগ্রাফের ভাষা শব্দ-সাঙ্কেতিক ভাষা। সুতরাং উক্ত ভাষা এখন উহার আদিম অবস্থায়। ঐ ভাষা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া বাক্যের ভাষায় পরিণত হইল—টেলিফোনের সৃষ্টি হইল। এখনও মানুষ টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষার সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যগ্র। তাই ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত এক মন যাহাতে অপর মনকে সাড়া দিতে পারে—তাহার ভাব জ্ঞাপন করিতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। এই ভাষাকে টেলিপ্যাথি নাম দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজে এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে। বর্ত্তমান ভাষার অভিব্যক্তির পরবর্ত্তী স্তর খুব সম্ভব টেলিপ্যাথি।

জগতে বাক্যের সৃষ্টি অতি ধীরে ধীরে হইয়াছিল। জগতে উহার সৃষ্টির সম্ভাবনা

ছিল না বলিয়া এ বিলম্ব নহে। ইহার কারণ কথা কহিবার যন্ত্রের অভাব ছিল বলিয়া। অভিব্যক্তির সাহায্যে ক্রমে বাক্‌যন্ত্র যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন মানুষ কথা কহিতে আরম্ভ করিল। জগতে তড়িতের অভাব ছিল বলিয়া টেলিগ্রাফ এতদিন পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এমন নহে। এ বিলম্বের কারণ, টেলিগ্রাফ যন্ত্রের অভাব। টেলিফোনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, যে বিধি অনুসারে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই বিধি যে জগতে বর্ত্তমান ছিল না, এমন নহে। ইহার কারণ, ঐ যন্ত্রের অভাব। ইহা হইতে বুঝা যায় যে টেলিপ্যাথি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া মানুষের কাযে আসিতেছে না, ইহার কারণ যে জগতে ইহার সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই, এমন নহে। ইহার কারণ, সেই সময়টি এখনও উপস্থিত হয় নাই —সেই যন্ত্রটি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপ ক্রমোন্নতির অন্তে মনুষ্যের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, এ সমস্যার উত্তরদান-কালে বিজ্ঞান মূক। প্রকৃতির অঞ্চলান্তরালে প্রচ্ছন্ন ব্যাপারগুলি দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে, মানুষের মন এবং জ্ঞান প্রতি-মুহূর্ত্তেই উন্নতি লাভ করিতেছে, জড় জগৎ নিয়তই পরাজিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্ব-শেষের বিধান কি? বোধ হয় "I am the tadpole of an archangel" এই বচনই সত্য।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

সৌধ-রহস্য

দশম পরিচ্ছেদ

এই কাহিনীর যতটুকু অপরের সাহায্যে আমায় সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাহা তাহাদের লিখিত বিবরণেই আমি প্রকাশ করিয়াছি, আবার এইবার আমার বক্তব্যের "থেই" আমি নিজের হাতেই তুলিয়া লইলাম।

পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ আছে—সেই মানব-নামধারী জানোয়ার,—কর্ণেল রুফাস্-স্মিথের ক্রুমবারে আগমন সংবাদ দিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। রুফাস্ আসিয়া-ছিল অক্টোবরের প্রথম ভাগে,—আর ডক্তার ইষ্টারলিংয়ের ক্রুমবার-গমনের তারিখ মিলাইয়া দেখিলাম যে তিনি ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্রুমবারে গিয়াছিলেন। এই সময়টা আমার পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবার একটু কারণও ছিল, যেহেতু ডাক্তারের ক্রুমবারে আগমনের কিছুদিন পূর্ব্বেই, গেব্রিয়েল ও আমার মধ্যে জেনারলের সহসা অভ্যুদয় হয়। ইহার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা বলাই হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই দিন হইতে গেব্রিয়েল বা মরডণ্টের আর কোন সংবাদ আমি পাই নাই,—তাহাদের ছায়াটুকুও আর চোখে পড়ে নাই,—অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই।

অনেক সময় আমার মনে সন্দেহ হইত, বুঝি বা তাহারা বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। তখন তাহাদের এই দুর্দ্দশার মূল যে আমরাই এই কথা চিন্তা করিয়া আমাদের

ভ্রাতা-ভগিনীর চিত্ত আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। এইরূপ অযথা কল্পনা জল্পনা ও জটিল বিভীষিকার ছায়ায় শঙ্কিত চিত্ত, উত্তরোত্তর কণ্টক গুল্মে আচ্ছন্ন হইয়া পথ হারাইয়া অন্ধের মতই ফিরিতেছিল।

জেনারলের সহিত শেষ সাক্ষাতের দুই দিন পরে একদিন সকালবেলা, একটি ধীবর বালক একখানি পত্র আনিয়া দিল, বলিল, গাছের মধ্যে যে মস্ত কোঠাটা আছে, সেই কোঠারই একটি বৃদ্ধা নারী তাহাকে পত্রখানি, আমাকে দিবার জন্য দিয়াছে। রমণীর বর্ণনা যতটুকু জানিয়া লইলাম, তাহাতে আন্দাজ করিলাম সে জেনারলের রন্ধনকর্ত্রী ছাড়া অপর কেহ নহে! পত্রখানি এই—

আমার প্রিয়তম বন্ধুগণ!

আমাদের সাক্ষাৎ বা সংবাদ না পাইয়া তোমরা যে আমাদের কথা ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত রহিয়াছ, এই ভাবনায় গেব্রিয়েল ও আমি আন্তরিক দুঃখিত।

আমরা এখন বন্দী! বন্দী বলিতে যে সাধারণ অর্থ বুঝায়—আমরা সেরূপ কোন শারীরিক শাসনের সহিত বন্দী নহি। আমাদের সুখ শান্তি-হীন দুর্ভাগ্য পিতার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দিন-দিন এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে তিনি আমাদের নিকট,—সন্তান আমরা, তাঁহার শাসনের পাত্র,—তথাপি তিনি সকরুণ মিনতির সহিত আমাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন যে, ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আমরা যেন কাহারও সহিত মেলা-মেশা না করি,—তাঁহাকে ভয় হইতে মুক্ত রাখি!" নতজানু হইয়া, তাঁহার নিকট আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার আদেশ আমরা সম্পূর্ণরূপেই পালন করিব। ওয়েষ্ট,—অকৃতজ্ঞ সন্তান আমরা,তাই এমন স্নেহময় করুণ-হৃদয় পিতারও আশঙ্কার কারণ হইয়াছি। হায়, যদি তাঁহার মানসিক যাতনার এতটুকুও লাঘব করিতে পারিতাম!

বাবা বলিয়াছেন, ৫ই অক্টোবর কাটিয়া গেলে তাহার পরদিনই তিনি আমাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সহিত মুক্তি দিবেন, বাতাসের মতই স্বাধীন জীবন; কিন্তু কে জানে কেন আজ আর সে কথা মনে করিয়া যতখানি আনন্দ উপভোগ করা আমাদের উচিত ছিল, সে আনন্দ মনে আসিতেছে না। স্বাধীনতা? কে জানে—এ মুক্তি প্রার্থনীয় কি না! আমরা আশঙ্কিত হইতেছি।

৫ই অক্টোবর যে বাবার ভয় চরম সীমায় দাঁড়াইবে গেব্রিয়েল বলিল, সে কথা, সে ইতি-পূর্ব্বেই তোমায় জানাইয়াছে। বাবার ভাব দেখিয়া মনে হয়—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—এবারকার ৫ই অক্টোবর তাঁহার দুর্ভাগ্য পরিবারের কল্পিত বা বাস্তব বিপদ বহন করিয়া আনিতেছে। এবার আর প্রতি বৎসরের মত শূন্য হস্তে সে ফিরিয়া যাইবে না। সেই জন্যই এবারকার রক্ষার আয়োজনও এত অধিক। তিনি যেন উন্মাদের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া প'ড়িয়াছেন। তাঁহার এই জীবন্মৃত অবস্থা দেখিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে।

তাঁহার এখনকার এই কম্পিত বক্র দেহ, সভয় দৃষ্টি দেখিয়া কে মনে করিতে পারিবে,—এই মানুষই কিছুদিন পূর্ব্বে তরাইয়ের জঙ্গলে পদব্রজে সাক্ষাৎ মৃত্যু-তুল্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শীকার করিয়াছেন,

এবং তাঁহার সহযাত্রী হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় সঙ্গীদের ভয়াতুর দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া সান্ত্বনার মৃদু হাসি হাসিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

তুমি জান—দিল্লীর রাজপথে সম্মানের বিজয়-নিশান-স্বরূপ তিনি ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভ করিয়াছিলেন। আর তোমরাই ত দেখিয়াছ—সেই তিনিই আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন পল্লীর প্রান্তে প্রাচীর বেষ্টনের রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া দারুণ ভয়ে কম্পিত হইতেছেন। ভাগ্যের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস, —কি এ নির্ম্মমতা! আমরা তোমাদের যে কথা জানাইয়াছি তাহা স্মরণ করিয়ো,—এ একটা কল্পিত মানসিক ব্যাধির ফল নহে,—আমাদের অন্তরাত্মা আজ বলিতেছে, সত্য, সত্য, সব সত্য! সত্যই আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে,—এই যে বিপদ—এ এমন ভাবের—যে ইহাকে ঠেকাইয়া রাখাও যায় না, অথবা টানিয়া ফেলিয়া দেওয়াও চলে না। আর বুঝাইয়া বলিবারও কিছু নাই।

তোমরা কি মনে কর, ৫ই অক্টোবর রিক্ত হস্তে আমাদের দুর্ভাগ্য পরিবারে কোন ভীষণ নাটকের যবনিকা নিক্ষেপ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবে? যদি তাহাই হয়, ৫ই অক্টোবর কাটিয়াই যদি যায়, ৬ই অক্টোবর প্রাতে ব্র্যাঙ্কসামারে আবার আমরা মিলিত হইব। তোমরা উভয়ে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা জানিয়ো।" ইতি তোমাদেরই "মরডণ্ট"

এই চিঠিখানা আমাদের মনে সুখ না দিলেও সান্ত্বনা দিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, তাহারা স্বেচ্ছা-বন্দী হইলেও অত্যাচারিত নহে। কিন্তু যাহারা আমাদের প্রাণাধিক, তাহারা যে সত্যই কোন ভীষণ বিপদের সম্মুখে অবস্থিত, এ চিন্তায় এত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, যে কেবল উন্মাদ হইতেই বাকি ছিল!

দিনের ভিতর পঞ্চাশ বার আমরা কেবলই ভাবিতে ছিলাম—যে বিপদটা কি প্রকারের? কোথা হইতে উহার উৎপত্তি সম্ভব? সে প্রশ্নের উত্তর ছিল না। চিন্তার সূত্রে উত্তরোত্তর গ্রন্থি বাঁধিয়াই চলিয়াছিল। অমীমাংসিত প্রশ্ন, অন্তর মধ্যে বেদনার দোলা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, পথ নাই, পথ নাই!

ক্রমবারের লোকগুলির নিকট যখন যতটুকু যাহা শুনিয়াছি, সমস্ত মিলাইয়া যদি সেই জটিল রহস্যের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাই, তাহারই নিষ্ফল চেষ্টায় অনেক সময় মস্তিষ্ক ঘৃতের অনেকখানি অপচয় করিয়াছি। কত বিনিদ্র রজনী এই একই চিন্তায় কোমল শয্যা কণ্টক-শয্যায় পরিণত করিয়া তুলিয়া, এ পাশ, ও পাশ ছট্‌ফট করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি, তথাপি কোন কূল-কিনারার সন্ধান মিলে নাই। মাথার উপর যে ঘোরতর দুর্দ্দিন আকস্মিক বজ্র নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহার ছায়া যেন আমাদের চিত্তেও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ কল্পনা-বলে একটা দুর্গম জটিল পথ তৈয়ার করিয়া লয়। কখনও কখনও ঘটনা চক্রের সংঘর্ষণে সেই সহস্র নির্ম্মিত পথই প্রশস্ত হইয়া তাহারই দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিয়া সফলতা আনয়ন করে। আমাদের বন্ধুদের কল্পিত দুঃখের দিন বুঝি বা সত্যই আসে! যে কাল্পনিক চিত্র সুদূর আকাশের গায়ে ছিল, তাহাই বুঝি শরীর ধরিয়া ভূতলে নামে!

যে বিপদের সম্ভাবনা এক সময় আমি অলীক বলিয়া তুমুল তর্কের মুখে উড়াইয়া দিতে চাহিয়া ছিলাম, আজ কি না তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্বেলিত বক্ষে পথ চাহিয়া ভয়ে সারা হইতেছি! অনেক সময় হাসিবার চেষ্টা করিয়া অকারণে ভাবিয়াছি, আমি প্রকৃতিস্থ কি না! সঙ্গ ও সংস্কারের কি অদ্ভুত মাদকতা-শক্তি,—আমি এখন একজন ঘোর অদৃষ্টবাদী! আমার অন্তরের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এমন ধীরে ধীরে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছিল, যে, আমি অনেক সময় অবাক হইয়া ভাবিয়া থাকি, —যে কিরূপে, কখন, ইহা ঘটিল?

চিন্তা যেখানে পথ পায় না, যুক্তি সেখানে পথ গড়িয়া লয়। আমরা ভাই-বোনে যখন কোন সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তখন স্থির করিলাম, চুপ করিয়া ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধুদের নিজ মুখ হইতে সব কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করাই এখানে সদ্‌যুক্তি। এখন মধ্যকার এই সুদীর্ঘ দিন কয়টাকে কাটাইয়া দেওয়া যায় কিরূপে? কিন্তু এ বিষয়েও বড় অধিক চিন্তা করিতে হয় নাই। দৈব সহসা এমন একটা অচিন্তিত ঘটনা আনিয়া আমাদের সারা চিত্তকে তাহারই করতলে ন্যস্ত করিয়া দিল, যে অপর চিন্তার আর বড় অবসরও রহিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

৩রা অক্টোবরের প্রভাত বেশ মনোহর মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়াছিল। সূর্য্যের রশ্মিতে তীক্ষ্ণতা নাই! লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে রঞ্জিত হইয়া বিহঙ্গের মতই ডানা মেলিয়া আকাশের-গায়ে ভাসিয়া চলিয়াছে। বাতাসে শীতলতা ছিল, শৈত্য ছিল না। কাননে সদ্য জাগরিত পাখীর কল-কূজনে চতুর্দ্দিকে মধুরতার ফোয়ারা ছুটিতেছিল। আমরা মনের অবস্থা লইয়া জড় প্রকৃতিকে বিচার করি, তাই আমার মনে হইল, সেদিনকার প্রভাত বুঝি কোন আগত শুভ ঘটনারই আভাষ বহন করিয়া অতিথির বেশে দেখা দিয়াছে!

প্রকৃতির এই মধুর ভাব অধিকক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হইল না। যেমন বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্যের তেজও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতেছিল। নাতিশীতোষ্ণ বাতাস, যাহা কিছু পূর্ব্বে দেহ, মনের ক্লান্তি হরণ করিয়া হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিতেছিল, তাহাই একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়া চারিদিকে একটা অসহ্য গুমটের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। যদিও শীত ঋতু তখন মধ্য পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সেদিনকার মেঘহীন সূর্য্যোত্তাপে অসহ্য অনলবর্ষী জ্বালা বর্ষিত হইতেছিল। এবং চ্যানেলের অপর প্রান্তে দূর আয়র্লণ্ডের ধূসর পর্ব্বতগুলির উপর কেহ যেন একখানা তরল কুয়াশার আচ্ছাদন বিছাইয়া দিয়াছিল।

তরঙ্গের উপর মৎস্য-লোলুপ পক্ষীর দল ক্রীড়া না করিয়া উড়িয়া গিয়াছে! সৈকত ভূমে টিটিভরাও ক্রীড়া ছাড়িয়া লুক্কায়িত। সমুদ্রের সফেন ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গগুলা চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে গভীর গর্জ্জনে বেলাভূমে আছাড়িয়া পড়িতেছিল, তাহার সেই গম্ভীর, গগন-পূরিত ধীর গর্জ্জন-ধ্বনি, কুর্ণে

যেন অসহায়ের আর্ত্ত ক্রন্দনের মতই আঘাত দিয়া বাজিতেছিল। প্রকৃতির অসীম রহস্য ভাণ্ডারের অনভিজ্ঞ অন্ধজীব, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে করিবে, সিন্ধু তাহার নিয়মেই বদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির রহস্য যাহারা জ্ঞাত আছে, তাহারা পরিবর্ত্তনশীল পুস্তকের যে কোন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া মনের দৃষ্টিতে পাঠ করিয়াছে, তাহারা প্রকৃতির এই নিষেধ-বাণী সম্পূর্ণ রূপেই পাঠ করিতে পারিবে।

আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রে তাললয়হীন যে অশান্ত নৃত্য চলিতেছিল—তাহা যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট দুর্ঘটনারই পূর্ব্বাভাষ মৃত্যু-দোলার অশ্রান্ত দোল!

বৈকালে এস্‌থার ও আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অত্যধিক গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ সেদিন আর বেশী দূরে না গিয়া নিকটের একটা বালুকাময় স্তূপ, যেখানে একটা ঘাসের প্রকাণ্ড চাপ্‌ড়া, সমুদ্রের জল তীরে আসিবার পথে বাধারূপে বিরাজিত ছিল, তাহারই উপর আমরা উপবেশন করিলাম।

অপরাহ্লের লোহিত তপন তরল মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া পদতলের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত মহা-সমুদ্রের সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত সহস্র বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া অস্তাচলে চলিয়াছে, তীরাহত সমুদ্রের গর্জ্জন-ধ্বনি যেন বেদনাময় রাগিণীর মত অজস্র সুরের মূচ্ছর্নায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। নীলফেনকিরীটি লবনাম্বুরাশি যোজনান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত! আমরা তন্ময় হইয়া প্রকৃতির সেই অপরূপ ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, সহসা পার্শ্বে ভারী জুতার মস্‌মস্‌ শব্দে চকিত হইয়া আমরা মুখ ফিরাইলাম "কে—ও—জেমিসন্?"

পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ আছে—যেদিন প্রথম ক্রুমবারে আলো দেখিয়া আমি তথ্য জানিতে যাই,—সেদিন এই বুড়া জেমিসনই আমার সঙ্গী হইয়াছিল। পিঠের উপর প্রকাণ্ড ভারী, একটা গোলাকৃতি জালের বোঝা চাপাইয়া এক মুখ হাসি লইয়া বৃদ্ধ আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। "সমুদ্রের কি চমৎকার রূপই খুলেচে,—মিঃ ওয়েষ্ট কুমারী এস্‌থার, তোমাদের রাত্রের খাবারের টেবিলের জন্য যদি এক ডিস্ তাজা মাছ পাঠিয়ে দিই—বোধ হয় তোমরা বিরক্ত হবে না?—এই ঝড়টা ওঠ্‌বার আগেই একটা বড় রকম মাছ ধর্‌তে পারব, এম্‌নি ত আশা কচ্চি।" বৃদ্ধ তাহার সরল হাসি হাসিয়া মন্তব্য শেষ করিল। বৃদ্ধের সরল স্নেহ-প্রকাশের সপক্ষে একটুখানি হাসিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন, তুমি কি ঝড়ের আশা কচ্চ না কি?"

একটা প্রকাণ্ড মোটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ-পূর্ব্বক সেটা মুখে গুঁজিতে গুঁজিতে জেমিসন উত্তর দিল "সকল নাবিকেই ত তা বুঝ্‌তে পার্‌বে - ঐ দেখ না কেন, ক্রুমবারের ধারে—ঐ জলাটায় সাদা ডানাওয়ালা "গ্যল" আর 'বকে' একবারে ঝাঁক বেঁধে গ্যাছে। ঝড়ে ডানা খসে ঠুঁটো হয়ে যাবার ভয়েই শুধু তারা এমন ভয় পেয়ে তাল পাকিয়ে জড় হয়নি কি? আমার ঠিক্ এম্‌নিই,—আর একটা দিনের কথা মনে পড়্‌চে,—সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন চার্লী নেপিয়ারের সঙ্গে ক্রনষ্টেটের একটু দূরে ছিলুম সে কি

ভয়ানক ঝড়! সবগুলো হাল আর সমস্ত এঞ্জিনের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে আমাদের যেন একেবারে দুর্গের কামানের উপর ছুড়ে ফেলে দেয়, এম্‌নি চেষ্টা। জীবন-মরণের ভীষণ যুদ্ধ—সে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এদিকে কখনও জাহাজ-টাহাজ ভেঙ্গেচে কি ডুবেচে শোনা যায়?"

"ও মশায়, ভগবান রক্ষে করুন। এই যে জায়গাটি এটিত ধ্বংসের একটি বড় রকম আস্তানা। কেন, ঐ যে উপ-সাগরটা দেখা যাচ্চে—স্পেন যুদ্ধে রাজা ফিলিপের দু-দুখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাল জাহাজ তার পেটভর্ত্তি লোকলস্কর নিয়ে ঐ খানটায় একেবারে তলিয়ে গেছল। এই জলের চাদরখানা দেখ্‌চেন—এ যদি বোবা না হোত, আর ঐ বাঁকের ডান দিকে যে নিউজ উপসাগরটা দেখা যাচ্চে—ওরা যদি নিজের নিজের গল্প বল্‌তে পারত, তাহলে হাজার হাজার ঝুড়ি বোঝাই হয়ে যেত। যখন শেষ বিচারের দিন আস্‌বে, আমার বোধ হয় ঐ ঠাণ্ডা নোনা জলটা টগবগ করে ফুট্‌তে থাক্‌বে, ওর তলায় যে অগুণ্‌তি হতভাগা ঘুমিয়ে রয়েচে—তাদের নিশ্বাসে সেদিন সারা সমুদ্রের জল তপ্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌বে।"

সূর্য্যাস্তের ম্লান আলো এস্‌থারের ঘন চুলে ঢাকা ছোট মুখখানির উপর পতিত হইয়া তাহার পরদুঃখকাতর মুখখানিকে জেমিসন-বর্ণিত হতভাগ্যদিগের জন্য রুদ্ধ বেদনায় পাণ্ডুর করিয়া দিল। প্রকৃতির ম্লানিমার অংশ তাহার বহিঃপ্রকৃতির নয়,—অন্তঃপ্রকৃতিকে শুদ্ধ যেন—তাহার ম্লান ছায়ালোকে মলিন করিয়া সুনীল নেত্রে ব্যথিত বেদনায় সজল করিয়া দিল,—যেন আলোক-দীপ্ত সুনীল তরল মেঘে সমাচ্ছন্ন—একটু বাতাস উঠিলেই এখনি ঝরঝর করিয়া তাহার রুদ্ধ বক্ষের পাষাণভার বিদীর্ণ করিয়া শীতল স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিবে। একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া এস্‌থার কহিল, "আহা,—আমরা যত দিন এখানে থাক্‌ব—আর যেন কখনও এমন দুর্ঘটনা না হয়।"

যেখানে আকাশের সহিত সমুদ্র মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, সেই দিগন্ত সীমায় চক্ষু রাখিয়া, চিন্তিত মুখে, মস্তকের সাদা চুলের ভিতর ঘন ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বৃদ্ধ জেমিসন্ কহিল, "যদি পশ্চিম দিক্ থেকে বাতাসটা ওঠে—তাহলে ঐ যে পাল খাটিয়ে জাহাজগুলো যাচ্চে,—ওদের লোকেরা বড় আমাদের বিষয় মনে কর্‌বে না। উত্তর চ্যানেলে কোথাও একটু মাথা রাখ্‌বার জায়গা নেই ত? দূরে—ঐ যে জাহাজখানা যাচ্চে, যদি ঝড়ের আগে, এই 'ক্লাইডে'র মধ্যে ওকে ঢোকাতে পারে, তবেই ওর কাপ্তেন খুব খুসী হয়ে যাবে।"

আমি জেমিসন-কথিত জাহাজ খানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তিতভাবে কহিলাম, "আমার ত মনে হচ্চে, জাহাজখানা দাঁড়িয়েই আছে, ও কি চল্‌তে পার্‌বে?" সমুদ্রের নাড়ী যেমন দ্রুত তালে কম্পিত হইতেছিল,—জাহাজখানার কালো রঙের হাল, আর রৌদ্রমাখা চক্‌মকে পালগুলিও তেমনি দ্রুত কম্পনে নাচিতেছিল। আমি পুনরায় কহিলাম, "জেমিসন্, আমাদেরই বোধ হয়

ভুল হয়েছে, আজ আর ঝড়-টড় কিছু উঠ্‌বে না?”

বৃদ্ধ নাবিক তাহার ভূয়োদর্শন-জ্ঞানের অভিজ্ঞতাসূচক একটুখানি তাচ্ছল্যপূর্ণ মৃদু হাসি হাসিয়া জালের বোঝা বহিয়া অভীষ্ট কার্য্যে চলিয়া গেলে আমিও এস্‌থারকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

প্রথমেই আমি বাবার লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করিলাম, কাকার জমিদারী-সংক্রান্ত একটা গোলযোগে কয়দিন হইতে মাথা ঘামাইয়াও কোন উপায় স্থির কবিতে পারি নাই। বাবা বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তিনি আমায় কতকগুলি লিখিত উপদেশ দিবেন এবং কিছু বুঝাইয়াও দিবেন। জমিদারী পরিদর্শনের ভার প্রধানতঃ বাবার উপরে ন্যস্ত থাকিলেও ক্রমশ এখন তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া আমারই স্কন্ধদেশে সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া বসিয়াছে। কারণ সাহিত্য-চর্চ্চায় বাবা আজকাল—এমনি মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন—যে সংসারের এই সকল ছোটখাট খুঁটিনাটি কাযের সেখানে আর স্থান ছিল না।

আমি যখন বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম—তিনি তখন এসিয়ার কোন অদ্ভুত সাহিত্যরসে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

চৌকা টেবিলটার নিকট চেয়ারের উপর তিনি বসিয়াছিলেন। টেবিলের উপর পুস্তক ও কাগজের স্তূপ এমন উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, যে দরজার নিকট হইতে আমি তাঁহার কোমল কেশের উপরিভাগ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বাবা পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া চশমাটি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। তাহার পর একটু গম্ভীর ভাবে, ব্যথিতস্বরে কহিলেন, “আমার ভারী দুঃখ হয় জ্যাক্ যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তুমি একেবারেই অপরিচিত রয়ে গেলে। তোমার বয়সে—আমি সে মহান্ দেবভাষায় কথা বল্‌তে ত পারতামই, তা ছাড়া লোহিতী গঞ্জেলী মালব তামিল তৈ এ গুলকেও দখল করে নিয়েছিলাম,—এ সবই টুরেণীয় শাখার উপশাখা।” বাবার মুখের ভাব দেখিয়া আমি দুঃখিতভাবে কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, “সে আমার দুর্ভাগ্য বাবা—উত্তরাধিকার-সূত্রে আমি আপনার এই আশ্চর্য্য বহুভাষাতত্ত্বের এতটুকুও পেলেম না।”

বাবা কহিলেন, তিনি এখন এমন একটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যদি বংশপরম্পরা ক্রমে সেই কার্য্যটি শুধু নিজেদের মধ্যেই রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ওয়েষ্টের নাম জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কথাটা তিনি খুলিয়াই বলিলেন। বাবা কহিলেন, “আমি বৌদ্ধধর্ম্মের সার সংগ্রহ করে একখানি ইংরাজী পুস্তক সঙ্কলন কর্‌ব, এবং তার ভূমিকায় শাক্যমুনির আবির্ভাবের পূর্ব্বে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কি অবস্থা ছিল, তারই বিশদ ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস যদি রীতিমত পরিশ্রম করি—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ভূমিকার কতক অংশ আমি শেষ করে যেতে পারব।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কত দিনে এর শেষ হওয়া সম্ভব?” বাবা কহিলেন, “এর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ পিকিনের রাজকীয়

লাইব্রেরীতে আছে,—সেটা হচ্ছে, তিন শো পঁচিশ খণ্ডে বিভক্ত—আর তার প্রত্যেক খণ্ডের ওজন প্রায় পাঁচ পাউণ্ড। আমি ভাবচি—তার ভূমিকাতে সাম, ঋক্, যজু অথর্ব্ববেদ—এবং ব্রাহ্মণ এইগুলির বিষয় যদি ব্যাখ্যার সঙ্গে দেওয়া যায়, তাহলে ভূমিকাটি মোট দশ খণ্ডে বিভক্ত হবে। এখন যদি ধরা যায়, আমরা প্রত্যেক খণ্ডের জন্য এক বৎসর করে সময় দিই ২২৫০ খৃষ্টাব্দে আমাদের বংশে প্রায় বারো পুরুষ পরে এই কাজটি শেষ হবার সম্ভাবনা। আর তের পুরুষ বোধ হয় সূচীটা শেষ করতে পারবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমাদের নিম্নতম পুরুষেরা যদি সারা জীবন এই কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে—তাহলে তারা খাবে কি? আমাদের ত জমিদারীটারি কিছু নেই।"

বাবা ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিলেন, "ঐ তোমার মহৎ দোষ। কাজের কথায় তোমার কখনই মনোযোগ নেই। আমার এই মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হবে, তা না ভেবে—কোথা দিয়ে কি রকম করে কি কি বাধা-বিপত্তি আস্তে পারে, সেই ভাবনাই আগে ভাবতে বস্‌লে। যতদিন আমার বংশের উত্তর পুরুষেরা এই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে কাটাবে,—বেঁচে তারা থাকবে নিশ্চয়ই। খাবে কি? সে তখন দেখা যাবে। ভগবান্ তাঁর সৃষ্ট কোন জীবকেই অনাহারে রাখেন না।"

এ সম্বন্ধে ভগবানের প্রতি তাঁহার যে কতখানি নির্ভরতা, তাহা, এই উইগটাউনের ব্যাঙ্কসামারে আসিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমরা অস্থিমজ্জায় যথেষ্ট অনুভব করিয়াছি। অভাব, অনাহার, দরিদ্রতায় তাঁহার স্বভাব-প্রফুল্ল চিত্তে এতটুকু উদ্বিগ্নতা আনিতে পারে নাই। সাহিত্যের আনন্দময় সিংহাসন হইতে, জ্ঞানের রাজ্য হইতে এতটুকুও টলাইতে পারে নাই। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া বাবা কহিলেন, "আচ্ছা! তুমি এখন যাও—ফারগাস্ ম্যাক্ ডোনাণ্ডের ঘরটা ছাওয়া হয়েচে কি না দেখ। ঝড়-জল হলে বেচারা কষ্ট পাবে, আর উইলি ফুলারটন লিখেচে, তার দুধ-ওয়ালী গাইটার কি অসুখ হয়েচে, সেই সব খোঁজ নাওগে,—এই সবই ত তুমি বোঝ ভাল। ইতিহাসের উপর তোমার কখনও শ্রদ্ধা নেই, যাও।" তিনি চশমা তুলিয়া লইয়া অধীত পুস্তকে মনোযোগ দিলেন। জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যাস্তের ম্লান আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাবার ঈষৎ হতাশা-ব্যঞ্জক সকরুণ মুখের প্রতি চাহিয়া আমার ভাষা তত্ত্বে অনভিজ্ঞতার জন্য মনে মনে আত্ম-গ্লানি জন্মিয়াছিল, স্থির করিলাম—আর আলস্য না করিয়া এ বিষয়ে এইবার হইতে মনোযোগ দিব। সংকল্প যে আজ এই প্রথমই করিলাম, তাহা নয়—এ ইচ্ছা ইতি পূর্ব্বে আরো অনেকবার করিয়াছি—কিন্তু সাধু ইচ্ছা মানুষের বড় দুর্ব্বল, ইহার দৃঢ়তাও বড় ক্ষণস্থায়ী, দুই-চারি দিন সেই জটিল পথে পদ-চারণা না করিতেই ক্লান্তিতে মন কেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাজ কিছুই অগ্রসর হয় না!

বাবার আদেশ-পালনের জন্য আমি যখন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, তখন কক্ষগাত্র বিলম্বিত ব্যারোমিটারটার প্রতি

একবার চাহিয়া দেখিলাম, তাপমানে পারা রেখা প্রায় ২৮ ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। সেই বহুদর্শী নাবিক বৃদ্ধ জেমিসন, সে যে প্রকৃতির ভাষা-পাঠে ভ্রমে পতিত হয় নাই—বিস্ময়ের সহিত সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই আমি পথ চলিতেছিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রজাদের সামান্য কাজ-কর্ম্ম সারিয়া যখন আমি জলার ধার দিয়া ফিরিতেছিলাম, বাতাস তখন বেগে বহিতে-ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মেঘে নীল আকাশ ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে সেই খণ্ড খণ্ড মেঘগুলা জমাট বাঁধিয়া যেন রেল গাড়ীর লাইন তৈয়ার করিতেছিল। সমুদ্রের বক্ষে পারদের উজ্জল আস্তরণের ন্যায় যে ঝক্‌মকানি ছিল—এখন সেখানে যেন এক-খানা ঘষা কাঁচের চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সমুদ্রের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া শ্রবণ-ভৈরব জলোচ্ছ্বাসের শব্দকে প্রতিহত করিয়া যে একটি ক্ষীণ করুণ ক্রন্দনের সুর উত্থিত হইতেছিল, সে যেন তাহারই ললাট-নিহিত কোন আসন্ন রোগ-বেদনারই মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ করুণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন-ধ্বনি!

চ্যানেলের বহুদূরে একখানা বেলফাষ্ট গামী ছোট জাহাজ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট শীকারীর করচ্যুত আহত পক্ষীর মত ডানা মেলিয়া শ্রান্ত দেহে প্রাণান্ত চেষ্টায় অগ্রসর হইবার জন্য বৃথা পরিশ্রম করিতেছিল। বাতাসের বেগ এবং সমুদ্রের তরঙ্গ তাহাকে কোন মতেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না, বরং বাধা দিয়া প্রতিহতই করিতেছিল। বৈকালে বেড়াইতে আসিয়া আমরা যে প্রকাণ্ড পালতোলা জাহাজখানাকে দেখিয়া গিয়াছিলাম—সেখানা এখনও দৃষ্টি-পথের মধ্যেই রহিয়াছে, বাহির হইয়া যাইতে পারে নাই। এখন কেবল ঝড়ের মুখে আত্মরক্ষার উপায়-চেষ্টায় উত্তর দিকে জলের ধারে লইয়া যাইবার জন্য তাহার তরফ হইতেও অক্লান্ত পরিশ্রম চলিতেছিল।

সুদূর আকাশের প্রান্তে ধূমপুঞ্জবৎ মেঘ শ্রেণী যেখানে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুতের লোল-জিহ্বা মেলিয়া নক্ষত্রপুঞ্জশোভী নীলাকাশকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম সমস্ত আকাশ সজল মেঘে ভরিয়া গিয়াছে, ভীত সমুদ্র-পক্ষীর দল, ঝাঁক বাঁধিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। আসন্ন ঝটিকার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানব-শিশুর মতই লক্ষ্যহীন তাহাদের চঞ্চল গতি! বকের দল শাদা ডানা মেলিয়া ক্লান্তভাবে জলার ধারেই জটলা পাকাইতে ছিল, সেই তাহাদের নিরাপদ আশ্রয়! পশ্চিম আকাশের প্রান্তে তখনও সূর্য্যাস্তের ম্লান আভাটুকু সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। বৃক্ষপত্রে করুণ মর্ম্মর-ধ্বনি, এবং দেবদারু ও পনস্ বৃক্ষের শিরে বাতাসের রুদ্ধ আস্ফালন শুনিতে শুনিতে আমি সোজা পথ ছাড়িয়া, আগের পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি নয় ঘটিকা! বাতাসের বেগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল! বাহিরে গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জন! দশটার সময় ঝটিকা আরম্ভ হইল।

মধ্য রাত্রি! এমন প্রলয়-ঝটিকা আমার জীবনে আমি এই প্রথম দেখিলাম!

ওকের জানালা দেওয়া আমার ছোট ঘর খানিতে বসিয়া প্রলয় রজনীর তাণ্ডব নৃত্য

আমি দুরুদুরু বক্ষে অনুভব করিতেছিলাম। জানালা সার্শীর উপর চটপট্ শব্দে পাথরের কুচা ও কঙ্কর উড়িয়া পড়িতেছিল। বাতাসের সোঁ সোঁ, গোঁ গোঁ শব্দ যেন শরবিদ্ধ উন্মত্ত বন্য জন্তুর গর্জ্জন ধ্বনির মতই শুনাইতেছিল। সৈকতোপবিষ্ট ভয় কাতর নিশাচরী পক্ষীর দল ঝট্‌পট করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, বজ্রের ভীষণ শব্দের সহিত ভীত সমুদ্র-পক্ষীর সকরুণ ক্ষীণ ক্রন্দন-ধ্বনি মিশিয়া, জগতে এক বিষম বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

বাহিরে প্রকৃতির অনাবৃত প্রাঙ্গণ-তলে নিত্যকালের যে মহান ধ্বনি অনাদি-কাল হইতে মানব-অন্তরে বাজিতেছিল, আজ মৃত্যু নিশার বিচিত্র সমবেত বাদ্য-ধ্বনিতে মিশ্রিত হইয়া তাহাও যেন ডুবিয়া গিয়াছে।

জানালাটা খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিলাম, সজোর বাতাসে কতকগুলা সমুদ্রের গাঁজলা আর একটা ভগ্ন ঝাউয়ের শাখা বেগে কক্ষ-নিম্নে আসিয়া পড়িল। কঙ্করাঘাতে আহত চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়াই প্রাণপণ শক্তিতে আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জনের সহিত মধ্যে মধ্যে তখন বিদ্যুৎ হানিতেছিল। ঝড়ের গর্জ্জনে তরঙ্গের আস্ফালনে বাহিরের সকল শব্দই ডুবিয়া যাইতেছিল।

বাবা ও এস্‌থার তাঁহাদের নিজ নিজ শয়ন-কক্ষে! ঘুমাইয়াছেন কি? আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকটে চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে দেখিতেছিলাম,—প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য,—আর ভাবিতেছিলাম এই মৃত্যু-রজনীর ভীষণতার দিকে চাহিয়া এ সময় গেব্রিয়েল কি করিতেছে? আর সেই বৃদ্ধ,—অকারণ-ভীত সংশয়াকুল চিত্ত কুসুমবার-স্বামী? প্রকৃতির এই সৃষ্টি-সংহারক ভীষণতাকে কি তিনি আপনার অন্তরের বিপদ সম্ভাবনার সহিত মিলাইয়া কোন আসন্ন বিপৎপাতের কল্পনায় একেবারে দারুণ ভয়ে আক্রান্ত হইয়া পড়েন নাই? মধ্যস্থলে আর দুইটি দিবা-রাত্রি আটচল্লিশ ঘণ্টার ব্যবধান, তাহার পরেই নবীন সূর্য্যালোকে আবার নব জগতে প্রবেশ-লাভ। এই ঝটিকার অবসানে আবার সূর্য্যোদয় হইবে, আবার ধরণী বর্ণে গন্ধে হাস্যে উৎসবে মুখরিত পুলকিত হইয়া উঠিবে, অন্ধকারের পর আলোক, জীবনের পর মৃত্যু, দুঃখের পর সুখ কি বিচিত্র এই লীলা, আর কি বৈচিত্র্যপূর্ণ এই সৃষ্টি!

জেনাবেল আশঙ্কা করিয়াছেন, ৫ই অক্টোবর তাঁহার অনিশ্চিত ভাগ্য-রহস্যের নিশ্চিৎ সিদ্ধান্ত ঘটিয়া যাইবে! এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ তাঁহার অন্তরাত্মাকে কতখানি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কি ভাবিতেছেন—এই সহসা-আগত ঝটিকার সহিত তাঁহার জটিল ভাগ্য সূত্রের কোন্ সূক্ষ্ম অংশ জড়িত হইয়া রহিয়াছে!

এই সব সত্য মিথ্যা বাস্তব অবাস্তব বিষয়, এবং আরও অনেক অবান্তর বিষয়ের চিন্তা আমার আলোড়িত মস্তিষ্কের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। অগ্নিকুণ্ডের কাষ্ঠ-খণ্ডগুলা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল,—সেই নির্ব্বাপিত বহ্নি-পীতধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর ভগ্নাবশেষ সিগারটা—নিক্ষেপ করিয়া

আলস্য ত্যাগ করিয়া শয়নের জন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা বা তাহারও কম সময় আমি ঘুমাইয়াছিলাম। সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কে যেন সজোরে আমার ঘাড়ে ঠেলা দিয়া ডাকিতেছিল "জ্যাক্! জ্যাক্!"

রাত্রির অন্ধকারে, ঘুমের ঘোরেও বুঝিতে পারিলাম, বাবা নিজেই ডাকিতেছিলেন। তাঁহার স্খলিত বেশ-বাসে এবং উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বিশেষ কোন দুর্ঘটনারই আভাষ পাইলাম। তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বাবা ব্যস্তভাবে ত্বরিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "জ্যাক্, চল, চল, একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ ঐ উপসাগরের চড়ায় এসে আট্‌কে গেছে—লোকগুলা বোধ হয় সব মারা যাবে। এস এস! আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি, যদি তাদের কোন কাজে লাগ্‌তে পারি।"

অন্ধকারে হাতড়াইয়া যতগুলা পাইলাম শুষ্ক বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ধড়াস্ করিয়া একটা ভয়ানক শব্দ হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের সহিত সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনা গেল। বাবা ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঐ শোন গো, ঐ, —ঐ—আবার তারা সাহায্য প্রার্থনার জন্য কামান ছুড়্‌চে—হায়, হায়—হতভাগারা!—জেমিসন আর এক দল নাবিকেরা নীচে রয়েচে। তোমার ওয়াটার প্রুফ্?—গ্লেন-গারী টুপিটা? এ সব—হাতের কাছে গুছিয়ে রাখ্‌তে হয়—? চল, চল, আমাদের এক মিনিটের দেরীর জন্য তাদের কত—অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।"

উত্তেজনা ও অধীরতায় বাবা যেন সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহাকে শান্ত করিবার প্রয়াস বৃথা—বরং গণ্ডগোলে সময় নষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা ছুটিয়াই চলিয়া ছিলাম। ব্রাঙ্কসামারের অপর চারজন দয়ালু লোকও আমাদের সাহায্যের জন্য সঙ্গে আসিয়াছিল।

ঝড় না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। বাতাসের সহিত তটাহত সমুদ্র-তরঙ্গের গর্জ্জন-ধ্বনি মিলিত হইয়া যেন একটা পৈশাচিক চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। বাতাসের বেগ এত বেশী যে আমরা স্কন্ধ গুটাইয়া তাহার বেগ সহ্য করিয়া দৌড়িতেছিলাম, বালুকা ও কঙ্করাঘাতে অনেক সময় দৃষ্টি-শক্তি অবধি হারাইয়া যাইতেছিল।

আকাশে ছিন্নমেঘ অস্পষ্ট নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে আমরা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ সফেন তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতে-ছিলাম না। বাতাসের ঝট্‌কায় হাঁটু পর্য্যন্ত ঠিকরাণো লতা-পাতায় জড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পতন অনিবার্য্য করিয়া তুলিতেছিল।

একটা সকরুণ সাহায্য-প্রার্থনার সহিত ভয়-মিশ্রিত ক্ষীণ ক্রন্দন আমার কর্ণে যেন বহুদূর হইতে বায়ুস্রোতে ভাসিয়া আসিতে ছিল। ঝড়ের, সমুদ্রের, মেঘের,—সমস্ত প্রকৃতির সেই বিশ্বব্যাপী সংহার কোলাহলের ভিতর দিয়া মানবের ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ,—কত টুকুই বা তাহার বল! (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সুরূপা দেবী।
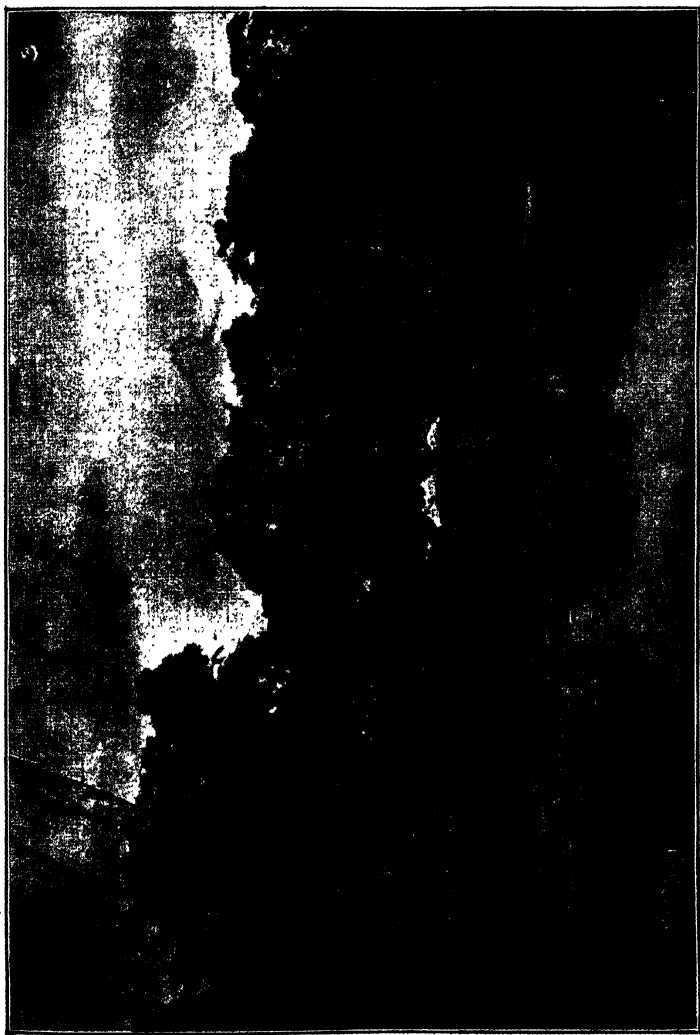
প্রতিচ্ছায়া

(ফ'টোগ্রাফ হইতে)

অবনত জাতি

(প্রতিবাদ)

প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় তাঁহার অবনত জাতি শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রহাচার্য্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক কথার অবতারণা করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণেতর-জাতিরা শুধু দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ কেন, যে কোন ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকারী নহেন। তিনি যে উল্লিখিত প্রবন্ধে কেবল শাস্ত্রবিধির অমর্য্যাদা করিয়াছেন তাহা নহে, বিবেচনা না করিয়া কোন কোন কথা লেখায় ভব্যতারও সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। আসাম প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারস্থ প্রদেশ সমুহে যে আমাদের সমশ্রেণীস্থ কোন ব্রাহ্মণের বাস আছে তাহা আমাদের পরিজ্ঞাত নাই। তবে বাঙ্গালা দেশে গ্রহাচার্য্যগণ চিরকালই এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মানিত। বাঙ্গালার দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায় অনন্তকাল হইতে বংশপরম্পরাক্রমে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর উপাসনা, শিবপূজা, নারায়ণ পূজা এবং দৈব-পৈত্র্য যে সকল কর্ম্ম আছে যথাবিধি তৎসমস্তেরই অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। জ্যোতিষী পণ্ডিতরূপে ইঁহারা হিন্দুসমাজের যাবতীর বৈধকার্য্যের বিধিব্যবস্থা প্রদান করেন। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণ গৃহে গ্রহযাগাদি বেদোক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন। এই বাঙ্গালা দেশের এক চতুর্থাংশ গ্রহাচার্য্য প্রাচীন রাজা ভূম্যধিকারীদের প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ভূমি ভোগ করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় বৈধ ব্যাপারে নিমন্ত্রিত ও সম্মানিত হন। বিহার প্রদেশে এই শ্রেণীর যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁহারা কনোজিয়া, গৌড় প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ও অন্যান্য উচ্চ বর্ণের পুরোহিত।

সেনমহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন "সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গণকদিগকে গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণরূপে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।" এই কথাটী সম্পূর্ণ অসত্য। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন যে গবর্ণমেণ্ট "ভারতে মনুষ্যগণনার" সৃষ্টি হইতে বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রহাচার্য্যসম্প্রদায়কে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করিয়া আসিতেছেন। এবং বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে গ্রহাচার্য্যদিগকে চতুর্থস্থান প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক (পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য) গ্রহাচার্য্য, অগ্রদানী, বর্ণযাজী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা গ্রহণ করা হইত। গত মনুষ্যগণনায় ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্যগণনায় সেরূপ সংখ্যা গ্রহণ করা হয় নাই। বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই "ব্রাহ্মণ" এই শিরোনাম দিয়া একত্র গণনা করা হইয়াছে।

তার পর সেনমহাশয়ের আর একটী ভ্রম এই যে, তিনি লিখিয়াছেন "গ্রহাচার্য্যগণ খাঁটী ব্রাহ্মণ হইবার জন্য চীৎকার করিতেছেন।" একথা তিনি কি প্রমাণবলে জানিলেন? কই বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রহাচার্য্য যে কাহারও কাছে গিয়া ঐরূপ চীৎকার করিয়াছেন এ সংবাদ ত আমরা পাই নাই। তিনি "খাঁটী ব্রাহ্মণ" কাহাকে বলেন? শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে যিনি যথাবিধি উপনয়ন সংস্কারের পর বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক সমাবর্ত্তনান্তে যথাশাস্ত্র দারপরিগ্রহ করিয়া প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই "খাঁটী ব্রাহ্মণ"। উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত বিধি সকল অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ যেরূপ পালন করেন, গ্রহাচার্য্যগণও তদ্রূপই করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে শাস্ত্রে কোন বিশেষ নামযুক্ত ব্রাহ্মণ "খাঁটী ব্রাহ্মণ" বলিয়া উক্ত হন নাই। বেদোক্ত নিষেকাদি শ্মশানান্ত বিধি যাঁহার সম্বন্ধে যথাযথ প্রতিপালিত হয় তিনিই খাঁটী ব্রাহ্মণ।

তার পর সেনমহাশয় আচার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া যে অশ্রুতপূর্ব্ব বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন উহা আলোচনার অযোগ্য। তিনি জানেন

না যে বাঙ্গালাদেশে যখন পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই তখন গ্রহাচার্য্যগণই প্রাণপাত করিয়া এদেশে বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার ও রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই এদেশের গুরু ও পুরোহিত ছিলেন। কালক্রমে গ্রহাচার্য্যগণের পৃষ্ঠপোষক শশাঙ্কবংশীয় রাজগণের শাসন বিলুপ্ত হইল, ইঁহারাও হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন। নবাগত রাজার রাজ্যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা দেশে প্রতিগমন করিলে বাঙ্গালীর দানগ্রহণে প্রত্যবায়গ্রস্ত বলিয়া স্বদেশে স্বজাতীয়দের মধ্যে স্থান পাইলেন না। ফিরিয়া-আসিয়া বাঙ্গালাদেশে বাস করিলেন। রাজার সমাদরে তাঁহারা বাঙ্গালার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। সেই ক্ষমতাপন্ন ব্রাহ্মণদিগকেও এই হীনপ্রভ সম্প্রদায়ের গৃহ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং ইহাদিগেরই অধিকাংশকে কুক্ষিগত করিয়া সমাজ বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা রাজার নিকট নিজের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এদেশের হীনপ্রভ ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত দূরে রাখিলেন। সুতরাং "যাহারে দেবতায় করে হেলা তাহারে রাখালে মারে ডেলা" এই নীতি-বলে ইঁহাদিগের শিষ্য, যজমান সমস্তই হস্তচ্যুত হইল। সুতরাং ইঁহারা ক্রমে নিস্তেজ ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। কাজেই এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এখন দীনদশাপন্ন। গ্রহাচার্য্যগণ অর্থহীন হইয়াছেন তজ্জন্য বড় কাজ করিতে পারেন না। যাঁহারা পারেন, তাঁহাদিগকে কেহ উপেক্ষা করেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের তোষাখানার প্রথম দেওয়ান বেলুড়নিবাসী ৺ রামচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে প্রায় ৫০০ শত (পাঁচ শত) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমবেত হন এবং তিনি সমাজ শুদ্ধ সমস্ত ব্রাহ্মণকে ফলাহার ও ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাহার পরও অনেক ক্রিয়া কর্ম্মাদিতে অধ্যাপকগণ ও সামাজিক ব্রাহ্মণগণ যোগদান করিয়া আসিতেছেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহিত আমাদের যে কোনও পার্থক্য আছে, তাহা ব্যবহার দ্বারা বুঝিতে দেন না। তবে সমাজে ঈর্ষাপরায়ণ নষ্টদুষ্ট লোকেরও অভাব নাই। তাহারা শুধু আমাদের সহিত কেন অনেকের প্রতিই কোনও না কোন প্রসঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্ত সেনমহাশয় গ্রহাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে যেন অকারণ লেখনী পরিচালনা না করেন। আমরা অযথা কলহের পক্ষপাতী নহি, তজ্জন্য সরলভাবে সত্যঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র উপাধ্যায়।

রত্নাবলী নাটিকা

(সিল্‌ভ্যাঁ লেভির ফরাসী হইতে)

১। বৎস-রাজার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, একটা ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা অবগত হইলেন যে, সিংহলরাজ-দুহিতা রত্নাবলী যাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন তিনি সার্ব্বভৌম নৃপতি হইবেন; কিন্তু বৎস-রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার পক্ষে একটা বিষম বাধা আছে। বৎস-রাজা স্বীয় মহিষী বাসবদত্তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত; তাই মন্ত্রীর ভয় হইল পাছে এই বাঞ্ছনীয় বিবাহে মহিষী বিরোধী হন। মন্ত্রী একটা ফিকির ঠাওরাইলেন। ফিকিরটিতে যেমন বেশ একটু নিপুণতা আছে, তেমনি একটু জটিল ধরণের। তিনি বৎস-রাজার জন্য রত্নাবলীর পিতার নিকট, রত্নাবলীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ে সিংহল-রাজ এই বিবাহে সম্মতি দিলেন এবং

বৎস-রাজার নিকট স্বীয় দুহিতাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সমুদ্রযাত্রার সময় একটা ঝড় উঠিল এবং কূলের সন্নিকটে অর্ণবপোত ভগ্ন হইল। কোন অপরিচিতের হস্তে, জলমগ্না রাজকুমারী উদ্ধার পাইয়া বৎস-রাজার অন্তঃপুরে নীত হইলেন এবং একজন সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা কুমারী বলিয়া পরিচিত হইয়া সেখানে "সাগরিকা" নাম প্রাপ্ত হইলেন। বাসবদত্তা তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ও ও উচ্চকুলোচিত ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে রাজার দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্তোৎসব সমাগত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গেল। অন্তঃপুরের ক্রীড়ামোদে যোগ দিবার জন্য বৎস-রাজা বিদূষক বসন্তককে সঙ্গে লইয়া মদনোদ্যানে অবতরণ করিলেন। মহিষীর দুই পরিচারিকা বসন্তঋতুর গান ও প্রেমের গান গায়িতে গায়িতে প্রবেশ করিল। তাহার পর তাহারা রাজাকে জ্ঞাপন করিল যে, কন্দর্পদেবের পূজার জন্য মহিষী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বৎস-রাজ আসিয়া বাসবদত্তার সহিত মিলিত হইলেন। পরিচারিকাদিগের মধ্যে সাগরি-কাকে দেখিতে পাইয়া একটা উড়িয়া-যাওয়া সারিকার সন্ধান করিবার ছুতা করিয়া মহিষী তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইলেন। রাজদম্পতি যথাবিধানে কামদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাগরিকা বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাদের পূজার্চ্চনা দেখিতেছিল; সে রাজাকে সাক্ষাৎ কন্দর্প মনে করিয়া দূর হইতে মনে মনে তাঁহাকে পূজা করিল। এমন সময় একজন বৈতালিক সন্ধ্যার সমাগম জ্ঞাপন করিল, তখন সাগরিকা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল, সে উদয়ন রাজাকেই দেখিয়াছে,—যে-উদয়ন-রাজার সহিত পিতা তাহার বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

২। দুইজন পরিচারিকা রাজবাড়ীর কথা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতেছিল। তাহা হইতে দর্শকবৃন্দ জানিতে পারিল, বৎস-রাজ অকালে ফুল ফুটাইবার কৌশল একজন সন্ন্যাসীর নিকট শিখিয়াছেন, এবং তাহা কাজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। পরে সাগরিকা প্রবেশ করিল। সাগরিকা রাজার চিত্র আঁকিতে ব্যাপৃত। তাহার সখি সুসঙ্গতা আসিয়া সেই চিত্রপটে রাজার পাশে সাগরিকার চিত্র আঁকিল। সাগরিকা তাহার অন্তরের গোপনীয় প্রেমের কথা তাহার সখির নিকট খুলিয়া বলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটা তুমুল কোলাহল শুনিয়া তাহারা পলায়ন করিল। একটা বানর পিঞ্জর হইতে পলায়ন করায়, অন্তঃপুরিকাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বসুলক্ষ্মী ভয় পাইয়াছে। যে সারিকাকে মহিষী সাগরিকার হাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সারিকা এই গোলযোগে উড়িয়া গিয়া কদলী-কুঞ্জের এক বৃক্ষের উপর বসিয়াছে। ঠিক্ এই সময় রাজা বিদূষককে সঙ্গে লইয়া কদলী-কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। সারিকা দুই সখীর কথাবার্ত্তা আবৃত্তি করিতেছে শুনিতে পাইলেন এবং একটি চিত্রপট দেখিতে পাইলেন, তাহাতে দুই ব্যক্তির চিত্র পাশা-পাশি চিত্রিত রহিয়াছে। সাগরিকা ও সুসঙ্গতা সেই চিত্রপটটি লইয়া যাইবার জন্য

সেখানে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল। অপরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং অন্তরালে থাকিয়া রাজার মদনপীড়িত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসবাক্য সকল শুনিতে লাগিল। রাজা সাগরিকার নিকটে গিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহার জ্বলন্ত বাসনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ প্রেমালাপ চলিতেছে এমন সময়ে বাসবদত্তা প্রবেশ করিয়া সেই প্রেমালাপে ব্যাঘাত জন্মাইলেন। মহিষী চিত্রপটটি দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে সাগরিকার চিত্রটি চিনিতে পারিয়া, মুখে রোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া, এবং রাজার সান্ত্বনাবাক্যে কোন উত্তর না দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ("মালাবিকা"র তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।)

৩। সাগরিকার সহিত যাহাতে আর একবার সাক্ষাৎকার ঘটে তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য রাজা বিদূষকের উপর ভার দিয়াছেন। বসন্তক সুসঙ্গতার সহিত মিলিয়া এমন একটা ফন্দি করিল যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না হয়। সাগরিকা রাণীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং সুসঙ্গতা রাণীর পরিচারিকার বেশ পরিধান করিয়া রাজার নিকট আসিবে স্থির হইল। কিন্তু তাহাদের এই ফন্দিটা কাজে পরিণত না হইতে হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং রাণী ইহা জানিতে পারিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে বাসবদত্তা সঙ্কেত-স্থানে গমন করিয়া সাগরিকার সহিত রাজার প্রেমালাপ শুনিতে পাইলেন। রাণী ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া রাজাকে যার-পর-নাই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেম, কিন্তু রাণী ক্ষমা করিলেন না। রাজা একাকী থাকিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সাগরিকা প্রবেশ করিল। রাজাকে দর্শন করিবার পুর্ব্বেই সাগরিকা রাজার বিলাপ শুনিতে পাইয়াছিল। চির বিষাদময় হতভাগ্য জীবনে ক্লান্ত হইয়া, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে বিদূষক তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বেশসাদৃশ্যে প্রতারিত হইয়া তাহাকে বাসবদত্তা ঠাওরাইল। রাজা স্বকীয় চপলতাই রাণীর মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া, রাণীকে বাঁচাইবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু সাগরিকাকে চিনিতে পারিয়া আবার সেই নূতন প্রেমে গা ঢালিয়া দিলেন। এদিকে বাসবদত্তা, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, সাগরিকার সহিত রাজার প্রেমালাপ চলিতেছে। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি সাগরিকা ও বিদূষককে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। ("মালবিকার" তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।

৪। রাণী বিদূষককে ছাড়িয়া দিলেন। সমস্ত দণ্ড সাগরিকাই ভোগ করিবে। সাগরিকা কারাগার হইতে বিদূষককে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আপনার মূল্যবান কণ্ঠমালাটি পাঠাইয়া দিল। রাজা বাসবদত্তার দয়া উদ্রেক করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হইল। এই সময়ে রাজা একটা বিজয়-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রুমণ্বৎ কোশলদিগের উপর জয়লাভ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন।

এই সময়ে একজন যাদুকর আসিয়া রাজ-

দর্শন প্রার্থনা করিল এবং রাজদম্পতীর নিকট তাহার গুণপনা দেখাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। রাজা ও রাণীর সমক্ষে যাদুকরের ক্রীড়া প্রদর্শিত হইতেছে এমন সময়ে সিংহল-রাজের ভৃত্যদ্বয় বাভ্রব্য ও বসুমতীর আগমনে ক্রীড়া থামিয়া গেল। রত্নাবলী ভগ্নপোত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে তাহারা এই সংবাদ রাজাকে নিবেদন করিল। এই সংবাদে সকলে যার-পর-নাই শোকগ্রস্ত হইয়াছে, এমন সময়ে আর একদিক হইতে দারুণ হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হওয়ায় সকলের আতঙ্ক আরও বর্দ্ধিত হইল। অন্তঃপুরে আগুন লাগিয়াছে। বাসবদত্তা স্বকীয় নিষ্ঠুরতার জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন এবং সাগরিকাকে বাঁচাইবার জন্য রাজাকে অনুনয় করিলেন। বৎস-রাজ জ্বলন্ত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিতা সাগরিকাকে লইয়া আসিলেন। সহসা আগুন নিবিয়া গেল। ইহা যাদুকরের একটা ভোজবাজি বই আর কিছুই নহে। বাভ্রব্য ও বসুমতী প্রথমে রত্নাবলীর কণ্ঠমালা চিনিতে পারিল, তাহার পর রত্নাবলীকেও চিনিল। বাসবদত্তা সাগরিকাকে ভগিনী বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং তাহার সহিত রাজার বিবাহ দিলেন। রাজা যৌগন্ধরায়ণকে জিজ্ঞাসা করায়, যৌগন্ধরায়ণ সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন। রত্নাবলীর জলমগ্ন হইবার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, যাদুকরের গৃহদাহ-ক্রীড়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তাঁহারই কৌশল। এই মহৎ উপকারের জন্য বৎস-রাজ স্বীয় মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং নিজ শুভ অদৃষ্টকেও ধন্যবাদ দিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটি গান

(রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি হইতে)

পাখী গাইত নিতি হৃদয়-খোলা খেয়ালে খুসী,
ও সে মেল্‌ত পাখা মেঘের সীমানায়;
আহা কোন্ ক্ষণে প্রেম সঙ্গ নিলে কোন্ আশা পুষি'
পাখী জান্‌লে নাক' হায়!
আজ সে পাখীর স্বস্তি নাহি আর,—
হারিয়েছে নীড়,—হিয়ায় হাহাকার।
আর সে খেয়াল নাইগো উড়িবার,—
গগন-বিহার বন্ধ আজি তার।
বন্দী সে আজ প্রেমের বন্ধনে,
তবে চরম কথা মরণ-ক্রন্দনে
নিক্ সে ক'য়ে, হায়!
আজ ফুরিয়েছে তার গগন-বিহার
হারিয়েছে কুলায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সার্দ্দুর নাট্য রচনা

[জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার সার্দ্দুর মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে নাট্য এবং নাট্যশালা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই এ স্থলে সঙ্কলিত হইল। সার্দ্দু একাধারে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, উত্তম রঙ্গভূমি সজ্জাকর, এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন।]

যাঁহার নাট্যাভিনয় দর্শনে পুরাতন ও নূতন ভূমণ্ডলের সহস্র সহস্র দর্শক বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান বোধ হয় শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক হইবে। বহু চিত্রকর সার্দ্দুর কোমল মধুর ভাবব্যঞ্জক অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নয়নদ্বয়কে চিত্রিত করিতে যাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহাকে একাদশ লুই হইতে ভলটেয়ার পর্য্যন্ত বহু বিখ্যাত লোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গ্রীষ্মের কয়েকমাস ফ্রান্সের একটী অতি মনোহর অথচ অজ্ঞাত পল্লীভবনে বাস করিতেন। উজ্জ্বল বিচিত্র ভাবে সজ্জিত কক্ষে বসিয়া সার্দ্দু তাঁহার নাটকাবলী রচনা করিতেন। বিগত ৫৪ বৎসর মধ্যে ইনি নাটক এবং অন্যান্য প্রকারের প্রায় ৭০ খানি পুস্তক. রচনা করিয়াছেন, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ইনি কি প্রকার পরিশ্রম করিতেন।

এখন সার্দ্দুর নিজের কথাতেই তাঁহার কার্য্যপ্রণালী এবং কিরূপ ভাবে নাটক সমূহ রচিত হইত তাহা বলা যাউক।

"কেমন করিয়া আমি নাটক রচনা করি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। হাস্যরসাত্মক নাট্য এবং সাধারণ নাট্য রচনায় সাধারণতঃ এই ভাবে অগ্রসর হই। প্রথমতঃ আমি ছোট গল্পাকারে নাট্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করি। যদিও আমি নাট্য সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছি তথাপি আমি উপন্যাসরচয়িতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। Balzac আমার নিকট সেক্সপিয়ারের ন্যায় প্রিয়। আমি সাধারণতঃ একাসনে বসিয়া এক অঙ্ক লিখিয়া ফেলি। পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় সমস্ত দৃশ্যই লিখিয়া সেক্রেটারীর নিকট দিই। কখনও যতবার সন্তুষ্ট না হই ততবার এমন কি দশবারও একটী অঙ্ককে পরিবর্ত্তিত করি। যখন আমি লিখি তখন প্রত্যেক চরিত্র এবং তাহাদের সামান্য কার্য্যপ্রণালীও আমার নয়ন সমক্ষে ভাসিতে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক নাট্যকারই তাঁহাদের নিজ নিজ মতানুসারে নাট্য রচনা করিয়া থাকেন। আমার নিকট প্রতিদৃশ্যই একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান্ হয় এবং আমার প্রতি চরিত্রই মানসে ভাসিতে থাকে।"

"দিবসের কোন্ সময়ে কার্য্য করা আপনি ভাল বিবেচনা করেন?"

"আমি সর্ব্বদাই প্রাতে লিখিয়া থাকি। রজনীর কার্য্যে আমি বিশ্বাস করি না, মস্তিষ্ক সে সময় অতিরিক্ত উত্তেজিত কিম্বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। একখানি নাটক রচনা

করিতে আমার তিন মাস হইতে চারিমাস সময় লাগে। এই প্রকার পরিশ্রমের কাজ আমি কেবল পল্লীতেই করিতে পারি। কারণ সে স্থানেই আমি প্রকৃত শান্তি পাই। যখন মার্লিতে বাস করি তখন তিনটা পর্য্যন্ত আমি কোন দর্শকের সহিত সাক্ষাৎ করি না, সেই সময় কিছু দিনের মত আমার রচনা একরূপ শেষ হইয়া যায়। তার পরে বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ আহ্লাদে রত হই।"

"আপনি কি নাটকের ঘটনাবলী ইতিহাস ও বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ করেন—না সাধারণতঃ যাহা আপনার মনে উদিত হয় তাহারই সাহায্যে রচনা করেন?"

"ইতিহাসের কোন বিশেষ ঘটনা এবং আমার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ একটী ঘটনা সমস্ত বিষয় হইতেই আমি আমার রচনার উপাদান সংগ্রহ করি। কার্য্যপরম্পরা ঘটনাবৈচিত্র্য এ সমুদায়ই আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি, একমাত্র প্রতিভার উপর আমার তেমন বিশ্বাস নাই। কারণ শুধু প্রতিভা দ্বারাই এমন জিনিস প্রস্তুত হয় না যাহা চিরকাল লোকমনোরঞ্জনে সমর্থ হইতে পারে। যখনই আমি একটা সুন্দর কল্পনা করি তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তৎপরে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ হইতে—ক্রমে ক্রমে আমার অজ্ঞাতসারে নাট্যরচনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আইসে। অবশ্য এরূপ ঘটনা শুধু ঐতিহাসিক রচনাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। মনে করুন আজ আমি একটী সুন্দর নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া লইলাম। নামটা টুকিয়া রাখিয়া দিলাম। তার পর ক্রমে ক্রমে কেবল নায়কের বিষয় নহে,—তাহার বাসস্থান, কাহিনী সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পরে কার্য্যে ব্রতী হইলাম।"

"আপনি কি রচনায় ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন—না কবিস্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া থাকেন?"

"আমি সামান্য ঘটনাতেও ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করি না, এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকি। আমার মনে হয় আমি প্রকৃতিগত ঐতিহাসিক নাটককার নহি। বাল্যকাল হইতেই আমি অসীম আগ্রহ সহকারে ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি। অতীতের ঘটনাবলী আমার নিকট সজীব ভাবেই প্রতিভাত হয়।

ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিবার পূর্ব্বে আমি সেই সময়ের সমস্ত পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করি। আমার উত্তম স্মৃতিশক্তি আছে। তজ্জন্য আমি সৌভাগ্যবান্। নাটক প্রকাশিত হওয়ার বহুদিন পরেও কোথা হইতে কোন্ ঘটনা গৃহীত ও পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি। মৎপ্রণীত 'Theodora' অভিনীত হইলে সমালোচক বর্গ আমার অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া আপত্তি করিলেন যে সেকালে এখনকার সভ্যযুগের অস্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হইত না। আমি যখন বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের এই ভুলের প্রতিবাদ করিলাম তখন সমালোচকগণের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।"

"আপনার নাটক অভিনয় হওয়া সম্বন্ধে

আপনিই বোধ হয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন?"

"নিশ্চয়ই। সমস্ত দৃশ্যই আমি নিজে কিম্বা আমার বিশেষ তত্ত্বাবধানে সজ্জিত করাই।—আমি প্রথম নেপোলিয়ানের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, সমস্ত জীবন ভরিয়া তাহার জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছি।"

"আপনি বোধ হয় বিপ্লব সময়ের ইতিহাস বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন?"

"পুরাতন প্যারিসের ও বিপ্লব সময়ের ইতিহাস আমি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছি। স্থাপত্য শিল্পের উপরও আমার খুব অনুরাগ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি 'রবাণ পিয়াসে'র' আবাসস্থান আবিষ্কার করি।"

"আমার বোধ হয় আপনি সাধারণ তন্ত্রকে একটু প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, নিজেকেও বোধ হয় সাধারণতন্ত্রী মনে করেন?"

"না মহাশয়, আমি সাধারণতন্ত্র এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখি না।"

"রঙ্গমঞ্চের বাস্তবপ্রণালী সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

"এই সম্বন্ধে বহু বাজে কথা শোনা যায়। আধুনিক নাটককারগণ মনে করেন তাঁহারাই একথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমি একজন Stage Realist ছিলাম, Nos Intimes এ আমিই প্রথমে রঙ্গমঞ্চের উপরে (Love scene) প্রেমদৃশ্যের অভিনয় প্রদর্শন করাই। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সমালোচক আপত্তি করিলেন; আমি তাহাকে বলিলাম—আপনি দেখুন কেমন ভাবে আমি ইহার অভিনয় করাই। সমস্ত প্যারিসব্যাপী একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল, অভিনয় দিনে রঙ্গমঞ্চে তিলধারণেরও স্থান রহিল না—আজকাল ইহা অতি সাধারণ ঘটনা বলিয়াই প্রতীয়মান্ হয়। বাস্তবিকই তৎকালে রঙ্গমঞ্চে ঘটনাবলী অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে সজ্জিত হইত। এখন আর হত্যাদ্বারা নাট্যশালাকে কলঙ্কিত করা হয় না, সে প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা দৃশ্যান্তরালে সংঘটিত হয়। Racine অথবা Corneille কখনও রঙ্গমঞ্চে হত্যা দেখান নাই। যখন 'Thermidor' অভিনীত হইতেছিল তখন রঙ্গমঞ্চে—গিলোটিনে মৃত ব্যক্তি বহনের গাড়ী ব্যবহৃত হয় নাই।

আমি নাট্যশালার বহুক্ষুদ্র অপ্রীতিকর ঘটনাবলী অপসারিত করিয়াছি। আমিই প্রথমে প্রকৃত আসবাব পত্রাদি রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করি, এবং আমারই অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চে তামাক ও চুরুট পান করে।"

"আপনি বোধ হয় পোষাকপরিচ্ছদ ও দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন?"

"নিশ্চয়ই, এ সমস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার নাটকের প্রত্যেক চরিত্রঅভিনেতার পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখি। রঙ্গমঞ্চের উপর আমি যেমন জিনিস রাখিতে চাহি—পূর্ব্ব হইতেই তাহার পরিকল্পনা করিয়া রাখি। প্রত্যেক দৃশ্য কেমন হইবে এমন কি চেয়ার ও সোফাখানি পর্য্যন্ত কেমনভাবে বসিবে তাহা স্থির করিয়া

রাখি। ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে এ সমস্ত ঠিক করা অত্যন্ত কষ্টকর।”

এস্থলে বলা আবশ্যক, সার্দ্দু জগদ্বিখ্যাত ষ্টেজ্ ম্যানেজার ছিলেন। কোন প্রসিদ্ধ নাট্যকারই রঙ্গমঞ্চের কার্য্যে ইঁহার সমান ছিলেন না।

“যখন আমার নাটকের রিহার্সেল আরম্ভ হয়—তখন আমি থিয়েটারেই বাস করি। যাহাতে নাটকখানি উত্তমরূপে অভিনীত হইতে পারে মনে প্রাণে তাহারই চিন্তা করি। নাট্যের প্রত্যেক অভিনেতার কার্য্যপ্রণালী, স্বরভঙ্গিমা এ সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই আমি স্থির করিয়া দিই। যত বড় অভিনেতাই হোন্ না কেন, কেমন করিয়া কোন্ কথা বলিতে হইবে আমি সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। নাটককার নিজে সঙ্গে থাকিয়া যদি অভিনেতাকে শিক্ষা দেন তবে অভিনয় অতি সুচারুভাবে নির্ব্বাহিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক নাটককারই জন্মগত সুদক্ষ ষ্টেজম্যানেজার নহেন। বহু বড় নাটককার জানেন না কেমনভাবে তাহাদের নাটক ষ্টেজে নামাইতে হয়, সে কার্য্য তাঁহারা অপরের সাহায্যে সম্পাদন করেন। আমার বন্ধুগণ বলিয়া থাকেন যে আমি প্রকৃতিগত একজন অভিনেতা। আমি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে, কোন্ দৃশ্য কেমন ভাবে অভিনীত হইবে, কোন্ কথা কেমনভাবে উচ্চারিত হইবে তাহা দেখাইতে ভীত হই না।”

“আপনি বোধ করি কোন হাস্যরসিক অভিনেতাকে তাহাদের স্বেচ্ছা অনুসারে আপনার চরিত্রের অভিনয় করিতে দেন না?”

“সে আমি যেরূপ অভিনেতার সহিত কার্য্য করি তাহার উপরেই নির্ভর করে। তবে আমার কথার সহিত অতিরিক্ত ফাজলামি সংযুক্ত হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। ম্যাঃ রেজানি অথবা সারা বার্ণার্ড তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কিছু করিলে নাটকীয় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হওয়া ব্যতীত ক্ষুণ্ণ হয় না।”

“আপনি কোন নূতন নাটক রচনার সময় কোন অভিনেতার জন্য বিশেষভাবে কোন চরিত্রের সৃষ্টি করেন কি? যখন আপনি La Tosca লেখেন তখন কি সারা বার্ণার্ডের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিয়াছিলেন।

“না সেরূপভাবে আমি কোনও চরিত্র সৃষ্টি করি নাই। ইহা ঠিক যে একজন ভাল অভিনেতার সাহায্যে নাটক খুব উৎড়াইয়া যায়। কিন্তু আমি সামান্য অভিনেতার প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখি—সমবেত শক্তি ব্যতিরেকে একখানি নাটক কখনও ভালরূপে অভিনীত হইতে পারে না। La Tosca এবং Fedora উভয় চরিত্রই আমি কোন বিশেষ অভিনেত্রীর জন্য লিখি নাই—তবে অভিনেত্রীগণই এ দুই চরিত্রকে তাঁহাদের নিজের করিয়া লইয়াছেন।”

“রমণী এবং পুরুষ—কমেডিয়ান হিসাবে কাহাকে আপনি উচ্চ স্থান প্রদান করেন?”

“রমণীকে নিশ্চয়ই। আমার ধারণা কমেডি অভিনয়ে তাঁহারা পুরুষদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

“আপনি বোধ হয় ফরাসী দেশীয় Conservatoire সঙ্গীতালয় সমূহকে ভাল বিবেচনা করেন?”

তদুত্তরে সার্দ্দু বলিলেন, “না আমি বরঞ্চ উহাকে ঘৃণা করি। ইহাতে অভিনেতা অভিনেত্রীর কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না, ফরাসী-

দেশের বিখ্যাত অভিনেতাগণের মধ্যে অনেকেই Conservatoire এ শিক্ষিত হন নাই। সেখানে কেহ সামান্য কিছু শিখিতে পারে, কিন্তু বাহির হইয়া দেখে তাহার শিখিবার অনেক বাকী রহিয়া গিয়াছে। শুধু রঙ্গমঞ্চেই প্রকৃত অভিনয় শিক্ষা করা যাইতে পারে। আমি বিশ্বাস করি হাস্যরসের অভিনেতা প্রকৃতিগত, তাহারা তৈরী হয় না।"

"আপনি ইতঃপূর্ব্বে Ballzacএর প্রতি আপনার শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন, আপনি নিজে কি কখনও উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিয়াছেন?"

"না আমি একবার একখানা নভেল লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, উপন্যাস রচনায় ও নাটক রচনায় বেশ প্রভেদ আছে। নাট্যে করুণ, হাস্য, ভয়ানক সমস্ত রসেরই একটা কেন্দ্র আছে। পৃথিবীর যে দৃশ্যসমুদায় মলিন এবং অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহা দেখাইতেই আনন্দ বোধ করি। আমার নাটকে বর্ণিত ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের চিত্রাদি পাইতে আমি সর্ব্বদাই যত্ন লইয়া থাকি। Fedora র প্রত্যেক চরিত্রই এক দিন জীবিত ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন নাট্য রচনা সামান্য পরিশ্রমেই সম্পাদিত হইতে পারে—এটা তাঁহাদের ভুল। নাটককারকে বহু পরিশ্রমে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়—এই পরিশ্রমের পুরস্কার সহস্র সহস্র দর্শকের হৃদয়োত্থিত আনন্দ কোলাহল।"

সার্দ্দুর নিজের কথাতেই তাঁহার রচনা প্রণালীর সামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম, ভবিষ্যতে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটক সমূহেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা রহিল। সুপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তাঁহার নাট্য ও অভিনয় নামক সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে সর্ব্ব দেশের নাট্য, নাট্যশালা, নাট্যকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতেছেন, তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, আশা আছে তিনিও বিদেশীয় নাট্যকার সম্বন্ধে আমাদিগকে বহু নূতন কথা শুনাইবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অপূর্ণ বাসনা

আসিছে জীবন সন্ধ্যা নিঃশব্দ চরণে
জুড়াইতে অভাগার অনন্ত যাতনা ;—
গুঞ্জনি বিদায় গীতি উঠিছে সঘনে
বক্ষঃ মাঝে ; থেমে গেছে পুলকের বীণা !
ছেয়ে আসে ধীরে ধীরে প্রলয় তিমির
সাঙ্গ কর্ম্ম ; কোলাহল নাহিক ধরায় ;—
চতুর্দ্দিকে নীরবতা উদাস গম্ভীর
ভেঙ্গে আসে আঁখি দুটী অনন্ত নিদ্রায় !
এখনি নিবিবে দীপ, ফুরাইবে সব
কিন্তু হায় ! এখনো যে অপূর্ণ বাসনা ;
অনন্ত তিয়াসা হৃদে, হে প্রাণবল্লভ !
আর কবে অভাগার পূরিবে কামনা।

শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ।

জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগৃহ

(Mark Twainএর বর্ণনা হইতে)

জর্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড় সম্মান। ছাত্র কোনও অপরাধ করিলে সাধারণ বিচারালয়ে তাহার বিচার হয় না,—সে বিচার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ। সহরে হয়ত কোনও ছাত্র শান্তিভঙ্গ করিবার অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শান্তি-রক্ষক জানিতে পারিল তাহার গ্রেপ্তারী আসামীটী বিদ্যালয়ের ছাত্র অমনি সে সসম্মানে তাহাকে তিনবার নমস্কার করিয়া—তাহার নাম ধাম বিনীত ভাবে জানিয়া লইয়া অন্যমুখী হইল। জর্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-দের এত সম্মান।

যথাসময়ে ঘটনাটী অবশ্য বিদ্যালয়ে কর্ত্তৃ-পক্ষদের গোচরীভূত করা হয়—তাঁহারাও অপরাধীকে বিচারানুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন। অপরাধীকে বিচার স্থলে উপস্থিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় না—তাহার অনুপস্থিতিতেই সাধারণতঃ বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

তারপর বিদ্যালয়ের পুলিশ একদিন হয়ত অপরাধীর দরজায় গিয়া উপস্থিত। সম্মতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া—সে সস্মিত-বদনে বিনয়ের সহিত নিবেদন করে—

"আমি এসেছি—আপনাকে কারাগারে নিয়ে যেতে। অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে এলে বাধিত হ'ব।"

"বটে, তা আমি ত এরূপ প্রত্যাশা করি নাই—আমি কি করেছি বল ত?"

"দু সপ্তাহের কথা—আপনি শহরে শান্তি ভঙ্গ করেছিলেন।"

"ওঃ, মনে হয়েছে। তা সেজন্য আমি বুঝি অভিযুক্ত হয়েছিলাম—আমার বিচার হয়েছে—আমি দণ্ড পেয়েছি?"

"আজ্ঞে, তাই। আপনার দু'দিনের—নির্জ্জন কারাবাস দণ্ড হুকুম হয়েছে।"

"কিন্তু—আমি ত আজ যেতে পারছি না?"

"কেন—তা' কি বলবেন দয়া করে।"

"আমার আজ Engagement আছে একটা।"

"তা হ'লে কাল যেতে পারবেন—বোধ হয়?"

"না, কাল আমার "অপেরা" দেখ্‌তে যাওয়ার কথা আছে।"

"শুক্রবার কি আস্‌তে পারবেন তা হলে।"

"(চিন্তিত ভাবে) শুক্রবার—শুক্রবার রোস, দেখ্‌ছি। বোধ হয়—সেদিন আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই।"

"তবে—সেদিন আপনাকে প্রত্যাশা ক'রতে পারি বোধ হয়?"

"আচ্ছা—তাই হবে।"

"ধন্যবাদ—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

তারপর স্বেচ্ছায় অপরাধী নির্দ্ধারিত দিবসে কারাদণ্ড গ্রহণ করিল।

কোনও এক ভদ্রলোকের নিকট একটী ছাত্র একদিন বলিতেছিল—সামান্য একটু অপরাধে তাহার ১২ ঘণ্টা কারাবাস হুকুম হইয়াছে—সে বিদ্যালয়ের পুলিশের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে শীঘ্রই একটা সুবিধামত দিন দেখিয়া কারাগারে যাইবে। এ ছাত্রটী যেদিন কারাদণ্ড গ্রহণ করে—ভদ্রলোকটী সেদিন—তাহার সঙ্গে দেখা করিতে—কারাগারে গিয়াছিলেন। তিনি কারাগারের যে বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহা এইরূপ।—

কারাগৃহটী বেশী বড় নয়—সাধারণ কারাগার অপেক্ষা সামান্য একটু বড়। জানালাটী বেশই বড় এবং লোহার জালে ঢাকা। গৃহে হাওয়া খেলে বেশ। সে গৃহে ছিল—একটী ষ্টোভ্—কাঠের দুইখানি চেয়ার—বহুদিনের পুরাতন দুইটী টেবিল এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধাম—নানারূপ মূর্ত্তি—ছবি, উক্তি (motto) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা—কাজের কথা—বাজে কথা—প্রেমের কথা—আশ্বাস—হতাশ্বাস—ইত্যাদি টেবিলের গায়ে খোদা। একটী স্বল্পপরিসর কাঠের তক্তাপোষ—তাহার উপর শতছিন্ন একটি মাদুর। বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি ছিল না—আসামী আবশ্যক বোধ করিলে এ সব নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারে।

গৃহচ্ছাদটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। বাতির শিষ দিয়া নাম, তারিখ কবিতা ইত্যাদি কত কথাই না সেখানে লিখিত হইয়াছে। দেওয়ালের গায়েও নানা চিত্র অঙ্কিত—কোনটী বা কালিতে আঁকা—কোনটি বা বাতির শিষে, কোনটি পেন্সিলে;—আবার কতকগুলি চিত্র লাল নীল ইত্যাদি নানা রঙের খড়ি মাটীতে অঙ্কিত। ছবিগুলির ফাঁকে ফাঁকে যে ২।১ ইঞ্চি স্থান খালি কারা-প্রবাসী সে স্থান নানা গদ্য পদ্য রচনায় ও নাম তারিখ ইত্যাদিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

দেওয়ালের গায় একখানা বোর্ডে—কারাগারের নিয়মাবলী টাঙ্গান।—দু' একটি নিয়ম এই। অপরাধীকে কারাগৃহে প্রবেশ করিবার সময় ২০ সেণ্ট দক্ষিণা এবং কারাত্যাগ কালীনও সেই পরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। এ ছাড়াও দৈনিক ১২ সেণ্ট করিয়া কারাগৃহের ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে। সামান্য কিছু মূল্য লইয়া কারাগার হইতে কাফি এবং প্রাতরাশ যোগান হয়—কিন্তু মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে ভোজনের ব্যয় কারাপ্রবাসীকে বহন করিতে হয়।

দেওয়ালের গায় যে সব বহুমূল্য রচনা অঙ্কিত আছে—তাহার দু'একটির নিদর্শন।

"পরের অভিযোগে আমাকে এখানে আসিতে হইল—পশ্চাৎবর্ত্তীগণ সাবধান হইবেন।"

"কারাজীবনটা কেমন তাহার স্বাদ গ্রহণ কামনায় আমি স্বেচ্ছায় শান্তিভঙ্গ করিয়া এখানে আসিয়াছি।"

সম্ভবতঃ এরূপ কৌতূহল আর তাঁহার হয় নাই।

"R, Diengandt—ভালবাসার পরিণাম — চারিদিন কারাবাস। অন্যায় শাস্তি।"

"বিচার কর্ত্তার বুঝিবার ভুল—সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য চারি সপ্তাহ।"

এ কারাগারে এত দীর্ঘকালের কয়েদী আর দেখা যায় না। অপরাধটী ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিলে বুঝিতে সুবিধা হইত।

স্থানে স্থানে ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিয়াও কত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেক স্থলে সে সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঘসিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছেন। অধ্যাপক Dr. K কে অভিবাদন না করিবার অপরাধে একব্যক্তির তিনদিনের কারাদণ্ড হয়—এই অপরাধেই অপর একজন "দুইদিন তিন রাত্রি নির্জ্জন প্রবাস" করিয়াছেন। তাই এক স্থানে চিত্রে Dr. K কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নির্জ্জন কারাগারে সময় কাটাইবার জন্য —কয়েদীরা অনেক স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের লেখা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া আমোদ উপভোগ করে। হয়ত কোন কারা-প্রবাসীর লিখিত নাম ধাম ও দণ্ড প্রাপ্তির তারিখ ঠিকই রহিয়াছে—পরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তি তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—

"চুরির অভিযোগে" "হত্যা অপরাধে" ইত্যাদি।

একস্থানে ক্ষুব্ধ চিত্তের বিপ্লব—কেবলমাত্র "প্রতিশোধ" বাক্যটীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেন যে কারাবাসী এত প্রতিহিংসা বুকে পূরিয়াছিলেন—সে কৌতূহল নিবারিত হওয়ার উপায় নাই।

এক স্থানে ব্রাণ্ডির বোতল হাতে একটী ছাত্রের ছবি অঙ্কিত আছে। নীচে লেখা—"সকল ভাবনা হইতে একমাত্র ইহাই পরিত্রাণ করিতে পারে।"

আরও কত অদ্ভূত—কত আশ্চর্য্য—কত করুণ—কত হাস্যোদ্দীপক লিপি অঙ্কিত আছে—সকল কথা বলিবার স্থান কোথায়?

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

উপনয়ন সংস্কারে ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের প্রমাণ

(উত্তর কুরুবাসের শাস্ত্র প্রমাণ)

উপনয়ন সংস্কার ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় সংস্কার। কারণ, ইহাদ্বারাই তাঁহাদের দ্বিজত্ব জন্মিয়া তাঁহারা বেদপাঠের অধিকারী হন। এই পাঠের অবস্থা বেদে 'ব্রহ্ম' * নাম অনুসারে 'ব্রহ্মচর্য্য' নামে অভিহিত এবং বেদ-পাঠার্থী ছাত্রও ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হইতেন। উপনয়ন সংস্কারটী এইরূপে শ্রেষ্ঠ বৈদিকসংস্কার বলিয়া, বৈদিক ইতিহাসের বিশেষ নিদর্শন যে ইহার মধ্যে নিহিত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই ঐতিহাসিক নিদর্শন কি?

উপনয়ন সংস্কারের কাল সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান দৃষ্ট হয় তাহাতে ভারতীয় আর্য্য-পুরাতত্ত্বের অতি মূল্যবান্ প্রমাণই পাওয়া যাইতে পারে।

উপনয়নের কালসম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, উত্তরায়ণেই উপনয়ন বিধেয়, দক্ষিণা-

* "বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্ম" ইত্যমর।

য়নে কখনও বিধেয় নহে। আর্য্যদিগের ভারতবাসের ইতিহাসে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের পূর্ব্বোক্ত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাইবার আশা করা যায় না কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর কুরুবাসের ইতিহাসে ইহার অতি সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উত্তর মেরুর সন্নিহিত বলিয়া উত্তর কুরুবাসিদিগের নিকট উত্তরায়ণের ছয়মাস দিবা ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস রাত্রি থাকিবে তাহা সকলেরই নিকট সহজবোধ্য। রাত্রিতে আমরা সাধারণতঃ দৈব ও পৈত্রকার্য্য নিষিদ্ধ দেখিতে পাই। সুতরাং দক্ষিণায়নের সময় উত্তরকুরুতে রাত্রিকাল থাকিত বলিয়া যজ্ঞাদি দৈব-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত না এবং উত্তরায়ণের সময় দিবস থাকিত বলিয়া তাহা উপনয়নের যজ্ঞাদি দৈবকার্য্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি। উত্তর কুরুতে উত্তরায়ণ ও দাক্ষণায়ন কাল সম্পর্কে যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল ভারত-বর্ষের শাস্ত্রকারগণ তাহার অনুসরণ করতঃ তাহাই ব্যবস্থারূপে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের উপরি উক্ত ঐতিহাসিকতত্ব যে শাস্ত্রকারদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না, শাস্ত্রের আলোচনা করিলে তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায়। এখানে আমরা উপনয়নের মাসফল সম্বন্ধে একটী শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি তাহা হইতেই আমাদের মন্তব্যের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইবে।

মাঘে দ্রবিণাশীলাঢ্যঃ ফাল্গুনেচ দৃঢ়ব্রতঃ।
চৈত্রে ভবতি মেধাবী বৈশাখে কোবিদোভবেৎ॥
জ্যৈষ্ঠে গহননীতিজ্ঞঃ আষাঢ়ে ক্রতুভোজনঃ।
শেষেষন্যেষু রাত্রিঃস্যাগ্নিষিদ্ধং নিশ্চিব্রতম্।"

ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত কৃত্য চিন্তামণিঃ।

মাঘ মাসে উপনয়ন হইলে ধনচরিত্র সম্পন্ন, ফাল্গুনে দৃঢ়সঙ্কল্প, চৈত্রে মেধাবিশিষ্ট, বৈশাখে শাস্ত্রবেত্তা, জ্যৈষ্ঠে গূঢ়নীতির্বিৎ, আষাঢ়ে যজ্ঞভোজী হয়। অবশিষ্টকাল রাত্রি থাকে। রাত্রিতে ব্রত (দৈবকার্য্য, নিষিদ্ধ।

এখানে উত্তরায়ণের ছয়মাস ব্যতীত (দক্ষিণায়নের) সকল মাসকেই রাত্রিরূপে উল্লেখ করায়—উত্তরায়ণের ছয়মাস যে দিবস তাহা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে, এবং উত্তর কুরুতে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যে দিবা ও রাত্রির আদিভেদ হইতেই যে ভারতেও এই দুইটী কালের দিবারাত্রি ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও বুঝা যাইতেছে।

কেবল যে উত্তরকুরুর প্রথার অনুকরণেই উপনয়নের কাল সম্বন্ধে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের বিধিনিষেধ ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—ইহার একটী বলবত্তর প্রমাণ আমরা নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন হইতে প্রাপ্ত হই!

"বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়াস্যাপি মৌঞ্জীস্যাদুত্তরায়ণে।
দক্ষিণে চ বিশাং কার্য্যং নানধ্যায়ে নসংক্রমে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত গর্গঃ।

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন উত্তরায়ণে হইবে। বৈশ্যের দক্ষিণায়নেও হইতে পারে কিন্তু অনধ্যায়ে ও সংক্রান্তিতে কখনও উপনয়ন কর্ত্তব্য নয়।"

এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই কেবল উত্তরায়ণে উপনয়ন অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু বৈশ্যের পক্ষে বিকল্পে দক্ষিণা-য়নেও উপনয়ন বিহিত হইয়াছে। ইহার

তাৎপর্য্য আমাদের নিকট এই বলিয়াই বোধ হয় যে, আর্য্যগণ উত্তরকুরু ছাড়িয়া প্রথমে যে দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন সেই স্থানটী আমাদের নিকট মধ্য-আসিয়া প্রদেশ বলিয়াই অনুমিত হয়। মধ্য আসিয়াতে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের সময় ছয়মাসব্যাপী নিরন্তর দিবারাত্রি বর্ত্তমান থাকেনা কিন্তু তদ্বিপরীতে প্রতিদিনই দিবারাত্রি হইয়া থাকে। সুতরাং এইস্থানে উত্তরকুরুর ন্যায় দক্ষিণায়ন কালে দৈবকার্য্যের কোন বাধা হওয়ার কারণ ছিলনা। বৈশ্যদিগের উপবীত গ্রহণের স্থান আমরা মধ্য আসিয়াতে কেন নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহার অপর একটী প্রমাণ আমরা তাঁহাদের উপবীতের উপাদান ও উপনয়ন পরিধেয়ের উপাদানে প্রাপ্ত হই। মনুসংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ব্রহ্মচারীর উপবীত ও পরিধেয়ের উপাদান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

"কার্ষ্ণ´রৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্বেন শাণ ক্ষৌমাবিকানিচ ॥ ৪১
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমাশ্লক্ষা কার্য্যাবিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্যতু মৌর্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী ॥ ৪২
২য় অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয় ও শণবস্ত্রের অধোবসন পরিধান করিবে; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী রুরু নামক মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌমবসন এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী ছাগ চর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষলোমের অধোবসন পরিধান করিবে।"৪১

"ব্রাহ্মণদিগের সমান গুণত্রয়ে নির্ম্মিত, সুখস্পৃশ্য মুঞ্জময়ী মেখলা করিতে হয়, ক্ষত্রিয়-দিগের মূর্ব্বাময়ী ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত এবং বৈশ্যের শণতন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা করিতে হয়।"৪২

এখানে বৈশ্যদিগের ছাগ চর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষলোমের অধোবসনের উল্লেখ দ্বারা ইহারা যে পশুপাল জাতি ছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মধ্য আসিয়াতেই আমরা পশুপাল যাযাবর (nomadio) জাতির বাসের বিবরণ জানিতে পারি। মধ্য আসিয়ার সুবিশাল তৃণক্ষেত্র পশুচারণের উপযোগী বলিয়া তাহা পশুপাল জাতির পক্ষে বিশেষ অনুকূলই হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের একটী স্তোত্রে আর্য্যগণ তাঁহা-দিগকে তৃণময় দেশে লইয়া যাইবার জন্য পূষার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"অভি সুযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥"৮
৪২ সূক্ত ১ম মণ্ডল।

"শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়, হে পূষা! তুমি (পথে) আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।"

এস্থলে রমেশবাবু টীকায় লিখিয়াছেন:— "এই সূক্তের কোন কোন ঋক্, বিশেষ ৮ ঋক্ হইতে প্রতীয়মান, হয় যে সে সময়ের হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে কোন কোন অংশ মেষ-পালক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সুন্দর তৃণ অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিত। পূষা বিশেষরূপে তাহাদিগেরই রক্ষক, অতএব তিনি ভ্রমণে পথপ্রদর্শক। সেকালে ভ্রমণে কিরূপ বিপদ্ আপদ্ ছিল তাহাও এই সূক্ত হইতে জানা যায়।" "ঋগ্বেদানুবাদ ১০৪ পৃঃ।

ছাগ ও মেষই পশুপাল জাতির প্রধান পালিত পশু। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে আর্য্যদিগের একশাখা মেষপালক (shepherd) ছিল এবং তাহারা আফ্‌গানিস্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখানে আমরা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটী মন্তব্য প্রদান করিতেছি :"—and on the other, the expulsion of the bulk of the shepherd tribe from Afganistan with their pantheon headed by Indra and the cultus which required animal sacrifies and of fermented liquers. These later are the ancesters of the Brahmanic Aryans. In India they found a congenial peaceful home." Rajendra Lal Mitra's Indo-Aryans. article XX Primitive Aryans.

"পক্ষান্তরে আফ্‌গানিস্থান হইতে বিতাড়িত অধিকাংশ মেষপালক জাতি তাঁহাদের ইন্দ্র প্রধান দেবগণ এবং পশুবলি ও মাদকদ্রব্যের আহুতিবিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান সহ এদেশে আগমন করেন। ইহারাই ব্রাহ্মণ আর্য্যদিগের আদিপুরুষ। ভারতবর্ষে তাঁহারা সুখকর শান্তিপূর্ণ বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

বৈদিক গান্ধার বা বর্ত্তমান কান্দাহার যে রোমপ্রচুর মেষের জন্য বিখ্যাত ছিল ঋগ্বেদের সূক্ত হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

"সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা ॥"৭

১২৬ সূক্ত ১ম মণ্ডল।

"আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা।"

রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ৫৫ পৃঃ।

মধ্য আসিয়ার তৃণক্ষেত্রে বৈশ্যদিগের আদিবাস ছিল বলিয়াই তৃণজাতীয় শণের সূত্রদ্বারা তাহাদের যজ্ঞোপবীত নির্ম্মিত হইত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সম্বন্ধে মনুসংহিতার বিবরণ হইতে কোন ঐতিহাসিক সত্য লাভ করা যায় কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীব যে মৃগচর্ম্ম উত্তরীয়রূপে ব্যবহৃত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইতে আমরা তাঁহাদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ প্রাপ্ত হই বলিয়াই মনে করিতে পারি। বর্ত্তমানে যেমন আমরা উত্তর মেরুতে মৃগজাতি বিশেষের (Reindeer) বাসের কথা জানিতে পারি অতি পুরাকালেও যে তথায় তদ্রূপ মৃগজাতির বাস ছিল তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপরই বোধ হয়। বর্ত্তমান উত্তরমেরুবাসিগণ যেমন পশুচর্ম্ম বস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন—উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণও তদ্রূপ মৃগচর্ম্ম পরিতেন এবং উত্তরমেরুবাসিদিগেরই ন্যায় তাঁহারা মৃগ মাংসও ভোজন করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই মৃসমাংস আমাদের শাস্ত্রে এরূপ পবিত্র ও প্রশস্ত মাংস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভূগোলে আমরা মধ্য-আসিয়ার যে সমস্ত পশুজাতির উল্লেখ পাই—তাহাদের মধ্যেও হরিণ, ছাগ ও মেষের স্পষ্ট উল্লেখই দেখা যায়।

"on the plateau of the interior

ruminating animals, such as camel, ox, deer, goat, sheep &c. are chiefly found, yak is used as a beast of burden". Longmans "The World with further treatment of India." P, 62.

"মধ্য-আসিয়ার সমতলক্ষেত্রে প্রধানতঃ উষ্ট্র, বৃষ, মৃগ, মেষ প্রভৃতি জাতীয় রোমন্থক জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। চমরী গাই ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হয়॥"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর যজ্ঞোপবীতের উপাদানে যে মুঞ্জা ও মুর্ব্বা তৃণের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা আমরা উত্তরকুরুজাত উদ্ভিদবিশেষ বলিয়াই মনে করি। আধুনিক ভূগোলেও আমরা উত্তরমেরুতে (Artic zone) ক্ষুদ্র গুল্ম ও অপুষ্প উদ্ভিদের (dwarf shrubs, liehens) উল্লেখ দেখিতে পাই। †

উপনয়নের স্থায় চূড়াকরণ গোদান ও বিবাহও বৈদিক সংস্কার। সুতরাং উপনয়নের সম্বন্ধেও আমরা যেরূপ উত্তরায়ণের বিধি প্রাপ্ত হই পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সংস্কারসমূহের সম্বন্ধেও আমরা তদ্রূপ বিধি পাওয়ার আশা করিতে পারি। শাস্ত্রে এই সমস্ত সংস্কারের কাল সম্বন্ধে অতি সুস্পষ্টরূপেই উত্তরায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে। "উদগায়নে আপূর্য্যমাণে-পক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চূড়োপনয়ন গোদান বিবাহাঃ॥"

আপূর্য্যমাণে পক্ষে শুক্লপক্ষে। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত আশ্বলায়ন। "উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে শুভনক্ষত্রে চূড়া, উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ কর্ত্তব্য॥"

এই প্রকার বৈদিক সংস্কারের সহিত উত্তরায়ণের যোগ ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসেরই যে ইতিহাস আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।—শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, বণিক প্রেসে মুদ্রিত। ষষ্ঠ সংস্করণ। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই গ্রন্থে বঙ্গীয় রমণীগণের গৃহধর্ম্ম-শিক্ষোপযোগী দশটি উপদেশ বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। মহিলাগণ যাহাতে গৃহধর্ম্মের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়া সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে, পতি, পরিবারবর্গ, অতিথি-অভ্যাগত প্রভৃতিদিগের প্রতি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য,—মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়, রন্ধন ও পরিবেষণ, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য, সন্তানপালন ও স্বাস্থ্যবিধান, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র-গঠন—এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি-সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইলাম, আলোচনার পদ্ধতিটিও বেশ সুশৃঙ্খল। লেখকের ভাষাও সহজ, সাধু হইয়াছে। অল্প-শিক্ষিতা রমণীগণের পক্ষে কোথাও জটিল বা

† The World with fuller treatment of India."
Longmans, Green and Co. p. 5.

দুর্ব্বোধ্য নহে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব।" সে বিষয়ে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের মতদ্বৈধ না থাকিলেও স্ত্রী-শিক্ষার যে আশানুরূপ প্রচলন এখনও হয় নাই, ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে। 'কন্যা ও পুত্রকে একই ভাবে শিক্ষা দিবে' ইহাই শাস্ত্র-বচন। শিক্ষা মনের সঙ্কীর্ণতা নাশ করে এবং এই শিক্ষার সেরূপ সুব্যবস্থা নাই বলিয়াই বহু গৃহ অশান্তি-কলহে উৎসন্ন যাইতেছে, সন্তানেরও সুশিক্ষা ঘটিয়া উঠিতেছে না। কারণ নারীই গৃহের সম্রাজ্ঞী—নারীর প্রভাব অল্প নহে। সুমাতা না হইলে সুপুত্রের আশা সুদূর-পরাহত! সেই মাতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে কন্যার সুশিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই শিক্ষা আবার সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া আবশ্যক। এ গ্রন্থে সেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষারই আলোচনা করা হইয়াছে। গৃহধর্ম্মের আলোচনা-বিষয়ে এমন সুন্দর আর-একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। গ্রন্থখানি প্রত্যেক বাঙ্গালী-গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য।

বানান-সমস্যা।—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ প্রণীত। কলিকাতা কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। বঙ্গবাসী কলেজ-স্কুল বুক্‌ষ্টল হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা। গ্রন্থকার পুস্তিকার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন, "আজকাল বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা একটা বিষম কাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আইনের ভয় ত আছেই, তাহার উপর আবার ঘরের বিভীষণদের তাড়া, গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ।" তাই তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বানান-সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। বহু প্রচলিত অশুদ্ধ-বানান-পদের তালিকা দিয়া ভুলটা কোথা দিয়া প্রবেশ করিল, তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিতে ছাড়েন নাই। তবে তিনি সমস্যার সমাধান করেন নাই। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত, আপনার স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় কৌতুক-রসে স্নিগ্ধ করিয়া, 'সকল দিক বাঁচাইয়া, সকল পক্ষকে খুসি রাখিয়া' বাণান-সমস্যার কথা-মাত্র তুলিয়া-ছেন, এবং 'বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ ও পরামর্শ' চাহিয়া-ছেন। এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভুল বাণানের সমর্থন কিছুতেই করা যায় না। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা ইহার এক খণ্ড করিয়া কাছে রাখিলে যে বহু উদ্ভট ও হাস্যকর বাণান-ভুলের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

অনুপ্রাস।—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ প্রণীত। কলিকাতা, ভট্টা-চার্য্য এণ্ড সন্সের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। বাঙ্গালায় ধর্ম্ম-কর্ম্মে, সাহিত্যে, নর-নারীর নাম-নির্ব্বাচনে প্রবাদ-বাক্য-প্রবচনে অনুপ্রাসের ঘোর ঘটা প্রদর্শন-কল্পে গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অনুপ্রাসের তরফে ওকালতি করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। ভাষাতত্ত্বের একটি কৌতুকাবহ রহস্য প্রদর্শন করাই" তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, "পরিমিত প্রয়োগে অনুপ্রাস রচনার সৌন্দর্য্য সাধন করে, ভূরি পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে কর্ণ পীড়া উৎপাদন করে। জোর-জবরদস্তি করিয়া, কষ্ট-কল্পনা করিয়া অনুপ্রাসের অজস্র সৃষ্টি করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে!" গ্রন্থকারের আশঙ্কা-সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি আমরা একটানে পড়িয়া শেষ করিয়াছি, অথচ কোথায়ও এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তি ধরে নাই। লেখকের সরস ভাষায়, সরল বর্ণনা-ভঙ্গিমায় ও সংগ্রহের বিপুলতায় অজস্র হাস্যধারা মণিমুক্তার মতই ঝরিয়া পড়িয়াছে। সানন্দে ও সাগ্রহে আমরা তাহা দুই হাতে করিয়া কুড়াইয়াছি। গ্রন্থখানি যেন বঙ্গ সাহিত্যের এক অজানা লোকের চাবি খুলিয়া দিয়াছে। একাধারে তথ্য ও হাসির ভাণ্ডার মুক্ত করিয়াছে। এ গ্রন্থ ভাষার সম্পদ-স্বরূপ। ছাপা কাগজ সুন্দর। গ্রন্থের মুখপত্রে ত্রিবর্ণে রঞ্জিত হর-পার্ব্বতীর একখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

উপমন্যু।—শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত। মূল্য দুই আনা। মহাভারতোক্ত উপমন্যুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানি ক্ষুদ্র একটি নাটিকা। বালক-বালিকাগণের অভিনয়োপযোগী করিয়াই রচিত। রচনায় মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় পাই; কিন্তু ভাষা সর্ব্বত্র একই ধারায় বহিয়া চলে নাই,—কোথাও বেশ

মুক্ত, সরল, আবার পরক্ষণেই গম্ভীর, জটিল। তবে তাহার মধ্য দিয়া তপোবনের প্রাচীন চিত্রের যেটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহা স্নিগ্ধ ও মনোরম। বহিখানির ছাপা-কাগজ আরও উচুঁ দরের হওয়া উচিত ছিল।

আধুনিক সভ্যতা।—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বাহিরের আদব-কায়দা, বেশভূষা প্রভৃতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতির সহিত আলাপ-পরিচয়ে কিরূপ 'আদব-কায়দা' মানিতে হইবে, নিজেদের মধ্যে বা মুসলমান-ইংরাজকে চিঠি-পত্র লিখিতে কিরূপ পাঠ লেখা শোভন ও আবশ্যক, তাহারও আলোচনা গ্রন্থকার বাদ দেন নাই। ফলতঃ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল; গ্রন্থকার তাহা দূর করায় আমাদিগের একান্ত কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

রাঢ়ীয় কুলদ্রুমঃ।—প্রথম খণ্ডঃ। মুখ-বংশঃ। ঢাকা, বিক্রমপুর, পুরাপাড়া নিবাসিনা শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘটক বিদ্যানিধিনা সংগৃহীতঃ প্রকাশিতশ্চ। মূল্য দুই টাকা। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের ভূমিকায় সংগ্রহকার বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, "বিধাতার সৃষ্ট জগতে যাহারা যে জাতি বলিয়া সমাজে পরিচিত হইয়া থাকেন; তাহাদের সেই জাতির আদিম বিবরণ ও পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক বংশ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। * * পূর্ব্বকালে পরিবারস্থ প্রাচীন কর্ত্তারা তাঁহাদের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতিকে বাল্যকালে নাম-শ্লোক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন পিতা হইতে ঊর্দ্ধতম পঞ্চম পুরুষের ও মাতামহ-কুলেন চারি পুরুষের নাম, গোত্র গাঁই এবং বংশ-কুল শিক্ষা করাইতেন।" কিন্তু এক্ষণে এ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; তাহার ফলে আমরা বিলাতের টিউডর বংশ, ষ্টুয়ার্ট বংশের ধারাবাহিক তালিকা অনায়াসে তৈয়ার করিতে পারিলেও নিজেদের পিতামহ বা মাতা-মহের ঊর্দ্ধতম পুরুষগণের নাম জানি না—ইহা যে আমাদের পক্ষে বিষম লজ্জার কথা, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। পূর্ব্বে ঘটকগণের নিকট বংশ-তালিকা থাকিত; বিবাহাদি সময়ে উভয় পক্ষের বংশাবলীর আবৃত্তির প্রথাও প্রচলিত ছিল, এবং এই সকল কারণে উচ্চ নীচ বর্ণ সমূহের পূর্ব্বপুরুষগণের তালিকাও ঠিক থাকিত। এখন ঘটকগণের মধ্যেও বংশ-তালিকা-রক্ষণের বিধি নাই, সেরূপ ঘটকও বিরল—অন্নদায়ে উদ্‌ভ্রান্ত কয়েকটি বেচারা জীবই অধিকাংশ স্থলে বিবাহের ঘটকালি করিয়া বেড়ায়। আমাদেরও এদিকে লক্ষ্য নাই, কাজেই পূর্ব্বপুরুষগণের নামের তালিকা সংগ্রহ বা সংরক্ষণে আমরা একান্তই উদাসীন। ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় বিস্তর শ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া প্রাচীন ঘটকগণের সংগৃহীত 'কুলপঞ্জিকা' "কুল-কল্পলতিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ, রাজা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক সমীকরণ বা সূত্রাদি ও আরও বিস্তর প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে বঙ্গীয় কুলবংশ প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান খণ্ডে ভরদ্বাজ গোত্রজ মুখোপাধ্যায় দিগের কুলীনামা সংগৃহীত হইয়াছে। মুখোপাধ্যায়-বংশীয়গণ, ঊর্দ্ধতন চারি-পাঁচ পুরুষের নাম জানা থাকিলে,—এই গ্রন্থ অব-লম্বনে অনায়াসে শ্রীহর্ষ হইতে আপনাদিনের কুল-ধারা-নির্ণয়ে সক্ষম হইবেন। এ কার্য্য বহু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য তথাপি বিদ্যানিধি মহাশয় যে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই, সেজন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইলে তিনি অপরাপর বংশাবলীও প্রকাশিত করিবেন। আশা করি, বাঙ্গালী সে উৎসাহ ও সহানুভূতি-প্রদানে কার্পণ্য করিবেন না। ইহার অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে শুধু যে ব্রাহ্মণ বংশের বংশ-তালিকাই সম্পূর্ণ হইবে তাহা নহে, বাঙ্গালার ইতিহাসও সমধিক সমৃদ্ধি লাভ করিবে, সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় নাই। গ্রন্থখানি বেশ সুশৃঙ্খল ধারায় সজ্জিত। ছাপা বেশ ঝরঝরে ও বড় অক্ষরে হওয়ার দরুণ কোন নাম দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। কাগজও ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

ত্রিস্রোতা—কবিতা-রেণু রচয়িত্রী; দিনাজপুর, গণেশতলা হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

এখানি গ্রন্থকর্ত্তীর দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বইখানির ভূমিকা লিখিয়া না দিলে লেখিকাকে হয়ত কোন কঠিন সমলোচকের তীব্র আঘাত সহ্য করিতে হইত, কেন না আধুনিক সমালোচকেরা নাকি "কষ্টিপাথরের" উপর সাহিত্যকে পরীক্ষা করিয়া লন। কোকিলেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন "নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদে বঞ্চিত হইয়া এই পবিত্রা বিধবা রমণী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া স্বর্গগত ইহার হৃদয় দেবতার সতত অনুধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।" বাংলা-দেশের একজন বিধবা নারীর করুণরাগরচিত এই কবিতাগুলি স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক কোন শিক্ষিত বঙ্গীয় পাঠক অনাদর করিবেন না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার একবিংশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী—বৌদ্ধধর্ম্মালোচনা প্রচার এই সভার উদ্দেশ্য। পালিগ্রন্থের মূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য এই সভা উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। "পরের মুখের ঝাল খাওয়ার মতন" এতদিন পালিভাষাবিদ্ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। এই সভার বিবরণীতে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রভৃতি পালিভাষাবিদের নাম দেখিলাম। আশা করি সভা ইহাদের সাহায্যে পালিগ্রন্থের মূলবঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীনঃ—

স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রথম ভাগ—এই সঙ্গীতপুস্তকখানি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত,এবং ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক ৮।২ নং ডালহাউসি স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সঙ্গীতের উন্নতিসাধনার্থে আজীবন যে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, এই গ্রন্থ খানি তাহারই অন্যতম পরিচয়। ইহার এই নূতন সংস্করণ দেখিয়া আমারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৮টি গানের স্বরলিপি আছে, সুতরাং সাধারণের নিকট ইহার আদর অবশ্যম্ভাবী। পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত আকার মাত্রিক স্বরলিপির বিশদ ব্যাখ্যা প্রথমেই দেওয়াতে শিক্ষার্থীর পক্ষে গানগুলি আয়ত্ত করা সহজ। এতদ্ভিন্ন তাল লয় প্রভৃতি দুরূহ অথচ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যেরূপ পরিস্কারভাবে বুঝানো হইয়াছে, তাহাতে পাঠক-মাত্রেরই সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ নিশ্চয়ই হইবে। তালের বোলের সঙ্গে সঙ্গে যে সাঙ্কেতিক ছড়া বসানো হইয়াছে, তাহা ছেলেবুড়ো সকলেরই পক্ষে অতীব কৌতুকাবহ এবং সেই জন্যই স্মরণযোগ্য। আজকালকার দিনে যখন পুরাতন ওস্তাদ-সাক্রেদ সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়াছে, এবং গ্রামোফোণ ঘরে ঘরে গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে তখন বিশুদ্ধ হিন্দুসঙ্গীতের এইপ্রকার সরল সংক্ষেপ ব্যাখ্যা বালকদের শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। হারমোনিয়মে গানের সঙ্গত শিখানো বইখানির মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, স্বরলিপি দৃষ্টে গানগুলি এস্রাজ বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রেও বাজাইতে পারা যায় এবং বাজাইলেই ভাল হয়। এই যন্ত্রগুলির সুবিধা এই যে সহজেই সব জায়গায় বহা যায়, এবং গায়কের কণ্ঠস্বর ছাপাইয়া তাহারা নিজের প্রভুত্ব জ্ঞাপন করেনা। সঙ্গীত সম্মিলনীতে, সঙ্গীত বিদ্যালয়ে, ও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এবং ডোয়ার্কিন কোং সেই প্রচারের এরূপ সুলভ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভূমিকায় সামান্য দুই একটা ছাপার ভুল লক্ষ্য করিয়াছি, এবং শুদ্ধিপত্রও কিছু বেশি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। মন্ত্রের ন্যায় স্বরলিপিতেও একটি অক্ষর বা চিহ্নের ভুলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; পাঠ্য পুস্তকের মত ইহাতে সাত খুন মাফ করা যাইতে পারে না, সুতরাং আশা করি আগামী সংস্করণ যাহাতে নির্ভুল হয় প্রকাশকগণ সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

শ্রী...........দেবী।

গিলগিটের গল্প

ইয়াসীনের শাসন কর্ত্তা 'বাদসার' সময়ে পুনিয়াল জেলায় গুলাপুরে থাসু নামক একজন শক্তিশালী ধনবান ব্যক্তি বাস করিত। থাসু সোনার লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিয়াছিল,—ধনসম্পত্তি ও রত্নাদি নিকটবর্ত্তী নালার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিত। স্থানীয় লোকেরা বলে যে আজও পর্য্যন্ত তাহার বহুমূল্য রত্নাদি সেই সকল 'নালাতে' লুক্কায়িত রহিয়াছে কিন্তু কেহই নির্দ্দিষ্ট স্থানের বিষয় বলিতে পারে না! ইয়াসীনের 'বাদসা' এক সময়ে তাহাকে খেলাত প্রেরণ করেন। দূত যখন খেলাত লইয়া গুলাপুরে পৌঁছিল,—থাসু তখন ইয়াসীনের পথের ধারে ভূমি-কর্ষণে মত্ত ছিল, বাদসার প্রেরিত দূত থাসুকে কখনও দেখে নাই—তাহার বাড়ীও চিনিত না—পথের ধারে থাসুকে দেখিয়া—'থাসুর বাড়ী কোথায়' জিজ্ঞাসা করিল। থাসু একটী ঘুরপথ দেখাইয়া আপন গৃহের সন্ধান বলিয়া দিল এবং স্বয়ং সোজা পথে দূতের আসিবার বহু পূর্ব্বেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কৃষকের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া থাসু ভাল পোষাক পরিল। দূত আসিয়া আর তাহাকে চিনিতে পারিল না। দূত থাসুকে 'খেলাত প্রদান করিলে পর, থাসু আপন দুর্গের (১) দিকে মুখ ফিরাইয়া তিন বার সেলাম করিল। সেই সেলামের অর্থ এই যে,—আমার বাহুবল ও দুর্গ বাদসার মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে বলিয়াই তিনি আমাকে খেলাত পাঠাইয়াছেন।

দূতগণ দেশে ফিরিয়া বাদসার নিকট সকল বিবরণ ব্যক্ত করিলে বাদসা অতি-মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বহু সৈন্যসহ থাসুর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। থাসু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'খুসাহাল বেগকে' শত্রুসৈন্যের গতি-রোধ করিতে পাঠাইল, কিন্তু শত্রুপক্ষ তখন গুলাপুরে আসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খুসাহালবেগ শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া বাদসার সম্মুখে উপস্থিত হইলে পর বাদসা উপর্য্যুপরি তাহাকে তিন বার তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন, কিন্তু খুসাহালবেগ তিন বারই কৌশলের সহিত বাদসার আঘাত ব্যর্থ করিয়া বলিল—"এক্ষণে আমার পালা—আমি আপনাকে আক্রমণ করিব।" বাদসা বলিলেন—"আচ্ছা, আমার একটা কথার উত্তর দাও। আমাদের মধ্যে কাহার লেজ গুটান উচিত?"

খুসাহাল বেগ বলিল—

"আপনি হইলেন বাজপক্ষীর রাজা, আর আমি হইলাম কক্কুটের রাজা আমি কি আর আপনার নিকট দাঁড়াইতে পারি!"

বাদসা তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইয়াসীনে ফিরিয়া গেলেন। থাসু খুসাহাল-বেগের পরাজয় স্বীকারে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইল এবং এরূপ সুযোগ পাইয়াও বাদসার মাথা আনে নাই বলিয়া তাহাকে ইস্কে-মানের 'চাখুনথান' নামক দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল।

এদিকে এই সংবাদ যথাসময়ে বাদসার নিকট পৌঁছিল। তিনি পুনরায় থাসুর

(১) এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও গুলাপুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং 'গাকুর' নামক স্থানে 'থাসুর পুত্র 'হাকিম বেগকে' ধৃত করিলেন। বাদসা হাকিম বেগের সহিত অতি ভদ্র ব্যবহার করিয়া তাহাকে বহুমূল্য উপহারাদি প্রদান করিলেন এবং নানা প্রকার উৎসবের আয়োজন করিয়া নিজের মহত্ব প্রদর্শন করিলেন। বাদসা, হাকিম বেগকে প্রচুর সৈন্যসহ তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া হীনতা স্বীকার করিতে বলিলেন। হাকিম বেগ পিতাকে বাদসার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলে পর থাসু পুত্রের প্রতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু বাদসা প্রেরিত সৈন্যবলের নিকট থাসুর উন্নত মস্তক অবনত হইয়া গেল। থাসু বশ্যতা স্বীকার কবিল এবং গ্রামের দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সকল সর্ব্বসমক্ষে বাদসাকে সেলাম করিল। বাদশা তখন থাসুকে নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিলেন—বাদসার আজ্ঞানুসারে থাসু নৃত্য আরম্ভ করিল। কিন্তু নৃত্য সময়ে বাদসাকে সেলাম করিবার পরিবর্ত্তে থাসু আপন দুর্গের দিকে যাইয়া সেলাম করিল, তাহাতে বাদসা ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে থাসুকে তাহার দ্বাদশ পুত্রসহ হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। বাদসার আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত ইহার পর থাসু ও তাহার দ্বাদশ পুত্রের মৃতদেহ সেইস্থানে প্রোথিত করা হইল।

এই কবরকে "থাসু আই—বোমবাট" (Thashu—I—Bomb—bat) বলে। কবরটী চতুষ্কোণ, উচ্চতায় ৯ ফুট, এবং পরিধিতে ৫ গজ হইবে। দেখিতে একটী ছোট ঘরের মত। ইহারই মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত করা হইয়াছিল। একটী ডুমুর গাছ ছাদের উপর জন্মিয়াছিল এবং তাহাতেই ছাতটী পড়িয়া গিয়াছে। থাসুর মৃত্যুর পর থাসুর ভ্রাতা খুসহাল বেগকে বাদসা গুলাপুরে উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

চেমোগা গ্রাম ধ্বংসের গল্প।

স্কারদুর প্রধানের—সের সা, আলি সা, সামুরাদ, সা-সুলতান নামক চারি পুত্র ছিল। চিত্রলাভিমুখে যাত্রা করিলে পর তাহারা পথিমধ্যে গিলগিট হইতে ১৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত চেমোগা নামক গ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাহারা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে এবং কর্ণ-বধির অসংখ্য ঢাকের শব্দে গ্রামবাসীদিগকে বিব্রত করিয়া তোলেন। গ্রামবাসীগণ একে একে রাজপুত্রগণকে সম্মান দেখাইতে আসিল কিন্তু চেমোগার একজন ধনবান ব্যক্তি আসিল না। রাজপুত্রগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য অনুচরগণকে আদেশ করিলেন এবং সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পর সে কেন সম্মান প্রদর্শনে এত বিলম্ব করিয়াছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধনী ব্যক্তিটী বলিলেন—হুজুর আমি আমার পশুশালায় দুগ্ধদোহনে ব্যস্ত ছিলাম। পশুদের চীৎকারে আমি আপনাদের ঢাকের শব্দ শুনিতে পাই নাই এবং আপনারা যে গ্রামে আসিয়াছেন, তাহাও জানিতে পারি নাই—তজ্জন্যই আমার বিলম্ব হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণ ক্রুদ্ধ হইলেন

এবং একজন কর্ম্মচারীকে এই ঘটনা সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য সেই ব্যক্তির পশুশালায় প্রেরণ করিয়া;—ঢাকীদিগকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে বাস্তবিকই তাহার পশুশালায় পশুদিগের বিকট চীৎকারে ঢাকের শব্দ শোনা যায় না। রাজপুত্রগণ তখন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন যে চেমোগা গ্রামের সমস্ত ভূমি পতিত অবস্থায় থাকিবে—আর কেহই যেন চাষ আবাদ না করে। কারণ ধনী হইলেই ইহারা আমাদের প্রতি সম্মান দেখাইতে বিলম্ব করিবে—হয়ত কালে আমাদের সম্মুখে মাথা অবনত করিতেই চাহিবে না। সুতরাং দ্বাদশ থলি পারা (quick silver) চেমোগা নদীর মুখে ঢালিয়া দেওয়া হউক। এরূপ করিলে কৃষিকার্য্যের জন্য আর তাহারা জল পাইবে না।

রাজপুত্রগণের আদেশ মত কার্য্য করা হইল। চেমোগা গ্রাম অনাবাদে পতিত অবস্থায় রহিয়া গেল।

রাজপুত্রেরা তাহাদিগের সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একদল আসতর পথে অপর দল "হারমোসের" পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গিলগিটের উত্তর পশ্চিমাংশে সাত মাইল দূরে অবস্থিত "হিনজিল্" নামক স্থানে উভয় দল মিলিত হইলে পর রাজপুত্রগণ সমস্ত সৈন্য গণনা করিতে মানস করিলেন। কিন্তু এত অধিক সৈন্য একদিনে গণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা আদেশ করিলেন যে "প্রত্যেক সৈন্য এক একটি ঢিল একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যাউক।"

তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালিত হইল। দেখিতে দেখিতে স্থানটী একটী ইষ্টক স্তূপে পরিণত হইল।

হিন্‌জিলে যে কয়েকটী স্তূপ দেখা যায় তাহা নাকি সেই সৈন্য সংখ্যা নির্ব্বাচনের স্তূপ। বস্তুত এই স্তূপ গুলি খুব সম্ভবত "বৌদ্ধ স্তূপের" ধ্বংসাবশেষ। রাজপুত্রগণ চিত্রল পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে একটী চিনার বৃক্ষের নিম্নে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরও রাখিয়াছিলেন। প্রবাদ এই তাঁহাদের আহার্য্য নাকি ৪০০ শত মাইল দূর স্কারদুর হইতে প্রস্তুত হইয়া গরম গরমই তাঁহাদের নিকট পৌঁছিত! ডাকের বন্দোবস্তও তাহা হইলে খুব ভাল ছিল বলিতে হইবে!

নিম্ন লিখিত গানটী গিলগিটবাসীগণের মুখে এখনও শোনা যায়—

ওভাই! সের, আলি, মোরাদ তারা
পুল বেঁধেছে জলের তলে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলে তারা
পুল বেঁধেছে নদীর জলে।
ওভাই! ঝক্‌মকান তাম্বু তাদের
জ্বল্‌ছেরে ঐ জলের তলে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলের তাম্বু
পুকুর পারে ঘাসের দলে।
ওভাই! বচ্ছে নদী হাতুর (২)নীচে
হোসীর [৩]কল ঐ জলে ঘোরে,
ওরে! মেক্‌পুনের ঐ ছেলে তারা
করলে এমন মাথার জোরে।

(২) Hatu—mountain,
(৩) Hoshi—a place near Ramghat,

ওভাই! চেমোগরের নদী জমীর
ফসল তারা এম্নি করে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলে তারা
কর্‌ল নষ্ট জীবন ভরে।
ওভাই! চিলি গাছের নীচে তারা
রাক্ষসেরে নাচিয়ে ছিল,
ওভাই! চিলি গাছের নীচে তারা
ঢাকের বাজনা বাজিয়ে ছিল।
ওরে! মেক্‌পুনের তিনটী ছেলে
ঢাক বাজিয়ে গাছের নীচে,
ওভাই! জয় করেছে নদী পাহাড়
স্ত্রীজাতিরা তাই কেঁদেছে।
ওভাই! সের, আলি, মোরাদ তারা
চিত্রলে পাথর পুতেছে,
ওরে! মেক্‌পুনের ছেলে তারা
সে চিহ্ন...যে জয় করেছে।
ওভাই! চিত্রলের অধিপতি
সাবাকতুরের [৪]মান গিয়েছে,
ওরে! তিন ভাইতে জয় করিয়ে
ছাগল যত বিলায়েছে।
ওভাই। সের, আলি, মোরাদ তারা
ইয়াসীনে খেললে পোলো,
ওরে! গিলগিটের লোহার কবাট
তারাই খুলে ভেঙ্গে গেলো!

নদী বক্ষে রাজপুত্র

বহুকাল পূর্ব্বে ত্রা—ত্রাখান (Tra—Trakhan) নামে গিলগিটে একজন প্রধান ছিলেন। তিনি দারেল নিবাসী একজন ধনাঢ্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। 'রা' পাশা খেলিতে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং প্রতি সপ্তাহেই তাহার শ্যালকদের সহিত খেলিবার জন্য দারেলে যাইতেন। একদিন তাঁহারা জীবন পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। নিয়ম হইল যে—যে দল হারিবে তাহাদের মাথা অপর দল কাটিয়া লইবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা চলিতে লাগিল। পরিশেষে রা অতি কৌশলের সহিত প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া পণানুসারে তাঁহার শ্যালকদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্ত্রী—"সোণী" ভাইদের মৃত্যু সংবাদে শোকে অভিভূত হইয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য একদিন তাহার স্বামীর খাদ্য দ্রব্যে বিষ মিশাইয়া দিলেন। বিষাক্ত দ্রব্যে স্বামীর মৃত্যু হইলে পর রাণী রাজ্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। স্বামীর মৃত্যুর একমাস পরে রাণীর একটি পুত্র সন্তান জন্মিল এবং তাহার নাম হইল "ত্রাখান"। কিন্তু রাণীর মনে তখনও ভ্রাতৃহত্যার প্রবল প্রতিহিংসা জাগিতেছিল তিনি ভ্রাতৃহন্তাকারীর সন্তানের মুখ দর্শন করিতেও ইচ্ছুক হইলেন না এবং একটী ছোট কাঠের বাক্সে শিশুটিকে আবদ্ধ করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। বাক্সটী ভাসিতে ভাসিতে চিলাস জেলার 'হোদার' নামক স্থানে পৌঁছিল। হোদারের একটী সংসারে দুইটী ভাই বাস করিত, তাহারা বড়ই দরিদ্র ছিল। একদিন কাঠ কাটিতে কাটিতে দেখিতে পাইল যে একটী কাঠের বাক্স নদীতে ভাসিয়া যাইতেছে, ক্রমে বাক্সটী কিনারায় আসিয়া ঠেকিলে পর দুই ভাই মনে করিল হয়ত ইহার মধ্যে টাকা কড়ি আছে। ইহা মনে করিয়া একজন নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাক্সটীকে তীরে তুলিয়া আনিল, কেহ দেখিতে পাইবে ভয়ে

(৪) Shabkatur—a ruler of Chitral.

তাহারা সেখানে আর বাক্সটী খুলিল না—কাঠের বোঝার মধ্যে লুকাইয়া বাক্সটী বাড়ী লইয়া আসিল, বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সহিত বাক্সটী খুলিয়া দেখিল বাক্সের মধ্যে একটী সুন্দর জীবিত শিশু! দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী শিশুটিকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল কিন্তু শিশুটীকে পাওয়ার পর হইতে যেন তাহাদের অবস্থা ফিরিয়া গেল। দিনে দিনে তাহাদের অভাব দূর হইতে লাগিল; সকলেই মনে করিল শিশুটী দেবতা, তাহারই আগমনে তাহাদের সৌভাগ্য ফিরিল।

শিশুটীর বয়স যখন ৬ বৎসর তখন একদিন কাঠুরিয়ার স্ত্রী তাহার প্রাপ্তিবিবরণ তাহাকে খুলিয়া বলিল।

শিশুটী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে পর একদিন সে গিলগিটে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। গিলগিটের সুখসম্পদ ও ভূমির উর্ব্বরতা প্রভৃতির বিষয় সে পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়া আসিতেছিল। কাঠুরিয়া পত্নী তাহাতে বাধা না দিয়া আপন পুত্রটীকেও তাহার সঙ্গে দিল। দুটী ভাই বেড়াইতে বেড়াইতে "হাবালী" পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গিলগিটের উত্তর ধারে অবস্থিত এই পাহাড়ের উপরটা বেশ সমতল ছিল। এই স্থানে তাহারা দুই ভাই কিছুদিন অতিবাহিত করিল, এই সমতল স্থানটীর নাম 'বলদাস'।

এদিকে গিলগিটের রাণী তখন সঙ্কটাপন্ন পীড়িত। গ্রামবাসীগণ 'রা' বংশের আর কেহই নাই বলিয়া 'রা' পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত একজন দক্ষ ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে ছিল।

একদিন প্রত্যুষে মুরগীর ডাক শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। সাধারণতঃ মুরগী যেমন—কোঁকোর কোঁ কোঁ বলিয়া ডাকে সেদিন নাকি মুরগী সেরূপ ডাকিল না; সেদিন মুরগী "বেলদাস-আম-বাই" অর্থাৎ বেলদাস নামক স্থানে একজন 'রা' বংশের লোক এখনও আছে—এই বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে দলে দলে লোক ছুটিল এবং সকলে গিয়া দেখিল যে ২টি বালক বেড়াইতেছে। তখন তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাণীর নিকট হাজির করিল।

'ত্রাখান' দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল—রাণী তাহাকে ডাকিয়া—তাহারা কেন আসিয়াছে—পিতা মাতার নাম কি—কোথায় থাকে ইত্যাদি সকল বিষয় খুলিয়া বলিতে আদেশ করিলেন। ত্রাখান তাহার জীবনের সকল ঘটনা রাণীকে খুলিয়া বলিলে পর রাণী তাহার নিজ সন্তানকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। মনে মনে কতই দুঃখ করিলেন—এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কিনা তিনি নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। রাণী তখন ত্রাখানকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। সেই দিনই 'ত্রাখান' গিলগিটের 'রা' বলিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া গেল।

ত্রাখান ও দাঁড়কাক

কথিত আছে যে গিলগিটের 'রা' ত্রাখান অতিশয় গর্ব্বিত ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। একদিন তিনি আপন অনুচরগণ সহ নদী-

তীরে বসিয়া বলিলেন—"আমার মত সাহসী ও শক্তিশালী 'রা' আর পৃথিবীতে কেহ নাই।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা কাক তাহার মাথার উপর মলত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে বেয়াদপ কাকটার উপর তিনি বড়ই চটিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ কাকটাকে যেরূপেই হউক ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন, রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ কাকের পশ্চাতে লোক ছুটিল।—বহুলোকের তাড়া খাইয়া কাকটা প্রথমত মনোওয়ার, পরে নদী পার হইয়া দানিয়ার গ্রামে উপস্থিত হইল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত লোক তাড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া কাকটা দানিওর নালাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় 'রা'এর অনুচরগণ দেখিল যে একটি স্ত্রীলোক মার্কহোর পশুর মাংস জলে ধুইতেছে, তাহার নিকট হইতে একখণ্ড মাংস লইয়া তাহার প্রলোভনে বশ করিয়া হতভাগ্য কাকটাকে ধরিয়া ফেলিল।

'রা'এর নিকট কাকটাকে আনা হইলে, কি জন্য সে গিলগিটের প্রবল পরাক্রান্ত 'রা'এর মাথায় মলত্যাগ করিয়াছে' এই প্রশ্ন পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করা হইল। কাকটা উত্তর করিল—যে তোমার গর্ব্বে আমায় হাসি পাইয়াছিল। কারণ তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া এরূপ গর্ব্ব করিতেছিলে সেই স্থানেই একজন তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী বীরের সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। সেই স্থানটী খুঁড়িয়া দেখিলে একটি অঙ্গুরী পাইবে, অঙ্গুরীটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে সে তোমার অপেক্ষা কত অধিক শক্তিশালী ছিল।

রা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানটি খুঁড়িতে আদেশ দিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি আঙটি পাওয়া গেল; সেই অঙ্গুরী দেখিয়া 'রা' অবাক হইয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন যে, তাহার সর্ব্বশরীরটী অঙ্গুরীটির মধ্য দিয়া অনায়াসে গলিয়া যাইতে পারে। 'রা' তখন সন্তুষ্ট হইয়া সুপাচ্য আহার্য্যে কাকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন।

সুমালিকের সাহস

কথিত আছে যে 'সুমালিক' নামক একজন 'রা' গিলগিটে ছিলেন, তিনি তাহার ভগিনীর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ইয়াসীনের শাসনকর্ত্তা ফরমাইসকে একটী কুকুর প্রদান করেন। বাদখাসানের 'রা' তাজমোগল, যখন গিলগিট আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে 'দারকোট' নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন তখন ফরমাইস একখানি পত্র লিখিয়া সেই কুকুরটীর গলায় বাঁধিয়া গিলগিট অভিমুখে কুকুরটীকে ছাড়িয়া দেন। পাঁচঘণ্টার মধ্যে কুকুর আসিয়া গিলগিটে হাজির হইল। সুমালিক সেই পত্রপাঠ করিয়া ভগিনীপতির সাহায্যের নিমিত্ত একদল দক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন, উভয় পক্ষের সৈন্য সমূহ একই সময়ে ইয়াসিনে উপস্থিত হইয়া নদীর উভয় পারে শিবির সন্নিবেশ করিল।

"মঙ্গলের" সৈন্যগণ পথশ্রমে কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই সুতরাং অনতিবিলম্বে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে তাহারা ব্যস্ত হইল। এদিকে গিলগিট হইতে ইয়াসীনের সৈন্যগণ কেবলমাত্র সেইদিন ইয়াসীনে

পৌঁছিয়াছিল। মঙ্গলসৈন্য গিলগিটের প্রধানকে সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধে আহ্বান করিলে পর গিলগিট 'রা' স্বীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত বলিয়া দুএকদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন এবং সেইসঙ্গে মঙ্গল সৈন্যগণের মধ্যে কেহ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী থাকিলে তাহার কৌশল দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 'রা'এর অনুরোধে তাজমোগল তাহার একজন বিখ্যাত যোদ্ধাকে তাহার শক্তি ও যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন।

আদেশ পাইয়া সেই ব্যক্তি একটী বৃহৎ ছাগল ধরিয়া এরূপ বলের সহিত নিক্ষেপ করিল যে ছাগলটী নদীর অপর পারে গিলগিট 'রা'এর তাম্বুর নিকটে আসিয়া পড়িল।

সুমালিক অতিশয় বলবান ছিলেন। মঙ্গল সেনার শক্তি দর্শন করিয়া তিনি কিছু-মাত্র বিস্মিত হইলেন না। নিকটে একটী প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি পড়িয়াছিল তিনি তাহা ধরিয়া অবলীলা ক্রমে নদীর পর পারে মঙ্গলদের শিবিরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সুমালিকের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া মঙ্গলগণ অত্যন্ত ভীত হইল এবং সেই রাত্রেই ইয়াসীন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রত্যূষে সুমালিক দেখিলেন যে নদীর পরপারে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই—শত্রু-সৈন্য পলায়ন করিয়াছে; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুসরণ করিলেন এবং দারকোট নামক স্থানে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন কিন্তু দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করায় দৈবক্রমে অশ্বের পদস্খলন হওয়ায় তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। মঙ্গলগণ সেই সুযোগে তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দীভাবে বাদখাসানে উপস্থিত করিল।

মঙ্গলসৈন্য গিলগিটের 'রা' কে চিনিত না—তাহারা মনে করিয়াছিল যে একজন পথিক হয়ত ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছে; আর গিলগিটের 'রা' যে তাহাদের অনুসরণ করিবে ইহাই বা তাহারা কি প্রকারে জানিবে, সুতরাং কেহই গিলগিটের 'রা' কে চিনিতে পারিল না।

যাহা হউক রা বন্দী হইয়া মীরের রান্নার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। একদিন বনে কাষ্ঠ সংগ্রহ কালে 'রা' একটা জন্তুর মাথার হাড় হাতে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিলেন না, কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সংবাদ 'বাদখাসানের মীরের কর্ণে পৌঁছিল, মীর তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর 'রা' বলিলেন যে—ইহা একটী উৎকৃষ্ট 'তালিকার' অশ্বের মাথা। দ্রুত গতিতে ইহার সমান ঘোড়া পৃথিবীতে আর নাই।

তাজমোগল জন্তুর সম্বন্ধে বন্দীর এরূপ অভিজ্ঞতা দেখিয়া তাহাকে স্বীয় অশ্বশালার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পশুশালায় এরূপ অশ্ব আছে কিনা পরীক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। রা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে একটী ঘোড়ার পেটে একটী 'তালিকার' বাচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু সেই ঘোড়ার পেট কাটিয়া বাচ্ছাটীকে বাহির করিতে হইবে নচেৎ অল্প দিনের মধ্যেই ঘোড়াটী মারা পড়িবে।

মীরের অনুমতি লইয়া রা সেই ঘোড়ার

পেট কাটিয়া বাচ্ছাটী বাহির করিলেন। মীর এই তালিকার ঘোড়া লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিয়া তৎসঙ্গে একটী উপাধি প্রদান করিলেন। ক্রমে 'রা' এর যত্নে ঘোড়াটী বড় হইতে লাগিল। রা ঘোড়াটীকে লইয়া ময়দানে শিক্ষা দিতেন এবং ক্রমে শিক্ষার গুণে ঘোড়াটী এরূপ হইল যে 'রা' তাহাতে চড়িয়া চার ঘণ্টায় ১০০ মাইল ঘুরিয়া আসিতে সমর্থ হইতেন।

একদিন সুমালিক মীরকে বলিলেন যে ঘোড়াটী এখন চড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে সুতরাং শুভদিন দেখিয়া একটী সভা করুন এবং নূতন ঘোড়ার উপর উঠিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। দরবারের জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট হইল,—দেশের যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজ-কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—লোকে লোকারণ্য হইল। সেই দিন ঘোড়াটীকে উত্তম রূপে স্নান করাইয়া স্বর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দরবারে আনয়ন করা হইল। সুমালিকও সেদিন একটী উৎকৃষ্ট পোষাক পরিলেন। দরবার স্থলে ঘোড়াটীকে আনিলে পর সুমালিক ঘোড়াটীর দ্রুত গমন শক্তি সর্ব্বসমক্ষে দেখাইবার জন্য মীরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক মীরকে কহিলেন—

"যাহাকে তোমরা বন্দী করিয়া আনিয়াছিলে সেই আমিই গিলগিটের রা সুমালিক; এক্ষণে তোমার ঘোড়ায় চড়িয়া আমি পুনরায় দেশে ফিরিয়া চলিলাম। তোমার সাধ্য থাকে আমাকে ধর; বিদায়-বিদায়।"

এই কথা বলিয়া সুমালিক অশ্বসহ দরবার হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! মীরের সৈন্যগণ চারিদিকে ছুটিয়া চলিল কিন্তু 'রা'কে ধরে কার সাধ্য! কেবল এক ব্যক্তি সুমালিকের পশ্চাৎ ত্যাগ করিল না। তাহা দেখিয়া সুমালিক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সেই ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন। মীরের সৈনিক নিকটে আসিলে রা কহিলেন—

"তোমার মত একজন লোকের পক্ষে আমাকে বন্দী করা অসম্ভব, কেন বৃথা প্রাণ হারাইবে, ফিরিয়া যাও। তবে তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে তোমার ঘোড়াও যদি তালিকার ঘোড়া হয় তবেই আমাকে ধরিতে পারে। নচেৎ অন্য কোন অশ্বের সাধ্য নাই যে আমার অনুসরণ করে।

মীরের সৈন্য তাহার কথায় অত্যন্ত সুখী হইয়া ফিরিয়া গেল এবং মীরের নিকট গিয়া আপন অক্ষমতা জানাইল।

দারকোট পথে সুমালিক পৌঁছিয়া দেখিলেন যে ফরমাইস তাঁহার ভগিনীর উপর অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। কারণ ফরমাইস্ মনে করিয়াছিল যে সুমালিক আর আসিতে পারিবে না সুতরাং তাহার আর কোন ভয় নাই। সুমালিক ফরমাইসকে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিয়া গিলগিট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোক তাঁহাকে কয়েকটী উপদেশ দান করিলেন। কারণ সুমালিক ক্রুদ্ধ হইলে বুদ্ধিহারা হইতেন ইহা সেই বৃদ্ধ লোকটীর জানা ছিল। বৃদ্ধ তাহাকে বলিয়া দিলেন যে—তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত অস্ত্রদ্বারা কাহাকেও আঘাত করিও না—অপর অস্ত্র অন্বেষণ করিয়া তাহা দ্বারা আঘাত করিও। সুমালিক সেই বৃদ্ধের উপদেশ মত চলিতে স্বীকৃত হইলেন।

সুমালিক গিলগিটে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন যে তাহার স্ত্রী একটী অপরিচিত পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে! তাহা দেখিয়া সুমালিক অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থ এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া মারিতে উদ্যত হইবামাত্র সেই বৃদ্ধের উপদেশ তাহার স্মরণ হইল। তিনি অন্য অস্ত্রের অন্বেষণে গমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে অপর পুরুষটী আর কেহই নহে—সেটী তাহারই প্রিয়তম পুত্র—খিস্‌রা খান।

সুমালিক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সেই অহিতকর কর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার উপদেশদাতা বৃদ্ধকে বহু অর্থ উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন

(প্রথম ভাগ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম, এ, মূল্য দুই টাকা—প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। পৃষ্ঠ ২২৬।

তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে একদা যিনি আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ প্রতিভা বিকাশে সমগ্র দেশের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, যাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য প্রভাবে ভারতবর্ষের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাকৃতজনের বোধগম্য হওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং যিনি এইদেশে ব্রহ্মবিদ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ দার্শনিক ঋষি শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত ও তাঁহার দার্শনিক মত অতি সংক্ষেপে গ্রন্থকার এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া লেখা কোন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে পাঠ করি নাই; দ্বিজদাস বাবু এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া প্রকৃতই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শঙ্করের জন্ম ও বালচরিত অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে মনে হইতেছিল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষকে ঈশ্বরের অবতার প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার জন্ম ও বালচরিত ঘেরিয়া নানা আলৌকিক ঘটনার ব্যূহ রচিত হইয়া থাকে। শঙ্কর যে মহাদেবের অবতার তাঁহার শিষ্যগণ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কত কাহিনীই না প্রচার করিয়াছেন। আবার একস্থলে পড়িলাম মহাদেব একদিন শঙ্করের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাদেব কয়টি?

শঙ্করের দার্শনিক মত সম্বন্ধে দ্বিজদাস বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া মনে অনেক তর্ক উঠিয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে গোবিন্দলাল শঙ্করকে উপনিষদের যে যে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল শ্লোকের পূর্ব্বাপর পাঠ করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহারা সমাধিস্থ জীবের সমাধি অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শাঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শঙ্করের মতে আত্মা এক এবং তাহার মতকে মায়াবাদ বলা চলে, ইহা নূতন বলিয়া ঠেকিল।

ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার ইতিহাসে শঙ্করের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক সাঙ্খ্যকার কপিলমুনির দর্শনকে নিরীশ্বর শাস্ত্র বলিয়াছেন। যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়া এই মত প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহার পূর্ব্বাপর অর্থাৎ Context পাঠ করিলে কপিলমুনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এ বাক্যে কি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাহাকে বলে ইহা লইয়া আলোচনা

আরম্ভ হইয়াছে। সাংখ্য বলিতেছেন "যত সম্বন্ধং সতং তদাকারোলেমি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্" তারপর প্রশ্ন উঠিল যোগীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বিনা অতীত অনাগত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়; উক্ত লক্ষণ যোগীর প্রত্যক্ষে ঘটিতে পারে না। ইহার উত্তর "যোগীনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ" অর্থাৎ যোগীর অতীত অনাগত সমীপস্থ অথচ পুরস্থ বস্তু যোগজসামর্থ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। ইহাদের ইন্দ্রিয় যোগবল দ্বারা দিব্য শক্তি প্রাপ্ত হয়; অতএব যোগীর প্রত্যক্ষে কোন দোষ হয় না। প্রশ্ন হইল ঈশ্বরের ত স্থূল ও সূক্ষ্ম কোনই ইন্দ্রিয় নাই তবে উক্তরূপ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের হইতে পারে না। ইহার উত্তরে কপিল বলিতেছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধে" ঈশ্বরে এ দোষ অসিদ্ধ অর্থাৎ ঘটিতে পারে না; কেন না জীব বিষয় (object) হইতে দূরে থাকে বলিয়া বিষয় লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় আবশ্যক হয় (জন্য প্রত্যক্ষ)! ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ। তাহাকে কিছু লাভ করিতে হয় না। প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার ইন্দ্রিয় আবশ্যক হয় না। সমস্ত পদার্থের মধ্যেও বাহিরে তিনি ওতঃ-প্রোতভাবে বর্ত্তমান। অতএব ইন্দ্রিয় না থাকিলেও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে কোন দোষ ঘটিতে পারে না সাংখ্যকার একথাই বলিতেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৫ সূত্রে প্রশ্ন হইল, অনন্ত শক্তি সম্পন্ন প্রকৃত পরমাত্মার অধীন কি করিয়া হইতে পারে। ৫৬ সূত্রে ঋষি উত্তর দিতেছেন "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" আবার পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রে কপিলাচার্য্য বলিলেন "বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার পর প্রশ্ন হইল "বৈদিক কর্ম্মের দ্বারাই যদি ফলসিদ্ধি হয় তবে ঈশ্বর থাকিবার প্রয়োজন কি?" তদুত্তরে কপিলমুনি বলিলেন "ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে ফল নিস্পত্তি কর্ম্মণাতৎসিদ্ধি"। এই প্রশ্নোত্তর হইতে সাংখ্য-দর্শনকে নিরীশ্বর শাস্ত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবার হেতু কি তাহা বুঝিলাম না।

মায়া সম্বন্ধেও দ্বিজদাস বাবু শঙ্করের মতামত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই।

ছোটখাট ভ্রমপ্রমাদ বইখানিতে বিরল নহে। দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইলে বইখানি অধিকতর সুপাঠ্য ও সুগম্য হইবে।

দ্বিজদাস বাবু আজীবন শাস্ত্রালোচনা করিয়া আসিতেছেন—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার আলোচনার প্রধান বিষয়। বহুকাল হইতে ভারতী প্রমুখ অন্যান্য মাসিক পত্রিকাতে এই বিষয়ে তিনি লিখিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে নানা শোক দুঃখের আঘাত পাইয়াও তিনি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমে, কার্য্য করিয়া বহু অধ্যায়ে প্রথমভাগ শেষ করিয়াছেন। এই নির্লিপ্ত ভাব পণ্ডিত জনেরই উপযুক্ত। এতদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমাদের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। গ্রন্থখানি পাঠে সেই শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইয়া যায়।

গ্রন্থখানি বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরের বস্তু,—ইহা পাঠে যে সকলেই অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বস্তুত আমার মত লোকের পক্ষে ইহার সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র, তাহা আমি করিও নাই। বইখানির যে যে স্থলে আমার মনে প্রশ্নোদয় হইযাছে, যে স্থান সুবোধগম্য বা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতে পারি নাই তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। আশাকরি দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থকার এই বিষয়গুলি বিশদরূপে মীমাংসা করিয়া দিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাউলের গান

হে গুরু, হে স্বামি তুমি এই দীনজনে,
শিখালে বাজাতে বীণা অতি সযতনে।
সুর বাঁধিবারে কিন্তু শিক্ষা দাও নাই,
সে কষ্ট সে শ্রম নিজে লয়েছ সদাই।

আজ তুমি নাহি কাছে, গেছ চলি দূরে;—
ছিন্ন ডোর বীণা তাই বাজিছে বেসুরে।
নীরব ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল সুতান,
একতারে বাজে শুধু বাউলের গান।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্য্যাতনসহিষ্ণু ভারতবাসী

এই কলিকাতা নগরীতে সাত আটটি মহিলাসমিতি আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারপীড়িত ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সমিতিসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগে বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ ২০ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট ভবনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভাস্থলে প্রায় দেড় হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়া গিয়াছিল। এখানে শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র যাহা পাঠ করিয়া ছিলেন—তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতবাসী ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে এবং জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অন্যান্য নানা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে তাহার সংবাদ আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে পড়িয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তাঁহারা অকুতোভয়ে যেরূপ আত্মত্যাগ করিতেছেন তাহার পুণ্য সুরভি সুদূর সমুদ্রের উপর দিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে ভারতবাসী স্বদেশ ছাড়িয়া সেই সুদূর আফ্রিকায় গিয়া বাস করিতেছে কেন? তাহাদের উপর অত্যাচারই বা কেন হইতেছে? সে অত্যাচার কিরূপ? এমন অত্যাচার সহিয়া ভারতবাসীর সেখানে থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? দেশে ফিরিয়া আসিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায়।

কেপকলনি, নেটাল, অরেঞ্জিয়া, ও ট্রান্সভাল, এই চারিটি প্রদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত। এই সকল স্থানেই ভারতবাসীগণ বাস করিতেছেন এবং অত্যাচারে পীড়িত হইতেছেন। বুয়ারদের সহিত ইংরাজের যুদ্ধের পূর্ব্বে কেপকলনি ও নেটাল ইংরাজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। বুয়ারগণ পরাজিত হইলে উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ লইয়া বুয়ার এবং ইংরাজের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। কানাডা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকা এক্ষণে ইংলণ্ডের একটি উপনিবেশ। ইহার শাসনভার বুয়ার এবং ইংরাজের মিলিত পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত। বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ এবং ইংলণ্ড হইতে গভর্ণর প্রেরণ, এই তিনটি বিষয় ইংলণ্ড কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় এবং কেবলমাত্র এই তিনটি বিষয় লইয়াই দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ। অন্যান্য সকল বিষয়েই ইহা স্বাধীন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত এই সকল প্রদেশে বহু সোণার, কয়লার এবং হীরকের খনি আছে। সেখানে চিনির কারবার সুবিস্তৃত। চিনি প্রস্তুতের জন্য বহু আকের ক্ষেত, চায়ের ক্ষেত্র এবং কয়লার কারখানা আছে। বুয়ার যুদ্ধের বহুবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানের দুইটি প্রদেশ (কেপকলনি ও নেটাল) যখন ইংরাজ অধিকার ভুক্ত ছিল তখন এই সকল খনির ও কারখানার মালিকগণ এবং চা-কর ও চিনিকরগণ ব্যবসা বাণিজ্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে পরিশ্রমী, মিতাচারী এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন মজুর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমদানি করিবার জন্য ইংলণ্ডকে অনুরোধ করেন। এতদিন তাঁহারা কাফ্রি কুলি লইয়া এই সকল কাজ চালাইতেন। কিন্তু কাফ্রিগণ তাঁহাদের ব্যবসা ক্রমশই অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছিল। এই সকল ব্যবসায়ীগণের স্বার্থের উন্নতির জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে একদল মজুর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত নেটালে প্রেরণ করেন। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষ হইতে কুলি চালান হইতেছিল।

বিদেশে ধনোপার্জ্জনের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, আপনাদিগকে দারিদ্র্য রাক্ষসীর ভীষণ গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া দীন দুঃখী ভারতবাসী সেই কোন্ অজানা, অচেনা রাজ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিল।

শ্রীযুক্ত গান্ধি

সম্মুখে যে কি উত্তালতরঙ্গ, কি ভীষণ সংগ্রাম, কি শোচনীয় ভবিষ্যৎ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তাহাদের জানা ছিল না। তাহারা তখন ভবিষ্যৎ সুখের আশায় মোহমুগ্ধ। আর তাহাদের মালিকগণও তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের এক মোহন ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের কশাঘাত যে বড় ভীষণ। ভারতবর্ষে ভারতবাসী দরিদ্র, কিন্তু বিদেশী আসিয়া এই ভারতবর্ষ হইতেই মণিমুক্তা খুঁড়িয়া লইয়া সম্পদশালী হইতেছে। ভারতবাসী "নিজ বাসভূমে পরবাসী," তাই আহার অন্বেষণে তাহাকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল।

নেটাল তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত। খনির ইংরাজ মালিকগণ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ মজুরদিগের বসবাসের নানা প্রকার সুবিধা করিয়া দিলেন। চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহারা স্বাধীনভাবে জমিজমা লইতে পারিবে, চাসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে এই অধিকার প্রদান করিলেন। ক্রমে মজুরদিগের সহিত বণিক ভারতবাসী স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নেটালে গমন করিতে লাগিলেন। নেটালে এই শ্রেণীর ভারতবাসীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহারা তত দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য দেশে গিয়া ব্যবসা করিতে উৎসুক হইলেন। একদল ভারতবাসী স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নেটালের সীমা অতিক্রম করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেন। ট্রান্সভাল নেটালের নিকটবর্ত্তী আর একটি প্রদেশ। ইহা তখন বুয়ারের অধীন উপনিবেশ ছিল। মিতাচারী, পরিশ্রমী, শান্ত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া ভারতবাসীগণ ঐ সকল প্রদেশে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে এতদূর উন্নতি লাভ করিলেন যে তাঁহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের কুড়ি বৎসরের মধ্যে নেটালের ইংরাজ ও ট্রান্সভালের বুয়ারগণ দেখিলেন ভারতবাসীর সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁহারা পরাজিত হইয়া যাইতেছেন। তখন তাঁহাদের স্বার্থে প্রবল আঘাত লাগিল। বণিক জাতি পকেটে টান পড়িলেই ক্ষেপিয়া উঠে। সেই সময় হইতে আফ্রিকার এই ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। ভারতবাসী যাহাতে স্বাধীনভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কলকারখানা চালাইতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহারা নানারূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহারা ভারতবাসীকে কেবল মাত্র কুলিরূপেই চাহেন,—কেননা ভারতবর্ষীয় কুলি না হইলে তাঁহাদের ব্যবসাবাণিজ্য অচল—কিন্তু সেখানে স্বাধীন ভারতবাসীর অস্তিত্ব তাঁহাদের অসহ্য। স্বাধীন ভারতবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাড়াইবার জন্য তাঁহারা নানা প্রকার ঘৃণ্য আইন করিয়া যে অত্যাচার সুরু করিয়া দিলেন তাহারই দূরীকরণ চেষ্টা ইংরাজের সহিত বুয়ার যুদ্ধের অন্যতম কারণ। অনেকেই একথা জানেন যে বুয়ার যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ এই বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভারতবাসীর প্রতি বুয়ারগণ যে অত্যাচার করিতেছেন তাহা দূর করাই আমাদের এই যুদ্ধের প্রধান কারণ। ভারতবাসী আমাদের প্রজা, তাহাদের প্রতি অত্যাচার কি আমরা সহ্য করিতে পারি? বুয়ারদিগকে পরাজিত করিয়া আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় যে শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিব তাহা ভারতবাসীর সকল দুঃখ দূর করিবে, ভারতবাসীর প্রতি সুশাসনে তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া অগণ্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া নিজের দেশের বাছা বাছা বীর পাঠাইয়া আমাদেরই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বুয়ারদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রামে রত হইয়াছিলেন। এই সংগ্রামে ভারতবাসী নানা প্রকার অসুবিধার জন্য যদিও যুদ্ধ করিতে সক্ষম হন নাই কিন্তু মিঃ গান্ধির নেতৃত্বাধীনে প্রায় এক হাজার ভারতবাসী ইংরাজদিগের পক্ষে থাকিয়া আহতদের সেবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্বলন্ত গোলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, কালান্তক অগ্নিবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া রণক্ষেত্র হইতে আহত যোদ্ধাদিগকে খাটিয়াতে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সে সময় তাঁহাদের অকুতোভয়তা, অক্লান্ত উৎসাহ, অকুণ্ঠ সাহস দেখিয়া ইংরাজগণ চমকিত হইয়াছিলেন এবং এই আত্মত্যাগের ফলে যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ভারতবাসীগণের

অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা ভারতবাসীর এ উপকার বিস্মৃত হইলেন। বুয়ারগণ পরাজিত হইবার পর সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা যখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন পার্লামেণ্ট গঠিত হইল তখন ভারতবাসীর সকল আশা নির্ম্মূল হইল। উপকারের প্রত্যুপকার যে ধর্ম্মসঙ্গত তাহা কাহারও মনে হইল না। বুয়ারদের অধীনে বাস করিবার সময় ভারতবাসীর প্রতি যত অত্যাচার হইত, ইংরাজ ও বুয়ারে মিলিত পার্লামেণ্টের অধীনে ততোধিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। জানিনা ইংরাজদের মত ন্যায়পরায়ণ জাতির ন্যায়নিষ্ঠতা, শুভ কামনা কোন্ দেবতার অভিশাপে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যে সকল অত্যাচার-মূলক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি আইন প্রধান ঃ—

(১) ইমিগ্রেসন আইন। এই আইন অনুসারে আসিয়ার কোন অধিবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নামিতে হইলে এমন কয়েকটি সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় যাহা মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ধর্ম্মের বিরোধী। কোন ইউরোপীয়কে এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় না।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতবাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কেপ কলোনিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদের এই অধিকার ছিল।

(৩) নেটালের ভারতবাসী মজুরগণ চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাৎসরিক ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিবার পর তথায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে তাহাদের বাস করিবার অধিকার নাই।

(৪) ভারতবর্ষ হইতে মজুরদিগকে চুক্তি বদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। আইন করা হইল প্রত্যেক চুক্তি-মুক্ত ষোল বর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষ এবং তের বৎসরের ও তদূর্দ্ধ বয়সের নারী বৎসরে ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিতে বাধ্য। এই আইনের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, স্বাধীন ভারতবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বহিষ্কৃত করা, কারণ ট্যাক্স দিতে না পারিলে তাহারা জেলে যাইবার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ চুক্তি মুক্ত হইবার পর ট্যাক্স দিতে অসমর্থ হইলে তাহারা পুনরায় চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া দাসত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। কেন না স্বাধীন ভাবে বসবাস করিতে গেলেই এই ট্যাক্স দিতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান নেতাগণ বলিয়াছেন, "আমরা ভারতবাসীকে এদেশে যে চাই না এমন নহে, কিন্তু তাহাদিগকে কুলিরূপে চাই, তাহারা আমাদের দাস হইয়া আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া দিবে। নিজেরা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আপনাদের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তাহাদের দেশকে সম্পদশালী করিবে কেন? আমাদের দেশে যখন আসিয়াছে তখন চিরকাল আমাদের দাস হইয়া থাকুক। স্বাধীন ভাবে আমাদেরই মত প্রজাস্বত্ব ভোগ করিয়া, কারখানা খনির মালিক হইয়া, জমিদার হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া দিবে, একি তাহাদের স্পর্দ্ধা? কৃষ্ণবর্ণ জাতির এ স্পর্দ্ধা কখনও বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। অতএব স্বাধীন ভারতবাসীর অস্তিত্বের মূলোচ্ছেদের জন্য এই ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইল। এই রক্তশোষণকারী ট্যাক্স কত পরিবারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, কত পুরুষকে পাপে ডুবাইয়া দিতেছে, কত রমণীকে অধর্ম্মের পথে দাঁড় করাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাবিয়া দেখুন, একটি পরিবারে পিতা, মাতা, একটি ষোল বর্ষ বয়স্ক পুত্র এবং একটি তের বর্ষের কন্যা থাকিলে প্রত্যেককেই বৎসরে ৪৮ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। কোন দরিদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রতি বৎসর এত টাকা ট্যাক্স দেওয়া কি ভয়ানক ক্লেশকর!

(৫) দক্ষিণ আফ্রিকায় কিংবা তাহার বাহিরের কোথাও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে যে বিবাহ হইয়াছে তাহা অবৈধ। এই আইন অনুসারে কোন হিন্দু কিংবা মুসলমান স্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনতঃ স্ত্রী বলিয়া গণ্য নহেন। সুতরাং কোন বিবাহিতা হিন্দু কিংবা মুসলমান রমণী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনতঃ প্রবেশ করিতে পারেন না। কিংবা দেশে থাকিলে স্বামীর নিকট যাইতে অথবা অল্পদিনের জন্য দেশে ফিরিয়া আসিতে আইনতঃ অক্ষম। তাঁহাদের বিবাহ অবৈধ বলিয়া তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও অসিদ্ধ। এই অবস্থা,

অমানুষিক আইন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীকে উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া এই আইন দূর করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত। সমগ্র ভারতনারী-সমাজের প্রতি একি ঘোর অবমাননা! ভারতবর্ষের নারীদের প্রতি একি ঘৃণ্য অত্যাচার! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, পদ্মিনীর জন্মভূমির কন্যাগণের প্রতি একি নিদারুণ, নিষ্ঠুর অপমান! ভগিনীগণ! আমরা মৃত, আমরা কুসুমশয্যায় শুইয়া আরামে, আয়াসে দিন কাটাইয়া দিই বলিয়া নারীর এই অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া আছি। বিদেশে আমাদের ভগিনীগণের মস্তকে যে অপমানের জ্বালা পুঞ্জীকৃত হইয়াছে, আমরা কি তাহার এক বিন্দুও অন্তরে অনুভব করিতে পারি? কিন্তু সেই সুদূর বিদেশে অত্যাচারে পীড়িত, অপমানে জর্জ্জরিত, আমাদেরই ভগিনীগণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন তাহা অতুলনীয়।

মিঃ গান্ধির জেলে যাইবার পূর্ব্বে মিসেস গান্ধির সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয় তাহা একান্তই হৃদয় বিদারক। মিসেস গান্ধি রোষে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ দেশের আইনানুসারে আমরা ত স্বামী স্ত্রী নই। আমাদের সন্তানেরাও অবৈধ। যে দেশের এমন ঘৃণ্য আইন, চল সে দেশ হইতে চলিয়া যাই।"

মিঃ গান্ধি বলিলেন, "না, তাহাত হইবে না। এই আইন রহিত করিয়া ভারতবাসীর অপমান দূর করিতে আমাদিগকে এখানেই থাকিতে হইবে।"

মিসেস গান্ধি বলিলেন, "তুমি জেলে গেলে, আমার জীবন ধারণের সার্থকতা কি?" ইহার পরই মিসেস গান্ধিও সংগ্রামের রক্ত পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন, আর দলে দলে নারীগণ আপনাদের মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহার তলে মিলিত হইলেন। উপরি উক্ত পশুজনোচিত আইন অমান্য করাতে মিসেস গান্ধি, তাঁহার দুই পুত্রবধূ এবং অন্যান্য কত রমণী আজ কারাগারের নিষ্ঠুর পীড়নে জর্জ্জরিত হইতেছেন। উল্লিখিত আইন ব্যতীত ভারতবাসী সম্বন্ধে আরও নানা প্রকার অপমানসূচক আইন বিধিবদ্ধ আছে। ভারতবাসীকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে হইলে দশ আঙ্গুলের দশটি ছাপ এবং দুই হাতের দুইটি ছাপ এই বারটি ছাপ দিতে হয়, আইনে ভারতবাসীকে সর্ব্বত্রই কুলি বলিয়া লিখিত আছে। যাহারা কুলি স্বরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন নাই এমন সব স্বাধীন ব্যবসায়ী ভারতবাসীয় কুলি বলিয়া আইনে আখ্যাত হইয়াছেন। ভারতবাসী হইলেই তাঁহারা কুলি, আর তাঁহাদের চোর, ডাকাত প্রভৃতির সামিল করা হইয়াছে। ভারতবাসীর ফুটপথে হাঁটিবার অধিকার নাই। যে ট্রামে, ট্রেনের যে কক্ষে কোন ইউরোপীয় যাইতেছেন তাহাতে ভারতবাসীর চড়িবার অধিকার নাই। ব্যবসা করিবার জন্য ভারতবাসীকে প্রায়ই লাইসেন্স দেওয়া হয় না। শতবার আবেদন নিবেদনে পরিশ্রান্ত হইয়া মিঃ গান্ধি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এক মহতী সভায় ভারত প্রবাসীদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, এই ঘৃণ্য অপমানজনক পাশব আইন মান্য করা অপেক্ষা আমরা কারাগারের যাতনা সহ্য করিব। যতদিন না এই দুঃসহ অত্যাচার নিবারিত হয়, যতদিন না ভারতবাসীর ইজ্জত রক্ষিত হয় ততদিন আমরা এই দেশের বে-আইন মানিব না এবং তাহার ফল স্বরূপ যে দণ্ড ভোগ করিতে হয় করিব। ইহাই দক্ষিণ আফ্রিকার passive resistance—ধর্ম্মঘট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কারণ। এই সংগ্রামের ফলে এ পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ ৩ হাজার ৫ শত বার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, এক শত লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, শত শত পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং সমগ্র সম্প্রদায় আজ পথের ভিখারী। আজ কত পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ কারাগারে আবদ্ধ বলিয়া রমণীগণ অসহায়া, শিশু সন্তান অনাহারে মৃতপ্রায়। খনির মালিকগণ খনি গুলিকে জেলখানায় পরিণত করিয়াছেন, আর তাঁহারা হইয়াছেন জেলার। কুলিদিগকে সেইখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জেলের আইনানুসারে কোন কয়েদী অবাধ্য হইলে জেলার তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে এবং ইচ্ছামত বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে পারে। খনিগুলি জেলখানায় পরিণত করাতে এই ফল হইয়াছে যে খনির মালিকগণ ইচ্ছামত কুলি-

দিগকে গুলি করিয়া মারিতে কিংবা বেত্রাঘাত করিতে পারেন। অনেক স্থলে খনির কুলিগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে তাহাদিগকে কাজে আনিবার জন্য খনির মালিকগণ তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে মৃতপ্রায় করিতেছেন। ব্যবসা করিবার জন্য ভারতবাসীকে অনেকস্থলে লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কতবার এইরূপ ঘটিয়াছে যে এই আইনের প্রতিবাদ কল্পে ভারতবাসিগণ বিনা লাইসেন্সেই রাস্তায় জিনিষ ফেরী করিয়াছেন। পুলিস আসিয়া যেই তাঁহাদের ধরিয়া কারাগারে লইয়া গেল, অমনি একদল নারী আসিয়া জিনিষ ফেরী করিতে আরম্ভ করিলেন, পুলিস ইহাদিগকেও ধরিয়া লইয়া গেল, আবার আর একদল আসিলেন। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একাগ্র নিষ্ঠা, ও আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাঁহারা আজ ভারতবর্ষের নরনারীর বীরত্ব জগৎসমক্ষে ঘোষিত করিতেছেন। এখন এই সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা বহন করিয়া অবনত মস্তকে যদি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তবে তাঁহারা অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন বটে কিন্তু বিদেশে ভারতবাসীর গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের এই যে প্রাণপণ সংগ্রাম ইহার অক্ষয় ফল হইতে তাহা হইলে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়। তাঁহারা ভারতবাসীর অপমান সূচক এই সকল আইন রহিত করিয়াই ভারতবাসীর মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদের সহিত ভারতবাসীকে সমান আসনে বসাইয়া ভারতবর্ষের মহিমা ও গৌরব জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই সংগ্রাম আরো পাঁচমাস কাল অব্যাহত রাখিতে পারিলে তবে সুবিচারের আশা আছে। এই পাঁচ মাস তাঁহাদিগকে জীবিত রাখিতে হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রতিমাসে অন্ততঃ ৭০ হাজার টাকা পাঠাইতে হইবে।

আজিকার এই সহানুভূতি জ্ঞাপন কেবল কাগজে কলমে না থাকিয়া, কেবল প্রস্তাবের মধ্যে আবদ্ধ না রহিয়া প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হউক। আমাদের অত্যাচার পীড়িত লাঞ্ছিত ভাইভগিনীদিগের দুঃখে অন্তরের দুঃখ ঢালিয়া দিয়া, তাঁহাদের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া তাঁহাদের কণ্টকাকীর্ণ পথের যাতনা প্রাণে বিন্দুমাত্রও অনুভব করিবার জন্য আজ আমরা প্রস্তাব করি যে সমগ্র বঙ্গনারীসমাজ এক প্রাণে মিলিত হইয়া একটি দিন নির্দ্ধারণ করিয়া উপবাস করুন। সে দিনের আহার্য্যের ব্যয় প্রত্যেক নারী, লাঞ্ছিত ভাই ভগিনীদিগের জন্য প্রেরণ করুন। সমগ্র বঙ্গের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ স্থানের রমণীসমাজকে পত্র লিখিয়া ঐ দিনে উপবাস করিতে অনুরোধ করুন। একটি দিনের এই সামান্য ত্যাগ সমগ্র দেশের নারীসমাজের অন্তরে যে শক্তির তরঙ্গ উত্থিত করিবে তাহা হয়ত আমাদিগকে আমাদের স্বাভাবিক জড়তা, আরামপ্রিয়তা, ও নিশ্চেষ্টতা হইতে তুলিয়া ধরিয়া মনুষ্যত্বের ভাবে জাগরিত করিতে সক্ষম করিবে।

শ্রীকুমুদিনী মিত্র।

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিং দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতবাসীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয়তার জন্য আমরা ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ

সকলেই জানেন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতের শ্রেষ্ঠ সম্মান—নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সম্মানকে আমরা ব্যক্তিবিশেষের সম্মান বলিয়া মনে করিতে পারি না—আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যে জগতের সমক্ষে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন ইহা আমাদের দেশেরই গৌরব। এই গৌরবানন্দে পূর্ণ হইয়া কবিবরকে অভিনন্দন করিবার মানসে গত ২৩ শে নভেম্বর প্রায় পাঁচশত লোক কলিকাতা হইতে স্পেশল ট্রেণে বোলপুর শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। তাহার বিশদ বিবরণ এখানে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—কারণ সে সংবাদ প্রায় সমস্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা কেবল সেই দিনের সংগৃহীত কয়েকখানি ছবি এইস্থানে প্রকাশিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এত সম্মানেও রবীন্দ্রনাথকে গর্ব্বিত করিয়া তুলে নাই। আমরা নিম্নে এই উপলক্ষে রচিত তাঁহার একটি গান প্রকাশিত করিলাম। ইহা হইতে তাঁহার অন্তরের প্রকৃত ভাব সকলে বুঝিতে পারিবেন।

বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতনে যাত্রা

রবীন্দ্রনাথের সভায় আগমন

গান

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
এরে পর্‌তে গেলে লাগে,
এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে
সুর নাহি যে সরে,
ওরই পরে মন দিতে যাই মন লাগে না কাজে॥

তাই ত ব'সে আছি
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি।
ফুলের মালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঁশী

বৃদ্ধ নাগ্নি ছোট ছোট নাতি নাতিনী-গুলিকে লইয়া একটা মাদার গাছের তলে বসিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছিল। বহুদিন বিদেশে কাটাইয়া সে সেই মাত্র কয়দিবস দেশে ফিরিয়াছিল;—ইচ্ছা জীবনের শেষ দিন কয়টা এমনি আমোদে সে কাটাইয়া দিবে। সারা জীবনটা যুদ্ধ ব্যবসায়ে কাটাইয়া সে তখন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—হিংসা, দ্বেষ আর তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। যৌবনের সে উদ্যম আর নাই—বাহুতে সে অসুরের বল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত দেহ জরাজীর্ণ; ভীলপুত্র নাগ্নি আজ শিশুর মতই দুর্ব্বল।

শরতের নির্ম্মল রাত্রি। উপরে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান্। সারা পৃথিবী তাহার স্নিগ্ধ কিরণ মাখিয়া একখানি লাবণ্যময়ী রমণীপ্রতিমার মত দেখাইতেছিল।

"দাদা! তুই বাজা আমরা শুনি হ্যাঁ দাদা বাজা!" ছয় বৎসর বয়স্কা পৌত্রী ভুটির হঠাৎ বাজনা শুনিবার ইচ্ছা হইল। সে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধ নাগ্নিকে 'বাজা, বাজা' বলিয়া উত্যক্ত করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ভুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল,—"কি বাজাব দিদি?"

"সেই তোর বাঁশিটা—হ্যাঁ দাদা বাজা!"

বৃদ্ধের সহিত সর্ব্বদাই একটী বংশ নির্ম্মিত বাঁশি ফিরিত—এক দণ্ডও সে সেটীকে কাছ ছাড়া করিত না। কিন্তু কেহ কখনও তাহাকে সেটি বাজাইতে দেখে নাই!

বৃদ্ধ আবার হাসিয়া বলিল,—"ছি দিদি! ও কথা ব'ল না আমি কি বাজাতে জানি যে বাঁশি বাজাব?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক বলিল,—"না, জানিস্ না বই কি! ইঃ! তুই মিছে কথা ব'লছিস্। যদি বাজাতেই না জানবি তবে তোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিটা সর্ব্বদা ফেরে কেন?"

বৃদ্ধ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বের মত কেবল বলিল,—"নারে দাদা—সত্যি ব'লচি আমি বাজাতে জানিনা।"

বালক বালিকারা কিন্তু তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। ভুটি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—"আচ্ছা দাদা এত ক'রে বল্লুম তুই তবু একবার বাঁশিটা বাজালিনে আমিও আর তোর পাকা চুল তুলে দেব না। বেশ, বেশ!"

বৃদ্ধ বালকের মত সরল প্রাণে একবার হাসিয়া উঠিল তাহার পর বলিল,—"না দিদি রাগ করিস নি। আমি ত বাঁশি বাজাতে জানি না—আচ্ছা তার চেয়ে বরং একটা গল্প বলি শোন! কেমন? তা হ'লে ত' আর রাগ থাকবে না?"

বালক বালিকারা সোৎসাহে তাহাকে ঘেরিয়া বসিল, বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা তাই বল, সেই বেশ হবে। কিন্তু যুদ্ধুর কথা—ভুতের গল্প হ'লে হবে না।"

বৃদ্ধ বলিল,—"আচ্ছা তাই ব'লচি শোন!"

বৃদ্ধ যে গল্পটি বলিল তাহা এই:—

সে আজ প্রায় ষোল সতের বৎসর পূর্ব্বের

কথা। আমি তখন সৈন্যদলের সহকারী সেনাপতি। সেই বৎসর একটা খুব বড় যুদ্ধ হয়,—সারা দেশটায় হাহাকার পড়িয়া যায়; কত লোক যে সে যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল তাহা গণনা করা কঠিন।

সেই সৈন্যদলের মধ্যে আমার একটী বন্ধু ছিল,—সে রামদীন্। আমি তাহাকে ঠিক ভায়ের মতই ভাল বাসিতাম, স্নেহ করিতাম; সেও যে আমায় তেমনি ভাবে স্নেহ করিত সে কথা আমায় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রামদীন্ আমার অকপট মিত্র ছিল।

আমাদের দলের যিনি সেনাপতি ছিলেন রামদীনের সহিত তাঁহার কোন দিনই মনের মিল ছিল না। কি জানি কেন তিনি তাহাকে একবারেই দেখিতে পারিতেন না—মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার নাম ছিল সেনাপতি আদভ। লোকটা ভারী বিলাসী ও কুচরিত্র। রামদীনও কখন তাঁহাকে সুনজরে দেখে নাই—তাঁহার ছায়া মাড়াইতেও সে ঘৃণা বোধ করিত।

আমরা যখন গুপ্তচরের মুখে শুনিলাম, শত্রু আমাদের গ্রামের প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে ছাউনী ফেলিয়াছে তখন আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরাও যথা সম্ভব যুদ্ধের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলাম। যে রূপেই হউক শত্রুকে পরাজিত করাই তখন আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য;—আমরা সংকল্প করিলাম প্রাণ দিয়াও আমরা আমাদিগের এ উদ্দেশ্য সাধন করিব,—দেশের ও প্রভুর মান রক্ষা করিব। কিন্তু তখন জানিতাম না যে ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগের প্রতিকূল!

রাত্রি তখন ঠিক কত আমি জানি না। হঠাৎ আমার বস্ত্রাবাসের মধ্যে কাহার পদশব্দ হইল। সেইমাত্র আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,—সে শব্দে আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; দৃঢ় মুষ্টিতে পিস্তলটা চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে?"

স্পষ্টস্বরে উত্তর হইল,—"আমি রামদীন?"

আমার একটু উৎকণ্ঠা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রামদীন্ তুমি? এত রাত্রে হঠাৎ আমার কাছে—ব্যাপার কি? শত্রুরা শিবির আক্রমণ ক'রেছে নাকি?"

"না ভাই সে রকম কিছু নয়, আলোটা জ্বাল আমি ব'লচি।"

আমার যথেষ্ট কৌতূহল জন্মিল। আমি আলো জ্বালিয়া রামদীনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। কি দেখিলাম? দেখিলাম তাহার মুখ দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণায় পূর্ণ! আমি সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি বল দেখি?"

"আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

"বিদায় নিতে এসেছ? এত রাত্রে? কেন, কেন, হঠাৎ তোমার হ'ল কি? আমি যে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। হ'য়েছে কি বল দেখি?"

"নতুন কিছুই নয়, সেই পুরাণ ঝগড়া। আজ হঠাৎ সেনাপতির সঙ্গে আমার বচসা হয় তাতে তিনি আমায় বাঁদির বাচ্চা ব'লেচেন আমি কিন্তু এর জন্যে তাঁকে কখনও ক্ষমা ক'রব না। প্রতিজ্ঞা ক'রেচি তাঁরই রক্তে মা'র এ মিথ্যা কলঙ্ক মুছব। আমার প্রতিজ্ঞা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রব।"

আমি তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলাম, "প্রকৃত মানুষের কাজই ত এই! তা হ'লে এখুনি তুমি যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ—এখুনি, এখুনি। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে না। আর দেখ, আমার ত' মনে হয় খুব সম্ভব কালই তোমাদের সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ বাধবে।"

"হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু সে যাই হোক তুমি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছ ব'লে আমাদের বন্ধুত্ব বোধ হয় যাবে না! অন্ততঃ আমার ত' এই ইচ্ছে যে যেখানেই তুমি থাক আজীবন আমরা পরস্পরকে বন্ধু ব'লে মনে ক'রব।"

"এ কথা না ব'ল্‌লেও চ'লত। আমি তোমায় ঠিক ভাইয়ের মতই ভাল বাসি। আমার বিশ্বাস এই যুদ্ধে আমরা দু'জনেই ম'রব। কিন্তু মরবার আগে আমায় একটা কাজ ক'ত্তেই হবে!"

"কি কাজ রামদীন?"

"সেনাপতি আদভের মাথা কাটা—এ কাজটা আমি নিজের হাতেই ক'রব।"

আমরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম। তাহার পর রামদীন অন্ধকারে মিশাইয়া গেল আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমাদের পূর্ব্ব অনুমান সত্যে পরিণত হইল। দেখিলাম শত্রুসৈন্য আমাদিগের শিবিরের অদূরে সজ্জিত হইয়া আমাদেরই অপেক্ষা করিতেছে! বেলা প্রায় নয়টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা প্রায় ছয়টার সময় একদল মুসলমান সৈন্য আমাদিগের অধীনস্থ সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। দেখিলাম রামদীনের অধীনে সে দল পরিচালিত হইতেছে,—তাহার পরিধানে তখন মুসলমান সেনানায়কের পরিচ্ছেদ!

কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর রামদীনের অধীনস্থ সেনাদল পরাজিত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল,—আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিলাম। কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে রামদীন তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিল,—স্বহস্তে গুলির আঘাতে সেনাপতি আদভকে নিহত করিল।

তাহার পর আরও বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। ভাগ্যদেবী ক্রমেই আমাদিগের বিপক্ষ পক্ষকে অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শেষে আমি সদলবলে বন্দী হইলাম। সে রাত্রির মত আমরা নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে আবদ্ধ রহিলাম। সেনাপতি আজ্ঞা দিলেন প্রাতে আমাদের গুলি করিয়া মারা হইবে।

কতক্ষণ পরে মৃত্যুর দূতরূপে প্রভাত আসিয়া আমাদিগের কক্ষে দেখা দিল।

আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

একজন রক্ষী আসিয়া আমাদিগের পরিচ্ছেদ খুলিয়া লইয়া এক একটা কৌপিন পরাইয়া দিল। আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এইবার বুঝি গুলি করা হবে?"

কি জানি কেন রক্ষী একটু নম্রস্বরে বলিল,—"না, এখনও তিন ঘণ্টা বাকি!"

আমার মন তখন রামদীনকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী আসিয়া আমাদিগকে বধ্যভূমে লইয়া চলিল।

তখন প্রায় শেষ মুহূর্ত্ত! মুসলমান

সেনাপতি আমার দলের একজন সৈন্যকে মুক্তি দিলেন। সে লোকটা দামামা বাজাইত—এই জন্যই তাহাকে ক্ষমা করা হইল। শুনিলাম সুলতানের আদেশ, বাদকদের হত্যা করা না হয়!

আমার তখন মুহূর্ত্তের জন্য একবার মনে হইল,—"হায়! হায়! আমি যদি কোন রকম বাজনাও বাজাতে জানতাম!" অবশ্য মুক্তি লাভ করিলে শত্রুদলে যোগ দিতে হইবে। তাহাতে কি? প্রাণটাত' রক্ষা পাইত! কিন্তু সে কথা ভাবিয়া ফল কি? আমিত গান বাজনার কিছুই জানিনা!

আমাদিগকে এক সারিতে দাঁড় করাইয়া আমাদের চোখ বাঁধিয়া দিল।

লক্ষ্য করিয়াছিলাম দশজন হত হইলে আমায় গুলি করা হইবে। অন্তিম কাল সন্নিকট বুঝিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া একে একে আমার পত্নী, পুত্র ও রামদীনের মূর্ত্তি ভাসিয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তেই গুলি করিতে আরম্ভ করিল।

এক! দুই!......

আর শুনিতে পাইলাম না। আমার শরীরের মধ্য দিয়া রক্তস্রোত দ্রুততর বেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমার সহজ জ্ঞান লোপ পাইয়া আসিল। অতি কষ্টে আমি দণ্ডায়মান রহিলাম। আবার বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। ওঃ! সে কি শব্দ! জীবনে আমি তাহা ভুলিতে পারিব না।—আমি কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না, কিন্তু তবু আমার মনে হইল গুলিতে আহত হইয়াছি! ঠিক সেই সময়ে কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। * * *

চক্ষু চাহিলাম!

কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল—"তবে বোধ হয় এখনও চোখ বাঁধা আছে।" চোখে হাত দিলাম; হস্ত আমার মুক্তচক্ষু স্পর্শ করিল। অদূরে একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। বুঝিলাম রাত্রি নয়টা আমি তখন একটী অন্ধকার ঘরে অবস্থিত। কাহার একটী ছায়ামূর্ত্তি আমার দিকে সরিয়া আসিল।

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার লোকেরা? কোথায় তারা?"

উত্তর হইল,—"কবরে।"

স্বর আমার চিনিতে বিলম্ব হইল না;—সে রামদীন্!

রামদীন বলিতে লাগিল,—"তোমার সাম্‌নেই সেনাপতিকে গুলি করি তা তুমি দেখেচ। তারপর ক্রমান্বয়ে লোক মারতে লাগলুম। ক্রমে অনেক রাত্রি হ'ল;—আকাশে চাঁদ উঠল। কিন্তু তোমায় কোথাও খুঁজে পেলুম না। শিবিরে ফিরে তোমার সন্ধান কল্লুম কিন্তু তোমায় দেখতে পেলুম না। খুঁজে খুঁজে শেষে হায়রাণ হ'য়ে পড়লুম;—ক্লান্তিতে শরীর অবশ হ'য়ে এল—ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর আজ যখন তোমার সঙ্গীদের গুলি করা হয় তখন আমার ঘুম ভাঙ্গল'। তার আগে আমি মনেও করিনি যে তুমি বন্দী হ'য়েছ। ছুটে বধ্য ভূমিতে এসে হাজির হলুম—দেখলুম আর দু'জনের পরই তোমায় গুলি ক'রবে। আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে তোমায় সেখান থেকে সরিয়ে আনলুম।

উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে বল্লুম,—

"এ লোক নয় সেনাপতি সাহেব এ লোক নয়।"

"কেন ? ও কি একজন বাজিয়ে নাকি ?

"সত্যি কথা ব'লতে কি নাগ্নি! কাণায় চোখ পেলে যেমন আহ্লাদিত হয় 'বাজিয়ে' কথাটা শুনে আমার ঠিক তেমনি আহ্লাদ হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বল্লুম,—"হঁ্যা সাহেব এ খুব একজন ভাল বাজিয়ে—ওদের দলের মধ্যে সেরা।"

"সেনাপতি গম্ভীর মুখে বল্লেন,—হুঁ, ও কি বাজায় ?"

"ও—ও—ও—হঁ্যা—ও বাঁশী, বাঁশী বাজায়।"

"সেনাপতি পিছনে ফিরে কাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, বাঁশীবাজিয়ে লোক আমাদের দরকার আছে কি ?"

"লোকটা পাঁচ সেকেণ্ড নিরুত্তর রইল—সেই পাঁচ সেকেণ্ড আমার কাছে পাঁচ যুগ ব'লে বোধ হ'তে লাগল।

"সে লোকটা ব'ল্লে—'হঁ্যা সাহেব, আমাদের বাঁশী বাজন্দার কাল মরে গেছে।'

"আমার দিকে ফিরে সেনাপতি বল্লেন, —'তবে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

"মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে আমি তোমায় এখানে নিয়ে এলুম।"

রামদীনের কথা শেষ হইল।

আমি বলিলাম—ভাই রামদীন্! তুমিই এ যাত্রায় আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেচ।"

"সে কথা এখন থাক—এখন বল দেখি তুমি বাঁশী বাজাতে জান ?

"জানি বটে, খুব সামান্য! সে কি আজকের কথা! সেই ছেলে বেলায় একবার একটু শিখেছিলুম। এখন তা আর মনে নেই ব'ল্লেই হয়।"

"তবে সত্যি কথা বলতে গেলে তুমি বাঁশী বাজাতে মোটেই জান না! হা অদৃষ্ট! এত ক'রেও তোমায় বাঁচাতে পারলুম না! যে মুহূর্ত্তে সুলতানের কাণে এ কথা পৌছবে সেই মুহূর্ত্তেই তোমায় গুলি ক'রে মেরে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক ব'লে আমারও প্রাণ যাবে।"

ইতিপূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যে আশার বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল রামদীনের কথা শুনিয়া সে ক্ষীণ শিখাও নিভিয়া গেল। বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, আমার ডাক ক'দিন পরে প'ড়বে ? আন্দাজ ?"

"প্রায় এক পক্ষের ভিতর তোমায় ডাক প'ড়বে।"

"এক পক্ষ ? ঠিক জান ?"

"হঁ্যা ঠিক এক পক্ষ পরে। তুমি ত' মোটেই বাজাতে জাননা আর এ সত্য যুগও নয় যে গাছের কাছে বর নিয়ে তুমি একেবারে হঠাৎ ওস্তাদ হ'য়ে প'ড়বে! কাজেই আমি বেশ দেখতে পাচ্চি আমাদের দু'জনকেই অবিলম্বে মরতে হবে।"

আমি বলিলাম,—"না ভাই রামদীন! আমি চৌদ্দ দিনের মধ্যেই বাঁশীতে ওস্তাদ হব—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেখো তুমি!

রামদীন বালকের মত সরল প্রাণে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

* * *

মানুষের মনের জোরের উপর তোমাদের

বিশ্বাস আছে কিনা জানি না কিন্তু আমার ঐকান্তিক আগ্রহে আমি সেই চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যেই বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। কেবল চতুর্দ্দশ দিবসে বলিলে ভুল হয়—চতুর্দ্দশ দিবারাত্রির মধ্যে আমি বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। সে সময়ে আমার আহার নিদ্রা ছিলনা,—শুধু বাঁশী, বাঁশী আর বাঁশী।

কি করিয়া শিখিলাম শুনিবে?

প্রথম যেদিন রামদীন আমায় নিরাশ সাগরে ভাসাইয়া দিল তাহার পরদিন প্রাতে আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতে করিতে অদূরে এক কৃষক যুবককে দেখিতে পাইলাম। সে গরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া এক মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম! সেই আমার গুরু। তাহার নিকট সেই দিবস কয়েকটী কৌশল শিখিয়া লইলাম। তাহার পর একটী নির্জ্জন উৎসের ধারে বসিয়া ক্রমাগত সাধনা করিতে লাগিলাম।

বাঁশী বাজাইতে শিখিলাম বটে কিন্তু মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারিলাম না;—বিকৃতি ঘটিল।

বাঁশী বাজানই আমার বাতুলতার প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িল। পূর্ণ তিন বৎসর কাল —অহরহ আমি বাঁশী বাজাইতাম।

রামদীন আমায় ত্যাগ করে নাই। যুদ্ধের অবসান লইলে আমরা রাজধানীতে গমন করিলাম। বাঁশী বাজাইয়া সেখানে আমি জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিলাম।

বাঁশীই তখন আমার আত্মা। আমার মনে হইত আমি এবং আমার বাঁশী উভয়ের মধ্যে কেবল দৈহিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাহার প্রতি অংশ আমারই অস্থিমজ্জা বলিয়া মনে হইত।

একদিন রাজসভায় আমার ডাক পড়িল। সুসজ্জিত সভাগৃহে দেশের গণ্যমান্য সকল লোকই উপস্থিত ছিলেন। আমি বাজাইতে লাগিলাম। কখনও করুণ কখনও হাস্য কখনও রুদ্ররসে সভাগৃহ বিচলিত করিয়া তুলিলাম। সমবেত কণ্ঠে আমার যশঘোষিত হইল। এই ভাবে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

সেই দুই বৎসর পরে রামদীন আমায় ত্যাগ করিয়া একাকী পরলোকের পথে যাত্রা করিল। তাহার মৃত মুখ দেখিয়া আমি যেন ঘোর নিদ্রার পর সহসা সচেতন হইয়া উঠিলাম।

শবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাঁশীটা একবার করুণ সুরে বাজাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা পারিলাম না। কোথায় ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ফুৎকার দিতে হয়, কোন স্থান টিপিয়া ধরিতে হয়, কখন কোন অঙ্গুলি তুলিতে হয় শত চেষ্টাতেও তাহা আর আমি মনে আনিতে পারিলাম না।

এখন আমি গীতবাদ্যে একেবারেই অজ্ঞ, অক্ষম!

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কপিলাবস্তু

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধদেব শাক্যমুনির জন্ম হইয়াছিল। এই কপিলাবস্তুকে মঙ্গোলগণ, "কাবিলিক্" এবং চীনগণ "কে-সিলো-ফা-সাটো" বলিয়া থাকেন। পালিভাষায় ইহাকে "কপেলা ভাস্নু," ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় "কপিলা-ভাট," শ্যামভাষায় "কপিলাপাৎ," সিংহলীয় ভাষায় কিম্বোলভাট" ও নেপালী ভাষায় ইহাকে "কপিলপুর" বলে। তিব্বতীয়গণ "সের-স্কাই- গ্রোং" রূপে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদের অর্থ, "যে দেশের ভূমি কপিল বর্ণ।"

চৈন বিবরণ অনুসারে এই নগর ভারতের উত্তরে, অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্গত। তিব্বতীয় গ্রন্থমতে কপিলনগর বা কপিলাবস্তু কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই কোশলই অযোধ্যা। শাক্যসিংহের জন্মের সময় মধ্য-ভারতের অধিকাংশ স্থানই মগধরাজ্যের অধীন ছিল; কোশলও সেই সকল রাজ্যের অন্যতম ছিল। তাই অনেকে বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুকে মগধের অন্তর্গত বলিয়াছেন। মগধ আবার বুদ্ধদেবের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, সেইজন্য বহু বৌদ্ধ তাঁহাদের বিধানকর্ত্তার জন্মস্থান মগধই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১)

তিব্বতবাসী বলেন, কপিলাবস্তু কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে ভাগীরথীর তীরপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। এ ভাগীরথী আধুনিক বঙ্গ-মধ্যে প্রবাহিতা ভাগীরথী নহে; আধুনিক রোহিনী নদীকে পূর্ব্বে ভাগীরথী বলিত। জাপানী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে (Encyclopedia) ইহা নেপালের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া লিখিত। একটী বৌদ্ধগ্রন্থ কাশী সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া ইহাকে কপিলাবস্তুর দক্ষিণে বলিয়াছেন, এবং জাপানী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া প্রদত্ত হিন্দুস্থানের মানচিত্রে "কিয়াপিলো" (কপিল) কাশীর এবং "অযুখো" (অযোধ্যা) বা "কি উশালো" (কোশল) রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী "ফা-হিয়ান" "কিজাও" (কান্যকুব্জ) হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে গমন করিয়া "কি উশালো" (কোশল) রাজ্যে উপস্থিত হইলেন ও তথা হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া তিনি—"কে-ওয়ে-লো-ওয়ে" (কপিলাবস্তু) নগরে আগমন করিলেন।

এই কথা অবলম্বন করিলে কপিলপুর নেপালস্থিত পর্ব্বতোদ্ভূত মহানন্দ সহযুক্তা রোহিনী নদীর তীরবর্ত্তী। রোহিনী গোরক্ষ-পুরের নিম্নে বাপ্তি নদীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে।

Hodgson নামক জনৈক ইংরেজ তাঁহার কৃত Essay on Buddhism প্রবন্ধে বলেন,—"Kapilavastu was situated near Ganga Sagar."

পাঠক উপযুক্ত উত্তর পাইয়াছেন ত? কোথায় বা সে বঙ্গদেশান্তর্গত গঙ্গাসাগর আর কোথায় বা কোশল রাজ্যের কপিলাবস্তু! সাহেব বোধ হয় রামায়ণে বর্ণিত কপিলাশ্রম-কেই কপিলাবস্তু বলিতেছেন।

(১) See Journal Asiatic Society, vol. I. P. 27.

আমরা যদি ফা-হিয়ানের "সে-ওয়ে" (Fyzabad) হইতে ভ্রমণ অনুসরণ করি তাহা হইলে আমাদিগের গমনের দিক হইবে দক্ষিণপূর্ব্ব। এই স্থান হইতে বোধ হয় আমরা গোরক্ষপুরের উত্তরে আসিতে সমর্থ হই না, আমাদিগকে গোরক্ষপুরের দক্ষিণেই অবস্থিতি করিতে হইবে। অতএব কপিলা-বস্তু ঘর্ঘরা বা গঙ্গার তীরদেশে বলিতে হয়।

কপিলাবস্তু সংস্থাপন সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শ্রুত হয়। প্রবাদটী এই,—

"এক সময় চারিজন রাজপুত্র বহু ব্রাহ্মণ, ধনী প্রভৃতি সহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অব-শেষে বারাণসীর এক দিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারি ভ্রাতা তথায় মন্ত্রণা করিতে বসিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যদি বলপূর্ব্বক পরের রাজ্য গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদিগের যশের যথেষ্ট অপমান করা হইবে।" তাঁহারা পরস্পরের যুক্তি মত একটী নগরের প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কতিপয় ব্যক্তি সহ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অপর তিনজন অবশিষ্ট ব্যক্তি সহ যোগ্যস্থান নির্ব্বাচনার্থ গমন করিলেন। অবশেষে তাঁহারা কপিল নামক একজন ঋষিকে হ্রদ সম্মুখবর্ত্তী প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের তলে নিরীক্ষণ করিলেন। ঋষিবর রাজকুমারত্রয়কে তাঁহাদের অভি-সন্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তখন মুনিবর তাঁহার সেই তপোবন নগরে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, "যখন শৃগাল শশকের দিকে ধাবিত হয়, তখন সেই শশক এই তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র শৃগাল প্রতিগমন করে। যদি কোন ব্যক্তি এইস্থানে বাস করেন, তিনি দেব ব্রাহ্মণের সুচক্ষে পূজিত হন; তিনি যুদ্ধ সময়ে বিপক্ষকে শীঘ্রই পরাজিত করিতে সমর্থ।"

রাজকুমারগণ ঐ স্থানেই নগর সংস্থাপন করিলেন এবং উহা শেষ হইলে মুনিবরের নামানুকরণে উহার নামকরণ করিলেন। সেই জন্য ঐ স্থান "কপিলাবস্তু" বা "কপিলপুর" বলিয়া কথিত।"

Mr. Turnour সাহেব বলেন, শাক্যমুনি রাজগৃহ হইতে কপিলাবস্তু দর্শনার্থ গমন করিলেন ও প্রতি দিবস এক যোজন পথ ভ্রমণ করিয়া দুইমাসে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণের পরিমাণ হয় ৬০ যোজন। (২)

যদি আমরা ৪ মাইলে একযোজন ধরি তাহা হইলে রাজগৃহ হইতে কপিলাবস্তু ২৪০ মাইল হয় এবং ইহা ফাহিয়ানের বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়। অতএব কপিলাবস্তু ঘর্ঘরা নদীর তীরে ও গোরক্ষপুর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে।

ফাহিয়ানের বর্ণনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় কপিলাবস্তু কুশি নগর হইতে ২৪ যোজন পূর্ব্বে ও ঘর্ঘরা নদীর তীরদেশে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীতারানাথ রায়।

(২) Journal Asiatic Society, vol. VII p. 791.

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, ঝামি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি।

ওয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

৩৭শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২০ [১০ম সংখ্যা

বাগ্দত্তা

(৪৭)

সত্যর বিবাহ, বিবাহে সমারোহ যথেষ্ট হইল, কিন্তু সুখ হইল না। শিবনারায়ণ চেষ্টা করিয়াও মানসিক গ্লানির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। কমলার প্রত্যেক স্মৃতিটি আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়া করুণাময়ীকেও যেন পোড়াইতে লাগিল, সকল উদ্যোগ আয়োজন যেন শোভাহীন নিরানন্দ ঠেকিতে লাগিল; কেবলই মনে হইতেছিল, কাহাকে না আনিয়া এ কাহাকে আনা হইতেছে? গভীর নিশ্বাস উঠিতে বসিতে বুকের মধ্য হইতে যন্ত্রণাকাতরধ্বনি করিয়া বলিতেছিল "মা কমল! আমার এ'কি করে গেলি মা! আমায় এ কি শাস্তি দিতে এসেছিলি?"

কিন্তু যাহার জন্য এ পরিবারের সকলে অসুখী তাহার আজ সুখের সীমা নাই, সে আজ যেন দশটা হইয়া খাটিতেছে। যেখানের যত চাষাভূষা, দরিদ্র, আতুর আজ সে তাহাদের সকলেরই অভিভাবক। কলিকাতা হইতে নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আসিয়াছে, পায়রা-ডাঙ্গার ছেলেগুলা জড় হইয়াছে, এখানকার পাড়াপ্রতিবাসীদের তো কথাই নাই; এই প্রকাণ্ড দলটি খাইতেছে যত খাটিতেছেও ততোধিক। মনীশের একটি অঙ্গুলি হেলনে ইহারা বোধ হয় আগুনে জলে ঝাঁপ দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। সকলেই কত বিষয়ে তাহার কাছে ঋণী তাহার ঠিক নাই। বিবাহের বরটিও কোমর বাঁধিয়া সকলের পরিচর্য্যায় লাগিয়া গিয়াছিল। কেহ তামাসা বিদ্রূপ করিলে বলিতেছিল, কি করব, দাদা খাটবেন, আর আমি বসে থাকবো?"

দাদার সুখ দুঃখে এখন সত্য নিজের সকল সুখদুঃখ নিমজ্জন করিয়াছে, নদী আসিয়া পারাবারে মিলিয়াছে।

এ বিবাহে ব্রাহ্মণ সজ্জন অনাথ অতিথের উপর যতটা খবর করা হইল, বাহ্যিক ধূমধাম ততটা কিছুই হইল না।

গাত্র হরিদ্রা হইয়া গেল, বরানুগমনের সকল উদ্যোগ প্রস্তুত, রাত্রিশেষে নান্দিমুখ,—সহসা অপরাহ্নে নন্দকিশোর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখে ঘোর অপরাধ সূচিত হইতেছিল, আদর

আপ্যায়নের সহিত ভাবী বৈবাহিক বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে এ সময় ?

নন্দকিশোরের কণ্ঠ শুখাইয়া গিয়াছিল মৃদুস্বরে তিনি কোন মতে কহিলেন "কি আর বলবো, আপনাদের নিকট আমার মুখ বার করতে লজ্জা হচ্চে—এই দেখুন আজই এই পত্র পেলাম—"

সে পত্র এইরূপ :—"সবিনয় নিবেদন, আপনার নিকট হইতে আসিয়া আমি বৈদ্যনাথ, কাশী হইয়া কানপুরে দুই দিবস যাপন করিয়া অবশেষে এইখানে আসিয়াছি। প্রথমে মনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু এখানে আসিবার পর সহসা একটা কৌতূহল জন্মিল। যে মেয়েটিকে আপনার নিকট দেখিলাম সেটি অসামান্য সুন্দরী, কিন্তু আমার পত্নী শ্যামাঙ্গিনী ছিলেন হয়ত কিছু ভ্রমও ঘটিতে পারে, এই সন্দেহে আমি আপনার গৃহের দাসদাসীগণের অনুসন্ধান আরম্ভ করি। রুকুনীয়া' নামে একটা দাসীকে আমি চিনিতাম সেই আমার মেয়েটিকে পালন করিতেছিল। অনেক অনুসন্ধানে তাহার খবর পাই, সে এখন কাজ ছাড়িয়া এখান হইতে সাতক্রোশ দূরে 'দেহাদে' ঘরে বসিয়া আছে, সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, এখন লিখিতেও লজ্জা পাইতেছি অথচ না জানাইলেও নয়। গৌরী বলিয়া যাহাকে আপনারা জানেন সে যথার্থ গৌরী নয়, সে বাস্তবিকই আপনার কন্যা, আমার কন্যা গৌরী মারা গিয়াছিল। কাপড় গুলা বোধ হয় তাহারই তাই এই ভয়ঙ্কর ভ্রমে আমি আপনার শান্তগৃহে বিপ্লব বাধাইয়া আসিলাম। কি আর বলিব আপনি সুধীব্যক্তি এ ঘটনার নীরত্যাগ করিবেন। কুশলাকাঙ্ক্ষী, শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষাল।"

পত্র পাঠান্তে শিবনারায়ণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পরে সসংজ্ঞ হইয়া কহিলেন "এখন উপায় ?"

নন্দকিশোর হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন, লজ্জায় তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। কি বিশ্রী কাণ্ডটাই তিনি হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় আচম্কা ঘটাইয়া বসিলেন, দুদিন ভাল করিয়া ভাবিলেও তো হইত।

কিন্তু বিধাতা আপনি যেখানে ঘটক সেখানে বিবাহ বন্ধ হয় না। ভোরের সময় যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট হইতে সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম আসিল তখন কর্ত্তব্যবিমূঢ় বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তার মুখে রক্ত ফিরিয়া আসিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ না চলিত থাকায় সমাজের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। আপনি প্রজাপতি সেই বাধা সমাজ হইতে বিদূরিত করিবার জন্যই এই নাট্যাভিনয় করিলেন। এ দেখিয়াও কি তোমরা এখনও দ্বিধা করিবে ? ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া ঈশ্বরের আদেশ কোন্ বিষয়ে কবে প্রচারিত হইয়াছিল ? গৌরী সত্য পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট, ইহাদের পবিত্র বন্ধনে সামাজিক অকল্যাণ দূর হউক, হিন্দু সমাজ প্রকৃত মঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাক্।"

এ যেন অলঙ্ঘ্য দেবাদেশ! শিবনারায়ণ কহিলেন "কি বলো বৈবাহিক!"

"আমার তো কোনই দ্বিধা নাই।" নন্দকিশোরের উত্তরে প্রসন্নচিত্তে শিবনারায়ণ উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, "আমারও বিন্দুমাত্র না। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চেয়ে শাস্ত্রাচার আমরা কি বেশী বুঝি? ঋষি প্রতিষ্ঠিত সমাজধর্ম্ম ঋষিদ্বারা সংস্কৃত হবে, আমরা এ'কে গড়িনি, আমাদের হাতে ভাঙ্গবেও না।

"তুমি সম্মত আছ মনীশ?" মনীশ সাগ্রহে উত্তর করিল "সর্ব্বান্তঃকরণে।"

বিবাহ হইয়া গেল, নন্দকিশোর অবশ্য তেমন করিয়া মেয়েলি কান্না কাঁদিতে পারিলেন না কিন্তু তাঁহার মন তেমনিই সুখে দুঃখে একটা অব্যক্ত কান্না কাঁদিতেছিল। মনীশকে ডাকাইয়া বলিলেন "মেয়েটি আমার একটু চঞ্চল তুমি ওর সব ত্রুটি শুধরে নিও।"

মনীশ মৃদু হাসিয়া কহিল "আপনাকে কিছুই বলতে হবে না আমরা ওঁকে আপনার চেয়েও বেশি চিনি।" কত দিন ছিপ কাড়িয়া লইয়া ভর্ৎসনা করিয়াছে, কতদিন অপক্ক ফল হাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, সেই সব স্মরণ করিয়া, সে নবদম্পতির পানে চাহিয়া একটু খানি স্নেহের হাসি হাসিল। সেই দুরন্ত বাল্যসঙ্গী দুইটী আজ নম্রশিরে লজ্জাবনত মুখে চিরসঙ্গী রূপে আবদ্ধকরে দাঁড়াইয়া। মনীশের দৃষ্টি গভীর আনন্দের জলে ঈষৎ ঝাপ্সা হইয়া আসিল।

ফুলশয্যার গভীররাত্রে নিদ্রিতা বধূকে জাগাইয়া সত্য কহিল "তোমায় একটা কথা বলি গৌরি, সবচেয়ে দরকারী কথা, তাই সব আগে বলচি। আমার দাদাকে তুমি খুব ভক্তি করো, তিনি যেন কখন তোমার পরে ঈষৎ মাত্র অসন্তুষ্ট না হতে পারেন।" গৌরী অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না কিন্তু কথাগুলার ভাবে ও স্বরে যেন একটু থমকিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ অনুভব করিল, যে সত্যর জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া ফিরিতেছিল এ সত্য যেন সে সত্য নয়! একটু ভীত হইল, বিস্ময়ও বোধ করিল—মানুষ এত বদল হয়! নিজেও যে সে অনেকটা বদলাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এ গম্ভীর প্রতিজ্ঞার অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলেও ইহা দ্বারা সম্মোহিত হইয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিল "আচ্ছা!"

মনীশের ত্যাগ মনীশের মহত্ত্ব মনীশের স্নেহ তাহার স্নেহাধার ভাইয়ের মনে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। পুত্রের মধ্যে শিবনারায়ণ পুনর্জ্জাত হইয়াছিলেন। এমনি করিয়াই মানুষ অমরত্ব লাভ করে, ইহাই বংশ গৌরব!

(৪৮)

বৃক্ষরোপণান্তে সারা বৎসর ধরিয়া জলসেকাদি দ্বারা তাহাতে একটি দুইটি করিয়া কতকগুলি ফুল ফুটিলে সেই কুসুমচয়নে গাঁথা মালাগাছি কণ্ঠে ধারণ মাত্রে যদি তাহার মধ্য হইতে একটা অতি বিষাক্ত কীট বাহির হইয়া বক্ষে দংশন করে তাহা হইলে মনে যেমন একটা বিস্ময়বিমূঢ় ভাবের সহিত ক্ষোভের ধিক্কার উঠে ফুলশয্যার রাত্রে নবপরিণীতার ব্যবহারে শচীকান্তের চিত্তেও ঠিক সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। বাহিরের ঘরে চৌকিতে বসিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া যতই সে এ ভাবনাকে

প্রতিকূল যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিতেছিল, ততই যেন সেগুলাকে ক্ষুরধারে কাটিয়া এই মর্ম্মদাহকারী দুশ্চিন্তা আপনাকে অক্ষয় কবচে আঁটিয়া তুলিতেছিল। পাষাণে প্রাণ সঁপিয়াছিল এমন মূর্খ সে! এই কল্পনার স্বর্গ! এই কমলা! হায় সুন্দর! তোমার অন্তরে বাহিরে কি সকল সময়ই এমনি ভেদ!

মনকে বাঁধিবার কোন সূত্র ছিল না তথাপি হাল ছাড়িলেও চলে না, অপ্রিয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা সংবাদ পত্র টানিয়া লইয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু হায় মনকে কে ফিরাইবে! সে যে দেশের ছোটলাট, বড়লাট এমন কি সমন্ত্রিসভা সসাগরা ভারতের একছত্রা অধীশ্বরীর কোন সংবাদই আমলে না আনিয়া নিজের কান্নাই কাঁদিতে চাহে। সহসা—একি! একি সংবাদ! সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এও একটা ইন্দ্রজাল, না অপর সকল ঘটনারই মত বাস্তব! বড় বড় অক্ষরে ভিতর দিকে শেষ কলমে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে—"করালীচরণ! কমলাকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনো, যাহা চাহ অঙ্গীকার করিলাম।" নীচে সাঙ্কেতিক অক্ষর যাহা আছে তাহাতে শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আন্দাজ করা অসঙ্গত হয় না।

কাগজখানা ভূমিতে ফেলিয়া শচীকান্ত আনত কাতরদৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিল, এমন সময় ভৃত্য জানাইল, মাঠাকুরাণী ডাকিতেছেন। এখন! অসময়ে! কেন!

গিরিজাসুন্দরী গৃহমধ্যে একাই ছিলেন, প্রবেশপথে অধো দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া ভক্তিনাথ! বজ্রপাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এ সময় একদিন যে নিশ্চিত আসিবে ইহা সে জানিত এবং এই সময়টা যত বিলম্বে আগমন করে ততই মঙ্গল, মনে মনে ক্রমাগত এই প্রার্থনা থাকিলেও যতক্ষণ না আসিতেছিল তাহাতেও যেন শান্তি পাইতে ছিল না।

ঝড়ের পূর্ব্বে আকাশে বাতাসে নদীতে যে ভাব ব্যক্ত হয় মানুষের মনের মধ্যে যখন ঝড় আসন্ন তখন তাহার বাহিরটাকে ঠিক তেমনি নির্ব্বাতনিষ্কম্প দেখায়। মাসিমা কহিলেন "তুমি যাকে বিয়ে করেছ সে মেয়ে চাকদায় থাকত?" তাঁহার স্বর স্থির গম্ভীর। অপরাধী কহিল "হ্যাঁ"।

"সে গাঙ্গুলীদের মনীশের বাগ্দত্তা?"

"না, সে বাক্‌দান যথার্থ বাক্‌দান নয়, তার বহু পূর্ব্বে এর ভাই আমার সঙ্গে বাক্‌দত্ত হয়েছিলেন।"

তবে যথার্থই ও মেয়ে রাঢ়ীশ্রেণীর, তুমি স্বীকার করলে?"

পতনোন্মুখ অশনি এবার গর্জ্জিয়া উঠিল "হতভাগা ছেলে এই করতে তুই আমার কাছে এসেছিলি! সভার মাঝখানে আমার মুখখানা একেবারে পুড়িয়ে দিলি!"

আত্মসম্মানে পূর্ণদৃষ্টি জমিদার গৃহিণীর দুই নেত্রে আগুনের হলকা ছুটিয়া গেল। "কত বড় বংশের বংশধর তুই—কি মহাপুরুষের সন্তান একবার ভাবলি নে। এত বড় একটা দাগ মহাপাতক একটা ছেলেখেলার মতন অনায়াসে করে গেলি! তুই আমাদের শচি? দুধের ছেলে তুই, তোর মধ্যে এত বড় প্রবঞ্চনা একি ভাবতে পারা যায়!—"

রুদ্ধকণ্ঠে সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। মাতৃহৃদয়ের নারীহৃদয়ের সমস্ত বেদনা হতাশা

এক কালীন্ ব্যাকুল বেগে তাঁহার রোষানল উদ্দীপ্ত বক্ষের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। নির্ব্বাক্ অভিমানে তিনি তখনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন রত্নপুকুরের অবস্থা বলিবার নয়। পল্লীগ্রামের দলাদলি যাঁহার জানা আছে এমন একটা কাণ্ডে সেখানকার অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে কেবল তাঁহারাই তাহা ধারণা করিতে পারিবেন। বৌভাতের যজ্ঞ দেখিতে দেখিতে দক্ষযজ্ঞের আকার ধারণ করিল। গৃহিণীর বহু যত্নেও এ ঘটনা শত কর্ণ সহস্র কর্ণ হইতে মুহূর্ত্তাধিক কালব্যয় হয় নাই।

তখন ভোজনশীলগণ ভোজ্য দ্রব্য সকল চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া ঘোর রোলে উঠিয়া পড়িল। রান্না ঘরে বড় বড় হাণ্ডায় ডাল ভাত পুড়িয়া তীব্রগন্ধে দশদিক ভরাইয়া তুলিলেও নামাইবার প্রবৃত্তি কাহারও হইল না। অনেকে সহর্ষে লুণ্ঠন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল,—বারণ করিবার কেহই নাই। ভদ্র, অভদ্র, বালক, বৃদ্ধ, মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে মিলিয়া কেবল একই ঘোঁট, ঐ একই কথা। দেখিতে দেখিতে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে কমিটী বসিল, ছড়া বাঁধা হইল, রাস্তায় রাস্তায় এই অপূর্ব্ব মিলন সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল, জমিদার বাড়ী ও সে বাড়ীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এক ঘরে করা এক বাক্যে সাব্যস্ত হইয়া গেল।

দেশটা যখন হাস্যে রহস্যে কুৎসায় ভাসিতেছিল কর্ম্মগৃহের মধ্যে তখন অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতার তালে এক মহাবিচ্ছেদের সূচনা জাগিয়া উঠিতেছিল। ক্ষীর, দধি, মৎস, পায়স, ব্যঞ্জন টুকিয়া একটা অসহনীয় গন্ধ নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতেছিল। যাদুমন্ত্রে পাষাণে পরিণতবৎ উৎসবানন্দময় গৃহ গভীর নিস্তব্ধ। যে যেখানে আছে যেন গঠিত মূর্ত্তিবৎ জমিয়া আছে। প্রাণের স্পন্দন চলিতেছে, অথচ শরীরে যেন প্রাণের কার্য্য নাই। সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে কাহার মৃত্যুশয্যা ঘেরিয়া তাহার শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

গিরিজাসুন্দরী হবেন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন "দোষ সবারি শুধু এখন ওকে দুষলেই বা হবে কেন? বিয়ে দিয়ে আনলে কোন বাড়ী থেকে, তার খবরটুকুও কেউ নিলে না, এইজন্যই বলে বুড় হলে সংসারে থাকতে নেই। এখন এর বিহিত কি স্থির করলে কেউ?"

এই বিষয়েই এত পরামর্শ চলিতেছিল, উপায় স্থির না করিয়াও কেহ স্থির ছিল না, কেবল মুখ ফুটিতেই একটু বাধিতেছিল। এখন ভরসা পাইয়া পুরাতন ভৃত্য মাথা চুলকাইয়া বলিল "ব্যাপারটিতো বড় সোজা নয় গড়িয়েও গেল অনেকখানি—"

"ভূমিকায় দরকার নাই, যা হয়েচে তা তুমিও দেখছ, আমিও দেখতে পাচ্চি; যা হবে সেইটেই এখন সবাই ভাবো।"

"হবে,—হ্যাঁ তাই তো ভাবা হচ্চে—তা আমি ওদের ঘরে ডেকে আনচি"

হরচন্দ্র সরিয়া পড়িল। পরক্ষণে বাসন্তীর মাতামহ, শিশিরের পিতা ও দেশের গণ্যমান্য দলপতি ও পরামর্শদাতাগণ অনেক ছন্দোবন্দে অন্তরালে সমাগত গৃহিণীকে জানাইলেন যে তাঁহার ঘরের কলঙ্ক নিজেদেরই মনে করিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহারা চুপ করিয়া

আছেন কিন্তু এত বড় কাণ্ডটাকে তো তাই বলিয়া চাপিয়া যাওয়া চলে না, তাহাতে সমাজ একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এখন অবহিত হইয়া যতশীঘ্র সম্ভব এ কলঙ্কের দাগ ধুইয়া নির্ম্মল হইতে হইবে। বিধান জিজ্ঞাসায় কহিলেন, যা সব চেয়ে সোজা, ঐ কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া শচীকান্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক স্বঘরে বিবাহ করুন্, সকল গোল মিটিয়া যাক্।"

গিরিজা একটু নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়েটির দশা কি হইবে?"

"ঐ রাঢ়ীর মেয়ের! কি হইবে? বাপের ঘরে গিয়া থাকুক। কোন্ ভাল কুলীনের ঘরের মেয়ে রাঢ়ী বারেন্দ্রের ঘরে শ্বশুর ঘর করিয়াছে!" মাসিমা ভাবিলেন হায় শচি! অভাগিনীর জন্মটা খোয়াইয়া দিলি, কি করিলি রে! কিন্তু এ ভিন্ন উপায়ই বা কি? গোপনে উহার খোরপোষের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিব, কিন্তু ঘরে লওয়াও তো চলে না, সমাজ তো আগে।

বাসন্তীর মাতামহ এ দলের অগ্রণী, শচীকান্তর উপর ক্রুদ্ধ হইবার তাঁহার কারণও আছে। মনের মত বর যখন পাওয়া যাইতেছে না তখন এই বর্জ্জন কার্য্যটা সমাধা করাইয়া ছান্‌লা তলার বন্দীশালায় এই অবাধ্য যুবককে বাঁধিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। প্রস্তাব করিলেন এ সকল কার্য্যে বিলম্ব অবিধেয়, প্রত্যূষেই রাঢ়ী কন্যাকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, শচীকে একবার ডাকাইয়া কথাবার্ত্তা স্থির করা হউক।"

এ যুক্তিতে সকলেই সায় দিলেন।

পাশের ঘরে পদশব্দ শোনা গেল, শচী প্রবেশ করিল, না জানি ঘৃণায় লজ্জায় তাহার মনের মধ্যে কি রকমই হইতেছে। গিরিজা কবাটের কাছে একটু সরিয়া আসিলেন।

বিজ্ঞ বিচারপতিগণ যথেষ্ট ভূমিকা সহ বক্তব্য বিষয়টি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন যা করেছ এমন কেউ কখনও করেনি, কানেও কখনও শোনা যায় না! কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি; হায় হতোস্মি করলেও আর যা হয়েছে তার বদল হবে না। এখন এর একমাত্র উপায়—ভ্রান্তি মিটিয়ে নেওয়া। ঐ কন্যাটিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণান্তর পুনর্ব্বার দ্বার গ্রহণ করিলেই সকল দোষ খণ্ডন হয়ে যায় আর সে ঘটনা যত শীঘ্র ঘটে ততই পাপ কম। আগত ভোরের ট্রেণে হরচন্দ্র ঐ রাঢ়ী কন্যাকে যথাস্থানে রাখিয়া আসুন। পঞ্জিকায় প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহের দিন দেখা যাক্। এ পুণ্যাহ মাস শুভদিনের অভাব হবে না, কি হবে ছেলেমানুষ বয়সের গরমে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে, তা এক রকম করে শুধরে দেওয়া যাবে। এ ত আর পরের ঘরের কথা নয়—।"

গিরিজা উত্তর শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন—সংক্ষিপ্ত উত্তর "না"।

চমকিয়া উঠিয়া তিনি গৃহভিত্তির উপর দেহভার রক্ষা করিলেন। সকলে কহিল, "কি? না! ত্যাগ করবে না?"

"না" আবার শচীকান্ত কহিল "কি অপরাধে ত্যাগ করব বলে দিন?"

"অপরাধ? প্রথম সে রাঢ়ীশ্রেণী, দ্বিতীয় অন্যের বাগদত্তা, তৃতীয় উন্মাদগ্রস্তা, ইহার প্রত্যেকটিই ত্যাগের প্রকৃষ্ট কারণ, শাস্ত্র ও আইন সঙ্গত।"

"সে উন্মাদ নয়, দ্বিতীয়তঃ সে আমারই বাগ্দত্তা—ইহার প্রমাণ আমার বাবাকে পত্র লিখিলেই পাইবেন। তৃতীয়তঃ রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। পথের দুর্গমতার ভেদবাধা ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে এ ভেদ বাধা কেন না দূর হবে?"

"তুমি চালাইবে না কি? ভট্টনারায়ণই পারিলেন না তুমি তো তুমি! শাস্ত্রে ও দেশাচারে মিল থাকে না, শাস্ত্রাপেক্ষাও কুল-প্রথাকে এদেশে বড় করে দেখা হয়। রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিবাহ দোষের না হতে পারে কিন্তু অপ্রচলিত।"

তর্ক চড়িতেছে দেখিয়া শচীর জেদও চড়িল, সে কহিল "প্রথম ইংরেজি শিক্ষার আমলে কেহ ছেলেকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতে চাহিত না, ট্রেণে চাপিত না, কলিকাতায় যাইত না, ডাক্তারি শিখিত না, এখন এ সকল দেশাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা অন্যায় নহে, পাপ নহে বরং সমাজের পক্ষে শুভ। তাহা প্রচলিত করিবার জন্য প্রথম দুএক জনেই চেষ্টা করে তাহার জন্য পীড়িতও হয়, ইহা অনিবার্য্য, আমি জানি আমি ঠিকই করিয়াছি। কমলা আমার প্রথম বাগ্দত্তা।"

কি নির্লজ্জ! হা রে শিক্ষাগর্ব্বিত আধুনিক ছেলে! গুরু লঘু জ্ঞানও বিধাতা তোদের নিকট হইতে হরিয়া লইয়াছেন। বুড়াদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতে সঙ্কোচও বোধ হয় না! বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণচিত্তে বিচারকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তা হলে তুমি তোমার এই অসিদ্ধ বিবাহের পত্নীকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নও?"

"সে আমার ধর্ম্মপত্নী।"

"বেশ ধর্ম্মের অর্থটা ভালই হৃদয়ঙ্গম করেচ!" গৃহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। "আমাকে আর কিছু বলবার আছে?" "তোমায়? কি বলব! তোমার মাসিমাকে এই বলবার আছে যে যদি তিনি তোমার ধর্ম্মপত্নী সমেত তোমার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন তাহলে এ ঘরের সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত! আমরা শাস্ত্র সমাজ লোকাচার সবই মেনে থাকি এখনও এতদূর আলোক পাইনি তো! আহত বক্ষ ফাটিয়া বাহির হইল "তাই হোক্"।

রাত্রি হইয়া আসিল বাহিরের ও ভিতরের গোলমাল কিছুই কমিল না আপন গৃহের মধ্যে বহুক্ষণ পদচারণ করিয়া শচীকান্ত এই কিছুক্ষণ মাত্র বিছানায় আসিয়া শুইয়াছে। ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল না, চলিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল! যে প্রতীক্ষিত কালের জন্য প্রভাতে মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সে ব্যাকুলতা আর নাই। মন এখন জ্যোৎস্নামধুরা যামিনীর সুখশয়ন ছাড়িয়া বন্ধুহীন প্রবাসের অসহায় অবস্থা স্মরণে শুকাইয়া উঠিতেছে।

ইহার মধ্যে অনেকখানি ঘটিয়া গিয়াছে। মাসীমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কথাবার্ত্তাও হইয়াছে, উপসংহার ভালরূপ হয় নাই। কমলাকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভব নয় একথা সেও বুঝে, কিন্তু ইহার মীমাংসা মাসিমাও ঐ একইরূপ করিতে চাহেন! শুধু ভরণ-পোষণ ভার!—হরি তাঁহারা যদি বুঝিতেন! শেষকালে তিনি কাঁদিয়া উঠিয়া গেলেন, বলিলেন "তুই যদি এমন করে আমার মায়া কাটাতে পারিস্ তবে আমিই কি আর পারিনে! যা ধর্ম্ম হয় কর!"

সে এ বেদনাদগ্ধ অভিযোগের উত্তর

দিতে পারে নাই। বড়ই বাজিয়াছে। মাসিমার স্নেহ তাঁহার অপরিসীম করুণা মঙ্গল কবচের মতই তাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছে। এতখানি সে আর কোথায় পাইত! সেই মাসিমা আজ কাঁদিয়া বুকে টানিতে চাহিতেছেন, সে বাহুপাশ তবু কাটিতেই হইবে। বড় পাষাণের কাজ!

অতি ধীরে কে গৃহে প্রবেশ করিল, শচী দেখিল কল্যাণী! "দাদা!" মুহূর্ত্তে সে আসিয়া তাহার কোলে মুখ লুকাইল "দাদা আমাদের সব মায়া কাটাবে দাদা?" এবার পাষাণ টলিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রুঝরিয়া তাহার মস্তকে পতিত হইল। সহানুভূতিহীন এ সংসারে এই একটি করুণার উৎস কঠোর বিচার দৃষ্টির বাহিরে একটিমাত্র স্নেহশীতল দৃষ্টি। এ যে অপার্থিব ধন! ছোট বেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কথা তাহার ঝটিকা-উদ্বেল বক্ষের মধ্যে উঠিতে পড়িতে লাগিল। "দাদা সত্যি যাবে?" "কি করি কল্যাণ! বলে দেনা?"

"দাদা!"

"কলি তুইও তো ওই কথা বলবি? ও ছাড়া আর কোন দণ্ড তোরা দিতে পারিসনে?" কল্যাণী মুখ তুলিল "না দাদা ওকথা আমি বলি না, কিন্তু কেন এমন হলো দাদা! এ কি করলে?"

"আমায় আর বকিসনে কল্যাণী! আমি আর বরদাস্ত করতে পারচিনে। সবাই মিলে আর বলিসনে আমি পাপ করেচি। এর আর একটা দিক হচ্ছে, সমাজের কুপ্রথাচ্ছেদ, সত্যপালন, অনাথার প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিকার! এগুলো কি সত্যই এত তুচ্ছ? আর যে যা বলে বলুক শুধু তুই বল্ যে, না, তুমি পাপ করনি, তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ তোমারি।"

(৪৯)

আকস্মিক বজ্রাঘাতে বিহ্বলতা জন্মায়, কিন্তু সেই বিদ্যুদগ্নি যখন লোলরসনা বিস্তৃত করিয়া গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসে তখন মুহূর্ত্তেই জড়ত্ব ঘুচিয়া যায়। কমলা চুপ করিয়া বসিয়া সবই দেখিল, কানের কাছে যাহা পৌঁছিল সকল কথাই শুনিল কিন্তু ইহাতে তাহার মধ্যে বড় একটা ভাবান্তর ঘটিল না, সে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে কোন বিষয়ে ভালমন্দ বিচার শক্তি তাহার কোথায়? এ বাড়ীতে এই রহস্যময় অভিনয়ের অভিনেত্রীরূপে আজ সে সংস্র কৌতুক দৃষ্টি ও শত ব্যঙ্গপূর্ণ রসনার লক্ষ্য! বিদ্রূপ, কুৎসা, অভিশাপ ধারাকারে তাহার মস্তকোদেশে বর্ষিত হইতেছিল, তাহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

কিন্তু যখন আশপাশের লোকেরা ঘটনার পরিচয় দান করিতেছিল তখন সহসা সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কি যে ঘটিয়া গিয়াছে এতদিনের পর আজই সে যেন ইহা প্রথম অনুভব করিল। তাহার লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া বহু পূর্ব্বের কি যেন একটা ঘটনা স্মৃতিপথে টানিয়া আনিতেছিল, আবার ভক্তিনাথের গৃহে, নৈহাটি ষ্টেশনে—সেই অর্দ্ধোচারিত তাহারই নাম—এ সবই যেন একটা ধারাবাহিক ঘটনার সামঞ্জস্য রাখিয়া আসিয়াছে! আর কে এই তাহার জীবনের শনিগ্রহ! দুষ্ট ধূমকেতু! সে নাকি কাশীর সেই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের,—তাহার

আরাধ্য দেবতার আত্মজ! বিশ্বনাথ! এর চেয়ে অঘটন ঘটনা আর কি কিছু ছিল না!

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে কল্যাণী আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল "বউ!" একি সম্বোধন! সে কোন্ গৃহের বধূ? উত্তর না পাইয়া ননন্দা অধিকতর স্নেহে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল "বুঝেছি বউ তুই কেন অমন আজ বুঝেছি, তোর জন্য আমারও প্রাণ কাঁদচে ভাই"।

এবার আর সহিল না সেই সহানুভূতিপূর্ণ বক্ষে পড়িয়া সে প্রাণফাটা কান্না কাঁদিল।

গভীর রজনীর অন্ধকারে উষ্ণ প্রস্রবণের বন্যাধারায় জড়ত্ব কাটাইয়া লুপ্তচেতনা লুপ্ত স্মৃতিকে লইয়া জীবনব্যাপী হাহাকার মাত্র সম্বলে আবার জীবন জাগিয়া উঠিল।

দিনের আলো না জাগিতে বিজয়ার আয়োজন হইয়াছিল, নহবতের সানাই সারাদিনই বন্ধ আছে, গাছের পাখী তখনও ডাকে নাই, কল্যাণী ডাকিল "বউ"! কি জানি সহানুভূতিপূর্ণ নারী চিত্তে কি আছে তাহা পাষাণকেও প্রাণ দিতে পারে, পাষাণী কহিল "আর কিছু বলো, আমি কমলা—." "না তুমি আমার বড় আদরের বউ। ভাই অনেক তো বুঝলাম; হিন্দুর মেয়ের স্বামীই সব স্বামীদ্বেষিণী হয়ো না; অতীত ভুলে যাও, ঈশ্বর সাক্ষ্যে যাঁকে বরণ করেছ তাঁকে কায়মনে গ্রহণ কর।"

ঠিক কথাই বলিয়াছ কল্যাণি! ঈশ্বর সাক্ষ্যে যাঁহাকে স্বামী বলিয়া মনে স্থান দিয়াছি তাঁহাকে কে দূরে সরাইতে পারিবে! হিন্দু মেয়ের দুবার বিবাহ হয় কি?

বিদায়ের অশুভ মুহূর্ত্ত দেখা দিল। কমলা যখন শুনিল সে এখানেও স্থান পাইবে না, যাহার সঙ্গ তাহার পক্ষে হিংস্র শ্বাপদাপেক্ষা ভয়াবহ এ বিশ্বে একমাত্র তাহারই বাহু তাহার অবলম্বন! তখন তাহার বজ্রাহত প্রাণও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কল্যাণী অজস্র অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে যখন গাড়িতে তুলিয়া দিতে লইয়া চলিল, সে তখন আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, সব ভুলিয়া তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিল—"তোমার মনে দয়া মায়া আছে আমায় এমন করে তোমরা তাড়িয়ে দিও না, তোমার মাকে ডাকো, তাঁর পায়ে ধরে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করবো দেবেন না কি? কল্যাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরে স্তব্ধগম্ভীর মুখে গিরিজা সুন্দরী আসিলেন। কমলা তাঁহার পা ধরিয়া বলিল "আমায় তোমার এই বাড়ীর একটা কোণে পড়ে থাকতে দাও মা, তোমার পায়ে ধরচি আমায় বিদায় করোনা, আমার এ জগতে আর স্থান নেই।"

গিরিজার স্ফীতনাসা. আরক্ত নেত্র, সজল জলদ তুল্য মুখ তাঁহাকে যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কোন মতে পা সরাইয়া লইয়া পরুষ কণ্ঠে কহিলেন "কেন বাছা মায়া বাড়াও! তোমার স্থানের অভাব কি! মূর্খের হাতে ত পড়নি আমারই যাহোক সর্ব্বনাশটা করলে। বাছাকে আমার—" বলিতে বলিতে অশ্রুজলের কম্পনে গলা ধরিয়া ক্ষোভে ক্রোধে হতাশায় অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন "এমন করে তোকে বিদায় দিতে হলো বাবা আমার!"

দাসী আসিয়া সহানুভূতিহীন কঠিন হস্তে একপ্রকার টানিয়া আনিয়া গাড়ির মধ্যে তাহাকে পুরিয়া দিতেই গাড়ির কবাট সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। সেই রুদ্ধ কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া গেল। সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে কমলার শ্রুতিশক্তিহীনপ্রায় কর্ণে প্রবেশ করিল "তোমারও কেহ নাই; আমিও আজ নির্ব্বান্ধব। আজ থেকে শুধু আমরা পরস্পরের, আর সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট!"

৪৯

বিবাহের সাত আট মাস পরে শচীকান্ত ডেপুটি কলেক্টরের পদ লইয়া সদর হইতে দরিয়াপুর সবডিবিসনে বদলি হইয়া আসিল। এ পদটুকু পাইতে তাহাকে এ কয়মাস ধরিয়া বড় অল্প শ্রম করিতে হয় নাই। সমস্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিয়া সে খাটিয়াছে, নিজের প্রতিও তিলমাত্র মমতা ছিল না। সে শ্রমের ফলও ব্যর্থ হয় নাই ইহার বলে অতি অল্পদিনেই সে ঊর্দ্ধে স্থান লাভ করিয়াছে।

এতদিনে অবসর মিলিল, এইবার আঃ! রণশ্রান্ত জীবনকে অনাবিল শান্তি বারি পান করাইয়া জীবনটা শুধু উপভোগ করিতে চায়! রত্নপুকুর ত্যাগ করিয়া আশ্রয়হীন অবস্থায় বন্ধু নলিনাক্ষের সাহায্য না পাইলে বোধ হয় এই উচ্চ পদ প্রাপ্তি ঘটিত না। এতদিন তাহার মায়ের কাছে কমলাকে রক্ষা করিয়া সে সংসার ক্ষেত্রে যুঝিতে দাঁড়াইয়াছিল। আজ সফলপ্রযত্ন হইয়া গচ্ছিতধন ফিরাইয়া আনিল। এপর্য্যন্ত কমলার সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নাই, বন্ধুগৃহে কোনদিন সে তাহার সহিত দেখা করিতে সাহসও করে নাই, পাছে বন্ধুর সাক্ষাতে কমলার অনাগ্রহ সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু ভক্ত বন্ধু ইহাকে খুব বৃহৎ করিয়াই দেখিয়াছিল; তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল "কর্ত্তব্যের কাছে কমলাও কিছু নয় এমন মনের বল তোমার!" এই বলিয়া সে তাহাকে প্রণাম করিল।

দরিয়াপুরের সাবডিবিসন অফিসারের বাংলা খানি ঠিক বাংলা নয়, তাহা একখানি অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। চারিদিকে সবুজ শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে শুভ্র গৃহটী চিত্র হিসাবে অতিসুন্দর। এ গৃহের সাজসজ্জাতেও কোন ত্রুটি ছিল না। সাধ্যাতীত ব্যয়ে গৃহস্বামী তাহার যথাস্থানে যাহা থাকা উচিত তাহাই সাজাইয়া ছিলেন। এই নূতন সজ্জিত নবীন সংসারে শচীকান্ত তাহার বধূ আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিল। তার পর এত দিনকার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল "এই তোমার ঘর সংসার দেখে নাও, আর আজ থেকে আমাকেও তোমার কাছে টেনে নাও,—কমল কাছে নাও বড় দূরে রয়েছি, অনেক তফাতে রেখেছ, আর না সরে এস।"

তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া নবীন গৃহস্বামী গৃহে ফিরিল। সিঁড়ির পথে, বারান্দায়, ঘরে কেহ কোথাও নাই। ছাদে,—না ছাদের সিঁড়ি ত নাই? ওই যে একটা ঘরের কবাট রুদ্ধ! কমল! খোল কমলা! ঘর নিঃসাড়া, দ্বার ছিদ্রহীন। তাহার শরীর মন ভয়ে অবসন্ন হইয়া আসিল। নীচে আসিয়া নব-নিযুক্তা দাসীকে জিজ্ঞাসায় জানিল দ্বিপ্রহর হইতেই দ্বাররুদ্ধ, অভুক্ত আহার্য্য

নীচেই পড়িয়া আছে। তবে বিষ খাইয়াছে নাকি? গলায় দড়ি দেয় নাই তো? দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল "কমলা, কমল দরজা খোল, শোন?"

পুনঃপুনঃ আহত হইয়া দ্বারের খিল ভাঙ্গিয়া খুলিয়া গেল। উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকিয়া সে ভীত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—ওই না কমল খাটের দাণ্ডা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ছুটিয়া কাছে আসিল—কই কিছু তো পরিবর্ত্তন দেখা যায় না! উদ্বেলিত বক্ষে কহিল "কিছু করনি তো?" উত্তর না পাইয়া সবলে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল "বলো বলো বলো।"

হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় কমলা স্থির কণ্ঠে কহিল "না।" —যথেষ্ট। "কমল! এ রকম কেন করচো?" কমলা সরিয়া দাঁড়াইল, সে নেত্রে একটা স্থূল না হোক্ সূক্ষ্ম দাহিকা শক্তি বিদ্যমান ছিল শচীকান্ত হাত ছাড়িয়া কিছু হটিয়া গেল। ক্ষোভের সহিত সে কহিল "কমলা আমার সঙ্গে তুমি কিন্তু অন্যায় ব্যবহার করচো, বলে দাও তোমার কাছে আমার কি অপরাধ? নিষ্ঠুর মামার কাছ থেকে উদ্ধার করায় কৃতজ্ঞতাও কি একটু নাই? একদিন তো তুমি এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলে?—সেদিন ওই জড় বালা দুগাছা যে আদর পেয়েছিল তার একটু কণাও কি আজ আমি পেতে পারি না? শুধু অবহেলা করবে? কেন. তোমার তো আমি কোন ক্ষতি করিনি!"

এত কথা বুঝি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না, সাপে কামড়াইলে যে অবস্থা হয় কমলাকে ঠিক সেই অবস্থাপন্ন দেখাইল। সে যে এতদিন কি ভুল স্বপ্ন দেখিতেছিল,—কি মন্ত্রে কাহাকে পূজা করিয়াছে তাহা আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে সে হস্তস্থ কঙ্কন দুগাছা খুলিয়া সবেগে ভূমে নিক্ষেপ করিল। সেই সঙ্গে এমনি করিয়া আছড়াইয়া নিজেকে চূর্ণ করিবার প্রবল ইচ্ছাটাই শুধু জোর করিয়া চাপিয়া রখিল। হায় আশা! হায় প্রতীক্ষা! সবই ব্যর্থ হইয়াছে! আগাগোড়া সবই ভুল! মনীশের প্রতিও একটা অসহায় ক্রোধে বুকের মধ্যে ধুধু করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! এতটুকু শেষ স্মৃতির সুখও তুমি তাহাকে দিলে না!

শচীকান্ত এ ব্যবহার দেখিল—তাহার মর্ম্মে ঘা পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ সেই অনাদৃত উপহারের পানে তাকাইয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল— "বুঝেছি তুমি ভুল বুঝেছিলে,—মনে করেছিলে মনীশের এই উপহার! তাই তার অত সম্মান! তখন আমি নিজের স্বপ্নেই ভোর তাই ভাবিও নাই এরও অপর অর্থ থাকা সম্ভব! হরি হরি মনীশ কিনা সেই রকম! সে যাই হোক তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি জিজ্ঞাসা করি? তোমার দাদা আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরে মনীশের কাকা আমার সঙ্গে ঝগড়ায় তাঁদের বাক্‌দান ফিরিয়ে নেন,—তুমি ধর্ম্মতঃ আর এখন লোকতঃ আমারই কমলা। কমলা! অতীত ডুবে যাক্ ভুলভ্রান্তি মিটিয়ে ফেল, বারে বারে আর আঘাত করোনা। অনেক প্রাণের জ্বালা আছে তুমি যদি একটা মিষ্ট কথা বল সব জুড়িয়ে যায়—।"

কে কোথায়? পাষাণী উপেক্ষার বাণে সব ব্যাকুলতা কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন শচীকান্ত কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"আমায় দেখে ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় কোন অপ্রিয় কথা বলতে আসিনি। আমার মধ্যেও একটা মানুষের প্রাণ আছে, তুমি সেইখানে আঘাত করেছ। আমি বলতে এসেছি তোমার অনাহারে অনিদ্রায় কষ্ট পাবার দরকার নেই, আমি তোমার পরে সকল দাবী ছেড়ে দিলাম। যেদিন তুমি নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হবে সেই দিন আবার তোমার কাছে এসে দাঁড়াব। সেদিন যত দেরিতেই আসুক,—একদিন আসবে এ আমি তোমায় বলে রাখচি। আর আমিও সে জন্য প্রতীক্ষা করতে অসহিষ্ণু হবো না। একদিন তোমার এই ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, সেদিন তুমি বুঝতে পারবে তুমি মনীশের নও আমার।"

মানুষের সুখ দুঃখ দিয়া নিয়মের কোন ব্যত্যয় করা যায় না। এই আকর্ষণহীন, নিরানন্দ নির্ব্বান্ধব গৃহে কমলার দিন কাটিতে লাগিল। আশাহীন, প্রতীক্ষাহীন, কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসর, যদিও কাটিতে বাকি থাকে না, তথাপি যেন ক্রমেই তাহা অসহ্যাপেক্ষা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। মানুষের একটা কিছু চাই, কিন্তু তাহার কোথায় কি! ঘর সংসার আছে, তাহার কর্ম্মকাজও নাই এমন নয়, করিলে সবই আছে কিন্তু করিবার ইচ্ছাই যে নাই, তাই জগতে কিছুই নাই। আছে শুধু অনন্ত চিন্তা সমুদ্র! সীমাহীন ভাবনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া অব্যক্ত বুকটা যন্ত্রণায় কেবলমাত্র লুণ্ঠিত হওয়া ভিন্ন আর কিছু নাই। গভীর অভিমানে সারা প্রাণ ঘুরিতে থাকে, বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসে, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া বলে এই তোমার দয়া! এই বিচার তোমার! কে বলে তুমি দয়াময়! নিষ্ঠুর, পাষাণ তুমি! কি পাপে আমার এ দুর্গতি করিলে! আবার মধ্যে মধ্যে কুহকিনী আশা আশাহীন চিত্তে কুহকের আলোক জ্বালাইয়া তুলে, নিরাশান্ধকার বর্ত্তমানের মাঝখানে অতীত আসিয়া দেখা দেয়। সেই আশ্বাস-বাণী কাণে বাজিয়া উঠে, মনের মধ্যে আশ্বাস সংগ্রহ করিয়া সে দৃঢ়চিত্তে ভাবে, নাই পাইলাম, এ জীবনের শেষে আর কি কিছুই নাই? সারাজীবনের পূজায় কি সেখানেও পাইব না? এ সম্বন্ধ কখনও ভাঙ্গিবে না। গৃহিণীর কথা মনে পড়িয়া যায়, সেই একটি সাধনার সঙ্কেত মনে জাগে, আকুল অশ্রুজলের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে করযোড়ে বলে "যেন পাই ঠাকুর, আর যেন বঞ্চিত হইতে না হয়,—সেখানে যেন পাই।" দিনের পর দিন কাটিতে থাকে, রাত্রি নীরবে চলিয়া যায়।

শচীকান্তেরও দিন কাটে। সমস্ত দিন আফিসের কাজে হাঁফ লইবার অবসর সে রাখে না। চারিদিকের উদ্দীপনার মধ্যে সুখ দুঃখ ডুবাইয়া কেবল কাজ করে! টেবিলের উপর বামবাহু স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অবিশ্রান্ত কলম চালাইয়া গাদা গাদা তাড়াবন্দী কাগজ লেখা হইলে সে যখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কেদারা ছাড়িয়া উঠে তখন মাতালের মত পা দুখানা টলিয়া পড়িতে থাকে। তার পর ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া টমটমে চড়িয়া যখন বাড়ীর দিকে ঘোড়ার বল্গাটা টানিয়া ধরে তখন ঠিক তাহার মনের

রাশখানাও তেমনি করিয়া সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। পরিশ্রমের সকল ক্লান্তি অপনীত হইয়া হৃদয় যেন একটা উৎসাহের হাওয়ায় তাজা হইয়া উঠে। কোনমতে পথটা কাটাইয়া বাড়ীর যত নিকটবর্ত্তী হয় মনটা আবার ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। প্রতিদিন নিরাশ হইয়াও প্রত্যহ একবার উপরের ঝিলমিলির দিকে চাহিয়া দেখার লোভ সম্বরণ অনিবার্য্য হয়, কিন্তু সেখান হইতে কেবলমাত্র একটা তীব্র ব্যর্থতার লেখা চোখের উপরে জ্বলজ্বলিয়া উঠে, আর কিছুই না। নীচের ঘরে কাপড় ছাড়িয়া একখানা আরাম চৌকির উপর হাত পা মেলিয়া শুইয়া পড়ে। তার পর? হায় তাহার বুঝি আর পর নাই। অজস্র চিন্তা, তীব্র অনুতাপ, আত্ম-গ্লানি, আরো কত কি তাহা বলিবার নয়। তবুও সেখানে একটা আশা ছিল, একটা মুগ্ধ প্রতীক্ষা ছিল। একদিন যে এই নীরব সহিষ্ণুতা কমলার বিমুখ চিত্ত তাহার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে এ সম্বন্ধে সে দৃঢ় নিশ্চিন্ত। কিন্তু সেদিন কবে আসিবে? ওগো কবে? কত দূরে—কত দূরে সে ভবিষ্যৎ? জীবনের এ পারে না ও পারে? হে ঈপ্সিত হে প্রার্থিত! এসো এসো, আর যে পারা যায় না, দেখা দাও ওগো দেখা দাও!

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

দাইতোকোরো

জাপানী ভাষার দাই অর্থ প্রধান এবং তোকোরো অর্থ স্থান। দাইতোকোরো অর্থাৎ রান্নাঘর। বাস্তবিক রান্নাঘর যে গৃহের প্রধান স্থান তাহাতে আর সন্দেহ কি। রান্নাঘরের ক্রিয়া দুই একদিন বন্ধ রাখিলেই জগতে প্রলয় উপস্থিত হয়। জাপানীদের আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অনেকের ধারণা জাপানীরা নিরামিষভোজী। আবার কেহ কেহ নিরামিষ আহার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনার্থে কখন কখন সংবাদ পত্রে লিখিয়া থাকেন—নিরামিষভোজী জাপানীরা প্রবল পরাক্রান্ত রুষকে জলে স্থলে পরাভূত করিয়াছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আজ উহাদের রান্নাঘর ও আহার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। জাপানীগণের সুদৃঢ় গঠন এবং পোষাক পরিচ্ছদের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, না জানি উহারা ক্ষীর সর নবনী কত কি খায়, কিন্তু রান্নাঘর এবং আহার্য্য দেখিলে মনে হয় কি করিয়া উহারা এত হৃষ্টপুষ্ট। ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সকলেরই রান্নাঘরে একইপ্রকারের আসবাব, বাসনপাত্র। ঢালাই লোহার একটি চুলা একটি মাটির ক্ষুদ্র চুলা (শিচিরিণ), এবং ভাত রাঁধিবার পাত্র, এবং দুই একটা কাঠের বালতি ইহা ছাড়া রান্নাঘরের মেজের উপর অন্য কোন আসবাব দেখিতে পাওয়া

জাপানীদের রান্নাঘর।

যায় না। ঘরের এক পাশে এক তাকের উপর কয়েকটি চীনা মাটির পেয়ালা, ভাত তুলিয়া খাওয়ার জন্য কয়েকটা কাষ্ঠ ফলক (হাসি), ছোট ছোট কয়েক খানা প্লেট, এবং চীনা মাটির কেটলি (দোবিন্‌) এতদ্ব্যতীত সব্জী কাটিবার জন্য ছোট একখানা কাঠের পিঁড়ি এবং একখানা কাটারি। এই হইল উহাদের রান্নাঘরের সমস্ত শরঞ্জাম।

প্রতি প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা, রান্না করিতে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কাঠ কয়লা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক দিন হইতেই ধূম নির্গমের জন্য বিজ্ঞানসম্মত চিমনি উহাদের রান্নাঘরে সংযোজিত। বড় বড় সহরে যেখানে জলের কল আছে সেখানে রান্নাঘরের ভিতরেই পাইপে জল নেওয়ার বন্দোবস্ত রাখা হয়। এমন কি অনেক জায়গায় গ্রামের ভিতরও বাঁশের পাইপের সাহায্যে রান্নাঘরে জল লইতে দেখিয়াছি।

ভাত উহাদের প্রধান খাদ্য। সকলেই আতপ তণ্ডুলের ভাত খাইয়া থাকে। উহাদের ভাত অতি সুস্বাদু। উহারা ফেন গালে না। উহাতে আমাদের ভাতের চেয়ে শ্বেতসার অধিক থাকিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোকিও কৃষিকলেজের এক অধ্যাপক ভারতে ধান্যকৃষি পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন, সে সময়ে আমি ঐ কলেজেই ছিলাম। তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর একদিন আমাদের ক্লাশেই ভারতের ভাত ও চাপাটি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতাকালে যে সময় তিনি বলিলেন যে, ভারতবাসী চাউলের সহজ পাচ্য সারফল নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয়। তখন ক্লাশের সমস্ত ছাত্রই আমার দিকে তাকাইয়া হাততালি দিতে লাগিল। আমি হয়ত কিছু মনে করিতে পারি—অধ্যাপকমহাশয় তাই বিষয়টা অন্য-ভাবে চালাইতে প্রয়াস পাইয়া আমাকেই ভাত রান্নার প্রণালী বর্ণনা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম "সম্ভবত অধ্যাপক মহাশয়

রাস্তা ঘাটে ষ্টেশনে, এখানে ওখানে সাধারণ লোকের ভিতর ভাত রান্না দেখিয়া আসিয়াছেন, ভদ্র পরিবারের ভিতর দেখিবার সুযোগ পান নাই।" যাহা হউক এই উত্তরে সেদিন সহাধ্যায়ীর হাত হইতে কোনরকমে নিস্তার পাই। বাস্তবিক আমাদের ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই লঘুপাক এবং পুষ্টিকর খাদ্য ভাতের ফেনটা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ভাতের পরই মুলা। মুলা ২।৪ টুকরা না খাইলে উহাদের খাওয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় বলিয়া মনে করে। প্রায় বার মাসই মুলা পাওয়া যায়। চালের কুঁড়া এবং লবণের সাহায্যে প্রকাণ্ড কাঠের পিপাতে মুলা পচাইয়া রাখা হয়। সে মুলার গন্ধে ভারতবাসীকে নাকে কাপড় দিতে হয়। গরীব লোকের প্রধান আহার্য্য ভাত, সবুজ চার জল এবং কয়েক টুকরা মুলা। এর উপর যদি কখন ঘটিয়া উঠে উহারা মাঝে মাঝে ডালের কোন জিনিস কিম্বা মাছ খাইয়া থাকে। জাপানে ডালে অনেক রকম জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিষ্টক, মিঠাই এবং উহার শ্বেতসারে অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর তোকু নামক খাদ্য প্রস্তুত হয়।

জাপানে অনেক রকম মাছ পাওয়া যায়। সে দেশে ছোট ছোট নদীর সংখ্যা বিস্তর। আমরা সামুদ্রিক মাছ আদৌ পছন্দ করিতাম না। জাপানীরা এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ কাঁচাই খায়। এই মাছ পাতলা পাতলা টুকরার আকারে কাটিয়া কেকের মতন সাজাইয়া রাখা হয়। ইহাকে ছাসিমি বলে। কোন কোন ভোজে ইউরোপ এবং আমেরিকাবাসীকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত ছাঁসিমি খাইতে দেখিয়াছি। এ মাছ অতি নরম এবং জাপানের একটি উপাদেয় খাদ্য। আমরা অনেকেই উহা স্পর্শ করিতেও সাহসী হই নাই। এক প্রকার সুবৃহৎ সামুদ্রিক মাছ আছে তাহার নাম মাগুড় জাপানের কই মৎস্য অতি সুস্বাদু। কই এর ন্যায় অন্যান্য নদীর মাছ আমরা সকলেই বেশ পছন্দ করিতাম। আমাদের জাপান-জীবনের প্রথম অবস্থায় আমরা একদিন চাকরাণীকে কি কি মাছ পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় কই, মাগুড়, তাই প্রভৃতি অনেক মাছের সে নাম করিল। আমরা তখন এগার জন ভারতবাসী এক সঙ্গে থাকিতাম।

আমাদের একজন বন্ধু, চাকরাণীকে, প্রত্যেকের ২টি হিসাবে ২২টি কই মাছ আনিতে আদেশ দিলেন। চাকরাণী কই মাছওয়ালাকে ডাকিয়া আনিলে সকলেই উৎসুক হইয়া কই মাছ দেখিতে নীচে নামিয়া আসিলাম। মাছ দেখিয়া সকলেই অবাক। রুই মাছের মতন বড় ২২টি মাছ আনিয়া হাজির। জাপানী কই আস্বাদনেও রুই মাছের মতনই। যাহা হউক ২টি মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ২০টি ফেরৎ দেওয়া গেল।

শুষ্ক মাছ জাপানীদের আর একটি উপাদেয় খাদ্য। উত্তর প্রদেশ হইতে তোকিও প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শুষ্ক মাছ আমদানী হইয়া থাকে। শব্জী রাঁধিবার বেলায় প্রায়ই উহারা শুষ্ক মাছ চাঁচিয়া চাঁচিয়া উহার কণা তরকারীতে মিশাইয়া দেয়। আলু, কপি, বেগুন, রাঙালু প্রভৃতি সকল রকম শব্জীই বিস্তর জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য মাছ এবং সব্জী জাপানে বেশ সস্তা।

মসলা উহাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

কোন কোন গাছপালার রস উহাদের মসলা। সে মসলার গন্ধ আমাদের নিকট বিটকেল। এমন কি প্রথম অবস্থায় জাপানী কলেজ বোর্ডিংয়ে ঢুকিয়া খাবার ঘরে গেলেই দুর্গন্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। প্রথম দুই তিন দিন কেবল নিজের ঘরে ফিরিয়া চা বিস্কুটে উদর পূর্ত্তি করিতাম। আমরা ক্রমে চাকর চাকরাণীদের আমাদের ধরণে রান্না শিখাইয়া লইলাম। ডাল তরকারী, চর্চ্চরী প্রভৃতি আমাদের ভারতীয় ধরণেই রাঁধিয়া দিত। জাপানীরা আমাদের মত তেল, ঘি, এবং লঙ্কা পছন্দ করে না। ঘিয়ের গন্ধে অনেকেরই বমির ভাব হয়। দুধ আজ পর্য্যন্তও সাধারণ লোকে অতি কষ্টে পান করিতে পারে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের এক ডাক্তার জার্ম্মানিতে ডাক্তারি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া দুধের উপকারিতা দেশবাসীর ভিতর প্রচার করেন। তদবধি অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঔষধের ন্যায় দুধ পান করিতে প্রয়াস পায়। আজকাল নব্যধরণের যাঁহারা তাঁহাদের দুধ ঘিয়ে ততটা অরুচি দেখা যায় না।

জাপানী রমণী তরকারি কুটিতেছে।

আমরা একদিন আমাদের ভাষাশিক্ষককে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। দেশের কয়েক রকম ডাল এবং ঘি মসলা আমাদের কাছে ছিল। জলযোগে লুচি, মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় লুচি দেখিয়াই অবাক। তিনি বলিলেন এই

গোলাকার স্ফীত এবং ফাঁপা জিনিসটির ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার কোনই রাস্তা নাই, কি উপায়ে এ বলের ন্যায় ফাঁপা জিনিস প্রস্তুত হইল। মোহন ভোগ মুখে দিয়া ঘিয়ের গন্ধে তিনি অস্থির। কাজেই এসকল আর তাঁহার খাওয়া হইল না। এলাচি, লবঙ্গ, মুগ এবং মুসুরের ডালের নমুনা দেখিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণ করিলেন।

আমাদের তোকিওস্থ বাড়ীতে এবং কাউন্ট ওকুমার বাড়ীতে অনেক গণ্যমান্য জাপানী ভদ্রলোক ভারতীয় ভোজে যোগদান করিয়াছেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া প্রভৃতি সকলের নিকট বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে, পোলাও এবং পায়স সর্ব্বসাধারণের নিকট তেমন প্রীতিকর হয় নাই যেহেতু ঘি এবং দুধের গন্ধ সকলে সহ্য করিতে পারেন না।

সই (Soy) এবং সস্ (Sauce) উহাদের অতি প্রিয়। উহাদের দেশীয় ঐ দুই জিনিসের গন্ধ যেন বিশেষ ধরণের। আমরা অনেকেই উহা তেমন পছন্দ করিতাম না। পিয়াজ এবং শাকশব্জীর পাতা কাটিয়া সই এবং সস্ মিশাইয়া সালাদ (Salad) খাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক বলিয়া মনে হয়। উহাদিগকে জল খাইতে বড় একটা দেখা যায় না। প্রায় সর্ব্বদাই উহারা গরম জলে সবুজ চা পান করিয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় এই চা আমাদের নিকট পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় বিটকেল লাগিলেও ক্রমে বেশ তৃপ্তিদায়ক মনে হইত। বিয়ার এবং মদ্য পানেও উহাদের বেশ আনন্দ হয়।

ভারতের অনেকেই মনে করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র অহিংসা পরম ধর্ম্ম; তাই বুঝি উহারা নিরামিষভোজী। কিন্তু তাহা নয়, জাপানীরা অতি মাত্রায় মাংসলোভী। শূকর, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি সকল রকম জন্তুর মাংসই উহাদের নিকট অতি উপাদেয়।
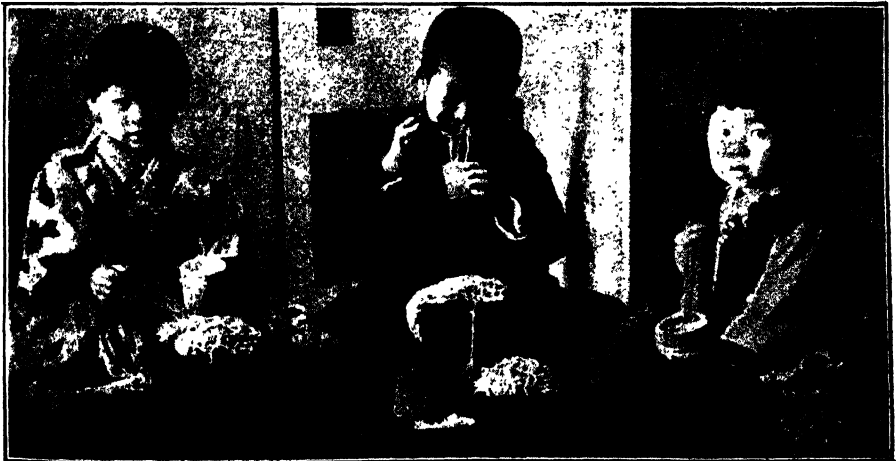
জাপানী শিশুরা আহার করিতেছে।

অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে যে উহাদের দেশে জীব জন্তুর সংখ্যা কম।

জাপানীদের প্রধান ভোজন দিনে তিনবার। সাধারণ জাপানীরা এই তিন বারই ভাত খাইয়া থাকে। আর নব্য ধরণের জাপানী মধ্যাহ্নে পাউরুটি খাওয়া পছন্দ করে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উহারা আহার করে। প্রাতে ছয়টা বা সাড়ে ছয়টায় দুপুরে বারটা বা সাড়ে বারটায় এবং সন্ধ্যায় ছয়টা সাড়ে ছয়টায় আহার করে। এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে চা পিষ্টক প্রভৃতি খায়। দুখানা কাষ্ঠফলকের সাহায্যে আহার করিলেও আমাদের চেয়ে অল্প সময়ে অধিক অন্ন ইহারা উদরসাৎ করিয়া ফেলে। উহারা বড় মিষ্টান্নভক্ত। বিলাতী ধরণের কেক ছাড়া চিনি এবং চাল ডাল চূর্ণ দ্বারা জাপানে একরূপ পিষ্টক প্রস্তুত হয় উহা সাধারণ সকলেই খায়।

জাপানে ফল প্রচুর জন্মে। এবং সকলেই ফল খাইতে বড় ভাল বাসে। অন্য দেশের লোকের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহারা এক সময়ে এক রকম জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে খায়। ফল খাইতে বসিলে হয় তো ছোট খাট এক ডালা ফলই একা নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে আবার মিঠাই খাইতে বসিয়া এক কাঁড়ি মেঠাই খাইয়া ফেলিবে।

জাপানীরা যেরূপ খাদ্যই গ্রহণ করুক আর যে পরিমাণেই গ্রহণ করুক উহাতে কোন অসুখ হইতে দেখি নাই। উহাতে স্বাস্থ্য দেখিয়া আমরা ঈর্ষা না করিয়া পারিতাম না।

শ্রীযদুনাথ সরকার

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৪)

তুকারাম ও রামদাস

তুকারাম ও রামদাস শিবাজী রাজার সমকালবর্ত্তী দুই মহাপুরুষ। তাঁহারা মহারাষ্ট্রের সাধু ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত। তাঁহারা সেই সময়কার লোক, যে সময়ে মারাঠা জনপদ অনেককাল মুসলমান আধিপত্যে অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও যবন অধিকারের ভিতরে এরূপ রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। যে দুইশত বৎসর মারাঠাগণ স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভকালের জাতীয় ধর্ম্মভাব এই দুই সাধুর জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়। রামদাস শিবাজীর গুরু ছিলেন, তাঁহার উপদেশ না লইয়া মহারাজ কোন মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তুকারামের সাধু জীবনীও শিবাজীর জীবনে সবিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

তুকারামের পবিত্র চরিত্র ও অলোক-

সামান্য গুণরাশি শিবাজীর শ্রুতিগোচর হওয়াতে মহারাজ স্বহস্তে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তুকারামকে রাজবাটীতে আনাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোকজন অশ্ব রথ রাজছত্র প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম প্রেরিত হইল কিন্তু তুকারাম মহারাজের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না। তিনি সেই সকল উপকরণ সামগ্রী ফিরাইয়া দিয়া রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গকে যে উপদেশপূর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহার সার মর্ম্ম এই :—

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল,
ইথে কেন জড়াইছ আমাকে ভূপাল!
ধনমান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি,
এ বিপদ হতে মোরে রক্ষা কর হরি!
ভাল যা না বাসি তাই চাও সঁপিবারে,
এ সঙ্কটে কেন বল ফেলিছ আমারে।
সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর রহিব একাকী।
মান দম্ভ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এ সব তোমারই থাক্, হে পাণ্ডরিপতি।

* * *

ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্য করিয়া প্রকাশ,
বিচিত্র শক্তির তাঁর করিলা আবাস।
পত্র প'ড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়—
সুচতুর, বুদ্ধিমান, গুরুভক্ত বড়।
লোকের ভাগ্যের সূত্র আছে তব হাতে
"শিব" এই পুণ্যনাম সেজেছে তোমাতে।
করি ধ্যান আরাধন, যাগ যজ্ঞ আর,
স্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার।
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন্,
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ।
হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তি-বিহীন,
বস্ত্রাভাবে ম্লানকায়, অন্নাভাবে ক্ষীণ।
জীর্ণ হস্তপদ অতি, দেখিতে কুৎসিত,
আমারে দেখিয়া তুমি না হইবে প্রীত।

* * *

আমি হে তোমারে করি এতেক মিনতি,
জানিহ হরির কৃপা আছে তোমা প্রতি।
পাণ্ডুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন,
নহে সে কৃপার পাত্র নহে দীন হীন।
পাণ্ড রঙ্গ রক্ষাকর্ত্তা, সহায় আমার,
ছাড়ি তাঁরে অন্য কারে নাহি মানি আর।
তোমার দর্শনে তবে কি হইবে ফল,
সংসার বাসনা যবে ছেড়েছি সকল।
বিসর্জ্জন করি দিয়া সব বাসনায়
পেয়েছি নিবৃত্তি-গ্রাম অল্প খাজনায়।
পতিব্রতা যেই প্রেম রাখে পতি পরে
মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে।
বিঠ্‌ঠলই সমস্ত বিশ্ব আর কিছু নাই,
তোমার মধ্যে ত তাঁরে দেখিবারে পাই।
রামদাস রয়েছেন সদ্‌গুরু অতি,
মনস্থির একমাত্র কর তাঁর প্রতি।
তুকা কহে "শুন ওগো বুদ্ধির আগার,
ভক্তি একমাত্র হয় ভক্তের উদ্ধার।"

* * *

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার,
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।
খাবার অভাব হয় খাব ভিক্ষা ক'রে,
বস্ত্র চাই, ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে প'ড়ে।
শয্যা মোর প'ড়ে আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ,
বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হ্রাস।
রাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায়?
মহতেরই তরে শুধু রাজার আলয়,
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথা মান্য নাহি হয়।
বসন ভূষণ আদি আড়ম্বর যত
দেখ সে আমার পক্ষে মরণের মত।

এই কথা শুনি তব রোষ যদি হয়,
তবু হরি মোর পরে রবেন সদয়।
হীনত্ব না ঘুচে করি যজ্ঞ উপবাস
যত দিন মন রহে বাসনার দাস।
তুকা কহে লোক মাঝে তোমাদের মান—
আমরা যে হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান।

* * *

এই একমাত্র যোগ করিও সাধন,
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা করো না কখন।
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন:
এমন কাজেতে মন দিও না রাজন্।
দুর্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তিদান,
তাহার কথায় কভু দিও নাক কাণ।
রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার।
পরীক্ষায় দোষ গুণ করিয়া বিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্ব্বল।
এই যে মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে।
দুই এক কাজ মাত্র মোর ব'লে জানি,
আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি।
এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্ব্বভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্যগুরু রামদাসে দেখহ আপন।
তুকা বলে "ধন্য ধন্য তুমি হে ভূপতি,
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্ত্তি ভাতি।"

* * *

চতুর মান রক্ষক তুমি প্রতিনিধি,
সত্বগুণনিধি তোমা করেছেন বিধি।
শুনহে মজুমদার লেখনী নিপুণ,
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ।
পেশওয়া, মুন্সি আর চিটনীস, ডবীর,
রাজজ্ঞ সুমন্ত আর সেনাপতি বীর।
তুমি হে পণ্ডিত রায় ভূষণ সভার,
বৈদ্যরাজ আদি সবে জান নমস্কার।
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়ে অন্তরে,
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপতিরে।
সাত্বিক প্রণয় ভরা, দৃষ্টান্তের কথা,
যা কহিনু যেন তার না হয় অন্যথা।
মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ,
বাক্যের স্বরূপ অর্থ ক'য়ো সবিশেষ।
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত,
তাহা হ'লে তোমাদেরি হইবে অহিত।
তুকা কহে "নমস্কার অধিকারীগণ,
জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন।"

তুকারামের পত্র পাঠে রাজা কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন—এমন কি, তিনি স্বয়ং সেই সাধুর আলয়ে গিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইলেন। কথিত আছে যে, বীরবর সেকন্দর বাদসা প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক দায়োজিনিসের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আনাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দায়োজিনিস তাঁহার নিকট গমনে অস্বীকৃত হইলে সেকন্দর নিজেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তুকারাম ও শিবাজী সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। ঐ সময়ে তুকারাম দেহুর নিকটবর্ত্তী লোহ-গ্রামে বাস করিতেছিলেন—মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্য রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন কিন্তু তুকারাম সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিলেন—বলিলেন "মহারাজ! সোনা রূপা আমার চক্ষে মাটির তুল্য, এ সকল বস্তুতে আমার লোভ হয় না। আমাদের মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে, আমি হরির দাস. হরিই আমার আশা ভরসা। মহারাজ, তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

শিবাজী তুকারামের নিস্পৃহতা ও অচলা দেবভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কালহরণ করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতা ঠাকুরাণী জিজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার পুত্রটিকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন— "ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সঙ্কীর্ত্তনের সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম্ম তাহার তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। প্রজাপালন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অতএব মহারাজ তাহাই অনুষ্ঠান করুন। সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা মহারাজের পক্ষে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই উপদেশ গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুযায়ী 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে যেমন অর্জ্জুনের, ইহাতে সেইরূপ শিবাজীর চৈতন্য হইল। তাঁহার বিষয় বৈরাগ্য দূর হইল, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

শিবাজীর প্রতিভাবলে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যের পত্তন হয়, তাহা অনতিকাল মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু শিবাজীর বংশজ রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার পুত্র শম্ভোজী ব্যসনাসক্ত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় জনৈক মোগল সর্দ্দার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকট ধরিয়া আনে। শম্ভোজীর প্রাণ রক্ষার্থে বাদসাহকে অনেক অনুরোধ করাতে সম্রাট বলিয়া পাঠাইলেন, "তোর জীবন মরণ তোর আপনারই হাতে। যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিস তবেই তোর প্রাণ রক্ষা, নতুবা জল্লাদের হাতে তোর প্রাণ দণ্ড হইবে।" শম্ভোজী উত্তর করিলেন, "বাদসা যদি আপনার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হন, তাহলে আমি মুসলমান হই।" এই উত্তরে ঔরঙ্গজীব ক্রোধান্ধ হইয়া শম্ভোজীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন।

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪

শম্ভোজীর পুত্র সাহু শৈশবকালে ঔরঙ্গজীবের হস্তে পড়িয়া অনেক বৎসর কারাবাস ভোগ করেন। বাদসার মৃত্যুর পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ্য ফিরিয়া পান কিন্তু মোগলদের মধ্যে সুদীর্ঘ কারাবাস প্রযুক্ত তাঁহাতে আর কোন পদার্থ ছিল না। নিজে রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম, সুতরাং ক্রমে সমস্ত রাজ্যভার সচিব প্রধান পেশওয়ার হস্তে সন্ন্যস্ত হইল। প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৪ সালে বালাজী প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নৃপতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। পেশওয়া পদ তাঁহার বংশানুগামী হইল। সাহু কেবল নামে ছত্রপতি, পেশওয়াই আসল রাজা।

শেষে এমন হইল সাতারার রাজা সাতারায় বন্দী, পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা। নূতন পেশওয়ার অভিষেক কালে অভিষেক বসন মহারাজের নিকট হইতে আনান হইত এই যা রাজমর্য্যাদার অবশিষ্ট রহিল। ১৭১৮ সালে বালাজী পেশওয়া সইয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পোষকতায় সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করেন। তার বৎসর দুই পরে দাক্ষিণাত্য রাজস্বের চৌথ আদায়ের বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করেন, তাঁহার প্রযত্নে পুণা ও সাতারার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে মহারাষ্ট্র রাজপতাকা বিধিমত বদ্ধমূল হইল।

বাজিরাও ১৭২১

বালাজীর পুত্র বাজিরাও দ্বিতীয় পেশওয়া। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতর সন্তান। হাইদ্রাবাদে নিজাম রাজ্য সংস্থাপক নিজাম আলি ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—ইহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত বাজিরাওএর দ্বন্দযুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু পেশওয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল উত্তর হিন্দুস্থান। মোগল রাজ্যের ভস্ম স্তূপের মধ্যে মহারাষ্ট্র জয়স্তম্ভ নিখাত করাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। একদা তিনি মন্ত্রীসভায় সাহু রাজাকে বলেন "এই আমাদের সময়। ভারতভূমি হইতে বিদেশীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জনের এই অবসর। শুষ্ক তরুমূলে কুঠারাঘাত কর, শাখা সকল আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে।" তাঁহার উৎসাহ বাক্যে সাহুর চিত্ত পিতামহোচিত জলন্ত উৎসাহে ক্ষণকালের নিমিত্ত উত্তেজিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন, "পিতার তুমি যোগ্য পুত্র, তুমিই স্বহস্তে মহারাষ্ট্র জয়ধ্বজা হিমালয় বক্ষে নিখাত করিবে। বাজিরাওয়ের বলবীর্য্যে মারাঠা রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল। ১৫ বৎসরের মধ্যে তিনি বাদসাহী মুলুক হইতে মালব ছিনিয়া লন ও বিন্ধ্যাচলের উত্তর পশ্চিম নর্ম্মদা হইতে চম্বল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৭৩৯ সালে পোর্ত্তুগীসদের নিকট হইতে বাসীন অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপর ইংরাজদের কটাক্ষ পড়ে। বাসীন বিজয়ানন্তর ইংরাজেরা সাহু রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতের প্রতি উপদেশ এই "রাজসভায় বাজিরাওয়ের শত্রু আছে কি না সন্ধান নিবে। তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুদলের ঈর্ষা জ্বালাইয়া দিবার সুযোগ পাইলে অমন সুবিধা যেন ছাড়া না হয়, কিন্তু সাবধান, দেখিবে তিনি যেন আমাদের শত্রু হইয়া না দাঁড়ান।" সে যাহা হউক, দৌত্য সফল হইল। ১৭৩৯ সালে পেশওয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বাণিজ্য প্রমুক্ত হইল। এই সন্ধির এক বৎসর পরে বাজিরাওয়ের মৃত্যু।

বাজিরাও রূপবান্, বীর্য্যবান্, অমায়িক, সরলান্তঃকরণ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি বীরোচিত কঠোর ব্রত পালন পূর্ব্বক আড়ম্বরশূন্য সহজ ভাবে চলিতেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। তাঁহার সহিত নিজাম-উল্-মুলকের প্রথম যুদ্ধারম্ভে নিজাম একজন সুবিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকাইয়া আদেশ করেন, "বাজিরাওকে গিয়াই যে ভাবে দেখিবে সেই ভাবে তাঁহার ছবি তুলিয়া আনিবে।" চিত্রকর

দেখিলেন, বাজিরাও বল্লম স্কন্ধে দুই হাতে জুয়ারীর দানা ভাঙ্গিয়া চিবাইতে চিবাইতে অশ্বপৃষ্ঠে সামান্য সেনার মত চলিয়াছেন, এই ভাবে তাঁহার ছবি তোলা হইল।

বাজিরাওয়ের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী তাঁহার উত্তরাধিকারী। তাঁহার দ্বিতায় পুত্র রঘুনাথরাও (রাঘোবা) মহারাষ্ট্রে যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহাই রাজ্যনাশের মূল। রাঘোবার পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও পিতার কার্য্য শেষ করিয়া রাজ্যের সমাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন।

নানা সাহেব

বালাজীর অপর নাম নানা সাহেব। নানার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রবল মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃৎকম্প উৎপাদন করে। ১৭৪১—৪২ সালে নাগপুর শাখার সেনাপতি ভোঁসলা বাঙলায় মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত লুটপাট করিয়া ফিরিয়া আসেন। আমাদের শিশু ঘুমপাড়ানী গান আর "মারাঠা ডিচ" নামক নগর সংরক্ষণী বর্গীদের উৎপাতের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৭৫১ সালে নবাব আলিবর্দ্দির নিকট হইতে তাঁহারা বাঙ্গলার চৌথ ও উড়িষ্যার অধিকার লাভ করেন।

জলদস্যু আঙ্গ্রে

নানার শাসন কালে ইংরাজেরা জলদস্যু আঙ্গ্রে দমনে পেশওয়ার সহযোগিতা করেন। পূর্ব্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিরা নবাবের আধিপত্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর মারাঠী সর্দ্দার আঙ্গ্রে তাহার স্থান অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত কানোজী হইতে রাঘোজী পর্য্যন্ত, আঙ্গ্রে বংশের আধিপত্য কাল। রাঘোজীর মরণানন্তর তাঁহার বংশ লোপ পাইয়া ডালহৌসী রাজনীতি অনুসারে আঙ্গ্রে রাজ্য ইংরাজ হস্তগত হয়। আঙ্গ্রের হস্তে ইংরাজদেরও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭২৪ ও ১৭৫৪ মধ্যে দুই ইংরাজ রণতরী আঙ্গ্রে কর্তৃক ধৃত হয়। কলিকাতাবাসীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাত ভয়ে সহরের চারি দিকে গর্ত্ত খনন করিয়া সুরক্ষিত হন, বম্বের বণিকগণও আঙ্গের আক্রমণ শঙ্কায় সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ সালে কানোজীর পুত্র তুলাজীকে দমন করিবার জন্য ইংরাজেরা পেশওয়ার সহিত যোগ দেন; পর বৎসরে সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ তাঁহার প্রধান দুই দুর্গ বিজিত হয়। সুবর্ণদুর্গ হারাইয়া তুলাজী সাগরপরিরক্ষিত বিজয়দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আডমিরল ওয়াটসন ও কর্ণল ক্লাইব মিলিয়া, ওয়াটসন জলে ক্লাইব স্থলে, আক্রমণকরত দুর্গ দখল করেন। অতঃপর ইংরাজ গবর্ণর বিজয়দুর্গ লাভ লালসে পেশওয়াকে বিস্তর অনুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে বোম্বায়ের দক্ষিণস্থ বাঙ্কোট ও অপর কতকগুলি গ্রাম উপার্জ্জনে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলেন। অপিচ পেশওয়ার নিকট হইতে এইরূপ বচন পাইলেন যে ওলন্দাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ ও বাসের অনুমতি পাইবে না তাহাদের বাণিজ্য পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন। পোর্ত্তুগীসের পতন ও মারাঠীদের সহিত উক্তরূপ সন্ধি স্থাপনবশতঃ

অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী য়ুরোপীয়জাতির মধ্যে ইংরাজদের প্রভুত্ব বলবত্তর হইয়া উঠিল।

নানা সাহেবের শেষদশা শোচনীয়। তিনি পাণিপতের যুদ্ধে স্বজাতির অধঃপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন—ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। ইহার পর নানা সাহেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। এই মর্ম্মান্তিক আঘাতে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি আস্তে আস্তে পুণায় ফিরিয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই পার্ব্বতী মন্দিরে দেহত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পেশওয়া বড় মাধবরাও

১৭৬১—৭২

নানার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাণিপতের যুদ্ধে মারা পড়েন; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধবরাও পেশওয়ার পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর। তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা পেশওয়াকে হাতে রাখিয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইবার প্রয়াসী ছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মাধবরাও স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক অসামান্য চাতুর্য্যের সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মারাঠাদের দিন দিন শ্রীসমৃদ্ধি দর্শনে ইংরাজেরা সশঙ্কিত কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা হাইদর আলির উপদ্রব নিবারণে সমুৎসুক। হাইদর দমনে মারাঠাদের সহিত সদ্ভাব বন্ধন প্রয়োজন সুতরাং তাঁহাদের মনোভাব যাহাই হউক সদ্ভাবব্যঞ্জক দৌত্য পাঠাইয়া পেশওয়াকে কোন মতে থামাইয়া রাখিলেন। যাহাতে হাইদরের বলপুষ্টি নিবারিত হয় সেই তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা। ইংরাজ দৌত্যের পাঁচ বৎসর পরে মাধবরাও লোকান্তর গমন করেন। তিনি সন্তান সন্ততি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার স্ত্রী রমাবাই অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, মৃতপতির অনুমৃতা হইয়া চিতানলে দেহত্যাগ করেন। মাধবরাও পেশওয়া ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত; বলবানের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সহায় ছিলেন। এই ন্যায়ী সাহসী প্রজাবল্লভ দৃঢ়মতি নৃপতি বিয়োগে রাজ্যের যত হানি হয়, পাণিপতের যুদ্ধেও তেমন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

নারায়ণরাও হত্যা

পঞ্চম পেশওয়া নারায়ণরাও, মাধবরাও এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাঘোবা কাকা তাঁহার অভিভাবক। মাধবরাও মৃত্যুকালে অনেক বলিয়া কহিয়া ভাইটিকে রাঘোবার হস্তে সঁপিয়া যান। কতককাল খুড়া ভাইপোর মধ্যে মৌখিক সদ্ভাব বজায় ছিল কিন্তু নারায়ণরাওয়ের মাতা গোপিকাবাই ও রাঘোবার পত্নী আনন্দীবাই এই দুজনে বনিবনাও ছিল না। মন্ত্রীবর্গের সঙ্গেও রাঘোবার মনান্তর; এই সকল কারণে তিনি প্রাসাদে বন্দীকৃত হইয়া রহিলেন। তদবধি তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। সেনাদের ঘুস দিয়া বশ করা তাঁহার প্রথম চেষ্টা। হঠাৎ একদিন গোল উঠিল পেশওয়ার সৈন্যদল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। নারায়ণরাও তখন প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন।

দ্রোহী দলের নেতা সমরসিংহ, তুলাজী শওয়ার নামক রাঘোবার অনুচর সমরংহের সহযোগী। বিদ্রোহীগণ সম্মুখের দ্বার ড়িয়া অন্য দ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ রত পেশওয়ার শয়ন গৃহের দিকে ধাবিত লে। নারায়ণরাও তাহাদের গোলমাল নে ভীত হইয়া কাকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ বিলেন—সমরসিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লল। যুবক কাকার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া তর স্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। রাঘোবা রসিংহকে ক্ষান্ত হও বলিয়া অনুরোধ বিলেন কিন্তু সে অনুরোধ শোনে কে? তকে বোতল হইতে ছাড়িয়া দিয়া এখন ক তাকে শান্ত রাখা যায়; সমরসিং উত্তর বিল "এতদূর আসিয়া কি আমি নিজেই রিতে যাইব? ছাড়িয়া দেও নতুবা তুমিও বা পড়িবে।" রাঘোবা ছাড়াইয়া ছাতে য়া লুকাইয়া রহিলেন। নারায়ণরাও লায়নোদ্যত কিন্তু পাষণ্ড তুলাজী তাঁহার । টানিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। এমন ময় চাপাজী নামক একজন বিশ্বাসী াজভৃত্যের প্রবেশ। তাহার হাতে যদিও কান অস্ত্রশস্ত্র নাই—সে দৌড়িয়া গিয়া াহার প্রভু ও অস্ত্রধারীদের মধ্যে ব্যবধান ইল। তাহাকে দেখিয়া নারায়ণরাও তাহার লা জড়াইয়া ধরিলেন—চাকর মুনিব দুজনেই রাধম নিষ্ঠুর হন্তারকদ্বয় কর্তৃক নিহত ইল।

রাঘোবা এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত কিনা —তাহার কোন প্রমাণ ছিল না—রামশাস্ত্রীর উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। রামশাস্ত্রী ন্যায়বান্ সত্যনিষ্ঠ সুবিজ্ঞ বিচারপতি—পুণাদরবারে বশিষ্ঠ স্বরূপ ছিলেন। অনুসন্ধানে তিনি শেষে জানিতে পারিলেন যে রাঘোবা নারায়ণরায়ের বধের আদেশ দেন নাই—তাঁহাকে ধরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আজ্ঞাপত্রে "ধরিবে" এই কথা বদলাইয়া "মারিবে" কথা কে একজন বসাইয়া দিয়াছে। রাঘোবাপত্নী (Lady Macbeth) আনন্দীবাই এই কাণ্ডের মূল কারণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই ঘটনার কতকদিন পরে রাঘোবা রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?" শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন "তোমার নিজের প্রাণ উৎসর্গ ভিন্ন ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার জীবনে আর সুখ নাই—তোমার এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। তুমি যতদিন কর্ত্তা থাকিবে ততদিন আমি এ সরকারে চাকুরী করিব না—আর এমুখো হইব না।" শাস্ত্রী তাঁহার বচন রক্ষা করিলেন। সেই অবধি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণা ছাড়িয়া বিজন গ্রামে একান্তে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

"ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটীরে, চলি গেলা ধীরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।" *

* কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ষষ্ঠ পেশওয়া রঘুনাথরাও
(রাঘোবা)

রঘুনাথরাও পেশওয়াপদে আরূঢ় হইলেন কিন্তু বিস্তর দিন টিঁকিতে পারেন নাই। তিনিও যেমন যুদ্ধ যাত্রায় পুণার বাহির হইলেন, তাঁহার বিপক্ষদলও মাথা তুলিল।

(পেশওয়া রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা)

মন্ত্রী প্রধান খ্যাতনামা নানা ফর্ণবীস সে দলের নেতা। রাঘোবার সহচর অনুচরগণ একে একে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। রাঘোবা বেগতিক দেখিয়া সিন্দে হোলকার ও ইংরাজদের শরণভিক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পেশওয়া বংশের অবনতি

এই সময় হইতে পেশওয়া বংশের অবনতি। প্রথমে যখন রাজিরাও রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তখন সেনাপতি রাঘোজী ভোঁসলা বহ্রাড় প্রান্তের জায়গীরদা ছিলেন। তিনিও পেশওয়ার দৃষ্টান্তে স্বাধী রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। পেশওয়া অধীনস্থ অপরাপর কর্ম্মচারীরাও প্রভুর দৃষ্টা অনুসরণ করিতে তৎপর হইল। ক্রমে মহা রাষ্ট্র রাজ্যে পঞ্চ শাখা বিস্তৃত হইল।

পঞ্চ শাখা

পেশওয়া তাহার মধ্যস্থিত, তাঁহা রাজধানী পুণা। ভোঁসলার রাজধা নাগপুর। সিন্দে গোওয়ালিয়রের আধিপ পাইলেন। হোলকর ইন্দোরে, বরদায় গাই কওয়াড় স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলেন পেশওয়া চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ, অন্যান্য সর্দ্দারগ শূদ্রজাতীয় মারাঠা। মহ্লাররাও হোলক হীনবর্ণ সৈনিক ছিলেন; রাণোজী সি পেশওয়ার পাদুকাধারী; পিলোজী গাইকওয় গোরক্ষক রাখালরাজ। ইঁহারা সকলেই দীনহী সামান্য শ্রমজীবির জীবিকা হইতে স্বভুজব রাজসিংহাসন উপার্জ্জন করেন, নীচকু জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবংশ পত্তন করিয়া যান পেশওয়া প্রথমত এই সকল বীরদিগকে দে বিজয়ে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর সৈ যোগাইবার ভার। তাঁহারা দূরে দূরে থাকি কার্য্য করিতেছেন, পেশওয়া তাঁহার উপ কর্তৃত্ব খাটাইবার সুবিধা পাইলেন না। পেশ ওয়ার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছানুসারে তাঁহার সন্ধি বিগ্রহ করিতে লাগিলেন ও রাজ রক্ষার্থে সেনা নিয়োগ না করিয়া স্ব সিদ্ধিতেই নিযুক্ত করিতেন। কালক্র তাঁহারা নিজে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলে —পেশওয়ার অধিকার নাম মাত্র। সাতারা

রাজা সম্বন্ধে যেমন পেশওয়া, পেশওয়ার সম্বন্ধে তদ্রূপ তাঁহার ভৃত্যবর্গ।

পুণায় দলাদলি

পুণা দরবার দুই দলে বিভক্ত। একদল রাঘোবার পক্ষ—অপর দল মৃত নারায়ণ-রাওয়ের পত্নী গঙ্গাবাইয়ের পক্ষ। গঙ্গাবাই তখন গর্ভবতী, সুরক্ষিত ভাবে পুরন্দর দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাঘোবা সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বপক্ষ সমর্থনে যত্নশীল হইলেন; প্রথম প্রথম কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিপক্ষ সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিলেন কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতি-কূল। পুণার সিংহাসন স্পর্শ করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় বজ্রপাত সদৃশ সংবাদ আসিল যে রাণীর পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে;—৪০ দিন গত হইলে শিশু রাজার রীতিমত রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। জ্যেঠা অপেক্ষাও বড় এই অর্থে "সওয়াই" মাধবরাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। এই সঙ্কটে হোলকর সিন্দিয়ার সাহায্য লাভে নিরাশ্বাস হইয়া রাঘোবা ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। বম্বে গবর্ণ-মেণ্ট অর্থ ও ভূমিলাভ লালসায় তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাঘোবা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট

১৭৭৫ সালে রাঘোবা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপন হয় তাহার নাম সুরাটসন্ধি; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইংরাজেরা রাঘোবাকে সসৈন্য পুণায় পৌছাইয়া দিয়া পেশওয়া সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবেন—রাঘোবা ইংরাজদের পুরস্কার স্বরূপ বাসীন সালসেট প্রভৃতি কতকগুলি লোভনীয় স্থান ছাড়িয়া দিবেন।

রাঘোবার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত হয় নাই। সুরাট সন্ধির পর পুরন্দর সন্ধি, এই প্রকার নানা পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর সবশেষে ১৪ই নবেম্বর ১৭৭৮ সালে রাঘোবার সহিত নূতন সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজ ও মারাঠীদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হয়।

প্রথম মারাঠা যুদ্ধ

গবর্ণমেণ্ট বম্বের সাহায্যে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাদের আগমন অপেক্ষা না করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। বম্বের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল এজর্টন। তাঁহার যে একাধিপত্য তাহা নহে, তাঁহার উপর আবার এক যুদ্ধ কমিটির অধিকার। এই অল্প সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্র গর্ভে প্রবেশ করা যত সহজ মনে হইয়াছিল, ফলে দেখা গেল তত সহজ নয়। ব্রিটিষ সৈন্য যত অগ্রসর হয়, মারাঠীরা আশপাশ প্রদেশ অগ্নিসাৎ করত তত পিছু হটে। ইংরাজ সৈন্য তলেগাম গিয়া দেখে সকলি ভস্মরাশি—লোকজন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। দুদিন পরে কমিটি হইতে সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের হুকুম আসে। যদিও কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে অমত ছিল, তথাপি এই আদেশ মত কার্য্য করিতে হইল। রাত্রে ভারি ভারি তোপ-সকল ডোবার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেশীর ভাগ জিনিসপত্র অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া ব্রিটিষ সৈন্য ফিরিল। কমিটি ভাবিয়াছিলেন সৈন্যেরা নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিবে, কেহ কিছু

জানিতেও পারিবে না। সকাল হইতে না হইতেই শত্রুদলের গোলাবৃষ্টিতে ইংরাজ সৈন্যের স্বপ্নভঙ্গ হইল, সন্ধ্যার সময় সে সৈন্য অনেক কষ্টে বড়গাম পৌছে। পরদিন প্রভাত হইতে তাহাদের উপর পুনর্ব্বার গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল—অবশেষে ব্রিটিষ সেনা হার মানিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল। ইংরাজদের এমন হার আর কখন হয় নাই। মারাঠীরা যাহা চাহিলেন তাহা পাইলেন, ইংরাজেরা সালসেট প্রভৃতি তাঁহাদের কতকগুলি অধিকৃত প্রদেশ ফিরিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্দের ভোগে ভরুচ অর্পণ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধিত হইল।

ইংরাজদের দর্প চূর্ণ।—এই কলঙ্কপূর্ণ বড়গাম সন্ধি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন না। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট অন্যতর প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তাহা মারাঠীদের অগ্রাহ্য হইল। পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ।

জেনেরল গডার্ড

এই সঙ্কটে জেনেরল গডার্ড বম্বে সৈন্যের সাহায্যে আগমন করেন। তিনি তখন বন্দেলখণ্ডে ছিলেন। তথা হইতে বিশ দিনের মধ্যে একেবারে ৩০০ মাইল কুচ করিয়া সুরাটে আসিয়া পৌছিলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে কোঙ্কন তাঁহার রণক্ষেত্র। ১৭৮০ সালে তিনি মারাঠীদের উপর জয়লাভ করিয়া বাসীন অধিকার করেন।

হাইদর আলি

এই সময়ে হাইদর আলির কর্ণাটক আক্রমণ সংবাদ বম্বে পৌছে, হাইদর দমনে ইংরাজদের সমুদয় বল প্রয়োগ করা চাই, মারাঠীদের সঙ্গে বিবাদভঞ্জন তখন প্রয়োজন। সেনাপতির প্রতি মারাঠিদের সহিত সন্ধি বন্ধনের অনুমতি হইল। মনোমত কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে পেশওয়াকে ভয় দেখান আবশ্যক এই বিবেচনায় গডার্ড সৈন্য সামন্ত লইয়া বরঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আপনি ঘাটের নীচে অবস্থিতি করিয়া একদল সেনা উপরে খণ্ডালায় প্রেরণ করিলেন। মারাঠীরা তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া বোম্বাই ও গডার্ড সৈন্যের মাঝখানে ঝুঁকিয়া পড়িল। পলায়ন শ্রেয় বিবেচনায় গডার্ড ফিরিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বরং অল্প সৈন্য লইয়া সম্মুখ যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা কিন্তু মারাঠীদের কাছে পিছন ফিরিলে আর রক্ষা নাই। গডার্ড তাহাই ঠেকিয়া শিখিলেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনে ব্রিটিষ সৈন্যের সমূহ ক্ষতি। দেশী য়ুরোপীয় সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬১ সেনা হত—কামান ও অন্যান্য জিনিসপত্র শত্রু হস্তে পতিত হইল।

সালবাই সন্ধি

এই দুই হারের পর সালবাই সন্ধি। এই সন্ধিমার্গে ইংরাজ মারাঠীদের মধ্যে দেশের আদান প্রদান হইল। ইংরাজেরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন— তিনি অতঃপর পেন্সনভোগী হইয়া গোদাবরীতীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্য য়ুরোপীয় জাতির সহিত মিত্রতা বন্ধন করিবেন না, পেশওয়া এইরূপ বচন দিলেন। এই সন্ধি করিয়া ইংরাজেরা হাইদরের বিপক্ষে অবাধে অস্ত্রচালনা করিবার সুযোগ পাইলেন।

মহাদাজী সিন্দে

সালবাই সন্ধিসাধনে মারাঠী পক্ষে সিন্দে প্রধান উদ্যোগী—মহাদাজী সিন্দে এই সন্ধিসূত্রে সিন্দিয়ার গুমর বাড়িয়া উঠিল। মহাদাজী প্রথমে সামন্য পাটেল ছিলেন, গাঁয়ের মোড়ল বৈ নয়—পেশওয়া সরকারে চাকর; এই ক্ষণে তিনি স্বাধীন রাজা, মারাঠী সর্দ্দারদের অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পদ বৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য বিস্তার হইতে চলিল। এই মহাদাজী সিন্দে মহারাষ্ট্রে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—জাতীয় বীরের মধ্যে ইনি শিবাজীর নীচেই গণনীয়।

মহাদাজী সিন্দে উত্তর হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করত পানিপতের কলঙ্ক মোচনে ব্রতী হইলেন। সময় অনুকূল। মোগল রাজ্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্নচূর্ণ, চতুর্দ্দিকে অরাজকতা—যার বল তারই জয়, জোর যার মুলুক তার। কিন্তু এই সকল সত্বেও দিল্লী সিংহাসনেব উপর লোকের অটল অনুরাগ। দিল্লীশ্বর বীর্য্যহীন ঐশ্বর্য্যহীন কিন্তু তাঁহার নামে সকলেই মোহিত, তাঁহার সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে লোকে উৎসাহিত, তাঁহার প্রদত্ত মানার্জনে মহা মহা আমীরও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সিন্দিয়াও অবসর বুঝিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। দিল্লীর বাদসা সা আলম। তাঁহার উজীর নজফ খাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, এই ঘটনায় উজীর পদের জন্য মহা বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। নজফের উত্তরাধিকারী আফ্রাসিয়াব। মহম্মদবেগ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, এই প্রতিদ্বন্দ্বী দমন মানসে আফ্রাসিয়াব সিন্ধিয়াকে ডাকিয়া পাঠান। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সিন্দে, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আগ্রায় গিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরে আফ্রাসিয়াব শত্রুহস্তে নিহত হওয়ায় রাজ্যবিপ্লব দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই সিন্দিয়ায় দিকে তাকাইয়া, সিন্দিয়ার সাহায্যে নিজ নিজ কাজ সাধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সিন্দিয়া দিল্লী প্রয়াণ করিয়া পেশওয়ার জন্য "বাদসাহী উজীর" পদবী আদায় করিলেন,—স্বয়ং বাদসাহী সেনাপতি পদ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংরক্ষণে আগ্রা দিল্লীর রাজস্ব নিয়োজিত হইল, এইরূপে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোআব প্রদেশ তাঁহার বশবর্ত্তী হইল। বাদসাসৈন্য মাঝে সঙের মত এদিক ওদিক ফিরিতে লাগিলেন—সিন্দিয়া মথুরাধামে নিজ নিকেতন স্থাপন করিলেন।

সিন্দিয়ার মথুরা প্রবাসকালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট পুণা দরবারে একজন রেসিডেণ্ট বসাইবার চেষ্টায় মহারাজা সিন্দে সন্নিধানে দূত প্রেরণ করেন। ব্রিটিষ দূত ম্যালেট সাহেব মথুরায় সিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মোগল সম্রাট সা আলম তখন সিন্দের ক্যাম্পে, তাঁহার সহিত ও সাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অগাধ পরিবর্ত্তন! ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মারাঠী বীরেরা তাহাদের কোটর হইতে বিনির্গত হইয়া ভারত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন দিল্লীশ্বরের মহিমা মিহিরে দিক্‌বিদিক্ ঝলসিত। সেকাল আর একাল! এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সমস্ত মহিমা অস্তমিত হইয়াছে। সেই দিল্লীসম্রাট এখন বর্গীদের অনুগ্রহ ভিখারী, সিন্দিয়ার ক্যাম্পে আবদার করিতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক, সিন্দের প্রসাদে ব্রিটিষ দৌত্য সফল হইল।

পুণা দরবারে ব্রিটিশ দূত
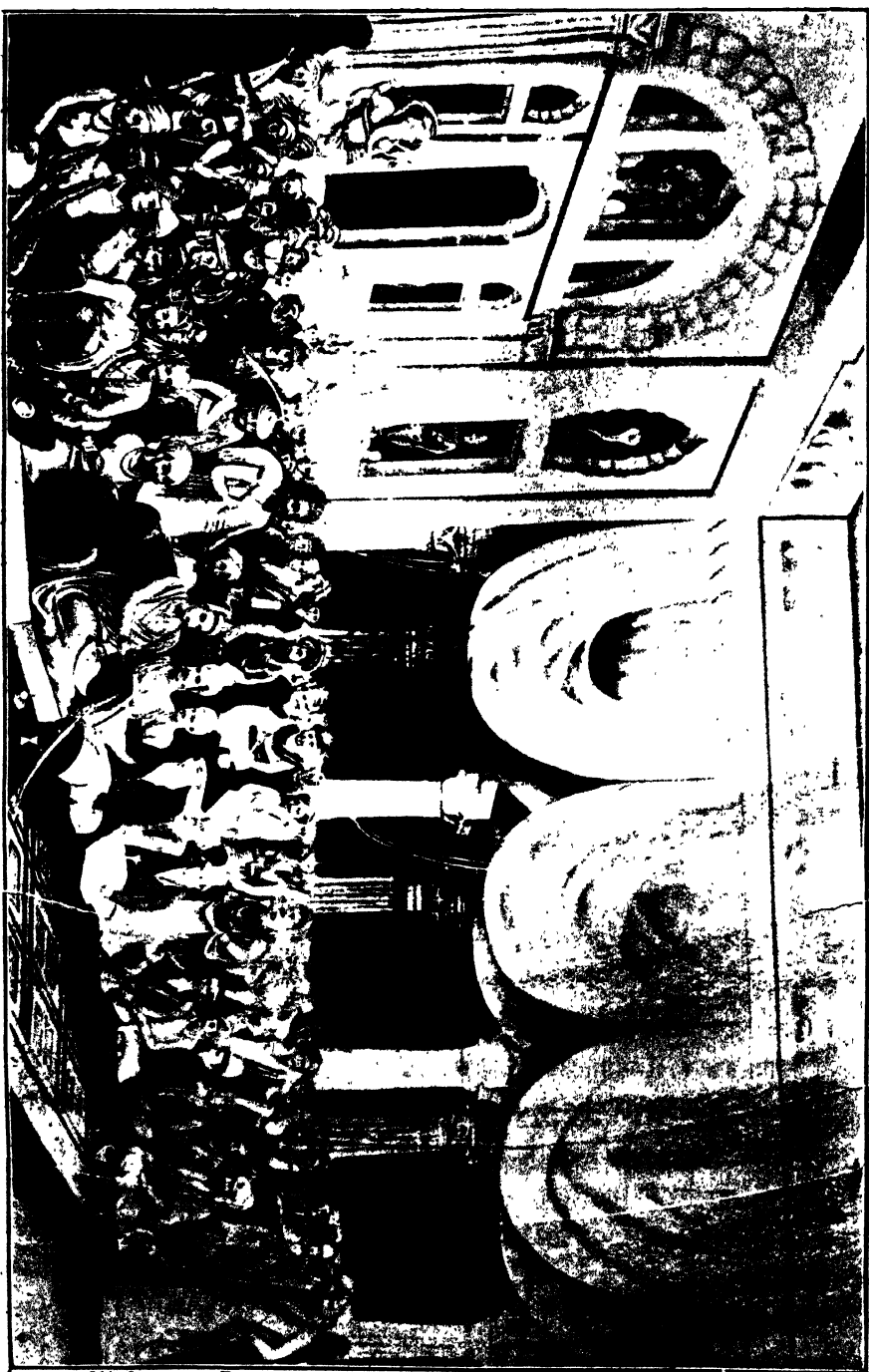
পুণার রেসিডেণ্ট সার জন ম্যালেট

১৭৭৫ সালে ম্যালেট সাহেব ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট হইয়া পুণার প্রবেশ করেন ও কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত দৌত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "ছুঁচ হইয়া প্রবেশ ফাল হইয়া বাহির হওয়া" ইংরাজ নয়-কৌশলের এই যে পরিণতি, পুণার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

উত্তর হিন্দুস্থানে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনানন্তর মহাদাজী সিন্দে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৭৯২ সালে তিনি পেশওয়ার হস্তে দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত নূতন পদমর্য্যাদা প্রদান উপলক্ষে পুণায় পদার্পণ করেন। তখন পেশওয়া সওয়াই মাধবরাও। তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। পুণায় এমন ধুমধাম আর কখনো হয় নাই। প্রথমে পেশওয়ার "বাদসাহী উজীর" পদবী গ্রহণ। উৎসবের জন্য সারি সারি তাম্বু পড়িয়াছে। প্রান্তবর্ত্তী তাম্বুতে এক স্বর্ণ সিংহাসন প্রস্তুত, তৎসমীপে বাদসাহী সনন্দ, বসন ভূষণ উপহার সামগ্রী সকল বিরচিত। পেশওয়া সিংহাসনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনবার সেলাম করিয়া শতৈক স্বর্ণ মোহর নজরাণা দিয়া বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। পরে বাদসাহী পরওয়ানা পঠিত হইল। ইহার শেষ ভাগে হিন্দুস্থানে গোহত্যা নিষেধসূচক অনুজ্ঞা ছিল তাহা শ্রবণ মাত্র সভাসদ্‌জনের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তৎপরে আড়ালে গিয়া অভিষেক বসন ভূষণ সাজ সজ্জা করিয়া দরবারে পেশওয়ার পুনঃ প্রবেশ, সভাস্থ সর্দ্দারের

পেশওয়া মাধব রাও

অভিবাদন ও দস্তুর মত নজরদান। অনন্তর তিনি দিল্লীশ্বর প্রেরিত অশ্ব, রথ, গজ, ঢাল, তলবার, বসন, ভূষণ, চামর, নিশান প্রভৃতি বিবিধ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। সভাভঙ্গ করিয়া পেশাওয়া যখন সহরে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য, বাদ্যধ্বনি, তোপধ্বনি, পৌরজনের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি গগনভেদী গভীর নাদ সমুত্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। প্রাসাদে গিয়া উজীরের প্রতিনিধি পদে সিন্দের বরণ। এই প্রসঙ্গে সিন্দিয়ার বিনয় অভিনয় অতীব কৌতুকজনক। পাত্রমিত্র সভাসদ্ সমস্ত লোকে তাঁহার সম্মানার্থে যেমন ব্যগ্র, সিন্দিয়া নিজ পদলাঘব বজায় রাখিতে

মহাদাজী সিন্দে

পুণা দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল। পুণায় থাকিয়া প্রধান মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এই তাঁর ভিতরকার মতলব। এই সময়ে নানা ফর্ণবাস তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মাথা তুলিলেন। পুণা দরবারে নানা একমাত্র দূরদর্শী চতুর মন্ত্রী ছিলেন, সিন্দের অতিভক্তির তলে যে স্বার্থসাধন অভিসন্ধি ছিল তাহা তলাইয়া বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। নানা ও সিন্দের মধ্যে মহা রেষারেষি, পেশওয়া বেচারা ভাবিয়া পান না কোন দিক্ রক্ষা করেন। দুইজন তাঁহার দুই বাহু। মহাদাজীব প্রভুত্ব নানার অসহ্য তেমনি তৎপর। সমবেত আমীর ওমরাদের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন গ্রহণ করা, স্বভুজার্জ্জিত উচ্চপদবী সকল তুচ্ছ করিয়া আপনার পাটেল নাম লোক মধ্যে ঘোষণা করা, মোরচল (ময়ুর পুচ্ছেব চামব) ধরিয়া পেশওয়ার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে চলা, পৈতৃক রীতি অনুসারে পেশওয়াব পার্শ্বে পাদুকা ধরিয়া দাঁড়ানো, ইত্যাদি বিনয় ভানে তিনি লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল।

নানা ফর্ণবীস

এই সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড সমাপ্ত হইবার পর সিন্দে ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

নানা ফর্ণবীস

হইয়া উঠিল—এমন কি, তিনি রাজ্য কারবার ছাড়িয়া কাশীবাসের সঙ্কল্প জানাইলেন। এমন সময় যমদূত আসিয়া নানার পক্ষ অবলম্বন করিল। সিন্দিয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নানার এক মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়া যাওয়াতে তাঁহার প্রভুত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইল।

খর্ডার যুদ্ধ

মহাদাজীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে পেশওয়া ও নিজামের মধ্যে চৌথ লইয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম। নিজাম আলি ব্রিটিষ সিংহকে স্বপক্ষে টানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। শীঘ্রই যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাষ্ট্রীয় মহা মহা বীরেরা পেশওয়ার পতাকাতলে এই শেষবার সম্মিলিত হইলেন। মহাদাজীর উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্দে তথা তুকাজী হোলকর পুণাতেই ছিলেন। নাগপুর রাজা ভোঁসলাও তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন। গোবিন্দরাও গাইকওয়াড গুজরাট হইতে ফৌজ পাঠাইলেন। রাস্তে ও পটবর্দ্ধন, মালেগাম ও বিঞ্চুরপতি, পন্ত্ প্রতিনিধি, পন্ত্ সচিব, নিম্বালকর, পাটনকর, ঘাটগে, ডফালে, থোরাত, পন্তওয়াব প্রভৃতি বড় বড় শূর সর্দ্দার জায়গীরদার স্ব স্ব দলবল লইয়া রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। অশ্বপদাতিক সর্ব্বসমেত প্রায় দেড় লক্ষ সেনা একত্রিত। পরশুরাম ভাউ সেনাপতি। আহমদনগর জিলার অন্তর্গত খর্ডায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বড় একটা রক্তপাতের প্রসঙ্গ আসে নাই। যেমন গর্জ্জন তেমন বর্ষণ নয়। কোন পক্ষের বিশেষ রণচাতুরীও প্রকাশ পায় নাই। নিজামের অকারণ ভীরুতা ও ভয়ে পলায়ন বশত মারাঠীরা সুলভমূল্যে জয় ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। মারাঠীগণ এই যুদ্ধে নিজাম সরকার হইতে দৌলতাবাদ ভূমিখণ্ড ও বিস্তর নগদ টাকা মিলিয়া বিলক্ষণ এককামড় আদায় করিয়া লইল। নানার গৌরবের আর সীমা রহিল না। কোন বিদেশী রাজার সাহায্য বিনা অমন প্রবল শত্রুর পরাভব, ধন্য নানার নয়কৌশল! দৌলতরাও সিন্দিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তুকাজী হোলকর তাঁহার বাধ্য, রঘুজী ভোঁসলা ও অপরাপর সর্দ্দারগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। পেশওয়ার রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব গৌরব সঞ্চারের সকলি অনুকূল। এই সমস্ত শুভলক্ষণ সত্ত্বেও কোথা হইতে আচম্বিতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া নানার আশা ভরসা বন্যায় ভাসাইয়া দিল।

পেশওয়ার আত্মহত্যা

যে অনর্থ পাতের কথা সূচিত হইল তাহা মাধবরাও পেশওয়ার আত্মহত্যা। তাঁহার বয়স যদিও বিংশতি বৎসর, তথাপি নানা তাঁহার সহিত নাবালকের মত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিতেন না। ইচ্ছামত তাঁহাকে আপনার ভাইদের সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। —নানার ষড়চক্রে রাঘোবার তিন পুত্র কয়েদ ছিলেন, বাজিরাও তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। এই বাজিরাও শাস্ত্রালাপ, শস্ত্রনৈপুণ্য রূপে গুণে বিখ্যাত ছিলেন। মাধবরাও সর্ব্বদাই তাঁহার গুণানুবাদ শুনিতে পাইতেন। কিসে

তাঁহার কারামুক্তি হয়, তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়, পেশওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। নানার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন রাঘোবাই যত অনর্থের মূল—তাঁহার পুত্রদের প্রশ্রয় দিলে রাজ্যের অনিষ্ট বই ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিনি এই ভাবে পেশওয়াকে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ তাঁহার ততই আরো বৃদ্ধি হয়। মাধবরাও অবসর বুঝিয়া বাজিরাওকে চরের হাত দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান, এইরূপে গোপনে তাঁহাদের পত্রব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। এক পত্রে বাজিরাও লেখেন "আমরা দুজনেই বন্দী, তুমি পুণায় আমি জুনরে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন—ভালবাসার উপর পরের কোন অধিকার নাই। যদি আমাদের পরস্পরের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ অটল থাকে, আমরা যদি আমাদের পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া চলি, সময়ে আমরাও কৃতী হইব।" নানা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, বাজিরাওয়ের বন্ধন দ্বিগুণিত করিলেন, মাধবরাওকে নানা প্রকারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাধবরাও রাগ করিয়া ঘরে বন্ধ হইয়া রহিলেন। দশ বার দিন দস্তুর মত দরবার হইল। পেশওয়া যদিও বাধ্য হইয়া সে উৎসবে যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের কষ্ট নিবারণ হইল না। তিনি জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য উদাস হইয়া উৎসবের দুদিন পরে প্রাসাদের ছাতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

পেশওয়া বাজিরাও
১৭৯৬—১৮১৭

এই ঘটনায় পুণায় হুলস্থূল বাধিয়া গেল। রাজ-সিংহাসনে কে বসিবে এই এক বিষম সমস্যা। রাঘোবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও তাহার ন্যায্য অধিকারী, কিন্তু মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আর এক প্রস্তাব উঠিল। তাঁহাদের মন্ত্রণা এই যে, মৃত মাধবরাওয়ের পত্নী যশোদাবাই বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠ চিমনাজীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং চিমনাজীকে পেশওয়া পদে অভিষিক্ত করা হয়। নানা এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, তাহা কার্য্যেও পরিণত হইল। এদিকে আবার দৌলতরাও সিন্দে বাজিরাওয়ের পক্ষ গ্রহণ করায় অবশেষে সেই পক্ষেরই জয় হইল। এইরূপে অশেষ উৎপাতের হস্ত এড়াইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৬ সালে বাজিরাও পেশওয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। নানাও বিস্তর ফাঁড়া কাটাইয়া পরিশেষে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলেন। বাজিরাও পেশওয়া—নানা ফর্ণবীস তাঁহার দেওয়ান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিনেমোয়া কুণ্ড

দেশটা তখন ছিল মেয়োরীদের। উমুকেরীয়া ছিলেন দেশের রাজা। রাজকন্যা হিনেমোয়া খুব সুন্দরী। পৃথিবীর নন্দন কানন—নিউ-জিলাণ্ডের চারিদিকে তাঁর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন; হইলে কি হয় কানাঠাকুর পুষ্পশর নিজের তুণ থেকে বাহির করেন নাই। রাজকুমারী বয়স্থা দেখে রাজা অধিক দিন চুপ করে থাকতে পারলেন না, ভাল দিন দেখে রাজবাড়িতে স্বয়ম্বর সভা ডাকা হোল। দেশ দেশান্তরের অনেক রাজকুমার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য রাজার দেশে রটোরুয়া-হ্রদের তীরে ছাউনি পাতলেন। তাঁদের দামী পোষাক পরিচ্ছদ ও লোকলস্করে হ্রদের কিনারা আলোকিত হয়ে উঠলো। বাছা বাছা উপঢৌকন সামগ্রী আগে থেকেই রাজকন্যাকে পাঠান হ'তে লাগল। আজ রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। সে দেশের রীতি অনুযায়ী যিনি নাচের কায়দায় সকলকে পরাজয় করবেন, সুন্দরী লাভ তাঁরই ভাগ্যে ঘটবে। নাচের নাম হাকা,—যুবক যুবতীরা এক সঙ্গে হাতে হাত ধরে নাচ গান করে থাকেন। হাকার হাসি ঠাট্টা আমোদ ইসারা ইত্যাদির মধ্যে অনেকেই ভবিষ্য জীবনের সাথী বেছে লন। এটী দেশের প্রথা; এখানে তার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

(২)

রটোরুয়া হ্রদের মাঝখানে মোকোইয়া দ্বীপ। সেখানকার রাজা হোয়াকেযু্বির পুত্র টুটেনিকাইও স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। টুটেনিকাইএর মাতা খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন না, সেই জন্য রাজপুত্র হিনেমোয়ার হস্ত প্রার্থনা করতে সাহস পান নাই। তবে তিনি গোপনে ভৃত্য টিকির সঙ্গে অনেক দিন থেকে হাকা তালিম দিয়ে খুব পাকা হয়েছিলেন। নাচ গান আরম্ভ হ'ল, দূরস্থিত পাহাড় গুলি তার প্রতি-ধ্বনিতে জেগে উঠল; গ্রামবাসীরা রাজ কুমারীকে সামনে রেখে নাচের প্রত্যেক তালে তালে আমোদ পেতে লাগলেন; এমন সময় হঠাৎ টুটেনিকাই সঙ্গীদিগকে দূরে ফেলে একেবারে হিনেমোয়ার কাছে এসে এধার থেকে ওধারে ঘুরে নাচতে লাগলেন। দেখাদেখি অনেকে সেই রকম ক'রে নাচলেও কেহই তাঁকে পরাস্ত করতে পারলেন না। অজানিত ভাবে হিনোমোয়ার গর্ব্বিত হৃদয় বিনা পণে টুটে-নিকাইয়ের কাছে বিকিয়ে গেল। নাচ শেষ হলে রাজকুমারেরা সকলেই মনে করতে লাগলেন তিনিই হিনেমোয়ার হৃদয় অধিকার করেছেন। ইতিমধ্যে দেশের নিয়ম অনুযায়ী হিনেমোয়া দাসীকে টিকির কাছে পাঠিয়ে বলে দিলেন, যেন তার প্রভু গোপনে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করেন। আমোদ প্রমোদ ফুরিয়ে গেল; অতিথিরা বিদায় নিয়ে নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

(৩)

দু'জনে দেখা হ'ল, দুটী প্রাণ পরস্পরের

কাছে অনন্তকাল মিলিত থাকতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। বিশুদ্ধ ভালবাসার পথে অনেক কাঁটা খোঁচা, অনেক বাধা বিঘ্ন। হিনেমোয়া রাজার কাছে নিজের মনের অবস্থা জানালে রাজা তো চটেই আগুন। যা মুখে এল তাই ব'লে গাল দিলেন "অকৃতজ্ঞ, নীচমনা, আমার পবিত্র বংশের কলঙ্ক! এত উচ্চবংশীয় রাজকুমার থাকতে কোথাকার একজন হীনজনকে নিজের প্রণয়ী ব'লতে ঘৃণা হ'ল না। আচ্ছা, দেখব কি করে সে আমার রাজ্যে আবার আসতে সাহস করে।" হিনেমোয়া ভয় পেলেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা স্থির রইল। রাজা হুকুম দিলেন, হ্রদের মধ্য হতে সব ডিঙ্গি টেনে ডাঙ্গার উপর তুলে রাখ, আর সাবধান কেহ যেন দ্বীপ থেকে কিনারায় আসতে না পারে। ভালবাসা বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তিন মাইল জলের ব্যবধানও হিনেমোয়াকে টুটেনিকাইয়ের নিকট থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হোল না।

(৪)

সন্ধ্যাবেলা আকাশে দু'একখানি পাতলা মেঘ কাস্তের মত চাঁদকে একবার ঢাকছে আবার একটু পরেই খুলে দিচ্ছে। হিনেমোয়া রোজ যেমন জলের ধারে বসে টুটেনিকাইএর বাঁশীর করুণ গান শোনেন আজও সেইরূপ শুনছেন। আজ সেই স্বর ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন বড় বেশী করুণ হয়ে তাঁর কাণে পৌঁছচ্ছে। আজ বাঁশীর সুরে তাকে পাগল করে তুলেছে। নারী সুলভ লজ্জা আর তাঁকে আটকে রাখতে পারছে না, বিপদসঙ্কুল জলরাশি পার হয়ে প্রিয়তমের নিকট যাবার জন্য তিনি একান্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। সব ভুলে গিয়ে তুষার শীতল জলে তিনি গা ঢেলে দিলেন। এদিকে মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেল্‌তে খেল্‌তে চাঁদ অস্ত গেল। একটী গভীর অন্ধকারের ছায়া হ্রদের জলের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তৃত করে ফেল্লে। বাইরের কোন নির্দ্দেশ আর চক্ষে পড়ে না, অন্ধকারে বাঁশীর স্বর অনুসরণ করে তিনি সাঁতার দিতে লাগলেন। একবার ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন "হায়, প্রিয়তম তুমি কোথায়! যদি নিকটে থাক ত এসে আমাকে তুলে নাও।" তখনও বাঁশীর আওয়াজ অনেক দূরে। একটী নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তিনি বলে উঠলেন "বিহঙ্গবর একবার তোমার পাখা দুখানি ধার দাও, আমি নিমেষের মধ্যে টুটেনিকাইয়ের কাছ থেকে ফিরে এসে তোমার পাখা তোমায় ফেরত দেব।" ক্রমেই সাঁতারের বেগ কমে আসতে লাগল, তবুও দেহের সমস্ত সামর্থ্যটুকু একত্র করে প্রাণ পণে জল কাটতে লাগলেন। বার বার ভূমি অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথায় ভূমি! সবই গভীর জল! অবশেষে নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় তাঁর পা মাটিতে ঠেকল'। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, শরীর ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে পড়েছিল, দুই তিন বার পড়ে যাবার পর হঠাৎ একস্থানে গরম জলের মাঝখানে এসে পড়লেন। তখন সহসা তিনি লুপ্ত শক্তি ফিরে পেলেন।

(৫)

মেয়োরীদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে সন্ধ্যাবেলা কোন স্ত্রীলোক কারও বাড়ী

পৌঁছলে গৃহস্বামী তাকে নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করেন। হিনেমোয়া মহা মুস্কিলে পড়লেন। আর ত বাঁশীর স্বর শোনা যাচ্ছে না, কার বাড়ী যাবেন কার দখলে পড়বেন, তিনি ভাবনায় আকুল হয়ে উঠলেন। এদিকে টুটেনিকাই বাঁশী বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে টিকিকে জল আনতে বললেন। টিকি যেখানে হিনেমোয়া গরম জলের মধ্যে বসে আছেন তার পাশে শীতল প্রস্রবণের নিকট গেল। মানুষের পদশব্দ শুনে হিনেমোয়া পরুষ স্বরে বললেন "তুই কে, কে তোকে এখানে পাঠিয়েছে।" বেচারা টিকি যথাযথ পরিচয় দিল। কিন্তু হিনেমোয়া ত টিকিকে চিনতেন না। তাঁর সন্দেহ হ'ল পাছে তাঁকে কেউ প্রতারণা করে। তিনি মতলব খাটিয়ে টিকির কাছ থেকে জলপূর্ণ পাত্রটী চেয়ে নিয়ে পানশেষে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন। ভৃত্যের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে টুটেনিকাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য যে কুণ্ডে হিনেমোয়া লুক্কায়িত আছেন তার কাছে এসে আততায়ীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

"সে আমি" এই উত্তর দিয়ে হিনেমোয়া জল থেকে তীরে এসে দাঁড়ালেন।

"তুমি হিনেমোয়া" আনন্দে ও বিস্ময়ে এই কথা বলে রাজপুত্র তাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন। রাজপুত্রের পালকের গাত্রাবরণে সুন্দরী প্রণয়িনীর শীত নিবারিত হোল।

তারপর তাঁরা রাজবাড়ীতে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে মহাসমারোহে উভয়ের বিবাহ হয়ে গেল।

যেখানে হিনেমোয়া শীতল জল থেকে হঠাৎ গরম জলে গিয়ে পড়েছিলেন, বটোরুয়া হ্রদের সেই অংশটীকে হিনেমোয়া কুণ্ড বলে। সে স্থানের জল অত্যন্ত উপকারী; দেশ দেশান্তর হতে অনেক লোক স্নানের জন্য বৎসর বৎসর বটোরুয়ায় আসে।

শ্রীনন্দলাল সাও

প্রিয়দর্শিকা

১। প্রিয়দর্শিকা রত্নাবলীরই ন্যায় একটি নাটিকার নায়িকা। প্রিয়দর্শিকার পিতা দৃঢ়বর্ম্মা, কলিঙ্গরাজের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনাসত্ত্বেও বৎসরাজের সহিত প্রিয়দর্শিকার বিবাহ দিলেন। কলিঙ্গরাজ, বৎসরাজের একটা ক্ষণিক পরাভবে সুযোগ পাইয়া দৃঢ়বর্ম্মের উপর প্রতিশোধ লইলেন; দৃঢ়বর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। প্রিয়দর্শিকার পিতৃমিত্র রাজা বিন্ধ্যকেতু প্রিয়দর্শিকাকে হস্তগত করিলেন। ইহাতে বৎসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বিন্ধ্যকেতুকে শাস্তি দিবার জন্য স্বীয় সেনাপতি বিজয়-সেনকে আদেশ করিলেন। এই যুদ্ধের অবসানে এই নাটিকার কার্য্যারম্ভ। বিজয় সেন, বিন্ধ্যকেতুর পরাভব ও মৃত্যুর সংবাদ স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করিলেন; বিন্ধ্যকেতুর প্রাসাদে একটি রোরুদ্যমানা নবযুবতীকে পাওয়া যায়; মনে হইল তিনিই বিজিত

রাজার দুহিতা। এই কন্যাটিকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাণী বাসবদত্তার পরিচারিকার পদে নিযুক্ত করিবার জন্য বৎসরাজ আদেশ করিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হইল—আরণ্যকা।

২। রাজা আরণ্যকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মদনপীড়ায় পীড়িত হইয়া তিনি বিদূষকের সহিত আত্মবিনোদনার্থ প্রমোদ-উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে আরণ্যকা মহিষীর আদেশে পুষ্পচয়ন করিবার জন্য উদ্যানে অবতরণ করিল। আরণ্যকার সখী মনোরমা তাহার সাহায্যার্থ আসিল, এবং তাহার বিশ্বাস উদ্দীপন করিয়া তাহার মনের কথা অবগত হইল। রাজা তাহার নিকটেই তরুকুঞ্জের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি এইরূপে জানিতে পারিলেন যে তিনি যেরূপ প্রিয়দর্শিকার প্রতি—প্রিয়দর্শিকাও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। মনোরমা প্রিয়দর্শিকাকে সেইখানে রাখিয়া দূরে চলিয়া গেল। যে সকল ভ্রমর পদ্মের চতুষ্পার্শ্বে গুঞ্জন করিতেছিল তাহারা প্রিয়দর্শিকাকে আক্রমণ করিল। প্রিয়দর্শিকা আত্মরক্ষার্থ উচ্চৈঃস্বরে সখীকে আহ্বান করিল। বৎসরাজ দৌড়িয়া আসিয়া ভ্রমরের আক্রমণ নিবারণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন।

মনোরমা সখীর চীৎকার শুনিয়া ফিরিয়া আসিল। বৎসরাজ আবার বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইলেন। আরণ্যকা মনোরমার সহিত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। (শকুন্তলা—প্রথম অঙ্ক—ভ্রমর দৃশ্য দ্রষ্টব্য)

৩। বাসবদত্তার পুরাতন সখী সংকৃত্যায়নী বৎস ও বাসবদত্তার প্রেম-কাহিনী সংক্রান্ত একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। রাণীর সম্মুখে উহার অভিনয় হইবে। আরণ্যকা বাসবদত্তার ভূমিকা এবং মনোরমা রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মনোরমা ও বিদূষক—দুজনে মিলিয়া এই ফন্দি করিয়াছে—প্রণয়ীযুগল প্রকাশ্যরূপে পরস্পরের নিকট স্বকীয় প্রেম ব্যক্ত করিবে। মনোরমার পরিবর্তে স্বয়ং রাজা নিজের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয়-প্রদর্শিত ঘটনার বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়া বাসবদত্তার চিত্ত অনেকবার বিচলিত হইল। কিন্তু সংকৃত্যায়নী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে উহা নিছক্ বিভ্রমমাত্র; তথাপি নাট্য-দৃশ্যের ছোট-খাট ঘটনায় ব্যথিত হইয়া রাণী রঙ্গশালা হইতে প্রস্থান করিলেন। চিত্রশালা দিয়া যাত্রাকালে দেখিতে পাইলেন, বিদূষক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, নিদ্রাবিহ্বল বিদূষক গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল (মালবিকা, চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। বাসবদত্তা ক্রোধান্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও, তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিলেন।

৪। রাণীর আদেশক্রমে আরণ্যকা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। রাজা তাহার মুক্তির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। বিজয়সেন আসিয়া রাজাকে একটা অভিনব বিজয়সম্বাদ জ্ঞাপন করিল,—কলিঙ্গরাজ পরাভূত এবং দৃঢ়বর্ম্ম স্বকীয় সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। দৃঢ়বর্ম্মের কোঞ্চুকী সেই সময় তাঁহার প্রভুর

পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আগমন করিল। কেবল একটি মাত্র মেঘখণ্ডে তাঁহার প্রভুর সৌভাগ্যগগন পরিম্লান।—তাঁহার দুহিতা প্রিয়-দর্শিকাকে তিনি হারাইয়াছেন। এই সময়ে হঠাৎ মনোরমা ভয়বিহ্বল হইয়া প্রবেশ করিল—আরণ্যকা বিষ খাইয়াছে। মুমূর্ষু আরণ্যিকাকে আনা হইল। কঞ্চুকী উহাকে দেখিয়া রাজার দুহিতা বলিয়া চিনিল। সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত কিন্তু বৎসরাজ প্রতীকারার্থ ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করিলেন (মালবিকা—চতুর্থ অঙ্ক দ্রষ্টব্য); আরণ্যিকা ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিল। বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকাকে ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং রাজার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা—এই দুই নাটিকারই কার্য্যপরিসর অতীব সংকীর্ণ; ভারতীয় রাজপ্রাসাদে যেরূপ সচরাচর দেখা যায়—এই দুই নাটিকাতে সেই অন্তঃপুরের প্রেম-লীলা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঘটনাসন্নিবেশ না তেমন জটিল ধরণের, না তেমন মর্ম্মস্পর্শী; উহা ঠিক নাট্যশাস্ত্রের স্থানুরূপ। পাত্রগণ নাট্য-শাস্ত্রাদিষ্ট আদর্শ-পাত্র, উহাতে কিছুমাত্র মৌলিকতা নাই। বৎস, উদারচিত্ত ও আমোদপ্রিয় নায়কের দৃষ্টান্ত, এবং সাগরিকা ও আরণ্যিকা মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টান্ত। সপত্নী বাসবদত্তা বর্ষীয়সী ও উন্নত চরিত্র রমণী। সুসংগতা ও মনোরমা উভয়ই মামুলী ধরণের সখী। বিদূষক, কঞ্চুকী, সেনাপতি, সকলই ভরতের বর্ণিত সূত্রানুরূপ। এই জন্যই রত্নাবলীর এত মান। সূত্রাদির ব্যাখ্যাকালে "দশরূপ" ইহা হইতে অনেকবার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণও ঐরূপ করিয়াছেন। তবে ঐ দুই রচনায় কোন গুণ নাই এরূপও বলা যায় না। উহাতে আখ্যানবস্তুটি বেশ নিপুণভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে; এবং নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসে হর্ষের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও উহার প্রয়োগে যে তাঁহার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৎসের নিকট, সারিকাকর্ত্তৃক সাগরিকার গোপনীয় উক্তিসমূহের আবৃত্তি, দুই পরিচারিকার ছদ্মবেশ ধারণ, একজনকে আর একজন বলিয়া ভুল করা; রত্নাবলীতে, যাদুকর-প্রদর্শিত অন্তঃপুরের গৃহ দাহ; প্রিয়-দর্শিকার ভ্রমরের দৃশ্য, দ্বিধারায় নাট্যকার্য্যের যুগল-ধারা—এই যে-সকল উদ্ভাবনা, অন্তত এই যে-সকল নাটকীয় কৌশল,—ইহাতে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই-নাটিকার সৌন্দর্য্য, সহকারী ললিতকলা কবিতার দ্বারা বেশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভাঁড়ামি, নৃত্য, গীত, বাদ্য—সমস্তই নাটকীয় কার্য্যের অনুযায়ী। এই আদিরসের কবিতাতে কতকগুলি বাস্তব দৃশ্যের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে:—যথা,—বসন্ত ঋতু (রত্নাবলী ১ অঙ্ক), উদ্যান (৩ ও প্রিয়দর্শা ২), প্রাসাদ (৪) যুদ্ধ (৪ ও প্রিয়দর্শী ১)। হর্ষের কবিতাতে না-আছে কালিদাসের সরসতা, না-আছে কালিদাসের সৌন্দর্য্য, না-আছে কালিদাসের কল্পনা-সম্পদ। ইতিপূর্ব্বে রত্নাবলী হইতে আমরা যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হইবে। যাহাই হউক, ইহার কতক-গুলি নিজস্ব গুণ আছে যাহাতে করিয়া এই নাটিকাটী একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া

আছে। বিশেষত একটি গুণে ইহা সকলের চিত্তরঞ্জন করে। ভাবার্থের সরলতা ও ভাব প্রকাশের সরলতা; ভাষা বেশ বিশদ, পরিপাটী ও বিশুদ্ধ; কল্পনার রূপগুলি নূতন না হইলেও, বেশ সত্যানুযায়ী ও সুকুমার। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌধ-রহস্য

সেই সংক্ষুব্ধ সাগর বক্ষে একটা উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল, সেটা জাহাজেরই একটা সাঙ্কেতিক আলোক। আমরা দেখিলাম সর্ব্বনাশ! চোরা পাহাড় হ্যানশেল শৃঙ্গের উপর জাহাজ খানা কাত হইয়া পড়িয়া আছে। দেখিবা মাত্রই চিনিলাম এ—সেই—জাহাজ, যেখানাকে আমি বৈকালে দেখিয়া গিয়াছি, যে তাহার সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া সমস্ত হালের শক্তিতেও,—আপনার গুরুভার দেহ স্রোতের প্রতিকূলে টানিয়া আনিতে পারিতেছিল না।

সাঙ্কেতিক আলোকের সাহায্যে জাহাজ খানার পশ্চাতে ইউনিয়ান জ্যাকের পতাকা চিহ্ন দেখিয়া এখানা যে কাহাদের জাহাজ তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কম্পিত আলোকের মধ্য দিয়া আমরা এ জাহাজ খানার প্রত্যেক মাস্তুল,. কাছি সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম ।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলা ফেনপুঞ্জের কিরীট ধারণ করিয়া যেন পাতাল পুরী হইতে ক্রুদ্ধ দৈত্যদলের ন্যায় সৃষ্টি সংহারোদ্দেশে অক্লান্ত অশ্রান্ত তেজে ছুটিয়া আসিতেছিল। আলোটা যখন তাহাদের উপর পতিত হইতেছিল তখন মনে হইতেছিল—সেই হতভাগ্য দারুময় জাহাজখানা, তাহাদের সেদিনকার বুভুক্ষু উদরের একমাত্র শীকার। জাহাজের গাত্রে পর্ব্বতের মত সফেন তরঙ্গাঘাত—তাহাদের যেন গগনপূরিত ভৈরব নৃত্য!

জাহাজের মাস্তুল ধরিয়া প্রায় জন দশ বারো নাবিক বাদুড়ের মত ঝুলিতেছিল। তাহাদের মুখ কি ভয়ানক বিবর্ণ,—নৈরাশ্য কাতর! তাহারা যখন আমাদের আগমন বুঝিতে পারিল তখন সাহয্যের আশায় এমন সকরুণ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল যে, তাহা অবর্ণনীয়! আহা! হতভাগ্য বেচারারা আমাদের আগমনে যেন কোন অভিনব আশার বাণী শুনিতে পাইল। তাহাদের জাহাজের ছোট বোটখানা তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে,—মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া —আর গত্যন্তর নাই,—কি ভয়ানক সেই মৃত্যু চিন্তা!

মাস্তুলের উপর যাহারা বাদুড়ের মত ঝুলিতেছিল,—তাহারা ছাড়া, ভাগ্যসূত্রে জড়িত অপর আরোহীও জাহাজে ছিল।

সে অবস্থাতেও আমরা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, জাহাজের পশ্চাতের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া রেলীংএ ভর রাখিয়া যে তিনটি যাত্রী পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতেছিল—তাহারা যেন ভিন্ন জগতের জীব। পরিচ্ছদেও তাহাদের ভিন্নজাতিত্বের ও ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। তাহাদের মুখে চোখে শান্ত ঔদাসিন্যের ভাব

প্রকাশ পাইতেছিল। সম্মুখে যে আসন্ন মৃত্যু মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—তাহারা যেন সে বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ। আলোটা যখন ঘুরিয়া তাহাদের মুখের উপর পতিত হইল—আমরা তীর হইতে লক্ষ্য করিলাম সেই পাথরে কোঁদা মূর্ত্তিগুলির মাথায় প্রকাণ্ড হরিদ্রাভ বস্ত্রের পাগড়ী এবং তাহাদের উন্নতদেহ, সুদীর্ঘ নাসিকা, কৃষ্ণতার চক্ষু, উজ্জ্বলবর্ণ সমস্তই প্রাচ্য দেশীয়ের পরিচয়-জ্ঞাপক। অবশ্য আমাদের তখন পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না—শুধু চকিত দৃষ্টিপাতে যতটুকু দেখিয়া লওয়া সম্ভব,—কেবল ততটুকুই আমরা দেখিয়া লইয়াছিলাম।

জাহাজখানা চূর্ণ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। অর্দ্ধমৃত আরোহীগণের রক্ষার জন্যই আমরা মনোযোগী হইলাম। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানে যে লাইফ্ বোট্ খানা আছে—সেও—এখান হইতে দশ মাইল দূরে বেঅফ্লিউমে? কিন্তু ঐ সমুদ্রের বেলাভূমে বন্দরের উপর যে প্রকাণ্ড জেলেবোটখানা পড়িয়া আছে—ইহাকে ইচ্ছা করিলে কাজে লাগাইয়া লওয়া যায়। আমরা ছয় জনে দাঁড় লইয়া নৌকাখানার উপর চাপিয়া বসিলাম—বাকী কয়জনে তাহাকে ঠেলিয়া জলে নামাইয়া দিল। ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ের সহিত প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিতে করিতে আমরা বিপন্ন জাহাজ খানার দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমরা যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গের মাথার উপর আসিয়া পড়িলাম মনে হইল বুঝি সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়া যায়। দেখিলাম—যেমন মেষপালক তাহার মেষ বৃন্দকে তাড়াইয়া আসে তেমনি করিয়া বহু-উজ্জ্বল তরঙ্গস্রোতকে তাড়াইয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ডকায় দৈত্যের মত পর্ব্বতাকৃতি উত্তাল তরঙ্গ সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপপ্রদাতা বোতলবদ্ধ দৈত্যটা বুঝি মুক্তি পাইয়া আজ তাহার দীর্ঘ জীবনের বন্দীত্বের রুদ্ধ রোষ এক মুহূর্ত্তে মিটাইয়া দিয়া সৃষ্টির চিহ্ন লোপ করিয়া দিবে! দেখিতে দেখিতে তরঙ্গটা ঘোর শব্দে জাহাজের উপর আছাড়িয়া পড়িল। তার পর অনন্ত উর্ম্মিরাশি;—তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাত জাহাজ খানাকে একেবারে আক্রমণ করিল। চোরা পাহাড়ের শৃঙ্গের মুখগুলা তীক্ষ্ণধার, এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কাটা। জাহাজ খানা—দুই ধারের দুই খানা করাতের ন্যায় শৃঙ্গের মধ্যস্থলে পড়িয়াছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের আঘাতসংঘর্ষে শৃঙ্গগাত্রে চিরিয়া সেখানা একেবারে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। পশ্চাতের খণ্ডটা তাহার পতাকা চিহ্নিত মাস্তল আর সেই তিন অসাধারণ বিদেশী আরোহীকে লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর জলতলে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আর সম্মুখ ভাগটা মৃতকল্প আরোহীদের লইয়া মৃত্যু প্রতীক্ষায় পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন রহিল। জাহাজ ভাঙ্গার শব্দের সহিত তরঙ্গের ও হতভাগ্য আরোহীদের হৃদয় বিদারক যে হাহাকার ধ্বনি মিলিত হইল তাহা মর্ম্ম বিদারক; তীরে তীরে তাহার প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল। আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে অবর্ণনীয় বেদনার সহিত তাহা শুনিতে লাগিলাম।

ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ! আমরা নিরাপদে জাহাজের পাল তুলিবার দণ্ডটার নীচে পৌঁছিয়া মরণাপন্ন ভয়াতুর প্রত্যেক আরোহীকে আপনাদের জেলে বোটে উঠাইয়া লইতে পারিলাম।

ফিরিবার মুখে যখন আমরা অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছি দেখিতে পাইলাম আবার একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া জাহাজের ভগ্নঅংশে আঘাত করিল। সিগনাল লাইট্‌টা নিবিয়া গেল—অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে সমুদ্র বক্ষ ঝাপ্সা দেখাইতেছিল, সঙ্কুচিত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—কিছু নাই,—জাহাজের চিহ্ন মাত্র নাই—প্রকৃতির সেই ধ্বংস দৃশ্যের উপর একখানা গাঢ়কৃষ্ণ বর্ণের যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে মাত্র।

আমরা নিরাপদে তীরে উঠিলাম;—আমাদের তীরস্থিত বন্ধুরা আমাদের প্রশংসা করিতে করিতে আমাদের বিপন্ন সঙ্গীদের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। জাহাজের আরোহীর সংখ্যা মোট তেরটি, তাহারা ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কাপ্তেন মেডোজ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি যেমন বলিষ্ঠ—তেমনি সাহসী! ঘটনাটিকে তিনি যেন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। আশ্রয়হীন লোকগুলির মধ্যে দুই চারিজনকে এখানে ওখানে স্থান করিয়া দিয়া, অবশিষ্ট কয়েকজনকে লইয়া আমরা বাটী ফিরিয়া আসিলাম। প্রথমেই শুষ্ক বস্ত্র দিয়া তাহাদের শীত নিবারণ করিয়া, রন্ধন গৃহের অগ্নিকুণ্ডের নিকটে তাহাদের আনিয়া কিছু মদ্য ও মাংস দিয়া সুস্থ করিলাম।

কাপ্তেন মেডোজ তাঁহার স্থূলদেহ আমার পরিচ্ছদে টানিয়া বুনিয়া যথাসাধ্য আবরিত করিয়া আমাদের বসিবার ঘরে বাবার খুব নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন। আমার দিকে চাহিয়া একটুখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন "মিঃ ওয়েষ্ট, আপনি আর আপনার ঐ সাহসী সঙ্গীগুলির সাহায্য না পেলে আমরা এতক্ষণ চল্লিশ হাত জলের নীচে ঘুমিয়ে থাক্‌তেম। বেলিণ্ডারের কথা যদি বলেন?—বেচারা জীর্ণ পুরোণ তক্তা মাত্র—ওর জন্যে ওর সত্বাধিকারী বা আমাদের কারুই অন্তঃকরণে আঘাত লাগেনি, জাহাজ খানা ভাল রকম ইনসিওর করাও ছিল। আর কতকদিন বাদে জ্বালানি কাঠ ছাড়া ওখানা আর কোনই উপকারে আসত না।"

বাবা করুণার্দ্র ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু কাপ্তেন তোমার সেই তিনটী বিদেশী সহযাত্রীকে আমরা হয়ত- হয়ত কেন নিশ্চয়ই আর কখনও দেখতে পাবনা? সমুদ্রের ধারে ধারে লোক রেখেচি যদি তাদের কোন খোঁজ পায়। কিন্তু সে বৃথা আশা, আমি তাঁদের ভাঙ্গা মাস্তুলের সঙ্গে জলের নীচে তলিয়ে যেতে নিজের চোখে দেখেচি, ভগবান্ যদি হাত ধরে তাদের তীরে তুলে দেন এ ছাড়া ত বাঁচবার তাঁদের কোন আশাই নেই। নাঃ, বাঁচতে তাঁরা কিছুতেই পারেন না।"

কাপ্তেনের দিকে চাহিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তাঁরা কে? কোন মানুষ যে নিশ্চিত মৃত্যুর সাম্‌নে এমন অবিচল

নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে,— এর পূর্ব্বে আমার সে জ্ঞানই ছিল না ?"

ধূমপান করিতে করিতে চিন্তিত মুখে কাপ্তেন কহিলেন "তাঁরা কে ? বা তাঁরা কি ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। আমরা ভারতবর্ষের উত্তর করাচি থেকে শেষ জাহাজ ছাড়ি,—আর তাঁরা গ্লাসগোর যাত্রী বগায় তাঁদের তুলে নেই। তাঁদের মধ্যে ছোটটির নাম শনৎসুন। আমি এর সঙ্গেই একটু আধটু আলাপ সালাপ করেছিলুম। সবার সঙ্গে আলাপ না হলেও আমি তাঁদের নিরীহ শান্ত প্রকৃতি ভদ্রলোক বলেই মনে করেছিলেম। তাঁরা কি কাজ কর্ত্তেন –? না, সেকথা আমি তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু আমি আন্দাজ করেছিলেম যে তাঁরা পার্শী ব্যবসাদার! ভারতবর্ষে এত রকম জাত বাস করে যে ওদের কে যে কি তা বোঝাই দায়। ব্যবসায়ের—জন্যই হায়দ্রাবাদ থেকে আস্‌ছিলেন অবশ্য। এটা আমি আমার নিজের অনুমানের কথা বল্‌চি। আমি ত ভেবেই পেতেম না—যে এই নিরীহ নম্র-প্রকৃতির যাত্রী তিনটীকে,—আমাদের জাহাজ শুদ্ধ লোক এমন কি জাহাজের মেট্ পর্য্যন্ত, এত ভয় করত কেন ? তার কিন্তু এর চেয়ে একটু উন্নত জ্ঞান থাকা উচিত ছিল ?" আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম "ভয় করত ? তাঁদের ভয় করত ?"

"হাঁ, সবারই তাঁদের উপর কেমন একটা সংশয়ের ভাব ছিল। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি,—আপনি যদি এখন রান্নাঘরে যান শুন্‌তে পাবেন সেখানে এই কথারই আলোচনা চল্‌চে! এই যে অতর্কিত বিপদটা ঘটে গেল,—এর জন্যে দেখবেন যে সেই বেচারা ভালমানুষ যাত্রী তিনটিকে সর্ব্ববাদী বিচারে অপরাধী হতে হয়েচে ?"

কাপ্তেনের কথা শেষ হইবামাত্র একজন দীর্ঘাকার লাল দাড়ীওয়ালা ব্যক্তি ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইনি কাপ্তেনের সহকারী, আমাদের কোন দয়ালু প্রতিবাসীর নিকট একসেট পোষাক আর চর্ব্বি-লাগান এক জোড়া চক্‌চকে জুতা উপহার পাইয়াছিলেন। আমাদের আতিথ্যের ছোট রকম একটু প্রশংসা করিয়া তিনি অগ্নিকুণ্ডের নিকটে চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, তার পর বড় বড় খস্‌খসে হাত দুখানা আগুনের তাপে গরম করিয়া লইতে লইতে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কি বলেন—কাপ্তেন মেডোজ এখন কেমন মনে হচ্ছে ? বেলিওয়ারে ঐ হতভাগাগুলোকে তুল্লে যে কি ফল হবে, আমি তা আপনাকে অনেক আগেই গুণে বলিনি কি ?

কাপ্তেন মেডোজ তাঁহার স্থূলবাহুর ভর চেয়ারের হাতের উপর রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হো হো শব্দে প্রাণ খুলিয়া খুব এক চোট হাসিয়া লইলেন। হাসি থামিলে, সস্মিত অর্থযুক্ত কটাক্ষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখুন; আমিও কি এই কথাই বলিনি,—গুণ্‌তে শুধু উনিই জানেন তা নয়— আমিও কিছু কিছু শিখেছি ?" কথার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই হো হো হাসি আরম্ভ হইল। সহকারী তাহার মদ্যপানে আরক্ত মুখখানার বিরক্তি ভাব গোপন না করিয়াই

ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—"আপ্‌নি হাস্‌বেন্‌ না কেন? আপনার কি? ও ইন্‌সিওর করা ছেঁড়া জাহাজ বইত নয়? কিন্তু আমার—তেমন যে চমৎকার—সমুদ্রে বেড়াবার স্যুট্‌টা—সেই সব চমৎকার চমৎকার বাসন পত্র আহা—সে সব আর ফিরে পাবনা!

পূর্ব্বস্মৃতির উদয়ে, প্রিয় জিনিষগুলির বিয়োগবেদনায় তাহার মুখে যে সকরুণ ভাব জাগিয়া উঠিল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আমি কহিলাম—আপনার কথা থেকে তাহলে কি আমরা বুঝ্‌ব যে, ঐ যাত্রী তিনটির জন্যই এই বিপদ ঘটেছে,—এই আপনার বিশ্বাস?"

সহকারী কাপ্তেন আমার বিশেষণটির প্রতি জোর দিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হতভাগ্য কেন?"

"কারণ—নিশ্চয়ই—তাঁরা জলে ডুবে মরেচেন?"

একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া—অচঞ্চল স্বরে—তিনি উত্তর দিলেন "হুঁ, তারা মর্‌বার—ছেলেই বটে? কখোনো তারা মরেনি, তাদের বাপ সয়তান—নিশ্চয়ই তাদের বাঁচবার উপায় টুপায় করে রেখেছিল;—আপনি কি দেখেছিলেন—যখন মাস্তলটা ভেঙে বেরিয়ে যায়—তারা তখন পেছনদিকে দাঁড়িয়ে কেমন হাসিমুখে কথা কচ্ছিল?—আপনারা ডাঙ্গার মানুষ—এসবে হয়ত আশ্চর্য্য হবেন না,—আমার পক্ষে—এ—ই—ঢের? এই যে—কাপ্তেন—সমুদ্রে ইনি কালোচুল সাদা কল্লেন ইনি-ই কি, জানেন না যে "বেরাল" আর "পুরুত" জাহাজের পক্ষে সব চেয়ে খারাপ যাত্রী! কৃশ্চান পুরুত যদি "অযাত্রা" হয়—তা হলে পৌত্তলিক পুরুত তার পঞ্চাশ গুণ বেশী মন্দ হবে না কেন,—বলুন দেখি? আমি আমার পুরোণ ধর্ম্ম বিশ্বাস করি—আর—এই বিশ্বাস নিয়েই মর্‌ব।"

সেই কর্কশভাষী নাবিকের আস্তিকতায় আস্থা দেখাইবার চেষ্টায়—নাস্তিকতা প্রচারে—বাবা ও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি পুনরায় তাহার কথার প্রমাণ দেখাইবার জন্য, মোটা খস্‌খসে আঙুলে সংখ্যা গণনা করিয়া বিষয় গুলির বর্ণনা আরম্ভ করিলেন "ধর—যখন করাচিতে এসেছিল তখনই আপনাকে আমি ওদের নিতে বারণ করেচি কি না?" প্রতি বাক্যের সহিত কাপ্তেনের দিকে ভৎর্সনা সূচক দৃষ্টিপাত করিয়া আবার আরম্ভ করিলেন, "আমাদের জাহাজে তিনজন বৌদ্ধ খালাসী ছিল,—বরাবর আমি তাদের দিকে নজর রেখে আস্‌চি!—ঐ পুরুত তিনটে যখন জাহাজে এলো—মাঝি গুলো কি করে'ছিল তাও—আমি দেখেচি। জাহাজের কাঠের উপর পেট্‌ ঠেকিয়ে,—তারা নাক দিয়ে জমী ঘস্‌ছিল। যদি রাজকীয়—নৌসেনাপতি নিজে আস্‌ত—তাহলেও ব্যাটারা কখোনো এ রকম করত না! কে, কি রকম লোক তা ঐ হতভাগাগুলো ঠিক্‌ চিন্‌তে পারে—। আমি ত সেই পুরুত তিনটেকে যে মুহূর্ত্তে দেখেচি—সেই মুহূর্ত্তে বুঝতে পেরেচি—যে তারা আমাদের জন্যে অনেক দুঃখ কষ্ট—বয়ে নিয়ে আস্‌চে।" ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে নৈরাশ্যে সহকারীর কণ্ঠ অনেক সময় রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমি তাঁহার ক্ষণে

ক্ষণে পরিবর্ত্তিত মুখভাবের প্রতি সকৌতুক কটাক্ষে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। তিনি কহিলেন "কাপ্তেন! আমি আপনার সাম্‌নেই মাঝিদের জিজ্ঞাসা করেছিলুম—কেন তারা ও রকম কল্লে? তাতে—তারা উত্তর দিয়েছিল যে "ওনারা, সাধু সন্ন্যাসী?" তারা যে "সাধু সন্ন্যাসী" এ কথা বোধ হয় আপনি নিজের কানেই শুনেছিলেন?"

কাপ্তেন মেডোজ সহাস্য মুখে চুরুটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে উত্তর দিলেন "ভাল!—আমি ত অস্বীকার কচ্চি না, কিন্তু সেজন্য ক্ষতিটা কি হয়েছে শুনি?

"কি—যে হয়েচে তা আমি কেমন করে বল্‌ব? সবচেয়ে সাধু কৃশ্চান যে, সে ভগবানের সবচেয়ে কাছে যায়—আর সবচেয়ে' সাধু নীগার সয়তানের কোলের কাছে দাঁড়ায়,—আমার ত এই বিশ্বাস।—তার পর কাপ্তেন মেডোজ, আপনি দেখেচেন তারা বই পড়ত—কিন্তু সে কাঠের বই—? মাঝ রাত্তির পর্য্যন্ত বাইরে ডেকের উপর হিমে বসে কি সব বিড় বিড় করে উচ্চারণ কর্‌ত, মন্ত্র-তন্ত্র কিছু হবে। তার পর তাদের ম্যাপ? জাহাজ কোথা দিয়ে যাচ্চে, কি কচ্চে—সে খবরে তাদের দরকার? তারা রোজ রোজ ম্যাপে দাগ দিত কেন?"

কাপ্তেন মুখ ফিরাইয়া সিগারেটের ধূম ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন "নাঃ,—এসব তারা কিছু কর্‌ত না।"

"হাঁ,—আলবৎ কর্‌ত,—আপনাকে কেন এ সব কথা বলিনি? বল্লে আপনি বিশ্বাস কর্‌তেন কিনা? তর্ক করে উড়িয়ে দিতেন,—বরাবরই ত তাদের উপর আপনার অকারণ স্নেহ দেখে আস্‌চি!"

অভিমানে তাহার কণ্ঠস্বর বুজিয়া আসিতে-ছিল "তাদের—নিজেদের সব যন্ত্রপাতি ছিল—আর কখন্ যে সে সব তারা ব্যবহার কর্‌ত—তা যদিও আমি জানি না,—চোখেত কিছু দেখিনি, কিন্তু প্রতি দিন দুপুর বেলা "ল্যাটিচুড্" "লংগীচুড" ঠিক্ করে তাদের কেবিনের টেবিলের উপরকার পিন্ আঁটা ম্যাপখানাতে দাগ টেনে টেনে জাহাজের গতি নিরূপণ যে কর্‌ত, আমি ঠিক্ ধরেছিলুম।

কাপ্তেন একটু চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন, "বেশ! আমি স্বীকার কচ্চি—এ সব খুব আশ্চর্য্য, কিন্তু এ থেকে তুমি কি যে প্রমাণ কর্‌তে চাচ্চ,—তাত বুঝ্‌তে পাচ্চি না।"

সহকারী একটু বেগের সহিত কহিলেন, "আর একটি কথা আমি বল্‌ব—এই যে উপসাগরটার উপর আমরা এসে পড়েচি এর নাম কি জানেন?" কাপ্তেন সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "না"।

সহকারী তাঁহার মেঘাবৃত মুখখানাকে আরো গম্ভীর করিয়া কাপ্তেনের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট গম্ভীর করিয়া তুলিয়া পরিষ্কার ভাষায় উচ্চারণ করিলেন "কার্ক-মেডেন-উপ—সাগর"!

যদি কাপ্তেনকে আশ্চর্য্য করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপেই সিদ্ধ হইয়াছিল। সুগভীর বিস্ময়ে ধীরে ধীরে মেডোজ কহিলেন "বাস্তবিকই ঘটনাটি যে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক

সে কথা অস্বীকার করবার আমারও উপায় নেই? ঐ যাত্রীগুলি যেদিন প্রথম আসে—সেই দিন থেকে অনেকবার আমাদের জেরা করেছিল—যে কার্ক মেডেন "নামে কোন উপসাগর আছে,—কিনা"? এই হকিংস্—আর আমি নিজে বলেছিলুম যে আমরা সে সব কিছু জানি না। নূতন উপসাগরটা উপসাগরের মধ্যে ম্যাপেই ধরা আছে—কিন্তু এর ভিতর যে কখনও জাহাজ এসে ঢুক্‌বে—আর ধ্বংস হবে—একথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? আমরা ত উপসাগরের নামেরই খবর রাখ্‌তুম না!"

সহকারী চীৎকার করিয়া কহিলেন আমি দেখেছি কাল সকাল বেলা যখন বাতাস একদম ঠাণ্ডা ছিল, তারা আঙুল বাড়িয়ে ঠিক্ জায়গাটাকেই দেখাচ্ছিল; তারা খুব ভাল রকমই জান্‌ত যে কোন জায়গায়টায়—তারা এসে পৌঁছবে?"

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে বিস্ময় কাপ্তেনের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া ক্রমশই তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছে,—অত্যন্ত ম্লান উৎকণ্ঠিত স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন "হকিংস্,—এ থেকে তুমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েচ?"

"আমার কি মনে হয়েছে, জিজ্ঞেস্ কচ্চেন? আমার মনে হয় ঐ টেবিলের উপরকার—গ্লাসপূর্ণ পানীয়টা তুলে ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাওয়ায় আমাদের যতটুকু মেহনৎ, তাদের পক্ষে সমুদ্রে ঝড় তোলাও ততটুকু মেহন্নতের কাজ? তাদের নিজেদেরই হয়ত এই ভগবান্ বর্জ্জিত দেশে"—সহকারী আমার ও বাবার প্রতি যুগপৎ সস্মিত দৃষ্টিপাত করিলেন, "মাপ কর্‌বেন মশায়, এদেশে যে আপনারা বাস করেন এই টুকুই দেশের পক্ষে সাফাই—আর আশ্চর্য্যি" বলিয়া পুনরায় পূর্ব্ব কথার অবতারণা করিলেন, "এদেশে আস্‌বার তাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল, আর তাই জন্যেই তারা জাহাজখানাকে ভেঙে এই "আঘাটা"য় নামবার সহজ পন্থা বার করে নিয়েচে,—এই ত আমার বিশ্বাস,—আর আমার আন্দাজ আমি বরাবর দেখে আসছি, কক্ষণো প্রায় ভুল হয় না। কিন্তু ঐ তিনটে সাধু বা সন্ন্যাসীর—এই কর্ক মেডেন উপসাগরে কী যে এমন দরকারী কাজ পড়ে গেছে—সেই টুকুই কেবল আমার বুদ্ধিতে আস্‌চে না?"

উভয় ভদ্রলোকের এই অপ্রীতিকর মতামতের বিরুদ্ধে বাবার মনে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাক্যে তাহার আভাষ মাত্র প্রকাশ না করিয়াই, ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তিনি কহিলেন "এই আকস্মিক্ দুর্ঘটনা-টায় আপনাদের দুজনেরই শরীর মন যে রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েচে, তাতে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া খুব দরকার, চলুন আপনাদের—আমি বিশ্রামের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি?"

অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য জমিদার-বাটীর যে প্রশস্ত কক্ষটি নির্দ্ধারিত ছিল, বাবা তাঁহার নূতন অতিথিদ্বয়কে সেই গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "জ্যাক্, চল, আমরা একবার সমুদ্রের ধারটা একটু ঘুরে আসি যদি কোন নূতন ঘটনা আবার ঘটে থাকে?"

সেই ভগ্ন জাহাজখানার দুঃখপূর্ণ স্মৃতি-চিহ্নিত স্থানে আমরা আবার যখন ফিরিয়া

আসিলাম তখন উষার ক্ষীণ আলোক, রোগীর মুখের পাণ্ডুর হাসিটুকুর মতই, ধীরে ধীরে পূর্ব্বগগনে ফুটিয়া উঠিতেছিল। চন্দ্র ডুবিয়া যাইতেছে, বহুদূরব্যাপী মরুময় বাহু ভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া ক্ষীণ জ্যোৎস্না শুভ্র বসনের মত সমুদ্র তীরে বিছাইয়া রহিয়াছে। ঝড় থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু সমুদ্র এখনও শান্ত হয় নাই, তটপ্রহত উর্ম্মিভঙ্গের গর্জ্জন কল্লোল বাতাসের শব্দে মিশিয়া ভৈরব রাগিণীতে বিচিত্র সুরে বাজিতেছিল। ফেন-কিরীটশীর্ষ তরঙ্গগুলা ক্রোধোন্মত্ত শিকারীর ন্যায় পলাতক শীকারের সন্ধানে তখনও যেন ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছিল। বায়ুর তাড়নে ও তরঙ্গাঘাতে যে সকল ভগ্ন মাস্তুল, ছিন্নপাল প্রভৃতি তীরাভিমুখে ভাসিয়া আসিতেছিল জেলেরা তাহাই একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিল। ছোট ছোট ডিঙ্গিতে সমুদ্র তীর ভরিয়া উঠিয়াছিল, ভাসমান নষ্ট দ্রব্যাদির উদ্ধার সাধনে সকলেই মনোযোগী!

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন মৃতদেহ তাহারা দেখিয়াছে কিনা?" তাহারা উত্তর দিল "না কর্ত্তা, যে সব হাল্কা জিনিষ ভাস্‌তে পারে তারাই ঢেউয়ের চোটে ডাঙ্গায় এসে ছিট্‌কে পড়্‌চে,—কিন্তু যে সব ভারী জিনিষ নীচের টানে তলিয়ে যাচ্ছে, তাদের সমুদ্রের পেটের ভিতরে ছাড়া আর জায়গা কোথায়?"

যে হতভাগ্য বিদেশী তিন জন সমুদ্র গর্ভে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত যদি তাহারা সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত না হইত তাহা হইলেও স্রোতের টানে পর্ব্বত গাত্রে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইত, যেদিক দিয়াই যাউক মৃত্যু তাহাদের অনিবার্য্য?

বাড়ী ফিরিবার সময় বাবা অত্যন্ত দুঃখ পূর্ণ স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন 'মানুষের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র,—শক্তি কত হীন তবু তাই নিয়ে তারা ঈশ্বরের কাযের উপর বিচার চালাতে চায়? আহা, বেচারা সহকারী কাপ্তেনটির হঠাৎ বিপদে মাথাটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! তুমি কি শুনেছিলে জ্যাক? তিনি বল্‌ছিলেন যে সেই তিন জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই—সমুদ্রে এই ঝড় তুলেছিল? আমার বোধ হয় তাঁর কানের নীচে শরষের পুলটিস্ লাগালে কিছু উপকার হতে পারে। কিন্তু—তার চেয়ে আরএক কাজ কল্লে সহজে হয়—আমার ঘুমের সেই বড়ী দুটা তাঁকে খাইয়ে দিলে হয় না?"

ক্লান্তিতে আমার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ঘুমে চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছিল, হকিংসের বা কাপ্তেনের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করা তখন আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। আমি ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিলাম, আমার বোধ হয় আজ রাত্রিটা তাদের চুপ চাপ্ করে ঘুমুতে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল। তার পর কাল সকালে উঠে ওষুধপত্র ব্লিষ্টার পীল যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

এ কথার পর বাবা আর কিছু না বলায় তাঁহাকে শয়ন গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আমি টলিতে টলিতে শয্যা গ্রহণ করিলাম, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না। শয্যা গ্রহণের পর মুহূর্ত্তেই গভীর নিদ্রায় চৈতন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় ৮টা। কক্ষ মধ্যে সূর্য্যের যে সুবর্ণ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছিল সেই ঝিলমিলে রোদে গতরজনীর ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি যেন দূরস্মৃত স্বপ্নের মতই ভাসাভাসা মনে পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে প্রবল বাতাস আমাদের গৃহের ভিত্তিগুলা পর্য্যন্ত নাড়াইয়া দিতেছিল—সেই বাতাসই এখন আইভিলতার সবুজ পাতার ভিতর দিয়া মৃদু মধুর গান গাহিতে গাহিতে বহিয়া চলিয়াছে। এ যেন আরব্য রজনীর স্বপ্নকথার মতই অবিশ্বাস্য! প্রকৃতিরাণী তাঁহার আকস্মিক ক্রোধোপশমে অনুতপ্ত লজ্জায় যেন কুণ্ঠিত হইয়াই এখন অম্লান সূর্য্যকরে, মৃদু বাতাসে গত রজনীর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেছিলেন। বাগানে সলিলধৌত গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতার ভিতর লুকাইয়া কলকণ্ঠ বিহঙ্গেরাও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। নাইটিংগেলের মিষ্টসুর হারমোনিয়মের মতই সুমধুর। মেঘান্ত প্রভাতের কোমল আলোকে গত রজনীর শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ভুলাইয়া দিয়া প্রাণে একটি মধুর প্রসন্নতা জাগাইয়া তুলিল।

আমি যখন হলঘরে প্রবেশ করিলাম তখন রাত্রির বিশ্রামের পর জলমগ্ন নাবিকেরা সকলে একত্র হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া তাহাদের ভিতর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধূম পড়িয়া গেল। বাবা কহিলেন তিনি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন—তাঁহারা উইগটাউন সহরে গিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে গ্লাসগো যাইতে পারিবেন। পথে যাহাতে তাঁহাদের আহারের ক্লেশ না হয়—সে জন্য বাবা প্রত্যেক নাবিকের জন্য প্রচুর খাদ্য সামগ্রীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাপ্তেন মেডোজ্ কর্ত্তৃপক্ষদের তরফ হইতে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং আমরা তাঁহাদের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম সেই কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখে তিনি ও তাঁহার নাবিকেরা আমাদের ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জার রাগে রাঙাইয়া তুলিলেন।

প্রাতরাশের পর কাপ্তেনের সহিত সহকারী কাপ্তেন ও আমি একবার সমুদ্র-তীরে গমন করিলাম। শোচনীয় ঘটনা স্থলটির শেষ চিহ্ন একবার দেখিয়া যাইবার জন্য কাপ্তেনের ইচ্ছা হইয়াছিল। সমুদ্র বক্ষ তখনও থাকিয়া থাকিয়া যেন অভিমানী নায়িকার মর্ম্ম বেদনার মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সমুদ্র গর্জ্জন মন্দীভূত! তীরস্থ পর্ব্বত গাত্রে ঢেউগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আছাড় খাইতেছিল, সে শব্দ বড় মৃদু, বড় করুণ রাগিণীপূর্ণ। গত রজনীর বিশ্ব-সংহারোদ্যত ভাবের চিহ্ন টুকুও নাই। দিগন্তব্যাপী সুনীল বীচিমালা ফেনপুঞ্জের কিরীট ধারণ করিয়া ধীরে গম্ভীরে তালে তালে সমুদ্র বেলায় আহত হইয়া ফিরিতেছিল। বেলা ভূমের অনতি দূরে—তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে জাহাজের বড় মাস্তলটা ভাসিতেছে। স্থানে স্থানে ধীবর ও কৃষকেরা ভগ্নখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকৃতি করিয়াছে। জাহাজখানি যেখানে জলমগ্ন হইয়াছিল ঠিক সেইখানে সমুদ্রের উপর দুইটা 'গাংচিল পাখা ঝাড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতে

ছিল। মনে হইতেছিল তাহারা বুঝি জলের ভিতর সেই শোচনীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান পাইয়াছে।

সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ব্যথিত স্বরে কাপ্তেন কহিলেন, "জাহাজ খানা খুব পুরণ বটে,—তবু সে আমাদের অনেক দিনের সুখ দুঃখের সঙ্গী, রোদ-বৃষ্টি ঝড়ঝঞ্ঝায় অকূল সমুদ্রের আশ্রয় গৃহ!"

কাপ্তেনের ব্যথিত স্মৃতিকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে আমি কহিলাম "কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য—এখনকার এই সৌম্য শান্ত গাম্ভীর্য্যময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে কে মনে করতে পারে যে এই খানেই তিনটি অমূল্য মানব-জীবন হারিয়ে গেছে?"

একটু আবেগের সহিত মেডোজ্ কহিলেন "আহা বেচারারা? যদি আমরা চলে যাবার পর তাদের মৃত দেহ তীরে ভেসে আসে তাহলে মিঃ ওয়েষ্ট আপনি তাঁদের দেহের উপযুক্ত সৎকার করবেন ত?"

কাপ্তেনের কথার উত্তর দিতে যাইব এমন সময় সহকারী সহাস্য চীৎকার স্বরে কহিলেন "যদি তাদের গোর দিতে চান একটু শীঘ্র শীঘ্র সে কাজটা সেরে ফেল্‌বেন। তা না হলে তারা হয়ত আবার এদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে। কাল আমি কি বলেছিলুম মনে আছে ত? একবার ঐ ঢিবিটার দিকে চেয়ে দেখুন দেখি কি রকম মনে হয়—!"

আমরা চাহিয়া দেখিলাম তীরে অনতিদূরে একটা কঠিন মৃত্তিকা ও নুড়ীর স্তূপের উপর এক জন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। সহকারীর বদ্ধদৃষ্টি সেই লোকটির প্রতিই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত আকৃষ্ট হইয়াছিল। কাপ্তেন সেই দিকে চাহিয়া যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কি আশ্চর্য্য! তাইত—এ যে দেখ্‌চি শনৎস্নুন নিজে? চল আমরা ওঁর কাছে এগিয়ে যাই—" অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে দ্রুতপদে কাপ্তেনকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

স্তূপারূঢ় ব্যক্তি নামিয়া ধীর মৃদুমন্দ গমনে আমাদের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার মস্তক ঈষৎ অবনত,—ওষ্ঠে কোমল স্নিগ্ধ সহাস্য ভাব! জগতের কর্ম্ম কোলাহলে ব্যস্ত, আত্ম অহঙ্কারে পরিপূর্ণ মানব আমরা—আমাদের মাথা সেই সৌম্য শান্ত গাম্ভীর্য্যের নিকট যেন আপনা হইতে নত হইয়া গেল। তাঁহার স্থির অকম্পিত কৃষ্ণতার চক্ষুর চিন্তাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যময় দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন আমাদের শিক্ষাদাতা—আর আমরা যেন এক দল স্কুলের বালক—!

আমার জ্ঞানে আমি এমন মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই! এমনতর দিব্য কান্তি মানুষের যে থাকিতে পারে তাহা কখন চিন্তাও করি নাই! প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, প্রাণস্পর্শী দৃষ্টি, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ ক্ষোদিত মূর্ত্তির মতই মনোজ্ঞ মনোহর! সম্ভ্রমে ভক্তিপূর্ণ বিস্ময়ে আমি অবাক হইয়া তাঁহারই পানে চাহিয়া রহিলাম। স্থৈর্য্য এবং ক্ষমতা-জ্ঞাপক একটি ভাব তাঁহার মুখে ব্যাপ্ত থাকিলেও বাহিরের প্রশান্ততার তাহা বিরোধী নহে। তাঁহার জানু পর্য্যন্ত ঢাকা একটি গেরুয়া

রঙ্গের রেশমী আলখাল্লা, মাথায় একটা গেরুয়া রঙ্গের সুবৃহৎ পাগড়ী, পায়ে শিং-উল্টান অদ্ভূত দর্শনের পশ্চিম দেশীয় নাগরা নামধারী এক প্রকার জুতা। তাঁহার অত্যন্ত নিকট-বর্ত্তী হইয়া আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, গত রাত্রির জলে ভেজার কোন চিহ্নই তাঁহার পোষাকে ছিলনা, একটি কুঞ্চিত রেখা, এতটুকু বর্ণহীনতা, জলের দাগ কিছুই না।

সুমিষ্ট সহাস্য স্বরে মেডোজ্ ও তাঁহার সহকারীর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "কালকের চুবন খেয়েও তাহলে আপনাদের বিশেষ কষ্ট হয়নি দেখ্‌চি, আপনার অনুগত গরীব খালাসীরা, তারা সব থাক্‌বার ভাল জায়গা পেয়েচে ত?"

কাপ্তেন বলিলেন "আমরা সকলেই নিরাপদে আশ্রয় পেয়েচি, কিন্তু আপনার আর আপনার বন্ধু দুজনের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা মনে না আসায় এইমাত্র আমি মিঃ ওয়েষ্টকে আপনাদের দেহের উপযুক্ত সৎকার কর্‌বার জন্যে অনুরোধ কচ্ছিলেম। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, তিনি আপনাদের আশ্চর্য্য উপায়ে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

সন্ন্যাসী উন্নত মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটু খানি ঔদাসিন্যের মৃদু হাসি তাঁহার আরক্ত ওষ্ঠের মধ্যেই বদ্ধ রহিল। "এখন কিছু কালের জন্য আমরা মিঃ ওয়েষ্টকে সে বিষয়ে কোন কষ্ট দেব না? আমি আর আমার সঙ্গী দুজন এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা নির্জ্জন ভাঙা কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েচি। জায়গাটি খুবই নির্জ্জন, কিন্তু আমাদের ভজনের পক্ষে ভারী চমৎকার স্থান।"

কাপ্তেন কহিলেন, আমরা আজ সন্ধ্যার ট্রেনে গ্লাসগো যাচ্চি, আপনারা যদি আমাদের সঙ্গী হন তাহলে আমরা অত্যন্ত সুখী হব। আমার বোধ হয় এর আগে আপনারা আর কখনও ইংলণ্ডে আসেন্‌নি তাহলে কিন্তু একা সহরে বেড়ান আপনাদের পক্ষে ভারী কষ্টকর হবে।"

সন্ন্যাসী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে উত্তর দিলেন "ধন্যবাদ মিঃ মেডোজ! আপনার সহৃদয়তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ! কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন আমরা এইখানেই থাক্‌ব মনে করেচি। প্রকৃতি মাতা আমাদের স্বেচ্ছায় যেখানে এনে ফেলেছেন আমরা সেইখানটিকেই একটু ভাল করে দেখতে ইচ্ছে কর্‌চি, সেইজন্যই আপনার স্নেহের আহ্বান নিতে পাল্লেম না, মাপ করবেন।"

কাপ্তেন স্কন্ধ গুটাইয়া একটু তাচ্ছিল্য ভঙ্গিতে কহিলেন "যা ভাল বোঝেন,—এ জায়গাটাতে বিশেষ কিছু যে দেখবার শোনবার আছে তাত আমার মনে হচ্চে না,—আমার মনে হয় এটা যেন ঈশ্বর বর্জ্জিত দেশ।।"

শনৎস্নন হাসিতে লাগিলেন, "আমার কিন্তু উল্টো মত। আপনার হয়ত মিলটনের সেই লাইনটা মনে আছে "স্বর্গ ও নরক মানুষের নিজের মনে।" আমার বোধ হয় আমরা এখানে দিন কতক বেশ আনন্দেই কাটাতে পারব। তা ছাড়া এটা যে কেবল অসভ্যদেরই দেশ, আমার ত এমন বোধ হচ্চে না। তার কারণ আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে এই যুবাপুরুষের পিতা, জন হাণ্টার ওয়েষ্ট

—যাঁর নাম আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও খুব সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন—তিনি ত এই প্রদেশেই বাস কচ্চেন?"

আমি একটুখানি বিস্মিত ভাবে কহিলাম "সত্য সত্যই বাবা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।" সন্ন্যাসী অত্যন্ত ধীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন "এ রকম একজন মহানুভব ব্যক্তির অবস্থানে বন প্রদেশকেও সহবে পরিণত করে, অসংখ্য ইষ্টককাষ্ঠবেষ্টিত অট্টালিকার চেয়ে—একটি মহান আত্মা—সভ্যতার ঢের বেশী উচ্চনিদর্শন! যদিও স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্—কিম্বা ব্যাবণ ভন্‌হামার পার্গষ্টনের ন্যায়—অমন গভীর ভাবে প্রাচ্যভাষায় তাঁর দখল নেই তবু ঐ দুজনের অনেক গুলি গুণ তাঁতে বিদ্যমান আছে। আমার হয়ে মিঃ ওয়েষ্ট আপনি আপনার পিতাকে বল্‌তে পারেন যে তিনি তামুলিক ও সৈদীধাতুর মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেচেন—সেটা কিন্তু তাঁর ভ্রম!"

আমি উত্তর দিলাম "আপনি যখন এই জলাভূমিতে কিছুদিন বাস করে আমাদের সম্মানিত করতে ইচ্ছা করেছেন তখন বাবার সঙ্গে আলাপ না কল্লে তিনি ভারী দুঃখিত হবেন। তিনি এ দেশের জমিদারের প্রতিনিধি—আর আমাদের স্কটল্যাণ্ডের নিয়ম এই যে, কোন বৈদেশিক বিখ্যাত লোক এদেশে এলে জমিদারগৃহই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মুক্ত থাকে।" আমার আতিথ্যপ্রিয়তাই তাঁহাকে আমাদের গৃহে অভ্যর্থনার প্রধান কারণ, ইহার অপর কোন নূতন কারণ ছিল না, কিন্তু সহকারী আমার কথায় এমন ভাবে আমার জামার হাতা ধরিয়া টানিয়া চক্ষুর কটাক্ষে ইশারা করিলেন, যাহাতে বুঝিলাম যে সন্ন্যাসীদের আতিথ্য প্রদান করি ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। তাঁহার আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিয়া শনৎস্থন আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন "আপনার নিমন্ত্রণে আমি ও আমার বন্ধুরা বিশেষ সম্মানিত হলেম, কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেইখানেই আমরা থাক্‌তে ইচ্ছে কচ্চি। তার একটু বিশেষ কারণও আছে, যে কুটীরটিতে আমরা এখন বাস কচ্চি সেটি যদিও নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত, আর স্থানে স্থানে ভগ্ন তবু আমাদের বেশ ভালই লেগেচে। ইউরোপীয়ানদেব যে সকল জিনিষ না হলে চলে না—ভারতবাসী আমরা—আমাদের সেগুলো অনাবশ্যক ভার বলেই মনে হয়। কারণ আমাদের বিশ্বাস যার যত আছে সেই অনুপাতে সে ধনী নয়—যে যত ত্যাগ করতে পারে—প্রকৃত পক্ষে সেই তত ধনী। একজন দয়ালু জেলে আমাদের কিছু কিছু শাক আর রুটি দিয়ে যাচ্চে,—শয়নের জন্য প্রচুর শুষ্ক খড় আছে—মানুষের এর চেয়ে বেশী প্রয়োজনই বা কি?"

কাপ্তেন কহিলেন "আপনাদের উষ্ণপ্রধান দেশে ওতে চল্‌তে পারে—কিন্তু এখানকার ঠাণ্ডায় আপনাদের কষ্ট হচ্চে না ত?"

জলধিবক্ষনিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন "হতে পারে সময় সময় আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়—কিন্তু আমরা সেটা কৈ লক্ষ্য করিনি, আমরা বহুকাল চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের অধিত্যকায় কাটিয়েচি—ঠাণ্ডায় আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না।" •

আমি কহিলাম "যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি করেন তাহলে আমরা কিছু মাছ মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আপনাদের জন্যে উপহার পাঠিয়ে দিই।" সন্ন্যাসী হাসিলেন, কহিলেন, "আমরা ত কৃশ্চান নই—আমরা উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ,—আমাদের শাস্ত্র অহিংসা ব্রত গ্রহণ করতে উপদেশ দেন, নিজের দেহ রক্ষার জন্য মানুষের জীবহত্যা করবার যে কোন অধিকার আছে তা আমরা মনে করি নে, মানুষ যে জিনিষ, যে দুর্ল্লভ জীবন ধন, দান করতে পারেনা বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত সে জীবন গ্রহণ করবার ভগবদ্দত্ত তার কোন অধিকারই নেই। মাপ করবেন আপনার দেওয়া উপহার আমরা গ্রহণ করতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম।"

এ কথার এইখানেই শেষ করিয়া দিয়া কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া সস্মিত মুখে কহিলেন "কাপ্তেন মোডোজ্ বিদায়,—জাহাজে আপনি আমাদের সঙ্গে যে রকম অসাধারণ সদ্ব্যবহার করেছেন তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন্, ভগবান আপনাকে আনন্দ দিন,—আর সহকারী মহাশয় আপনাকেও বিদায় জানাচ্চি —এক বৎসরের মধ্যে আপনি আপনার নিজের জাহাজ নিয়ে বেরুতে পারবেন।—মিষ্টার ওয়েষ্ট, এদেশ ত্যাগ করে যাবার পূর্ব্বে—আমার বিশ্বাস আবার আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে—নমস্কার।" মস্তক ঈষৎ নমিত করিয়া আমাদের অভিবাদন জানাইয়া ধীর গাম্ভীর্য্যময় পদ বিক্ষেপে তিনি যেদিক হইতে আসিয়াছিলেন সেই দিকেই চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর পথে ফিরিবার সময় কাপ্তেন মোডোজ স্মিতমুখে কহিলেন "হকিংস্ এক বছরের মধ্যেই তুমি ত জাহাজের মালিক হচ্চ? আমি তোমায় অভিনন্দন কচ্চি?"

সন্তোষের হাসি হাসিয়া সহকারী উত্তর দিলেন, "সে সব কি—আর এসব কপালে হবে? কিন্তু বলাও যায় না কিছু। কি থেকে কি হয়—বিশেষ ওসব লোকের কথা?"—কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু বিশেষ বাহাদুরি-ব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে যুগপৎ কাপ্তেন ও আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া পুনরায় কহিলেন, "মিঃ ওয়েষ্ট লোকটিকে দেখ্‌লেন ত, কি মনে হয়?"

সন্ন্যাসীর অপরিবর্ত্তিত প্রশান্ত কোমল কণ্ঠস্বর তখনও আমার কর্ণে সুমধুর বাদ্যযন্ত্রের মত বাজিতেছিল, অপরূপ সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি তখনও আমার মানসনেত্রে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, বুকের ভিতরটা যেন দুলিতে-ছিল—তাহা আশ্চর্য্যে কি আনন্দে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তখন অম্লান রৌদ্রে সমস্ত আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, সমুদ্রের গর্জ্জনধ্বনি যেন আমার হৃদয়ের শান্তভাবের সহিত সুর মিলাইয়া বাজিতেছিল, স্নিগ্ধ বাতাসে জড় ও চেতনের মর্ম্মে মর্ম্মে একটা আনন্দের উজ্জ্বল রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। স্বপ্নপূর্ণ দৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সচকিত হইয়া সহকারীর প্রশ্নে উত্তর দিলাম "চমৎকার! সত্য সত্যই লোকটিকে দেখে আমি চমৎকৃত হয়েচি। কি সুন্দর মাথার গড়ন, কি মহিমাব্যঞ্জক ধরণধারণ, সাধারণ যুবাপুরুষদের মধ্যে এমন উন্নত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব আমি আর কখনও দেখিনি। আচ্ছা এঁর বয়স কত

হবে? তিরিশ হবে কি? আমার বোধ হয় তিরিশের চেয়ে কম?" সহকারী সবজান্তা ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওঁ হুঁ চল্লিশ!" কাপ্তেন একটু গম্ভীর ভাবে হাসিয়া কহিলেন "না, ষাটের একটি দিনও কম নয়—দু চার বছর বেশী হতে পাবে? মিঃ ওয়েষ্ট আপ্‌নি হাস্‌চেন, কিন্তু আমি প্রমাণ দিচ্চি। আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে এঁদের আমি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে কথা বার্ত্তা কইতে শুনেচি; তখন ইনি যুবাপুরুষ,—আর আফগান যুদ্ধ,—আজ চল্লিশ বছরের উপর হয়ে গ্যাছে।

আমি আশ্চর্য্য ভাবে কহিলাম "ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু! ওঁর চোখের উজ্জলতা আমাব চোখের চেয়েও বেশী, গায়ের চর্ম্ম আমার চেয়েও মসৃণ, মাথার চুল যতটুকু দেখাগেল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বলেই ত অনুমান হোল;—এঁদের কয়জনের মধ্যে ইনিই বোধহয় সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ?" কাপ্তেন হাসিতে লাগিলেন, "না সবচেয়ে ছোট,—সেই জন্যেই যখন কথাবার্ত্তা কবার দরকার হয় ইনিই কয়ে থাকেন। এঁর আর দুজন যে সঙ্গী তাঁরা—বহু উচ্চে। পার্থিব বিষয়ে তাঁরা কখনও কোন আলোচনা করেন না।" আমি কহিলাম 'আমাদের এই সমুদ্রের ধারে এ পর্য্যন্ত যত রকম মানুষ বা জিনিষ এসেছে তার মধ্যে এঁরাই সব চেয়ে চমৎকার! বাবা এঁদের দেখ্‌লে এত সুখী হবেন,—" বাধা দিয়া সহকারী কহিলেন, "খুসী একটু কম হলেও চল্‌বে। আমার পরামর্শ নিন, ওদের সঙ্গে যতটা পারেন কম করে মিশবেন। আমি যদি কখন নিজের জাহাজ চালাই—আপনাদের বলে রাখছি ও রকম যাত্রী কখনো নেব না।—আসুন এখন আমরা নঙ্গর টঙ্গর তুলে তৈরী, আপনাদের কাছে বিদায়।"

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম দরজার কাছে তাঁহাদের জন্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। মাল ও মানুষে গাড়ী খানা বোঝাই। কোচ-ম্যানের দুই পার্শ্বে কাপ্তেন ও তাঁহার সহকারীর স্থান ছিল, তাঁহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া আবার আমাদের জয়ধ্বনি তুলিলেন তাহার পর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উইগ টাউনের তরুচ্ছায়াঘেরা ক্রুমবারের পথে তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া গেল—ততক্ষণ আমরা হাত নাড়িয়া, রুমাল নাড়িয়া তাঁহাদের বিদায় জানাইয়া ছিলাম। কিন্তু অতিশীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র সীমা নির্দ্দিষ্ট পৃথিবী হইতে তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। কেবল আমাদের বেলাভূমিকে জাহাজের ভগ্নাংশে এবং তাহার শোচনীয় পরিণামের করুণ কাহিনীতে প্রকৃতির পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা ভরাইয়া রাখিয়া, আমাদের স্মৃতির মন্দিরে একটি সুকরুণ সহানুভূতির যোগ করিয়া দিয়া গেলেন।

শ্রীসুরূপা দেবী।

নোবেল প্রাইজ

সব জিনিষেরই দুটি দিক আছে—একটি সদর আর একটি মফস্বল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Nobel Prize পেয়েছেন বলে বহুলোক যে খুসি হয়েছেন তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সকলে যে সমান খুসি হন্‌নি এ সত্যটি তেমন প্রকাশ হয়ে পড়ে নি। এই বাঙ্গলাদেশের একদল লোকের, অর্থাৎ লেখক সম্প্রদায়ের, এ ঘটনায় হরিষে বিষাদ ঘটেছে। আমি একজন লেখক সুতরাং কি কারণে ব্যাপারটি আমাদের কাছে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সেই কথা আপনাদের কাছে নিবেদন কর্‌তে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ যখন একজন বাঙ্গালীলেখক এই পুরস্কার লাভ করছেন, তখন আর একজনও যে পেতে পারে, এই ধারণা আমাদের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে যে তা উপড়ে ফেল্‌তে গেলে আমাদের বুক ফেটে যাবে! অবশ্য আমরা কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নই, বড় জোর তাঁর স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ, তাই বলে' পড়্‌তাটা যখন এদিকে পড়েছে তখন আমরা যে Nobel Prize পাব না এ হতে পারে না। সাহিত্যের রাজটীকা লাভ করা যায়—কপালে। তাই বল্‌ছি আশার আকাশে দোদুল্যমান এই টাকার থলিটি চোখের সুমুখে থাকাতে লেখা জিনিষটে আমাদের কাছে অতি সুকঠিন হয়ে উঠেছে।

স্বর্গ যদি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ হয়, আর তার লাভের সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে তাহলে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চলাফেরা দূরে থাক্, তার পক্ষে পা ফেলাই অসম্ভব হয়, এই ভয়ে, পাছে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলি। তেমনি Nobel Prizeএর সাক্ষাৎ পাওয়া অবধি, লেখা সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমাদের এত বেড়ে গেছে যে আমরা আর হাল্‌কা ভাবে কলম ধর্‌তে পারি নে।

এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র Swedish Academyর মুখ চেয়ে লিখ্‌তে বাধ্য। অথচ যে দেশে ছমাস দিন আর ছমাস রাত সে দেশের লোকের মন যে কি করে' পাব তাও বুঝতে পারি নে। এইটুকু মাত্র জানি যে আমাদের রচনায় অর্দ্ধেক আলো আর অর্দ্ধেক ছায়া দিতে হবে, কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে, তার হিসেব কে বলে দেয়? Sweden যদি বারোমাস রাতের দেশ হত, তাহলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উপর কালির পোঁচড়া দিয়ে যেতে পার্‌তুম; আর যদি বারোমাস দিনের দেশ হত, তাহলেও নয় ভরসা করে সাদা কাগজ পাঠাতে পারতুম। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ হওয়াতেই আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি।

দ্বিতীয় মুস্কিলের কথা এই যে, অদ্যাবধি বাঙ্গলা আর বাঙ্গালী ভাবে লেখা চল্‌বে না। ভবিষ্যতে ইংরেজি তর্জমার দিকে এক নজর রেখে,—এক নজর কেন পুরোনজর রেখেই—আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য গড়্‌তে হবে। অবশ্য আমরা সকলেই দোভাষী,

আর আমাদের নিত্য কাজই হচ্ছে তর্জমা করা। কিন্তু সব্যসাচী হলেও এক তীরে দুই পাখী মেরে উঠতে পারি নে। আমরা যখন বাঙ্গলা লিখি তখন ইংরেজির তর্জমা করি, কিন্তু সে না জেনে; আর যখন ইংরেজি লিখি তখন বাঙ্গলার তর্জমা করি, সেও না জেনে। কিন্তু এখন থেকে ঐ কাজই আমাদের সজ্ঞানে করতে হবে মুস্কিল ত ঐ খানেই। মনোভাবকে প্রথমে বাঙ্গলা ভাষার কাপড় পরাতে হবে, এই মনে রেখে যে আবার তাকে সে কাপড় ছাড়িয়ে ইংরেজি পোষাক পরিয়ে Swedish Academyর সুমুখে উপস্থিত করতে হবে। এবং এর দরুণ মনোভাবটীব চেহারাও এমনি ত'য়ের করতে হবে, যে শাড়ীতেও মানায় Gownএও মানায়।

এক ভাষাতে চিন্তা করাই কঠিন, কিন্তু একসঙ্গে, যুগপৎ, দুটি ভাষাতে চিন্তা করাটা অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কায়ক্লেশে আমাদের সেই অসাধ্য সাধন করতেই হবে। একটি বাঙ্গালী আর একটি বিলাতি এই দুটি স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন তাঁরাও জানেন। তা ছাড়া এ উভয়ের প্রতি সমান আসক্তি না থাকলে এ দুই সংসার করাও মিছে। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি চাইকি মানুষের হতেও পারে, কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনুরাগ হওয়া অসম্ভব, কেননা মানুষের চোখ দুটি হলেও হৃদয় শুধু একটি। স্ত্রৈণ হতে হলে একটি মাত্র স্ত্রী চাই। এমন কি, দুই দেবীকে পূজা করতে হলেও পালা করে করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরের অর্দ্ধেক সময় আমাদের বাঙ্গলা লিখতে হবে আর অর্দ্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তরজমা করতে হবে। ফিরেফিরতি সেই Swedenএর কথাই এল। অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছমাস রাত আর ছমাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের কারও নেই।

তৃতীয় মুস্কিল এই যে, সে তর্জমার ভাষা চলতি হলে চলবে না। সে ভাষা ইংরেজি হওয়া চাই অথচ ইংরেজের ইংরেজি হলেও হবে না। দেশী আত্মা এমনি ভাবে বিলাতি দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া চাই, যাতে তার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারটুকু বজায় থাকে। ফুল ফোটাতে হবে বিলেতি কিন্তু তার গায়ে গন্ধ থাকা চাই দেশী কুঁড়ির। প্রজাপতি ওড়াতে হবে বিলেতি কিন্তু তার গায়ে রং থাকা চাই দেশী পোকার। এক কথায় আমাদের পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ওঠাতে হবে। এহেন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিদ্যা অবশ্য আমাদের নেই।

কাজেই যে কার্য্য আমরা একদিন বাঙ্গলায় করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছি—রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ - তাই আবার দোকর করে ইংরাজিতে করতে হবে। ইউরোপে আসল জিনিষটি গ্রাহ্য হচ্ছে বলে নকল জিনিষটিও যে গ্রাহ্য হবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। ইউরোপ এদেশে মেকি চালায় বলে', আমরাও যে সে দেশে মেকি চালাতে পারব এমন ভরসা আমার নেই।

ফলে আমরা সাদাকে কালো, আর কালোকে সাদা যতই কেন করি না,—

আমাদের পক্ষে Nobel Prize সিকেয় তোলা রইল। কিন্তু যদি পাই? বিড়ালের ভাগ্যে সে শিকে যদি ছেঁড়ে! সেও আবার বিপদের কথা হবে। Nobel Prize পাওয়ার অর্থ শুধু অনেকটা টাকা পাওয়া নয়, সেই সঙ্গে অনেকখানি সম্মান পাওয়া। অনর্থ এ ক্ষেত্রে অর্থ নয়, কিন্তু তৎসংসৃষ্ট গৌরব টুকু। বাঙ্গলা লিখে আমরা কি অর্থ কি গৌরব, কিছুই পাই নে। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই এবং পুরষ্কারের মধ্যে লাভ করি তার চাটু টুকু। স্বদেশের শুভইচ্ছার ফুলচন্দন কালেভদ্রেও আমাদের কপালে জোটে না বলে' ইউরোপ যদি উপযাচী হয়ে, আমাদের মাথায় সাহিত্যের ভাইফোঁটা পরিয়ে দেয়, তাহলে তার ফলে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাস হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

প্রথমেই দেখুন, যে, Nobel Prize এর তারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শত শত চিঠি পাব। এবং এই অসংখ্য চিঠি পড়্তে এবং তার উত্তর দিতেই আমাদের দিন কেটে যাবে, সাহিত্য পড়্বার কিম্বা গড়্বার অবসর আর আমাদের থাকবে না। এক কথায় সমাজের খাতিরে, ভদ্রতার খাতিরে, আমাদের সাহিত্যের ফুলফল ছেড়ে শুধু শুষ্কপত্রের রচনা করতে হবে। এই কারণেই বোধ হয় লোকে বলে যে Nobel Prize লাভ করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্যজীবনের মোক্ষ লাভ করা।

আর এক কথা, টাকাটা অবশ্য ঘরে তোলা যায় এবং দিব্য আরামে উপভোগ করা যায়, কিন্তু গৌরব জিনিষটে ওভাবে আত্মসাৎ করা চলে না। দেশশুদ্ধ লোক সে গৌরবে গৌরবান্বিত হতে অধিকারী। শাস্ত্রে বলে "গৌরবে বহুবচন।" কিন্তু তার কত অংশ নিজের প্রাপ্য আর কত অংশ অপরের প্রাপ্য সে সম্বন্ধে কোন একটা নজির নেই বলে', এই গৌরব-দায়ের ভাগ নিয়ে স্বজাতির সঙ্গে, একটা জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অপর পক্ষে যদি একের সম্মানে সকলে সমান সম্মানিত জ্ঞান করেন এবং সকলের মনে কবির প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে তাতেও কবির বিপদ আছে। ত্রিশ দিন যদি বিজয়াদশমী হয়, এবং ত্রিশকোটি লোক যদি আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তাহলে নররূপধারী একাধারে তেত্রিশকোটি দেবতা ছাড়া আর কারও পক্ষে অজস্র কোলাকুলির বেগ ধারণ করা অসম্ভব। ও অবস্থায় রক্তমাংসের দেহের মুখ থেকে সহজেই এই কথা বেরিয়ে যায় যে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" এবং ও কথা একবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলে, তার ফলে, কবিকে কেঁদে মরতে হবে।

তাই বলি, আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের পক্ষে Nobel Prize হচ্ছে দিল্লির লাড্ডু— যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ও'ভি পস্তায়া।

বীরবল।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনার

ডাক্তার স্পুনার কেবল মাত্র আট বৎসর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করিয়াছেন; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অল্প নহে। সম্প্রতি তিনি পাটলিপুত্রের খনন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্পুনার ১৮৯৯ সনে আমেরিকায় কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ পরীক্ষায় সম্মান লাভ করেন। জাপানের রাজধানী টকিও নগরে তিনি কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়া পরে পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে ১৯০১ হইতে ১৯০৪ সন পর্য্যন্ত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া "মধ্যম" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাশীবাসকালে তিনি আমেরিকার হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ লাভ করেন। হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে সাধারণতঃ একব্যক্তি একাধিকবার সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। কিন্তু, মিঃ স্পুনারকে দুইবার সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্বকীয় গুণগ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

১৯০৪ সনেই স্পুনার সাহেব গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ অধ্যাপক কিলহর্ণের নিকটে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে গমন করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে পুনর্ব্বার হার্ব্বার্ডে গমন করিয়া পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্রে ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সম্মানসূচক "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ স্পুনার।

১৯০৬ সনে ডাক্তার স্পুনার "সীমান্ত প্রদেশীয়" প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ লাভ করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯০৭ সনে তিনি মর্দ্দান জিলার সারিবাহল নামক স্থানে খননে নিযুক্ত থাকিয়া কারুকার্য্য শোভিত অনেকগুলি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার আবিষ্কৃত কুবের ও হরিতির চিত্র আমরা এই স্থানে প্রদান করিলাম। এই সকল মূল্যবান দ্রব্যাদি পেশোয়ার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। এই সময়ে স্পুনার সাহেব যে সকল দ্রব্যাদি

প্রাপ্ত লইয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত যাদুঘরের এক অংশ পূর্ণ হইলেও অতি অল্প ব্যয়ে,—মাত্র সাত শত টাকায় উক্ত বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পাদিত হইয়াছিল।

১৯০৭ সনে পেশোয়ারের সন্নিকটস্থ সা-জি-কি ঢেরী নামক স্থানে ডাক্তার স্পুনারের কর্তৃত্বাধীনে পুনরায় খননকার্য্য আরম্ভ করা হয়। ঐ বৎসরেই সারিবাহলের উত্তর

কুবের ও হরিতি

(ডাক্তার স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।)

পূর্ব্বদিকস্থ তাকৎ-ই-বাহি নামক সজ্বারামের খননকার্য্যও তিনি পরিদর্শন করেন। এই স্থানে তিনি শাক্যমুনির ছয় বৎসর কঠোর তপস্যাকালীন যে অস্থিকঙ্কালসার প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতীর পাঠকবর্গের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলাম।

১৯০৮ হইতে ১৯০৯ সা-জিকা ঢেবীর খনন কার্য্য চলিতে থাকে এবং ১৯০৯ সনের মার্চ্চ মাসে কণিষ্করাজনির্ম্মিত আধার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আধারেই বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই আধার ও দেহাবশেষ বর্ম্মার বৌদ্ধগণকে প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা মান্দালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।

গৌতম (ছয় বৎসর তপস্যান্তে)
(ডাক্তার স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত)

১৯০৯—১৯১০ এ ডাক্তার স্পুনার সারিবাহলে অনেকগুলি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে দুইটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এইরূপ বৃহদাকারের বুদ্ধমূর্ত্তি ইতঃপূর্ব্বে আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৯১১ ও ১৯১২ সনে মজঃফরপুরের অন্তঃপাতি বাসারা নামক স্থান খনন করিয়া তিনি অনেকগুলি মোহর প্রাপ্ত হন। খৃষ্টীয়-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে এই মোহরগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে প্রাচীন বৈশালী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল।

১৯১৩ সনে বোম্বাইয়ের কোটিপতি রতন টাটা মহোদয় প্রাচীন স্থানসমূহ খননের জন্য

গবর্ণমেণ্টের হস্তে বাৎসরিক ২০,০০০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার স্পুনারের হস্তে আপাততঃ পাটলিপুত্র খননের ভার অর্পণ করিয়াছেন।

আমরা "ভারতীর" আগামী সংখ্যায় গত বৎসরে পাটলিপুত্রে যে সকল দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে প্রতিকৃতি সহ তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইব।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
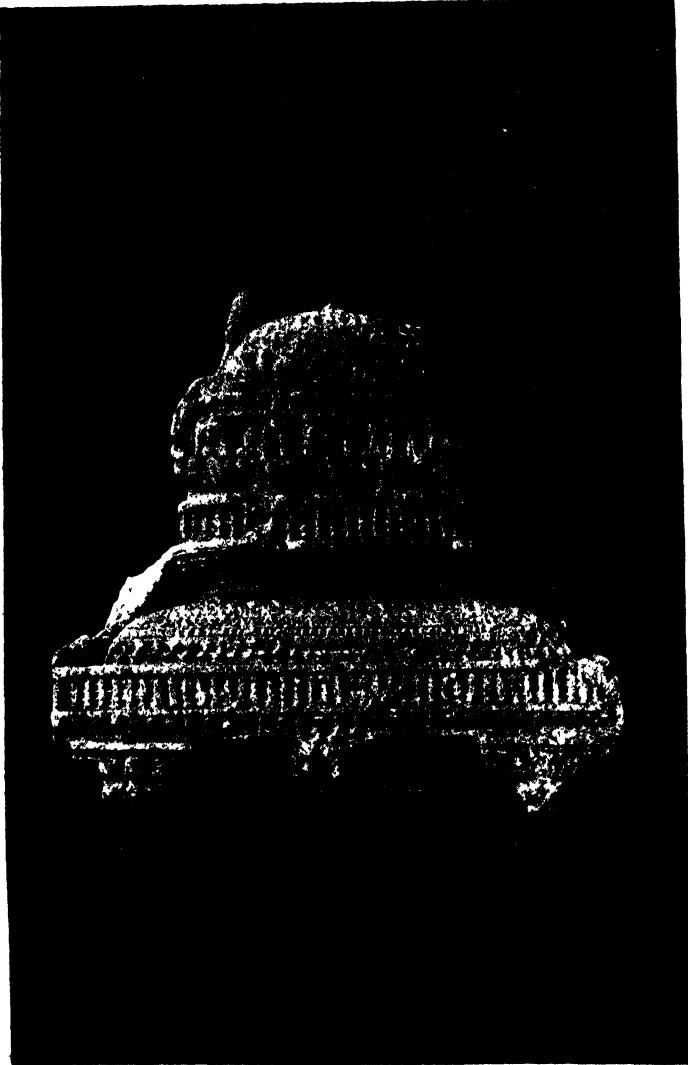
বৌদ্ধ-চৈত্য

(ডাক্তার স্পুনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত)

চাঁদিমা *

'ম্যারিগন্যান'—এই সৈনিকোচিত নামটী মঠাধ্যক্ষের বেশ উপযোগী হইয়াছিল। সন্ন্যাসী দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত, ধর্ম্মের ভাবে বিভোর ও শুদ্ধাত্মা। তাঁহার বিশ্বাস স্থির, অচল, অটল! তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ঈশ্বরকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার অভিসন্ধি, ইচ্ছা ও কার্য্য তাঁহার অজ্ঞাত নাই।

যখন তিনি গির্জ্জার অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথে দীর্ঘ পাদক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেন তখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে প্রশ্নের উদয় হইত,—"ঈশ্বর এটা এমন ক'রলেন কেন?" এবং এই প্রশ্ন মনে উদিত হইবার পরই তিনি নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইতেন; এবং মীমাংসাও করিয়া ফেলিতেন। তিনি সাধারণ ধার্ম্মিক লোকের মত কখনও বলিতেন না যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই। পরন্তু তিনি বলিতেন,—"আমি ঈশ্বরের দাস; তাঁর সৃষ্টির কারণ আমার জানা উচিত; যেটা না জানি সেটা জানতে চেষ্টা করাও উচিত।"

তাঁহার মনে হইত প্রকৃতির সমস্ত বস্তুরই একটা অকাট্য ও প্রশংসনীয় কারণ আছে, আর সেই উদ্দেশ্যেই তাহার সৃষ্টি। "কেন" এবং "কারণ" এ দু'টো কথা তাঁহার নিকট প্রায় সমানই হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন আমাদের জাগরণকে আনন্দময় করিবার জন্য উষা, শস্য পাকাইবার জন্য দিন, তাহার উপর জলসেচনার্থ বৃষ্টি, বিশ্রামের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত জানাইবার জন্য সন্ধ্যা এবং নিদ্রার জন্যই কৃষ্ণরাত্রির সৃষ্টি হইয়াছে; এবং ষড় ঋতুর সৃজন হইয়াছে কেবল চাষের কাজের সারা বছরের আবশ্যক পূর্ণ করিবার জন্য। প্রকৃতির তাবৎ পদার্থের যে একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নাই এবং পদার্থনিয়মের দারুণ আবশ্যকতাই যে সৃষ্টির প্রধান কারণ এরূপ সন্দেহের ছায়াপাত তাঁহার হৃদয়ে কখনও হইত না।

তিনি রমণীকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এবং নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাদের ঘৃণাও করিতেন;—এটা তাঁহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। "রমণী, তোমাকে আমার প্রয়োজন কি?"—খৃষ্টের এই উক্তিটী তিনি আপনার মনে মনে প্রায়ই বলিতেন; আবার বলিতেন,—"বোধ হয় ভগবানও তাঁর এই সৃষ্ট জীবটী সৃজন ক'রে সন্তোষ লাভ ক'রতে পারেন নি! কবিরা কন্দর্প শিশুকে যে অপবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার মনে হইত, রমণী তাহা অপেক্ষাও অপবিত্র,—তার সবটুকুই অপবিত্র। জগতের প্রথম পুরুষকে ত রমণীই প্রলোভন দেখাইয়া পতনের পথে লইয়া গিয়াছিল! এখনও সে প্রলোভন দেখান ছাড়ে নাই; সকল বিপদ,

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বিখ্যাত ফরাসী গল্পলেখক Guy De Maupassant এর গল্পের অনুবাদক Mrs Ada Galsworthy আমাকে এই গল্পটি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

মানবের অকারণ দুর্জ্জেয় রহস্যময় বিরক্তি এ সকলের মূলেই ঐ রমণী! আবার তাহাদের পাপ দেহের অপেক্ষা প্রেমপ্রবল আত্মা অধিকতর ঘৃণ্য।

অনেক সময় তাঁহার মনে হইত, রমণীর স্নেহময় ব্যবহার বুঝি তাঁহার মনকে টলাইতে প্রয়াস পাইতেছে; আপনাকে প্রেমজয়ী বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও চির-প্রেম-বিক্ষোভিত রমণী হৃদয়ের আকর্ষণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্তকেও বিক্ষুব্ধ করিত। তিনি ভাবিতেন, পুরুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে প্রলোভিত করিবার জন্যই ভগবান রমণীর সৃজন করিয়াছেন। রমণীর নিকট যাইতে হইলে অতি সাবধানে যাওয়া উচিত। কি জানি সে পুরুষ ধরিবার জন্য কি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে! পুরুষের পক্ষে রমণী বাস্তবিকই ফাঁদ বিশেষ। পুরুষকে ধরিবার জন্যই যেন তাহাদের বাহু সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে।

তাঁহার মন একমাত্র সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের উপর প্রসন্ন ছিল, কারণ তাহারা ব্রতধারিণী, পবিত্রা! তাহাদের উপরেও তিনি সমভাবে রূঢ় ব্যবহার করিতেন, তাহার কারণ তিনি বেশ জানিতেন যে তাহারা শুদ্ধচারিণী হইলেও অন্তরে অন্তরে তাহাদের প্রণয়ের স্রোত বহিতেছে; আর তাঁহার ন্যায় সংযমী পুরোহিতও কখন কখন তাহার আভাষ অনুভব করিয়া থাকেন।

তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতেন যে, সন্ন্যাসিনীর নেত্রে যে পরিমাণ কোমলতা, চাহনীতে যে পরিমাণ স্নেহ থাকা উচিত তাহাদের দৃষ্টিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কোমলতা, অধিক স্নেহ আছে; তাহাদের খ্রীষ্টের প্রতি প্রেমোচ্ছাসও তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইত না, কারণ সে প্রেম দেবতার উদ্দেশে প্রেরিত হইলেও তাহা রমণীর প্রেম, পার্থিব প্রণয়োচ্ছাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সন্ন্যাসিনীদিগের দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ, তাহাদের কোমল স্বরে তাঁহার সহিত কথা কহা, তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইলে অশ্রুসজল নেত্রে বিদায় প্রার্থনা এ সকলের মধ্যেও তিনি তাহাদের পঙ্কিল পার্থিব প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন।

মঠ দ্বার হইতে বাহির হইয়াই তিনি তাঁহার পরিচ্ছদটী ঝাড়িয়া ফেলিতেন, তাহার পর দীর্ঘপাদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে দ্রুত-প্রস্থান করিতেন—যেন কি একটা বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন!

তাঁহার একটী ভাগিনেয়ী ছিল। সে তাহার মাতার সহিত নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিত। পুরোহিত তাহাকে সন্ন্যাসিনী করিবেন স্থির করিয়াছিলেন।

মেয়েটী দিব্য সুন্দরী, একটু পাগলাটে ধরণের; পুরোহিত তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে সে হাসিতে থাকিত; তিনি ক্রমে রাগিয়া যাইতেন; বালিকা তখন তাঁহাকে উভয় বাহুতে বেষ্টন করিয়া চুম্বনের উপর চুম্বন দানে বিব্রত করিয়া তুলিত; তিনি অন্তরে ইহাতে আনন্দ পাইলেও এবং পুরুষ হৃদয়ের সুপ্ত পিতৃভাব জাগিয়া উঠিলেও অনিচ্ছার সহিত আপনাকে সে স্নেহালিঙ্গন হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন।

তিনি যখন কুমারীকে সঙ্গে লইয়া মাঠের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে ঈশ্বরের

কথা—তাঁহার বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা ঈশ্বরের কথা বলিতেন, সে তখন সেদিকে মন না দিয়া বিশেষ একাগ্রতা সহকারে আকাশ তৃণ ও পুষ্পের দিকে চাহিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে পতঙ্গের অনুসরণে ছুটিয়া যাইত, তাহার পর পতঙ্গ হাতে ধরিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিত,—"কেমন সুন্দর এটি দেখ মামা! আহা, আমার ইচ্ছে করে একটা চুম খাই!" পতঙ্গ বা পুষ্পকে এই চুম্বন দানের আকাঙ্ক্ষা পুরোহিতকে ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিত। রমণীহৃদয়ের যে প্রেমের ফল্গু চিরদিন বহিয়া যাইতেছে পুরোহিতের নিকট প্রকারান্তরে ইহা তাহাই প্রমাণ করিয়া দিত!

তাঁহার গৃহকর্ত্রী, মঠের ধনরক্ষকের পত্নী একদিন অকস্মাৎ অতি গোপনে তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে তাঁহার ভাগিনেয়ীর একজন প্রণয়ী আছে! একথা শুনিয়া তাঁহার মন ভয়ানক ব্যগ্র হইয়া উঠিল বটে কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাঁহার দাড়ির উপর দিয়া ক্ষুর চলিতেছিল বলিয়া সে রাগটা তেমন করিয়া প্রকাশ পাইতে পারিল না।

কথাটা শুনিয়া প্রথমে তাঁহার রাগে কণ্ঠ রোধ হইল; পরে কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া আসিলে তীব্র স্বরে তিনি বলিলেন,—"এও কি কখন হ'তে পারে?—মিলেনী, তুই মিথ্যা কথা ব'লছিস।"

কৃষকরমণী আপনার বক্ষে হাত রাখিয়া বলিল,—"না পাত্রী সাহেব, আমি মিথ্যা বলিনি, তা যদি ব'লে থাকি তবে পরমেশ্বর যেন তার বিচার করেন। নদীর ধারে তাদের মিলন হয়। রাত দশটা থেকে দুপুরের ভেতর সেখানে গেলেই, স্বচক্ষে সব দেখতে পাবেন।

তিনি ক্ষৌরকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ঘরের মধ্যে ক্রমাগত প্রচণ্ড বেগে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একটা কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইলে তিনি এইরূপ করিতেন। তাহার পর আবার যখন ক্ষুর ধরিয়া কামাইতে গেলেন তখন নাক হইতে কাণের মধ্যে তিন স্থানে ক্ষুর বসাইয়া ফেলিলেন।

ঝড়ের পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন স্থির গম্ভীর থাকে সেই ভাবে তিনি সারা দিনটা কাটাইয়া দিলেন। এই সর্ব্বজয়ী প্রেমের উপর তাঁহার ধর্ম্মযাজক-সুলভ কোপের সহিত, পিতৃ-সুলভ কোপ ও আত্মার-রক্ষক ও অভিভাবক-সুলভ কোপ যুক্ত হইল; তিনি যে প্রতারিত, ব্যর্থমনোরথ এবং বালিকার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন এ চিন্তায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বৃদ্ধ মাতাপিতারা যখন কন্যার নিকট শুনেন যে তাঁহাদের অজ্ঞাতে, তাঁহাদের সাহায্য না লইয়াই তাঁহাদের কন্যা আপনার স্বামী নির্ব্বাচন করিয়াছে তখন তাঁহাদের স্বার্থে ও আত্মসম্মানে যেরূপ আঘাত লাগে পুরোহিতমহাশয়ের আত্ম-সম্মানও এই সংবাদে সেইরূপ আহত হইল।

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি পাঠে একটু মন দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাগ তাঁহার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রি দশটা বাজিলে তিনি আপনার ছড়িগাছটি

তুলিয়া লইলেন; রাত্রিকালে রোগী দেখিতে যাইতে হইলে তিনি এই ওক কাঠের সুন্দর ছড়িটী না লইয়া যাইতেন না। তাঁহার দৃঢ়-মুষ্টিগত ছড়িটীর দিকে চাহিয়া একবার ঈষৎ হাস্য করিলেন তাহার পর সেটী ঘুরাইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সজোরে ছড়ি দিয়া একখানি চেয়ারে আঘাত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেটী ভগ্নাবস্থায় মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

দ্বার খুলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু চন্দ্রকিরণ উদ্ভাসিত আকাশের পানে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ সুন্দর চন্দ্রালোক তিনি বহুদিন দেখেন নাই।

তাঁহার প্রাণ,—সেই শান্ত রজনীর বিরাট সৌম্য চন্দ্রালোক দেখিয়া প্রাচীন ঋষি ও কবিদিগের ন্যায় ভাববিভোর, চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল।

তাঁহার ক্ষুদ্র বাগানখানির সারবন্দী ফলের গাছগুলি স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে স্নাত হইয়া তাহাদিগের সরু দীর্ঘশাখা বাহুগুলির ছায়া পথের উপর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তখন আর সে গুলি তেমন সবুজ দেখাইতে ছিল না। অন্যদিকে গৃহপ্রাচীর গাত্র বাহিয়া যে পুষ্পলতা তাঁহার ঘরের ছাদের উপর উঠিয়াছিল তাহার স্নিগ্ধ মিষ্টগন্ধ বায়ু পথে সৌগন্ধের একটী বিমল আত্মার ন্যায় ভাসিয়া আসিতেছিল।

মাতাল যেমন আগ্রহে মদ্য পান করে তিনি ঠিক তেমনি আগ্রহে বায়ু পথে ফুলের আঘ্রাণ লইতেছিলেন। সেই ভাবে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন; বিস্মিত, বিমুগ্ধ তিনি আপন ভাগিনেয়ীর কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।

মাঠের পথে আসিয়া পড়িতেই তিনি সেই চন্দ্রালোক পরিস্নাত নিশীথের নিস্তব্ধ শুভ্র প্রান্তরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কি সুন্দর সে দৃশ্য! স্নিগ্ধশান্ত রজনীতে ঝিল্লিরব ও চক্রবাক বঁধুর গীতের মূর্চ্ছনা বায়ুপথে ভাসিয়া আসিতেছিল।

পুরোহিত আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার হৃদয় যেন অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ এরূপ হইবার কোন কারণ তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। ক্রমেই তিনি যেন অধিকতর শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল যেন সেইখানেই থাকিয়া যান, একটু বিশ্রাম করেন, ভগবানের এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে বসিয়াই তাঁহার পূজা ও মহিমা কীর্ত্তন করেন—এইং এইখানেই—এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার জীবন অবসর লাভ করে!

অল্প দূরে নদীর বক্র পাড়ে পপ্‌লার বৃক্ষের সারি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একটা পাতলা কুয়াসা, অস্বচ্ছ শুভ্র বাষ্পজাল চন্দ্রালোকে ঈষৎ দীপ্তিশালী হইয়া ক্ষুদ্র নদীটির ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; তাহাতে বঙ্কিমগতি নদীটির জলস্রোত ঈষৎ দীপ্তিময় স্বচ্ছ পশমী বস্ত্রখণ্ডে আবৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

পুরোহিত আবার থামিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে পর্য্যন্ত একটা অদম্য, ক্রম:বর্দ্ধনশীল স্নিগ্ধ চঞ্চলতার প্রবাহ ছুটিয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে একটা সন্দেহ, একটা অজ্ঞাত অস্বচ্ছন্দতা তাঁহাতে বিকশিত হইল। সময়ে সময়ে তিনি আপন মনে যে সকল প্রশ্নের সমাধান করেন তখন তাঁহার মন সেইরূপ প্রশ্নে ভরিয়া উঠিল।

ভগবান এমনটা করিলেন কেন? রাত্রি যদি নিদ্রার জন্য, বিশ্রামের জন্যই সৃষ্ট তবে তিনি ইহাকে দিনের চেয়ে এত রমণীয়, প্রভাত ও সূর্য্যাস্ত অপেক্ষা এত মধুর, এত সুন্দর করিলেন কেন? কেন এ নির্জ্জনবিহারী অদ্ভুত উপগ্রহটীকে তিনি সূর্য্যাপেক্ষা এত অধিক কবিত্বময় করিয়া গড়িলেন, দিনের পূর্ণ আলোক যে সকল দ্রব্যকে রহস্যময়, সুকুমার বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহে না—চন্দ্রালোক যে তাহাকেও প্রকাশ করিয়াছে! ছায়াগুলিকে স্বচ্ছ তরল করিয়া চাঁদ ওখানে উঠিল কেন?

অন্যান্য পাখীর মত শ্রেষ্ঠকলাবিদ্ বিহগেরা এ সময় বিশ্রাম করে না কেন?—তাহার পরিবর্ত্তে রজনীকালে তাহারা বায়ুর উপর গানের মূর্চ্ছনাই বা ছড়াইতে থাকে কেন?

মানুষ যদি রাত্রিতে নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল তবে কাহার চিত্ত হরণের জন্য এ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি? কাহার জন্য এ উদার উন্মুক্ত দৃশ্য, স্বর্গের নন্দন হইতে মর্ত্ত্যের উপর এ কবিত্ব-পারিজাত বৃষ্টি?

সন্ন্যাসী কোনমতেই এ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিলেন না।

হঠাৎ যেন তাঁহার প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন অদূরে তৃণাচ্ছাদিত মাঠের প্রান্ত ভাগে বিমল-চন্দ্রকর-স্নাত তরুমণ্ডপের নিম্ন দিয়া দুইটি ছায়ামূর্ত্তি পাশাপাশি চলিতেছে!

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মূর্ত্তিটি পুরুষের;—তাহার হাতখানি প্রণয়িনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রশান্ত ভূমিখণ্ড যেন তাহাদিগের পদস্পর্শে সজীব হইয়া দৈবপ্রেরিত দুর্ভেদ্য আবরণের মত তাহাদিগকে বহির্জ্জগৎ হইতে রক্ষা করিতেছে। তাহারা দুইটিতে যেন এক আত্মা;—আর তাহাদের জন্যই যেন এই শান্ত সুন্দর রজনীর সৃষ্টি!

তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বক্ষের স্পন্দন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল; তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন কোন একটা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার নয়নের সম্মুখ দিয়া এ যেন সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ক্রমে সেই পবিত্র বাইবেল-বর্ণিত রুথ ও বুজের প্রেমাভিনয় চলিতেছে। তাঁহার সারা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বাইবেলের পবিত্র গাথা, সেই জ্বলন্ত কবিতাস্রোত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বুঝি মানবের প্রেম মায়াচ্ছাদনে আবৃত করিবার জন্যই ভগবান এমন সুন্দর রজনীর সৃষ্টি করিয়াছেন!"

এই প্রেমিক যুগলকে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। তাহার পরই তিনি চিনিতে পারিলেন যুবতী তাঁহারই ভাগিনেয়ী! এইবার তাঁহার মনে হইল, বুঝি তিনি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন। কারণ যে প্রেমকে তিনি এমন মহিমময় আবরণে বহির্জগতের নিকট হইতে আবৃত

করিয়া রাখিয়াছেন সে প্রেম কি তাঁহার অনভিপ্রেত হইতে পারে।

কর্ত্তব্যবিমূঢ় লজ্জিত পুরোহিত তখনি সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিলেন! তাঁহার মনে হইল আজ যে পবিত্র দেব-মন্দিরের দ্বার অবধি গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন তাহার ভিতরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জর্ম্মান্‌সম্রাট কেইসার উইলহেল্‌ম্

(সম্রাটের কোন বিশিষ্ট বন্ধুর রচনা হইতে সঙ্কলিত)

পরলোকগত মার্কুয়েস্ সেলিস্‌বারি কথা প্রসঙ্গে একদা কেইসারকে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ অবিবেচক বলিয়াছিলেন। এরূপ নিরপেক্ষ ভাবে একজনের প্রতি ব্যক্তি-গত মতের অভিব্যক্তি করা সহজ বটে, অনেকেই বোধ হয় বিনা আয়াসে এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া দেখা উচিত প্রত্যেক লোকেরই সাধারণতঃ দুইটী প্রকৃতি বর্ত্তমান। যাহা সাধারণের পরিজ্ঞাত তাহাই কোন ব্যক্তির স্বভাবের বাহ্যাভিব্যক্তি; আর যাহা গুপ্ত-ভাবে পরোক্ষে তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিয়া, ঐ ব্যক্তির পারিবারিক ব্যক্তিবর্গ ও কর্ত্তব্য-নিচয়ের প্রতি আবদ্ধ থাকে, উহাই তাঁহার আভ্যন্তরীন্ চরিত্রের দ্বিতীয় বিকাশ বলিয়া ধরা যায়। কাজেই কাহারও সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত প্রচার করিতে হইলে, চরিত্রের উভয় দিকই আলোচনা করা দরকার।

জর্ম্মান্ সম্রাট কেইসারের চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন, সম্রাটের মধ্যে কোন্‌খানে কতটুকু ভাল বা কতটুকু মন্দ

জর্ম্মানসম্রাট কেইসার্ উইলহেলম্

রহিয়াছে। কেবল তাঁহারাই সদম্ভে পূর্ব্বকৃত অপবাদের নিরাকরণে হস্তপ্রসারণ করিতে সাহস পান। জর্ম্মান্ সম্রাটের নৈতিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণে যাঁহারা প্রচুর অবকাশ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে—বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকও একজন। প্রবন্ধের অন্তর্গত রোমান্স (Romance) গুলি লেখকের মৌলিক চিন্তাশক্তির ফল নহে—বা কাব্য কল্পনাও নহে পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ দর্শনে তাঁহার আভ্যন্তরীন্ চরিত্রের যথার্থ অনুবর্ত্তন মাত্র!

পৃথিবীতে বিশ্রামবিমুখ যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তবে জর্ম্মান সম্রাটই সেই লোক,—এই আখ্যা একমাত্র তাঁহাকেই সাজে! অপরাপর রমণীয় সামগ্রীপুঞ্জের মধ্যে, তাঁহার অতি প্রিয় একটী মাত্র বজরাই প্রাতঃ-সন্ধ্যায় তাঁহার বাহন স্বরূপ হইয়া থাকে। এই সুদৃশ্যমান্ সুরভিসম্ভারে সজ্জিত ক্ষুদ্র তরণীর আরাম কুঞ্জেও তাঁর বিশ্রাম নাই! কোন্ দেশে কখন কোন্ বিষয়ের কতদূর উন্নতি সাধিত হইল ও কোন্ সাম্রাজ্যের শাসননীতি কতদূর উন্নতিশালী হইল এইরূপ আলোচনাই সম্রাটের নিকট বিশ্রাম সুখের প্রকৃত উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ আলোচনা ছাড়াও বজরাখানি নানাবিধ জটিল বিষয়ের মন্ত্রণালয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সময়ের অল্পতা যতই কেন হউক না, বিষয়টীর গুরুত্ববোধক ও সমস্যাসূচক কূটস্থান তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, অদ্ভুত মেধাবীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রত্যুত্তরে সকল জটিলতা "জলবৎতরলম্" করিয়া তবে ক্ষান্ত হন।

সম্রাটের ইংলণ্ডপ্রীতি তাঁহার পূত-চরিত্রের আর একটী নির্ম্মল চিত্র। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ইনি দেবীজ্ঞানে মনোমন্দিরে পূজা করিয়া থাকেন এবং সেই হেতু কোন ইংরেজকে দেখিবামাত্রই তাঁহার আরাধ্যা মহীয়সী নারীর স্মৃতিচিহ্ন মনে করিয়া সমাদরে তাহাকে আতিথ্য দান করেন। সমবেত কর্ম্মচারী সমক্ষে, একদা তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর জ্ঞানী ও উৎকৃষ্ট নৃপতির আসরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার মত মাত্র দুইটী লোকের নাম করা যায়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ও সম্রাট পিতামহ উইলহেলম্ অন্যতম। এইরূপ কথোপকথনের পর সম্রাট, হাস্যপরিহাসচ্ছলে বলিলেন—"অবশ্য আমিও ইহাঁদের পরবর্ত্তী আসন পাইতে ইচ্ছুক, কি বল?" বাস্তবিক তিনি একটী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! মন্ত্রীসমক্ষে সভাস্থলে—বিদ্বান ব্যক্তি সঙ্গমে এমন কি সাধারণ রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সম্মুখেও, বিশেষ বিনয়তৎপরতার সহিত আত্মদৈন্যতা জানাইয়া,—তিনি যে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পিতামহের শাসননীতির অনুসরণ বৃত্তির আশ্রয় অবলম্বনে কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন না! বাস্তবিক যখনই কোন অঘটন ঘটিবার উপক্রম হয়, কি কোন প্রকার দুর্ঘটনার অভিনয় সুরু হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যায় সম্রাট একান্ত অনুগতের ন্যায় ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের কার্য্যাবলীর আলোচনা দ্বারা স্বীয় সিদ্ধান্তের উপসংহার করেন। এইরূপ গুণগ্রাহিতায় জর্ম্মান্ সম্রাটের উদারতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত, কেইসারের বেশ মাখামাখি আছে। অবকাশ কালে এই দুই শাসন কর্ত্তার মধ্যে চিঠি পত্রের বিনিময়ও ঘটিয়া থাকে। মামা এডওয়ার্ড থাকিতে ভাগিনেয় আপন প্রিয় বজরায় করিয়া বৎসরান্তে একবার ইংলণ্ডে বেড়াইতে যাইতেন; এই উপলক্ষে আমোদ প্রমোদে লণ্ডন নগরী মুখরিত হইয়া উঠিত। কিন্তু এখন? এখন ইচ্ছা থাকিলেও জর্ম্মান্ সম্রাট ইচ্ছার পূর্ণতাসাধনে যত্নবান্ হইতে পারেন না। সে গিয়াছে এক শান্তির যুগ যখন এডওয়ার্ড জীবিত ছিলেন! আর আজ? চতুর্দ্দিকে অস্ত্রের ঝন্ঝনা—গোপনে সমরানলের আয়োজন—যাহার এক অধ্যায়ের অভিনয় বলকান্ ক্ষেত্রেই অভিনীত হইতেছে। আরো কি হইবে কে জানে? এই সব কারণেই জর্ম্মান সম্রাট, নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলেও তথায় যাইতে পারিতেছেন না। লোকে কি বলিবে? উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, কানাকানি হাঁকাহাঁকি ত চলিবে!

পাশ্চাত্য সুধীসমাজ জর্ম্মান্‌সম্রাট কেইসারকে ইউরোপের মধ্যে "শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই উক্তি যে সর্ব্বাংশেই তাহার প্রাপ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের রাজশক্তির সহিত পরিচয় লাভ তিনি একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তদুদ্দেশ্যে ইনি কয়েক বৎসর হইল, বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য নৃপতিদিগের সহিত কিয়দ্দিবস একত্রে বাস ও গভীর সূক্ষ্মদর্শিতার ফলে তাঁহাদের চরিত্র ও আন্তর্জাতিক ভাবের অভাব উপলব্ধি করা! আমরা জানি একদিন পরলোকগত সম্রাট এডওয়ার্ড সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া! শক্তির পসরা যাহাতে ইউরোপ অধিক দিন বহন করিতে পারে, এ কেবল তাহারি জন্য! কিন্তু হায়, সম্রাটের চুক্তিপত্রের বন্ধনও যেন এইবার শিথিল হইয়া আসিয়াছে।

জর্ম্মান্‌রাজ বহু ভাষাবিদ্। ইংরেজী ভাষা ঠিক যেন মাতৃভাষারই ন্যায় অনর্গল বলিয়া যাইতে পারেন। বিদেশী ভাষায় তাঁহার এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠায় তিনি বলিয়ছিলেন—"আমি ইংরেজী ও জর্ম্মান ভাষার মধ্যে কোনটী আগে শিখিয়াছি, মনে নাই।"

সম্রাট কেইসার অতি প্রত্যুষেই শয্যা-ত্যাগ করেন। কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে এমনও বলেন যে, তিনি মোটেই ঘুমান না। সারা রাত জাগিয়া কেবল কাজের বোঝা লাঘব করিতে থাকেন। রাজপ্রসাদের প্রত্যেক শয়ন কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে একটী করিয়া অধ্যয়নাগার নির্দ্দিষ্ট আছে—এইরূপে দ্বাদশটী কক্ষে দ্বাদশটি পাঠাগার সংযুক্ত। সন্ধ্যা হইলেই সম্রাট প্রথমটীতে গমন করেন ও ঘণ্টাকাল কাটাইয়া দ্বিতীয়টীতে প্রবিষ্ট হন, এইরূপে সারা রাতে দ্বাদশটী প্রকোষ্ঠ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া থাকেন। ইহার মধ্যেও অন্য কাজ আছে,—এইরূপ কাজকর্ম্ম পড়াশুনার মাঝে তিনি কখন্ আহার ও নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন তাহাই আশ্চর্য্য! পাশ্চাত্য সুধীসমাজ হয় ত এই জন্যই তাঁহাকে সমগ্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইউরোপ

কেন,—সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ কর্ম্মাসক্ত পুরুষ দুইটী আছে কি না সন্দেহ। কার্য্যের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত হইলেও মাঝে মাঝে এরূপ শুনা যায় যে, স্থানীয় থিয়েটারেও ইনি যোগ দিয়া থাকেন। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের ধূম চলিতেছে, রহস্য বেশ জটিল হইয়া আসিয়াছে, রাত্রিও প্রায় দুই প্রহর,—হয়ত এমন সময়েই সম্রাট নাচ গান, হাসি তামাসা ফেলিয়া কর্ম্মের টানে বার্লিন রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আর অমনি পূর্ব্বকৃত অসমাপ্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া উহার বাকী অংশ শেষ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যখন নগরীর লোকসকল একবার ঘুমাইয়া আবার দিবালোক প্রকাশের বাকী দুই ঘণ্টার জন্য দ্বিতীয় বার নিদ্রার ক্রোড়ে শ্রমসন্তপ্ত দেহ ঢালিয়া দেয়, তখনও জার্ম্মান্‌ সম্রাটের কক্ষস্থিত আলোক নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না।

এই ত গেল রাত্রির কথা। দিবাভাগে যে পরিমাণ কার্য্য তিনি করিয়া থাকেন, উহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। প্রত্যেক কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই বহু সংখ্যক সেক্রেটারী তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, সম্রাটকে অনুসরণ করিতেই বেচারাদের সময় চলিয়া যায়। আর যদি তাঁহারা কোন কাজে হাতই দেন ত তাহা অর্দ্ধেক শেষ করিতে না করিতেই আবার সম্রাটের নূতন তাগিদ তাঁহাদের ব্যস্ত করিয়া তুলে। সময়ের অনাবশ্যক পরিক্ষেপ যিনি আদৌ পসন্দ করেন না।

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালী বিশেষ ভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন জার্ম্মান্‌ সম্রাটের কার্য্য কলাপে শৃঙ্খলার লেশ মাত্রও নাই। যদি এতদূর অনুযোগ তাঁহাকে দিতেই হয়, তবে জানা উচিত যে উহা দ্রুত কার্য্যপ্রিয়তার আনুসঙ্গিক দোষ। এই যেমন ধরা যাক্‌, মন্ত্রীর নিকট তিনি এক জরুরী পত্র লিখিতেছেন, এমন সময়ে সৈন্য বিভাগের এক অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি সে চিঠি লেখা ফেলিয়া, প্রাপ্ত অভিযোগের যথার্থ উত্তর প্রদানে নিযুক্ত হইলেন! ইহাতেই বেশ বুঝা যায় সম্রাট কখনও ভিড়ে চাপা পড়েন না; সকল সময়েই কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার চিত্ত সজাগ ও সচকিত থাকে।

সম্রাটের একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস্‌ ভিক্টোরিয়া লুসি আশৈশব পিতার সঙ্গী; যখন কার্য্যব্যপদেশে তিনি ইউরোপের প্রত্যেক রাজশক্তির সহিত পরিচিত হইতেছিলেন, প্রাণাধিকা কন্যা তখনো পিতার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। জীবনের প্রতিপদ বিক্ষেপে,—আলোড়ন বিলোড়নের মাঝে সম্রাটের একনিষ্ঠ সাধক—একমাত্র সঙ্গী তাঁহার এই কন্যা! প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুযায়ী বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে সম্রাট প্রায়ই বজরায় কাল কাটাইয়া থাকেন—কন্যা লুসিও পিতার আমোদ প্রমোদে যোগ দান করেন।

কোন কোন পাঠক হয়ত কেইসারকে বেরসিক ঠাওরাইয়াছেন। কিন্তু আসলে তা নয়, শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয় যে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মাসক্ত পুরুষও গীত-

বাত্মাদিতে সুনিপুণ! তিনি কেবল উত্তম যন্ত্র-বাদক নহেন, একজন উৎকৃষ্ট গায়ক। তাঁহার রচিত অনেক গান জাতীয় উৎসবে ও সভাসমিতিতে গীত হইয়া থাকে। সম্রাটের সাধের বজরাটির নাম 'হহেন ভলোরন্'। গানের আসর এইখানেই সাধারণতঃ জমে, অনেক হাসি তামাসাও হইয়া থাকে। একদিন গ্রামোফন চলিতেছে সম্রাট আনমনা হইয়া সামরিক কার্য্যের আলোচনায় প্রবিষ্ট আছেন। এমন সময় অলক্ষ্যে এক জেনারেল রেকর্ড বদলাইয়া দিলেন। হঠাৎ যখন সেই গানের স্বর বাহির হইল তখন সম্রাট বলিয়া উঠিলেন, "What a horrible noise"; সম্রাট কর্ম্মচারীকে রচয়িতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। হাসি চাপিয়া অনুচর জানাইল যে, গানটি সম্রাটেরই রচনা! সম্রাট খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া রেকর্ডটি টানিয়া ফেলিয়া দিলেন।

জর্ম্মান্ সম্রাটের পৌরুষেয় ভাব বা ব্যক্তিত্ব জগৎবিদিত। সত্য বলিতে কি তাঁহার মধ্যে এমন কোন খুঁৎ নাই, যাহা না কি মন্ত্রী অথবা সেক্রেটারীবর্গের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা দ্বারা সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক চর্চ্চায় আপন ভ্রাতা প্রুসিয়াধিপতি হেনরী সময় সময় সে সকল বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন সম্রাট তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া নীর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার সার গ্রহণে যত্নবান হন।

'হোহেন ভলোরন্' বজরায় সম্রাট ও কন্ম. লৌসি।

সুদূরে পাশ্চাত্য প্রদেশে রমণীর প্রভূত ক্ষমতা! কিন্তু কেইসার ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী! জর্ম্মান্ দেশে সেই জন্যই রমণীর ক্ষমতা লণ্ডন অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কঠোর স্বরে সম্রাট বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রী স্বাধীনতা তাঁহার অসহ্য, বিশেষ রাজনৈতিক আলোচনায়! বলা বাহুল্য এ বিষয়ে অনেক সময় সাম্রাজ্ঞী এবং প্রাণপ্রিয়া কন্যাও অনুরোধ করিতে যাইয়া নিরাশ হন। বাকিংহাম্ রাজপ্রসাদে

একবার কেইসারের সহিত রাজ্ঞী মেরীর এ বিষয়ে বেশ বাদানুবাদ চলিয়াছিল। তাঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রয়োজনীয় অংশটুকুই উদ্ধৃত হইল।

কেইসার প্রশ্ন করিলেন—"What can women know of politics ?"

শান্তস্নিগ্ধ স্বরে মেরী প্রত্যুত্তর কবিলেন—

Just about as much as a man knows of the organization of a nursery and the rearing of a family.

কেইসার চুপ করিয়া রহিলেন। প্রতিবাদের দ্বিতীয় শব্দ না করিয়া কথার সুর বদলাইয়া দিলেন।

ভাগিনেয় কেইসারের মাতুলপ্রীতি তাঁহার চরিত্রের আর একটী মধুর দিক। এডওয়ার্ডকে তিনি কতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন—কতদূর অন্তরতম ভাবিতেন, জনসমাজ সে কথার একাংশও বিদিত নহে। একটী ঘটনা হইতেই তাঁহার আন্তরিক ভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তিনি মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণায় নিযুক্ত, খবর আসিল, ইংলণ্ডের রাজা মৃত্যুশয্যায় শায়িত! অমনি জর্ম্মানসম্রাট দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন ; শোকবিজয়ীর হৃদয় কোন অভূতপূর্ব্ব বেদনায় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। কেইসার কাঁদিয়া ফেলিলেন।......সাম্রাজ্যের প্রতি শত কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই লণ্ডনাভিমুখে যাত্রার জন্য যথোপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রচারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যেন কেহই তাহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে জীবনবাহী চির অভিশাপ অর্জ্জন না করেন! এইরূপে —নানাপ্রকারে—যাবতীয় কার্য্যের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডের প্রতি তাঁহার গভীর আসক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! আমরা জানি ইউরোপের পঞ্চ শক্তির মধ্যে ইংরেজ ও জার্ম্মান্ শক্তি ক্ষমতার তৌলদণ্ডে সম-ওজনে বিরাজমান্—কিন্তু এই সমতাই আবার উভয়ের বিরোধের কারণ। ইংরেজ শক্তির কার্য্যকলাপ একটু চাপা ধরণের। এইরূপ চাপা ভাব প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজশক্তির মধ্যেই হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জর্ম্মান্ সম্রাট ইহার অনুকরণে এখন পর্য্যন্তও অনুপ্রাণিত হন নাই। আত্মগোপন তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহ্য—গোপনে বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার মত বিরুদ্ধ।

নববর্ষে জর্ম্মান দেশে "Mock Fight"এর প্রবল ধূম পড়িয়া যায়—প্রায় সপ্তাহ খানিক ব্যাপিয়া "ছল যুদ্ধ" চলিতে থাকে। জর্ম্মান্ রণসম্ভারের রণনৈপুণ্য পরিদর্শক শুধু সম্রাট একক নহেন—পরন্তু নানাদেশীয় যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিবর্গ এই রণক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সেনাপতি নিমন্ত্রিত হইয়া সম্রাট কর্ত্তৃক মহোৎসাহে অভ্যর্থিত হন এবং বার্লিন রাজপ্রাসাদে একত্র পানাহারে রাজ-সম্মান ভোগ করিয়া থাকেন। জর্ম্মান্ সম্রাটের এবম্বিধ শিশুসারল্য বৈদেশিক সেনানায়কের মন বিস্ময়ে কৌতূহলে স্তম্ভিত করিয়া দেয়!

এইবার সম্রাট চরিত্রের একটী অদ্ভুত কাহিনী বলিব, সেটী এই যে, ইনি বহুল পোষাক পরিবর্ত্তন বড়ই পছন্দ করেন! তাঁহার ১২টি সজ্জাগৃহ এবং বারটি লাইব্রেরি এই চতুর্ব্বিংশ প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে কত

হরেক রকমের পোষাক ঝুলান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কষ্টসাধ্য। পৃথিবীতে এত অধিক ফ্যাসানের পরিচ্ছদের আধিক্য কোনও রাজার ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। নূতন কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হয়, এইরূপে দিনমানেই কত পোষাক যে তিনি পরেন আর ছাড়েন তাহা বলা যায় না! ব্রাকেটের হ্যাণ্ডলের অগ্রভাগে এমন করিয়া পোষাকগুলিকে আটকাইয়া রাখা হয় যেন টান দিলেই অনতিবিলম্বে খ'সিয়া আসে। একমুহূর্ত্ত খুলিতে বিলম্ব হইলেই সর্ব্বনাশ! বিরক্তির বিকট ছায়া তাঁহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠে। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর করিয়াছেন—"পোষাকের মৌলিকত্ব মনের সঙ্গে এক যোগে কাজ করে! তা' বুঝি জান না?"

কলাবিদ্যা সম্রাটের অতি প্রিয় বস্তু। সমুদ্র ভ্রমণে নির্গত হইলে তাঁহার অধিকাংশ সময় শোভা সন্দর্শনে কাটিয়া যায়। সমুদ্রের কোন্‌খানে কি আলোকের কিরূপ রং, কোন্‌খানে জলমগ্ন শৈলের অস্পষ্ট ছায়া, এই সব খুঁটিনাটি উপকরণ ইঙ্গিতে সংগৃহীত হইলে ছবি আঁকিতে বসিয়া যান্। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে তৎকর্ত্তৃক অঙ্কিত অনেক ছবি আছে যাহা নাকি সম্রাট নিজের জন্ম একখানি পর্য্যন্ত না রাখিয়া মাতুলপুত্রকে উপহার দিয়াছিলেন। বিনিময়ে বার্লিন রাজপ্রসাদের পাঠাগারে ইংলণ্ডের অনেক সুরম্য স্থানের ফটো সংযুক্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান ভারত সম্রাটের অভিষেক উৎসবে গৃহীত অনেক ফটোগ্রাফই জার্ম্মান্ সম্রাটকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। মাননীয় ফোর্টেস্কু প্রণীত নবপ্রকাশিত "Visit to India" নামক সুলিখিত গ্রন্থে পাঠকেরা সেই সমুদয় ফটোর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাবেন।

কলাবিদ্যাকে জার্ম্মানসম্রাট ক্রীড়ার সামিল করিয়া লইয়াছেন। শীকার করিতেও তিনি খুব ভালবাসেন। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ খেলা জড়তার সাহায্যকারক বলিয়া বাল্যকাল হইতেই ইহাদের ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন।

পুস্তক পাঠে তাঁর অনেক সময় কাটিয়া যায়। কেবল যে এক বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন এমন নহে; পরন্তু প্রধান দেশ সমূহের সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসমূলক নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। বক্তব্য বিষয় যতই কেন জটিল হউক না, গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যটী সম্রাটের বুঝিতে বাকী থাকে না। বিগত বর্ষের প্রারম্ভেই চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থপাঠ তাঁহার একরূপ শেষ হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যখন যে কোন অভিনব পুস্তকের সৃষ্টি হয়, গভীর তত্ত্বদর্শিতার সহিত পাঠ করিয়া সম্রাট উহার সারমর্ম্ম আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত পাঠাগারে এক একটী স্বতন্ত্র পুস্তকালয় স্থাপিত আছে, ইহাদের মধ্যে কত প্রাচীনতম পুস্তক জরাজীর্ণ ভাবে সাক্ষ্য স্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে;—এই সব প্রাচীন পুস্তক কোন্ যুগের তাহাই বা কে বলিবে?—নব সংস্করণের যে সমুদয় পুস্তক পাঠাগারে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে,

তাহাদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু আক্ষেপ করিয়াছিলেন। মৃদু হাসিয়া সম্রাট নাকি বলিয়াছিলেন—"সখা আপ্‌শোষ করিও না, জানইত কীট পুস্তকের পরম শত্রু।"

প্রকৃত কর্ম্মীর স্বাস্থ্যসুখ অনেক সময় হারাইতে হয়, সুখের বিষয় জার্ম্মান্‌সম্রাট প্রকৃত কর্ম্মী হইয়াও এখন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য সুখ হারান নাই। এত কাজের চাপেও এক ঘণ্টা করিয়া বৈকালে ও প্রাতে ব্যায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অশ্বচালনায় তিনি বেশ স্ফূর্ত্তিবোধ করেন।

সংক্ষেপে জর্ম্মান্ সম্রাটের জীবন কাহিনীর অনেক কথাই বিবৃত হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নাম ও যশ যেরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তিনি বর্ত্তমান যুগের পরাক্রান্ত রাজশক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইতে পারেন, এ কথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। যিনি ঐহিক সুখভোগের আশায় পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, যিনি নিজেকে ক্ষমতাপন্ন ভাবিয়াও সাধারণের অভিলষিত ছাঁচে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য আপন হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার জীবনবাহী একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জার্ম্মানশক্তির পরিপূর্ণ জাগরণ, জাতীয় উত্থানের জন্য যাঁহার মূল্যবান জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তিনি যে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে, তাঁহাদের পাশে আপন স্থান করিয়া লইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শেষের দিনে

(জালালুদ্দীন রুমী হইতে)

অন্তিম শয়নে হেরি' ক'রো নাক হাহাকার
ওগো বন্ধুগণ!
চিতাগ্নি জ্বলিতে দেখি মিছা মিছি মায়া-ভ্রমে
ক'রোনা রোদন!
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত যায় তাই ব'লে কে কোথায়
করে হাহাকার?
এ কলুষ রাজ্য হ'তে অস্ত গিয়ে' পুণ্যরাজ্যে
উদয় তাহার।

আমার প্রিয়ের সহ মনোরম মিলনের
হবে নাট্যলীলা
অনধিকারীর লাগি' বিরচিবে যবনিকা
সমাধির শিলা!
যখন প্রিয়ের গৃহে বিজয় মঙ্গল গান
হইবে আমার,
সে কেমন হ'বে বন্ধু, তখন তোমরা যদি
ক'রো হাহাকার?

শ্রীকালিদাস রায়।

আদিম জাতির সংখ্যাগণনা।*

মানব মাত্রেই কিছু না কিছু গণনাশক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। মানব সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত সুসভ্য জাতিদিগের গণনাশক্তি যেরূপ বিকশিত এবং গণনাকার্য্য যেরূপ বিস্তৃত অসভ্য বা আদিম জাতি দিগের সেরূপ নহে। এই শেষোক্ত জাতি দিগের গণনাশক্তি অনুশীলনার অভাবে একরূপ সুপ্তাবস্থায় অবস্থিত এবং তাহাদিগের গণনাও মাত্র দুইএকটি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। এই সকল অসভ্যজাতি যখন পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাবে সভ্যতার উচ্চতর স্তরে অধিরোহণ করিতে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিস্তৃত গণনার প্রয়োজন বোধ করে তখন তাহাদের সুপ্ত গণনা-শক্তি প্রবুদ্ধ ও বিকশিত হইয়া উঠে। দক্ষিণ আমেরিকার চিকিটা (Chiquita) জাতির শব্দকোষে সংখ্যাদ্যোতক কোন শব্দ আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'এক' এই সংখ্যা ব্যক্ত করিতে যে কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে অভিধানে তাহার অর্থ 'একাকী'। ইহাদের গণনাশক্তি লুপ্তপ্রায় প্রতীয়মান হইলেও ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্ হওয়া যায় না। এরূপ জাতিও বিরল নহে যাহারা মাত্র '২' পর্য্যন্ত গণিতে পারে। পৃথিবীর অনেক আদিমজাতির গণনার ঊর্দ্ধসংখ্যা মাত্র ১০।

সংখ্যা প্রকাশের উপায়—ভাবপ্রকাশক শব্দের নাম ভাষা। এই ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বে নানারূপ সাঙ্কেতিক উপায়ে ভাব ব্যক্ত হইত। আজও আমরা অনেক সময় নয়নে নয়নে বার্ত্তাবিনিময় করিয়া থাকি। অনেকেই সময় বিশেষে "মরম-কথা নয়ন কোণে" কহিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই শিশু অঙ্গুলির সাহায্যে প্রথমে গণনা করিতে শিক্ষা করে। সেইরূপ জাতির শৈশবাবস্থাতেও আদিম জাতিরা অঙ্গুলি সঙ্কেতে গণনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। আজও এস্কিমোজাতি, দক্ষিণ সামুদ্রিক দ্বীপ-পুঞ্জবাসীরা হস্তের দশ অঙ্গুলির সাহায্যে গণনা করিয়া থাকে। এই অঙ্গুলিসঙ্কেতে গণনা পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এমন কি, ১০,০০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত অঙ্গুলিগুলির নানাপ্রকার সন্নিবেশে ব্যক্ত হইত। শুনিতে পাই চীনবাসীদিগের মধ্যে কিঞ্চিন্ন্যূন একলক্ষ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনার জন্য একপ্রকার অঙ্গুলিসঙ্কেতরীতি প্রচলিত আছে, এই সাঙ্কেতিক গণনার এতই প্রচলন যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে আড়তদারেরা অন্যের অজ্ঞাতে কোন দ্রব্যের দর ব্যক্ত করিতে হইলে কাপড়ের মধ্যে হস্ত স্থাপন করিয়া পরস্পরের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া থাকে। এই অঙ্গুলি সাহায্যে গণনা মানবের এমনই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে সুসভ্য জাতিরাও এখনও অনেক সময় অঙ্গুলি পর্ব্বে গণনাসাধন করিয়া থাকে।

হিসাব রক্ষার উপায়। এই আদিম-

* Dr. Levi L. Conant রচিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

জাতিরা হিসাব রক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, কখন বা উপলখণ্ডের সাহায্যে, কখন বা কড়ির সহায়ে, কখন বা ধান্যমুষ্টির দ্বারা, কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে হিসাব রাখিয়া থাকে। আজও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে আমাদের দেশে নানা উপায় প্রচলিত আছে। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় যে গোপরমণীগণ গৃহস্থকে দৈনিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া গৃহস্থের বাটীর দেওয়ালে প্রত্যহ একটি করিয়া গোবরের টিপ দিয়া রাখে। মাসান্তে এই গোবরের টিপের সাহায্যে হিসাব বুঝিয়া লয়। আজও অনেক স্থানে দেখা যায় যে তৈলকার প্রত্যহ তৈল "রোজান" দিয়া একটি কাটিতে দাগ কাটিয়া রাখে।

গণনার ঊর্দ্ধসীমা। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের সুবিশাল ক্ষেত্রে হলচালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের হলাগ্রভাগে উত্থিত নূতন নূতন তথ্য হইতে যে সকল অসভ্য ও আদিম জাতির সংখ্যা গণনার ঊর্দ্ধসীমা জানিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে হস্তাঙ্গুলির সংখ্যা নিদর্শনে অনেক জাতিই ১০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। কিন্তু এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা ২, ৩, বা ৪ সংখ্যার অধিক গণনা করিতে পারে না। বোটোকুডো জাতির 'এক' এর বেশী আর সংখ্যা নাই। '২' প্রকাশ করিতে তাহারা 'উরাহু' বলিয়া থাকে—যাহার অর্থ 'অনেক'। পুরি এবং ওয়াচান্দা জাতির '২' পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে। পুরি জাতি 'পৃকা' (অনেক) এই কথার দ্বারা এবং ওয়াচান্দিজাতি ২, ১ দ্বারা '৩' সংখ্যা ব্যক্ত করে। (১) আন্দামন-বাসীদিগের মাত্র দুইটী সংখ্যাবাচক শব্দ আছে কিন্তু তাহারা অঙ্গুলি সাহায্যে ১০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। 'সকল' অর্থবোধক শব্দ দ্বারা তাহারা '১০' সংখ্যা ব্যক্ত করিয়া থাকে। বুশম্যানদিগেরও গণনার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। ইহারা '২' এর বেশী কোন সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে 'অনেক' অর্থ-বোধক শব্দ ব্যবহার করে।

সিংহলের ভেদ্দাগণ (Veddas) এইরূপে গণনা করিয়া থাকে যথা:—একামাই—১, দেকামাই—২ এবং তদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা ব্যক্ত করিতে হইলে 'ওতামিকাই'—অর্থাৎ 'আর এক বেশী' এই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া থাকে। (২)

পূর্ব্বোল্লিখিত জাতিগুলির গণনার ঊর্দ্ধ-সীমা ২। আবার অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা মাত্র তিন পর্য্যন্ত গণিতে পারে। নব হল্যাণ্ডবাসীদিগের তিনের অধিক সংখ্যা নাই। (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার দামারা জাতি মাত্র তিন পর্য্যন্ত গণিতে পারে। গল্টন সাহেব এইরূপ একজন দামারার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। একজন দামারা দুইটি মেষ বিক্রয় করে, প্রত্যেকটির মূল্য ২ গোছা তামাক। ২টী মেষের মূল্যস্বরূপ তাহাকে

(১) Tylor : Primitive Culture.

(২) Dechamp's L' Anthropologie, 1891.

(৩) Tylor : Primitive Culture.

৪ গোছা তামাক দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এই হিসাবটুকু প্রবেশ করে না। তৎপরে একটি মেষ লইয়া তাহার মূল্যস্বরূপ ২ গোছা তামাক দিয়া পুনরায় আর একটি মেষ লইয়া তাহার মূল্যস্বরূপ ২ গোছা তামাক দেওয়া হয়। এই প্রকারে সে তখন হিসাব বুঝিতে পারে। (৪) ব্রেজিলের কয়েকটী আরণ্যক জাতি তিনের কোন উর্দ্ধসংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে 'অনেক' অর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করে। হার্ব্বার্ট নদবাসী অষ্ট্রেলিয়েরাও ঐরূপ করিয়া থাকে। ফিউগান জাতিদিগের গণনা মাত্র তিনটি বাক্যে পর্য্যবসিত, যথা—কাওনক্লি—১, কম্‌পাইপি—২, মাতেন—৩। পেরুর কাম্পাস্ জাতি এইরূপে গণনা করিয়া থাকে, যথা:—পেত্রিয়ো—১, পিত্তেম—২, মাহুইমি—৩; এতদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা ব্যক্ত করিতে হইলে তাহারা ১, ৩; ১, ১, ৩ এইরূপ ভাবে এবং মোট সংখ্যা অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে দশের বেশী কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা তাহাদের ধারণাতীত, এবং দশকে 'অনেক' অর্থবোধক বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করে। (৫) 'বিরাদরোই'র অষ্ট্রেলিয়ান জাতির তিনের বেশী সংখ্যাদ্যোতক কোন শব্দ নাই। '৪' এই জাতির নিকট 'অনেক' এবং ৫ 'খুব বেশী'। দিপ্পিল, কামিলরোই, আদিলের, তারাবুল, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া তাসমানিয়া ইত্যাদি জাতিগুলিও প্রায় ঐরূপ। ইহার মধ্যে অনেকে '৪' এই সংখ্যা '২-২' বা '২ জোড়া' এবং ৫ '২-৩' কিম্বা '২-২-১' এই ভাবে প্রকাশ করে। Encounter Bay জাতি '৬' সংখ্যা 'কুকো কুরো – কুকো' অর্থাৎ '২-২-২' এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করে। Amazonবাসী ইয়কো জাতি তিন সংখ্যা ব্যক্ত করিতে এক বিকট দংষ্ট্রাভেদী শব্দ উচ্চারণ করে, যথা "পোয়েত্-তার্‌রারোরিনকোয়ারোয়াক"; এই সম্বন্ধে La Condemaine যথার্থই বলিয়াছেন "Happily for those who have dealings with them, their arithmetic goes no further." (৬)

এইরূপে দেখা যায় যে, যে সকল অসভ্য জাতি মানব সম্প্রদায়ের সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত তাহাদের সংখ্যাদ্যোতক শব্দ একটি বা দুইটি আছে; তদূর্দ্ধ কোন সংখ্যা তাহাদের নিকট 'অনেক'। এই সকল জাতি অপেক্ষা যাহারা একটু উন্নত হইয়াছে তাহাদের শব্দকোষে মাত্র তিনটি সংখ্যাবাচক শব্দ পাওয়া যায়। যাহারা সভ্যতার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়াছে তাহারা প্রায় পাঁচ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল জাতি সংখ্যাগণনায় '৩' এর সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহারা হস্তের অঙ্গুলির সংখ্যানিদর্শনে পাঁচ পর্য্যন্ত গণনা করিতে সক্ষম হয়। তবে এরূপ কতিপয় জাতিও দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের গণনার উর্দ্ধসীমা '৪' (৫ পর্য্যন্ত পৌছায় নাই)। দক্ষিণ আমেরিকার টুপ্পিদিগের ৪টি সংখ্যাবাচক

(৪) Wallace: Darwinism.

(৫) Wiener: Perou et Bolivie.

(৬) Voyage de la Riviere des Amazons.

শব্দ আছে যথা ;—ওয়িপি—১, মোকোই—২, মোসাপিরা—৩, এবং এরান্দি ৪।(৭) ম্যাকারে হ্রদবাসী অষ্ট্রেলিয় জাতির 'ওরান'এর বেশী সংখ্যা নাই (ওরান—৪); তবে তাহাদের মধ্যে একটি বাক্য ব্যবহৃত হয় যাহার অর্থ "বহুৎ বহুৎ" অর্থাৎ অসংখ্য। সেই বাক্যটি "কাঁঙোল—কাঁঙোল" এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তাস্‌মানিয়াবাসীদিগের '৪'এর অধিক কোন সংখ্যা নাই, তবে '৫' এর জন্য একটা যৌগিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা :—"পাগান—আ—মারা"—৪ + ১।

কতিপয় অসভ্যজাতি হস্তের অঙ্গুলি সাহায্যে ১০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। জুলুগণ দশ পর্য্যন্ত গণিতে সমর্থ। উত্তর পশ্চিম আমেরিকাবাসী আহ্‌টজাতি এবং দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি জাতি ঐ দশ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। ঈষদুন্নত কতিপয় জাতি, যথা এস্কুইমাক্সজাতি, হস্তপদাদির অঙ্গুলি সাহায্যে বিংশতি পর্য্যন্ত গণনা করিতে সক্ষম। (৮)

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ অসভ্য জাতিদিগের গণনার তিনটি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যথা :—৫, ১০, ১০০। কোন অসভ্য সহজেই এক হস্তের অঙ্গুলির নিদর্শনে ৫ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। যাহাদিগের বুদ্ধি একটু বিকশিত হইয়াছে এবং যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে একটু বিস্তৃত গণনার আবশ্যক বোধ করে, তাহারা দুই হস্তের অঙ্গুলি সাহায্যে দশ গণিয়া থাকে। যে সকল জাতি হস্ত পদাদির অঙ্গুলির সংখ্যা নিদর্শনে ২০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে তাহারা প্রায়ই ১০০ পর্য্যন্ত গণিতে সমর্থ হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অসভ্যতারও একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কোন জাতি অসভ্যাবস্থায় কখনও এক সহস্রের অধিক সংখ্যা গণনা করিতে সক্ষম হয় না।

আধুনিক সুসভ্যজাতিদিগের গণনারীতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের অসভ্যাবস্থায় তাহারা এক সহস্রের অধিক সংখ্যা গণিতে পারিত না। ইংরাজি গণনা পদ্ধতির million, billion, trillion, ইত্যাদি শব্দগুলি বিশুদ্ধ Saxon নহে। ভাষান্তর হইতে গৃহীত হইয়াছে। Thousand —শব্দটী, One, Two, Thaee, Ten, hundredএর ন্যায় বিশুদ্ধ Saxon। জর্ম্মান, স্কান্দিনেভিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুজ্য। কিন্তু চীন, সংস্কৃত, আজটেক্ ভাষার সমস্ত সংখ্যাদ্যোতক শব্দগুলি নিজস্ব। পূর্ব্বে লাটিনদিগের উর্দ্ধসংখ্যা mille (১,০০০) এবং গ্রীকদিগের ১০,০০০ ছিল। অধুনা মলয়বাসীদিগের সংখ্যাগণনার উর্দ্ধ সীমা 'রিবু' অর্থাৎ ১,০০০ পর্য্যন্ত। ল্যাপল্যাণ্ড-বাসীদিগের গণনায় সর্ব্বোর্দ্ধসংখ্যা "ঝিওয়েট্" এবং আর্য্যজাতির 'সিয়াদ' অর্থাৎ একশত। আবিসিনিয়েরা, উত্তর আফ্রিকার কতিপয় জাতি ১,০০০ পর্য্যন্ত গণনা করিতে পারে। সাধারণতঃ জাতির আদিমাবস্থায় গণনাশক্তি লুপ্তকল্প হইলেও বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত এবং নানা সভ্যজাতির সংস্পর্শ হেতু অবস্থার পরিবর্ত্তনে গণনাশক্তি প্রবুদ্ধ হইতে থাকে এবং বিস্তৃত গণনার প্রয়োজনে শব্দকোষও নানা সংখ্যাদ্যোতক শব্দ দ্বারা সম্পদশালী হইয়া উঠে৷

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ।

(৭) Muller. (৮) Lubbock : Origin of Civilisation and Wallace : Darwinism.

মেরুতে আর্য্যদিগের আদিনিবাস

বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে কেবল উত্তরকুরুতেই আর্য্যদিগের আদিনিবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নহে—কিন্তু মেরু-তেও আদিনিবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই প্রমাণের আলো-চনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের জন্মভূমি যে কিরূপে ভূ স্বর্গে পরিণত হয় ইংরেজ কবি মণ্টগোমরীর (Mont Gomery) "Home" (গৃহ) নামক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি হইতেই তাহা উপলব্ধি হইবে,—

'There is a land of every land the pride,
Beloved by Heaven o'er all the world beside,
Where brighter suns dispense serener light,
And milder moons emparadise the night
A land of beauty, virtue, valour, and truth,
Time-tutored age and love-exalted youth.'

'সর্ব্বদেশের গৌরব, অপর সমগ্র পৃথিবীর অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রিয় এরূপ একটী স্থান আছে, যেখানে উজ্জ্বলতর সূর্য্য স্নিগ্ধতর আলো বিকিরণ করে—সৌম্যতর চন্দ্র রাত্রিতে স্বর্গের শোভা সৃষ্টি করে। এই স্থান সৌন্দর্য্য, পুণ্য শক্তি ও সত্যের আকর। এখানে বার্দ্ধক্য অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত, যৌবন প্রীতির দ্বারা সমুন্নত।'

অপর একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন :—

'A charm from the skies seems to hallow all there.

John Howard Payne,

'আকাশ হইতে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব তথাকার সমস্তই পুণ্যময় করিয়া থাকে।'

আমরা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে গমন করিলে আমাদের স্বদেশের প্রিয় স্মৃতি জাগরিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্বর্গের ভাবকে যে আরও বাড়াইয়া তোলে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় এই ভাবের অভিব্যক্তি হইতেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্যগণ তাঁহাদের আদিনিবাস মেরুপ্রদেশ হইতে যখন চিরবিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নূতন দেশের সন্ধানে বহির্গত হইলেন; তখন তাঁহারা যতই জন্মভূমি হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই ইহার স্মৃতি তাঁহাদের মনকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর রূপে অধিকার করিতে লাগিল।

তাঁহাদের জন্মভূমির প্রিয় ও পবিত্র স্মৃতি এইরূপে চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্মভূমিকে প্রথমতঃ পৃথিবীতে আদর্শ সুখের স্থান ও অপার দিব্য সুখের স্থানরূপে কল্পনা করিয়া লইল। অভিধানে মেরু শব্দের যে পর্য্যায় শব্দ পাওয়া যায় তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত সত্যের উদ্ধার হইতে পারে। অমরকোষে মেরু শব্দের পর্য্যায় শব্দসকলের এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়—

'মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রীরত্নসানুঃ সুরালয়ঃ।'

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে মেরু যেমন 'সুমেরু' বা 'হিমাদ্রি' নামে অভিহিত হইয়াছে, তেমনিই 'সুরালয়' নামেও অভিহিত হইয়াছে। 'সুরালয়' ও 'দেবালয়' বা স্বর্গকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মেরু বা মেরুস্থিত সুমেরু পর্ব্বতই 'সুরালয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে সুমেরু শব্দের জটাধর ধৃত যে পর্য্যায় শব্দ সকল প্রদত্ত

হইয়াছে, তাহাতে আমরা 'অমরাদ্রি' 'ভূস্বর্গ' এই দুইটী শব্দ প্রাপ্ত হই। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে সুমেরু প্রথমতঃ ভূস্বর্গ রূপে কল্পিত হইয়াই পরে 'অমরাদ্রি' ও 'সুরালয়' রূপে কল্পিত হইয়াছে।

মেরু আমাদের নিকট মরু শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। মরু শব্দ আমরা অমর কোষে পর্ব্বত ও নির্জ্জন দেশ উভয়েরই বাচক দেখিতে পাই। যথা,—

'মরু ধম্ব ধরা ধরৌ।'

'মেরু'ও * আমরা অভিধানে পর্ব্বতার্থকই দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের বোধ হয় মেরু প্রদেশের তুষারময় পার্ব্বত্যদেশ, উদ্ভিজ্জাদির অভাব বশতঃ প্রথমতঃ মরু নামেই অভিহিত হইত। পরে মধ্যআসিয়া অতিক্রম করিয়া আর্য্যগণ বালুকাময় প্রকৃত মরুদেশে উপস্থিত হইলেই তাহার সহিত তুলনায় পূর্ব্ব মরুদেশের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনার্থ সেই তুষারময় আদিস্থানকে তাঁহারা 'মেরু' 'সুমেরু' নামের দ্বারা বিশেষিত করেন।

মেরুর সহিত আর্য্যদিগের সংযোগের নিদর্শন আমরা মানবের আদি পিতা মনুর নামেও প্রাপ্ত হই। পুরাণে আমরা এক মনুর নাম 'মেরুসাবর্ণ' দেখিতে পাই। যথা—

'ততস্তু মেরুসাবর্ণো ব্রহ্মসূনুর্ম্মনুঃস্মৃতঃ।
ঋতুশ্চ ঋতুধামা বিষক্ সেনোমনুস্তথা।

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মাৎস্যে ৯ম অধ্যায়ঃ।

বেদেও আমরা মনুকে 'সাবর্ণ্য' ও 'সাবর্ণি' বিশেষণে আখ্যাত দেখি। যথা—

'প্রনূনং জায়তাময়ং মনুস্তোক্মেব রোহতু
যঃ সহস্রং শতাশ্বং সদ্যোদানায় মংহতে॥ ৮
নতমশ্নোতি কশ্চন্ দিবইব সান্বারভম্
সাবর্ণ্যস্ত দক্ষিণা বি সিন্ধুরিব পপ্রথে॥ ৯
'সাবর্ণের্দে'বাঃ প্রতিরংত্বায়ুর্যস্মিন্নশ্রান্তা অসনাম বাজম্॥১১

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৬২ সূক্ত।

'এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হউক, ইনি জল সংযুক্ত আম্র বৃক্ষবীজের ন্যায় শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্র গাভী এখনই দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁহার তুল্য কার্য্য করিতে কাহার(ও) সাধ্য নাই। সাবর্ণ মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাতলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মনুর পরমায়ু বৃদ্ধি করুন। তাঁহার নিকটে আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকি।'

রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ।

বেদের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে মেরুসাবর্ণ ও মনুসাবর্ণ্য যে অভিন্ন তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মনু মেরুরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'মেরুসাবর্ণ' নামে সেই স্মৃতি রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। মনু সর্ব্ববর্ণের আদি পিতা বলিয়াই তাঁহার নাম সাবর্ণি হইয়াছে ইহাই আচার্য্য মোক্ষমূলরের মত —

"For some reason or other Manu the Mythic ancester of the race of man was called Savarni meaning possibly the Manu of all colours i.e. of all tribes and castes."

——Science of Language (1882) Vol II. page 357.

'যে কোন কারণেই হউক মানবের পৌরাণিক আদি পূর্ব্বপুরুষ মনু 'সাবর্ণি' বলিয়া কথিত হইয়াছিল। ইহার অর্থ যে মনু, সর্ব্ব বর্ণের অর্থাৎ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বশ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ।

* শব্দকল্প দ্রুম দ্রষ্টব্য।

যিনি মানবের আদি পিতা তিনি যে মানবের আদিবাসরূপ মেরুবাসী হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। তাহা হইতেই তদীয় আদি পিতৃত্বের নিদর্শন-রূপ 'সাবর্ণ' নাম তদীয় আদিবাসের নিদর্শন-রূপ মেরু নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার মেরুসাবর্ণ নামে উভয়েরই স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের নিত্য নারায়ণ পূজায় আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের মেরু বাসের অতীব কৌতুকাবহ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণ পূজার আসন শুদ্ধির বিনিয়োগ মন্ত্রেই সেই নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বিনিয়োগ মন্ত্রটী এই—"মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনি-য়োগঃ।" এস্থলে 'মেরুপৃষ্ঠ' প্রকৃত ঋষি হউক বা না হউক আসনে মেরুতলের আরোপ করিয়া আদি নিবাসভূত মেরুদেশের পবিত্রতা আসনে সংক্রামিত করাই যে 'মেরুপৃষ্ঠ ঋষি' কল্পনার মূল তাৎপর্য্য তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

আর্য্যদিগের আদিনিবাসরূপে মেরু তাঁহাদিগের নিকট এরূপই পবিত্রতার আধার হইয়াছে যে জপমালার অগ্রমালায় ও অঙ্গুলি পর্ব্বেও তাঁহারা মেরু কল্পনা করিয়াছেন,—

'মালামেকৈকমাদায় সূত্রে সম্পাতয়েৎ সুধীঃ।
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতোন্যসেৎ ॥'

—ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত উৎপত্তিতন্ত্র ৬০ পটলঃ।

'তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমাচৈক পর্ব্বিকা
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ ॥'

—ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রসারঃ।

পাশ্চাত্য ভাষায় মেরুবোধক যে শব্দ পাওয়া যায় তাহাতেও আমরা আর্য্যদিগের আদি মেরুনিবাসেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্য ভাষায় মেরুকে Arctic region বলে। এই আর্টিক (Arctic) শব্দ গ্রীক্ Arktos শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। গ্রীক্ ভাষায় এই আর্কটস্ (Arktos) শব্দের অর্থ ভল্লুক। Arktos শব্দের অর্থ ভল্লুক হইলেও তাহা কিন্তু সপ্তর্ষি নক্ষত্র মণ্ডলকেই বুঝাইত। তাহা হইতেই সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাধারণ নাম ইংরাজীতে Great Bear হইয়াছে। এই Arktos বা সপ্তর্ষিমণ্ডল বিরাজিত বলিয়াই মেরুর পাশ্চাত্য নাম Arctic হইয়াছে। এই Arctic নামে নক্ষত্রের সহিত ভল্লুকের যোগ একটী অতীব জটিল সমস্যা বলিয়াই প্রতীয়মান্ হয়। পাশ্চাত্য ভাষাসকলের দ্বারা ইহার কোন সমাধানই হয় না কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ইহার আশ্চর্য্য সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃতে ভল্লুকবাচী যে 'ঋক্ষ' শব্দ পাওয়া যায়—গ্রীক্ Arktos শব্দটীকে ঠিক্ ইহারই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃতে এই ঋক্ষ শব্দটীকে নক্ষত্রবাচীও দেখিতে পাওয়া যায়। 'ঋক্ষ' শব্দের এই নক্ষত্র অর্থ নূতন অর্থ নহে ইহা বৈদিক কালের পুরাতন অর্থ। বেদে উক্ত অর্থে আমরা ইহার স্পষ্ট প্রয়োগই দেখিতে পাই। যথা,—

অমীষ ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহচিদ্দিবেয়ুঃ।

ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল ২৪ সূক্ত।

'ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রি যোগে দৃষ্ট হয় দিবা যোগে কোথায় চলিয়া যায়?' রমেশ বাবুর অনুবাদ।

এস্থলে ঋক্ষ শব্দের টীকায় সায়ণ 'ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ।' 'যদ্বা ঋক্ষাঃ সর্ব্বেঽপি নক্ষত্র বিশেষাঃ।' এইরূপ লিখিয়া সপ্তর্ষি ও নক্ষত্র সাধারণ উভয়ার্থে ঋক্ষ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইখানেই আমরা পাশ্চাত্য ভাষার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেছি। গ্রীকগণ তাঁহাদের আর্য্য ভ্রাতৃগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবার সময় 'ঋক্ষ' শব্দটী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহার নক্ষত্র অর্থটী বিস্মৃত হইয়া কেবল ভল্লুক অর্থটী স্মরণ রাখিয়াছিলেন। তাহাতেই নক্ষত্রকে তাঁহারা ভল্লুক নামে আখ্যাত করিয়া বিষম গোলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

রমেশ বাবু এতৎ সম্বন্ধে যে মন্তব্য তদীয় অনুবাদে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি—

সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ (ভল্লুক) এবং ইউরোপীয় ভাষায় Great Bear বলে কেন? ইহার একটী অতি রহস্যজনক কারণ আছে। ঋচ্ বা অর্চ্চ উজ্জ্বল হওয়া বা অর্চ্চনা করা। উজ্জ্বল হওয়া অর্থে এই ধাতু হইতে উজ্জ্বল লোমধারী ভল্লুকের নাম ঋক্ষ হয় এবং উজ্জ্বল সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নামও ঋক্ষ হয়। কালক্রমে লোকে ঋক্ষ শব্দের নক্ষত্র অর্থটী ভুলিয়া গেল এবং যে সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ কহিত তাহার অর্থ ভল্লুক নক্ষত্র করিল। এইরূপে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নাম ভল্লুক নক্ষত্র; সুতরাং ইউরোপে Great Bear নাম হইল।

Riksha in the sense of hight has become the name of the bear so called either his bright eyes or from his brilliant tawny fur..............from The same name in the sense of the bright ones, has been applied by the Vedic poets to the stars in general, and more particularly to that constellatian which in northern parts of India was the most prominent.....................And thus it happened that when the Greeks had left their central home and settled in Europe, they retained the name of Arktos for the same unchanging stars....................Thus the name of the Arctic regions rests on a misunderstanding of a name framed thousands of years ago in Central Asia, and the surprise with which many a thoughtfull observer has looked at these seven bright stars, wandering why they were ever called the Bear, is removed by a referance to the early annals of human speech,

Maxmuller's Science of Languago (1882) Vol II page 395 to 399.

রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ।—২৫ পৃষ্ঠা

নিম্নে আমরা মোক্ষমূলরের মন্তব্যের অনুবাদ প্রদান করিতেছি;—

'উজ্জ্বল অর্থে ঋক্ষ, ভল্লুকের নাম হইয়াছে। চক্ষুর ঔজ্জ্বল্য বা লোমের উজ্জ্বল কপিল বর্ণ হইতেই ভল্লুক এই নামে কথিত হইত। এই নামই বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক উজ্জ্বল অর্থে সাধারণ ভাবে নক্ষত্রের প্রতি এবং যে নক্ষত্রমণ্ডল ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ সকলে সবিশেষ লক্ষিত হয় সেই নক্ষত্রমণ্ডলের প্রতি বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রীকগণ মধ্য আসিয়ার অধিবাস পরিত্যাগ করতঃ ইউরোপে উপনিবিষ্ট হইলে তাঁহারা এই স্থির নক্ষত্ররাশির আর্কটস্ নামটী যে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা এই প্রকারেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এই প্রকারেই Arctic Region (সুমেরু) নাম মধ্য আসিয়াতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে নাম গঠিত হইয়াছিল তাহারই ভ্রমাত্মক অর্থ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। বহু চিন্তাশীল পর্য্যবেক্ষক যে আশ্চর্য্য ভাবের সহিত এই সপ্তর্ষি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ ইহারা কেন কখনও ভল্লুক নামে অভিহিত হইত ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন সেই আশ্চর্য্য ভাব মনুষ্য ভাষার আদি ইতিহাসের নির্দ্দেশের দ্বারাই দূরীভূত হইয়াছে।"

এস্থলে যে সাদৃশ্যমূলে নক্ষত্রের 'ঋক্ষ' নাম ভল্লুকের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আচার্য্য মোক্ষমূলর মন্তব্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ চক্ষুর সাদৃশ্যের জন্য সমগ্র দেহ নক্ষত্রের সহিত

তুলিত হইবে ইহা তেমন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি আমরা সমস্ত চক্ষুটীও নক্ষত্রের সহিত তুলিত দেখিতে পাই না, কেবল ইহার জ্যোতিষ্মান্ গোলাকার অংশ-টীকেই নক্ষত্রের সহিত তুলিত দেখি। 'চক্ষু-তারকা' কথাতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ভল্লুকের কপিল বর্ণের উজ্জ্বল লোমের সহিতও নক্ষত্রের ঔজ্জ্বলের সাদৃশ্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না কারণ নক্ষত্রের উজ্জ্বল্য শ্বেতবর্ণ আর ভল্লুকের লোমের বর্ণ কটা। তাহা হইলে এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে ভল্লুকের সহিত আর কোন্ প্রকারে নক্ষত্রের সাদৃশ্য হইতে পারে? আমরা অনুমান করি, যে ভল্লুকের সহিত নক্ষত্রের সাদৃশ্য পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা আমাদের সাধারণ কটা রঙের ভল্লুক নহে পরন্তু তাহা শীতপ্রধান মেরুমণ্ডলের শ্বেতভল্লুক। তাহাদের উজ্জ্বল শ্বেত লোমের সহিত নক্ষত্রের উজ্জ্বল শ্বেতরশ্মির তুলনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। আচার্য্য মোক্ষমূলর মধ্য আসিয়াতে ঋক্ষ নামটী প্রথম গঠিত হইয়াছিল বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভল্লুক মধ্য-আসিয়ার স্বভাবজাত পশু বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বর্ত্তমান ভৌগোলিক গ্রন্থেও মধ্য আসিয়ার স্বভাবজাত পশুর মধ্যে আমরা ভল্লুকের নাম দেখিতে পাই না। তাহাতে আমরা রোমন্থনকারী জন্তু যেমন উষ্ট্র, বৃষ, হরিণ, ছাগ, মেষ, চমরী গাই প্রভৃতিরই উল্লেখ দেখিতে পাই।* মধ্য আসিয়ার সুবিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের উপযোগী তৃণভোজী জন্তুর বাসই তথায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে উত্তর আসিয়ার জন্তুদিগের যে নাম আমরা ভূগোলে দেখিতে পাই, তন্মধ্যে ভল্লুকের নাম আমরা প্রথমেই উল্লিখিত দেখি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শীত-প্রধানদেশের বাসোপযোগী অপর কোন জন্তুর উল্লেখ দেখিতে পাই যথাঃ—

In the Northern Region the forest furnish shelter for numerous wild animals, which are hunted for the sake of their furs. Bears, foxes, sables and martens are among the most commons. The rein-deer Is almost the sole-support of the inhabitants of the Far North,

Longman's, The World with fuller treatment of India page 62.

লোমের জন্য যে সকল জন্তুকে শীকার করা হয় উত্তরভাগের অরণ্যসকল তৎসমস্তকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে। ভল্লুক, ছাগল ও নকুল জাতীয় জন্তু সকলই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বল্গাহরিণকেই সুদূর উত্তর প্রদেশাধিবাসীদিগের একমাত্র অবলম্বন বলা যায়।

ইহা হইতে আর্য্যদিগের সুমেরুতে বাস কালেই যে ভল্লুকের ঋক্ষ নামটী গঠিত হওয়া সম্ভব কিন্তু মধ্য আসিয়াতে বাসকালে গঠিত হওয়া সম্ভব নহে তাহাই আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি।

এই প্রকারে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় প্রকারের পুরাতত্ত্বের দ্বারাই আর্য্যদিগের আদিনিবাস যে 'মেরু' বা 'সুমেরু'তে ছিল তাহা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

* On the plateaux of the interior, ruminating animals such as the camal, ox, dear goat sheep etc are chiefly found ; the yak is used as a beast of burden,

Longman's The world with fuller treatment of India.

সন্ধ্যা প্রদীপ

বেলা চলি যায় পাংশুবরণ মুখে
সন্ধ্যা আসিল অবগুণ্ঠন টানি,
আবাহনী গীত বাজিল করুণ শাঁখে
কুলবধূ ঘরে প্রদীপ জ্বালিল আনি'।

লীলা।

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ভারতে অনার্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি

দক্ষিণ ভারতে অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে অনেক প্রকার অদ্ভুত বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সকল শ্রেণীর মধ্যেই 'তলু' 'বট্টু' (এক প্রকার হাঁসুলি বা গলার হার) জিনিষটি বিবাহ কর্ম্মের অপরিহার্য্য উপাদান বলিয়া গণ্য। অনেক ইয়ুরোপবাসী হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে তাঁহাদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও নববিবাহিত যুগলের পশ্চাতে চাউল ছড়াইবার রীতি প্রচলিত। কুরুম্বা (kurunba) বা রাখাল জাতির মধ্যে বিবাহ কালে কন্যা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া রাখে। চাষারা যেরূপ শারীরিক সুচিহ্ন দেখিয়া পশু ক্রয় করে ইহারাও সেইরূপ কন্যার অঙ্গের কোন সৌভাগ্য চিহ্ন দেখিলে তাহাকে পত্নীরূপে মনোনীত করে। যানদীস্ (yanadis) নামে নেলোরের এক বন্য জাতির মধ্যে পুরুষ বা নারী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পায় না। বর ক'নের ডান পা'র উপর তাহার ডান পা রাখিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করে এবং ক'নের কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দেয়। তাহারা দুইজনে পরস্পরের মাথার উপর চাউল নিক্ষেপ করে। ইহার পর দেবতার পূজা সমাপ্ত হইলেই বিবাহ কর্ম্ম সমাধা হইল।

'কোরাবার নামে আর এক অর্দ্ধসভ্য চোর জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত। কাহারও পত্নী ইচ্ছামাত্রেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে কোন নিন্দা নাই। বর কন্যার পিতার নিকট এক ভাঁড় 'তাড়ি' উপঢৌকন দিতে পারিলেই কন্যার পাণিগ্রহণ সিদ্ধ হইয়া যায়। বিবাহ বন্ধন ইহাদের মধ্যে বড়ই শিথিল।

'সাগালি' নামে আর এক জাতি আছে তাহারা পাখী ধরিয়া খায়। ইহাদের মধ্যে বর তাহার ভাবী শ্বশুরকে দুই একটি গো মেষ ও কিছু টাকা দিতে পারিলেই তাঁহার কন্যার কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দিতে পারে অর্থাৎ তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে। বিবাহের পর তৃতীয় দিনে ক'নে তাহার স্বামীর বাটীতে গমন করে। যাইবার সময়ে সম্মুখে একটি ষাঁড় রাখিয়া চলে।

যোগী নামে আর এক বন্যজাতি বিবাহ কালে ১২টি খুঁটি পুঁতিয়া একটি খোঁয়াড় প্রস্তুত করে। বর কনে উভয় পক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে একটি করিয়া মেষ ও মাটির ভাঁড় উপহার দেয়। যে এরূপ উপহার দিতে অক্ষম হয় তাহার হাতের চেটোয় তিন ঘা করিয়া বেত্রাঘাত করা হয়। পরে তাহার কিছু অর্থ দণ্ড করিয়া তাহার মাথার উপর ময়লা জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে কনের কণ্ঠে 'বট্টু' বাঁধিবার পূর্ব্বে বর একটী বিড়ালীর কণ্ঠে বট্টু বাঁধিয়া দেয়। এরূটী করার যে উদ্দেশ্য কি তাহা তাহারা নিজেই জানে না। তামিল চামারেরা 'অভরম্' গাছকে বিশেষ ভক্তি করে। এই গাছের ছালে তাহারা চামড়া পরিষ্কার করে। ইহারা

প্রথমে 'অভরম্' গাছের ডালে একটি 'বট্টু' বাঁধিয়া পরে কনের কণ্ঠে 'বট্টু' পরাইয়া দেয়। 'পলয়ক্করণ' নামে এক প্রকার ব্যাধ জাতি জম্বু বৃক্ষকে বিশেষ ভক্তি করে। বিবাহের প্রথম দিনে ইহারা একটি জম্বু শাখাকে ধূপ ধুনা, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা পূজা করে। অবশেষে এই বৃক্ষজড়িত লতা লইয়া বর বিবাহ মঞ্চের প্রত্যেক খুঁটিতে তাহা জড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালে বিবাহিত যুগল গ্রামের বাহিরে কোন পিঁপড়ার ঢিবির নিকট যাত্রা করে। তাহার উপর দুধ ও ঘি ঢালিয়া ঝুড়ি করিয়া সেই কাদা গৃহে লইয়া আসে। বর সেই কাদায় ১২টি প্রদীপ গড়িয়া ১২টি স্তম্ভের উপর জ্বালিয়া দেয়। তৃতীয় দিনে বর তাহার আত্মীয়গণের সহিত গ্রামের বাহিরে এক মাঠে গিয়া কতকটা ভূমি লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিয়া সেইস্থানে শস্তের বীজ বপন করে। 'কাম্মাভারো' নামে এক প্রকার তেলেগু কৃষকজাতি পুরাকালে শত্রুগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া 'ঢল' বনের ভিতর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহারা সেই জন্য এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ কালে সামিয়ানার উত্তর দিকের খুঁটিতে 'ঢল' গাছের পাতা বাঁধিয়া রাখে।

'মলয়ালি' নামে এক প্রকার পার্ব্বত্য জাতি পশ্চিম ঘাটের 'জবাদি' পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা অতি অদ্ভুত। পুরোহিত কনের কণ্ঠে 'তলু' বাঁধিয়া দিবার পর বিবাহিত যুগলের কোলের উপর একখানি তরবারি রাখিয়া দেওয়া হয়। কনের পিতার নিকট কন্যাদানের সম্মতি গ্রহণের পূর্ব্বে বরকে অন্ততঃ এক বৎসর কনের বাড়ীতে কর্ম্ম করিতে হয়। অনেক সময়ে যুবতী পিতার সম্মতি লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া যুবকের সহিত পলাইয়া যায় বা যুবক যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে। বর এরূপ করিলে তাহার এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়, যথা মুখে রঙ মাখিয়া, ভাঙ্গা হাঁড়ি, জঞ্জাল বোঝাই ঝুড়ি বা ভাঙ্গা জানালা মাথার উপর রাখিয়া তাহার পথে চলিতে হয়। ইহাদের মধ্যেও বিবাহবন্ধন অতি শিথিল। ইহারা পর্ব্বতের গুহ্যতম প্রদেশে একটি প্রস্তরের কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করে। তথায় বাহিরের কাহারও ত' যাইবার সম্ভাবনা নাইই, তাহাদের স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত তথায় প্রবেশ করিতে পায় না।

'বয়া' নামে আর এক প্রকার জাতি আছে। তাহারা পূর্ব্বে ব্যাধ ছিল। বিবাহ-কালে ইহারা বর কনের হাতে লোহার বালা পরাইয়া দিয়া কৃষ্ণ মেষের লোমে দুই জনের হাত বাঁধিয়া দেয়। কন্যার কণ্ঠে 'তলু' পরান ত' আছেই। ইহাদের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই কাল রঙ্গের বালা পরে।

দক্ষিণ ভারতে 'দেবদাসী' নামপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকগণ আমরণ অবিবাহিতা থাকে ও দেবালয়ে নর্ত্তকীর কার্য্য করে। ইহাদের একটি তরবারির সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। যে দেবতাকে ইহারা দাসীরূপে সেবা করে তাঁহারই পত্নীরূপে ইহারা গণ্য হয়। বিবাহিতার চিহ্নস্বরূপ ইহারা কণ্ঠে 'বট্ট' ব্যবহার করে।

চট্টগ্রামে চাক্‌মাজাতির বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস তাঁহার চাক্‌মা-জাতির ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতিশয় কৌতুকাবহ। ইহাদের মধ্যে মামাত পিস্‌তুত ভাইভগিনীর মধ্যে পাণিগ্রহণ প্রচলিত, কিন্তু শ্যালিকার সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে।

বিবাহ ইহাদিগের সচরাচর পঞ্চবিধ যথা,—অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে—১। বল-পূর্ব্বক বিবাহ ২। বড় বিবাহ, ৩। গৃহজামাতা আনয়ন ৪। এবং মনোমিলনে পরিণয় ৫। এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহ সমধিক প্রচলিত।

* * *

পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতামাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত "তাইন্‌মাং" (পরামর্শ) করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে।

তাহাদের মনোমত কন্যার সমাচার পাইলে কোন কোন সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত কন্যার পিত্রালয়ে বরের পিতাকে যাইতে হয়। পিতা না থাকিলে অন্য কোন অভিভাবক গমন করেন। প্রথম বারে মদ, পানসুপারী এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। পরন্তু কখনই কলা লইয়া যাইতে নাই; তাহাতে বিফল মনোরথ সর্ব্ববাদীসম্মত। নিতান্ত সাবধানে বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত করা হয়। পাত্রের পিতা বলে—"তোমার ঘরের নিকট একটি মনোহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে চাহি।" ইহা হইতেই কন্যার পিতা মূলকথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। কেন না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা গেলে, অথবা কোন কাক যদি বামপার্শ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনও জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পায়, তবে আর একপদমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়া দেয়।

* * *

এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, "ছাদং"এর সময় অর্থাৎ আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমার মধ্যে বিবাহের কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়বারেও প্রথমবারের ন্যায় অধিকন্তু পিষ্টক, মোরগ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। অনন্তর তৃতীয়-বারে পণ ধার্য্য করা হয়। সাধারণতঃ ৫০,৬০ তোলা রূপার গহনা এবং ১০০।১২০ টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পণ নির্দ্ধারিত হইয়া

থাকে; সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্যাপণের প্রচলন নাই। এই সময়ে কন্যা তুলিয়া আনা হইবে, কি বরকে তুলিয়া নিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, এই প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া নিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু ইহার তেমন প্রচলন নাই।

* * *

উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে, শুভদিন ধার্য্য হইয়া যায়। ফসলের কার্য্য হইতে অবসর কালই বিবাহের প্রশস্ত সময়; এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

* * *

কথাবার্ত্তা সাব্যস্ত হইবার পর কোন কোন বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে একটি অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়া আইসে; অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে বরপক্ষ কন্যার পিতার নিকট হইতে বিবাহের নিমিত্ত মণ্ড প্রস্তুত করিবার অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্ব্বদিন যে সকল বাদ্যকরেরা আসে, তাহাদের প্রথম বাদ্য হইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাশুভ গণনা করে। এই প্রথম বাদ্যকে "খোলা আননি" (১) বলা হয়। এতদ্ভিন্ন বরপক্ষীয় কোন স্ত্রীলোক কলাপাতায় পান সুপারীর দুইটি "পুঁটুলি" করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুঁটুলি' দুইটি মিলিত হইয়া ভাসে তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় সদ্ভাব সূচিত হয়, অন্যথা তাহারা বরকন্যার মনোমালিন্যের আশঙ্কা করে। বরের বাড়ীতে বিবাহ হইবার কথা হইলে, বরপক্ষীয় কোন মহিলা পক্ষান্তরে কন্যাপক্ষের কেহ নদী হইতে এক কলসী জল লইয়া আইসে; এই জলে, বিবাহের দিন বরকন্যাকে স্নান করান হয়। অধিবাস দিবসে বরকন্যা উভয়পক্ষেরই গৃহ-সম্মুখীন্ দুইধারে সপল্লব মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

১। পাত্রী বরের গৃহে তুলিয়া আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ব্বদিন, পথ যদি দূরবর্ত্তী হয় তবে তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়ীতে উপনীত হইতে পারা যায় সেই হিসাবে, বরের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ বাদ্যাদিসহ কন্যা আনয়নের জন্য যাত্রা করে।

* * *

পরদিন প্রত্যূষে ঘট প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক অপরাপর শুভানুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা দুহিতারত্নকে বিদায় দান করে। এই সময়ে "সাঁকো"র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সূত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। বর-পক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিবার সময় কন্যার মাতা সূতাখানি ছিঁড়িয়া দেয়, ইহাতেই তাহাদের সহিত কন্যার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, কন্যার সহিত তাহার পিতা কি পিতামাতা উভয়েই বরগৃহে গমন করে।

* * *

কোন কোন পরিবারে গণৎকার

(১) এ সময় প্রাঙ্গণে একটি জায়গা করিয়া তাহাতে পান সুপারী, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে; এই নিমিত্ত টাকাও একটি দিতে হয়।

নির্দ্ধারিত লগ্নে বরকন্যাকে উপযুক্ত বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহবেদীর উপরে উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর বামপার্শ্বে স্থান পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনও আত্মীয় এবং আত্মীয়া বর-কন্যার প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া যথাকালে তাহাদের পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে ছাঁয়লা" এবং "ছাঁয়লী" বলা হয়। ইহারা একখানি শুভ্রবস্ত্র লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "জোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে ত?" সকলে বলিয়া উঠে—"আছে" "আছে" "আছে"। সম্মতি পাইবা মাত্রই "ছায়লা—ছায়লী" উক্ত বস্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে বদ্ধ করে। তখন তাহারা পরস্পরকে "বদা-গুল্যা ভাত" অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ তাহার মুখমধ্যে উল্লিখিত ভক্ষ্য প্রদান করে।

* * *

এইরূপে খাদ্য বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধ নবীন দম্পতির মস্তকে শুভাশীষ বাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করেন। ইহাই স্বস্তিবাচন—পক্ষান্তরে কর্ম্মের সাফল্য ঘোষণা। অনন্তর দম্পতি আচম্বিতে উঠিয়া পড়ে। এতন্মধ্যে যদি নবোঢ়া পূর্ব্বে উঠে, তবে সে সর্ব্বদা স্বামীর অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সংস্কারের আশ্বাস আছে। পরে স্বামী স্ত্রী পৃথক স্থানে নিদ্রায় রাত্রি কাটায়।

পরদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া জনৈক "ওঝার" সহিত নদীকূলে যায়, এবং তথায় দুইটী মোরগের রুধিরে "ঘিলা" ও কিঞ্চিৎ মদ্য ও সোনারূপার জলে "মাথা ধুইয়া শুদ্ধ" হয়। ইহাকে বিবাহের "বুরপারণ" বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই তাহারা বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয়স্বজাতি সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া বসে! তখন নবদম্পতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয়; এবং যথোচিত অভিবাদন পুবঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্ঠীবন-সিক্ত সতণ্ডুল-তুলা শুভনির্ম্মাল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতির কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে।

* * *

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানা-বিধ মদ্য এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়া সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া আইসে। ইহার নাম বিবাহের "ছুইদ্ ভাঙ্গান" অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতির একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে, এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও উঠিতে পারে না।

* * *

বর তুলিয়া নিয়া বিবাহ এবং উপরি বর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ কোন তারতম্য নাই; কেবল বরগৃহের কর্ম্ম-গুলিও কন্যার পিত্রালয়ে হইয়া থাকে মাত্র।

* * *

ইহাদের সমাজে অনূঢ় এবং অনূঢ়াদলের সম্মিলন প্রায় অব্যাহত। যুবক যুবতীর মধ্যে সেই সুযোগে প্রণয়াসক্তি জন্মিলে তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পায় যে, তাহাদের পুত্র বা কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া সমাজকর্ত্তার সমীপে যুবকের নামে অভিযোগ জানায়। উপায়াভাবে যুবকের পিতামাতাও যুবতীর পিতামাতার নিকট তাহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা করে। অবশেষে যুবক যুবতী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সমাজকর্ত্তার কাছে বিচার উপস্থিত হয়। যদি যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই দুর্ম্মতি যুবকের ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়া যায়। কোন কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়া না গেলেও যদি যুবক যুবতীর সঙ্কল্প প্রবল থাকে, তাহারা পুনরায় পলায়ন করে। এইরূপে চারিবার পর্য্যন্ত পলাইতে পারিলে কন্যার পিতা আর কুলমর্য্যাদাহানির দাবি করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে "চুপ্‌লাং" পূজা এবং নূতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুসঙ্গিক কার্য্য না করিলেও চলে, হয়ও না।

চিত্রোৎপলা

১

নহে সিন্ধু, কাবেরী, যমুনা, গঙ্গা,
নর্ম্মদা, গোদাবরী সে;
সে ত আর্য্য-কীর্ত্তি-স্মৃতি-তরঙ্গা
গাথা নাহি হেথা বরিষে।

২

এ যে শবরভবনে বিজনবাহিনী
শৈলমঞ্চে নটিনী,
গাহে ফেনিল লাস্যে স্বচ্ছ কাহিনী
চিত্রোৎপলা তটিনী।

৩

ঐ পাষাণ গলায়ে শিলায় শিলায়
বিষম পন্থা দলিয়া
ছোটে চঞ্চলা; ফোটে লহরী লীলায়
সৌর কিরণ ঝলিয়া।

৪

নাহি তীরভূমে তার হর্ম্ম্যমালায়
খচিত রম্য নগরী,
আছে পর্ণকুটীরে বনের তলায়
বিজনে শবর-শবরী।

৫

হেথা স্ফটিক স্বচ্ছ নীল তরঙ্গ
অম্বর প্রতিবিম্বিয়া,
ধায় উপলকৃষ্ণ যুবতি-অঙ্গ
গলায় গলায় চুম্বিয়া।

৬

হেথা ধৌত, স্নিগ্ধ, ভূতল, গগন,
কানন, শৈল, শবরী;
হেথা অমল, সবল সচল স্বপন,
বিরাজে চেতনা আবরি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।
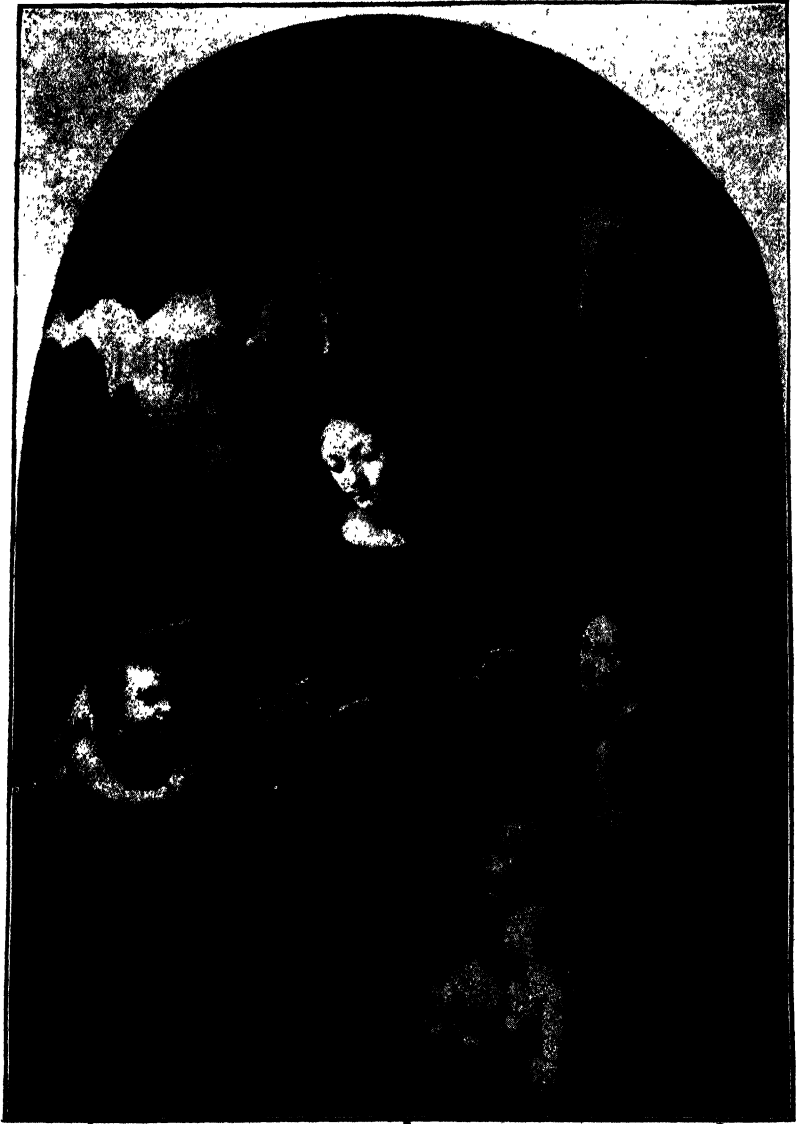
শৈলকুমারী

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

জাতীয় মহাসমিতি

করাচীতে এবারকার জাতীয় মহাসভার অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় বিষণদাস বিভিন্ন প্রদেশের সমাগত ডেলিগেটদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার সময় হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন যে সখ্য ভাব দেখা যাইতেছে তাহা সমগ্র দেশের পক্ষে মঙ্গলেরই সূচনা করিয়া দিতেছে। গত বৎসর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যে আনন্দপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশ সাফল্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। পঁয়ত্রিশ কোটি মানব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক প্রাণে, একত্রে শান্তিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ;—সকলেরি উদ্দেশ্য, চেষ্টা, সাধনা, আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায় সেই এক মাতৃভূমির সেবা—এ অপূর্ব্ব দৃশ্য কবিকল্পনা নয়, স্বপ্নমুগ্ধের মানসছবি নয়, ইহা বাস্তব ঘটনা।

মুসলমানদিগের মধ্যে নব জাগরণের প্রকাশ সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমরা ভায়ে ভায়ে একত্র মিলিয়া জাতিবিরোধ ও তুচ্ছ স্বার্থের প্ররোচনা ভুলিতে পারিলে, তবেই না মাতৃভূমির উন্নতি সাধিত হইবে? মুসলমানগণ দেশধর্ম্মের উদারতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যতই গভীর রূপে অনুভব করিবেন—ততই না ভারতীয় জাতি সুদৃঢ় রূপে গঠিত হইবে? কেবলমাত্র হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, পার্সি জৈন নয়, প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক জাতিরই উন্নতিতে—জাতীয়জীবনের সম্পূর্ণতা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিণতি।

মোসলেম লীগের পরিচালকসমিতি গত বৎসর H. H. Aga Khan এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশরাজের আশ্রয়ে স্বায়ত্তশাসনই যে আদর্শ শাসনপ্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেই জানা যাইতেছে—জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগের আর কোন মতভেদ নাই। আমরা সকলেই আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া একই লক্ষ্যের অভিমুখে স্থির ভাবে অগ্রসর হইতেছি। কাব্য সাহিত্য দর্শন এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করিয়া হিন্দুর বিংশতি বৎসর পরে মুসলমানও সেই পথের যাত্রী হইয়াছে। আমাদের সকলেরই এক স্বার্থ মাতৃভূমির দুঃখ নিরাকরণ ; আমাদের সকলেরই হৃদয় সমস্বরে বলিতেছে "নমো হিন্দুস্থান।"

জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নবাব সৈয়দ মহম্মদের বক্তৃতা সুদীর্ঘ। তাহাতে তিনি বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াই এস্থলে ক্ষান্ত হইব। হিন্দু মুসলমান-দিগের ঐক্য সম্বন্ধে সভাপতি বলিয়াছেন ;—

"আজ বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৭ সালে মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসভার তৃতীয় অধিবেশনের

সভাপতি বদরুদ্দিন তায়াবজি বলিয়াছিলেন, 'অনেকে আমাদের এ সম্মিলনীকে জাতীয় মহাসভা বলিতে সম্মত নহেন। কেননা ভারতীয় জাতির এক প্রধানতম অংশ মুসলমানসম্প্রদায় ইহার পূর্ব্ব দুই অধিবেশনে সম্পূর্ণ ভাবে ইহাতে যোগদান করেন নাই। কিন্তু হে ভদ্রমণ্ডলি এ কথা ঠিকনহে। ক্ষণিক এবং স্থানীয় কোন কারণ বশতঃ সম্ভবত এইরূপ ঘটিয়াছে—ইত্যাদি।' বস্তুতঃই—সে ক্ষণিক কারণসকল ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে—শিক্ষা বিস্তারের সহিত দিন দিন হিন্দু মুসলমানের হৃদ্যতা যে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা কেহ আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। সম্মানীয় আগাখান সাহেবের বক্তৃতায় এই বন্ধুত্বের চরম পরিণতির আনন্দ বার্ত্তা আমরা জানিতে পারিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন ;—

হিন্দু মুসলমান প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, একাগ্র মনে, একত্রে, উভয়ে উভয়ের সহায়তায় সাহসী এবং উৎসাহী হইয়া কার্য্য করিতে পারিলেই অচিরে ভারতবাসীর উন্নতি সুন্দররূপে সাধিত হইবে ; ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ মধ্যে মধ্যে একত্র সম্মিলিত হইয়া সাধারণের মঙ্গলজনক বিষয়-সকল কিরূপে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার পরামর্শ করা আবশ্যক। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেশভক্ত মাতৃসেবী সন্তানগণ কখনই এ অনুষ্ঠানে পশ্চাৎপদ হইবেন না। এই একপ্রাণতাই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। ইহা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া মঙ্গলপ্রসূ হউক ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।'

রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে হইলে —জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একপ্রাণ হওয়াই যে তাহার একমাত্র উপায় তাহার আর সন্দেহ কি ?—সহানুভূতি দ্বারা অর্থাৎ নাড়ীর টানেই দূর দূরান্তর হইতেও আমরা মিলনের প্রীতি অনুভব করি। কোনও বহিঃশত্রু যাহাতে আমাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিতে না পারে সে জন্য সকলেরই সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ দলিত করিয়া মহৎ উদার সহানুভূতিতে, মাতৃভূমির স্বার্থে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্মুখের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আগে যেমন যাইতে হইবে, তেমনি একত্রেও যাইতে হইবে একথা যেন আর আমরা না ভুলিয়া যাই।"

দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারের সম্বন্ধে সভাপতি বলিয়াছেন ;—

"এই নাড়ীর টানেই ব্যথা অনুভব করিয়াছি বলিয়া আমরা আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী ভারতীয় ভ্রাতাভগিনীদিগের দুঃখে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারি নাই।—এই জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী একশত পঞ্চাশ সহস্র ভারতবাসীর দুঃখ আমাদের হৃদয়কে কাতর ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—এই জন্যই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা যে আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ কোনরূপেই এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন। যে অশেষ বীরত্বের সহিত তাহারা বিপুল অসমশক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় সম্মান রক্ষার্থ এবং ভবিষ্যতের মঙ্গল সাধন চেষ্টায় যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে তাহাতে আমাদের মনে যেমন তাহাদের নিমিত্ত গভীর সমবেদনার সৃষ্টি করিতেছে তেমনি তাহাদিগের বিরোধী অত্যাচারীদিগের প্রতি তীব্রক্রোধের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু এ সহানুভূতি বা ক্রোধে অত্যাচারীর পীড়নদণ্ড প্রতিরোধ করিবার

কোন শক্তিই আমাদের নাই। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রই এই প্রতিবিধানের মহামন্ত্র প্রচার করিতে পারেন। সেখানকার শাসনকর্ত্তাগণ এখনও কেন এ সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ—এখনও কেন ভারতীয় প্রজা উৎপীড়িত হইতেছে? সহানুভূতিসূচক বার্ত্তা, উৎসাহের অভয়বাণী অনেক শুনিতেছি—কিন্তু কথা কেন কার্য্যে পরিণত হইতেছে না? যে মহা সামাজ্যের অধীনে ৫০ কোটী প্রজার বাস—যে রাজার রাজ্যে সূর্য্যদেবের অস্ত নাই—সেই সাম্রাজ্যের অধিনায়কগণ মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিকের বিরুদ্ধে ন্যায়ের শাসনদণ্ড উত্তোলন করিতে অক্ষম ইহা অপেক্ষা অবোধ্য এবং ভয়ানক ব্যাপার কি হইতে পারে?—এ ব্যাপারে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের মনে বিভীষিকার সঞ্চার হইতেছে।

যে মহা সাম্রাজ্যাধীনে আমরা সকলেই বসবাস করিতেছি তাহারি প্রধান বর্গ উদাসীন ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন—আর আঘাতের পর নির্ম্মমতর আঘাত বর্ষিত হইয়া ভারতীয়দিগকে ধূলিশায়ী করিতেছে। এই উদাসিন্য উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে দারুণ বিরূপতার সৃষ্টি করিতেছে—ব্রিটিশ রাজ্যচালকদিগের উন্নত, দৃঢ়, চরিত্রবলের প্রতি সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে। এই ঔদাসিন্যের বলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান মনে করিতেছে যে তাহাদিগের কার্য্য প্রণালীর সহিত ব্রিটিশ হোমগভর্ণমেণ্টের কোন বিরোধ নাই—তাঁহারা ইউনিয়ানেরই স্বপক্ষ। আমি বলি ইউনিয়ানকে উপেক্ষা কর—অন্য উপায় নাই—বুয়ারগণ কখনই ন্যায়ত সদ্ব্যবহারের দাবী গ্রাহ্য করিবে না,—তাহারা জানে ভারতবাসীদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্যই যুদ্ধের অবতারণা হয়,—তাহারি ফলে, তাহাদিগের পূর্ব্বের স্বাধীনতা যায়। ভারতীয় প্রজাদিগের এ দুর্গতির জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে দায়ী। ইহা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন; পূর্ব্বেই আইনের দ্বারা ইহার সম্ভাবনা দূর করিতে পারিতেন। বুয়ারদিগকে স্বায়ত্তশাসন দান করিবার সময়ই তাহা করা উচিত ছিল—কিন্তু করা হয় নাই, এখন আর উপায় নাই। প্রতিশোধ পন্থা অবলম্বনই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হইবে আমার ধারণা। নেটাল হইতে যাহাতে আমাদের দেশে আর কয়লা না আসিতে পারে—এবং সেখানকার শ্বেত বর্ণ প্রজা যাহাতে এ দেশের সিভিল সার্ব্বিসে কার্য্য না পায় তাহা করিলে তবেই কতক প্রতিবিধান হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই অস্ত্র ধারণ করিলেই সেখানকার দম্ভবল অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই। অবিলম্বে এ অস্ত্র ধারণ করা আবশ্যক। হয় ত ইহাতে স্থায়ী ফল হইবে না, ক্ষণিকের জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হইবে মাত্র, কিন্তু ইহার নৈতিক ফল ভারতবাসীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই—এবং ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট যে এ অস্ত্রপাতে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিতে পারিবে তাহাও মনে হয় না। এইরূপ শাস্তিবিধান-নীতি অনুসরণ করিলে আর কিছু না হউক সমগ্র পৃথিবী জানিতে পারিবে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাদিগের দুঃখ কষ্টে উদাসীন নহে—প্রজার অত্যাচার তাঁহারা কখনই মানিয়া লইবেন না। শাস্তি বিধান

করিতে বলিতেছি কেননা অন্য উপায় আর দেখি না, তবুও আশা করিতেছি বিচার-আলোচনার পথ সম্পূর্ণ রোধ হয় নাই, ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্টের ন্যায়বিচার-শক্তি এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।”

ভারতীয় সেক্রেটারি অব্ কাউনসিল পুনর্গঠন সম্বন্ধে সভাপতি বলিতেছেন, “আজ কালকার দিনে সভ্যদিগকে সাধারণে নির্ব্বাচন করিয়া দিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কাউনসিল সংস্কার কালে যাহাতে ভবিষ্যতে এক তৃতীয়াংশ ভারতীয় সভ্য হয়েন—এবং তাঁহারা যাহাতে রাজকর্ম্মচারী না হয়েন সে বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।”

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন যে বিশেষ আবশ্যক তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন—“অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত জড়মূঢ় সাধারণকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার একমাত্র মহামন্ত্র শিক্ষা,—তাহাদিগের নৈরাশ্য দূরীকরণের, মানব নামের শ্রেষ্ঠতা অনুভূত করাইবার একমাত্র উপায় শিক্ষা, সাহিত্য দেশবার্ত্তা, কৃষিউন্নতির নিয়মাবলি ও নূতন বিজ্ঞানানুযায়ী কৃষিচেষ্টা বিস্তার করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা। দেশের প্রধান জন কয়েক শিক্ষিত হইলে জাতি গঠিত হয় না প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা আবশ্যক, —বালক বালিকা, সমভাবে শিক্ষা লাভ করিলে তবে দেশের সুদিন ফিরিয়া আসিবে।”

সভাপতি বলিয়াছেন,—“উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে শান্তির প্রয়োজন,—চারিদিকে পরিপূর্ণ শান্তির বিস্তার অতি অবশ্যকীয়; মুসলমান কবি হাফিজ বলিয়াছেন, —যদি উন্নতি তোমার অভিপ্রেত হয় তবে বিশ্বে সবলের সহিত শান্তি, প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন কর। বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতায় কেবল মাত্র শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়,—আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি।”

সভাপতি বলেন, “মহম্মদের ধর্ম্ম বিরোধ প্রচার করে না; অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিরাগ তাহার যথার্থ মর্ম্মকথা নয়।—ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন মহম্মদের ধর্ম্ম উদার নীতি এবং গণতন্ত্রের প্রসার প্রচার করিয়াছে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা তাহার উদ্দেশ্য নয়। তবে আসুন মুসলমান, হিন্দু পার্সি, খ্রীষ্টান আমরা সকলে ভ্রাতৃত্বের সখ্য বন্ধনে দৃঢ় হইয়া অগ্রসর হই। হৃদয়ে বিশ্বাস জীবনে দেশপ্রীতি আমাদের অটল থাকুক্। মুসলমান যদি এতদিন দূরে ছিল আজ সে নিকটে আসিয়াছে, হিন্দু ভ্রাতাগণ তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণে অভিনন্দন করিয়া লউন—তাহাদের সহিত একত্র কাজ করিবার বাসনায় বিশ্বাস স্থাপন করুন! ঐক্যের মাহেন্দ্রক্ষণ আমাদের নিকট মঙ্গল লইয়া সমাগত, তাহা যেন ব্যর্থ হইয়া না যায়! এ ঐক্যের জন্য আমাদিগকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে হইবে, অনেক ছাড়িয়া হয় ত অল্প সঞ্চয় করিতে হইবে,—তবুও এই সম্মিলনই দেশের মঙ্গলের চরম পন্থা। ক্ষুদ্রতা বর্জ্জন করিয়া, সম্পূর্ণতার আদর্শ বরণ করিয়া একত্রে, সখ্যে, আনন্দে, আসুন আমরা অগ্রসর হই।”

"রবীন্দ্র"

কবীন্দ্র রবীন্দ্র তুমি আকাশ সম্রাট,
একাধারে ইন্দ্র আর রবি,
আলোছায়া বৃষ্টিধারা ইন্দ্র ধনু খেলা
ইচ্ছামত রচিতেছ সবি !

সপ্ত বরণের তব তুলিকা পরশে
বিশ্ব হয় চিত্তপটে আঁকা,
নেত্রে যার ছায়া ভাসে চিত্তে তারি আলো
তাই নিয়ে চিরদিন থাকা !

তুমি ঘুচাইয়া দাও কুহেলি আড়াল
নয়নে নূতন দৃষ্টি দিয়ে,
বসুধা সহসা হাসে গুঞ্জে মধুকর
পুষ্পশত ওঠে মুঞ্জরিয়ে !

বসন্তের দিগ্বিজয় কে জানিতে পেত
তুমি যদি না দিতে চেতনা,
কোকিলের কলতান চাতক-বিলাপ
কর্ণে কারো প্রবেশ পেতনা।

তরুণ নবীন দিনে অরুণ কিরণে
অশোকের আশীষ বর্ষণ,
করুণ জলদ ছায়া প্রকাশ অম্বরে
বিশ্বে যবে অসহ্য দহন !

রুদ্র নিদাঘের তাপ, বাদলের ধারা
সফল করিয়া এক সাথে,
ভরিছ সোনার ধানে দরিদ্র কুটীর
শরতের উদার প্রভাতে !

মেঘ মুক্ত নীলিমায় অপার আকাশে
দিনে দিনে পূর্ণ শশধরে,
অজানা উত্তর হতে বার্ত্তা যবে আসে
দীপ্তি তব তৃপ্তি হয়ে ঝরে !

সমালোচনা

বিবাহ ও তাহার আদর্শ। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি, এ প্রণীত। ঢাকা, আলবার্ট লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও আলেকজান্দ্রা ষ্টীম মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। বাল্যবিবাহ বিধি শাস্ত্রশাসিত নহে এবং হিন্দুবিবাহের আদর্শ উচ্চ ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থখানি সুচিন্তিত, আমাদিগের সুকঠিন জীবন-সমস্যার দিনে পরম উপাদেয় সামগ্রী; দিক্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীকে সুপথ দেখাইবার পক্ষেও সুনিপুণ 'গাইড্'-স্বরূপ হইয়াছে। গ্রন্থকার 'উপক্রমে' বলিয়াছেন, "হিন্দু বিবাহের আদর্শ কত উচ্চ, তাহা বিবাহমন্ত্রাদির মধ্যেই সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। * * * বিবাহের আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, এই আদর্শের অনুযায়ী সমাজকে উন্নত করিতে হইলে কিরূপ বিবাহ এদেশে সর্ব্বাদৌ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। তজ্জন্য বিবাহ-সংস্কারের সমগ্র অনুষ্ঠানের আলোচনা আবশ্যক। এই গ্রন্থে তাহাই কিয়ৎপরিমাণ চেষ্টা করা গিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "এক দিকে বাল্যবিবাহ, অপরদিকে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, এই দুই কারণেই সমাজ উত্তরোত্তর অধঃপতিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল যেমন অপ্রাপ্তরজস্কার বিবাহ সর্ব্বদা অনুসৃত হয়, তেমনি উনচতুর্ব্বিংশবর্ষীয় পুরুষের বিবাহও নিত্য প্রচলিত। ইহার পরিণাম কি? অন্যান্য সভ্য দেশে ১৮৮১-৯০ অব্দের তালিকায় ১৫ হইতে ৫০

বৎসরের হাজার-করা স্ত্রীতে সন্তানের বার্ষিক জন্ম ২৫০; আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হাজার-করা স্ত্রীতে জন্ম-সংখ্যা ৪৯ হইতে ৫১ পর্য্যন্ত! আমাদের দেশের মৃত্যুসংখ্যায় শতকরা ৪৩ জন পাঁচ বৎসরের শিশু থাকে; ১৫ জন পাঁচ হইতে চব্বিশ বৎসরের; ২৬ জন পঁচিশ হইতে ৫৪ বৎসরের; অবশিষ্ট ১৬ জন তদূর্দ্ধ বৎসরের। এইরূপ মৃত্যু সংখ্যা অন্য কোনও জাতিতে দেখা যায় না। স্ত্রীদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়; ১০ হইতে ৩৪ বৎসরের স্ত্রীদিগের মধ্যে সূতিকাগৃহেই প্রতি বৎসর দেড় লক্ষ প্রসূতি দেহত্যাগ করে।" প্রসিদ্ধ ডাক্তারদিগের মত এই যে, কন্যার বিবাহ যত অল্প বয়সে হয়, তত শীঘ্রই তাহার সন্তানোৎপাদন-শক্তি চলিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাল্য-বিবাহের মধ্যে কবিত্ব ও সেন্টিমেন্টের প্রাচুর্য্য থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা ক্ষতিকর। সেইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে বাল্যবিবাহের আদর্শ কিরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা বিশদ ও নিরপেক্ষ হইয়াছে। যুক্তি ও সত্যের উপর তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ঋষিদিগের মতাদি ঘটনাবিপর্য্যয়ে কিরূপে বিকৃত অবস্থায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও তিনি নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ্ জগতীচ্ছন্দের পরিচ্ছদ পরিয়া কত অনাচার লোকসমাজে সদাচাররূপে পূজা আদায় করিতেছে, কত দানব ভদ্রবেশে দেবতার ভোগ অপহরণ করিয়া লইতেছে * * * কেবল টীকাকার বা অন্যের উদ্ধৃত শ্লোকাদির উপর নির্ভর করিয়া মূল গ্রন্থের অধ্যয়ন না করিলে দুই একটি বিচ্ছিন্ন বচন হইতে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের আশা করা বিড়ম্বনা।" এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বার্দ্ধ-ভাগে তিনি বাল্যবিবাহ-সমর্থক শাস্ত্রবচনের বিচার ও উত্তর ভাগে বিবাহের মন্ত্র ও আদর্শের আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীনকালে শাস্ত্রাদির অনুশাসন প্রভৃতির জন্য স্মৃতিশক্তির উপরই সকলকে অধিকতর নির্ভর করিতে হইত। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদির অবতারণা একান্তই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুধু মনে করিয়াই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হন নাই—তিনি দৃঢ় ও নিপুণ যুক্তি-তর্কে এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদি-নির্দ্ধারণেও সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বিচার-নিপুণতা, অনুশীলন ও গবেষণার পরিচয় আমরা সর্ব্বত্র পাইয়াছি। অথচ বিচারে গ্রন্থকার কোথাও সংযম হারান নাই—বেশ সশ্রদ্ধ গম্ভীরভাবেই মতাদির আলোচনা করিয়াছেন, ইহা বিচারকের পক্ষে খুবই সঙ্গত ও যোগ্য হইয়াছে। দুই-একখানি গ্রন্থ পড়িয়াই তিনি স্বমত খাড়া করেন নাই, সমস্ত সংহিতা গ্রন্থাদিরই পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কেমন করিয়া বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইল, তাহাও তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ পাঠ করিয়া যৌনবিবাহের অনুকূল বচনগুলির আলোচনায় তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন আর্য্যেরা বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধীই ছিলেন। শাস্ত্রাদি গ্রন্থে এমন একটি বচন পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা উনচতুর্ব্বিংশবর্ষীয় বয়স্ক পুরুষের বিবাহের সমর্থন করা যায়। অথচ হিন্দুসমাজে ২৪ বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা সওয়া তিন কোটিরও অধিক। এই সওয়া তিনকোটি যুবক অকাল ভোগ-সুখের দুর্ভর বন্ধনে জড়িত ও শৃঙ্খলিত হওয়ায় তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার-ময়—বিবাহের আনুসঙ্গিক দুর্ভর ভারে উত্তরোত্তর জড়িত হওয়ায় তাহাদের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আশাও যে সুদূর-পরাহত, ইহা কি যথেষ্ট ভাবনার কথা নহে? কন্যা সম্বন্ধেও শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছে, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাই বিবাহযোগ্যা—বিবাহের মন্ত্রাদিও ইহার সমর্থক। প্রাচীন সাহিত্যও এই মতের সমর্থন করে। ভারতের আদর্শ নারী সাবিত্রী, গৌরী প্রভৃতির প্রাপ্ত বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। বৈদিক বিধিই সর্ব্বত্র অনুসরণীয়। বেদে বাল্যবিবাহ-সমর্থক কোনও বিধির স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই, পরন্তু বৈদিক মন্ত্রাদিতে দৃষ্ট-রজস্কার বিবাহের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা যেরূপ কঠিন জীবন-সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি, তাহাতে এ বিষয়ে আমাদিগের বিশেষরূপে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, নহিলে অন্ধ আচারের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া আমরা যে অচিরে উৎসন্ন যাইব, সে

বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার এদিকে আমাদিগের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি বঙ্গবাসী-মাত্রেরই প্রভূত কৃতজ্ঞতার পাত্র। গ্রন্থখানি প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। বহির ছাপা কাগজ সুন্দর হইয়াছে—মূল্যও অত্যন্ত সুলভ হওয়ায় প্রত্যেকেই অনায়াসে ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

আক্ষেপ। স্বর্গীয়া তিলোত্তমা দাসী লিখিত। কলিকাতা, দাস যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-পুস্তক। কোন বিশেষত্ব নাই।

সেবা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-শাখা, বরিশাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। পরিষদের বরিশাল-শাখার প্রথম বর্ষের মাসিক অধিবেশন সমূহে পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্য হইতে বাছিয়া কতকগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগের সম্পত্তি; দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যালোচনা-বিষয়ক। সংগ্রহটি উপাদেয় হইয়াছে। "কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটিতে ভাষার দোষ বহু স্থলে লক্ষিত হইল,—আলোচনাটুকুও গভীর নহে, ভাসা-ভাসা ধরণের।

অভিধানপ্পদীপিকা বা পালি শব্দকোষ। সদ্ধর্ম্মবিশারদস্থবির শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। চৈতন্য প্রসাদ বিহার, শিলক, চট্টগ্রাম। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। পালি সাহিত্য ভাণ্ডারের মণিস্বরূপ অভিধানপ্পদীপিকা বঙ্গাক্ষরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। পালি-শিক্ষার্থিগণের পক্ষে মহাসুযোগের ব্যবস্থা করিয়া সংগ্রহকার ও প্রকাশক উভয়েই পালি-শিক্ষার্থী ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সুধীবৃন্দের সবিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান 'অভিধানপ্পদীপিকা' গ্রন্থ ছাত্রগণের কণ্ঠস্থ করিবার সৌকর্য্যসাধনার্থ কেবল ছন্দে অথচ পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইয়াছে। "অমরকোষ' যেমন সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণের অবশ্য-পাঠ্য, তদ্রূপ পালি-শিক্ষার্থিগণের পক্ষেও 'অভিধানপ্পদীপিকা' অত্যাবশ্যক।" গ্রন্থের ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে—বাঁধাইও চমৎকার।

কমলিনী। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল প্রণীত। কলিকাতা, বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি উপন্যাস। প্লট সেই মামুলি ধরণের, নিতান্তই আজগুবি। চরিত্র জড়পিণ্ড মাত্র, রচনা-ভঙ্গীও নীরস, প্রাণহীন।

কবিতা-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত রচিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। নামেই বুঝা যাইতেছে, এখানি কবিতা-পুস্তক। গ্রন্থকার মুখবন্ধে বিনীত নিবেদন করিয়াছেন, "গুণজ্ঞ হংসেরা যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জলাংশ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধাংশ পান করে, তদ্রূপ হে সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ, আপনারাও দোষ-গুণ-বিমিশ্রিত কবিতা মঞ্জরীর গুণ-সৌরভ গ্রহণ করিলে" ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যক্রমে আয়াস-সত্ত্বেও আমরা ইহার "গুণ সৌরভে"র আভাস পাইলাম না।

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন-চন্দ্র পূততুণ্ড প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল-শাখার উৎসাহ ও অনুমোদনে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। ছাত্রদের জন্য অর্দ্ধ মূল্য আট আনা। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগস্থ বর্ত্তমান বরিশাল, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জিলা এবং বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থান চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উহা এককালে বঙ্গের অতি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে উক্ত প্রদেশের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি-বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল অবধি বিবরণী গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহ হৃদয়গ্রাহী ও বহুল হইয়াছে, তথ্য-সমাবেশে শৃঙ্খলার পারিপাট্যও প্রশংসনীয়। চন্দ্র-দ্বীপের রাজ্যশাসন-প্রণালী ও শিল্প বাণিজ্য, সামাজিক বিধান, বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্বের কাহিনী, বারভূঞার পরিচয়, দুর্গ, গড়, কামান, ভাষা প্রভৃতির কথা কিছুই ইহাতে বাদ পড়ে নাই। প্রাদেশিক ইতিহাস-সাহিত্য বিভাগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালার চারিদিকে প্রাদেশিক ইতিহাস-সংগ্রহ ও সঙ্কলনের যে বিপুল

উদ্যম দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা হয়, অখণ্ড বঙ্গের সম্পূর্ণ ইতিহাস অচিরেই লিখিত হইয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক মোচন করিয়া জাতি-স্বরূপে তাহাকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। এ বিষয়ে যাঁহারা সহায়তা করিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে, বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের কথা বলিবার সময় বৃন্দাবন বাবু টিপ্পনী কাটিয়াছেন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ 'তৎকৃত বউঠাকুরাণীর হাট নামক গ্রন্থে "রাজা রামচন্দ্র রায়ের যে কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই।" বৃন্দাবন বাবুর এ কথা মনে রাখা উচিত ছিল যে, উক্ত গ্রন্থ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ ছিলেন না, এবং তৎকালে ঐতিহাসিক উপকরণাদিরও এতখানি উদ্ধার হয় নাই। তদ্ভিন্ন উপন্যাস উপন্যাস, তাহা ইতিহাস নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'জেবউন্নিসা' 'তকি খাঁ' প্রভৃতি চরিত্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রামচন্দ্র'-চরিত্রও সুতরাং মার্জ্জনীয়।

মাল্য ও নির্ম্মাল্য।—আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত। কলিকাতা, একুমি প্রেসে মুদ্রিত। ও ৯৮ বেলতলা রোড, শ্রীসুধীর কুমার সেন, বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। বহুকাল পরে 'আলো ও ছায়া' প্রণেতৃর নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহার কবিযশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আগ্রহের সহিত আমরা তাঁহার নূতন গ্রন্থ "মাল্য ও নির্ম্মাল্য" পাঠ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থে তাঁহার উজ্জ্বল কবিযশঃ কোথাও ম্লান দেখিলাম না, বরং স্থানে স্থানে তাহা দীপ্ততরই ফুটিয়াছে। "মাল্য ও নির্ম্মাল্যে"র কবিতাগুলি স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ,—তাহাতে অধিকতর শক্তিশালী কবিগণের ভাবের ছাপ পড়ে নাই, সেগুলি আপনার ভাবেই ফুটিয়াছে, আপনার বেগেই ছুটিয়াছে, আপনার ভারেই লুটিয়াছে। কবিতাগুলির ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল, সর্ব্বত্রই ভাবের অনুগামিনী হইয়াছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ১১০টি কবিতা আছে, তন্মধ্যে ৪১টি পূর্ব্বে 'নির্ম্মাল্য' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যের' কবিতাগুলি ভাবে কোথাও গম্ভীর, আবার কোথাও একান্তই কোমল। "আশীর্ব্বাদ," "আকাঙ্ক্ষা," "মিলন-মহত্ব," "স্মৃতিচিহ্ন," "প্রাচীন কীর্ত্তি-দর্শন," "নারীর অভিমান," "অযোগ্য ও যোগ্য প্রেম," "নিরুপায়," "হিসাব", দীনের বাসনা" প্রভৃতি কবিতাগুলি ভাবসম্পদে অমর হইয়া থাকিবে। কবিতাগুলিতে কোথাও এতটুকু অসংযম নাই—আগাগোড়াই বেশ একটি শান্ত সুরের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কাব্য-রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাও যে তৃপ্ত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম, বি, এফ, সি, এস প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এই গ্রন্থের বহু অংশই ভারতীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ,—আলোচনা যে সুনিপুণ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আলোচনা করিবার সময় দেশকাল-পাত্রের কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়াই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলিলে বাঙ্গলা গৃহের বহু অকল্যাণ ও বহু অশান্তি দূর হইবে, বাঙ্গলার গৃহে স্বাস্থ্যের হাওয়া সঞ্চারিত হইবে, বাঙ্গালী আরামে বাস করিতে পারিবে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত দেশ-হিতৈষণা ও জাতি-প্রীতির কার্য্যই করিয়াছেন। বাঙ্গালী তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আবালবৃদ্ধ-বনিতার হাতে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক,—বাঙ্গালার শ্মশান শান্তিময় গৃহে রূপান্তরিত হইবে, সংসার হইতে রোগ, শোক, অর্থনাশ ও মনস্তাপ যে অনেকাংশে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ আশা আছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি চমৎকার, আকার ছোট হওয়ায় পকেটেও অনায়াসে রাখা যায়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

দিলীপের পরীক্ষা।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

৩৭শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২০ [১১শ সংখ্যা

ছোট ও বড়

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালোবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই তার উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা, প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে একটি চিরজীবনের উদ্যম প্রকাশ পায়, সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মত সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে মানুষ একথা সমস্ত মনের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারে না। ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে ভোগী আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক পোকার মত আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করচে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চির-রাত্রি রচনা করে পড়ে আছে কিন্তু তবু সমস্ত মত্ততা, অহঙ্কার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে যে আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়। সেইজন্যে আমরা যাঁকে দেখ্‌লুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসার বুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়া ঘের দিয়ে রাখ্‌লুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বল্লেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ, সর্ব্বস্মাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব কিছু হতেই প্রিয়, তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এইজন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখ্‌লুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে মধুময় করে বিকশিত করচেন, যখন তাঁর সেবককে

দেখ্‌লুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ অপমানকে গলার হার করে তুল্‌চেন তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বল্লুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষ বিদ্বেষ ভাগ বিভাগের মাঝখানে এইটি ঘট্‌চে; কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই যে অনন্তের বিশ্বাস, এই যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মত রয়েছে বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু এ যে মর্ম্মের জিনিষ, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্র-স্থল থেকে এ যে অনির্ব্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে। তাইত ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ত, সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠ্‌চে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেননা বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটা গাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের জায়গাটি ঘন করে জুড়ে বসে, আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য যোগায় না, তখন খর রৌদ্রের দিনই শুভদিন —তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে সে মরবে তখনি যখন আমরা মরব; যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে—মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃত লোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ছে আজ আমাদের উৎসব সেই-খানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র? এই যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে, মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়?

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দ্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করচে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্চে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করচে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করচে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করচে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রস-স্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব—এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েইত আছে; বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে, সেইদিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেইদিন বোঝা যায় এতদিনকার

পাতা-ধরা এবং পাতা-ঝরার ভিতরে ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আস্‌ছিল, সেইজন্যই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি? আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্ম্মজাল বুনে বুনে চলা নয়—তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য্য পরম কল্যাণ পূজার অঞ্জলির মত উর্দ্ধমুখ হয়ে উঠ্‌চে?

না, সে কথা ত আমরা সকলে মানিনে। আমাদের জীবনের মর্ম্মনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন. এখনো হয় ত আসেনি, আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগেনি;—কিন্তু তবুও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্য-মনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক্। কেন না, এ ত আমাদের কারো একলাকার সামগ্রী নয়। আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তব সঙ্গীত উঠ্‌বে সেত কারো একলা-কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডাকছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে, আমরা সেই সকল-মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি—কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে যে, তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাক্‌তে শিখেছি মানুষের এই একটি আশ্চর্য্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মত আহার বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারি মধ্যেই "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি, সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি তাই আনন্দ করচি তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়েই বলেছে, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রকাশ পাচ্চেন। মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্ত-মাখা পায়ে তাকে চল্‌তে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে; মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে এবং রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ সেই মুখ মানুষ দেখ্‌তে

পেয়েছে। সে দেখা ত সহজ দেখা নয়, সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই ত তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে, তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দ-সম্মিলন। একদিকে মানুষেরা কত ক্ষুদ্রতায় চারিদিকে বদ্ধ কিন্তু "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" তারাই সেই সর্ব্বব্যাপীকে সর্ব্বত্র হতে পেয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে আপনাকে মিলিত করে সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করেছে—এ সংবাদটি গোপন থাকবার নয়, এই কথাটি স্মরণ করবার জন্যে মানুষ তার সকল কাজের দিনের মাঝখানে একটি উৎসবের দিন করবে।

কিন্তু বিমুখ চিত্ত ত আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন্ মহৎ সম্পৎ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাস-কুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি? তাই এমন কথা শুনি, অনন্তকে নিয়ে ত আমরা উৎসব করতে পারিনে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্ব কথামাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখ্‌ব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোক-ধারার আবর্ত্তন হতে কত শত শত বৎসর কেটে যায় সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়? তাইত সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মত করে ছোট করে' নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করিনে, যখন সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করিনে তখনই কলহ করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুট্‌তে হত তাহলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত কিন্তু যে সূর্য্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এই জন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশ-বেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই ত ঐ বাণী উঠেছে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রকাশ পাচ্চেন। এ ত তর্কযুক্তির কথা হলনা—চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে, এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা। সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন—এষঃ, এই যে তিনি, সেখানে ত কোনো কথা বলা চলে না। সীমা শব্দটার সঙ্গে একটা "না" লাগিয়ে দিয়ে আমরা "অসীম" শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু অসীম

ত "না" নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন "হাঁ"—তাই ত তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়—ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যাহা কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিষটি যেমন—কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্ত্তেই তার ধ্বংস হচ্চে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখ্‌তে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্ত্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে, মৃত্যুর "না" দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্চে "হাঁ"। সীমার মধ্যে অসীম হচ্চেন তেমনি ওঁ;—তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখ্‌লেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্চে সমস্ত স্খলিত হয়ে যাচ্চে বটে কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্চে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্ত্তন সমস্ত গতায়াত সত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানচি। নিরন্তর সমস্ত চলে-যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করচে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখচি, কখনো আজ, কখনো পাঁচ দিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়, তার সম্বন্ধে আমাদের বাইরের ইন্দ্রিয়-বোধটাকে জড়ো করে দেখ্‌লে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে; যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখেনি, যে কাল অনাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখেনি, এমন কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করেনি। বরঞ্চ বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই দেখাগুলিকে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে মনে আন্‌তে চাইলে মন হার মানে কিন্তু সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন, তাঁরাই বলেছেন, এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এ ত জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এযে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই যে ইনি, এই যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমাগতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ;—তিনি একদিকে যেমন গতি আর একদিকে তেমনি আশ্রয়, একদিকে যেমন সাধনার ধন, আর একদিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করচি বটে তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকৃত না। অতএব অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মত

গড়ে নিতে হবে তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চল্‌তে পারে এমন কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তাহলে কখনই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না, বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ,—তেমনি অনন্ত স্বরূপের প্রকাশও ত আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করেনি, তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করচেন। যখনি তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করচেন তখনি তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাৎ তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ আভা ত আমারই, বনের শ্যামল শোভা ত আমারই, ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে, ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সঙ্গীত উঠেছে সে সঙ্গীত কার জন্যে? আর এই ত রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর দক্ষিণহস্ত-ধরা বন্ধু, এইত ঘরে বাহিরে যাদের ভালো বেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্চে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতে পাতা আসন; এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আলপনা-আঁকা বরণ-বেদীটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ রূপে অমৃত রূপে বিরাজ করচেন। এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব? সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দ-নিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগ্‌লনা, আমরা তাঁকে যদি ভালোবাসতে না পারলুম তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কি ছিল? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে? তবে ত বল্‌তে হয় বিশ্ব-সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্চেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বল্‌তে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচেনা; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেচে তাতেই তার পেট ভরবে। না, এ কেবল সেই সকল দুর্ব্বল উদাসীনদের কথা, যারা পথে চল্‌বেনা এবং দূরে বসে বসে বল্‌বে পথে চলাই যায় না।

একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম "তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কি বলেছে, তার থেকে তুমি কি বুঝলে? সে

বল্লে সে কথা ত আমাদের মাষ্টার মশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাষ্টার মশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয় মাষ্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর একটা কথা বসানো, "সুশীতল" শব্দের জায়গায় "সুস্নিগ্ধ" শব্দ প্রয়োগ করা। এ পর্য্যন্ত মাষ্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে, যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানে ও নবুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয়নি; এই জন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না—সেও বলে আমি বুঝিনে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ সহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নদী জিনিষটা কি তুমি কখনো দেখেছ? সে বল্লে, না। ভূগোলের নদী জিনিষটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে, এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয়নি যে, যে নদী দুই বেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোল বিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগজামিন পাসের নদী। তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাষ্টার মশায়রা কোনো-মতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এই জন্য অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারিনি, দেখতে পেলুম না। ওরে বোঝবার আছে কি? এই যে এষঃ, এই যে এই। এই যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়-বীণায় তাঁর হাত পড়চে, এই যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠ্চে; এই যে দুঃখ রূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করচেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠ্চে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর ঐ যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর-পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎ শিখাময়ী কষা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠ্চে—এই ত এষঃ, এই ত এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে নিজের কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি—সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং, সেই কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীর ভাবে পূর্ণ করচেন, সেই যে অন্তহীন, জগতের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, সেই যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে—পিতা মাতা বন্ধু—সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোট করে আপন হাতে আপনার মত করে গড়েছি তখন কি যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না? যখন আমরা বলেছি আমাদের পরম ধনকে সহজ করবার জন্যে ছোট করব তখনি আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি; তখন টুক্‌রো কেবলি হাজার টুক্‌রো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থাম্‌তে চায়নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীবিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্ম্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে, আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মত স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরতে কেবলি ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখ্‌লে নয়; আমাদের সীমাই হচ্চে আমাদের মৃত্যু, আরোর পরে আরোই হচ্চে আমাদের প্রাণ— সেই আমাদের ভূমার দিক্‌টি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়ত সাধনার দিক্‌—সেই মুক্তির দিক্‌কে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্ব্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোট করতে গিয়ে আপনার পূজনীয়কে এক প্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর এক বিপদে গিয়ে পড়ে, আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতেই পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে, অসীমকে কেবল মাত্র ছোট করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবল মাত্র বড় করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়, তাঁকে শুধু ছোট করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড় করে আমাদের শুষ্কতা। অনন্তং ব্রহ্ম অনন্ত বলেই ছোট হয়েও বড়, এবং বড় হয়েও ছোট। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এই জন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে ত তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতা মাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করচেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করচেন, আমাদের কথা শুন্‌চেন এবং শোনাচ্চেন, এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গ লোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে।

অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত

মানব-সম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনি একথা সত্য হয়েছে তখনি একথাও সত্য, যে, অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এই জন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। একদিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর একদিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; একদিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর এক দিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্ম্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক্ এবং নিকটের দিক্ দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয় তা অকল্যাণ হয়েছে। এই জন্যেই মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসার-বুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্চে তার আর সীমা সংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্য্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্ম্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবী করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্ম্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে; মানুষ যখন বড় বড় দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নাম-টুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্য-পুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানব-জন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মত হয় কোনো পূর্ব্ব পিতামহের নয় নিজের জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্ম্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে, এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু তবু এই সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্ম্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে' কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করচে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে,

অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয় মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা অন্যদিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলি রসে মজে থাক্‌তে হবে না; জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্ম্মে পেতে হবে; তাঁকে আমার মধ্যে যেমন জানতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু-সমস্ত সৃষ্টি করচেন আবার আর একদিকে বলেছে স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যার দ্বারা যা-কিছু-সমস্ত সৃষ্টি করচেন। এ দুই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করচেন, তিনি তপস্যাদ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরচি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্ব্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে!" সে আরো গেয়েছিল "আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে।" তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয় কিম্বা একথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে, যারা গাচ্চে তারা সাম্প্রদায়িক-ভাবে এর ঠিক কি অর্থ বোঝে। কেন না, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্য-ভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই ত, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠ্‌চে? ইহুদিদের পুরাণে বলেছে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন, স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক্ গভীরভাবে এ কথা সত্য বই কি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েইত মানুষকে তৈরি করে তুলেচেন; সেই জন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় একটি কাকে অনুভব করচে। সেই জন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেছে "খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়!" আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জান্‌তে পারচি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যেরে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মত চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রেরণ ও সর্ব্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করচে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে। অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কি সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের

ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ ;—তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাক্‌তে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ ত আমার এই সামান্য মানুষটি নয় ; তাঁকে ত কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে, ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌তে হচ্চে, "আমার মনের মানুষ কেরে, আমি কোথায় পাব তারে ?" সে যে কে তা ত আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূলরকম করে ভুলিয়ে রাখলে জান্‌তে পারবনা—তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে ; সে জানা কেবলি জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। "কোথায় পাব তারে ?" কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ত পাওয়া যাবে না,—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া —আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া। মানুষ এমনি করেই ত আপন মনের মানুষের সন্ধান করছে—এমনি করেই ত তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌চে, যতই তাকে সে পাচ্চে, ততই বল্‌চে, "আমি কোথায় পাব তারে"। সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই ; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য-টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই যে একটি চির-বিরহ আছে এ বিরহ ত কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই ত এর পূর্ণতা হতে পারে না ; জ্ঞানে কর্ম্মেও এই বিরহ ডাক দিয়েছে, ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে যে দিকেই মানুষ বলেছে আমি চিরকালের মত পৌঁচেছি, আমি পেয়ে বসে আছি, এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই গান যে তার চিরকালের গান, "আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে ?" এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন –"মনের মানুষ যেখানে, বল কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে ?" কেননা সন্ধান ও পেতে থাকা একসঙ্গে ; যখনি সন্ধানের অবসান তখনি উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর-এক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ—কোনো অনন্ত তত্ত্বকে ত পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল ; এতে কি কোনো অপরাধ হল, এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল ? কিছু মাত্র না। কেননা আমার ঘর ছেড়ে তিনি ত শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি

যে সকলরকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক এক ভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘরভরা অসীমকে, আমার সেই জীবনভরা অসীমকে আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, সেইটেই আমার চরম ডাক, সেই জন্যেই আমার ঘর, সেই জন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি, সেই জন্যেই আমার জীবনের যত কিছু জানা, যত কিছু পাওয়া। তাই ত মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে "পিতা নোঽসি" তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক—কিন্তু এই ডাকই মানুষ একেবারেই মিথ্যা করে তোলে, যখন এই ছোট অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড় অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা বলে পিতা বলে কেবলমাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না—যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফল লাভ করতে চাই, অন্যায় করে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু এ ত কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্ব্বলতাকে লালন করবার জন্যে তাকে পিতা বলা নয়। সেই জন্যেই বলা হয়েছে পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার মধ্যে উদ্বোধিত করতে থাক। এ বোধ ত সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে ত চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে দেশ থেকে দেশে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্যই প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্ম্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে, পিতা। সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠ্‌বে, সমস্ত লুব্ধ স্বার্থকে লজ্জিত করে ডেকে উঠ্‌বে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু, পিতার বোধকে উদ্বোধিত কর যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, দেশের কাজে আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে উঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণ-কীর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে সেই সমগ্র-মানবের সমস্তকালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসব-দেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায়চ ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ, তুমি সুখরূপে আনন্দকর তোমাকে নমস্কার তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণ তোমাকে নমস্কার, তুমি নব নবতর কল্যাণ তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরব গণিতবেত্তা আবু'ল-ওয়াফা

মধ্যযুগে মোসলেম জগতে যে সকল প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল, তন্মধ্যে আবু'ল-ওয়াফা একজন বিখ্যাত জ্যামিতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইনি 'ত্রিকোণমিতি' শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য গণিত-বেত্তারা গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহাঁকে উচ্চ-স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই গণিতবিশারদ পণ্ডিতের পূর্ণ নাম আবু'ল-ওয়াফা মোহম্মদ এবেন্ মোহম্মদ এবেন্ এহিয়া এবেন্ ইস্মায়েল এবেন্ আব্বাস অল-বজ্জানী। ইহা খুব সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় যে, ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্য দেশবাসী ছিলেন। আবু'ল-ওয়াফা ৩২৮ হিঃ সনের রমাদান মাসের ১লা তারিখে (৯৪০ খৃঃ, অঃ ১০ই জুন) খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত নেশাপূরের নিকটবর্ত্তী একটি বৃহৎ পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁর পিতৃব্য আবু আম্‌র্ অল্ মোঘাজিলী ও আবু আব্দ আল্লাহ্ মোহম্মদ বিন আন্-বাসাই ইহাঁকে প্রথমে গণিতশাস্ত্র শিখাইয়া-ছিলেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিত (আবু আমর্ অল্-মোঘাজিলী) আবার এহিয়া'ল মেরওয়াজী (বা মাওয়ার্দ্দী) ও আবুল আলা'বিন কর্ণিবের নিকটেই রেখাগণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। হিঃ ৩৩৮ (৯৫৯ খৃঃ অঃ) সালে আবু'ল-ওয়াফা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এরাকে গিয়া বাস করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বোগদাদেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং এইখানেই হিঃ ৩৮৮ রজব মাসে (জুলাই, ৯৯৮ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এবেন্-অল্-আসির ও এবেন্ খল্লিকান (এবেন্-অল্-আসিরের মত অনুসরণ করিয়া) লিখিয়াছেন যে, তিনি হিঃ ৩৮৭ (বুধবার, ৯৯৭ খৃঃ) মৃত্যুলাভ করেন।

গণিতবেত্তা আবু'ল-ওয়াফা 'ফি এস্তেখ্-রাজ অল-আওতার' নামে বৃত্তাংশ সমূহের জ্যাগুলির ফল বাহির করিবার প্রণালী (the manner of finding the value of the chords of arcs) সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন।

এবেন্-অল-কিফ্‌তীর 'তারিখ-অল্-হোক-মা'তে ইহাঁর গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্ট হয়:—

(১) 'মনাজীল',—একখানি উৎকৃষ্ট পাটীগণিত বিষয়ক গ্রন্থ।

(২) অল-খোয়ারিজ্‌মীর—বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থের টীকা।

(৩) ডাওফেণ্টসের বীজগণিতের টীকা।

(৪) এবেন্ এহিয়াঁর—বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থের টীকা।

(৫) 'মোদ্‌খীল'—পাটীগণিত সূত্র।

(৬) 'কেতাব অল-বরাহিন ফি'ল-কদায়া ফিমাস্তমালাহু দাওফেন্তস্ ফি কেতাবিহী' (ডাওফেণ্টস্ কর্ত্তৃক তাঁহার গ্রন্থে প্রযুক্ত (বা ব্যবহৃত) নিয়মাবলীর প্রমাণ।

(৭) 'কেতাব এস্তেখ্‌রাজ মবলঘ্‌ ইল কা'ব বি-মাল মাল ওয়া মা এয়াতরক্কাব মিনহা' (the obtaining of the amount of the cube by a double multiplication and of the other combinations effected by the operation)

(৮) ষষ্টিতম সংখ্যার তালিকা বিষয়ক (on the sexagesimal table) একখানি গ্রন্থ।

এই সকল গণিতগ্রন্থ ব্যতীত আবু'ল-ওয়াফা জ্যোতিষশাস্ত্র ও ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুই তিনখানি আজও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে :—

১। 'কেতাব ফি মা এহ্‌তাজী এলাহী অল-কোত্তাব ওয়া'ল আম্মল মিন এল্‌ম্‌ অল-হেসাব' নামক একখানি পাটীগণিত বিষয়ক পুস্তক। এবে্‌-অল-কিফ্‌তী কর্তৃক 'কেতাব অল মনাজীল ফি'ল হেসাব' নামক যে পাটীগণিতক গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে ইহাও সেই একই গ্রন্থ।

২। 'অল কেতাব অল কামিল', ইহার কতকাংশ ক্যারা ডি ভো (Carra de Vaux) কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

৩। 'কেতাব-অল্‌-হেন্দেসা' (একখানি জ্যামিতিক গ্রন্থ), কনষ্টাণ্টিনোপালে (আইয়া সোফিয়ায় আরবী ও পার্শী রক্ষিত গ্রন্থ, আর Woepcke কর্তৃক সমালোচিত পারিস লাইব্রেরীর জ্যামিতিক অঙ্কন বিষয়ক পার্শীগ্রন্থ, এই দুইই সম্ভবতঃ একই বলিয়া বোধ হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার ইউক্লিড, ডাওফেণ্টস ও অল-খোয়ারিজ্‌মীর টীকাগুলির, বা 'আল ওয়াজীহ' নামক তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রমূলক তালিকারও কিছুই পাওয়া যায় না। তবুও ইহা অতি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, ফ্লোরেন্স (লরেণ্ট), পারিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত কোন এক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিত 'অল-জিজ-অল-শামিল' নামক জ্যোতিষিক তালিকামালা আবু'ল ওয়াফার তালিকাবলী হইতেই সংগৃহীত।

অতএব পণ্ডিতপ্রবর আবু'ল ওয়াফা যে কেবল গণিত-শাস্ত্রেই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনিই টাইকোব্রাহীর (Tycho Brahé) পূর্ব্বে চন্দ্রকলার তৃতীয় অসামঞ্জস্যতা (বা গতি) (third inequality on the moon's surface) আবিষ্কার ও পৃথিবীর বৃত্তাভাস পথের মধ্যভাগের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তজ্জন্য একজন অতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ নামে পরিচিত এবং পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের অজ্ঞাত কতকগুলি সিদ্ধান্তের (corollary) প্রমাণ করায় একজন প্রসিদ্ধ জ্যামিতিজ্ঞ পণ্ডিতের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। আবু'ল-ওয়াফা জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার্থ, হিঃ ৩৭৬ (৯৮৬ খ্রীঃ) 'মোরসদ-ই-বুজ্জানী' বা বুজ্জানীর মানমন্দির নামে একটি পর্য্যবেক্ষণিকা স্থাপিত করিয়া খগোল মণ্ডলের বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

যাহা হউক, তিনি কি জন্য পাশ্চাত্য গণিতবেত্তা-গণের নিকট পরিচিত ও কি জন্যই বা পাশ্চাত্য গণিতবেত্তারা তাঁহার নিকট ঋণী আছেন, তাহা আধুনিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও গম্ভীর গবেষণাকারী—প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত

মুঁসো সুতের (M. Suter) কর্ত্তৃক লিখিত ও 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম' গ্রন্থে প্রকাশিত 'আবু'ল-ওয়াফা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠেই জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"ত্রিকোণমিতিকে অধিকতর উন্নত করাতেই আবু'ল-ওয়াফার বিশেষ যোগ্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। বার্ত্তুলিক ত্রিকোণমিতি, এরূপ কথিত 'চতুর্ব্বিধ নিয়ম' ('rule of the four magnitudes') (Sine a : Sine c = Sine A : 1) এর ও ট্যানজেণ্ট উপপাদ্যের (tan. a : tan. A = Sine b : 1) সাহায্যে ম্যানিলসের প্রতিজ্ঞার সহিত একটি পূর্ণ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের সমকোণী ত্রিভুজের পরিবর্ত্তন করায় আমরা তাঁহারই নিকট ঋণী আছি; এই চারিটি সাধারণ সূত্র সম্বন্ধে তিনি আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ;—Cos. c = Cos. a Cos. b. সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে বক্রকোণ বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের নিমিত্ত সাইন প্রতিজ্ঞা স্থাপিত করিয়াছিলেন। সাইন ৩০´ অংশ সংক্রান্ত অঙ্কের প্রণালীর জন্যও (যাহার ফল ইহার প্রকৃত উত্তরসহ ৮ দশমিক পর্য্যন্ত মিল হয়) আমরা তাঁহারই নিকট ঋণী আছি। তাঁহার জ্যামিতিক অঙ্কন গুলিও অতি প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে, ত্রিকোণমিতিতে ট্যানজেণ্ট, কো-ট্যানজেণ্ট, সেক্যাণ্ট, কো-সেক্যাণ্ট প্রবর্ত্তিত (বা প্রথম ব্যবহার) করার নিমিত্ত প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে; যেহেতু এই সকল প্রক্রিয়া (functions) ইতিপূর্ব্বেই হাবাশ অল-হাসিব নামে পরিচিত আহম্মদ বিন আব্দ আল্লাহেরও জানা ছিল।"

কিন্তু অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনিই প্রথমে ট্যানজেণ্ট, কো-ট্যানজেণ্ট, সেক্যাণ্ট ও কো-সেক্যাণ্টের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই এই সকল প্রক্রিয়ার প্রথম আবিষ্কারক। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করিতেছেন যে, এই সকল ত্রিকোণমিতিমূলক প্রক্রিয়া ইহাঁর পূর্ব্বে আরব গণিতজ্ঞ আহম্মদ বিন আব্দ আল্লাহ্ই জ্ঞাত ছিলেন। যাহা হউক, ইনিও একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া 'অল-হাসিব' ('গণিতবেত্তা') এই উপাধি-সূচক নামেই পণ্ডিত সমাজে পরিচিত।*

মোহম্মদ কে, চাঁদ।

* নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল—

(1) Rt. Hon. Syed Ameer Ali, P. C., LLD, *The Spirit of Islam.*

(2) Ibn Khallikan, *Biographical Dictionary*, (De Slane's Translation Vol. III)

(3) Rouse Ball, W. W, *History of Mathematics.*

(4) Clement Huart, *A Short History of Arabic Literature.*

(5) M. Suter, 'Abu'l Wafa' in the *Encyclopædia of Islam.*

(6) M. Sedillot, 'খোলাসাতে তারিখ-অল-আরব', ইত্যাদি।

বীরের নারী

উঠানে শুধু পা দিয়েছে
ঘোড়ায় থেকে নামি'
সোয়ার পরে সোয়ার এল,
চরণ গেল থামি'।
রাজার কড়া হুকুম হ'ল,
'যুদ্ধে চল যুদ্ধে চল'
যেমন এল তেম্‌নি গেল—
রইনু চেয়ে আমি।

কপাল বেয়ে ঘামের ঝোরা
ঝর্‌তেছিল যে,
সোজা হ'য়েও দাঁড়াইতে
পারছিল না সে।
সাধ্যবিহীন নয়ন দু'টি
মুখের পানে রইল ফুটি',
বুকের ব্যথা বক্ষে লুটি
গুম্‌রে গেল রে!

রাজদ্রোহী নই ত আমি,
বিরোধ নাহি জানা,
রাজার কাজে জীবন দেবে—
করিনে তায় মানা।
আমি শুধু ভাব্‌ছি রাজা,
নির্দ্দোষীরে এ কোন্ সাজা?
যুগান্তরের পরে দেখা—
এই কি দেনা পা'না!

হয়ত তারে শুতে হবে
দূরে—অনেক দূরে,
রাঙা হবে সেথার মাটী
তারি শোণিত ঝুরে।
গেল—একটা চুমার আঁকো,
গণ্ডে তবু পড়্‌ল নাকো!—
এরি গর্ব্বে বীরের নারী,
বেড়াস্ তোরা ঘুরে!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আত্মদানের আকুলতা

(জালালুদ্দিন রুমী হইতে)

ওগো সুন্দর রথী,—ওগো সুন্দর শিকারী,
আঁখি বাণে বিঁধ' হৃদয় হরিণ, মানসকাননবিহারী॥
ওগো—নিশি নিশি তোমা লাগিয়া
চাঁদের মতন জাগিয়া,
তনু মন ক্ষীণ হয় দিন দিন তব পথপানে নেহারি,
হারাইয়া দাও তোমার আলোকে হে রবি গগনবিহারী॥

প্রভু—তব পথপানে ছুটিয়া,
ভূতলে উপলে লুটিয়া,
এ নদী, কান্ত, হয়েছে শ্রান্ত তোমার চরণ ভিখারী
উচ্ছল চল জোয়ারে টান গো উত্তাল কলবিহারী॥
ওগো সুন্দর রথী—ওগো সুন্দর শিকারী,
তব প্রেমজালে বন্ধন কর চঞ্চল চিত আমারি।

শ্রীকালিদাস রায়।

অদ্ভুত যাদুঘর

সাসেক্সের (Sussex) অন্তর্গত ব্রামবার (Brambar) নামক স্থানে এক পুরাতন প্রাসাদদুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি নূতন ধরণের চিত্তাকর্ষক যাদুঘর আছে। সেখানে ইতর প্রাণীদিগকে নানাপ্রকার সুচারু বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া এক একটি হাস্যজনক দৃশ্য রচনা করা হইয়াছে। এরূপ যাদুঘর ইংলণ্ডের মধ্যে আর কোথাও নাই। ছোট ছোট বালকবালিকাগণের নিকট ইহা একটি আশ্চর্য্যজনক পরীর রাজত্ব বিশেষ। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও ইহার দর্শনীয় বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হন এবং রচয়িতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মৌলিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ইতরপ্রাণীদিগের দ্বারা এরূপ নীরব কৌতুক দৃশ্যের অভিনয় প্রদর্শিত করিবার মতলব এই যাদুঘরের বৃদ্ধ সত্বাধিকারী Mr. W. Patterএর মস্তকে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইহা-দিগকে লইয়া প্রথম "Death and burial of Cock Robin" সংক্রান্ত বিষয়টির দৃশ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অবসর সময়ে তিনি ইহা করিতেন এবং ইহা সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার সাত বৎসর লাগিয়া-ছিল। এই বিষয়টি একটি ছেলে ভুলান ইংরেজী ছড়া মাত্র। এই গল্পস্থিত সমস্ত দৃশ্য গুলি এরূপ চমৎকার ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, সেগুলি দেখিলেই রচয়িতার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একশত রকমের বিলাতী পাখী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আগাগোড়া সকল বন্দোবস্তই মৌলিকতাব্যঞ্জক!

প্রথম বারে কৃতকার্য্য হইয়া তিনি আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগের সহিত ব্রতী হইলেন। ১নং ছবিতে "The Kittens' croquet Party" রচিত হইয়াছে। আটটি বিড়াল ছানা croquet খেলিতেছে। প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত গবাক্ষ হইতে দর্শকগণ আনন্দের সহিত খেলা নিরীক্ষণ করিতেছে। এই

আটটি বিড়াল ছানা 'ক্রকে' খেলিতেছে

সঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত যে এই সকল বিভিন্ন দৃশ্য রচনায় চেয়ার টেবিল প্রভৃতি যাহা কিছু সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হয় Mr. Patter স্বহস্তে সে সব প্রস্তুত করিয়া লন। ২নং ছবিতে কতকগুলি কাঠবিড়ালী তাস খেলিতেছে; ক্লাবের

কতকগুলি কাঠবিড়ালী তাস খেলিতেছে

অপরাপর সভ্যগণ সংবাদপত্র পড়িতেছে, ধূমপান করিতেছে কিংবা মদ্যপান করিতেছে। অপর দৃশ্যে (৩নং ছবি দ্রষ্টব্য) একদল ইঁদুর dominoc খেলিয়া ও ধূমপান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে।

৪নং ছবিতে খরগোসের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের

একদল ইঁদুর 'ডোমিনো' খেলিতেছে

খরগোসদের গ্রাম্য বিদ্যালয়

একটি দৃশ্য রচিত হইয়াছে। আমাদের বিদ্যালয়ের সহিত ইহার খুব সাদৃশ্য আছে। এই ছবির সমস্ত খরগোস ৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে জীবিত ছিল। কেহ খাতায় হাতের লেখা পাকাইতেছে, কেহ অঙ্ক কষিতেছে, কেহ বা পাঠে মনোনিবেশ করিতেছে। একজন পড়া না করায় বা কোন অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য শাস্তি পাইয়া পশ্চাতে বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; আর শিক্ষক মহাশয় সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্লাসের কার্য্যসমূহ তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত এই যাদুঘরে আরও অনেক গুলি হাস্যোদ্দীপক মনোরঞ্জক দৃশ্য আছে। তাহাদের মধ্যে "The House that Jack built" শীর্ষক সর্ব্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ গল্প "The Guinea Pig's cricket match" এবং "The Kittens' Wedding" এই তিনটি বিষয় লইয়া রচিত দৃশ্যাবলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দৃশ্যে, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, মোরগ, প্রভৃতির বেশভূষা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও রমণীয় হইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে cricket ম্যাচে খেলোয়াড়গণই যে কেবল খেলিতেছে তাহা নহে, বাজনদারগণ সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজাইতেছে, দর্শকগণ বিশ্রামাগার হইতে অতীব কৌতুহলজনক দৃষ্টিতে খেলা নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাদের মুখের ভাবভঙ্গী সবই ঠিক মনুষ্যের ন্যায়। বিবাহোৎসব সংক্রান্ত দৃশ্যটি অতীব সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে ২৪ জন সুন্দরাকৃতি বিড়ালশিশু যোগদান করিতেছে।

যাদুঘরের অবশিষ্ট দর্শনীয় দ্রব্যসমূহ বিবিধ প্রকারের। একটি মাছরাঙ্গা পাখীর

বিপন্নকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে

সাতটি ডিম রহিয়াছে। একটি ছাগলের পৃষ্ঠদেশে একটি বানর চড়িয়া রহিয়াছে; এবং একটি ইঁদুর তাহার সঙ্গীকে কল হইতে উদ্ধার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। (৫নং ছবি দ্রষ্টব্য)

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গোলাম কাদির ও ইসলাম বেগ

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে যাঁহারা হিন্দুস্থানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখ যোগ্য দুইটি ব্যক্তির নামেই এই প্রবন্ধটীর নামকরণ করা গেল। ইঁহাদের মধ্যে ইসলাম বেগ পারস্য জাতীয় ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত সেনাপতি মহম্মদ বেগ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসের শেষে লাল্সাউত যুদ্ধে নিহত হন। অপর জন জলিত খাঁ নামক দুর্দ্দান্ত রোহিলার পুত্র। তিনি দোয়াবে পিতার ক্ষুদ্র সর্দ্দারগিরিটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা ইঁহাকে রোহিলা-নবাব নামে অভিহিত করিব। এই রোহিলা-নবাব একজন বুদ্ধিমান ও কষ্টসহিষ্ণু যুবাপুরুষ এবং ইসলাম বেগ সৈন্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভীক সাহসী এবং তৎকালিক অশ্বারোহী সেনাগণের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্ম শেষে এই নেতাদ্বয় মারাঠাগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল্লি আক্রমণে ধাবিত হইলেন। সিন্ধিয়াও এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। তিনি পুণারাজশক্তি-প্রেরিত নূতন সৈন্যের বলে শক্তিমান হইবেন, এই ভরসায় বুক বাঁধিলেন; এবং সেই নূতন সৈন্যদলের

আগমন প্রতীক্ষায় নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মারাঠানেতাগণের সমবেত শক্তির প্রকৃত পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। মারাঠাদলন এবং যে সমস্ত প্রদেশ তখনও রাজশক্তিকে এক আধটু মান্য করিত, সেই সব স্থানে ইসলামীয় ক্ষমতার পুনঃস্থাপন করাই রোহিলা-নবাব এবং ইসলাম বেগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইসলাম-সৈন্য আগ্রা ও মথুরা জয় করিয়া বসিল, এবং রোহিলা-নবাব বীরদর্পে দিল্লি নগরীতে পদার্পণ করিলেন ও তথা হইতে ক্ষুদ্র মারাঠা সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। পারিবারিক হিসাবের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রোহিলা-নবাব সম্রাট-দরবারে পরিচিত হইলেন। তিনি "আমির-উল-ওমরা" বা প্রধান মন্ত্রীত্বের প্রার্থনা করিলেন; এবং প্রাসাদে প্রধান মন্ত্রীর জন্য যে স্বতন্ত্র আবাস নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, যখন বেগম সমরু ইউরোপীয় সেনাপতিগণ পরিচালিত সৈন্যদল সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি নদীর অপর পারে আপনার সেনানিবাস 'শাদরে' প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং দিন কয়েক কোনরূপ সাড়া শব্দ দিলেন না।

যুদ্ধ বিগ্রহ ও ব্রিটিসঅধিকারের দাবী রাজপ্রাসাদকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রাসাদের ঠিক সম্মুখে এক অতি বিস্তৃত আঙ্গিনা; তাহারই একপ্রান্তে কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য সম্রাট উপবেশন করিতেন। ইহারই পশ্চাতে আর একটী প্রাঙ্গণ, যে প্রাঙ্গণের উপর নয়নপ্রীতিকর বিখ্যাত দেওয়ানী খাস আদালত। চুণবালি-নির্ম্মিত অট্টালিকাটী নানা কারুকার্য্য-খচিত হইয়া আরও মনোরম আরও মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। আর এই অট্টালিকার বাহিরের অংশে উপরের এক-স্থানে লালা রুক্ষের সেই চিরপরিচিত সংক্ষিপ্ত প্রশংসালিপি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে,—

স্বর্গ ব'লে কোন কিছু যদি থাকে ভবে,
এই সেই এই সেই এই সেই তবে।

কিন্তু এই স্বর্গ, এই আনন্দধাম ইতঃপূর্ব্বেই নিরানন্দে ভরিয়া গিয়াছে; সেই সুন্দর ময়ূর-সিংহাসন, ইহার অমূল্য মণি-মরকত সে সময় পারসিকগণের হস্তগত; আর সেই পৃথিবী-বিখ্যাত, ভারত-পূজিত মোগল-পাদসা তখন তাঁহারই প্রদত্ত ক্ষমতায় স্ফীত হৃদয় রাজকর্ম্মচারীগণের অনুগ্রহের পাত্রমাত্র! হায়, কালের কি ভীষণ পরিণাম! কাল যে ছিল রাজা আজ সে ভিখারী!!

বর্ণিত প্রাসাদ অংশকে রোহিলা-নবাব আপনার বাসস্থানে পরিণত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু অম্বজি নামক মারাঠা কর্ম্মচারীর সহিত বেগম সমরুর প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহার এইরূপ ক্রমিক অনধিকার প্রবেশ এই স্থানেই বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোহিলা-নবাব যখন দেখিলেন যে, সমরু আর একটী প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে তখন তিনি এই গোলযোগ আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলেন। ফলে, তাঁহার ঈপ্সিত পদটী তিনিই প্রাপ্ত হইলেন। উভয় সেনাদলকে তুলিয়া লওয়া হইল। শাহ ধাতুময় তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন, তদ্দ্বারা নিজের শরীররক্ষক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন—এবং কেবল মাত্র

এই সৈন্যের উপরই তাঁহার দেহ রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। এই সময় ইসলাম বেগ বলিষ্ঠ মারাঠা রক্ষী সেনাদলের দ্বারা রক্ষিত আগ্রানগরী অবরোধের চেষ্টা করিলেন। রোহিলাও তাঁহার সহিত মিলিবার আশায় অগ্রসর হইলেন। দুরন্ত হিমানী শেষে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্য মার্চ্চ মাসে নূতন সৈন্যাদির সমাবেশের পর, সিন্ধিয়া বাহ্য ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করতঃ চম্বল নদী পার হইয়া ঢোলপুরে আসিলেন। তিনি আগ্রা প্রবেশের পূর্ব্বেই সম্মিলিত মসলেম শক্তি তাঁহাকে ২৪শে এপ্রিল তারিখে ভরতপুর হইতে এগার মাইল দূরে চক্ষণ নামক স্থানে আক্রমণ করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ বৈগনের উপস্থিতি সত্ত্বেও ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন কালে সিন্ধিয়ার জীবন রক্ষক রাণ খাঁ এ সংগ্রামে রাজপক্ষের সেনাচালনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। মোস্‌লেম অশ্বারোহী সেনাগণ যেন একটা অজ্ঞাত শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিল; মারাঠা সৈন্যদিগের দ্বারা গঠিত তিনদল পদাতিক, শত্রুর বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। এমন কি জাট্ অশ্বারোহীগণও কিছু করিতে পারিল না।

এইরূপে পরাজিত হইয়া রাণ খাঁ গোয়ালিয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রোহিলা নবাবও আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন। শিখগণ রোহিলারাজ্যের উত্তর পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া দেশকর্ত্তাকে ভয় দেখাইলেও ফলে কিন্তু শিখেরাই পশ্চাৎ তাড়িত হইয়াছিল,—যদিও এই আক্রমণফলে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত শরণপুর জেলাকে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে দুইপুরুষেরও বেশী সময় আবশ্যক হইয়াছিল। রোহিলা এবং বেগ পুনরায় তাঁহাদের সৈন্য একত্রিত করিলেন। এই নবগঠিত সৈন্যদলের এক অংশ আগ্রায় রাখিয়া অবশিষ্টাংশ লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তাঁহারা মহানগরীতে পৌঁছিলেন। এই সময়ে শাহ রাজপুত রাজন্যবর্গকে স্বীয় করতলগত করিবার জন্য রাজপুতানায় গমন করেন, কিন্তু তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য হইতে আগত নূতন সেনাবলে বলীয়ান হইয়া সিন্ধিয়া আগ্রা অবরোধ করিলেন। এই সম্মুখযুদ্ধে ফতেপুরসিক্রির জীর্ণ প্রাসাদ সমীপে ইস্‌মাইল বেগ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; এবং গোলাম কাদিরের সঙ্গে দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। সিন্ধিয়ারাজ তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি লক্কাদাদকে আগ্রা রক্ষণের ভার দিলেন; এবং তাঁহার পল্টনের ক্ষুদ্র এক অংশ সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য দিল্লিতে পাঠাইয়া দিয়া মথুরার সেনানিবাসে অবশেষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোস্‌লেম নেতাগণ 'শাদরে' শিবির সন্নিবেশ করিল। শিবিরে খাদ্যদ্রব্যের অনাটন পড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে নেতৃযুগল শাহের সেনাপতিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। ফলে মোগলসেনাদলও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিল; গোঁসাঞিদের নেতা হিম্মত আপন সেনাদলকে ফিরাইয়া লইলেন। এইরূপে সম্রাট সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে, মিত্রদ্বয় নদী পার হইয়া দিল্লিতে প্রবেশ করিলেন; এবং নগররক্ষণ দুর্গ ও রাজকীয় প্রাসাদ জয় করিয়া বসিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মৌসুম প্রারম্ভে

তাঁহারা পৃথক হইলেন। রাজধানীর দক্ষিণে পুরাতন সহরটীতে বেগ তাঁবু ফেলিলেন। রোহিলা এই মহানগরীর পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র দরিয়াগঞ্জে আপনার দলবল রাখিয়া, জীর্ণ রাজপ্রাসাদে স্বয়ং বাস করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ কার্য্য নির্ব্বাহের সমস্ত ভার নিজেদের উপর গ্রহণ এবং মারাঠাশত্রুর হস্ত হইতে নিজেদের মুক্তির জন্য তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রোহিলা-নবাবের প্রসাদের বাসের আর একটুকু মৎলব ছিল। তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, রাজপ্রাসাদে নিশ্চয়ই লুক্কায়িত ধনরাশি আছে, এবং একটু চেষ্টা করিলেই তিনি তাহার অধিকারী হইতে পারিবেন।

২৯শে জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং অট্টালিকা সমূহের তলদেশ খনন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত ধনরাশি মিলিল না। তখন তিনি শাহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মহিলাগণকে বিরলবাস হইতে টানিয়া বাহির করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে ছাড়িয়া দেওয়া হইল,—অপমানের চূড়ান্ত আরম্ভ হইল। ১০ই আগষ্ট তারিখে অপমানিত, নিপীড়িত সম্রাটকে রাজ-সিংহাসনস্থিত রোহিলানবাবের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। সম্রাটকে গুপ্তধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্পষ্ট বাক্যে কহিলেন, সম্রাট কখনও মিথ্যা কহিতে জানে না, তাঁহার প্রাসাদে কোনও লুক্কায়িত ধন-ভাণ্ডার নাই। শাহের একথায় সন্দেহ করিবার কিছু না থাকিলেও, রোহিলা-নবাব এই উত্তরে সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার দলের কয়েকজনের সাহায্যে সম্রাটকে ভূতলে পতিত এবং ছুরিকা-ঘাতে পার্থিব সম্পদের শ্রেষ্ঠ উপাদান চক্ষু হইতে তাঁহাকে চির জীবনের মত বঞ্চিত করিলেন। হায়, কি শোচনীয় পরিণাম!

তারপর একটী অসহায় সাহাজাদাকে নামে মাত্র বাদসাহ করা হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোহিলাই সম্রাট হইলেন। সময়ে তাঁহার স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, দিল্লিসিংহাসনে উপবেশন করিয়া নিজের মুখস্থিত তাম্রকূটের ধূম্ররাশি ঘৃণাভরে তাঁহার হস্তের ক্রীড়াকুন্দকস্বরূপ নব সম্রাটের মুখে দিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার শাস্তি গ্রহণের সময়ও ক্রমে নিকটতর হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার বিস্তৃত সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগস্থিত সাধু সেনাপতিটি এক্ষণে তাঁহার ঘৃণিত সমরসাথীকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং বেগের প্রস্থানান্তর আগ্রা ও মথুরার মারাঠাগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। এদিকেও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রাজপ্রাসাদ বিলাসভোগের একটা প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল।

ক্রমে ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিল। অন-সনে লোক মরিতে আরম্ভ করিল। তবুও অত্যাচারের বিরাম নাই। অবশেষে যখন আর জীবন রক্ষার উপায় থাকিল না, তখন তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে—সদলবলে যমুনার পারে প্রস্থান করিলেন।

সাধু সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রোহিলা-নবাব আর রাণ-খাঁ এবং বৈগ্‌নের শিক্ষিত পদাতিক সৈন্যদলের সম্মুখীন্ হইতে

সাহসী হইলেন না। ১১ই আক্টোবর তারিখে তিনি রাজপ্রসাদে অগ্নি সংযোগ করিলেন, এবং হস্তীপৃষ্ঠে নদীপার হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার কার্য্য নিস্ফল হইল। যথা সময়ে রাণ খাঁ এবং তাঁহার অগ্রবর্ত্তী রক্ষিসেনা উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করত, শাহ এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। 'পুতুল' সম্রাট এবং প্রাসাদের খাস অধ্যক্ষ রোহিলার অসদভিপ্রায় নির্ব্বাহ করিবার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। রাণ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রোহিলার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু রোহিলা নবাব ইতঃপূর্ব্বেই নিমাট দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই দুর্গ তাঁহার রাজ্য-প্রবেশের প্রধান দ্বার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নয়টী সপ্তাহ ধরিয়া তিনি বীরপুরুষের ন্যায় দুর্গ রক্ষা করিলেন। যদিও এক পক্ষে তিনি অত্যন্ত হীনপ্রকৃতির ছিলেন, তবুও তাঁহাতে সাহসের অভাব ছিলনা। কিন্তু রোহিলা-নবাব দুর্গটী আর রক্ষা করিতে পারিলেন না; এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া শিখদেশে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই শিখদেশেই ইতঃপুর্ব্বে তাঁহার সহোদরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। একদিন রজনী যোগে খিড়কীর দ্বার পথে মণিমরকত পরিপুর্ণ জিন্‌থলি-আঁটা অশ্বের উপর চড়িয়া তিনি পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে বেশী দুর যাইতে হইল না। তিনি পথভ্রান্ত হইয়া অশ্ব সহিত একটী গর্ত্তে পতিত হইলেন। কতিপয় গ্রামবাসী তাঁহাকে ধরিয়া রাণ খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। সিন্ধিয়ার আদেশ ক্রমে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইবার পর তাঁহার ছিন্ন ভিন্ন দেহখানি দিল্লিতে পাঠান হইল; এবং অন্ধ সম্রাটের সম্মুখে দেহখানি স্থাপিত হইল। বৈগ্‌নের একজন কর্ম্মচারী মণি-মরকতগুলি পাইয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চাকুরী ছাড়িলেন, এবং সম্ভবতঃ ঐ ধন-সম্ভার লইয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া গেলেন।

রাজদ্রোহিতা, লোভপরায়ণতা এবং নিষ্ঠুরতা এই তিনটী অপরাধের সংমিশ্রণে রোহিলা-নবাব দোষী ছিলেন। তাঁহার ভীষণ অত্যাচার যে কোন যুগের ধর্ম্মজ্ঞানকে আহত করে। একদিন কোরাণ স্পর্শ করত প্রতিজ্ঞা করিয়া এই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির রোহিলা নবাব বলিয়াছিলেন যে, তিনি চিরকালই অসহায় দিল্লীশ্বরকে রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার সেবা করিবেন। তাই দীর্ঘকাল পরে যখন কঠোর উপহাসে বিদ্ধ করিবার জন্য রোহিলা-নবাব অন্ধ শাহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি এক্ষণে কি দেখিতেছেন, তখন শাহ উত্তর করিয়াছিলেন,—"তোমার আর আমার মধ্যে সেই ঐশ-সাক্ষ্যের ব্যবধান ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" এই হেয় বিশ্বাসঘাতকতার উপরেও রোহিলা নবাব আরও অনেক নির্দ্দোষীকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সম্রাটকে সবংশে নির্ব্বংশ করিবার জন্য পলায়নের পূর্ব্বে প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। এইনিষ্ঠুর কার্য্য সমুদয় সম্পাদন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক-মতে, এগার বৎসর পুর্ব্বে ইঁহার পিতা জলিত খাঁ দুর্দ্দান্ত রাজদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া পলায়ন কালে নিজ পরিবারবর্গকে এক দুর্গে রাখিয়া যান। দুর্গ পরহস্তগত হইল। তাঁহার পুত্র

রোহিলানবাব রাজকীয় প্রাসাদে নীত, এবং জেনানার বালক ভৃত্য নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত হইতে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই যাতনাই নাকি শেষকালে তাহাকে ভীষণ প্রতিশোধ লইতে বাধ্য করিয়াছিল। অপর মতে, তাঁহার ধীশক্তি চিরকালই অসংযত ছিল, এবং ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শেষ অবস্থায় একদিন তিনি সম্রাট পরিবারবর্গকে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে বাধ্য করিলেন। তাঁহারা নাচিতে লাগিলেন। কিছু পরে তিনি নিদ্রা যাইবার ভাণ করিয়া সিংহাসনে হেলিয়া পড়িলেন। আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নর্ত্তনশীল রাজপরিবারবর্গকে এরূপ সুবিধা দেখিয়াও তাঁহার জীবনের উপর লক্ষ্য না করায় কাপুরুষ বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। অপর এক সময়ে, তিনি দেবতার প্রত্যাদেশের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া আপনার পাপের বোঝা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে আগ্রা হইতে আসিবার সময় যখন প্রখর সূর্য্যতাপ অসহনীয় হইয়া পড়িল, তিনি পথিপার্শ্ববর্ত্তী কোন উপবনে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। এই সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একটী স্বর্গদূত তাঁহার অন্তর্বিদ্ধ করিয়া কহিতেছেন, "উঠ, দিল্লিতে যাও এবং প্রাসাদটী আপনার জন্য অধিকার করিয়া লও।" যাহা হউক, শাহ রোহিলানবাবকে নির্দ্দয় শঠতার প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি সময় সময় একটী কবিতার আবৃত্তি করিয়া তাঁহার কারাদুঃখ কথঞ্চিৎ লাঘব করিতেন।—

যে স্তন্যে সাপের দেহ করে পুষ্টি লাভ,
তারেই আঘাত করা সাপের স্বভাব।

রোহিলা নবাবের তুলনায় তাহার সহকারী ইস্লাম বেগের পরিণাম অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় এবং কম ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। তিনি সিন্ধিয়ার সেনাধ্যক্ষ রাণ খাঁর সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দিল্লি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ বেগের ন্যায় স্বাধীনচেতা একজন বীরের পক্ষে মারাঠা সেনাবিভাগে আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার খুল্লতাতের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মারাঠা সেনাদলে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার পর আর কেহ কখন তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখে নাই। ইহার পর দশ মাস কাল তিনি মধ্য যুগের সাহসী সেনাচালকদিগের ন্যায় জীবনের আর একটী বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় অতিবাহিত করেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন মোগল অশ্বারোহী সেনাগণকে তিনি আপনার পতাকা তলে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সৈন্য বলে বলীয়ান হইয়া বেগ আবার একটী নূতন বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন, এবং শক্তিমান্ মারাঠাশক্তি তাঁহার নিকট হইতে রাজকরের দাবী করিলে তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

দেশ কাল এবং পাত্র বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার বিদ্রোহের পতাকা কিছু দিনের জন্য আবার অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে পুলক স্পন্দনে কম্পিত হইয়া উঠিল। দামায়া

দুন্দুভির উত্তেজনাপূর্ণ জয়ধ্বনিতে বহু-ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ডকে ধ্বনিত করিয়া যুদ্ধবর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়া বেগ সসৈন্যে সিন্ধিয়ার সুশিক্ষিত পদাতিক সৈন্য-দলের উপরে পতিত হইলেন। সিন্ধিয়াসৈন্য প্রথমে এই প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু পরক্ষণে বেগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শেষযুদ্ধে সিন্ধিয়াই জয়লাভ করিল। বেগের অবশ্যম্ভাবী শেষ দশা নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি আত্মরক্ষার জন্য কনৌন্দ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। দুর্গস্বামিনী, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সঙ্গী গোলাম কাদিরের বিধবা ভগিনী, দুর্গটী অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এই মহিলাটি এই সময়ে সিন্ধিয়ার সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ পেরণ রণবাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে না আসা পর্য্যন্ত তিনি দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! বেগের সাহায্যে তাঁহার উৎসাহও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই শত্রুদিগের ভীষণ আক্রমণে তিনি রণক্ষেত্রে বীর রমণীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করেন।

বেগেরও আর যুদ্ধ চালাইবার ইচ্ছা ছিল না। জনৈক য়ুরোপীয়ের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রাণরক্ষা করা হইবে এই অঙ্গীকারে ইসলাম বেগ আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে বন্দীরূপে আগ্রায় লইয়া আসা হইল। সেখানে দুর্গের উচ্চতম স্থানে একটী জীর্ণ অট্টালিকাতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অট্টালিকাটী দানসাহ নামক একজন জাঠের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিত। এই অট্টালিকাতেই ইসলাম বেগের স্বল্পকালস্থায়ী শেষ জীবনটুকু অতিবাহিত হইয়াছিল। যদিও তিনি বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইতেন না, তবুও এই বন্দী অবস্থা, এই নির্জ্জীবতা তাঁহার ন্যায় চঞ্চল কর্ম্মঠ জীবনের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় ছিল।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ অজ্ঞাত।

শ্রীযতীশগোবিন্দ সেন।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৫)

বাজিরাও পুণার শেষ পেশওয়া। নানা ফর্ণবীস যতদিন মন্ত্রীরূপে রাজ্যের হাল ধরিয়াছিলেন ততদিন রাজ্যতরী নানা সঙ্কটের মধ্যে একপ্রকার নিরাপদে চলিয়া-ছিল। পুণা দরবারে তিনি একমাত্র বিচক্ষণ কর্ণধার ছিলেন। ইংরাজদের প্রতাপ ও সত্যনিষ্ঠার উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু অতবড় প্রবল শত্রুকে বক্ষে স্থান দিলে বিষম বিপাকের আশঙ্কা বিবেচনায় তিনি ইংরাজদিগকে সাধ্যমত দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাজিরাওএর আমলে নানা ফর্ণবীস রাজ্যের হিতকামনায় পেশওয়াকে নিঃস্বার্থ ভাবে সৎপরামর্শ দিতে সর্ব্বদাই

বাজীরাও ১ম

তৎপর ছিলেন। কিন্তু রাজা যখন অব্যবস্থিত ব্যসনাসক্ত দুর্ব্বুদ্ধি, তখন মন্ত্রী আর কত পারিয়া উঠিবেন?

যশবন্তরাও হোলকর

১৮০০ সালে নানার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর অরাজকতা উৎপন্ন হইল। পেশওয়ার শাসন নির্জীব ও অন্তঃসারশূন্য, চতুর্দ্দিকে বিপ্লব, যে যেখানে পারে সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা সাধিয়া লইতে তৎপর। বৎসরেক পরে আর এক নূতন বীর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—যশবন্তরাও হোলকর। সিন্দিয়া এতদিন হোলকরকে বশে রাখিয়াছিলেন, যশবন্তরাও সহসা স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে সমুত্থান পূর্ব্বক সিন্দের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। যশবন্তের রণকাহিনী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এইস্থলে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি।

হোলকর বংশ

হোলকর বংশ আসলে ধনসর (গয়লা জাতীয় মারাঠা। পুণাসন্নিহিত নীরানদী তীরবর্ত্তী হোলগ্রামে তাঁহাদের আদিম নিবাস ও সেই গ্রাম হইতে তাঁহাদের কুলনামের উৎপত্তি। হোলকর বংশের মুখোজ্জ্বলকারী মহ্লার রাও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে খান্দেশে তাঁহার মামার মেষপালক ছিলেন।

মহ্লার রাও ১৬৯৩—১৭৬৯

একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় এক বৃহৎ অজগর সর্প তাঁহার মুখের উপর আতপত্ররূপে ফণা ধরিয়া থাকে। এই শুভলক্ষণ দৃষ্টে উৎসাহিত হইয়া তিনি অন্য চাকরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি একজন মারাঠী সর্দ্দারের নিকট ঘোড়সোয়ারের কর্ম্ম পান। এই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। ১৭২৪ সালে বাজিরাও পেশওয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বের অশ্বপতি, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ ও বিস্তর ভূমি সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। ১৭৩২ সালে তিনি পেশওয়ার প্রধান সেনাপতিরূপে মালবের মোগল প্রতিনিধিকে যুদ্ধে পরাভব করেন। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মালব বিজয়ান্তর সিন্দে ও হোলকর তাহা আধাআধি ভাগ করিয়া লন, তাহাতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফার প্রদেশে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। এইরূপে তাঁহার রাজ্য ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ইন্দোর তাঁহার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইল। পাণিপতের যুদ্ধে যে অল্প কয়েকজন মারাঠী বীর ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, মহ্লাররাও তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি ঐ যুদ্ধে বড় একটা যোগ দেন নাই—তাহার কারণ এইরূপ রাষ্ট্র যে, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ পরামর্শ দেন মারাঠী সেনাপতি সদাশিব ভাউ "গয়লার কথা কে মানে" এই বলিয়া সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার পরামর্শ এই—পাঠানদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের দলবলকে বিবিধ উপায়ে হায়রাণ করা—বল অপেক্ষা কৌশলে তাহাদের দমন করা—পলায়নচ্ছলে অরিদল আকর্ষণ করিয়া অবসর বুঝিয়া তাহাদের উপর হল্লা করা; "ত্বরায় অনর্থ, বিলম্বে

কার্য্যসিদ্ধি” এই তাঁহার উপদেশ। এই সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি তাড়াতাড়ি রণে মাতিয়া গেলেন, শীঘ্রই তাহার বিষম ফলভোগও করিলেন। পাণিপতের যুদ্ধের পর মহ্লাররাও মধ্যহিন্দুস্থানে স্বরাজ্যের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবন্ধনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করেন—তাঁহার তাহাতে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কেন না মহ্লার রাও উদারচেতা, বিনয়ী অথচ দৃঢ়মতি, অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। রণে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব, রাজ্য শাসনেও সেইরূপ তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অহল্যাবাই

মহ্লাররাওএর পুত্র খণ্ডেরাও পিতার আগেই মরণ প্রাপ্ত হন, তাঁহার পৌত্র মালিরাও তাঁহার উত্তরাধিকারী। মালিরাও নির্ব্বুদ্ধি ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলেন, অধিককাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। মালিরাওএর মৃত্যুর পর তাহার মাতা খ্যাতনামা অহল্যাবাই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তুকাজিরাও তাঁহার সেনাপতি। উভয়ে মিলিয়া অশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতা সহকারে ৩০ বৎসর কাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তুকাজীর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে সাতপুরা শ্রেণীর দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশের তত্ত্বাবধান করা, করদ রাজ্য সকল হইতে কর আদায় করা, এ সকল অহল্যাবাই করিতেন। যখন তুকাজী উত্তর হিন্দুস্থান পরিদর্শনে গমন করিতেন, তখন মালব নিমার প্রভৃতি প্রদেশের সমগ্র কার্য্যভার রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পিত—সমুদায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শাসন বিস্তৃত। রাজকোষ তাঁহার হস্তাধীন—রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব নিয়ম পূর্ব্বক রক্ষিত হইত। কোন গুরুতর রাজকার্য্য উপস্থিত হইলে তুকাজী রাজ্ঞীর পরামর্শ ভিন্ন কার্য্য করিতেন না এবং পররাজ্যে যে সকল কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিতে হইত, তাহা অহল্যাবাই স্বয়ং করিতেন। তাঁহার অনুপম নয়কৌশলে পররাজ্যের সহিত মিত্রতা-গ্রন্থির কোন শৈথিল্য ঘটে নাই। এদিকে আবার স্বরাজ্যে প্রজাদের সুখশান্তিবর্দ্ধনেও তাঁহার অশেষ যত্ন। একদিকে অতিরিক্ত করভার হইতে রায়তদের অব্যাহতি দান, অন্যদিকে জমিদারদের স্বত্বরক্ষণ, এই দুইদিক রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজ্ঞী যেরূপ প্রজাবৎসলা, প্রজারাও তাঁহাকে নীতিপ্রজ্ঞা-মূর্ত্তিমতী জননী সমান শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে আদালত পঞ্চায়ৎ অথবা মন্ত্রীবর্গের বিচারে সঁপিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না, যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য দরবারে ন্যায় বিতরণ করিতেন—যাহার যে কোন আবেদন তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর ছিলেন, শক্তের ভক্ত হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় পীড়ন অনুমোদন করিতেন না, স্ত্রীজন চিত্ততোষী তোষামোদও তাঁহাকে ন্যায়মার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। এই রূপবতী, গুণবতী, ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজ্ঞী মহারাষ্ট্র দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৭৯৫ অব্দে ষাট বৎসর বয়সে সংসার যাত্রা হইতে অপসৃত হন। সেনাপতি তুকাজিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু কি করেন—

সে বয়সে বড়, তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না, কিন্তু তাহা না হইলেও তাহাকে মহ্লাররাওএর পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করিয়া যান। প্রথম মারাঠী সমরে তুকাজী হোলকর ও মহাদাজী সিন্দে উভয়ে মিলিয়া একমনে কার্য্য করেন। শেষাশেষি তাঁহাদের পরস্পর বৈমনস্য ও বৈরভাব সংঘটন হন। মহাদাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তুকাজী পরলোকগত হয়েন।

তুকাজীর চারি পুত্র। কাশীরাও ও মহ্লাররাও দুই পত্নী-গর্ভজাত—যশবন্ত ও বিঠোজী দুই দাসী পুত্র। কাশীরাও মহ্লাররাও দুই ভায়ে রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি; জ্যেষ্ঠের সহায় দৌলতরাও সিন্দে, কনিষ্ঠের পক্ষে নানা-ফর্ণবীশ। একবার দুই ভায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয় কিন্তু সে চেষ্টার কোন ফল হইল না। যে দিনে দুই ভ্রাতা তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দবন্ধন স্থাপন করিলেন তার পরদিনেই মহ্লাররাও সিন্দিয়ার সৈন্য হস্তে নিহত হন। যশবন্তরাও মহ্লাররাওএর পক্ষ ছিলেন, তিনি এই গোলযোগে পলায়ন করিয়া নাসপুর রাজার শরণাপন্ন হইলেন। সেখানে শরণ লাভ দূরে থাকুক তাঁহার ভাগ্যে কারা লাভ ঘটিল—দেড় বৎসর পরে বহুকষ্টে পলায়নে মুক্তিলাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডেরাওএর নামে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মারাঠা, রাজপুর্ত, পাঠান, ভিল, পিণ্ডারী প্রভৃতি লোক হইতে ফৌজ একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের দলপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে ইউরোপীয় রণপণ্ডিতদের সাহায্যে এই ফৌজ হইতে রণদক্ষ শিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। আমীর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান সর্দ্দারের সাহায্য পাইয়া তাঁহার বল পুষ্ট হইল; দুইজনে মিলিয়া সিন্দিয়ার রাজ্যে ঘোরতর লুটপাট অত্যাচার আরম্ভ করিয়া-দিলেন। পরিশেষে ১৮০২ সালে পুণাগগনে ধূমকেতুর ন্যায় সহসা সসৈন্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পুণা আক্রমণের এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা বিঠোজী কোন এক বিদ্রোহাচরণে ধরা পড়িয়া দণ্ডনীয় হন, বাজীরাও তাঁহাকে হাতীর পায়ে বাঁধিয়া নির্দ্দয়রূপে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন। সিন্ধিয়ার রাজ্য লুণ্ঠন স্থগিত রাখিয়া যশবন্তরাও প্রতিশোধ তুলিবার মানসে পুণার দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য পেশওয়া ও সিন্ধে উভয়ে আলিবেল ঘাটে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তিনি আর একদিক দিয়া ঘুরিয়া সৈন্য হস্ত এড়াইয়া পুণার দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে আসিয়া তাম্বু গাড়িলেন। দুই দিন পরে দুই সৈন্যের সংঘর্ষণ। ঘোরতর সংগ্রামের পর যশবন্ত জয়ী হইলেন। সিন্ধিয়া কামান ও অন্যান্য জিনিষপত্র ফেলিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পুণার পথ উন্মুক্ত। পরদিন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণল ক্লোজ সাহেব হোলকরের সহিত সাক্ষৎ করিতে যান। গিয়া দেখেন কর্দ্দমাক্ত ক্ষত বিক্ষত শরীরে অন্ধবীর * এক ক্ষুদ্র তাম্বুতে শয়ান, ঠিক যেন শরশয্যাগত ভীষ্মদেব। হোলকর কর্ণেল সাহেবকে পুণায় থাকিবার জন্য বিস্তর

* ইতিপূর্ব্বে ঘটনা ক্রমে দৈবাৎ বন্দুক ছুটিয়া যাওয়াতে একচক্ষু হারাইয়া ছিলেন।

অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিবার ঔৎসুক্য দেখাইলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ না মানিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে পুণা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। হোলকর তখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্ণ অবকাশ পাইলেন ও মনের সাধে নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন।

বাজিরাও হোলকরের বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পুণা হইতে সিংহগড়, সিংহগড় হইতে রায়গড়, রায়গড় হইতে রত্নগিরির সমীপস্থ সুবর্ণদুর্গ, পরিশেষে ব্রিটিষ পোতে বাসীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনে বাসীনসন্ধি।

বাসীনসন্ধি ৩১ ডিসেম্বর ১৮০২

এই সন্ধিযোগে পেশওয়ার স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল। সন্ধির মর্ম্ম এই, ইংরাজেরা পেশওয়াকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া দিবেন, —পেশওয়া স্বীয় রাজধানীতে ব্রিটিষ সৈন্য পোষণ করিবেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাহাতে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় হয় এমন ভূমিসম্পত্তি বন্ধক রাখিবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত সন্ধি বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এইরূপে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া বাজিরাও পুণায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মসনদ প্রাপ্তি ঘোষণার্থে ১৯ তোপধ্বনি হইল। প্রকৃত-পক্ষে এ তাঁহার সম্মানার্থে নহে, ইহা ইংরাজ-দের রাজ্যলাভসূচক জয়ধ্বনি।

বাজিরাও সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়া যে বিশেষ কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। কায়দা নাই, কানুন নাই, কোন প্রকার শাসন নাই—প্রজাদের যে ভয়ানক দুর্দ্দশা তাহা কহতব্য নয়, পুণার আশপাশ পল্লীগ্রাম সকল দস্যু তস্করের আবাস —রাজপুরুষেরা তাহাদের লুটের ভাগী ও প্রশ্রয় দাতা। পেশওয়ার নিজের রাজ্য শাসনের ক্ষমতা নাই। পুণা দরবারে অপর কোন যোগ্য শাসনকর্ত্তারও নাম গন্ধ নাই। বাজিরাও ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসী ছিলেন, তাঁহার নিজের আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য। আদালত নাম মাত্র—যাহার পয়সা তাহারই জয়।

ত্রিম্বকজী

দুর্ভাগ্য ক্রমে ত্রিম্বকজী ডাঙলিয়া নামক এক ব্যক্তি আবার তাঁহার মোসাহেব ও দুর্মন্ত্রী আসিয়া জুটিল। যেমন রাজা তার উপযুক্ত মন্ত্রী। যেমনটি চাই বাজীরাও তেমনি ভৃত্য পাইলেন। এই সময়ে পেশওয়া ও গাইকওয়াড় সরকারের মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত। গাইকওয়াড়ের তরফ হইতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই বিবাদভঞ্জন কার্য্যে পুণায় আগমন করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রীর আগমন পেশওয়ার মনঃপূত হয় নাই। তাই বাহিরে যতই ভদ্রতাচারণ করুন ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। বাজীরাওয়ের নিমন্ত্রণে শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডরপুর তীর্থে গমন করেন। ১৪ই জুলাই দুজনের একত্রে পান-ভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় শাস্ত্রী বিঠোবা

মন্দিরে পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পেশওয়ার মধুরালাপে প্রীত হইয়া যেমন মন্দিরের বাহির হইলেন অমনি জল্লাদের খড়্গাঘাতে ব্রাহ্মণের অপঘাত মৃত্যু। এই ব্রহ্মহত্যার মূল প্রবর্ত্তক ত্রিম্বকজী। কিন্তু পেশওয়া যে নিতান্ত নির্দ্দোষী ছিলেন তাহা নহে—তাঁহাকেও সত্বর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল। বাজিরাওয়ের রাজ্যে শাসন ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট এলফিনিষ্টন

সুবিচক্ষণ এলফিনিষ্টন সাহেব তখন পুণায় ব্রিটিষ কার্য্যকর্ত্তা। ত্রিম্বকজী এই হত্যা-কাণ্ডের মূলপ্রবর্ত্তক সপ্রমাণ হওয়াতে এলফিনিষ্টন তাহাকে পেশওয়ার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠান। বাজিরাও প্রথমত ইতস্তত করেন, পরে তাড়া পাইয়া অগত্যা প্রিয়তম ত্রিম্বকজীকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন—ত্রিম্বকজী থানার দুর্গে বন্দী রহিলেন। তাহার উপর ইউরোপীয় সান্ত্রীদের চৌকি পাহারা। কতকদিন পরে তিনি ইউরোপীয় গার্ডদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক পাহাড় পর্ব্বতে অদৃশ্য ভাবে ফিরিতে লাগিলেন।

বাজিরাও এইক্ষণে ইংরাজদের তাড়াই-বার নানান্ পন্থা দেখিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে সিন্দে হোলকর নাগপুর রাজা পিণ্ডারী দস্যুদল, এই সকল লোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং কুলি ভীল প্রভৃতি বন্য জাতীর মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ উদ্দেশে ত্রিম্বকজীকে অর্থ সাহায্য জন্য পাঠানো হইল। এলফিনিষ্টন সাহেব চর-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেছেন, বাজিরাও এইরূপ আচরণে নিজের কত হানি করিতে-ছেন—রাজ্যকে কি ঘোর সঙ্কটে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যাদি তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। তাহাতে যখন কোন ফল হইল না তখন পেশওয়াকে স্পষ্ট বলা হইল "ত্রিম্বকজীকে দেশান্তরিত করিতে হইবে যদি না কর তাহা হইলে ইংরাজদের সঙ্গেই নিশ্চয় যুদ্ধ বাধিবে। এই বেলা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দেও এবং এই করারের বন্ধক স্বরূপ দুর্গত্রয় আমাদের হস্তে রাখিয়া দেও নইলে পুণা এখনি সৈন্য বেষ্টিত হইবে।" পরে পেশওয়াকে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো কঠোর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। অবশেষে গবর্ণর জেনেরালের আদেশ ক্রমে পুণার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। তাঁহার স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমূলে নির্ম্মূল।

পুণার সন্ধি ১৮১৭

বাজিরাও ইংরেজদের সঙ্গে বলে পারিয়া উঠিবেন না বিলক্ষণ জানিতেন; তাই প্রকাশ্যে কোন শত্রুতাচরণ করিতে পারেন না, গোপনে সৈন্য সংগ্রহে নিরস্ত হইলেন না। বাজিরাও যে মতলবে সৈন্য সংগ্রহ করি-তেছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া এলফিনিষ্টন তাড়াতাড়ি বোম্বাই হইতে একদল ইউরোপীয় ফৌজ আনাইয়া পুণার ক্রোশ দুই দূরে খিড়কী ক্ষেত্রে আড্ডা গাড়িলেন। ৫ই নবেম্বর যুদ্ধারম্ভ।

খিড়কী যুদ্ধ ৫ই নবেম্বর ১৮১৭

ইংরাজদের সৈন্যবল সবশুদ্ধ ২৮০০ পদাতিক, তন্মধ্যে ৮০০ ইউরোপীয় সেনা। মারাঠীদের ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ৮০০০, পুণা হইতে খিড়কীর পথ পর্য্যন্ত সেনায় সেনায় আচ্ছাদিত। বাপু গোখ্‌লে মারাঠী সেনাপতি। গোখলে একদল সিপাহির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৬০০০ বাছাবাছা অশ্বচালনা করিলেন—সওয়ারেরা মহাবোখে হল্লা করিয়া চলিল—সেই সঙ্গে নয়মুখী কামান-ব্যাটারি হইতে গুলিগোলা বর্ষিত হইল। এই অশ্বচাল চালনে আশানুরূপ ফললাভ হইল না, বরং উল্টোৎপত্তি হইল। দুই সৈন্যের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মতন ছিল, কতকজন সোয়ার প্রথম ঝোঁকে তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল, কতক বা গুলি খাইয়া ধরাশায়ী হইল—অবশিষ্ট সওয়ারেরা পিছু হটিয়া গেল। সওয়ারদের পরাভবে মারাঠী সেনারা এমন দমিয়া গেল যে আর কেহই এগোইতে সাহস করিল না। সন্ধ্যার মধ্যে এই বিপুল সৈন্য সশরীরে অন্তর্ধান। ইংরাজেরা রিপু-শূন্য সমরক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিল। এই রণে ইংরাজদের সামান্য ক্ষতি, মারাঠীদের ৫০০ লোক মারা পড়ে। পেশওয়া সেনা-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া পার্ব্বতী মন্দির হইতে খিড়কীর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সূর্য্যোদয়ে তাঁহার সৈন্যদলের উৎসাহ কোলাহলে আকাশপূর্ণ—সূর্য্যাস্তের মধ্যে সে সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।
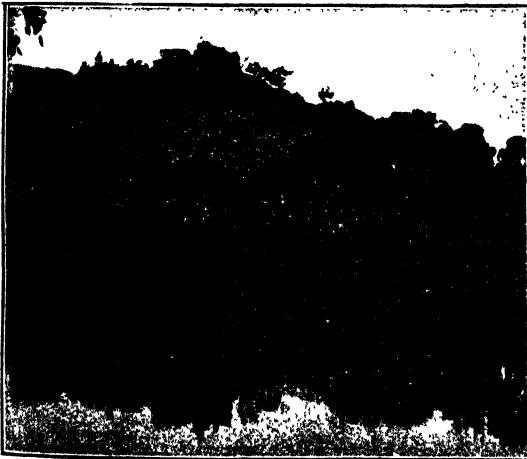
He counted them at break of day,
And when the sun set where were they ?

প্রভাতে গণিয়া সেনা হরষে বিহ্বল,
ভানু যবে অস্তাচলে কোথায় সে বল ?

বাজিরাও-এর গ্রহ মন্দ। ইংরাজদের প্রসাদে তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন—ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন।

পার্ব্বতী মন্দির

১৫ই নবেম্বর ব্রিটিষ সৈন্যের পুণা অধিকার, তখন হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদের করতলন্যস্ত হইল। নববর্ষারম্ভে পুণার অনতিদূর কোরেগামে আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজপ্রতাপের দ্বিতীয় বার পরিচয় পাইয়া বাজীরাও সেই যে স্বদেশ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলাইলেন, আর ফিরিলেন না। দেশ দেশান্তরে তাড়িত হইয়া অবশেষে তিনি সরঞ্জন

মালকমের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন এবং অতঃপর উদার পেন্সন ভোগে কানপুর সন্নিহিত বিঠুরে কালহরণ করিতে লাগিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রধার দুরাচার নানা সাহেব এই বাজিরাও-এর পোষ্যপুত্র। শতবর্ষায়ত পেশওয়া বংশ তাঁহাতেই বিলীন হইল। পুণা ও পুণার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইল।

আহমদনগর

আহমদনগর দক্ষিণ প্রদেশের একটি নামাঙ্কিত নগর। মোগল যুগে ইহার পত্তন হয়। বিপ্লবের মধ্যেই ইহার জন্ম ও বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া কিরূপে ইহা ব্রিটিষ রাজ্যের অধীন হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট ভারতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনো মোগল যূপ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে আল্লাউদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। ইহার দেড়শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল পরাক্রান্ত 'বামন' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বিজাপুর আহমদ নগর গলকণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান রাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু-রাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মুসলমানদের একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় হইতেই তাহার বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় ও তাঁহার পৌত্র সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল-রাজ্য ভুক্ত হয়।

সুলতান বহ্রান নিজাম সার মৃত্যুর পর আহমদ নগর দুই দলে বিভক্ত হয়; সুবিখ্যাত চাঁদবিবি তন্মধ্যে একদলের অধিনায়িকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল-সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেক-কাল খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নন। সম্রাটের আদেশ ক্রমে মোরাদ আহমদ নগরের সম্মুখে সসৈন্য উপনীত হইলেন।

চাঁদবিবি

আহমেদনগর আক্রমণ কালে সুলতানা চাঁদবিবি যে অসাধারণ বীরত্ব ও দেশানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাতে তাঁহার নাম ও অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহার আত্মীয় বিজাপুর সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু সুলতান সময় মত আসিতে পারিলেন না। চাঁদবিবি একলাই তাঁর বিচ্ছিন্ন সৈন্যবল একত্রিত করিয়া মোগলবলের বিপক্ষে কটীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে যুবরাজ মুরাদ সৈন্য-সামন্তে নগর বেষ্টন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত, কিন্তু রাণী কিছুতেই বিচলিত হইবার নন। প্রত্যহ অশেষ সঙ্কটের মধ্যে

কেল্লা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বলাধানের উপায় চিন্তা করিতেছেন। মোগলখণিত দুইটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৃতীয় আর একটা সুড়ঙ্গ ছিল তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য চালাইবার পূর্ব্বেই শত্রুগণ তাহা উড়াইয়া দেওয়াতে সেই সঙ্গে অনেক দুর্গপালবিনষ্ট হইল, প্রাচীরে বৃহৎ ছিদ্র দেখা গেল, লোকেরা প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত চাঁদবিবি কবচ ধারণ পূর্ব্বক মুখের উপর একটা ঘোমটা ফেলিয়া খোলা তরবারে সেই স্থানে গিয়া উৎসাহ বাক্যে সকলকে ডাকিয়া আনেন—তাঁহার দৃষ্টান্তে ভীরুও সাহস পাইল, গুলি গোলা তীর যাহা কিছু ছিল শত্রুদের উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য পিছু হটিয়া গিয়া সেদিনকার মত নিরস্ত হইল। চাঁদবিবি সে রাত্রে সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছেন। পরদিন প্রাতে মোগলেরা দেখিতে পাইল প্রাচীরের ছিদ্র অনেকটা বুজিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ, নূতন সুড়ঙ্গ না করিলে আর প্রবেশের পথ নাই। যুবরাজ ভাবিলেন গতিক বড় ভাল নয়, প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, যদি বহ্রাড় (Berar) প্রান্ত দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদবিবি বিজাপুরের সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। যুবরাজ ও অল্পস্বল্প ফললাভে সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন। সুলতানা সেবারকার মত যেন কোনপ্রকারে নিস্তার পাইলেন কিন্তু সে অল্পকালের জন্য। তাহার দুই বৎসর পরে মোগলেরা ফিরিয়া আসিয়া আবার নগরের উপর হল্লা করিল। এবার রাজ্ঞী আর শত্রুহস্ত এড়াইতে পারিলেন না। তিনি দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শত্রু তাহার উপর আবার গৃহ বিচ্ছেদ; চাঁদবিবি দেখিলেন এবার আর রক্ষা নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলের সঙ্গে সন্ধি সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই গোলযোগে একজন বিদ্রোহী সৈনিকের হস্তে রাণী প্রাণ হারাইলেন; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রু হস্তে নিপতিত হইল।

চাঁদবিবি ভারতবীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুরের

চাঁদবিবি

সুলতান ইব্রাহিম চাঁদবিবির নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী—তাঁহার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি সুলতানার নামে যে একটি স্তুতিগীত রচনা করেন তাহা এই স্থলে ভাষান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। †

সুরকাননে অপ্সরা—আছে নানা,
নরভবনে রূপবতী—কত আছে।
বিজাপুরের রাণা চাঁদ—সুলতানা,
রূপে সবাই হার মানে—তাঁর কাছে॥
সদা সাহস ধ্রুব তাঁর—ঘোর রণে,
গৃহে শান্তি দয়া যেন—শোভমানা।
আহা, করুণা কত তাঁর—দীনজনে,
বিজাপুরের রাণী চাঁদ—সুলতানা॥
যথা ফুলের মাঝে চাঁপা—সেরা মানি,
তরু মাঝারে সহকার—সবে জিতে।
তথা রাণীর মাঝে রাণী—চাঁদ রাণী,
কেবা পারে গো তাঁর গুণ—বাখানিতে॥
যিনি জননী সম স্নেহে—স্বভবনে,
মোরে বিদেশে পালিলেন—সযতনে।
আমি দ্বিতীয় ইব্রাহিম—স্মরি সে কথা,
তাঁর চরণে সঁপিলাম—স্মরণ গাথা॥

আহমদনগর মোগল রাজ্য ভুক্ত হইল কিন্তু তাহা দিল্লীশ্বরের হস্তে অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। দিল্লীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। মোগল হইতে মারাঠী অধিকার, পরে যখন পেশওয়াকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইংরাজেরা পশ্চিম ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন, তখন আহমদনগরও ইংরাজরাজ্যে আসিয়া মিলিত হইল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম

সে আজ কত দিনের কথা—একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তিনজনে তেতালার ঘরের খাটের উপর কেহ বসিয়া কেহ শুইয়া গল্প করিতেছিলাম। শ্রীমতী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী বলিলেন যে "দেখ আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করিলে দেশের ও জনসাধারণের অনেক কায করিতে ও করাইতে পারি। মনে কর তোমার স্বামী ডাক্তার,—কোন দরিদ্র বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাইতেছে তুমি স্বামীকে বলিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলে। কাহারও স্বামী ব্যারিষ্টার—স্বামীকে বলিয়া সুবিচারের প্রার্থী কোন দরিদ্রের তিনি কাযটী উদ্ধার করিয়া দিলেন।" সকল কথা মনে নাই কিন্তু বেশ মনে পড়ে সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে আমরা এই কথাবার্ত্তায় এমন নিমগ্ন ছিলাম যে কখন সে ঘর চাঁদের আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতেও পারি নাই। সে দিনের আর সব কথা ভুলিয়া

† বোম্বাই চিত্র পৃঃ ৩৩৯—৩৪৩।

গিয়াছি কেবল সেই চাঁদের আলো মনে আছে আর মনে আছে তাহার অল্পদিন পরেই শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সখি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদের কথোপকথন স্থলে সেদিন স্বর্ণকুমারী দেবী উপস্থিত ছিলেন না,—অথচ এই একই সময়ে এই স্ত্রীশক্তির ভাবটি তাঁহার মনে স্বতঃ জাগরিত হইয়া উঠে—এবং আমাদের কল্পনা জল্পনা তাঁহার যত্নে কার্য্যে পরিণতি লাভ করে। সখিসমিতি স্থাপিত হয়—১২৯৩ সালের বৈশাখে;—ইহার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েতে মেয়েতে আলাপ পরিচয় দেখাশুনা মেলামেশা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা—বিধবা রমণীকে সাহায্য করা, অনাথাকে আশ্রয়দান, ইত্যাদি।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কার্য্যে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। সে সময় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী কয়েকটী অনাথা বালিকাকে নিজ গৃহে স্থান দিয়া সযত্নে তাহাদের লালনপালন ও লেখা পড়া শেখানর ভার লইয়া মাতাকে সাহায্য করিতেন। সে সব অনেক দিনের অনেক কথা, বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়। সকল কথা মনেও নাই; কেবল মনে আছে শিল্প মেলার কথা—সে কি আনন্দ সে কি উৎসাহ! নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে অটল ধৈর্য্যের সহিত কায করিয়া কয়েক বৎসর পরে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন, আর সখি-সমিতি লোপ পাইল।

আজ কয়েক বৎসর হইল শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী সখি-সমিতির একটী উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া মহিলাশিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এই আশ্রম হিন্দু বিধবা নারীর উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ কাল ৩০ জন হিন্দু বিধবা বালিকা ও রমণী হিন্দু আচার ব্যবহারে পালিত হইয়া লেখা পড়া ও শিল্পাদি শিক্ষা করিতেছে। ঝাড়ন গামছা সাড়ী রেশমী কাপড় মোজা গেঞ্জি লেস্ ও সদাসর্ব্বদা ব্যবহারের বস্ত্রাদি তাহারা নিজেরা প্রস্তুত করিতেছে।

একালে আমাদের দেশেও ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র যে কেহ জামা মোজা গেঞ্জি কোর্ত্তা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দোকানে দৌড়িতে হয়, যাঁহাদের ঘরে ছেলে পিলে আছে যাঁহারা সর্ব্বদা দর্জ্জির সহিত কারবার করেন, তাঁহারা জানেন সে কি বিষম ঝঞ্চাট! প্রথম ত দর্জ্জি কাপড় না চুরি করিতে পারে এ জন্য খরদৃষ্টি রাখা দরকার,—দ্বিতীয়তঃ অসম্ভব রকম মজুরী হাঁকিলে তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে হয়, সবশেষ ও শ্রেষ্ঠ ভাবনা দর্জ্জি কি যে তৈয়ার করিয়া আনিয়া তারিফ্ করিয়া দেখাইবে তার ঠিক নাই। যখন জ্যাকেট করিতে গিয়া বালিসের খোলটি হাতে ঝুলাইয়া ভারি প্রশংসায় চক্ষে সে দেখে ও দেখায় তখন হাড় শুদ্ধ জ্বালা করে। অনেকে বলিবেন, ওসব "বিলাসিতা" ছাড়িয়া দিলেই জ্বালা ঘোচে।—মেয়েদের বেলায় তা যেন হইল—আমরা যেন মাতামহী পিতামহীদের পরিচ্ছদের দৃষ্টান্ত অনুকরণের জন্য "ফিরে চল ফিরে

চল ভাই” বলিয়া গাইতে গাইতে ফিরিয়া যাইব; কিন্তু মোজা গেঞ্জি পাঞ্জাবী কামিজ চাপকান্ কোট প্যাণ্ট পুরুষদের নিত্য ব্যবহার্য্য সকলই ত চাহি। সুতরাং দেখা যাইতেছে মেয়েরা সেলাইএ অভ্যস্ত হইলে সংসারের বিস্তর ঝঞ্ঝাট কমিয়া যায়। ধনী দরিদ্র প্রত্যেক রমণীরই সেলাইএ দক্ষতা থাকা যে উচিত এ কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন।

শিল্পাশ্রমে যে কেবল বিধবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নহে, সধবা বালিকাগণও ইচ্ছা করিলে সেখানে গিয়া প্রত্যহ লেখাপড়া এবং শিল্প শিক্ষা করিতে পারেন। মহিলাশিল্পাশ্রমের ছাত্রীগণ তাঁত বোনা হইতে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত জ্যাকেট ফ্রক রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে।

এমন যে আবশ্যকীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে তাহার আদর কই?

চিরদিন কল্যাণময়ী নারীর সুকোমল হস্ত ও স্নেহপ্রবণ হৃদয় সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের দেশে বিধবা হইলেই আর সে নারীর আদর থাকে না—তখন সেই কল্যাণময়ী সকলের চক্ষে চির অকল্যাণী বলিয়া প্রতিভাত হয়।

যখন বিধাতার নির্ব্বন্ধে কল্যাণী নারী দৃঢ় বন্ধন মুক্ত হইয়া দশজনের সেবার জন্য নিজের হৃদয় মনকে প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পায়, তখন সেই বিধবা অকল্যাণী বলিয়া আত্মীয় জনের গলগ্রহ ও হতাদরের হইয়া তাহার জীবনকে ব্যর্থ জীবন মনে করিয়া কোনমতে দিন যাপন করিতে থাকে। এই সকল বিধবাদের জীবন যে ব্যর্থ নহে ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের যে কতখানি মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এইজন্য অর্থাভাবে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। সামান্য ।০ মাসিক চাঁদা আদায় করিতে কিরূপ কষ্ট পাইতে হয় তাহা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও কর্ম্মকর্ত্রীগণ বিলক্ষণ জানেন। এই পতি-পুত্রহীনা বিধবাগুলি যেন তাঁহাদেরি অবশ্য পোষ্য, দেশের আর দশজনের সহিত যেন কোন সংশ্রব নাই। এ যে দশজনের কায—তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? একটী ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে সে যে তোমাদের দশজনের কায করিয়া নিজে ধন্য হইবে—এই মাতৃস্বরূপিণী বালিকারা যে দেশের দশজনের সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে ইহা যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন তবে ইহার উন্নতি বিধানে মুক্ত হস্ত হইতে কি কুণ্ঠিত হইতে পারেন? আমরা অবরোধে বাস করি—নিজ নিজ পিতা পুত্র ভ্রাতা ও স্বামীর সংসারই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র,—তদভাবে নিকট আত্মীয় যদি স্থান দান করেন তবে কোনমতে মান রক্ষা হয় বটে, কিন্তু প্রাণ রক্ষা হয় অনেক কষ্টে!—এই পরের গলগ্রহ আপদকে কি কেহ স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারে? এ দৃশ্য যে ঘরে ঘরে! এই জন্য এদানী অনেক ভদ্রঘরের দরিদ্র বিধবাকে হীনকার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতে দেখা যায়। আত্মীয়গণের নিকট দাসী বৃত্তি করিয়াও যখন অনেক স্থলে

মিষ্টভাবে আধপেটা জোটে না তখন অগত্যা পরের ঘরে দাস্যবৃত্তি করিতে যাওয়া ভাল বলিয়া মনে হয়।

পরের ঘরে দাসী বৃত্তি করিতে গেলে ভদ্র অভদ্র বিচার থাকে না, দরিদ্রতা অভদ্রতা নামে অভিহিত হয়, কাযেই হীন ব্যবহারে হীন বৃত্তিতে মনটাও কেমন নীচ হইয়া পড়ে। যে রমণী আজ ভ্রাতৃগৃহে স্থান পাইলে একাহারে অক্লান্ত পরিশ্রমে হাস্যমুখে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত—সে রাঁধুনি বৃত্তি গ্রহণে কেমন করিয়া তেলটুকু সরাইব কেমন করিয়া নুনটুকু সরাইব এই চেষ্টায় বিব্রত থাকে। বিলাতের কত শত নারী আজীবন কুমারী থাকিয়া নিজ উপার্জ্জনে ধর্ম্ম কর্ম্ম, পরের সেবা, কত কত কায করিয়া থাকে। কত মহীয়সী নারীর কথা শুনা যায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কুমারী। আমাদের দেশে তাহা হইবার যো নাই। কিন্তু নাম মাত্র বিবাহ হইয়াছে—বালিকাব সে দিনটার কথাও হয়ত মনে নাই এখন বিধবাও আছে, তবুও তাহারা কুমারী নহে বিধবা। এই সকল বালিকারা স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া যাহাতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় এই জন্য বিশেষ করিয়া এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রায় ১৯।২০ জন সধবা বালিকাও প্রত্যহ আসিয়া শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া যাইত, তাহাদের জন্য তখন গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যেখানে প্রত্যহ সহস্রাধিক ছাত্রী আসা উচিত সেখানে এই ১৯।২০টি মাত্র ছাত্রী! ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে মেয়েদের শিক্ষার জন্য এখনও কেহই ততদুর চিন্তা করেন না। যখন উন্নতি উন্নতি করিয়া দেশের আবাল বৃদ্ধ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন তখনও ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে প্রথমে গাছটির যত্ন করিলে তবে ফলটি ভাল পাওয়া যাইবে। এত অল্প ছাত্রীর জন্য যে ব্যয় হইত তাহা সমিতির পক্ষে সাধ্যাতীত হওয়াতে এখন আর দৈনিক ছাত্রী লইবার গাড়ী নাই। তবে ইচ্ছা করিলে কেহ নিজের গাড়ীতে গিয়া শিল্পশিক্ষা করিতে পারেন। পূর্ব্বে শিল্পাশ্রম কলিকাতার মধ্যেই ছিল,—এখন ল্যান্সডাউন রোডে উঠিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সকলেই গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী

স্বভাব

জানি যাবে কুসুম শুকায়ে,
তাপ গেলে হইবে শীতল,
সুখ আছে দুঃখ পিছে লয়ে,
বলীও সে হবে দুবর্বল।

জানি আছে জীবন মাঝারে
আমরণ বিরহ মিলন,
তবু বলি হাসি বারে বারে
তুমি আমি রব অনুক্ষণ।

শ্রীলীলাদেবী

চীনরমণীর প্রেমপত্র

একজন চীনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "চীনে রমণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না কেন?" তিনি কিছুকাল হতবুদ্ধি হয়ে থেকে বলেছিলেন "চীনের রমণী! তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেই না—তারা কেবল চীনেদের মাতা, সম্ভবতঃ এ ছাড়া তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু চিন্তাই করে না।"

সত্যই চীনের নারীসমাজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত—তারা তাদের স্বামীর ও পুত্রের পিছনে লুকিয়ে থাকতেই ভালবাসে, তবু প্রাচ্য জাতির পিতা মাতার প্রতি অগাধ ভক্তি আছে ব'লে তারা পুরুষের উপর অগাধ আধিপত্য বিস্তার করে আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশের রমণীর চেয়ে চীনের রমণীদের সম্বন্ধে খুবই সামান্য কথা জানা যায়। অন্য দেশীয় সাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে তাদের কথা জানা একপ্রকার অসম্ভব। চীন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে সাধারণত নীচজাতীয় চীনেদিগকে লইয়াই—কারণ ভ্রমণকারী অথবা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত যাহাদিগের মেলা মেশা হয় তাহারা প্রায়ই সামান্য লোক। ভ্রমণকারীরা কুলী রমণী দেখেন অথবা নৌবিহারিণী নারীদের সম্বন্ধে কিছু শোনেন ও দেখেন—কিম্বা চা'র দোকানে শোভন পরিচ্ছদপরিহিতা নর্ত্তকী বালিকার অঙ্গসঞ্চালনে মুগ্ধ হন। কিন্তু প্রকৃত চীনে রমণী—তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, সংসার ধর্ম্ম এ সমস্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস নিম্নের পত্রগুলি চীনে রমণীর জীবনের কিছু পরিচয় দিতে পারবে। এগুলি চীনের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী যখন প্রিন্স চুংএর সহিত ভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পত্নী কুই-লি তাঁকে লেখেন।

চীনেও আমাদের ন্যায় ছেলেরা বিয়ে ক'রে পত্নীকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে আসে—সেখানে তাদের স্বামীর মাতার ইচ্ছানুসারে চলতে হয়। এঁরা ইচ্ছে করলে পুত্রবধুর পক্ষে স্বামীগৃহ নন্দন বা নরক দু'ই করে তুলতে পারেন। কুই-লির পিতা chihliর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ইনি চীনের নবভাবের শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তনের একজন প্রধান উদ্যোগী,—ইনি কন্যা ও পুত্রকে সমভাবে শিক্ষিত করেন। কুই লি তাঁহাদের প্রদেশের বিখ্যাত কবি Ling-wing-puর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এঁর নিকটেই ইনি কল্পনা ও ভাব বিকাশের ক্ষমতা লাভ করেন।

(১)

প্রিয়তম আমার!

পাহাড়ের উপরের বাড়ীখানি যেন তার সকল সৌন্দর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। আমার কাছে সবই শূন্য বোধ হচ্ছে, ছাদে উঠে অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের কনকরশ্মির পানে চেয়ে থাকি—তখন মনে পড়ে তুমি কাছে নাই—উদয়াস্ত এখন সবই আমার সমান, কিছুতেই আনন্দ পাই না।

তুমি কিন্তু ভেবো না আমি অসুখে আছি। তুমি এখানে থাকতেও যেমন কাজ কর্ম্ম করতুম—এখনও তেমনই করি—শুধু মনে হয় তোমার কথা,—তুমি কাজগুলো সুনির্ব্বাহিত দেখলে কত সুখী হতে! 'মে-কি' তোমার চেয়ারখানা সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কারণ সেটা নাকি বড্ডো ভারী—আমি তা বারণ করেছি, ঐ চেয়ারে তুমি বসতে—ঐখানে বসে ধূম পান করতে, বই পড়তে, আমি সব সময়ই তাই দেখতে পাই—ওখানা আমার নিকট কত প্রিয়—কত মধুর। 'মে-কি' ছাদের উপর সেই সরু ছোট্ট পাইন গাছটা এনেছিল—আমি সেটা

তাকে নীচে উঠানে রাখ্‌তে বলেছি। তুমি বলেছিলে—'ওগুলো যেন বাল্যেই ঘূণে ধরে বৃদ্ধের মত দেখায়। আমিও এক সময়ে টবের গাছগুলোকে বড় ভাল বাসতুম—কিন্তু এখন তোমার চোখে দেখতে শিখেছি। প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত তরুর চেয়ে মানুষের চেষ্টাকৃত কৃত্রিম অর্দ্ধাঙ্গ তরুর শোভা কিছুই নয়।

খুব বড় চিঠি লিখে ফেল্‌ছি যে তোমাকে! তুমি আমায় ৭ দিন পর পর চিঠি লিখতে বার বার বলে গিয়েছ—সংসারের কথা আমার কথা সবই জানতে চেয়েছ। তোমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী যেন এটা পছন্দ করেন না—যে আমি তোমার কাছে চিঠি লিখি—তিনি বলেন তাঁদের সময়ে এ কেউ কল্পনাতেও আন্‌তে পারত না—আজকালকার মেয়েরা লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছে। প্রিয়তম—তোমার আফিসের খামগুলি যেমন নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেল তেমনই ভাবে এ চিঠি খুলো না এ চিঠির এক একটা অক্ষরের সঙ্গে আমার হৃদয়ের এক একটা অংশ তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।

তোমারই—'কুই-লি।'

(২)

প্রিয়তম আমার!

প্রথম পত্রখানিতে শুধু দুঃখ নৈরাশ্যের কথাই ছিল; নূতন নূতন তোমাকে ছেড়ে মন কেমন হয়েছিল বুঝতেই পার? এক সপ্তাহ কেটে গেছে—অন্তরের দুঃখ শুধু আমিই জানি। তোমার মা ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে দিয়েছেন, পূর্ব্বে তিনি আমায় যেমন বালিকা ভাব্‌তেন—এখন আর তেমনটী ভাবেন না—এই ভেবে আমি বড় সুখী হয়েছি।

প্রথম যেদিন আমি স্বামীর সংসারে আসি সে দিনের কথা সদাই আমার মনে জাগে। আমার পক্ষে এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে পিতা মাতা শুধু হাতে আমায় অন্যত্র পাঠাচ্ছেন না। বিবাহের মিছিল প্রায় ১ লি* দীর্ঘ হয়েছিল। আমি দেখ্‌ছিলাম—বহু কুলী আমার নূতন সংসারের জিনিস-পত্র বয়ে আন্‌ছে। ভারবাহীরা যখন বহু বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত রেশমী চাদর, বহুমূল্য আসবার পত্র নিয়ে আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল—আমি ভাবলুম সব আমার নূতন গৃহে যাচ্ছে—ভগবান করুন যেন আমিও সেখানে সকলের ভাল চোখে পড়ি। যথা-সাধ্য সাহস সঞ্চয় কোরে তোমার সম্মুখে দাঁড়ালেম—কেমন বেশ ছিল আমার মনে পড়ে—সোনার কাজকরা রেশমের পোষাক পরে—মুক্তাবাঁধা চুলগুলি নিয়ে ব্রেসলেট্ ও আংটি ভারাক্রান্ত হাতখানি নিয়ে এই বালিকা তোমার সম্মুখে তার সকল সাহস সঞ্চয় করে দাঁড়াল বটে—কিন্তু ভয়ে সে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠ্‌ছিল। এই মাত্র সে পিতা মাতা—তার সব ভালবাসার জন ছেড়ে এসেছে—জানে না সে এখানে কেমন ব্যবহার পাবে—যদি সুনজরে না পড়ে তবে কত দিন অসহ্য যাতনা ভোগ করতে হবে?

আমরা যখন তোমার পিতামাতার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসেছিলাম—তখনই

* ১ লি প্রায় ⅓ মাইল।

সর্ব্ব প্রথম আমি স্বামীর মুখ দেখলাম—! তোমার কি মনে পড়ে—যখন ঘোমটা খুলে তুমি একদৃষ্টে আমার চোখের পানে চেয়ে ছিলে? আমি ভাবছিলাম্ "সে কি আমায় সুন্দরী দেখবে?" ভয়ে আমি তোমার দিকে ভাল কোরে চাইতেও পারি নি, এক মুহূর্ত্তের জন্যে চেয়ে দৃষ্টি অবনত হয়ে গেল আর তাকাতে পাল্লুম না—। সেই মুহূর্ত্তেই দেখেছিলেম—তুমি সুন্দর সুপুরুষ—চক্ষু দু'টী সুন্দর— বর্ণ উজ্জল—দন্তপাঁতি মুক্তার মতো—আমি অন্তরে বড় সুখী হয়েছিলাম,—কারণ অনেক কনের কথা জানি যাদের বরের মুখ দেখে কাঁদতে ইচ্ছা হয়েছে—কারণ - তারা বুড়ো এবং বড় কুৎসিত-স্বামী পেয়েছে। ভেবেছিলাম যদি এঁর সুনজরে পড়ি তবে কত সুখী হতে পার্ব্বো।—আমার বিশ্বাস যাঁদের ছেড়ে এসেছি -তাঁদের ভুলবার জন্যই তোমার পূজনীয়া মাতৃদেবী—আমার হাতে ভাঁড়ারের চাবি দিয়েছেন, তিনি বলেন, "যে সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকে সে দুঃখ করবার অবসর পায় না"—আমি সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকি। ভোরে উঠে—দেখি চুল ঠিক আছে কি না—তার পর এক পেয়ালা চা নিয়ে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। ভোরের ভোজন ব্যাপার মিটলে আমি পাচক ও চাকরকে সব জিজ্ঞাসা করি। মাছ তরকারী সব নিজে দেখে নি—এবং সব জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করি।

আমি চাবির গোছা নিয়ে ঘুরে বেড়াই —আর যখন ভাঁড়ারের দ্বার খুলি তখন আমার মনে ভারী আনন্দ হয়—কেন জানি না—বোধ হয় এইটা ভেবেই যে, এই গৃহের আমিই কর্ত্রী। চাকর বা ঝি কারো অসুখ হলে আমি সব কাজের বন্দোবস্ত ঠিক করে দেই—তার পর মালীর সঙ্গে বাগানে গিয়ে ফুল গাছ সব দেখি। পাহাড়ের গায়ে যে ফুলগুলি জড়িয়ে থাকে ঐগুলি আমি বড় ভালবাসি—। তুমি যে পথে গিয়েছিলে সেই পথের পানে একদৃষ্টে আমি চেয়ে থাকি।—সেই ভোরে তুমি সহরের দিকে যাত্রা কোরেছ—এই পথ দিয়ে আবার এই পথেই ফিরে আসবে - সেই আশায় চেয়ে থাকি।

তোমারই আশায় আছি—

তোমার ভালবাসার

আমি তোমারই——পত্নী—

(৩)

প্রিয়তম আমার!

দিনগুলি একই ভাবে কাট্‌ছে। তোমায় বলবার মতো নূতন খবর কিছুই নাই। সকাল বেলাটা সব গৃহস্থের মতো সাংসারিক কাজেই কেটে যায়। তার পর তোমার মা ঘুমুলে আমি ও তোমার ছোট বোন ছাদে যাই। মা-লি ও আমি সেখানে বহুক্ষণ সেলাইয়ের কাজ নিয়ে থাকি, আমরা কৃষাণদের খালের ভিতর থেকে কাদা উঠিয়ে জমিতে ছড়াতে দেখি—হংস-পালককে হাঁসের পাল নিয়ে লম্বা বংশদণ্ড হাতে কর্কশ কণ্ঠে হাঁসের পাল তাড়াতে দেখি। কখনও বা বিবাহের মিছিল যেতে দেখি —আবরণে ঢাকা কনের আসনখানি থেকে কনেটীকে দেখবার প্রয়াস্ অনেক সময়ই

ব্যর্থ হয়। কখনও বা শবযাত্রী দর্শন করি—মৃতের সঙ্গে কেউ হয় তো পয়সা ছড়াতে ছড়াতে চলেছে—মৃতের আত্মা তৃপ্তি লাভ কোর্‌বে এই উদ্দেশ্যেই এ দান।

এস্থান এখন বড়ই সুন্দর। শরতের প্রকৃতি একটা নূতন সৌন্দর্য্যে দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে - এখনই শীতের ভয়ে ভীত হয়ে পতঙ্গকুল যেন তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সঙ্গীতটুকু শেষ কোরে নিচ্ছে। বন্য হংসীরা দক্ষিণাভিমুখে যাচ্ছে। কিছুই যেন ভাল লাগে না—চক্ষু আমার অজ্ঞাতসারে জলে ভরে আসে,—কেন বুঝি না—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সকাল সন্ধ্যা তোমার বিহনে কিছু ভাল লাগে না আমার,—এ দীর্ঘ দিন কি ফুরাবে না—

তোমারই—সেই।

(৪)

প্রিয় আমার!

তোমায় অনেক কথা বলতে যাচ্ছি। এর পূর্ব্বের পত্র পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই অসুখী হয়েছ—এ পত্রে আশা করি তুমি সুখী হবে। তোমার ভাই সি-পের বিবাহ শীঘ্রই হবে। তুমি জান chih-leর শাসনকর্ত্তার কন্যা লি-টির সঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার ভ্রাতার বিবাহ স্থির হয়ে রয়েছে—কনে শীঘ্রই এখানে আসছে। আমরা তার সব বন্দোবস্ত কচ্ছি। জানিনা তার সঙ্গে কতটী দাস দাসী আস্‌বে, বেশী কিছু না এলেই ভাল—ভিন্ন দেশের লোক—কিসে কি হবে—সংসারের শান্তি নষ্ট শুধু। আমরা শুনেছি—সে নাকি খুব সুন্দরী—বিদুষী। তোমার মা—তার এ বৌ লেখা পড়া জানে শুনে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি বলেছেন "বেশী লেখাপড়াটা মেয়ে লোকের পক্ষে কিছু নয়" আমি আর তোমার বোন মা-লি খুব সুখী হয়েছি। আমরা মনে মনে ভেবে ভারী সুখী হয়েছি—অবশ্য একথা—নৈশ বায়ুরও কাণ আছে বলে প্রকাশ করিনি—এখন দু'জনার পরিবর্ত্তে তোমার মা'র কথা শোনার তিনজন লোক হলো। তুমি বুঝতে পাচ্ছ—তিনি বেশী কথা বলেন বলে নয়—তবে তিনি কথা বল্‌লেই আমাদের শুনতে হবে বলে।—আরো খবর আছে—একজন নূতন ক্রীতদাসী—আমাদের বাড়ী এসেছে—তুমি বোধ হয় জান আমাদের উত্তর দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। কতকগুলো নৌকা এনে আমাদের খাল ধারেই বেঁধে ছিল। তার ভেতর থেকে একজন বালিকা আমাদের এখানে এসেছে। তার চেহারা বড় সুন্দর, কোঁকড়ান চুলের রাশি—তার মাথা ভরা। নয়নদ্বয় কোমল মধুর। তাকে দেখে আমি ভাল বেসেছি—এমন বন্ধুহীনা সহায়হীনা সে।

সে আমায় বল্লে তারা একবাড়ীতে বহু স্বজন ছিল; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—আত্মীয় সবই ছিল। অন্ন মেলা ভার হয়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসেরই মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হলো, মৃত্যু তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো—অন্নাভাবে মৃত্যু এর চেয়ে আর যা কিছু হয় তাই ভালো! এমন সময় বালিকাদের কেনবার জন্য লোক এল—একজন বালিকা বিক্রী করলে সেই অর্থেই তারা সমস্ত শীত কাটাতে পার্ব্বে—এদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপও অনেক কমে আসবে, একজনকে দিলে সব

বাঁচতে পারে; বালিকার মাতাকে একথা বলাতে মাতা নিজ কন্যাকে বেচতে সম্মতা হলেন না, নিশা তার কাঁদতে কাঁদতে ভোর হতো দিবসে কন্যাকে সব সময় চোখে চোখে রাখ্‌তেন। অবশেষ হতাশ হয়ে একদিন মাতা 'কোরাণ-ইন্‌'এর পূজো দিতে দূরবর্ত্তী মন্দিরে যান। মা গেলে পিতাকে বহু মুদ্রা দিয়ে এই কন্যাটিকে ক্রেতারা নৌকায় তুলে নেয়, পেট যখন শূন্য, গর্ব্ব তখন দূরে পালায়, আর কত শিশু অনাহারে কাঁদছে—একজনের ত্যাগে যদি সকলের অভাব পূর্ণ হয়। আমি এখন তার মা'র স্থান অধিকার করেছি। বড় ভাল বেসেছি তাকে আমি। এমন উজ্জ্বল দিবস—এই স্বর্ণবর্ণ বিচিত্র সূর্য্যরশ্মি—নিশীথে মধুর চন্দ্রালোক—কত ভাবি—তোমার কথা। এমন দিনে তোমার কি একবারও মনে পড়ে না আমায়? সমস্ত নিশা তোমার অপেক্ষায় থাকি আমার বাহু তোমার উপাধান হোক এই আশায় থাকি কিন্তু তুমি কোথায়?

তোমারই অপেক্ষায় আছি প্রিয়তম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

নাগানন্দ ও পার্ব্বতী-পরিণয় নাটক

শ্রীহর্ষের তৃতীয় নাটক "নাগানন্দে" একই প্রকার দোষগুণ পরিলক্ষিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত দুই নাটিকা হইতে উহার প্রভূত প্রভেদ থাকিলেও, ঐ কারণে উহা পৃথক গ্রন্থকারকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া আদৌ সন্দেহ হয় না। মনে হয় যেন কবি নিজ রচনার পিতৃত্ব নিঃসংশয় করিবার অভিপ্রায়ে, স্বরচিত তিন নাটকের প্রত্যেক নাটকে একই প্রস্তাবনা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং একটি নাটকের শ্লোক অপর নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াই ভারতীয় কবিগণ নিজ রচনাদির প্রামাণ্য ও তদাত্ম্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পান।

রত্নাবলীর ষষ্ঠ শ্লোকটি, প্রিয়দর্শিকার প্রথম অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকে, ও নাগানন্দের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এবং প্রিয়দর্শিকার তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকটি নাগানন্দের চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম শ্লোকে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। নাগানন্দ—বৌদ্ধধর্ম্মানুপ্রাণিত একখানি নাটক। এবং অন্য দুই নাটকের নান্দীতে যেরূপ শিব-গৌরীকে আহ্বান করা হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে নাগানন্দের নান্দীতে বুদ্ধকে আহ্বান করা হইয়াছে। একথা সত্য, নাগানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মকে একটু খাটো করা হইয়াছে,—এমন-কি শেষ অঙ্কে নায়ককে পুরস্কার দিবার জন্য দেবী গৌরী আবির্ভূত হইয়াছেন। নাগানন্দের প্রথম অভিনয় কোন্ বৎসরে ও কোন্ দিনে হইয়াছিল, cowell সাহেব তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিউয়েন-সাং একটা মহোৎসবের উল্লেখ করেন; এই মহোৎসব গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসবে শ্রীহর্ষ

ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে মুক্তহস্তে দান করেন। এই মহোৎসব বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। শ্রীহর্ষ, একটি প্রতিমূর্ত্তি বুদ্ধের উদ্দেশে, একটি প্রতিমূর্ত্তি সূর্য্যের উদ্দেশে ও আর-একটি প্রতিমূর্ত্তি শিবের উদ্দেশে, উৎসর্গ করেন। হর্ষের ১৮ জন সামন্ত রাজা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। cowell সাহেবের এইরূপ বিশ্বাস যে, উৎসবের প্রথম দিনে নাগানন্দের অভিনয় হয় এবং তৃতীয় দিনে রত্নাবলীর অভিনয় হয়। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি প্রস্তাবনার এই উক্তিটির উল্লেখ করেন;—"এই নূতন নাটকখানি শুনিবার জন্য রাজারা সমাগত হয়েছেন।" এই অনুমানটি বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচায়ক হইলেও কোন যুক্তির দ্বারা ইহার সমর্থন করাও যায় না, প্রতিবাদও করা যায় না। তথাপি হিউয়েন সাং-এর ২০ বৎসর পরে যে তীর্থ-যাত্রী ভারতে আসিয়াছিলেন,—সেই ইৎ সিং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে রাজা হর্ষ গীত-বাদ্য ও নৃত্য-সহকারে নাগানন্দের অভিনয় করাইয়াছিলেন। উক্ত তীর্থযাত্রী এই নাটকের উল্লেখ করিতেন না—যদি ইহার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব না থাকিত।

দানধর্ম্ম ও আত্মবিসর্জ্জন মনুষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম যে সকল শিক্ষাপ্রদ কাহিনী রচনা করিয়াছে বা প্রচার করিয়াছে তন্মধ্যে বোধিসত্ত্ব জিমূতবাহনের কাহিনী একটি। এই উপাখ্যান "অবদান"-গ্রন্থ হইতে কথা-সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বৃহৎ কথায় ইহার দুইটি বিবরণ আছে (ক্ষেমেন্দ্র—৪র্থ ও ৯ম অধ্যায় ও সোমদেবের ৪র্থ ও ১২শ অধ্যায়); সর্ব্বজনপ্রিয় "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র মধ্যে এই উপাখ্যানটি সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে—এমন কি, মোগোলিয়া পর্য্যন্ত ইহা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নাট্যাভিনয়ের উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে হর্ষ এই উপাখ্যানের মূল-উপাদানগুলির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই। "বেতাল পঞ্চবিংশতি"তে যেমনটি আছে তিনি ঠিক্ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। রাজকুমার জিমূতবাহন, বৃদ্ধ রাজা জিমূতকেতুকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনগমনে পরামর্শ দিলেন। প্রজাগণের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করিয়া, রাজা স্বীয় সিংহাসন তাঁহার উচ্চাভিলাষী আত্মীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া মলয়পর্ব্বতে গিয়া বাস স্থাপন করিলেন। সেখানে জিমূতবাহন সিদ্ধদিগের অধিপতি মিত্রবসুর সহিত মৈত্রীবন্ধন করিলেন। একদা তাঁহার বন্ধুর ভগিনী মলয়াবতী বীণা বাজাইয়া গান গাইতেছিলেন; সেই গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অগ্রসর হইয়া, সেই অপরিচিতা রমণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। মলয়াবতীও তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইল। তাঁহাদের প্রথম মিলনে হঠাৎ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল; কিন্তু পরে অন্বেষণ করিয়া শীঘ্রই আবার পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইল। দেবী গৌরী স্বপ্নে দৈববাণী করিলেন, জিমূতবাহন মলয়াবতীর পতি হইবেন। মিত্রবসু বিদ্যাধরের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন—বিদ্যাধর জিমূতবাহনের পিতা

মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন, আনন্দের সহিত বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু একদিন জিমূতবাহন মিত্রবসুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে একটা অস্থিময় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন; বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—উহা নাগদিগের দেহাবশেষ।

পূর্ব্ব-অঙ্গীকারসূত্রে, প্রতিদিন এক একটি নাগকে পক্ষিরাজ গরুড়ের আহারার্থ উৎসর্গ করা হইত। সেদিন যে নাগের বলি হইবার কথা, জিমূতবাহন নিজ প্রাণ বিনিময়ে তাহাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মিত্রাবসু হইতে দূরে চলিয়া গিয়া সেই বধ্যস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে একটা ক্রন্দন ও বিলাপ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। আজ নাগ শঙ্খ-চূড়ের বলি হইবে—তাহার মাতা তাহাকে লইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়াছে। জিমূতবাহন তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন এবং স্বীয় সঙ্কল্প তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অসাধারণ ঔদার্য্য ও মহত্ব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে সে অস্বীকৃত হইল। এমন কি, এই কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। যখন শঙ্খচূড় দেবারাধনার নিমিত্ত তাহার মাতার সহিত গোকর্ণ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে—সেই সুযোগে জিমূতবাহন গরুড়ের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন,—গরুড় তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার মুকুট হইতে একটা রত্ন আকাশ হইতে ভূতলে স্খলিত হইয়া ঠিক মলয়াবতীর পদতলে আসিয়া পড়িল; ভয়ত্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া মলয়াবতী ঐ রত্নটি তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট পাঠাইয়া দিল। জিমূতবাহনের পিতা মাতা পুত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। শঙ্খ-চূড় মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল, বলির কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন সে গরুড়ের উদ্দেশে ধাবিত হইল। গরুড় বধ্যজনের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। শঙ্খচূড় গরুড়ের ভ্রম গরুড়কে জানাইয়া দিল এবং নিজ মৃত্যু-অধিকারের দাবী করিল। তখন সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। যখন জিমূতবাহনের পিতামাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন জিমূতবাহন মৃত্যুমুখে পতিত। গরুড় নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই সময়ে গৌরী আবির্ভূত হইয়া জিমূতবাহনকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন, এবং স্বর্গ হইতে অমৃতবর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। অমৃতবর্ষণে গরুড়-ভক্ষিত সমস্ত নাগ আবার জীবিত হইয়া উঠিল। এবং গরুড়ও প্রতিজ্ঞা করিল ওরূপ নিষ্ঠুর বৈরনির্যাতন সে আর কখন করিবে না।

রাজা হর্ষের এতটা ভক্তির আবেগ ছিল না যে সেই ভক্তির আবেগে, তিনি স্বপ্রণীত নাটকের পঞ্চ অঙ্ক শুধু বৌদ্ধপ্রবর্ত্তিত মৈত্রী-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শনেই নিয়োগ করিবেন; এবং নাট্যশাস্ত্রের নিয়মের প্রতি তাঁহার এতটা আস্থা ছিল যে, ভরত-আদিষ্ট কোন রস ছাড়া আর কোন রসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার তাঁহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নাগানন্দের তিন অঙ্ক নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানু-

সারেই রচিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে, উপন্যাসের অনুরূপ জিমূতবাহন ও মলয়াবতীর পরস্পর মিলন হইল। নায়ক অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মলয়াবতীর প্রেমঘটিত বিশ্রম্ভালাপ এবং গৌরী স্বপ্নে যে ভাবীপতির কথা বলিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন-বিবরণ শুনিতে পাইলেন। বিদূষক হঠাৎ নায়ক নায়িকার মধ্যে মিলন ঘটাইল। তাঁহারা ভয়ে ভয়ে স্বকীয় অনুরাগ পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন এমন সময় একজন তাপস আসিয়া মলয়াবতীকে আশ্রমে লইয়া গেল। দ্বিতীয় অঙ্কে, মলয়াবতী মদন-তাপে সন্তাপিত হইয়া, তাপ-প্রশমনের জন্য একটী নিকুঞ্জে আসিয়াছেন, এবং সেইখানে একটী মণি শিলায় শয়ন করিয়াছেন; তাপ-প্রশমনের জন্য সখিদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। একটা পদশব্দ শুনিতে পাইয়া মলয়াবতী পলায়ন করিল। জিমূতবাহন এই সময়ে নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া মদনপীড়িত হৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিলেন এবং মণিশিলার উপর উক্ত মলয়াবতীর ছবি চিত্রিত করিলেন। মিত্রাবসু স্বীয় ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে চাহিলেন। জিমূতবাহন তাঁহার নাম জানিতেন না এবং যাহাকে তিনি ভালবাসেন তারও প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন না। সুতরাং তিনি বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। মলয়াবতী তাঁহার কথা শুনিয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিলেন এবং আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। (রত্নাবলীর ৩য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য) মলয়াবতীর সখিরা রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জিমূতবাহন সত্বর আসিয়া মলয়াবতীকে সচেতন করিলেন, আশ্বস্ত করিলেন, এবং নিজ অনুরাগের প্রমাণস্বরূপ তিনি মলয়াবতীর যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন সেই চিত্র মলয়াবতীকে দেখাইলেন। তখন নায়ক নায়িকা শপথ বিনিময় করিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তৃতীয় অঙ্কে, বিবাহের পর তাঁহারা কুসুমাকর উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নাটকের দ্বিতীয় অংশ, বিদ্যাধরের বলিদান ব্যাপারে পরিপূরিত। আখ্যানবস্তুর মধ্যে এইটি মৌলিক উপাদান। এইখানে করুণ ভয়ানক ও শান্তিরস, আদিরসের স্থান অধিকার করিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কের ৬টি দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কের ৭টি দৃশ্য, মুলকাহিনী হইতে সাক্ষাৎ ভাবে গৃহীত। উহার বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভে জিমূতবাহনের সহিত মিত্রাবসুর বিচরণ; এবং গরুড় যখন আত্মবলিদানেচ্ছু বধ্যজনকে লইয়া চলিয়া গেল, সেখানে চতুর্থ অঙ্কের শেষ হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে জিমূতবাহনের পিতামাতার উৎকণ্ঠা, শঙ্খচূড়ের দুঃখ, জিমূতবাহনের মৃত্যু, পুনর্মিলন, গরুড়ের অনুতাপ ও গৌরীর অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শিত হইয়াছে।

নাট্যবিষয়াতিরিক্ত কবিতায় নাগানন্দের অধিকাংশ স্থান অধিকৃত হইয়াছে। উহাতে বর্ণনার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। মলয় পর্ব্বত, আশ্রম, মধ্যাহ্নকাল, (প্রথম অঙ্ক), স্নানের সময় (দ্বিতীয় অঙ্ক), ধারাযন্ত্র সমন্বিত উদ্যান (প্রিয়দর্শী,—দ্বিতীয় অঙ্ক ও রত্নাবলী তৃতীয় অঙ্ক দ্রষ্টব্য), বিবাহ-উৎসব, সূর্য্যাস্ত, (তৃতীয় অঙ্ক), অরণ্য, সাগরের জলোচ্ছ্বাস,

(চতুর্থ অঙ্ক)—এই সমস্ত, পাত্রগণকর্ত্তৃক নহে পরন্তু গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম তিন অঙ্কে নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিবিধ দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকগুলি স্থান উদ্ধৃত হইতে পারে। নায়ক নায়িকা সাধারণ ধরণের প্রেমিক, তাহাদের চরিত্রগত কোন বিশেষত্ব নাই। তাছাড়া, আখ্যানবস্তু দুই অংশে বিভক্ত হওয়ায় এবং প্রথম অংশটি অতি-পরিপুষ্ট হওয়ায় সমগ্রের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের মধ্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। নায়ক নায়িকার সাদামাটা দৃশ্যগুলির মধ্যেও দর্শকের ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ থাকে। যদিও আদিরসের দৃশ্যগুলিতে কোন মৌলিকতা নাই, নাটকীয় কার্য্য-পরম্পরার মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই, তথাপি বলিতে হইবে, দৃশ্যগুলি বেশ গুণপনা ও নিপুণতার সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। কবি আদিরস ছাড়াও যোগ্যতাসহকারে এরূপ রসেরও অবতারণা করিয়াছেন—যাহা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে অতীব বিরল। মৈত্রীভাব, আত্মত্যাগের তৃষা, জ্বলন্ত ভক্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা, মাতৃদুঃখ,—এই সকল ভাব শ্রীহর্ষ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি মূল-কাহিনীর রূপগুলিতে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়া, তাহাতে একটা মৌলিকতার ছাপ দিয়াছেন। জিমূতবাহন একটি বিশেষ চরিত্রের লোক। এই চরিত্রসম্বন্ধে আলঙ্কারিক-সম্প্রদায়দিগের মধ্যে ঘোর তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, এই চরিত্র-সৃষ্টি-সম্বন্ধে, ইহা অপেক্ষা প্রশংসা আর কি হইতে পারে? যেমন ভালবাসায় তৎপর, তেমনি আত্মত্যাগে সতত প্রস্তুত,—এরূপ পুরুষরত্নের চরিত্র আলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে আলঙ্কারিকগণের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

বৈচিত্র্যসম্পাদন ও আমোদ প্রদানের অভিপ্রায়ে শ্রীহর্ষ নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত দুইটি চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বিদূষক আত্রেয়ী ও বিট্ শেখরক। সকল বিদূষকেরই ন্যায়, আত্রেয়ী জাতিতে ব্রাহ্মণ, নির্ব্বোধ, স্থূলবুদ্ধি, ঔদরিক,—সর্ব্বসাধারণের উপহাসের পাত্র। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অনুপ্রাণনায় গ্রন্থকার এই উদ্ভট চরিত্রকে আরও উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে প্রহসনসম্বন্ধে সাধারণতঃ দৈন্য লক্ষিত হইলেও অন্ততঃ নাগানন্দে, ভাঁড়ামী ধরণের প্রহসনের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। বিট শেখরক সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া বিবাহ-উৎসব হইতে বাহির হইয়াছে। বাহির হইয়া বিদূষককে দেখিতে পাইল। বিদূষক ভ্রমরের আক্রমণ নিবারণার্থে একটা অবগুণ্ঠনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছে। শেখরক, অবগুণ্ঠিত বিদূষককে স্বীয় প্রিয়তমা নবমল্লিকা মনে করিয়া, তাহাকে চুম্বন করিল, তাহার সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল। এমন সময়ে নবমল্লিকা আসিয়া পড়িল। বিট তাহার ভ্রম জানিতে পারিল, সেই দাসীর চরণে ভূমিষ্ঠ-প্রণিপাত করিতে বিদূষককে বাধ্য করিল এবং জোর করিয়া তাহাকে সুরাপান করাইল। (তৃতীয় অঙ্ক) একটু পরে, বেচারা বিদূষক আর

একটা ফাঁদে জড়াইয়া পড়িল। নবমল্লিকা, নবদম্পতির সম্মুখে, বিদূষকের মুখে তমাল-পত্রের রস মাখাইয়া, মুখ কালো করিয়া দিল। এই ধরণের প্রহসনের দৃষ্টান্ত একমাত্র মৃচ্ছকটিকাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহার উপর শ্রীহর্ষের নাটকগুলি আরোপিত হইয়াছে—সেই শ্রীহর্ষের আশ্রিত কবি ভান নিজ নামেও কতকগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন। একজন ভাষ্য-কার (নলকম্পু সম্বন্ধে গুণবিনয়গণি; peterson-এর কাদম্বরীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) "মুকুটাড়িতক" নামক একটি নাটকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পার্ব্বতীপরিণয়" নামক আর একটি নাটক বানের রচনা বলিয়া পাঠকের নিকট অর্পিত হইয়াছে। যে কাদম্বরীর প্রামাণিকতা অবিসম্বাদিত, সেই কাদম্বরীর একটি শ্লোকের সহিত, পার্ব্বতীপরিণয়-নাটকের প্রস্তাবনার একটি শ্লোক অভিন্ন; সুতরাং উভয়ের গ্রন্থকার যে একই ব্যক্তি;—এই অনুমানটি কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বান যদি বাস্তবিকই, হর্ষচরিত, কাদম্বরী ও চণ্ডিশতকের গ্রন্থকার হয়েন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার উক্ত নাটকটি অল্পবয়সের রচনা—কেননা ঐ নাটকে কল্পনা ও উদ্ভাবনাশক্তির বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। উহার মতন ঔৎসুক্য-বিহীন নাটক কল্পনা করাও অসম্ভব। উহার পঞ্চম অঙ্ক একেবারে ঘটনাশূন্য; উহা কেবলই কথোপকথন, সংবাদ ও বর্ণনাদিতেই পূর্ণ। তথাপি একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, উহা চিত্তাকর্ষণের যোগ্য বলিয়া মনে হয়। হিন্দু নাট্যসাহিত্যের অন্তর্ভূত আর কোন রচনায় মহাকাব্যের সহিত অতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে শুধু যে আখ্যানবস্তু গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে; কবি পদেপদে কালিদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। ঐ মহাকাব্যের সর্গগুলিকে কবি অঙ্কে-অঙ্কে বিভক্ত করিয়াছেন মাত্র। Mr. Glaser স্বপ্রণীত সংস্করণের পরিশিষ্টে, কুমারসম্ভবের সহিত পদেপদে তুলনা করিয়া উক্ত নাটকের একটি অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ দিয়াছেন। নাটকের প্রথম অঙ্ক মহাকাব্যের প্রথম সর্গের অবিকল অনুরূপ। উহাতে তিনটি মাত্র পাত্র:—নারদ, হিমবৎ ও মেনা; ইঁহারা সম্মিলিত হইয়া শিব পার্ব্বতীর বিবাহ ঘটাইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কটি, দ্বিতীয় সর্গ ও তৃতীয় সর্গের প্রথম অংশের অনুরূপ (২৩ শ্লোক পর্য্যন্ত); তারকার ভয়ে ভীত দেবতারা একটা সভা করিয়া কামকে তাঁহাদের কার্য্যসাধনে নিযুক্ত করিলেন। কাম শিবকে প্রেমাসক্ত করিয়া তুলিয়া, তাঁহার সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিয়া দিবেন। কেননা, এই মিলনে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে সেই তারকাসুরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে। তৃতীয় অঙ্কটি, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গকে অনুসরণ করিয়াছে। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইলেন। নারদ ও রম্ভা আসিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলেন যে, শিব স্বীয় নেত্রানলে কামকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কটি, চতুর্থ সর্গের অনুরূপ। শিব, নন্দীর দ্বারা পার্ব্বতীর সখীদ্বয় জয়া বিজয়ার নিকট বার্ত্তা পাঠাইলেন, পরে স্বয়ং পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন।

তাঁহাদের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পঞ্চম অঙ্কে বিবাহ হইয়া গেল। (কুমার সম্ভব ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গ) রঙ্গমঞ্চে বিবাহের অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হইল। এই দীন চিত্রপটের উপর কবি জগতের ছবি আঁকিয়াছেন, হিমালয়ের ছবি আঁকিয়াছেন, দিব্য আশ্রমের ছবি আঁকিয়াছেন এবং নাট্যশাস্ত্রসুলভ সমস্ত স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন। পাত্রগুলি জড়-পুত্তলিকা মাত্র। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রে কবির অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল—তিনি তাই মনে করিয়াছিলেন, আগাগোড়া নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিলেই বুঝি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করা যাইবে। শুধু ইনি নহেন, তাঁহার পরে অন্যান্য গ্রন্থকারও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগ্‌দত্তা

(৫০)

শ্যাল পল্লবের মর্ম্মর তুলিয়া ঝড়ের হাওয়া বহিতেছিল। আকাশের ইতস্ততঃ কোথাও খণ্ড মেঘ অন্ধকারে চলন্ত পর্ব্বতের মত উদ্দেশ্য বিহীন পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছে, বর্ষণের আয়োজনে ব্যস্ত নহে তাহা তাহাদের গতি হইতেই জানা যাইতেছিল। কমলা নিজের বদ্ধগৃহ হইতে সম্মুখের খোলা ছাদে আসিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া পরিম্লান নক্ষত্র পুঞ্জের পানে একবার তাহাদেরই ন্যায় নিষ্প্রভ দৃষ্টি উন্নমিত করিল, তারপর একটা ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারের দিকে অনির্দ্দেশ্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। অবসাদে হৃদয়প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে, উঠিতে বসিতে বুকের মধ্য হইতে কে যেন দারুণ নিপীড়নে নিপীড়িত করিয়া ক্রমাগত বলিতেছে, 'আর আমি পারি না, আর আমি সহিতে পারি না।' এ প্রবল অস্বীকারের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই, সান্ত্বনা নাই; সমস্ত চিত্ত এ বিদ্রোহের তাপে তাতিয়া উঠিয়াছে, শরীর শুদ্ধ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া যেন সমান তালে কহিতেছিল "আমিও আর এ ভার বহিতে পারিতেছি না।" নিদ্রাহীন কণ্টকশয্যা ত্যাগ করিয়া তাই সে এইখানে মুক্ত আকাশের তলে উদার প্রকৃতির মধ্যে একটু হাঁফ লইতে আসিয়াছে।

কিন্তু অভাগার ভাগ্যের মত এত বড় অভিশপ্ত বস্তু বুঝি জগতে আর কোথাও কিছু নাই। কমলা হৃদণ্ড জুড়াইতে আসিল, সেটুকু যেন ভাগ্যবিধাতার প্রাণে সহিল না, সেই ঘন অন্ধকারের একটা প্রান্তকে বিদারণ করিয়া অকস্মাৎ উষা প্রকাশের আলো আকাশ প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু—না এ আলো ত দিবাগমনের সুসমাচার ঘোষণা নহে! এ যেন ঘোরতর অমঙ্গল বার্ত্তা প্রেরণকারী নিশানের মত সুললিত আভায় দক্ষিণে পশ্চিমে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আতসবাজির মত ইহার বিচিত্র ফুলঝরি ঊর্দ্ধে তারকা ফুটাইয়া

ঐযে আবার কেন্দ্রবিচ্যুত গ্রহের ন্যায় মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্যের দিকে ঝরিয়া পড়িল। কমলা শিহরিয়া উঠিল, ঐশ্মশান চিতাবহ্নি নাজানি এই নিশুঁতি রাত্রে কত দগ্ধ গৃহে চিতাশয্যা সাজাইতে আসিয়াছে। হায় সে যদি আজ ঐঘরগুলার একখানায় থাকিতে পারিত!

অগ্নি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অন্ধকার সভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর হইতে দূরে সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল; বজ্র শব্দে বাঁশ ফাটিতে লাগিল, অকস্মাৎ নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া সদ্যঃ জাগরিত ভীত নরনারীশিশুপশুর আর্ত্তকণ্ঠের তীব্র হাহাকার আকাশে বাতাসে দিকে দিকে একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, 'আগুন' 'জল,' 'হায় হায়!' রবে ঘুমন্ত প্রকৃতি চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

মানুষের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া বাতাস অট্টহাস্যে পুনঃপুনঃ সেই দক্ষিণের পথেই আনাগোনা করিতেছিল; গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মাথা নাড়িয়া প্রলয়ের গর্জ্জনগান গাহিতেছে, এতক্ষণকার সুষুপ্ত রাজপথ এক মুহূর্ত্তে বন্যা-তাড়িত জলস্রোতের মত জনস্রোতে ভরিয়া গিয়াছে। কলরব কোলাহলে সকলেই সেই সর্ব্বনাশিনী অগ্নিক্রীড়া দেখিতে ছুটিয়াছে। সর্ব্বনাশের মধ্যেও বোধহয় একটা সুতীব্র আনন্দের স্বাদ আছে। বজ্রধ্বনিতে যখন মুহুর্মুহু বিদ্যুতের তীব্র আলো ভরিয়া উঠে তখন গুরু গুরু কম্পিত গৃহের মধ্যে ভীত শিশু সভয় আনন্দে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া সেই ধ্বনির দিকেই কান পাতিয়া রাখে। কমলার অন্তরের মধ্যেও যেন নৈশ মৃত্যুৎসব তেমনি একটি সর্ব্বনাশী আনন্দের দোলা দিতেছিল। মুগ্ধ পতঙ্গের মত তাহার সমস্ত হৃদয়টা সেই অনল পর্ব্বতের দিকে ক্ষণে ক্ষণে উভয় বাহু বিস্তৃত করিয়া দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, পিপাসী যেন শীতল নির্ঝরের পানে তাকাইয়া আছে,—এমনি ভাবে তাহার দুই লুব্ধ লোচন সেইদিকে নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

নীচে রাজপথে লোকের ভিড় বর্দ্ধিত হইতেছিল, একজন লোক তামাসা দেখিয়া নিজের ঘর সামলাইতে ফিরিয়া যাইতেছে, যাত্রীর দল তাহার নিকট সংবাদ চাহিল, সে ঔদাস্যের সহিত কহিল, বাজারের প্রায় সকল ঘরই ধরিয়াছে, দ্বিতলঘরেও অগ্নিদেবতার অকৃপা নাই! আর একটা খবর সে অতি সহজ কণ্ঠেই বলিয়া গেল। যাহার নির্ঘাত ধ্বনি কমলাকে বিঁধিতে ছাড়িল না। সে শুনিল, সেই দ্বিতল গৃহে ডাক্তার বাবুর নব-প্রসূত শিশু ও শিশুজননী অনলবেষ্টিত। গৃহস্বামী গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছেন, দাসদাসীরা কে কোথায় কে বলিতে পারে, কাঠের সিঁড়ি প্রথমেই জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এতক্ষণ হয়ত ভস্মসাৎ হইয়া গেল, উপরের ঘরে অসহায়া জননীর আর্ত্তকণ্ঠধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকের তুমুল শব্দ ডুবাইয়া ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিতেছে, শিশুকে বুকে লইয়া তিনি পাশবদ্ধ কুরঙ্গিণীর মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, এক কথা "আমার ছেলেটীকে বাঁচাও গো বাঁচাও।" কিন্তু কে এতবড় দুঃসাহসিক আছে যে মৃত্যুর রাজ্য হইতে মাতাপুত্রকে উদ্ধার করিতে আসিবে?

কমলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, পুত্রস্নেহাতুরা মাতার কম্পিত আর্ত্তনাদ যেন

তাহার দুই কর্ণে সহস্র কামান গর্জ্জনের চেয়েও প্রবল শব্দে জাগিয়া উঠিল,—কেহ কি ইহাদের রক্ষা করিবার নাই? ওগো কেহ কি বাঁচাইতে পারে না? দূরে অগ্নি ও বায়ুর আস্ফালন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্যবৎ সে ছুটিয়া শচীকান্তের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। তখন তাহার আর কোন কথাই মনে ছিল না, শুধু সেই অগ্নিবেষ্টিত গৃহের শিশুকন্যা জননীর মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণায় তাহার নারীচিত্তে করুণার হাহাকার উঠিয়াছিল। প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণে অকস্মাৎ জমাটবাঁধা বরফ গলিয়া প্রেমের মন্দাকিনী বহিয়াছে।

শব্দহীন রুদ্ধকক্ষে অতল অন্ধকারের আশ্রয়ে শচীকান্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল, শান্তিহীনের পরমারাধ্যা দেবী আজ যেন তাহাকে বহুদিন-প্রবাসিনী মায়ের মত গভীর স্নেহে কোলে লইয়া শুইয়া আছেন। সুখস্বপ্নে অধর প্রান্ত ঈষৎ হাস্যে বিকশিত। এমন সুখে, আরামে সে বুঝি রতনপুকুর হইতে আসিবার পর আর একদিনও ঘুমায় নাই।

মনের আকস্মিক উত্তেজনার বশে কমলা যখন এই ঘরের দ্বার ঠেলিয়া স্বহস্তঘাতী আত্মার মত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন একবারের জন্য অর্দ্ধ অন্ধকারে সমস্ত ঘরখানার দৃশ্য তাহার চক্ষে মৃত্যুপুরীর ছায়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ঐ অদূরে মরণের নির্দ্দয় ভেরী সঘনে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ বুঝি অভাগিনী জননীর সর্ব্বস্বধন তাঁহারই বক্ষতলে অসহায় ক্ষীণকণ্ঠের যন্ত্রণারোদনে জ্বালা বাড়াইয়া জ্বলিয়া গেল! কমলার সর্ব্বশরীরের মধ্যে আগুনের শিখা ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, সেই আগুনে পুড়িয়া মনটাও বুঝি লোহা হইয়া গিয়াছিল, সে সমুদয় দ্বিধা ভয় ভুলিয়া শয্যাতলে শায়িত শচীকান্তের নিকটে ছুটিয়া আসিল, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "শোন, একবার ওটো"। নিদ্রিত তখন বড় মধুর সুখে বিভোর ছিল। স্বপ্নে সে অপ্সরাসেবিত নন্দনের চারু উপবনে দাঁড়াইয়া। অদূরে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র শোভা, পারিজাতের অপূর্ব্ব গন্ধসম্ভার, কিন্নরী ললিতরাগিণীতে চিরবসন্তের বন্দনা গাহিতেছিল, সার্থক প্রেমের পুলক বাতাসে আকাশে স্বর্ণসলিলকম্পিত সরসীর বক্ষে এবং শচীকান্তের সর্ব্বশরীরের মধ্যে শিহরণ আনয়ন করিতেছিল। মুগ্ধ প্রেমিক প্রীতি-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উদ্যানের দ্বাররুদ্ধ, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না। এমন সময় কোথা হইতে কোন্ সুরে নারীর কণ্ঠ তাহার কর্ণ কুহরে সমস্ত সঙ্গীতের তাল মান খর্ব্ব করিয়া বাজিয়া উঠিল, পুলকস্পন্দিত বক্ষে সে শুনিল দিব্যাঙ্গনা বলিতেছে "এসো, আমি তোমায় দ্বার খুলিয়া দিতেছি।" আর সে কমলা! ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মুক্ত-দ্বার পথে নক্ষত্রালোক গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার বাহু ঠেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কে ডাকিতেছে "ওঠো, ওঠো শোন একবার শোন।"

ও কে ডাকে? এ কাহার স্বর? দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সে সেই অস্ফুট আলোকে সবেগে চাহিয়া দেখিল, অমরালয় হইতে কি দেবকন্যা এই অন্ধকার মর্ত্ত্যগৃহে

আর্বিভূর্ত্ত হইয়াছে! গভীর বিস্ময়ে তাহার রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠ মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল "কমলা ?"

কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে অধীরতর হইয়া উঠিতেছিল, পলে পলে মরণের রুদ্রহস্ত তাহাদের মধ্যের পাশ কঠিনতর করিতেছিল সে কহিয়া উঠিল "হাঁ আমি কমলা, তুমি ওদের রক্ষা কর।"

শচীকান্ত ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, "কাদের? কাদের কমলা?"

কমলা জানালার নিকট ছুটিয়া গিয়া সশব্দে তাহার কবাট দুখানা খুলিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল নেত্রে বাহিরে চাহিল, অন্ধকার ঘর মুহূর্ত্তে দিবালোকিত কক্ষের মতই তীব্র আলোকে ভরিয়া উঠিল। শচীকান্ত ইহাব ভিতর উঠিয়া গিয়া জানালার নিকট কমলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সেই ভীষণ অগ্নি-পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া শিহরিত ভাবে কহিল "বাজারে আগুন লেগেছে!"

কমলা তাহার কম্পিত অধরের মধ্য হইতে আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল "ওই আগুনে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তাঁর ছেলে নিয়ে উপরের ঘরে আছেন, ডাক্তার বাবু বাড়ী নাই, তাদের কি বাঁচান যায় না?"

শচীকান্ত অগ্নির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল "সম্ভব নয়।" বায়ু গর্জ্জিতেছিল, অগ্নি সাগরতরঙ্গের মত লহরে লহরে গর্জ্জিয়া শূন্য পথে ছুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। কমলার বক্ষশোণিত শীতল হইয়া গেল, রুদ্ধশ্বাসে সে তাহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী শচীকান্তের একখানা হাত সবলে চাপিয়া ধরিল "তুমি ওদের বাঁচাও, ওদের বাঁচাও,—বাঁচাও!"

এই যে ব্যাকুল আবেদনের নির্ভর আত্মনিবেদন ইহার যে কতবড় তাড়িৎ শক্তি তাহা সেই লাঞ্ছিত হৃদয়ই শুধু জানে। ব্যথাজড়তায় যে চিত্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুমূর্ষুর মত শীতল গৃহকোণের মলিন শয্যায় লুটাইয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই অস্তের সূর্য্যে যেন উদয়ের আলোক আসিয়া পড়িল। বিস্ফারিত নেত্রে সে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় কমলার দিকে ফিরিল, তাহার সর্ব্ব-শরীরের মধ্যে পুলকের বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়াইতে ছিল। "তুমি যখন আদেশ করেচ তখন যাবো কমলা? যে অধিকার এক মুহূর্ত্তের তরেও গ্রহণ করেচ, যে দাবী এক মুহূর্ত্তের তরেও তোমার মনে আমার কথা জাগিয়ে দিয়েছে সে আমার অধিকার আমি রক্ষা করতে চেষ্টা করবো কমলা।" তাহার স্বর সঘনে কম্পিত হইতেছিল। একটা উদ্দাম আনন্দে যুদ্ধাভিমুখী বীরের ন্যায় তাহার সারাচিত্ত নাচিয়া উঠিতে লাগিল। কি আনন্দ! আজ এই নৈশ নরমেধ যজ্ঞে কি আনন্দ! মৃত্যুর এই আকস্মিক আবাহনে আজ কি বিপুল পুলক! কি অসীম তৃপ্তি! সে সেই দহনের আলো দিয়া পূর্ণ নেত্রে অকথ্য ভয়ে বিবর্ণ কমলার মুখের পরে চাহিয়া দেখিল, কমলাও সেই সময় অগ্নিরাশি সহিতে অসমর্থ চক্ষু সরাইয়া আনিয়া তাহার দিকে চাহিল, চারিচক্ষে মিলিত হইল, শচীকান্তের হস্ত ত্যাগ করিয়া সে মিনতি পূর্ণ আদেশের সহিত কহিল "তবে যাও—।"

"যাই কমলা"। শচীকান্ত কমলার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ছিনাইয়া আনিল, একটা গভীর সাধকে অতৃপ্ত রাখিয়াই সে নিজেকে

সবলে টানিয়া সরাইয়া লইল, না ছি! ভীত পক্ষীটি যখন আশ্রয় বোধে তাহার বক্ষনীড়ে উড়িয়া আসিয়াছে তখন তাহাকে পিঞ্জরায় পুরিবার কথা, মনের কোণেও আনা কাপুরুষতা। সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। "কমলা একটা কথা, হয় ত এই শেষ কথা বলে যেতে চাই—" শচীকান্ত কমলার দিকে আবার দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। "আমি যাচ্চি তুমি যাদের বাঁচাতে আদেশ দিয়েছ, তাদের রক্ষা করবার জন্য ঐ আগুণের হাপরের মধ্যে প্রবেশ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবোনা জেনো, তবু যদি না পারি, ক্ষমা করো! এই যে যাচ্চি হয় ত আর ফিরে নাও আসতে পারি, যদি আসি? ফুরিয়ে গেল, কিছুই বলবার নেই। কিন্তু যদি নাই আসি যদি এই আমাদের শেষ হয় আমায় একটু দয়ার সঙ্গে বিচার করো। ঐ অগ্নিবেষ্টিত গৃহের প্রাণী-দের জন্য তোমার প্রাণে যে অসীম করুণা আছে তার একটি বিন্দুমাত্র আমার পরে খরচ করো। এইটুকু শুধু মনে করো আমি যা করেচি যা সয়েচি সব তোমার জন্য; তোমায় ভালবেসে, তোমায় আমার বাক্‌দত্তা পত্নী জেনে। তোমায় ভাল না বাসলে আমার আজ এ দশা হতো না, তুমি আমার নও আমার হবে না জানলে এ পাপ আমি করতেম না। আমি বন্ধুর কাছে বিশ্বাসঘাতক কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার বুঝবার ভুলই পাপ।" অদূরে ভীষণ রবে গৃহপ্রাচীর ভূমিসাৎ হইল, অগ্নি গর্জ্জিল, হু হু হু! শচীকান্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

(৫১)

কমলার শরীরে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল অর্থাৎ তাহার বোধ শক্তি, স্মৃতি ধৃতি প্রভৃতি মানসিক শক্তি স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, সর্ব্ব প্রথম তাহার মনে পড়িল সে এই গৃহে কোন অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে? তারপর এ গৃহের অধিকারী নিশ্চিন্ত নিদ্রিত ছিল, তাহাকে কিসের অধিকারে সে ডাকিয়া তুলিয়া কঠিন কণ্ঠে মৃত্যু গহনে ঝাঁপিয়া পড়িতে আদেশ করিল? ঠেলিয়া পাঠাইল? কে দিল এ ক্ষমতা তাহাকে? কে দিয়াছে? কেন সে এমন কাজ করিল? যাহাকে এ পর্য্যন্ত এত দিনের তরেও সে নেত্রাঙ্গিতের এতটুকু কম্পনে বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শন করে নাই, যাহার সাজান অর্ঘ্য পা দিয়া ঘৃণায় ছুড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার জীবনের উপরে তাহার এতবড় জোর? একটা সম্বন্ধের দাবী পর্য্যন্ত যাহার সহিত সে কোনমতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় তাহাকেই অনায়াসে সে নিতান্ত আপনার মত করিয়া মৃত্যুপণে বিদায় দিল? এ কি করিল? কেন এমন করিল? সে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ডাকিল "যেওনা ফিরে এসো, শুনে যাও" কিন্তু হায়! কাহাকে এ বৃথা আহ্বান! বহির্দ্বারের কবাট সজোরে বন্ধ হইবার শব্দ পাওয়া গেল, জনহীন গৃহ উচ্চ গম্ভীর নাদে প্রতিধ্বনি করিল "ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে—"

কমলা পাগলের মত খোলাছাদে ছুটিয়া গেল, এখনও হয় ত সে তাহাকে ফিরাইতে পারে! স্পন্দিত নর্ত্তিত আলোকে দূরে চঞ্চল-গতি পরিচিত মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এখন ডাকা বৃথা, চেষ্টা বৃথা, ফিরাইবার আর উপায় নাই।

সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরক্ষণে সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া গেল, বহির্দ্বার খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ফিরাইবে! কিন্তু পরক্ষণেই চেষ্টা বাতুলের চেষ্টা মাত্র বুঝিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। জানালায় দাঁড়াইয়া নিস্পন্দলোচনে কিছুক্ষণ সেই অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদজলে অঙ্গ বস্ত্র ভিজিয়া সবেগে ভূমে বসিয়া পড়িয়া সে অধীর উচ্ছাসে কহিল "ওকে ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো।"

সারারাত্রি প্রবল বেগে ঝড় বহিল, প্রকাণ্ড তালগাছগুলার প্রকাণ্ড মাথা সে বাতাসে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, দূরে অগ্নির প্রচণ্ড মূর্ত্তি সে বাতাসে ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছিল। আকাশে সাঁ সাঁ করিয়া মেঘের দল ছুটিয়া চলিয়াছে, ধ্বংসালোকের পশ্চাতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ভীষণাকার যমদূতের মত উদ্যতদণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল। কমলার বুকের ভিতরেও এমনি প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল। আগুণের হল্কাগুলা এমনি বেগে হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, চারি দিকে যেন একই প্রবল ভূমিকম্প হইতেছিল, আর্ত্তস্বরে তাহার সমুদয় প্রাণটা কাঁপিয়া বলিতেছিল, "এ আমি কি করেছি, এ কি করেছি।"

ভোরের আলো না ফুটিতে চলন্ত মেঘ স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আকাশ পথের কোনখানে ফাঁক নাই দেখিয়া বজ্রানল মেঘপর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া দেখিতে দেখিতে ধরণী বক্ষে অজস্র ধারায় নামিয়া আসিল। ঊর্দ্ধশিখ অগ্নি নিম্নমুখে মাথা নত করিল, ধূম্ররাশি সবেগে আকাশের মেঘে মিশিতে ছুটিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বাতাসের কাতর আর্ত্তনাদ রহিয়া রহিয়া যন্ত্রণা-কাতর চিত্তের হাহাকারের ন্যায় হাহা করিয়া উঠিতেছিল। সহৃদয় দর্শকের অশ্রুধারা যেন অশ্রান্ত বর্ষণের আকারে পৃথিবীর তপ্তগণ্ডে ঝরিতেছিল। কাল এই বর্ষণের গোটাকত ধারা পাইলে হয় ত কতলোক বাঁচিয়া যাইত; কত হতভাগ্য গৃহহীন হইত না, কিন্তু জগতে সময়ে সহানুভূতি লাভ বড় বিরল।

ঝিয়ের সহিত নীচে রাঁধুনী বামুনের ঘোরতর কোন্দল বাঁধিয়া গিয়াছে, ভৃত্য মধ্যস্থতা করিতে গিয়া গালি খাইয়া তাহা প্রত্যর্পণের বৃথা চেষ্টায় কোলাহল বর্দ্ধিত করিতেছিল। কাহার পদশব্দ শুনিয়া সকলেই একসঙ্গে চুপ করিল, কমলার বক্ষ শোণিত নিশ্চল হইয়া আসিল—সে কি এইবার নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিবে? উঠিতে যেন পা উঠিল না, গতরাত্রির ঘটনা একটা বিরাট ভারের মত তাহার সর্ব্বশরীরকে যেন এই ঘরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়াছিল। হয়ত এতক্ষণ সে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, দালান পার হইল, এইবার বুঝি এই ঘরেই প্রবেশ করিতেছে এখনি সে শুনিবে "কমলা আমি এসেছি।" সে কি করিবে,—ওগো কেহ বলিয়া দাও সে কি করিবে? বলিবে কি "তুমি যাও, তুমি কেন এলে—তুমি যাও!" যদি সে তেমনি করিয়া আজও বলিতে আসে "আমার কমল!" সে উদ্ধত রোষে বজ্র দৃষ্টি হানিয়া

আজও বলিবে কি "তুমি আমার কেউ নও।" হরি এ কি হইল?

যেহ কক্ষে প্রবেশ করিল না, জল স্থল কম্পিত করিয়া বজ্র ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুতের তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়া আকাশের বক্ষ চিরিয়া দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল, বায়ু কাঁদিয়া উঠিল হা, হা, হা।"

পাশের ঘরে কে ওই না দাঁড়াইয়া? এখনই ত সে এই ঘরেই ঢুকিবে? স্বেদজলে সর্ব্বশরীর ভিজিয়া উঠিল, হৃদ্‌পিণ্ড দমফুরান ঘড়ির মত অকস্মাৎ চলিতে গিয়া চলিল না। কেহ প্রবেশ করিল না, খোলা দরজার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র কক্ষ দৃষ্ট হইতেছিল, আনলায় ঝুলান সার্ট, কোট, কলার, টাই, বাতাসে ফুলিয়া দুলিয়া স্থানচ্যুত হইতেছিল। বস্ত্র-মধ্য হইতে একটা অস্ফুট চামেলি গন্ধ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অমনি কমলা অকস্মাৎ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে।

এইবার নীচে একসঙ্গে অনেক লোকের জুতার শব্দ শোনা গেল, কমলা চমকিয়া উঠিয়া পড়িল,—এবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে একবার অসহায় নেত্রে লৌহ গরাদেঘেরা জানালার দিকে চাহিল, পাশের ঘরের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল, আবার কি মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে চাহিতে সাহস হইতেছিল না, প্রতি মুহূর্ত্তেই সেখান দিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে।

শ্রীঅনুরূপা দেবী

প্রতীক্ষা

শ্রান্ত নিদ্রাতুর দেহে বসি আছি আজ!
দূরান্তের বার্ত্তা আসে বাতায়ন-পথে!
নির্ম্মল মধ্যাহ্নদীপ্ত গহন আকাশে
হৃদয় উড়িয়া গেছে অজানা জগতে!
হেরিতেছি সুবিজন নীলিমার পারে
ক্ষীরোদ সরসীজলে ওগো প্রিয়তম,
সুবর্ণ সোপানে কভু কভু ধারাগৃহে
অপার আনন্দে তুমি করিছ গাহন!
পড়িয়াছে গৌরদেহে সৌর রশ্মিমালা
দিগন্ত ঝলসি যায় তার প্রতিচ্ছায়,
আমি পান্থ সে বিদেশে, সেই কল্পপুরে
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি গো তোমার বিভায়
বাসনা কামনা মোর শরীর-ধূলির
স্খলিত হইয়া গেছে যেন জীর্ণ চীর!

অনন্ত আলোক ঘাতে অন্ধ নেত্র-তলে
নাহি জাগে সংসারের সহস্র কুহক;
ভোগের, সুখের শত মরীচিকা রাগে
উদ্‌ভ্রান্ত নাহি হয় প্রাণ অপলক!
মানস অম্বর মোর গিয়াছে খুলিয়া
সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ল'য়ে শান্ত স্থির সার,
হে দেবি, যোগিনি মোর, অতি সন্তর্পণে
খুলি দিলে তব পুণ্য দেবালয় দ্বার!
তোমারি নূপুর রবে কিঙ্কিণি কঙ্কন
শতমুখে উঠে বাজি দেবতা-আরতি;
তোমারি নয়ন হ'তে স্বর্গের ইঙ্গিত
ডাকিছে নিখিল বিশ্ব দেবতার প্রতি!
খুঁজেনা তোমার মাঝে যারা দেবতারে—
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তারা মরে তব দ্বারে!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিকালে আহারাদির পর আমি সেই তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বাবার নিকট গল্প করিলাম। শনৎস্থন তাঁহার সম্বন্ধে যে সব উচ্চ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেই সব কথা শুনিয়া বাবা ত সেই রাত্রেই তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক বুঝাইয়া আমরা দুই ভাই বোনে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলাম।

রাত্রি প্রায় বারটা! কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বক্ররেখায় পশ্চিম আকাশের গায় গড়াইয়া পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নালোকে বাগানের শিশুগাছ ও ঝাউগাছের ছায়া দীর্ঘতর হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, দূরে কোথাও কুকুর ডাকিয়া স্তব্ধ রজনীর সুপ্ততাকে সজাগ করিয়া দিয়া গেল; আমি বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে বসিয়া মনে মনে গত রজনীর ঘটনাবলির আলোচনা করিতেছিলাম, রাত্রি যেমন ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল—আমার অন্তরের চিন্তাও তেমনি গভীর-তর হইয়া উঠিতেছিল! সহসা কোমল-মৃদু করস্পর্শে আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, এসথার আমার নিকটে কখন যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমি অনুভব করিতেও পারি নাই।

কম্পিত শীতল হাত দিয়া আমার বাহু বেষ্টন করিয়া অত্যন্ত মৃদু কোমল স্বরে সে কহিল, "দাদা, আমাদের ক্রমবারের বন্ধুদের উপর আমরা কি অন্যায় কচ্ছি, তাঁদের কি আমরা ভুলে যাচ্ছি না? গত রাত্রির উত্তেজনায় তাঁদের ভয় ও বিপদের কথা আমাদের মাথা থেকে সরে যায়নি কি, দাদা?"

আমি হাসিয়া তাহার ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলির আঘাত করিতে করিতে কহিলাম "ঠিক বলেছ এসথার? এই সব বাইরের ঘটনায় তাঁদের কথা—অনেকখানি ভুলিয়ে দিয়েচে বই কি? কাল সকাল বেলাই আমি ক্রমবারে গিয়ে তাঁদের খবর নিয়ে আসব এখন,—কিন্তু—কালই—৫ই অক্টোবর নয়? মধ্যে আর একটি দিন—তা হলেই সব বিপদ কেটে যায়?"

ভগিনী ম্লান গম্ভীর মুখে, ব্যথিত শ্বাসে উত্তর দিলেন "কিম্বা সব বিপদটাই ঘটে যায়!" বৃক্ষপত্রের অবসরপথ দিয়া ম্লান জ্যোৎস্না তাহার মলিন মুখে পতিত হইয়া মুখখানাকে একেবারে বিবর্ণ পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার বেদনাব্যথিত কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব দুঃখ অনুভব করিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া-উঠিলাম, "হয়েছে কি এস্থার? তুমি এমন করে কথা বলচ কেন?" এস্থার আমার আর একটু নিকটে আসিয়া লজ্জিত কুণ্ঠার সহিত উত্তর দিল "কি জানি, আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে, কেমন যেন মনে হচ্চে—যারা আমাদের ভালবাসার পাত্র তাদের মস্ত একটা বিপদ এগিয়ে এসেছে। আচ্ছা ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা? ওরা আমাদের

এখানে কিছুদিন থাক্‌তে ইচ্ছে কচ্চে কেন ?

আমি উদাসীন ভাবে কহিলাম "সন্ন্যাসীরা ?—ওদের কত রকম ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, নিয়ম আছে, তারি জন্যে নির্জ্জন জায়গা দেখে পছন্দ হয়ে গেল,—কোন বিশেষ কারণের জন্যেই কি রয়ে গেল—তা না ?"

অত্যন্ত ভীত জড়িত স্বরে সে আস্তে আস্তে উত্তর দিল "না দাদা তা নয় ? আচ্ছা তোমার কি মনে হচ্চে না যে জেনারলের বিপদ সম্ভাবনা ভারতবর্ষ বা ঐ ভারতবর্ষীয়দেরই থেকেই ?" এসথারের সন্দেহ আমায় ভাবাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু মনের চিন্তাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না দিয়াই—আমি হাসিয়া কহিলাম "তোমার বিচার করবার ক্ষমতা দেখে আমি ভারী খুসী হয়েছি এসথার ! হতে পারে জেনারেলের বিপদ বা ভয়, ভারতবর্ষ থেকেই—কিন্তু শনৎসুনের সম্বন্ধে তুমি যা ভাবচ—তাঁকে যদি দেখ তাহলে এই ভাবনার কথা মনে করে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়বে। শুক্‌ন রুটি, আর ঘাসের বিছানাই যাঁদের যথেষ্ট বলে মনে হয় সেই সব ত্যাগী মহাপুরুষদের কাছে তুমি কি অনিষ্টের আশঙ্কা করতে পার এসথার ?

যেন একটু সাহস পাইয়া লজ্জিত ম্লান হাস্যের সহিত সে উত্তর দিল "তাহলে আমার এমন বিচলিত হওয়া বা তাঁদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব মনে আনা ভাল হয়নি, দাদা ! কিন্তু তুমি আমায় কথা দাও—বল, কাল সকালেই তুমি ক্রুমবারে যাবে ? আর যদি জেনারলের সঙ্গে দেখা হয় তা হলে এই নবাগত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কথা তাঁকে বল্‌বে ? এঁরা কেন এলেন—সত্যিই কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা তা আমাদের চেয়ে তিনিই বেশী বুঝ্‌তে পারবেন।"

বাহিরে ঠাণ্ডা ক্রমশই বার্দ্ধত হইতেছিল। চাঁদ আমাদের সম্মুখ ছাড়িয়া ছাদের মাথায় উঠিয়া পড়ায় জ্যোৎস্নাও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। আমি কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে কহিলাম, চল ঘরে যাওয়া যাক্—শীত লাগ্‌চে। —তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই রাখ্‌ব—সকালে উঠে প্রথমেই আমি ক্রুমবারে যাব,—আর জেনারলের সঙ্গে দেখা করে এই সন্ন্যাসীদের কথা সব বল্‌ব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমারও একটা কথা আছে,—বাকী রাতটুকু তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমিয়ে নাও—কোন ভয় নেই।" এসথার চলিয়া গেল কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে তাহার মুখের ভাব যতটুকু আমার দৃষ্টিগোচর হইল—তাহাতে মনে হইল বালিকা সান্ত্বনা পায় নাই—গভীর বেদনায় সে মুখ পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছে ! চোখের দৃষ্টি কি নৈরাশ্যময় !—আমার মনে হইল সরলা এসথার যদি একবার সন্ন্যাসীকে দেখিত !

এসথারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহার ভয় ভাঙ্গাইবার অভিপ্রায়েই আমি তাহার ইচ্ছা পালনে সম্মতি দিয়াছিলাম। নতুবা সকাল বেলার অম্লান সূর্য্যালোকে যে উন্নত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছি সেই অহিংসাধর্ম্মাবলম্বী তিনটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আমার আত্মা একান্ত অনিচ্ছুক। ইহাদের মনে যে কোন দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে অথবা ক্রুমবারের সহিত কোন শুভাশুভ

ঘটনায় তাঁহাদের সংযোগ আছে—এ কথা ভাবিতেও আমি নিজে নিজে লজ্জিত হইলাম।

* * *

পরদিন প্রাতরাশের পর এসথারের নিকট অঙ্গীকৃত বাক্য পালনের ইচ্ছায় আমি ক্রুমবারের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বিশেষতঃ আজ আমার সঞ্চয়ের অভাব ছিল না নিতান্ত দীন দর্শনপ্রার্থীর ন্যায় আমায় রিক্ত হস্তে দাঁড়াইতে হইবে না। আজও সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন কৌতূহলের লেশমাত্রও বর্জ্জিত ক্রুমবারবাসী, গতপূর্ব্ব রজনীর ঘটনা সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ, ইহাতে আমার মনে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

ক্রুমবার প্রতিদিনের মতই অচল গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ধ্যানাসীন! পরশ্ব রাত্রে বিশ্বধ্বংসী বিদ্রোহের চেষ্টা তাহার গাম্ভীর্য্যের ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিলেও—তাহার ছাপ মারিয়া দিয়া গিয়াছে। সৌধের স্থানে স্থানে চুণ সুরকি খসিয়া গিয়া ইষ্টক বাহির হইয়াছে। রাস্তার ধারের বড় বড় গাছগুলার কতক কতক অর্দ্ধভগ্ন!

বেড়ার ছিদ্র দিয়া যত দূর দেখিতে পাওয়া যায় পথে, বাগানে, জানালায়, কোথাও মনুষ্য বা মনুষ্যবাসের চিহ্নটিও দেখিতে পাওয়া গেল না। বেড়ার ধারে যে প্রকাণ্ড দেবদারু গাছটা ঝড়ে উৎপাটিত হইয়া রণাহত সৈনিকের মত ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা তেমনিই পড়িয়া আছে, সরাইয়া ফেলিবার কোন বন্দোবস্ত করাও হয় নাই। চারি ধারের উঁচু বেড়াটা ছাড়া আর কোথাও এতটুকু পরিপাট্য বা যত্ন লওয়ার চিহ্নই নাই। স্তব্ধ নির্জ্জনতা মৃত্যুর বিভীষিকার মতই আমার মনে ধীরে ধীরে কোন অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল। সকাল বেলার ঠাণ্ডা বাতাস রাস্তার ধারের ঝরা পাতায় মর্ম্মর রব তুলিয়া যেন কে প্রিয়বিয়োগ বেদনাতুরের ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনি বহিয়া আনিতেছিল। সেই দুর্গপ্রাকারের আদর্শ অনুকৃতি প্রাচীরটা ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় কি না? এই উন্মত্ত দুরাশা মুহূর্ত্তের জন্য আমার চিত্তে স্থান পাইয়াছিল। এসথারের নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জেনারলের সংবাদ পাইতেই হইবে, বাটীর কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় কি? পথের ধারের পাইন গাছের তলায় হস্তস্থ সংবাদ পত্রখানা বিছাইয়া আমি উৎকর্ণ হইয়া, ক্রুমবারের দিকেই বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। দূরে যেন একটা চাবি খোলার আওয়াজ হইল। উঠিয়া বেড়ার ছিদ্রে চক্ষু সংলগ্ন করিতেই দেখিতে পাইলাম জেনারল হিথারষ্টন অত্যন্ত বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে বাহির হইয়া আসিতেছেন, আমি বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার সৈনিকের বেশ। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্ কোম্পানির যে ফ্যাসানের পোষাক ক্যাটলগে দেখা যায়, তেমনি ফ্যাসনের বেশ আধুনিক সৈনিকদের মত নহে, বহুকালের ব্যবহারে লাল কোটটার বর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ট্রাউজারটা পূর্ব্বে বোধ হয় সাদাই ছিল, এখন কেমন ঘোলাটে হলদে রঙ্গের দেখাইতেছিল। বক্ষদেশে পদস্থ সৈনিকের সম্মানচিহ্ন সুবর্ণ ষ্টারমেডেল ঝুলানো খাপখোলা চকচকে তরোয়ালখানা কোমরবন্ধ

হইতে ঝুলিতেছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার জন কোম্পানির একটি অফিসের জীবন্ত চিত্র।

আশ্চর্য্য! সেই ভিক্ষুক রুফাস্‌স্মিথও সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর পশ্চাদ্‌গামী অধঃস্তন কর্ম্মচারীর ন্যায় সম্ভ্রমের সহিত পদচারণা করিতেছিল। তাঁহারা কথাবার্ত্তায় তন্ময় হইয়া ভিতরের ময়দানটা পরিক্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম সে অবস্থাতেও তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি বার বার দক্ষিণে ও বামে পতিত হইতেছিল।

জেনারলের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু এখন তাঁহাকে একা পাইবার কোন আশাই নাই দেখিয়া আমি বেড়ার গায়ে জোরে জোরে আঘাত করিয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহারা যেন তাড়িতাহতের মতই দরজার দিকে ফিরিলেন, তাঁহাদের মুখে ভয় ও বিরক্তি সমভাবেই ফুটিয়া উঠিল। আমি আমার পিচের ছড়ী গাছটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলাম, যাহাতে তাঁহারা শব্দের উৎপত্তি স্থানটা সহজে বুঝিতে পারেন। চমকিয়া জেনারল সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাঁহার মুখে চোখে ভয়ানক দুঃখের ভাব প্রকাশ পইতেছিল, তিনি যেন অত্যন্ত চেষ্টার সহিত সে আবেগ গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, হাত ধরিয়া রুফাস্ তাঁহাকে গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিল। তাঁহাদের ভয়াতুর দেখিয়া আমি একটু জোরের সহিত জানাইলাম যে আমি ওয়েষ্ট আর একাকী!"

আমার কথার ফল ফলিল, তাঁহার মুখের ক্লিষ্ট বিবর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া আনন্দ ও উৎসাহের সজীবতা দেখা দিল। একটু আগ্রহের সহিত জেনারল আমায় অভ্যর্থনা করিয়া, স্নেহব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "ওয়েষ্ট, সত্য সত্যই তোমার ভারী দয়া, বিপদের দিনেই আত্মীয় অনাত্মীয় বেশী চেনা যায়, তোমায় এখন আমার বাড়ীর ভিতর আস্‌তে বল্লে তোমার উপর কিছু অন্যায় করা হবে, কিন্তু তোমায় দেখে সত্যই আমি ভারি খুসী হয়েচি।" তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ কথাগুলিতে আমি অন্তরের মধ্যে একটি আনন্দ অনুভব করিয়া কহিলাম "আপনাদের কদিন কোন খবর না পেয়ে আমরা ভারী ভাবিত হয়ে পড়েছিলুম। কেমন ছিলেন আপনারা ঝড়ের রাত্তিরে?"

"যেমন থাকা উচিত—কিন্তু কালথেকে আমরা সম্পূর্ণরূপেই ভাল থাক্‌ব।—করপোর‍্যাল কাল থেকে আমরা নতুন লোক হয়ে যাব—না?"

করপোর‍্যাল সামরিক প্রথায় সেলাম করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ হুজুর কাল আমরা ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুকের মতই নিরাপদ হয়ে যাব।" জেনারল কহিলেন আমাদের দুজনের মনই আজ অন্য দিকে রয়েচে, কিন্তু তার দরকার নেই; আমার বিশ্বাস সবই ঠিক আছে, আর ঈশ্বর ত আছেন তাঁর কাজের উপর ত কারু হাত দেবার ক্ষমতা নেই, সবই তাঁর ইচ্ছা! তোমরা কেমন ছিলে?" আমার বক্তব্য বিষয়টি জানাইবার এই শুভ অবসর! আমি কহিলাম "আমরা একটা বিষয় নিয়ে ভারী ব্যস্ত ছিলুম—পরশু রাতে

যে প্রকাণ্ড জাহাজখানা ভেঙ্গে গ্যাছে আপনারা বোধ হয় তার কোন খবরই শোনেন্ নি ?"

অনাগ্রহ ভাবে যোদ্ধা পুরুষ উত্তর দিলেন "কিচ্ছুনা।" যুদ্ধ যাঁহাদের ব্যবসায়, বিপদ এবং মৃত্যু যাঁহাদের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত এ সব ছোট খাট সংবাদে তাঁহাদের চিত্তকে সহজে টলাইতে পারে না! আমি পুনশ্চ কহিলাম "ঝড়ের শব্দে আপনারা বোধ হয় জাহাজের সিগনালের জন্যে যে কামান ছোঁড়া হয়েছিল তার শব্দ শুন্‌তে পান্ নি। ঝড়ের রাত্রে একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ আমাদের উপসাগরে এসে চোরা পাহাড়ে ধ্বংস হয়ে গ্যাছে। ইণ্ডিয়া থেকে জাহাজখানা আস্‌ছিল"—

"ইণ্ডিয়া থেকে!" একটা আশ্চর্য্য রকম চীৎকারের সঙ্গে জেনারল এইরূপ প্রতিধ্বনি করলেন।

"হাঁ—সৌভাগ্য ক্রমে তার যাত্রীগুলি সবই বেঁচে গ্যাছে। আর কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে তাঁদের গ্লাসগোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে।" মৃতের ন্যায় বিবর্ণ মুখে সংশয়পূর্ণ স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন "সবাইকে? তাদের সবাইকে ওঠান হয়ে গ্যাছে?" তাঁহার কণ্ঠে যে হতাশার স্বর ধ্বনিত হইল সে স্বর শুনিয়া আমার বক্তব্য বিষয় জানাইতে আমি যেন কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এখন আর কথা ফেরান চলে না, যেন অপরাধীর মত সঙ্কুচিত বিস্ময়ের সহিতই আমি কহিলাম, কেবল তিন জন তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী—তাঁরাই কেবল কিছু দিন এখানকার নির্জ্জনতা ভোগ করবার জন্যে রয়ে গেলেন?" আমি বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম ঝটিকাহত বৃক্ষের মত জেনারলের সুদীর্ঘ দেহ কম্পিত হইতেছে, হঠাৎ আবেগতাড়িত কণ্ঠে যেন তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া আর্ত্তনাদের মত ধ্বনিত হইল "ওঃ ঈশ্বর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' পরক্ষণেই আকাশের দিকে দুই হাত উত্তোলিত করিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসিয়া পড়িলেন।

বেড়ার ছিদ্র দিয়া দেখিতে পাইলাম করপোরলের কুৎসিৎ মুখখানার সমস্ত রক্তটা যেন মাথায় উঠিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে হল্‌দে করিয়া দিয়াছে। হেমন্ত কালের ঠাণ্ডাতেও তাহার ললাটে ঘাম ঝরিতেছিল তবুও সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, জেনারলের মত অভিভূত হইয়া পড়ে নাই। হাতে হাতে ঘসিয়া অত্যন্ত সকরুণ বিলাপোক্তির মত করপোরল বলিতেছিল—"আমার কপাল! সবই আমার কপাল! এতকালের কষ্টের পর যাই একটু আরামের জায়গা ও পেট ভরে খাবার পেয়েচি—অমনি—!"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি এই আকস্মিক ব্যাপারের মর্ম্ম অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ধীরে ধীরে জেনারল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গভীর নিশ্বাসটা সজোরে চাপিয়া ফেলিয়া একটু থামিয়া বলিলেন "ভয় পেওনা বৎস, যাই হোক, যা আসে আসুক আমরা সাহসী সৈনিক, সৈনিকের মতই বিপদের সাম্‌নে দাঁড়াব। তোমার কি চিলেনওয়ালার কথা মনে পড়ে? যখন তোমাকে কামান ছেড়ে আমাদের ব্যূহের মধ্যে

ঢুক্‌তে হয়েছিল? যখন শিখ অশ্বারোহীর দল বজ্রের মত আমাদের উপর এসে পড়েছিল, তখনও আমরা নড়িনি আর এখনও আমরা নড়বনা। ওঃ, নিজেকে আজ আমার শৃঙ্খলমুক্ত হাল্‌কা বলে মনে হচ্চে। এই অনিশ্চিততাই আমায় পলে পলে হত্যা করছিল, নিশ্চিৎ বিপদ যাই হোকনা কেন তবুও সে মুক্তি!" করপোবাল কম্পিত হাত দুই-খানা বক্ষে বদ্ধ রাখিয়া অস্ফুট স্বরে উত্তর করিল—"আর সেই শব্দ? সেই ভূতের শব্দ? একা যে যাবনা এই টুকুই আমার এখন ভরসা।" দুই স্নেহপূর্ণ চোক্ষের করুণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মৃদু গম্ভীর স্নেহপূর্ণ স্বরে জেনারল কহিলেন, "বিদায় প্রিয়তম ওয়েষ্ট; গেব্রিয়েলের খুব ভাল স্বামী হোয়ো, [illegible] বাপের অভাব যেন সে তোমার স্নেহে ভুলে যেতে পারে, আর আমার অভাগিনী স্ত্রীকে—" এইখানে জেনারলের স্বর কম্পিত হইল,—"জায়গা দিও—আমার বিশ্বাস কষ্ট ভোগ করবার জন্যে সেও আর বেশী দিন এ সংসারে বেঁচে থাক্‌বেনা। আর মরডণ্ট? সে সোলজারের ছেলে,—সে নিজের পথ খুঁজে নিতে পারবে;—এখন বিদায় বাছা আমার! ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখবেন। আমার জীবনের অন্ধকারের ছায়াও যেন তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ না করে। আবার বলি বাছা আমার দুঃখিনী গেব্রিয়েলের খুব ভাল স্বামী হোয়ো!"

তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া জোর করিয়া আমি খানিকটা তক্তা ভাঙ্গিয়া একটু ফাঁক বাড়াইয়া লইলাম। এ সুযোগ হারাইলে আর হয়ত কখনও মিলিবে না। আমি দ্রুত কণ্ঠে কহিলাম "শুনুন মহাশয় শুনুন? মানবক্ষমতাতীত বিপদের এই যে সম্ভাবনার ভয়—এ আমি আর সহ্য করতে পাচ্চিনা! এইবার বোধহয় আমাদের মাঝখানকার পর্দ্দা কেটে ফেলে দিয়ে সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াবার সময় এসেচে। মুখ ফেরাবেন না। যে অধিকার এইমাত্র আমায় দিলেন—সেই সম্মানিত অধিকারের বলেই আমি জোর করে বল্‌চি স্পষ্ট করে সব কথা আমায় বলুন। বিশ্বাস করুন আমি প্রাণ দিয়েও আপনার জন্য লড়ব, ও সব ভয় মন থেকে তাড়িয়ে দিন, আর কেনই বা ভয়? কিসেরই বা ভয়? আপনি কি ঐ তিব্বতীয় সন্ন্যাসীদের ভয় কচ্চেন—তা যদি হয় আমি আমার বাবার ক্ষমতা নিয়ে এখুনি তাদের নিষ্কর্ম্মা অকেজো বলে গ্রেপ্তার করাতে পারি—বলুন তাই কি? ওদেরই কি আপনি ভয় কচ্চেন?" জেনারলের মুখে দুঃখের সহিত কৌতুকের অতি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অতি দুঃখেও মানুষ হাসে, "না বাছা না,—তা হতে পারে না—এইটুকুই তোমায় অনুরোধ; পাগলের মত ঐ কাজটিই কোরনা কেবল! এ শোচনীয় নাটকের শীঘ্রই শেষ দেখ্‌তে পাবে। এই সব বিষয়ের কাগজ পত্র আছে। কোথায় আছে মরডণ্ট জানে, কাল তুমি সব দেখ্‌তে পাবে।"

বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া আমি কহিলাম—"না, এমন ভাবে আমি আপনাকে কখনই যেতে দেবনা। বিপদ যদি সত্যই কিছু এসে থাকে আমায় এতটুকু আভাষ দিন, যা থেকে আমি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নিতে পারি। আমার বিবেকের কাছে—ঈশ্বরের কাছে আমায় অপরাধী করে

রাখবেন না, বলুন কিসের ভয় কচ্চেন?" জেনারল একটু ম্লান হাস্যের সহিত ধীর ভাবে উত্তর দিলেন, "প্রিয় ওয়েষ্ট তোমার কিছুই করবার নেই। ঈশ্বর জানেন সত্য সত্যই কিছু করবার নেই। যা ঘট্‌বে তা ঘট্‌তে দাও—ঘটনাস্রোতকে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ তার কোন্‌দিকে গতি। এমন কোরে কাঠ-কাঠ্‌রার বেড়া দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখ্‌বার চেষ্টা করাই আমার পাগলামী হয়েছিল। কিন্তু কথা কি জান—একেবারে নিরীহ অদৃষ্টবাদীর মত নিজেকে ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয় না, তাই যতটুকু পেরেছিলুম সাবধানতা নিয়েছিলুম। আমার এই দুর্ভাগাবন্ধু আর আমি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছি যা কেহই কখন কল্পনাও করেনি। এখানে মানুষের হাত নেই, তাই আমি এখন অসীম ক্ষমতাপন্নের উপর আত্ম নির্ভর করেচি, মানুষের সাহায্যের আর আমার আবশ্যকই নেই। আমার বিশ্বাস জীবনে যে কষ্ট পেয়ে গেলুম পর জীবনের জন্য আমার আর কিছুই সঞ্চয় রইল না। এইবার তোমার আমাকে ছেড়ে যেতে হবে কারণ আমার অনেক কাজ বাকী আছে,—কতকগুলি কাগজ পত্র পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে কতক গুলি লিখ্‌তে হবে, অনেক গুলি জিনিষ গুছিয়ে রাখতে হবে। প্রিয় বৎস ক্ষুণ্ণ হোয়োনা, মানুষ অবস্থার দাস, পুরুষকার সব সময় জয়ী হয় না, আমার জন্য দুঃখ কোর না মুক্তিতে আমি শান্তিলাভই করব। বিদায়, সুখী হোয়ো বাছা!"—তক্তা ভাঙ্গিয়া আমি যে পথটুকু করিয়াছিলাম তাহারই ভিতর দিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত আমার করমর্দ্দন করিলেন। তাহার পর অত্যন্ত সহজ ভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে হলের দিকে গম্ভীর মুখে চলিয়া গেলেন। নতশিরে দুর্ব্বল পদক্ষেপে করপোর‍্যাল খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার অনুগমন করিল। জেনারল হিথারষ্টনের সেই ভীত সন্দিগ্ধ দুর্ব্বলতার এতটুকুও চিহ্ন এখন নাই। কি এ বিপদ? যাহার সম্ভাবনার ভয়ে অতবড় সাহসী সেনাপতিকে আসনতাড়িত বালকের মত ভয়াতুর করিয়া তুলিয়াছিল এবং যাহার উপস্থিতি অনুভব মাত্রেই তিনি সাহসী সৈনিকের ন্যায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন?

শ্লথ গতিতে ঘরের পথে ফিরিতে আমার প্রথম চিন্তার বিষয় হইল আমি এখন কি করিব? সহসা এসথারের কথা মনে পড়িয়া গেল, বালিকা সন্দেহ করিয়াছিল যে সেই তিনটি পশ্চিম দেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আগমনের সহিত জেনারলের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের সূত্র জড়িত? বুদ্ধিমতী বালিকা ঠিক্‌ই অনুমান করিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা যে অমূলক নহে এই চিন্তা আমার মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শনৎমুনের সেই মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক প্রশান্ত, সহাস্য, জ্ঞানদীপ্ত মুখচ্ছবি আমার অন্তরে উদিত হইল। তাঁহার মুখের সেই উদার কথাগুলির সহিত মিলাইয়া আমি কোন অপ্রিয় ঘটনারই কল্পনা করিতে পারিতেছিলাম না। তেমন লোকের দ্বারা কাহারও কি ক্ষতি হওয়া সম্ভব? আমি ভাবিতেছিলাম সেই কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশ জালের অন্তরালে তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভিতরে কি কখন ভয়ঙ্কর ক্রোধ আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে? তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি ভাবিয়া দেখিলাম

সমস্ত জগৎ সংসার যদি আমার উপর রাগ করে আমি হয়ত অনায়াসেই তা সহ্য করিতে পারি কিন্তু সে মুখের ক্রোধ আমি কল্পনা করিতেও ভয় পাই—সহ্য করা ত পরের কথা!

আরও একটা কথা ভাবিতেছিলাম সেই মনুষ্য নামের কলঙ্ক ক্রুফাসস্মিথ আর এই বিখ্যাত যোদ্ধা উচ্চপদস্থ জেনারেল একত্র মিলিত হইয়া ঝটিকাক্ষুচ্যুত এই তিনটী ফকিরের নিকট কি এমন গুরুতর অপরাধ করিলেন বা করিয়াছেন এও একটা জটিল প্রশ্ন? যদি স্বীকার করিয়া লওয়াই যায় যে সেই অর্থ, অস্ত্র এবং লোকবলহীন সাধুদের দ্বারা জেনারেল হিথারষ্টনের শারীরিক কোনরূপ অনিষ্ট ঘটা বাস্তবিকই সম্ভব তবে উঁহাদের বিরুদ্ধে পুলিষ বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট সাহায্য গ্রহণে আপত্তি কেন? আমাকে যদি সেই উদারতার প্রতিমূর্ত্তি সৌম্যসুন্দর শনৎসুনের বিরুদ্ধে কোন উপায় দেখিতে হইত—তাহা হইলে যে আন্তরিক সদ্ভাবের সহিত তাহা দেখিতাম না, একথা অস্বীকার করি না; তবু উপায় ত ছিল! জেনারেল বিশেষভাবে এইটুকুই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন—তবে? পুলিষের নিকট উঁহাদের সংবাদ জানাইতেই কি তাঁহার আপত্তি? ঈশ্বর জানেন কি! জেনারলের সহিত আলাপে আমি তাঁহাকে যতটুকু বুঝিয়াছি, আমার বিশ্বাস কোন গর্হিত অসৎকার্য্য তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

এ সকল আত্মগত প্রশ্নের কোন সদুত্তর মিলিল না, সেই দুইজন সাহসী যোদ্ধার ভাব ও ভাষা আমায় ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের সভয়চিন্তা যে একেবারেই ভিত্তিহীন বা সম্পূর্ণ অমূলক তাহা আর আমার মনে হইতেছিল না। সমস্তটাই প্রহেলিকা!—এ প্রহেলিকার উত্তর নাই। আমি এখন কি করিব? কেবল প্রার্থনা ও চিন্তা করা ছাড়া আমার আর কি উপায় আছে। জেনারলের কথা হইতে যতটুকু বুঝিয়াছিলাম তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়—যে, যে ঝড় উঠিয়াছে তাহা কেবল উঁহাদের দুইজনেরই জন্য। গেব্রিয়েল বা—তাহাদের দুঃখিনী মা সে ঝড়ের লক্ষ্য নহেন।

চিন্তামন্থর গতিতে গৃহের পথে চলিতেছিলাম। কোথায় যাইতেছি কেন যাইতেছি তাহাও স্মরণ ছিল না। সহসা বাবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া চিন্তা হইতে বিরত হইলাম। কি আশ্চর্য্য অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে যে একেবারে আমাদের বাড়ীর গেটের ধারে আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছি।

পৃথিবীর কাজ কর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়া বাবা আজ কাল তাঁহার শরীরমন জ্ঞানের রাজ্যে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সংসারের কোলাহল সেখানে প্রবেশ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাঁহার শান্তি ও আনন্দ অব্যাহত রাখিবার জন্য আমরাও ভাই বোনে যথাসাধ্য যত্ন লইয়া থাকি। কি এমন অদ্ভুত আকর্ষণে তাঁহাকে সাহিত্য জগৎ হইতে এতদূরে বাহিরের সংসারে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইল অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঝাউগাছের অন্তরাল দিয়া ধীরে

ধীরে আমি অগ্রসর হইতে ছিলাম। সহসা অতিমাত্র বিস্ময়ানন্দে আমার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়া আমাকে গতিহীন করিয়া দিল। আমার মনের চিন্তা শনৎসুনের সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া বাবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। বাগানের একখানা লৌহ বেঞ্চিতে বসিয়া দুইজনে কোন বিষয়ে তর্ক চলিতেছিল। অঙ্গুলির আঘাতে প্রত্যেক কথার উপর জোর রাখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছিলেন। টেবিলের হাতার উপর দুই হস্তের ভার রাখিয়া সন্ন্যাসীর দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বাবা অত্যন্ত প্রবল প্রমাণ প্রয়োগে তাঁহার বিপক্ষমত খণ্ডন করিতেছিলেন। তর্কের হার জিত বুঝা যাইতেছিল না। দুজনেই পণ্ডিত দুজনেই স্বমতের যথার্থতা প্রমাণে সচেষ্ট। তাঁহারা তর্কে, এমনি মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে আমি প্রায় দুই তিন মিনিট তাঁহাদের ঠিক পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলাম তথাপি তাঁহারা আমার উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

প্রথমে সন্ন্যাসী আমায় দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম দর্শনে যেমন ভাবে অভিবাদন করিয়াছিলেন—ঠিক তেমনি করিয়া অভিবাদন করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন "আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব স্বীকার করেছিলেম তাই আজ দেখা করতে এসেচি। দেখুন আমি কথা রেখেচি। হিন্দুধর্ম্ম, সংস্কৃত শাস্ত্র নিয়ে আমাদের প্রায় একঘণ্টা তর্ক চলচে—এখন আমরা এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছেচি—যে কেউ কারু মত বদলাতে পারচিনা। জেমস্ হান্টার ওয়েষ্ট প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ব'লে যাঁর নাম প্রতিগৃহে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রতর্কে আমি সমকক্ষ হতেই পারি না। কিন্তু এই একটি বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা করেচি আর তার দ্বারা যতটুকু বুঝেচি সেই অভিজ্ঞতার বলেই বলচি ওঁর মত অভ্রান্ত নয়।" বাবার দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিলেন "আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি যে খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দিতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের ভাষাই ছিল সংস্কৃত।" বাবা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলেন "কিন্তু আমিও জোর করে বলতে পারি সে সময়ে বিশিষ্ট বিদ্বৎসমাজ ভিন্ন সংস্কৃত ভাষা অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন। আমি প্রমাণ দেখাব। কেবল ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান শাস্ত্র লেখবার সময় সংস্কৃতের ব্যবহার হোত। ইউরোপের মধ্যযুগেও ঠিক্ এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—জনসাধারণ লাটিনভাষা ভুলে গেলেন, কেবল ভাল ভাল বই লাটিনে লেখা হোত, তা ভিন্ন তার চলন ছিল না।" সন্ন্যাসী কহিলেন "আপনি যদি বিশেষ ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—তাহলে দেখতে পাবেন আপনার মত অভ্রান্ত নয়।" বাবা কহিলেন "আপনি যদি রামায়ণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র মন্থন করেন তাহলে দেখবেন কার ভুল"। সন্নাসী কহিলেন "আচ্ছা কুল্লুভট্ট দেখুন ?" বাবা বিজয়োল্লাসে উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "বেশ তাহলে অশোকের কথাই হউক। খৃষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে —পরে নয়—এটা যেন মনে থাকে,—অশোকের

বৌদ্ধ ধর্ম্মসূত্র প্রচারের জন্য স্তম্ভে শিলা লিপিতে কি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, সংস্কৃত কি?" "না"—

"আচ্ছা সংস্কৃত নয় কেন? কারণ তাঁর সময়ের প্রজাবৃন্দ ও ভাষার একবর্ণও বুঝতে পারত না। অশোকের শিলালিপি সম্বন্ধে আপনি কি অনুমান করেছেন?" শনৎসুন কহিলেন "আমার বিশ্বাস নানা ভাষায় শিলালিপি লেখা হয়েছিল,—যা হো'ক আমরা বাজে কথায় আমাদের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট কচ্চি, আমাদের এ তর্কের শেষ হওয়া খুব শীঘ্র সম্ভব নয়। আজ এইখানেই থাক।" বাবা একটু দুঃখিত ভাবে কহিলেন "আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বড় সুখ পেয়েছিলেম—এখানে এসে কথা কইবার লোক পর্য্যন্ত পাইনে, তবে এই নির্জ্জন স্থান পাঠের পক্ষে আমার খুব সাহায্য করেচে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন "সূর্য্যদেব মধ্যগগন অতিক্রম করে যাচ্চেন আমি আর বিলম্ব করবনা, আমায় সঙ্গীদের সঙ্গে মিলতে হবে।" বাবা নম্রস্বরে কহিলেন "ভারী দুঃখের বিষয় আমি তাঁদের দর্শন পেলুম না।" বাবার মুখে ঈষৎ দুঃখিত ও কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে বাবা তাঁহার অতিথির সহিত তর্কে পাছে আতিথ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া থাকেন সেই ভাবনায় যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। সন্ন্যাসী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "তাঁরা এখন সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছেন—পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের কোন খোঁজ নেই, পাছে লোকসঙ্গ মনের চাঞ্চল্য আনয়ন করে সেই জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। ছয় মাস সমাধিতে থেকে তৃতীয় অবতারের রহস্য জানবার প্রতীক্ষায় আছেন। হিমালয় থেকে নামবার পূর্ব্বেই তাঁরা এই সাধনা আরম্ভ করেচেন। মিঃ হাণ্টার ওয়েষ্ট বিদায়,—আর কখনও আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। বড় আনন্দ পেলেম আপনার সঙ্গে কথা কয়ে। আপনার শেষ জীবন আনন্দেই কাটবে, শান্তি ও আনন্দ লাভের যথার্থই আপনি উপযুক্ত অধিকারী। আপনার ভারতবর্ষীয় জ্ঞানচর্চ্চা আপনার দেশের ও সমাজের উপর চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে। নমস্কার।" একটুখানি সঙ্কোচের সহিত আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার সঙ্গেও কি আপনার আর দেখা হবে না?"

"আমার সঙ্গে যদি সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যান তবেই—কিন্তু বোধ হয় আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, সকালে কোথায় বেরিয়েছিলেন না?" আমি আন্তরিক আনন্দের সহিত উত্তর দিলাম "তা হোক্, আপনার সঙ্গ আমাকে খুবই আনন্দ দান করবে।" সন্ন্যাসী আপত্তি না করায় আমি তাঁহার অনুগামী হইলাম। বাবাও খানিক দূর আমাদের সহিত আসিয়াছিলেন। আমার মনে হইল সেই অমীমাংসিত সংস্কৃত তর্ক আরো খানিকটা চালাইতে তাঁহার মনে মনে খুব ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু পথ চলা ও ও কথা কহা—এই দ্বিবিধ ব্যায়ামের শক্তি তাঁহার শরীরে না থাকায় তিনি নীরবে চলিতেছিলেন। বাবা ফিরিয়া গেলে সন্ন্যাসী কহিলেন "উনি, মিঃ হাণ্টার ওয়েষ্ট মস্ত বিদ্বান ব্যক্তি,—কিন্তু এমন অনেক লোক

আছেন যাঁরা নিজের ধারণাকেই অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন। জ্ঞানের সর্ব্বতোমুখী বিকাশে এ ভাবটা সহজেই কেটে যায়।”

নীরবে নতশিরে সমুদ্রবেলায় বালুকার উপর দিয়া আমি তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলাম, তাঁহার বাক্যের কোন উত্তর দিলাম না। সমুদ্রের ধারে উচ্চ বালুকাতীর যেন পর্ব্বতের অনুকরণে যোজনব্যাপী হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণদিকে রৌপ্যের মত চক্চকে জলরাশি;—সেই রূপার পাতখানা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কোন জাহাজ বা কিছুই নাই, জনহীন সমুদ্রতীরে—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর আমি! প্রকৃতির সেই নির্জ্জন পথে দুইটিমাত্র যাত্রী পাশাপাশি চলিতেছিলাম, সহকারী কাপ্তেন হকিংস এই সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যে সব ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, জেনারল হিথারষ্টনের সভয় উক্তি হইতে ইঁহাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থিত,—এখন এই সুগভীর নির্জ্জনতার ভিতর সেই চিন্তা আমার মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। মনে হইল স্বেচ্ছায় নিজেকে সেই অসীম ক্ষমতাশালীর হস্তে শিশুর করধৃত ক্রীড়নকের মতই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া দিয়া হয়ত ভাল কাজ করি নাই। তথাপি সেই মহত্ত্বব্যঞ্জক উন্নত মূর্ত্তির কালো চোখের শান্ত করুণকোমল দৃষ্টির বিরুদ্ধে আমার অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী করিতে আমি একান্তই অক্ষম। সমুদ্রের জলকণসিক্ত বাতাস আমার মাথার চুলগুলি দোলাইয়া দিয়া মৃদু-গুঞ্জন মর্ম্মর ধ্বনিতে যেমন ক্ষীণভাবে বহিয়া গেল, আমার অন্তরের অপ্রিয় চিন্তাও তেমনি অস্পষ্টভাবে মনের কোণে ছায়া ফেলিয়াই মিলাইয়া গিয়াছিল। সে মুখ হয়ত কাহারও কাহারও নিকট ভীতিপ্রদ হইতে পারে—কিন্তু সে হৃদয়ে অন্যায়ের স্থান থাকিতে পারে না। সে হস্তে নির্দ্দোষীর প্রতি অন্যায়দণ্ড বর্ষিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। ঘনকুঞ্চিত সুপ্রচুর শ্মশ্রুরাজিমণ্ডিত অতি সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই সঙ্গে তাঁহার পরিহিত পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া আমার মনে হইল এ মুখে এ শরীরে সে বেশ মানায় নাই। আমি তাঁহাকে মনে মনে যে সুদৃশ্য ছাঁটকাটওয়ালা রাজার পোষাক পরাইয়া দিলাম সে অঙ্গে তাহাই শোভনীয়। ইহাতে তাঁহার মধুরতা আর সৌন্দর্য্য যেন সবটুকু অন্তরের ভিতর অনুভব করা যায় না। এ যেন গল্পকথার রাজপুত্র ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন।

আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম সেও একটি নির্জ্জন স্থান; একখানি ছোট কুঁড়ে ঘর।—বোধ হয় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে সেই গৃহের অধিকারী তাহার সমস্ত স্বত্ব নিস্বার্থভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সাম্নের দরজাখানা হয় ত ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে—নতুবা কোন দরিদ্র লোক লইয়া গিয়া জ্বালানি করিয়াছে। ঘরখানা অহিফেনসেবী পুরাতন রোগীর ন্যায়—এখনও তাহার জীর্ণ পঞ্জর কয়খানার জোরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই অদ্ভুত প্রকৃতির মানবেরা জমীদারের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ, সুখপূর্ণ প্রাসাদবাস ত্যাগ করিয়া এইখানেই নিজেদের বাসস্থান স্থির করিয়াছেন। স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভিখারী যে সেও সম্ভবতঃ এই গৃহে বাস করিতে ঘৃণা বোধ

করিত। একখানি ছোট বাগান, গৃহস্বামীর সৌখীনত্বের পরিচায়করূপে কোন সময় তাহার সবুজ শোভায় সাদা রাঙ্গা পত্রপুষ্পে অথবা দরিদ্রগৃহের অভাবমোচক শাকসবজীতে পূর্ণ করিয়া স্নেহবাহুবেষ্টনে তাহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে বাগান—কতকগুলি শুষ্ক এবং সতেজ কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন। আমার সঙ্গী সেই কণ্টক বনের মধ্য দিয়া লঘু চরণ ক্ষেপে ধীরে ধীরে দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভিতরের দিকে চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, তিনি অত্যন্ত নম্র অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে কহিলেন। "মিঃ ওয়েষ্ট তুমি এমন একটি সুযোগ পেয়েচ—যা অল্প ইউরোপ-বাসীর ভাগ্যে ঘটে থাকে। ভিতরে চেয়ে দেখ—দুটি যোগী—যাঁরা সাধনার চরম অবস্থার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। এঁরা এখন অন্তরচিন্তায় সমাধিগ্রস্ত। নতুবা তোমায় এখানে আন্‌তে আমি সাহসই করতেম না। তিব্বতের "রডকের" পবিত্র মঠে এখন এঁদের মুক্ত আত্মা বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এই দেহ এখন আত্মাশূন্য।

ধীরে ধীরে পা ফেল, দেখ' যেন মানবের সান্নিধ্যে সাধনার ব্যাঘাত হয়ে যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়ে না যায়; তাঁদের আত্মা যেন অতৃপ্ত হয়ে ফিরে না আসে। আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দেহের ভর রাখিয়া কণ্টক গুল্মের হাত বাঁচাইয়া দরজার উপর উঁকি মারিয়া দেখিলাম। বহুকাল মানববর্জ্জিত ক্ষীণালোক গৃহে কোন গৃহ সজ্জাই বিদ্যমান ছিলনা। এক কোণে কতকগুলি শুষ্ক খড় শয্যারূপে পড়িয়া রহিয়াছে। অসমতল স্যাঁৎসেতে মেজে ঢাকিবার জন্য কোন আচ্ছাদন নাই। মৃত্তিকা-আসনে যোগী দুই জন বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বসিবার ভঙ্গিও অদ্ভুত। দুই পদ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত - ক্রোড়দেশে সংস্থাপিত। এবং তদুপরি যুগলহস্ত বদ্ধালিঙ্গনে ন্যস্ত। মস্তক ও মুখমণ্ডল নত হইয়া বক্ষদেশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুই জনের আকৃতিরও বিভিন্নতা ছিল। একজন ক্ষুদ্রাকার শুষ্কদেহ; অপরজন দীর্ঘাকৃতি, তাঁহার অস্থিগুলি মোটা; এককালে বোধ হয় খুব লম্বা চৌড়া চেহারা ছিল ইঁহার। এখন তাঁহাদের দেহ কান্তিহীন, সূক্ষ্ম চর্ম্মখণ্ডে মাত্র অস্থি গুলি আচ্ছাদিত,—বর্ণের উজ্জ্বল গৌরাভা এ অবস্থাতেও লুপ্ত হয় নাই। তাঁহারা এমনি স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন যে দুইটি প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তির মতই দেখাইতেছিল। কেবল নিয়মিত ধীর শ্বাস প্রশ্বাসই তাঁহাদের দেহে জীবনের চিহ্ন প্রমাণ করিতেছিল। মুখের বর্ণ অত্যধিক পাণ্ডুর, নত মস্তকের তলদেশ হইতে যে নেত্র দুইটি দেখা যাইতেছিল তাহা উন্মীলিত থাকিলেও উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষুতারকা দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল না।

একটি কানাভাঙ্গা মৃৎ কলসীতে খানিকটা পানীয় জল এবং একখানা বৃক্ষপত্রে আধখানা রুটি,—তাহারই সম্মুখে একটুক্‌রা কাগজ পড়িয়াছিল। কাগজে বিজাতীয় ভাষায় কোন কথা লিখিত ছিল। শনৎসুন দূর হইতে সেইদিকে চাহিয়া দেখিয়া আমার পানে ফিরিয়া কহিলেন "তুমি বোধ হয় আজ একটা নূতন জিনিষ দেখিলে—? দেহ হইতে আত্মার বিচ্যুতি খুব সম্ভব

আর কখনও দেখ নাই ?" আমি কহিলাম "না আমার ভাগ্যে এ সুযোগ আর কখনও ঘটে নাই।" তিনি কহিলেন "এই যে ধর্ম্মবীরেরা শুধু যে এঁদের আত্মাই এখান থেকে বার হয়ে হিমালয়দেশে বিচরণ করে বেড়াচ্চে তা নন—এঁরা যে পোষাকে যে মূর্ত্তিতে এখানে রয়েচেন সুদূর ভিন্ন দেশে শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে ঠিক সেই অবস্থাতেই এঁদের মুক্ত আত্মা আনন্দে বিচরণ করে বেড়াচ্চে। মহাত্মা যে স্থূলদেহে সেখানে উপস্থিত নাই—তাঁর অত্যন্ত স্নেহপাত্রেরাও তা অনুভব করতে পারবে না।

"কি করে এ ব্যাপার হয় ?" সন্ন্যাসী হাসিতে লাগিলেন—"আচ্ছা আমি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। যোগীরা সূক্ষ্ম আত্মার পরমাণুকে তড়িৎবেগে ইচ্ছানুরূপ স্থানে নিয়ে যাবার ক্ষমতা অভ্যাস করেন। সেখানে গিয়ে ইচ্ছাবলে তাহা স্থূলদেহের আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হতে পারে। পূর্ব্বকালে যখন তাঁদের জ্ঞানের সংকীর্ণতা অধিক ছিল তখন স্থূল দেহকেই এমনি ভাবে প্রেরণ করা হত। কিন্তু সেটা কষ্টকর! সাধনার প্রসারতার সহিত জ্ঞানেরও প্রসারতা বৃদ্ধি হয়েছে। এখন স্থূলদেহবিচ্যুত সূক্ষ্ম আত্মাকেই যোগ বলে যোগীরা যথেচ্ছা প্রেরণ করতে পারেন। এই যোগবল কি সে কথা বোঝান অনেক সময়-সাপেক্ষ,—আমার বিশ্বাস যদি যথার্থ জিজ্ঞাসু হতে ইচ্ছা কর—তোমার বাবার কাছেই অনেক বিষয় জান্‌তে পার্‌বে। তবে পঠিত বিদ্যা ও অনুশীলনের জ্ঞানের যে তফাৎ এক্ষেত্রেও তাহাই। যাই হোক্ তিনি মহাপুরুষ, উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই।" আমি কহিলাম "আচ্ছা আপনারা সূক্ষ্ম দেহে যখন সর্ব্বত্র বিচরণ করতে পারেন তখন আত্মজ্জামময় ক্লেদপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসাতুর ভারবহ দেহটাকে বহন করে বেড়াবার আবশ্যকই বা কি ?"

"জ্ঞানী সমাজে তার কোন প্রয়োজনই নেই, সূক্ষ্মাত্মা দ্বারাই কার্য্য সাধন হতে পারে,—কিন্তু সমাজেরও ত স্তর আছে ? সাধারণের সহিত মিলিত হবার জন্য সাধারণ দেহের আবশ্যক নতুবা তারা এঁদের বুঝতে বা দেখ্‌তে পান্‌না। সূক্ষ্ম আত্মাকে দর্শনের জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও ত প্রয়োজন ; সকলেই কিছু সাধু বা দিব্য দৃষ্টির অধিকারী নহেন। মিঃ ওয়েষ্ট—তোমার জ্ঞান স্পৃহা ও সারল্যে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি—এখন বিদায়—"

শনৎস্থন বিদায় অভিবাদনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমি তাহা গ্রহণ করিয়া ব্যগ্রতাপূর্ণ স্বরে কহিলাম "আপনার নিকট যে জ্ঞানের কথা শুনলেম তাতে আমি ভারী আনন্দ পেয়েচি। আমাদের এই অল্পক্ষণস্থায়ী পরিচয়ের কথা আমি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখ্‌ব।" আমার মুখের পানে দুঃখিত ভাবে চাহিয়া শনৎস্থন ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন "তুমি তাতে যথেষ্ট উপকারই পাবে। হয়ত ভবিষ্যতে যা ঘটবে—সাধারণ দৃষ্টিতে তা ভাল মনে হবে না—কিন্তু কোন বিষয়ে সহসা বিচার করো না—মানুষের পক্ষে যতই কঠোর হোক এমন কতকগুলি আইন জগতে আছে—যার কার্য্য পালন করতেই হবে। হয়ত তার ফল লোকচক্ষে নিষ্ঠুর বা নিন্দনীয় হতে পারে কিন্তু তবু আইন অলঙ্ঘ্য; তাকে লঙ্ঘন করবার শক্তি মানব শক্তির

অতীত। তোমাদের দেশের গো বা মেষের নিকটও আমরা ভয়ের পাত্র নহি—কিন্তু যে পাষণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্তপাত করেচে—মানবের আইন তাকে রক্ষা করতে পারে কিনা তা আইনকর্ত্তাই বলতে পারেন। বিদায়—মিঃ ওয়েষ্ট—বিদায়,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন— ।"

শেষ কথা কয়টী বলিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর মুখে যেরূপ ঘৃণা ও ক্রোধের ছায়া তীব্র রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আজিও আমার মনে মুদ্রিত হইয়া আছে। সন্ন্যাসী দ্রুতপদে ভাঙ্গা কুঁড়ে খানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল আমি সেই দিকেই চাহিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে গৃহের দিকে ফিরিলাম। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল মথিত করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল, "হায় অভাগা জেনারল! এমন লোকেরও তুমি ক্রোধের পাত্র! নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর নিয়তি!" দূরে আমার দক্ষিণে মেঘমণ্ডিত আকাশের গায়ে সুনিপুন চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি খানির ন্যায় শ্বেত প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছিল। ঐ সুদৃশ্য সুবৃহৎ অট্টালিকার দিকে চাহিয়া যে সকল পথিক ঈর্ষাকুল চিত্তে অট্টালিকাস্বামীর সুখ সৌভাগ্যের আলোচনা করিয়াছে তাহারা কি জানিত যে ঐ একটি মাত্র শুভ্রশির কোন অলক্ষ্য হস্তের উত্তোলিত শাসন দণ্ডের নিম্নে প্রতি মুহূর্ত্তে নত হইয়া রহিয়াছে। আমার মনে হইতেছিল—ঐ যে ধূসর আকাশের গায়ে কালো মেঘ ঘন হইতে ঘনতর রূপে জমা হইতেছিল ও বুঝি তাঁহারই মেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশের ছায়ামাত্র। সন্ন্যাসীর কথার ভাবে কোন অশুভ বার্ত্তার আভাষ দিয়াছিল। আমার মাথার মধ্যে রক্তের স্রোত প্রবল ভাবে তোলপাড় করিতেছিল। কাহাকে কহি, কে পরামর্শ দিবে, কিসেরই বা পরামর্শ,—জেনারল সম্বন্ধে কোন কথাই ত হয় নাই, তিনি ইহাদের পরিচিত অথবা অপরিচিত তাহারত কোন নিদর্শন পাই নাই—তবে?

আমি যখন বাড়ী ফিরিলাম তখনও বাবা তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকৃত স্থানটিতেই চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার যে তর্ক হইয়াছিল মনে মনে তখনও যেন তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া চিন্তিত মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্যাক্, সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার ব্যবহারটা কি বেশী অভদ্রের মত দেখায়নি? আমার বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন অভ্যাগতের সঙ্গে তেমন ভাবে তর্কটা আমার উচিত হয়নি—কিন্তু তিনি এমনি একগুঁয়ের মত তর্ক কর্‌ছিলেন যে চুপ করে থাকাও সম্ভব হোল না। তর্কে যে আমি হেরে যাইনি তা বোধহয় তুমি বুঝ্‌তে পেরে থাকবে? এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু বোঝ্‌বার জন্যে নিশ্চয়ই তোমায় মাথা খরচ করবেনা, তবু অশোকের শিলালিপির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই তাঁকে যে বিদায় নিতে হয়েছিল এই সহজ তত্ত্বটুকু বোধহয় বুঝ্‌তে পেরেচ?" আমি কহিলাম, "না আপনার তর্ক বেশ ভালই হয়েছিল; আচ্ছা বাবা তাঁর সম্বন্ধে আপনার মত কি রকম?" বাবা প্রফুল্ল মুখে উত্তর দিলেন "বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী যোগী ভিক্ষু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিও একজন। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারে জীবন

উৎসর্গ করে সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করেছেন, খুব মহৎ অন্তঃকরণ তাতে সন্দেহ কি? আমার অনুমান ইনি একজন ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎ জ্ঞানের উপাসক। কিন্তু আমার মনে হয় ইনি এবং এঁর সঙ্গীরা এখনও সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করবার যোগ্যতা লাভ করেননি। কেন না যে মহাত্মা মহানন্দময় মহদৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছেন তিনি কি এমন বিপথ ধরে সমুদ্র পার হতেন? আমার মনে হয় এঁরা কোন শিক্ষিত যোগীর শিষ্য। শীঘ্রই এঁরা সাধনার উচ্চ অবস্থায় উপনীত হবেন। আমি ত এই রকম আন্দাজ কচ্চি?" এসথার সিঁড়ীর উপরকার গোলাপ গাছের শুষ্ক পাতাগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল, বাবার পানে ফিরিয়া বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল "এত জায়গা থাকতে এই সব সাধু মহাত্মাদের এই অনুর্ব্বর স্কটল্যাণ্ডের জলাভূমি কেন পছন্দ হোল বাবা?" তাহার কণ্ঠের কাতরতার সুর আমাদের মনেও বেদনার দোলা দিয়া গেল। বাবা বিচলিত ভাবে মাথার চুল গুলা ঘন ঘন কণ্ডূয়ন করিতে করিতে চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন "তাইত এ কথাটা আমি ভেবে দেখিনি, এ সম্বন্ধে তুমি আমায় পেরিয়ে গেছ বাছা! তবে অনুমান যে করা যায় না এমন নয়—সহরের কাছে থেকেও নির্জ্জন তাই পছন্দ করেচেন—আর কি কারণ থাকতে পারে? যতক্ষণ এঁরা আমাদের দেশের শান্তি ভঙ্গ না কচ্চেন ততক্ষণ ত আমাদের ভাবনার কোন দরকারও নেই।" আমি কহিলাম "আপনি শুনেচেন কি যে এই সব উন্নত সাধকদের এমন সব অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।" "কেন প্রাচ্য পুস্তকাবলী এই সব কথাতেই ত পরিপূর্ণ। বাইবেলও একখানা প্রাচ্য পুস্তক। এর প্রত্যেক পৃষ্ঠাইত এই সকল ক্ষমতার কথা প্রকাশ কচ্চে। এটা খুব সত্যি যে আমরা যে শক্তি যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচি প্রাচ্যেরা সেই বিষয়ে অনেক উচ্চে আরোহণ করেচেন। অবশ্য আধুনিক সাধকেরা সেই মহান শক্তির অধিকারী কিনা সে সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, আমি বলচিও না কিছু।" আমি চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা—এঁরা কি প্রতিহিংসাপরায়ণ? এঁদের ভিতর কি এমন কোন অপরাধ আছে যার দণ্ড মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নেই?" বাবা বিস্মিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া উত্তর দিলেন "আমি ত কিছু জানি না। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই যাঁদের নীতি তাঁদের মধ্যে এমন ব্যবস্থা না থাকাই অন্তত উচিত। কিন্তু জন্, এসথার আমি বুঝতে পাচ্চিনা তোমাদের হয়েচে কি? আজ যেন বড় উৎকণ্ঠিত মনে হচ্চে? তোমার এ রকম প্রশ্নের মানে কি? আমাদের প্রাচ্য আগন্তুকেরা তোমাদের মনে কোন রকম কৌতূহল বা ভয় জাগিয়ে তুলেছেন কি?"

মনে মনে লজ্জিত অনুতপ্ত হইলেও বাবার কাছে কোন কথা খুলিয়া বলা সঙ্গত মনে হইল না। এ সংবাদে তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলা ছাড়া অপর কোন ফল হইবে না। তাঁহার শরীর ও বয়স এখন বিশ্রাম লাভের অবসর চাহিতেছিল

চিন্তা বা দুর্ভাবনার ভার চাপাইয়া তাঁহাকে কষ্ট দিয়া লাভ নাই। তাছাড়া যে বিষয় আমি নিজেই বুঝি নাই সে সম্বন্ধে তাঁহাকে বুঝাইবই বা কি? কৌশলে উত্থাপিত প্রশ্ন এড়াইয়া অন্য কথার অবতারণা করিলাম। বাবাও আর সে বিষয়ে কোন কথা তুলিলেন না।

আমার জীবনে এই ৫ই অক্টোবরের ন্যায় এত বড় সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল দিবস আর কখনও আসিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। এই প্রকাণ্ড দিনটাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিবার যদি কোন উপায় থাকিত!

বাগানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছড়ীর আঘাতে অনেকগুলা সযত্নবর্দ্ধিত ক্রোটন ও ডাল ভাঙ্গিয়া অন্য মনে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঈষৎ পীতাভ অনুজ্জ্বল মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্রে মাঠে মাঠে লক্ষ্যশূন্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমুদ্র তীরে মাছ ধরিতে গেলাম। জলে ছিপ ফেলিয়া উদ্দেশ্যহীন নেত্রে একদিকে চাহিয়া রহিলাম—বিদ্ধমৎস্য ফাৎনা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া লইয়া কখন চলিয়া গিয়াছে অনুভবও করিতে পারি নাই।

বাবার লাইব্রেরী ঘরে গিয়া তাঁহার আরব্ধ প্রিয় পুস্তকের সূচীপত্রে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিলাম; সংশয়ের ভার আর বহন করিতে পারা যায় না, নিজেকে কার্য্যস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া মুক্তির চেষ্টাই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হইলে কি হয়—মন ত কাজ করিতেছিল না, চিন্তার স্রোত বাধা প্রাপ্ত জলস্রোতের ন্যায় তীব্র ভাবে সেই একই পথে বহিতেছিল। এসথারও ঠিক আমার মতই সংশয়োদ্বিগ্ন অস্থির চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার উৎকণ্ঠিত সচকিতদৃষ্টি, ম্লানমুখ, বিষণ্ন হাসি মনের চিন্তাকে বাহিরেও স্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। জেনারল ঠিক বলিয়াছিলেন "মৃত্যুতে মুক্তি আনয়ন করে—অনিশ্চিন্ততাই মৃত্যুর অধিক ভয়ানক।"

মনের চাঞ্চল্যে সেদিন বাবার কাজেরও আমরা অনেক গোলমাল করিয়া ফেলিতেছিলাম। চষমা আনিয়া দিতে, টুপি আনিয়া দেই—হাঁ বলিতে গিয়া না বলিয়া বসি। এসথার সার্টের হাতার বোতাম গলায়,—গলারটা হাতায় লাগাইয়া প্রতিপদে লজ্জায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল। অবশেষে সুদীর্ঘ দিনটা ঠেলিয়া দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল-ধূসর মেঘের স্তরের মধ্যে চুমকির টিপের মত দুই একটি তারা দেখা দিল। বাহিরের বাতাস রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে যেন কেমন একটা কষ্টকর কুহেলিকার আবরণ জড়াইয়া দিল।

রাত্রিকালের আহারাদির পর আমরা শয়নের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বাবার নিকট হল ঘরে একত্র বসিয়া থাকি। এই সময়টা বাবা আমাদের সহিত সাহিত্য আলোচনা করেন, পড়া শোনা দেখেন—এসথারের বাজনা শোনেন—তাঁহার সহিত সাংসারিক ভাবে মিশিবার জন্য এইটুকু সময়ই আমরা পাইয়া থাকি। বাকী সময় তিনি নিজের পড়াশুনার মধ্যেই ডুবিয়া থাকেন। তাই এই সময়টুকু আমাদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়; আজও আমরা অন্যদিনের ন্যায় তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম। এসথার পিয়ানোর নিকটে গিয়া গৎ বাজাইতে সুরু

করিল। কিন্তু আজ তাহার প্রতি অঙ্গুলি-ক্ষেপে ভুল হইতেছিল।

বাবা বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"এসথার তোমার বাজ্‌না বন্ধ রাখ, আজ নিশ্চয়ই তোমাদের কিছু হইয়াছে। শয়নের পূর্ব্বে সুনিদ্রার জন্য প্রার্থনা করিও—একটা ব্যারাম না করিয়া তোমরা ছাড়িবে না দেখিতেছি।" মৌনবিবর্ণ নতমুখে এসথার বাজনা বন্ধ করিয়া দিল।

শ্রীস্বরূপা দেবী।

মূল-আর্য্যজাতি

(উত্তর-কুরুবাসের প্রমাণ)

আর্য্যজাতির শাখা প্রশাখা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূভাগেই প্রসারিত দেখা যায়। সুতরাং মূলআর্য্যজাতি কোথায় ছিল এবং কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণই পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা এতৎ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের যেরূপ সন্ধান পাওয়া যায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

বেদই ভারতীয় আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য। বেদের এই প্রাচীনত্ব হেতুই সর্ব্বশাস্ত্রের উপর ইহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা বেদ হইতে যে তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব অপর সকল তথ্যের অপেক্ষা উহা অধিক প্রামাণ্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বেদের বহুস্থলেই আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে স্পষ্টাক্ষরেই "আর্য্য" নামে অভিহিত দেখিতে পাই; যথা:—

"সনানাৰ্ভা উত সূর্য্যং সনানেন্দ্র সসান পুরুভোজসংগাম্।
হিরণ্যয় মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যুং প্রার্য্যং
বর্ণমাবৎ॥"৯॥

ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ৩৪ সূক্ত।

"ইন্দ্র অশ্বদান করিয়াছেন, সূর্য্যদান করিয়াছেন, বহুলোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করিয়াছেন, সুবর্ণময় ধনদান করিয়াছেন, দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ॥"

(অথর্ব্ববেদ সংহিতা ৪ কাণ্ড ১২০।৪.)

'আর্য্য ও শূদ্র সকলকেই আমি সেই একই ভাবে দর্শন করি।'

এই আর্য্যদিগের আদিনিবাস স্থান আমরা ঋগ্বেদে "পঞ্চক্ষিতি" নামে উল্লিখিত দেখিতে পাই; যথা:—

"য একশ্চর্ষণীনাং বসুনা মিরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ পঞ্চক্ষিতিনাম্॥" ৯

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৭ম সূক্ত।

"যে ইন্দ্র একাকী মনুষ্যদিগের ধনসমূহের এবং পঞ্চক্ষিতির উপর শাসন করেন।"

'ক্ষি' ধাতুর এক অর্থ বাস করাও আছে সুতরাং ক্ষিতি শব্দের অর্থ বাসস্থানই হয়। এই অর্থে 'পঞ্চক্ষিতি' শব্দের অর্থ বাসস্থানভূত পঞ্চভূভাগকে বুঝায়।

এই পঞ্চ ভূভাগে আর্য্যগণ কর্ষণ করিয়া বাস করিতেন। তাহাতেই 'পঞ্চক্ষিতির' ন্যায় আমরা 'পঞ্চকৃষ্টি' শব্দেরও উল্লেখ বেদে প্রাপ্ত হই; যথা—

"বয়মগ্নে অর্ব্বতা বা সুবীর্য্যং ব্রহ্মণা বা চিতয়েম জনাং অতি।
অস্মাকং দ্যুম্নমধি পঞ্চকৃষ্টিষ্ চ্চার্ম্বর্ণ শুশুচিত দুষ্টরম্॥" ১০
ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ২য় সূক্ত।

"হে অগ্নি! আমরা তোমার প্রদত্ত অশ্ব ও অন্ন দ্বারা প্রভূত সামর্থ্য লাভ করতঃ সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া উঠিব; এবং আমাদিগের অতি প্রভূত ও অন্যের অপ্রাপ্য ধনরাশি সূর্য্যের ন্যায় পঞ্চকৃষ্টির উপরে দীপ্যমান হইবে।"

"আদধিক্রাঃ শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ সূর্য্যইব জ্যোতিষাপস্ততান॥"১০
ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৩৮ সূক্ত।

"সূর্য্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বল দ্বারা পঞ্চকৃষ্টিকে বিস্তৃত করিয়াছেন।"

"কৃষ্টি" সম্বন্ধে রমেশবাবু এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"কৃষধাতু অর্থে কর্ষণ করা বা চাষ করা, কৃষ্টি অর্থে চাষকার্য্য, অতএব পঞ্চকৃষ্টি অর্থে পাঁচ প্রকার চাষ, কিংবা পাঁচটী কৃষিপ্রধান জনপদ বা প্রদেশ হওয়া সম্ভব। ঋগ্বেদানুবাদ ৪১৭ পৃঃ।

আর্য্যদিগের বাসভূমির সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ কর্ষণের যে যোগ আমরা দেখিতে পাইয়াছি পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক 'আর্য্য' নামের মধ্যে যে কর্ষণার্থক অর্ ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থনই পাওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আর্য্য শব্দের মূলার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অর্ ধাতু হইতে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ করেন। অর্ ধাতুর অর্থ ভূমি কর্ষণ। লাটিন্, গ্রীক্, এংলোসেক্সন্, ইংরেজী, রুষ, আয়রিশ্, কর্ণিশ, ওয়েলস্, প্রাচীন নর্স, লিথুত্রণিক, প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষার হল বা কৃষিবাচক শব্দগুলি এই অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহাদের মতে এই জাতি কৃষি কার্য্য করিত বলিয়া আর্য্য নাম হইয়াছে॥"
বিশ্বকোষ॥

আর্য্যনামের পূর্ব্বোক্ত 'কৃষিজীবী' অর্থের সহিত কৃষ্টির কর্ষণার্থের যোগের দ্বারা "পঞ্চকৃষ্টি" যে আর্য্যদিগেরই অধ্যুষিতভূভাগ ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

বেদে যেমন আমরা আর্য্যদিগের পঞ্চভূভাগের উল্লেখ—'পঞ্চক্ষিতি' ও 'পঞ্চকৃষ্টি' শব্দে প্রাপ্ত হই—তেমনই তাহাদিগের পঞ্চজনভাগেরও উল্লেখ 'পঞ্চজন' শব্দে প্রাপ্ত হই। এস্থলে আমরা পঞ্চজন সম্বন্ধে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাত মদিতির্জনিত্বম্॥" ১০
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত।

"অদিতি সকল দেব; অদিতি পঞ্চশ্রেণী লোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।"

"অদিদ্যুতৎস্বপাকো বিভাবাগ্নে যজস্বরোদসী উরূচী।
আয়ুং নযংনমসা রাতহব্যা অংজংতি সুপ্রয়সং পঞ্চজনাঃ॥"৪
ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ১১ সূক্ত।

"পরিপক্ক বুদ্ধি, দীপ্তিমান্ অগ্নি সম্যক্‌রূপে শোভা পাইতেছেন। তুমি শোভন হব্যসম্পন্ন, পঞ্চ প্রকার মনুষ্য হব্য প্রদানপূর্ব্বক মর্ত্ত্য অতিথির ন্যায় তোমাকে অন্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করে, তুমিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্য দ্বারা পূজা কর।"

"ইহি তিস্রঃপরাবত ইহি পঞ্চজনা অতি।
ধেনাইন্দ্রাবচাকশৎ॥" ২২
ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৩২ সূক্ত।

"হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দূরদেশ হইতে তিন (দিকে) আগমন কর, তুমি পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আগমন কর।"

আচার্য্য মোক্ষমূলর এই পঞ্চজনকে "Five nations" (১) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চজন শব্দে যে পঞ্চজাতিকে বুঝাইতেছে তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিউর (Muir) পঞ্চজনের অনুবাদ (Five tribes) (২) লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ পঞ্চজাতি হয়। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে মূল আর্য্য জাতি প্রথম পাঁচ শাখায় বিভক্ত ছিল।

যেমন পঞ্চজনের উল্লেখ বেদে দেখা যায় তেমনই 'সপ্ত মনুষ্যের' উল্লেখও তাহাতে দেখা যায়; যথা :—

"যো অগ্নি সপ্তমানুষঃ শ্রিতো বিশ্বেষু॥"

তমাগন্ম। ৮ ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৩৯ সুক্ত।

"যে অগ্নি সপ্তমনুষ্য বিশিষ্ট ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাহার নিকট গমন করি।"

পূর্ব্বে আমরা 'পঞ্চজন' ও পরে যে 'সপ্ত মানুষের' উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার তাৎপর্য্য আমরা ইহাই মনে করি যে পূর্ব্বে আর্য্যগণ কেবল জন অর্থাৎ জাত বলিয়াই আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন। এই জন্যই বেদের অপর একস্থলে (৬.৬১।১২) আমরা 'পঞ্চজাত' বলিয়াও তাহাদিগকে বর্ণিত দেখিতে পাই। পরে যখন মনুর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ তাঁহার সন্ততি বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন—তখনই তাঁহারা 'মানুষ' বলিয়া কথিত হইতে লাগিলেন। আর্য্যগণ মনুর পূর্ব্বে পঞ্চজাতিতে বিভক্ত ছিল—মনুর সময় তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা—সপ্তজাতিতে বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন—তাহাতেই তাঁহারা তখন 'সপ্ত মানুষ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সময়ে এই বংশবিস্তার দ্বারা স্থানাভাব ঘটাতেই সম্ভবতঃ আর্য্যগণ নূতন বাসস্থানের সন্ধানের জন্য পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাদিকে গমন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে আমরা মনুষ্য বাচক যে 'man' শব্দ দেখিতে পাই—তাহাতে তাঁহারা যে মনুরই বংশধর তাহারই নিদর্শন যেন দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ মনু শব্দ যেমন মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে—'man' শব্দও তদ্রূপ মন্ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভাষা-বিজ্ঞানে মূল আর্য্যজাতির আদি বিভাগও তাঁহাদিগের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উপনিবেশ বিস্তারের এইরূপ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

"The Aryan settlement seems to have separated into two main divisions, one of which marched towards the west and the other towards the south-east. The former division kept together till it reached the neighbourhood of the Caspian sea, when it broke up into various detachments, which advanced at different times to seek new homes in the west, and finally succeeded in conquering the greater part of Europe. First, a tribe, now known as Kelts, marched, to the neighbourhood of the Danube. Next came the Teutons, who, following in the wake of the Kelts, drove them from the Danube further westward into Wales, Ireland, and Scotland, and installed themselves in

(১) রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১১৩১ পৃঃ।
(২) রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৩০৫ পৃঃ।

their place. Among these Teutons were the direct ancestors of the English.

A third band, the Slavonians, chose Russia to settle in, and thence spread over Illyira, Poland, and Bohemia.

Lastly, Greece and Italy were taken possession of by two other bands.

The other great division of the Aryan nation marched south, until it reached the region north-west of what is now known as the Punjab. Here it parted into two bands, one of which went into Persia, and the other towards the Punjab, whence it spread over a great part of India."

(1897) Hints on the Study of English by Messrs Rowe and Webb.

এখানে আমরা আসিয়াতে যেমন ভারতীয় ও পারসিক ঔপনিবেশিকদিগের উল্লেখ পাইতেছি—তেমনই ইউরোপে কেল্‌টীয়, টিউটনীয়, শ্লেভনীয়, গ্রীক্‌ ও ইটালীয় ঔপনিবেশিকদিগের উল্লেখ পাইতেছি। এই প্রকারে আসিয়ায় দুই ও ইউরোপে পাঁচ সমস্তে এই মূল সাত আর্য্য শাখারই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। আমরা মনুর আর্য্যসন্তান দিগের সপ্তশ্রেণীর 'সপ্ত মানুষ' বলিয়া বেদে উল্লেখের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছি—এই সপ্ত আর্য্য শাখা মনুসন্ততির সেই সপ্ত শ্রেণী বলিয়াই বোধ হয়।

জার্ম্মান্‌দিগের আদি পিতার মেন্নাস্‌ (Mannus) নাম যে মনু নামেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ তাহাতে আর কোন সন্দেহই হইতে পারে না। ইহা হইতে মনুর সন্ততি-গণের দ্বারাই যে পাশ্চাত্য দেশে আর্য্যাধিকার স্থাপিত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় পূর্ব্বপুরুষবাচক যে মেইন্‌স্‌ (manes) শব্দ আছে—তাহার সহিত মনু শব্দের স্পষ্ট যোগ আছে বলিয়াই মনে হয়। এই মেইনস শব্দটী মানব শব্দেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মনুর সন্তান বলিয়া যে বিবেচিত হইতেন ইহা দ্বারা সেই অর্থই প্রকাশিত হয়। জার্ম্মেন্‌ শব্দটী যেমন জাতিবাচক সংজ্ঞাশব্দ তেমনই ইহা ভ্রাতৃবাচক অভিধা শব্দও বটে। ইহা হইতে Germane শব্দটী সম্বন্ধবাচী সাধারণ বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে German শব্দের man শব্দটীর মূলে যেন মনু শব্দের সহিতই সম্বন্ধ ছিল এবং তাহা হইতেই ইহা উল্লিখিত বিভিন্নার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। German শব্দের ন্যায় Norman, Englishman, Dutch man প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের মেন্‌ (man) শব্দেও আদি পিতা মনুর সহিত সংস্রবের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়াই মনে হয়।

আর্য্যদিগের 'পঞ্চজন' ও 'সপ্ত মানুষ' রূপে বর্ণনায় যেমন তাঁহাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমের আভাস পাওয়া যায় তেমনই তাঁহাদের সম্বন্ধে 'পঞ্চক্ষিতি' ও 'পঞ্চকৃষ্টি' বর্ণনায় তাঁহাদের আদিবাসস্থানের পরিবর্ত্তনইতিহাসেরও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম তাঁহারা যে উত্তর প্রদেশে বাস করিতেন তাহাতে তাঁহারা কেবল বাস-গৃহের আবিষ্কারই করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহা 'পঞ্চক্ষিতি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপর আর্য্যগণ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে যখন হলকর্ষণ প্রণালীর উদ্ভাবন হইল তখন তাঁহাদের বাস

স্থানের নাম জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাই 'পঞ্চকৃষ্টি' নামে আখ্যাত হইল।

আর্য্যদিগের 'পঞ্চক্ষিতি' ও 'পঞ্চকৃষ্টি' কোথায় ছিল এক্ষণে তাহাই আমাদিগের বিবেচ্য। এই দুই স্থান যথাক্রমে উত্তর আসিয়া ও মধ্য আসিয়াতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই আমাদিগের অনুমান হয়। বেদের একটী ঋকে এ সম্বন্ধে যে, ভৌগোলিক প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। বেদের সেই ঋক্‌টী এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—

"ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্দ্ধয়ন্তী। বাজে বাজে হব্যাভূৎ॥" ১২

ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৬১ সূক্ত।

"ত্রিলোক ব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা পঞ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতিযুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন॥"

এখানে পঞ্চজাত শব্দ দ্বারা যে পঞ্চজন বা পঞ্চজাতীয় আর্য্যদিগকে বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই পঞ্চজাত আর্য্যগণ যে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী ছিলেন তাহারও আভাস এখানে পাওয়া যাইতেছে।

আমরা উল্লিখিত সূক্তেরই শেষ ঋক্‌টী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে আর্য্যদিগের সরস্বতী তীরবাসের পরিষ্কার প্রমাণই পাওয়া যাইবে।

সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যোমাপস্ফরীঃ পয়সা মান আধক্।
"জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যাচ মাত্বৎ ক্ষেত্রাণ্যেরণানি গন্ম॥" ১৪

"হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। তুমি আমাদিগকে হীন করিও না। অধিক জল দ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না তুমি আমাদিগের বন্ধুত্বও গৃহস্বীকার কর। আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি।"

এক্ষণে উপরিউক্ত সরস্বতী নদীটীর অবস্থান নির্ণয় করিতে পারিলেই আর্য্যদিগের আদিনিবাস যে কোথায় ছিল আমরা তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইব।

সরস্বতীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে বিশ্বকোষে যে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা-দৃষ্ট হয় আমরা তাহা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিত আছে—

পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্‌বৈপথ্যা-স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুচ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুং। যোবাতত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতিস্মাহ। এষাহি বাচোদিক্ প্রজ্ঞাতা।" (শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ৭।৬)

অর্থাৎ পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তর দিকে ভাষা শিখিতে যায়। যে লোক সেইদিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (বেদ-বাণী) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এইস্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।"

ঐ উত্তর দিক্ কোথায়? সেইস্থান কাশ্মীরের উত্তরে (৩) মেরুর নিকট যে স্থান হইতে সরস্বতী বাহির হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ন্যায় পারসিকদিগের বেদ

(৩) শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার বিনায়কভট্ট লিখিয়াছেন—

"প্রজ্ঞাততরা বাগুচ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তাতে।" এইরূপে তিনি কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের মতে সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান বিন্দুসর (১২০।৬৪) বর্ত্তমান নাম সরীকুল হ্রদ। এক সময়ে এই সরীকুল পর্য্যন্ত কাশ্মীরদেশ বিস্তৃত ছিল। ইহা আর্য্যজাতির বাক্ বা বৈদিকী ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়া সরস্বতীর অপর নাম বাক্ বা ভাষা হইয়াছে।" বিশ্বকোষ।

বা আদি ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তাতেও হরকুইতি বা সরস্বতী বাগুৎপত্তির স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে"।

এস্থলে আমরা সরস্বতী যে মেরুর নিকটবর্ত্তী নদী ছিল তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি এবং এই সরস্বতীতীরে বাসকালে বেদরচনা হইতেই যে ভাষার নাম এই নদীর নামে সরস্বতী ও বেদের 'ব্রহ্ম' নাম হইতে 'ব্রাহ্মী' হইয়াছে তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি।

মনুসংহিতায় আমরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়কে 'দেবনদী'রূপে উল্লিখিত দেখি এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' দেখিতে পাই এবং ইহা 'দেবনির্ম্মিত দেশ বলিয়া বিশেষিত দেখি। যথা—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" ১৭
মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

"সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থলে যে দেবনির্ম্মিত দেশ তাহা 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া কথিত হয়।"

উদ্ধৃত বর্ণনায় নদী ও দেশের সহিত 'দেব'শব্দের যোগের দ্বারা আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত ইহাদিগের প্রথম সংস্রব হইতেই যে ইহারা এইরূপ দেবগৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যগণ এই আদি স্থান হইতে ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইলে ইহার পরম পবিত্র ও সুখময় গৌরবস্মৃতি স্মরণ করিয়া ইহাকে "দেবনির্ম্মিত দেশ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন—ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

আর্য্যদিগের সর্ব্বাদিনিবাস মেরুও এই প্রকারে 'সুরালয়' বা দেবালয় বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যথা অমরকোষে :—

"মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রীরত্নসানুঃ সুরালয়ঃ।"

আর্য্যদিগের প্রথমাধিবাসহেতু যে মেরু 'সুরালয়' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই মেরুর সন্নিহিত সরস্বতী নদী ও তত্তীরবর্ত্তী-ভূভাগ যে দেবরূপী আর্য্যগণের প্রথম উপনিবেশ বলিয়া 'দেবনদী' ও 'দেবদেশ' নামে আখ্যাত হইবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যগণ সরস্বতীর পরে বিন্দুসরোবরের বা সরীকুলহ্রদ তটে উপনিবিষ্ট হন। এই সরোবর হইতে যে সপ্তনদী নির্গত হইয়াছে তৎসমস্তের তীরে বসতি বিস্তার হইতেই আর্য্যদিগের দেশের "সপ্তসিন্ধু" নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমরা বেদে যে আর্য্যদিগের "সপ্তমানুষ" নাম প্রাপ্ত হই; এইখানে আসিয়া বিন্দুসরোবর হইতে উৎপন্ন সপ্তনদীর তীরে বাস হইতেই তাঁহারা এই নাম প্রাপ্ত হন বলিয়া বোধ হয়। (৪) এই স্থানই "প্রত্নৌকস্" নামেও বেদে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। বিশ্বকোষে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিমপ্রলয় উপস্থিত হইলে আদিবাস ছাড়িয়া আর্য্যসন্তানগণ পূর্ব্বশ্রুতি লইয়া দক্ষিণমুখে সরসপ্ (পৌরাণিক বিন্দুসর ও বর্ত্তমান সরীকূল) হ্রদের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৪) আমরা উপরে সরস্বতীকে যে 'সপ্তাবয়বা' ('সপ্তধাতুঃ') বলিয়া বেদে (ঋগ্বেদ ৬।৬১।১২) বর্ণিত দেখিয়াছি, 'সপ্ত' নদী সেই সরস্বতীর শাখা হওয়াও অসম্ভব নহে।

এই স্থানই পরবর্ত্তী বৈদিক ও আবস্তিক আর্য্যজাতির নিকট পরে 'প্রত্নৌকস্' বা প্রাচীন ভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত রেগোজিন আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ সম্বন্ধে তদীয় "বৈদিক ভারত" (Vedic India) নামক গ্রন্থে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও সরস্বতীতীরেই যে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায়। এস্থলে আমরা তদীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"আর্য্যগণ নদীর পর নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে বহুদূর অগ্রসর হইলে একটী নদীর নিকট আসিয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। ইহার তীরদেশেই অধিষ্ঠান সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর্য্যদিগের নিকট যে নাম প্রিয় ও পবিত্র ছিল ইহা সেই নামই উত্তরাধিকাররূপে পরিগ্রহণ করিল। ইহা কি কারণে হইয়াছিল? তাঁহাদিগের প্রাচীন স্মৃতি ও সংস্রব হইতেই হইয়াছিল। কারণ 'সরস্বতী' প্রাচীন ইরাণীয় "হরকৈতিরই" অবিকল সংস্কৃত প্রতিরূপ। ইহা পূর্ব্ব ইরাণ-আফগানিস্তান ও কাবুলের বৃহৎ নদীরই (যাহা বর্ত্তমান হেল্‌মণ্ড) আবেস্তিক নাম। এখানেই বিচ্ছিন্ন ভারত-ইরাণীয় জাতিদিগের কোন কোন জাতি সাহস করিয়া সুলিমান পর্ব্বতশ্রেণীর প্রস্তর প্রাচীরের সম্মুখীন হওতঃ ইহার আরণ্য স্বল্পপরিসর গিরিবর্ত্ম সকলের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণভাবে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অবশ্য বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে যাহা দীর্ঘকাল তাঁহাদের স্বদেশ ছিল তাঁহারা এই প্রকারে তাহার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবেন। আধুনিক শেষ গবেষণার ফলেই এই স্বাভাবিক সুন্দর সমাধানের আভাস পাওয়া গিয়াছে, এবং অথর্ব্ববেদের তিনটী সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখের দ্বারা ইহা সমর্থিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে যে এরূপ উল্লেখ থাকিবে তাহা কখনও প্রত্যাশা করা যায় নাই। এইরূপ (তিনটী সরস্বতীর) উল্লেখ বহুকাল অব্যাখ্যাত থাকায় যে সমস্ত সমস্যা পণ্ডিতদিগকে প্রতিপদে বাধা প্রদান করে ইহা তাহারই অন্যতম সমস্যারূপে পরিগণিত হইয়াছিল। যে সমস্ত বিষয় (আর্য্যদিগের) স্মৃতিপথ হইতে তখনও অন্তর্হিত হয় নাই—সম্ভবতঃ তৎকালে তৎসমস্তের কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় নাই।" (৫)

বেদেও আবেস্তায় 'সরস্বতী' বা 'হরকৈতি'

(৫) After the Aryans had advanced a considerable distance eastward crossing river after river, they reached one which arrested their progress for a time. Settlements arose along its course and it inherited the name that for some reason was dear and sacred to the Aryans. For what reason? From ancient memories and association. For Sarasvati is the exact Sanskrit equivalent of the old Eranian. "Haraquaiti" the Avestan name of the great river (modern Helmond) of Eastern Eran—Afghanistan and Kabul where some of the separating Indo-Eranian tribes certainly sojourned before they summoned courage to face the stony wall of the Suleman range and thread its wild, narrow passes. Was it not natural that they should have thus perpetuated the memory of what had long been home? This beautiful and natural solution is suggested by the results of latest rcsearches, * and confirmed from a most unexpected quarter by a curt mention in the Atharva-veda (100) of three Sarasvatis—a mention being long unexplained, has been another of the puzzles which confront scholars at every step. Probably no explanation was needed at the time of things which had not passed out of remembrance." Vedic India by A Ragozin pp 268—69.

* See chiefly Hillebrandt Vedische Mythologic Vol. I., pp 99—100.

নামের উল্লেখ দ্বারা ইহার তীরদেশই যে আর্য্যদিগের আদি উপনিবেশের স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়।

পারসিকগণ সর্ব্বশেষ ভারতীয় আর্য্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হন ইহাই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। তদ্রূপ ইহাও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যে পাশ্চাত্য আর্য্যগণ তৎপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। পারসিক ও পাশ্চাত্য আর্য্যগণ আর্য্যদিগকে প্রাগুক্ত পঞ্চ (পঞ্চজন) বা সপ্ত (সপ্তমানুষ) জাতিরই যে অন্তর্গত জাতি ছিল তাহাতে যে অল্প সন্দেহেরই কারণ বিদ্যমান আছে তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বিচ্ছেদের পর অবশিষ্ট আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করতঃ তাঁহাদিগের প্রথম ভারতীয় উপনিবেশকে তাঁহাদের জাতীয় নামানুসারে 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে আখ্যাত-করেন।

এই প্রকারে আপনাদের নূতন বাস-স্থানের সহিত তাঁহাদের প্রাচীন জাতীয় নাম সংগ্রথিত করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ 'আর্য্য'নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামের দ্বারা আর্য্য-দিগের প্রধান ও শ্রেষ্ঠভাগই যে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা অনুমিত হয়। 'আর্য্যাবর্ত্তের' সহিত আমরা 'আর্য্য' নামের যেরূপ স্পষ্ট সংযোগ দেখিতে পাই এরূপ আর অন্য কোনও স্থানের নামের সহিতই পাই না। ইহা হইতে ভারতীয় আর্য্যদিগের মূল স্থান 'পঞ্চক্ষিতি' বা 'পঞ্চকৃষ্টি'ই যে সকল আর্য্যেরই মূল স্থান ছিল তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

যে সমস্ত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্কন্দনভীয়াকে (Scandinavia) আর্য্যদিগের মূল স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা স্কন্দনভীয় ভাষার দ্বারা এক Aryan বা আর্য্য নামের ব্যাখ্যাই দিতে পারিয়াছেন কি না জানি না কারণ এক সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতেই ইহার মূল এরূপ স্পষ্টরূপে লক্ষিতব্য নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার যে মূলের সন্ধান করিয়াছেন তাহাও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই করিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ আর্য্যদিগের আসিয়ায় আদিনিবাস সম্বন্ধে অনাস্থাবান্ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আইজাক্ টেলার ও, তদীয় 'আর্য্য আদিনিবাস' (The origin of Aryans) নামক গ্রন্থে স্কন্দনভিয়াকে আর্য্যদিগের আদিবাসের উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। যথা—

"It is difficult to believe that a sufficiently extensive area for the growth of such a numerous. people can be found in the forest clad valleys of Norway and Sweden, which moreover are unadapted for the habitation of a nomad pastoral people such as the primitive Aryans must have been." The Origin of Aryans by Isaac Taylor. pp. 46—47.

"নরওয়ে ও সুইডেনের অরণ্য পরিবৃত উপত্যকায় যে এরূপ বিপুল জনসঙ্ঘের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত ক্ষেত্র পাওয়া যাইতে পারে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অধিকন্তু উক্ত উভয় দেশই পশুপালক ভ্রমণশীল আদিম আর্য্যজাতির অধিবাসের অনুপযোগী।"

আর্য্যদিগের আমরা যে 'পঞ্চজন' ও 'সপ্তমানুষ' এই দুই প্রাচীনতম শ্রেণী বিভাগের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শনও আমরা সংস্কৃত ভাষাতেই প্রাপ্ত হই। 'মানুষ' শব্দটী 'মনুষ্য' পর্য্যায়ের

ও 'পঞ্চজন' শব্দটী পুরুষ পর্য্যায়ের অন্তর্ভূ‍ক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"মনুষ্যা মানুষা মর্ত্ত্যা মনুজা মানবানরাঃ।
স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ পুরুষাঃ পুরুষানরাঃ॥"

অমরকোষ।

আর্য্যদিগের আদি শ্রেণীনাম যে মনুষ্য সাধারণের নামরূপে ভারতবর্ষে পরিণত হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে প্রাথমিক পঞ্চ বা সপ্ত আর্য্য-জাতির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার এবং তাঁহাদের শাখা প্রশাখার সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হইতে সকলকে একলক্ষণান্ত দেখিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ আর্য্যসাধারণ নামেই তাঁহাদিগকে অভিহিত করতঃ তাঁহাদের সহিত আপনাদের সাজাত্যের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন। পক্ষা-ন্তরে এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে আর্য্যজাতিকে মনুষ্যের প্রকৃত আদর্শ মনে করিয়াই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আর্য্যদিগের আদিম জাতীয় নামের দ্বারাই সমস্ত মনুষ্য-জাতির নামকরণ করিয়াছিলেন। মনু-সংহিতায়ও এই আদর্শের কথা স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত দেখা যায়। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ ১৯
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" ২০

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

"কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথরা এই কয়টী দেশকে 'ব্রহ্মর্ষি দেশ' বলে। উক্ত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্তেরই সন্নিহিত।"

এই সমস্ত দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে।

'মনুষ্য'নাম যে প্রথমে আর্য্যআদর্শবাচক নাম ছিল তাহার আরও প্রমাণ এই যে পুরাকালে আমরা অনার্য্যজাতি বা অনার্য্য-ভাবাপন্ন আর্য্যজাতিকে 'মনুষ্য' নামে অভি-হিত দেখিতে পাই না পরন্ত যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, দানব, দৈত্য প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামেই অভিহিত দেখিতে পাই।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মূল আর্য্যজাতির ঐতিহাসিক নিদর্শন যেমন ভারতীয় সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনই আর্য্য মূলস্থানের ঐতিহাসিক নিদর্শনও ভারতীয় সাহিত্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাক্ষ্য

(১)

সাগর সেঁচিয়া কেশবে বাসবে
সকল রত্ন লইল হরি,
তুমি পেলে শুধু ওগো ভোলানাথ
উগ্র গরল কণ্ঠ ভরি!

(২)

সত্যের যুগে এ কথাটি হায়,
না জানি কে দিল রটনা করে,
আজিও সাক্ষ্য শিশু সুধাকর
রয়েছ যখন ললাটে ধরে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পাটলিপুত্র

"The excabations for which Ratan Tata has so generously provided the means and which the Archaeological Department is carrying out on his behalf have not yet had time to advance for, but they have yielded enough to show that the Royal Palace of the Mauryas was no phantasy of the chinese pilgrims"

(His Excellency Lord Hardinge's Reply to the Address of the Landholders' Association, Patna)

[গত বৎসর হইতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধানে ও কোটিপতি রতন তাতার বদান্যে পুনর্ব্বার পাটলিপুত্রে খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ পাটলিপুত্রের খননকার্য্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ভারতীতে প্রকাশ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে যে সকল স্থানে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কার্য্য করিতেছেন, সেই সকল স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির বিবরণ ও আলোকচিত্র প্রকাশের জন্য তিনি অনুমতি লইয়াছেন। এই সংখ্যায় পাটলিপুত্রের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে ও গত বৎসরের প্রাপ্ত দ্রব্যাদির বিবরণাদি প্রদত্ত হইল। আগামী সংখ্যায় শেষোক্ত বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইবে। ভাঃ সঃ]

১। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ইতিহাস

পাটলিপুত্র কে স্থাপন করেন, তাহা সঠিক অবগত হওয়া যায় না। রামায়ণে পাটলিপুত্রের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণের মতে মগধরাজ অজাতশত্রুর পুত্র উদয়াশ্ব এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহারা এই মতের পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা খৃষ্ট-জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে উদয়াশ্ব দ্বারা এই নগর প্রতিষ্ঠিত এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চান। তাঁহারা বলেন যে, অজাতশত্রু গঙ্গাতীরে পাটলি নামক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পৌত্র উদয়াশ্ব এই দুর্গ হইতে কিছু দূরে পাটলিপুত্র নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের মতে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় ও উদয়াশ্বের রাজত্বের শেষ ভাগে উহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। চৈনিক পরিব্রাজকগণের অন্যতম অনুবাদক বিল সাহেব বলিয়াছেন যে, মগধরাজ অজাতশত্রু পাটলিপুত্র নগরকে সুদৃঢ় করেন। অন্যতম লেখক বলিয়াছেন যে, কালাশোক রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বস্তুতঃ অনেকের মতে খৃষ্টের জন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কালাশোক এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যিনিই ইহা প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, ইহা সত্য যে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রেই অবস্থান করিতেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়েই পাটলিপুত্র পৃথিবীপ্রসিদ্ধ হয়।

মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তদৃষ্টে অনেকেই পাটলিপুত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন "গঙ্গা এবং অপর একটী নদীর সঙ্গমস্থলেই পালিবোথ্রা অবস্থিত। এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া। ইহা আকারে সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায় এবং ইহার চতুষ্পার্শে কাষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে তীর নিক্ষেপের জন্য ছিদ্র আছে। নগরের ময়লা বহির্গত হইবার জন্য ও নগর রক্ষার্থ ইহার চতুর্দ্দিকে একটী প্রাকার

মিঃ রতন তাতা

মিঃ তাতা কর্ত্তৃক অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়কে প্রদত্ত ফটো হইতে

আছে।" (১) মেগস্থেনিস হইতে উদ্ধৃত করিয়া আরিয়ান বলিয়াছেন যে, ইরান্নোবোয়াস এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাসিয়ানদের রাজ্যে পালিমবোথ্রা নগরই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নগরপ্রাচীরে ৬৭০টী বুরুজ এবং ৬৪টী দ্বার আছে।"

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে পঞ্চতন্ত্রে "পাড়লিপুত্রের" উল্লেখ দেখা যায়। উইলসন বলিয়াছেন যে পাড়লিপুত্রই শুদ্ধ উচ্চারণ। পাটলিপুত্রের সন্নিকটস্থ জৈন-মন্দিরে যে, খোদিতলিপি আছে তাহাতে "পাড়লীপুরের" উল্লেখ আছে। "ক্ষেত্র-সমাস" নামক ভৌগোলিক পুস্তকে পলিভট্ট নাম দেখা যায় এবং লঙ্কাদ্বীপে প্রচলিত পুস্তকাদিতে পাটলিপুত্র নাম পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ অশোকাদানে পাটলিপুত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়:—

"তৎ যথাসীন্মহীখণ্ডে আর্য্যাবর্ত্তে রশোত্তমে,
মগধভূপ্রদেশস্থ গঙ্গাতীরে পবিত্রিতে।
নগরং পাটলিপুত্র ভূকান্তা তিলকোত্তমং,
সুভিক্ষং কমলাবাসং সর্ব্বসম্পৎ সমৃদ্ধিতম।
সাধুজন সমাকীর্ণং বিদ্বজ্জন নিষেবিতং,
সর্ব্বদা মঙ্গলোৎসাহ প্রবর্ত্তনাভি নন্দিতম্।
ধৃতিভিরণভিক্রান্তং স্ফীতং ক্ষেমং শুভশ্রিয়ং,
সত্যধর্ম্মালয়া রামস্বরম্যং স্বর্গ সন্নিভম্।

অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের মগধপ্রদেশে গঙ্গাতীরে সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন সাধুজন সমাকীর্ণ ও বিদ্বজ্জন সেবিত পাটলিপুত্র নামক নগর আছে।

পাটলিপুত্রের সুরম্যসৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর না হইলেও, অশোকাবদানের যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতেই চৈনিক-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'ফা-হিয়ান বলিয়াছেন "পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী ছিল এবং রাজা অশোক এই স্থানেই রাজত্ব করিতেন। নগরস্থ রাজপ্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি রাজাদেশে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাজ প্রাসাদান্তর্গত প্রাচীর, দ্বারগুলি এবং স্থপতি-কার্য্য মনুষ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই।"

অন্যতম পর্য্যটক হিউয়েন-সিয়াং বলিতেছেন "গঙ্গার দক্ষিণে প্রায় সত্তরলি বিস্তৃত একটী পুরাতন নগর আছে। এক্ষণে ইহা জনশূন্য হইলেও অদ্যাপিও ইহার প্রাচীর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদে অনেক পুষ্পবৃক্ষ ছিল, বলিয়া পূর্ব্বে ইহা কুসুমপুর নামে অভিহিত হইত। বহুকাল পরে ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পাটলিপুত্রে পরিণত হইয়াছে।"

হিউয়েনসিয়াং এই নাম প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—

"অনেকদিন পূর্ব্বে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ এইস্থানে বাস করিতেন। অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ গমন করিত। একদিন ছাত্র সকল একত্র হইয়া অন্যত্র ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিল; সেই সময় তাহাদের একজন অত্যন্ত বিমর্ষভাবে কালযাপন করিতেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রটী উত্তর করিল যে,"আমার যৌবন-সীমা অতিক্রান্ত হইতে চলিল; কিন্তু, এ পর্য্যন্ত আমি "ধর্ম্মরক্ষা" করিতে সমর্থ হইলাম না; এই জন্যই আমি এত বিমর্ষ।" অন্যান্য ছাত্রেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক তাহাদের সহাধ্যায়ীকে বলিল যে "এ ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তোমার জন্য পাত্রী অন্বেষণ করিব।" তৎক্ষণাৎ

(১) মৎসম্পাদিত "সমসাময়িক ভারত" প্রথম কল্প. দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে কন্যার পিতা ও অপর একজনকে বরের মাতা স্থির করিয়া পাটলি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের নাম জামাতা—বৃক্ষ রাখিল। পরে তাহারা নানাপ্রকার ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া বিবাহের লগ্ন নির্দ্ধারণ করিল এবং লগ্নকালে কন্যার পিতা (?) ঐ বৃক্ষের একটি শাখা ভগ্ন করিয়া ছাত্রকে বলিলেন "এই আমার কন্যা; ইহাকে গ্রহণ কর।" ছাত্রটাও ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুষ্পশোভিত সেই শাখা গ্রহণ করিল।

"সূর্য্যাস্তকালে অন্যান্য বালকগণ গৃহপ্রত্যাগমনে উদ্যত হইলে, সেই ছাত্র গৃহগমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ তাহাকে বলিল যে, তাহারা যাহা করিয়াছে সকলই পরিহাসচ্ছলে করিয়াছে। এই স্থানে থাকিলে রাত্রিতে হিংস্রজন্তুতে তাহাকে নিধন করিবে, সুতরাং গৃহে প্রত্যাগমনই বিধেয়। কিন্তু, যুবক অস্বীকার করাতে তাহারা তাহাকে একাকী রাখিয়া প্রত্যাগমন করিল।

"রাত্রিতে এক অনৈসর্গিক আলোকরশ্মি সেই বনভূমি আলোকিত করিল। কোথা হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি এবং বংশীবাদন হইতে লাগিল এবং সেই স্থান মূল্যবান কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল। অকস্মাৎ ভদ্রবেশধারী এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একটী যুবতীর হস্ত ধরিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সঙ্গে সাজসজ্জা করিয়া অনেক লোক ও বহুসংখ্যক বাদ্যকরগণ আসিতে লাগিল। পরে, বৃদ্ধ ছাত্রটীর হস্তে যুবতীর হস্ত সমর্পণ করিয়া বলিলেন "ইনিই আপনার পত্নী।" সমাগত সপ্তদিবস আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত হইল। সাতদিন পরে তাঁহার সহাধ্যায়ীরা তাঁহার অন্বেষণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহাধ্যায়ীরা যেন কাহার প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যাগমনে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিলেন।

"পরে তিনি স্বেচ্ছায় নগরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত সেই উপবনে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পাটলিবৃক্ষ বৃহৎ প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে; ভৃত্যবর্গ চতুর্দ্দিকে গমনাগমন করিতেছে এবং পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ তাঁহাদের সমাদরে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইতেছেন। নানাপ্রকার আহার্য্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ছাত্রের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে পরিতুষ্ট করিলেন।

পুরাতন রাজধানী কুসুমপুর পরিত্যাগ করা হইলে পর এই স্থান নূতন রাজধানীর জন্য মনোনীত করা হইল এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনা স্মরণার্থ এই নগরের নাম পাটলিপুত্র—পুর (অর্থাৎ পাটলি বৃক্ষের পুত্রের পুর) রাখা হইল।"

গার্গীসংহিতায় পাটলিপুত্রের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। সে সময়ে পাটলিপুত্রস্থ রাজপ্রাসাদকে কুসুমধ্বজ বলা হইত। গুপ্ত-রাজগণের সময়েও পাটলিপুত্রের কিছু কিছু প্রাধান্য ছিল। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই হুনগণকর্তৃক পাটলিপুত্রের ধ্বংসসাধন হয়। ইহার পরে প্রায় সহস্র বৎসর পরে সের সাহের সময়ে পুনর্ব্বার পাটনার প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভে পাটনায় ইংরাজদের একটী প্রধান কুঠী ছিল এবং কিংবদন্তী বিশ্বাস করিলে পাটনাতেই কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের হিন্দুপত্নী-গ্রহণ ব্যাপার ঘটে। সাহ আলমের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে পাটনার বাদসাহী ও ইংরাজী ফৌজে যুদ্ধ ঘটে। পাটলি-পুত্রের যে স্থানে খনন হইতেছে, সেই স্থানে কণিষ্কের সময় হইতে প্রচলিত মুদ্রা ও সাহ আলমের নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

২। পাটলিপুত্রের অবস্থিতি

পাটলিপুত্র ঠিক কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। ডি

আনভিল নামক ভৌগোলিক ইহাকে আলাহাবাদে, ফ্রাঙ্কলিন নামক প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহাকে ভাগলপুরে, ও উইল ফোর্ড রাজমহলে, পাটলিপুত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মেজর রেনেল সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান পাটনাকে প্রাচীন পাটলিপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মেগস্থেনিস গঙ্গা ও ইরান্নোবোয়াসের সঙ্গম-স্থলে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পাটনার যে সার্ভে হয় তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পুরাতন সোন ও গঙ্গার সংযম হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সোন অনেক দূরে সরিয়া পড়াতে এখন আর গঙ্গা ও সোনের সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র বা পাটনা অবস্থিত নহে।

ফরাসী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জুলিয়েন স্থির করেন যে, পাটনার সন্নিকটস্থ কোন স্থানই পাটলিপুত্র। অবশেষে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ওয়াডেল এই স্থানে আসিয়া অনুসন্ধানে স্থির করেন যে পুরাতন পাটলিপুত্র যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই স্থান গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রধানতঃ তিনি ফা-হিয়ান এবং হিউয়েন-সিয়াংয়ের পর্য্যটন-কাহিনী অবলম্বন করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

শুভক্ষণেই চৈনিক পরিব্রাজকগণের এ দেশে শুভাগমন হইয়াছিল নতুবা অশোকের পাটলিপুত্রের স্থান নির্দ্দেশের বিশেষ আশা ভরসা ছিল না।

রেলিং
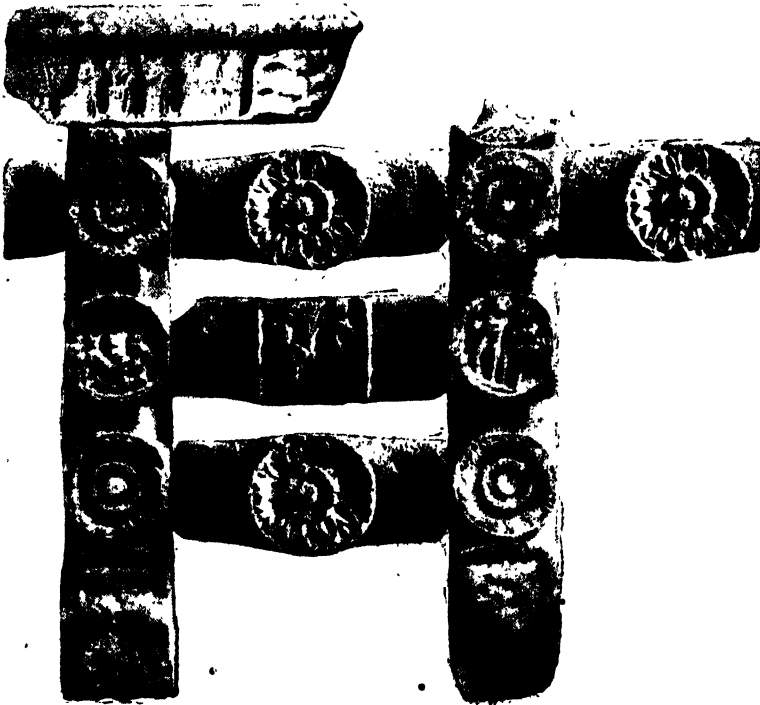
৩। পাটলিপুত্রের পূর্ব্বকার খননের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(ক) ১৮৭২ সনে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বেগলার সাহেবকে প্রাচীন পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, কানিংহাম স্বয়ং পাটলিপুত্রে আসিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রাচীন পাটলিপুত্রের অনেকাংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কানিংহাম সাহেব চৈনিক পরিব্রাজকগণের লিখিত কয়েকটী স্থান নির্দ্দেশে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্তম্ভের শীর্ষদেশ

(খ) ওয়াডেল সাহেব ১৮৯২ সনে পাটলিপুত্রে আগমন করিয়া "পাঁচ-পাহাড়ী" নামক স্থানে গমন করেন। হিউয়েন-সিয়াং তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে এই পাঁচ পাহাড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই পাঁচপাহাড়ী নামে বর্ত্তমানে পরিচিত স্থানই যে পর্য্যটক-উল্লিখিত পাঁচটি স্তূপ তাহাই নির্দ্ধারণ করেন। "ভিক্ষুপাহাড়" ও পাঁচ পাহাড়ীর মধ্যস্থিত প্রায় দুই মাইল স্থানে মৌর্য্যকালের খোদিত অনেক প্রস্তর দেখিয়া তিনি স্থির করেন যে, এই স্থানই প্রাচীন পাটলিপুত্র। তিনি মেগস্থেনিস-বর্ণিত কাষ্ঠ প্রাচীরেরও নিদর্শন পান।

(গ) উক্ত ওয়াডেল পুনর্ব্বার ১৮৯৪ সন হইতে এই কার্য্যে ব্রতী হন।

এই সময়ে তিনি দুইটি রেলিং প্রাপ্ত হন। একটী রেলিংয়ের আলোকচিত্র আমরা এই স্থানে প্রদান করিলাম। ওয়াডেল সাহেবের সহকারী মিঃ মিল্‌স্‌ ভূগর্ভে দ্বাদশ ফীট নিম্নে একটী সুন্দর ও বৃহৎ স্তম্ভের শীর্ষদেশ দেখিতে পান। ইহারও চিত্র আমরা এই স্থানে প্রদান করিলাম। ওয়াডেল এই উভয় দ্রব্যকেই গ্রীস দেশীয় স্থাপত্যবিদ্যার অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ঘ) ওয়াডেল সাহেবের নির্দ্দেশানুসারে পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার সি, আর, উইলসন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেও কিছুদিন খনন হয় কিন্তু ইহাতে কোন ফললাভ হয় নাই।

(ঙ) বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বলকারী প্রত্নতত্ত্ববিৎ পরলোকগত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে কয়েক বৎসর এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি দ্রব্যও তিনি আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে একটি অশোক-স্তম্ভের অংশ, একটী দেবীমূর্ত্তি এবং ১৯ ফীট নিম্নস্থ শালকাষ্ঠ ব্যতীত ১৮৯৭ সনে প্রাপ্ত বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

(চ) তৎপরে প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। কোন কোন স্থানে কূপ খনন কালে শালকাষ্ঠ বা ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইলেও স্থায়ী ভাবে কোন কার্য্য হয় নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ, ১৯১২ সনে বোম্বাই-সহরের ক্রোড়পতি মিঃ রতন তাতা কোন প্রাচীন স্থান খননের জন্য সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতিশ্রুত হন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া পাটলিপুত্র খননে স্থিরীকৃত হন। গবর্ণমেণ্ট এবং মিঃ রতন তাতার মধ্যে সর্ত্ত হইয়াছে যে, খনন কার্য্যে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে তাহা তাতা মহাশয়ের ইচ্ছানুযায়ী হয় বোম্বাই নগরে বা পাটনায় রক্ষিত হইবে। তবে বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইলে শ্রীযুক্ত তাতা মহাশয় কোন দ্রব্য পাটনাতেও রাখিতে পারেন। বর্ত্তমানে, দ্রব্যাদি বোম্বাই বা পাটনায় রক্ষিত হইলেও, অবশেষে দ্রব্যাদি গবর্ণমেণ্টেরই তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং দ্রব্যাদির সহিত মিঃ তাতার নাম সংযোজিত থাকিবে। যদি কোন দ্রব্য দুইটী পাওয়া যায়, তবে তাতা মহাশয় ইচ্ছানুসারে উহা যাঁহাকে ইচ্ছা দিতে পারিবেন।

এই সর্ত্তানুসারে দানবীর তাতা বাৎসরিক বিংশসহস্র মুদ্রাদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং ১৯১৩ সনে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্যতম সুযোগ্য কর্ম্মচারী ডাক্তার স্পুনারের অধীনে গত বৎসর পাটলিপুত্রের দুইটি স্থান খোদিত হইয়াছে।

গত বৎসরের খননে যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে শক যুগের কয়েকটি মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) মৃত্তিকা গর্ভে গুপ্তরাজগণের সমসাময়িক প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রাচীরের তলদেশে অশোকযুগের অনেকগুলি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি নিটোল স্তম্ভ দেখিবার জিনিষ। ইহার চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইয়েছে। স্তম্ভের নিম্নদেশে কতকগুলি অক্ষর রহিয়াছে।

(৪) মৃত্তিকার আট ফীট নিম্নে একটী ভস্মের

স্তর দৃষ্ট হইয়াছে এবং এই স্তরের উর্দ্ধদেশেই তৃতীয় দফার লিখিত প্রস্তর স্তম্ভের অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই ভগ্ন-স্তরের উপরে গুপ্তরাজ্যের সমসাময়িক প্রাচীর দৃষ্ট হইয়াছে। এই ভস্ম-স্তর ঠিক একইরূপ সমভূমিতে অবস্থিত নহে। সমদূরত্বে ইষ্টকপ্রস্তরের ভগ্নাবশেষের সহিত এই ভস্ম মৃত্তিকা-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, কোন সময়ে এই স্থানস্থিত প্রাসাদ জলমগ্ন হয়। সেই অবস্থায় ইহার উপরে ৮।১০ ফীট গভীর মৃত্তিকার স্তর পড়ে এবং পরে ইহার উর্দ্ধদেশস্থ প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়। স্তম্ভগুলির উর্দ্ধাংশ এই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেও, নিম্নাংশস্থিত অংশগুলি মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত থাকায় ভস্মীভূত হইতে পারে নাই। পরে, যে সকল কাষ্ঠখণ্ডের উপরে এই সকল স্তম্ভগুলি অবস্থিত ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, স্তম্ভগুলিও ক্রমশঃ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইতে থাকে। তাহাদের অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকামধ্যে বৃত্তাকার গর্ত্ত হইতে থাকে এবং গর্ত্তগুলি উর্দ্ধস্থ ইষ্টক ও প্রস্তরের ভগ্নাবশেষ দ্বারা পূর্ণ হয়। অবশ্য এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা বর্ত্তমানে সঠিকরূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। (২)

(৫) পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত অন্য আর একটী দর্শনীয় দ্রব্য হইতেছে কাষ্ঠের মঞ্চগুলি। স্তম্ভগুলির ঠিক দক্ষিণে ৩০ ফীট লম্বা, ৬ ফীট প্রস্থ ও ৪½ ফীট উচ্চ মঞ্চ-প্রায় কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এক একখানি কাষ্ঠখণ্ড সুবৃহৎ। আমরা ইহারও চিত্র আগামীবারে প্রদান করিব। এগুলি কি এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি এরূপ কাষ্ঠ-মঞ্চ দৃষ্ট হয় না। এরূপ মঞ্চ যে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত

(২) গত জুলাই মাসে আমি "ঢাকা রিভিউ" পত্রে অনুমানের বিষয় লিখি। উহার কিছুদিন পরে "ষ্টেটস-ম্যান পত্রিকায় একজন বিশেষজ্ঞ লেখক এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্প্রতি ডাঃ স্পুনারও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

শুধু যে কেবল তাহাই নির্দ্ধারিত হয় নাই তাহা নহে; ইহারা কত দিবসের তাহাও নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন। যদি তাহারা অশোক যুগের না হয়, তবে তাহাদিগকে আরও সুপ্রাচীন বলিতে হইবে, কারণ অশোকস্তম্ভের

স্তম্ভগুলির ভগ্নাবশেষ

আরও পাঁচ ফীট নীচে এই সকল কাষ্ঠমঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে।

আশা করা যায়, এ বৎসরের খননে এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ।

নিশীথ-রাক্ষসীর কাহিনী*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ভাল, সারি, সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি? ভূত আছে?"

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল। একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া ছুরি কাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুক্‌রা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদন মধ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক আধখানা আলুকে তৎসহবাসে প্রেরণ করিয়া একটু রুটী ভাঙ্গিয়া বামহস্তে রক্ষা পূর্ব্বক অগ্রজের মুখপানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণ কার্য্য সমাপন করিল। পরে একটুকু সেরি দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল "ভূত? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল "Rather laconic."

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষ মাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না।

যথাবিহিত সময়ে, অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন "Laconic? বরং একটি কথা বেশী বলিয়াছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে "ভূত আছে?" আমি বলিলেই হইত 'না'। আমি বলিয়াছি 'ভূত? না।' 'ভূত' কথাটি বেশী বলিয়াছি, কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।"

এই বলিয়া বরদা আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবচলিত-চিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল, তখন বরদা বলিল "Seriously সারি! ভূত আছে বিশ্বাস কর না?"

সারি। না। †

বরদা। একদিন ভূত দেখলে তোমার আক্কেল হবে।

সারি। আমি একবার ভূত দেখেছিলাম। সেই জন্যই ত ভূত আছে ব'লে বিশ্বাস করি না।

---

* "এই ভূতের গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গল্পটি সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।" বঙ্কিমজীবনী (শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত)।

দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কোন লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের এই গল্পটির একটা 'উপ'-সংহার পর্য্যন্ত করেন নাই। এতদিন বাদে শুধু 'উপ'সংহার করাটা স্বর্গীয় কবির প্রতি অবিচার হয়, তাই যথাসাধ্য ইহার পুরাদস্তুর 'সংহার'ই করিয়া দিলাম। লেখক।

† এই পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা।

বর। কি রকম? ভূত দেখে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান? নূতন ধরণের কথা বটে!

সারি। ব্যাপারটা শুন্‌লে সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। আগে খাওয়াটা শেষ হোক্‌। তারপর সব বল্‌ছি।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই ভ্রাতা ভোজন সমাপন করিয়া বারান্দার দুখানি কঞ্চির চেয়ারে আসীন হইলেন। সুগন্ধি সিগারেট ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বরদা বলিল "বল, সারি। তোমার ভূত দেখার কথাটা শোনা যাক্‌।"

তখন চারিদিক রজনীর অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছিল। বারান্দার কিনারায় গোটা কতক টবে বিলাতী ফুলের গাছ সজ্জিত ছিল। মধ্যে মধ্যে বাতাস আসিয়া তাহার ডালপালাগুলি নড়াইতেছিল। তখনও চাঁদ উঠে নাই। তারাগুলি মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। বারান্দায় আলোক ছিল না। অন্ধকারে দুই ভ্রাতার মুখে স্থিত দুইটি চুরুটের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতেছিল।

সারদা বলিল "তখন তুমি বিলাতে ডাক্তারি পড়িতে গিয়াছ। আমি সেবার ধারমঠের রেলওয়ে ব্রিজ নির্ম্মাণ করিয়া বেশ কিছু টাকা হাতাইয়া ছিলাম। জানই ত, সোনার বেনে আমরা, আমাদের কাছে যে কেউ চালাকি করে ঠকিয়ে যাবেন তা হতেই পারে না। কণ্ট্রাক্টর হতে কুলি পর্য্যন্ত সকলে জান্‌ত যে এ বাবুর কাছে চালাকি চলিবে না। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি দু পয়সা রোজগার কর্‌তে, দান খয়রাত কর্‌তে ত আর নয়। কাজেই যাতে বেশ মোটা রকমের কিছু টাকা হাতান যায়, সর্ব্বদাই সেই মতলব কর্‌তুম। পোলটা তৈরি করে বেশ দুপয়সা করে নিয়েছিলুম।"

বরদা বলিল "সারি! তুমি যে পয়সা কর্‌বে তা আর আশ্চর্য্য কি? তোমার মাথায় যে সব ফন্দী খেলে তা বড় বড় ব্যারিষ্টারদের বুঝ্‌তে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'তে হয়। সেই বাড়ীর মাম্‌লা মনে কর—"

সারদা বলিল "একবার কিন্তু জীবনে আমাকে ঠক্‌তে হয়েছিল। সে লোকটা আমার ওপর যায়। উদ্দেশে তাকে প্রণাম করি। সে ছাড়া আর কেউ আমাকে জব্দ কর্‌তে পারে নি।

বর। তোমাকে জব্দ? সে কি? বল, বল এই গল্পটাই আগে শুনি।

সার। ভূতের কথা আর এই গল্প, একই। শোন না। শুন্‌লে সব বুঝতে পার্‌বে।

বর। বল। দিয়াশলাইটা দাও, আর একটা চুরুট ধরাই।

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বরদা দিয়াশলাই লইল ও চুরুট ধরাইতে মনোনিবেশ করিল। সারদা গল্প আরম্ভ করিল—

"ব্রিজের টাকাগুলো পেয়ে মনে কর্‌লুম এগুলো ব্যাঙ্কে রাখা হবে না। খাটিয়ে কিছু বাড়াতে হবে। তখন মধুপুরের কাছে একটা নূতন সহর প্রতিষ্ঠা হইতেছে। অনেক বড়লোক স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য এই মনোরম স্থানটিতে বাড়ী ঘর তৈরি কর্‌তে আরম্ভ করেছেন। আমারও খেয়াল হইল, একটা বড় বাড়ী তৈরি করে ভাড়া দেবো। বাড়ী একখানা হবে বটে কিছু সেটাকে এমন

ভাবে তৈরি করা হবে যে সাত আটখানা আলাদা আলাদা বাড়ী তা থেকে করে নেওয়া যাবে। প্রত্যেক বাড়ীর আলাদা কপাট, আলাদা সব। নিজেই ত বাড়ীটার নক্সা করে ফেল্‌লুম। সব ঠিক্ করে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম।"

বর। জমী ঠিক করবার আগেই বাড়ীর নক্সা তৈরি হয়ে গেল?

সার। শোন না; সেই জন্যই ত গোল হ'ল। সেখানে গিয়ে সুবিধামত জমী আর পাই না। পাহাড়ের উপর বেশ সুন্দর খানিকটা জমী ছিল। তা সেটা সেখানকার একজন লোক আগে থাকৃতেই কিনে রেখেছে। সে জমী কিছুতেই বেচতে রাজী নয়। আমি ভাবলুম, আমি শ্রীসারদাকৃষ্ণ সেন ইঞ্জিনিয়ার আমার সঙ্গে চালাকি! তাকে বল্‌লুম 'আচ্ছা তুমি জমী বেচ্‌তে না চাও, বিশ বছরের মত ঐ জমী আমায় লিস্ (Lease) দাও।

লোকটা তাতেও কিছুতে রাজী হতে চায় না। তখন আমার নক্‌সা খানি তার সামনে খুলে ধর্‌লুম। বল্লুম 'ওহে বাপু, এই এত বড় একখানি বাড়ী তৈরি হবে। বিশ বচ্ছর আমি ভোগ কর্‌ব, তারপর জমীও তোমার হবে বাড়ীও। রাজী হওত বল।'

লোকটা খানিকক্ষণ ভেবে বল্লে 'কাল আপনাকে জানাব।'

আমি বুঝ্‌লুম টোপ্ গিলেছে। একটু খেলিয়ে তুল্‌তে হবে। গম্ভীরভাবে 'আচ্ছা' বলে চলে এলুম।

তার পরদিন রীতিমত রেজেষ্ট্রী করে লীস্ নিলুম। বাড়ী তৈরি হতে লাগ্‌ল।

বুঝ্‌তেই পাচ্ছ সারদাকৃষ্ণ সেন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী তৈরি হচ্ছে। তা আবার লীস্ নেওয়া জমীর উপর। বিশবছর বাদে তা অন্য লোকের সম্পত্তি হবে। সে বাড়ীতে নিজে থাক্‌ব না, ভাড়াটে বস্‌বে। এই হিসাবে বাড়ী তৈরি হ'তে লাগ্‌ল। যত রকম ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, যত কম পয়সা খরচ হতে পারে সেই রকমে বাড়ীখানি তৈরি করা গেল। বাড়ীর বাইরেটাতে নীল রঙ দিয়ে দেওয়া হ'ল। সামনে একটু রাস্তা। দূর থেকে দেখ্‌তে যেন ছবিখানি। যে লোকটার জমী সে ত আর আহ্লাদে বাঁচে না। দুবেলা এসে দেখে দেখে যায়। মনে মনে ভাবে বিশ বচ্ছর বাদে এ বাড়ী আমার হবে। আমি তার দিকে চেয়ে মনে মনে হাসি আর বলি 'বাবা, সারদাকৃষ্ণের বাড়ী ভোগ কর্‌বে এমন লোক এখনও দুনিয়ায় জন্মায় নি। বিশবচ্ছর ত দূরের কথা, পনের বচ্ছর বাদে এ বাড়ীর একখানা ইটও থাকবেনা।"

বরদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "আচ্ছা মালমসলা দিয়ে বাড়ীখানি তৈরি করেছিলে ত?"

সার। তা কর্‌ব না? আমরা ঐ কাজ করে পেকে গেলুম, আর একবেটা খুঁটিওয়ালা একটু জমি লীস্ দিয়ে ঠকিয়ে একখানা বাড়ী নেবে? বাড়ী ত তৈরি হল। চারদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসোপযোগী, আটখানি বাড়ী পাশাপাশি ভাড়া দেওয়া হবে। কেউ ইচ্ছা কর্‌লে দুখানি বা তিনখানি একত্রে ভাড়া নিতে পারেন। নূতন বাড়ী স্বাস্থ্যকর স্থান

প্রভৃতি প্রলোভন যতদূর দেখাবার তা দেখান গেল। বিজ্ঞাপনের খুব ফলও হল। দু মাসের মধ্যে সব বাড়ীগুলি ভাড়া হয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত।

দু বছর এই রকম করে কেটে গেল। বাড়ীগুলি থেকে বেশ আয় হতে লাগ্‌ল। যে বেটার জমী সে কেবল টঁাকছে কতদিনে বাড়ী তার হয়। আমি মনে মনে হাস্‌ছি আর বল্‌ছি। 'তোমার আক্কেল দাঁত গজিয়ে তবে ছাড়্‌ব।'

তৃতীয় বৎসরের প্রথমে মাঝের একখানি বাড়ী ছাড়া আর সবগুলি এক Season এর জন্য ভাড়া হয়ে গেল। মাঝেবটির আর ভাড়াটে জুটছে না। এই সময় আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধর্‌ল। আমি মনে কর্‌লুম, যাই কিছুদিনের ছুটি নিয়ে একবার ঐখানেই হাওয়াটা বদ্‌লে আসি। দরখাস্ত করে তিন-মাসের ছুটি নিলুম। রওনা হবার যোগাড় কচ্ছি এমন সময় আমার সরকারের এক চিঠি পেলুম যে মাঝের বাড়ীখানি সেইদিন ভাড়া হয়ে গেছে।

আমি সরকারকে টেলিগ্রাম কর্‌লুম সে যেন আমার জন্য আর একখানি বাড়ী দেখে রাখে। দুদিন বাদে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুলুম। সরকার আমার জন্য একখানা ছোট বাড়ী ঠিক্ করে রেখেছিল। সেই-খানেই ওঠা গেল।

মাঝের বাড়ীর ভাড়াটের কথা সরকারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম। সে বল্লে 'মশাই বড় বিপদে পড়েছি। বাঙ্গাল এক বেটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। নানা রকম ফ্যাসাদ আরম্ভ করেছে। এটা সারিয়ে দাও, ওটা সারিয়ে দাও। বেটা যেন মেটেবুরুজের নবাব। অমন নতুন বাড়ী পছন্দ হয় না। বেটার দেশের বাড়ী হয় ত খোলার চাল, এখানে এসে আমিরী দেখাচ্ছে।'

আমি বলিলাম 'অগ্রিম এক Season এর ভাড়া নিয়েছ ত?'

সরকার বলিল 'আজ্ঞে তা না নিয়ে কি আর বেটাকে বাড়ী ঢুকতে দিই? ছ মাসের ভাড়া আগাম নিয়েছি আর দু বচ্ছরের এগ্রিমেণ্ট।

তাই জন্যে আরও বেটার রোখ্। বলে আগাম ভাড়া নিয়েছ, বাড়ী মেরামত কর্‌বে না কেন?

আমি বুঝিলাম দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এর মধ্যেই আমার ইঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধিতে প্রস্তুত বাড়ী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

বলিলাম 'আচ্ছা, তা দেখা যাবে।

সরকার বলিল 'আজ্ঞে, সে এখনই আপনার কাছে আস্‌বে। বলেছে বাবু আস্‌ছেন, তাঁর সঙ্গেই সব কথা ঠিক্ কর্‌ব। তুমি সরকার তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে আর কি হবে!"

আমি বলিলাম 'আচ্ছা।' সরকার চলিয়া গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু, চক্ষু রক্তবর্ণ, হাতে এক কোঁৎকা, আমায় দেখিয়া বলিল 'আপনিই সারদাবাবু, ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। আপনার বাড়ীটি নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আপনাকে এর একটা বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।'

আমি বুঝিলাম এ সেই বাঙ্গাল। বলিলাম 'সে কি কথা? নিশ্চয়ই করব। আপনাদের সন্তুষ্ট না রাখ্‌লে আমার চল্‌বে কি করে? আপনাদের অনুগ্রহেই ত করে খাচ্ছি।'

বাঙ্গাল বলিল 'বিলক্ষণ! সে কি কথা! আপনি মহাশয় লোক। আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি না দেখ্‌লে আমাদের দেখবে কে?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

সে বলিল 'আমি একা।'

"একা? রান্নাবান্না কে করে?"

"নিজেই।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম। বেটা বলে কি? এখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে এসেছে। নিজে রেঁধে খায়! ভাবিলাম, বোধ হয় কোন রোগী শীঘ্র আসিবে। বলিলাম 'কার জন্য বাড়ী নিয়েছেন?'

"আমারই জন্য। আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়। একটু স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে আসিয়াছি।"

আমি ত অবাক্। এই ভীম শরীর। এর উপর আবার স্বাস্থ্যোন্নতি! বেটা কি রামমূর্ত্তির খেলা দেখাবে নাকি? মুখে বলিলাম 'ওঃ! তা আপনার অভিযোগ কি?'

"দেখুন, ঘরগুলির ছাদ ত সব ফুটো হয়ে গেছে। কাল রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তা শোবার ঘরখানিতে খাটিয়া টেনে টেনেই অস্থির। যেখানে খাটিয়াটি সরাই সেখানেই টপ্ টপ্ করে জল পড়ে। শেষে খাটিয়ার উপরে ছাতা খুলে সারারাত বসে কাটিয়েছি।

আমার এত হাসি পাইতেছিল যে বুঝি পেট ফাটিয়া যায়। অনেক কষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিলাম, 'বলেন কি? সরকারটা দেখ্‌ছি কোনও কাজের নয়। আমি আজই মিস্ত্রী পাটিয়ে সব ঠিক্ করে দোব।'

"আর দেখুন, দেওয়াল থেকে বালি চুণ সব খসে পড়্‌ছে। সে গুলোও মেরামত করে দিতে হবে। আর কপাট জানলা গুলো বন্ধ করলেও তার মাঝে এমন ফাঁক থাকে যে তা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঢোকে আর রান্না ঘরে জল ঢালবার যে নর্দ্দামা আছে তাতে জল ঢাল্‌লে জল আট্‌কে থাকে, সেটাকে একটু বড় করে দিতে হবে, আর ছাতের পাইপটা দু তিন জায়গায় ছ্যাদা হয়ে গেছে—আর—"

সর্ব্বনাশ! বাঙ্গালটা মাসিক পত্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের ন্যায় অবিরাম চল্‌ছে যে! বলিলাম 'সব ঠিক্ করে দোব। আমি আজই মিস্ত্রী পাঠিয়ে দিচ্ছি, যা যা দরকার তাদের বল্‌বেন। তারা ঠিক করে দেবে। আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না।' এই বলিয়া লাঠিটা লইয়া জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম!

বাঙ্গালটা কি তবু ছাড়ে? সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বলিল, 'যে আজ্ঞে! আপনি মহাশয় ব্যক্তি! আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি—'

আমি বলিলাম 'আপনি কোন্ দিকে যাবেন?'

সে একটা রাস্তা দেখাইয়া বলিল 'এই দিকে।'

আমি তাহার বিপরীত একটি গলির দিকে গিয়া বলিলাম 'আচ্ছা, আসুন তাহলে প্রণাম। আমার এইদিকে একটু কাজ আছে।'

তখন বাঙ্গালটা বিদায় হয়। বাপ্। হাঁফ ছাড়িয়া তখন ঘরে আসিয়া জুতা খুলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমার নির্দ্দেশক্রমে সরকার দুজন মিস্ত্রী পাঠাইল। তাহারা কেবল ছাদ মেরামত করিয়া দিয়া আসিবে এই বলিয়া দেওয়া হইল। গোবর ও চূণ মিশাইয়া ছাদের উপর একটা কোটিং (Coating) দিবে। ছাদ খোঁড়া হইবে না। বর্ষাকালটা এই রকমে রিপু করিয়া চলুক। শীত গ্রীষ্মে কোন ভয় নাই। আর বছর বর্ষাকালে যা হয় দেখা যাইবে।

তারপর দিন বাঙ্গালটা আবার আসিয়া হাজির। বলিল, মিস্ত্রীরা কিছুই করে নাই। তাহার কথা শোনে নাই। ছাদে গোবর ঢালিয়া কি একটা কাণ্ড করিয়াছে। মেরামত প্রভৃতি কিছুই হয় নাই।

আমি তখন নিজমূর্ত্তি ধরিলাম। সমস্ত seasonএর ভাড়া অগ্রিম আদায় হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালটা করিবে কি? বলিলাম 'আবার কি হ'বে? গোটা বাড়ীটা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে দিতে হবে নাকি? তুমি কোথাকার লোক? বাড়ী যখন ভাড়া করেছিলে তখন দেখে নিতে পারনি? নানা রকম ফ্যাচাঙ্ বার্করে উদ্বাস্ত করে তুলেছ।'

"আজ্ঞে, দোর জানালা বন্ধ কল্লেও কপাটের ভেতর দিয়ে ফাঁক বয়, হু হু করে হাওয়া ঢোকে।"

"তা ঢুকবেই ত! এসেছ হাওয়া বদলাতে। হাওয়া খাবে না? ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে এ বাড়ী তৈরি হয়েছে, ventilation না থাক্‌লে সে বাড়ী বাস-যোগ্যই নয়, তা জান? থাক পাড়াগেঁয়ে, এ সব বুঝ্‌বে কি?"

"আর রান্নাঘরে যে নর্দ্দামা দিয়ে জল বেরোয় না।"

"সেখানে জল ঢাল কেন? একটা মাটির গাম্‌লা কেন'। তাতে জল ঢাল। গাম্‌লা ভর্ত্তি হ'লে বাড়ীর বাইরে গাম্‌লা নিয়ে গিয়ে জলটা ফেলে দিলেই হবে।"

"আর বালি চূণ খসে পড়্‌ছে যে—"

"তোমার বায়নাক্কা ত কম নয়? দেবে ত মাসে ত্রিশটি টাকা ভাড়া। তা ইট বারকরা দেওয়াল হলে তোমার ঘুম হয় না। কি এমন নবাবপুত্তুর তুমি যে তোমার জন্যে ঘরে পেণ্ট্ করে দিতে হবে। আর কিছু হবে টবে না। মিছামিছি আর জ্বালিও'না। পছন্দ না হয় অন্য বাড়ী খুঁজে নাও গে।"

"আজ্ঞে তা হলে আমি বাড়ীই বদলাব।"

"স্বচ্ছন্দে।"

"আমার টাকা তা হলে ফেরৎ দিন।"

"কিসের টাকা?"

"আমি যে ছমাসের ভাড়া আগাম দিয়েছি।"

"সে টাকা কেন দোব? আমি ত আর তোমায় উঠিয়ে দিচ্ছিনি। তোমার পোষাচ্ছে না তুমি উঠে যাচ্ছ।"

"আজ্ঞে, আপনি আইনতঃ বাড়ী মেরামত করতে বাধ্য।"

"বেশ। আদালতে নালিশ করগে যাও। এই গলির মোড়েই শ্যামাচরণ বাবু উকীল থাকে। যাও—তাঁর কাছে। দেখ, কি করতে পার।"

বাঙ্গালটা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমিও শীষ্ দিতে দিতে বাবুর্চ্চিকে ফাউল কারির অর্ডার দিলাম।

তারপর দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। শুনিলাম, বাঙ্গালটার ভারি পসার। কাহাকেও মাদুলি দিতেছে। কাহারও বাড়ী স্বস্ত্যয়ন করিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম ব্যাটা আমার কাছে জব্দ হয়ে গেছে।

চার পাঁচদিন পরে একদিন সকালবেলা চা বিস্কুট খাইতেছি এমন সময় আমার বাড়ীর ভাড়াটিয়া তিনচারজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখের ভাব উদ্বেগব্যঞ্জক। আমি তাঁহাদিগকে খাতির করিয়া বসাইলাম। তাঁহাদের মধ্যে অবিনাশ বাবু বয়সে প্রবীণ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ব্যাপার কি?'

অবিনাশ বাবু বলিলেন 'মশাই, আমাদের সবাইকে ত আপনার বাড়ীগুলি ছাড়্তে হ'ল।'

"কেন?"

"আজ্ঞে, এতদিন বেশ ছিলুম, কিন্তু দিন দুই তিন হ'তে বাড়িগুলিতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে।"

আমি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম 'ভূত? বলেন কি মশায়? তামাসা কচ্ছেন নাকি?'

"আজ্ঞে না। তামাসা কি? প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমার ছোট মেয়েটির হাঁপানির ব্যারাম। এখানে সারাতে এসে-ছিলুম। দুর্ব্বল শরীর। ভূত দেখে তার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে। গিরীন বাবুর পরিবার ত মাথার দিব্য দিয়ে বলেছিলেন আজই বাড়ী ছাড়্তে হবে। ছেলেপুলে সব ভয়ে কাঁটা।"

আমি ভাবিলাম, এ সেই বাঙ্গাল বেটার কারচুপি। বলিলাম 'কি হয়েছিল খুলে বলুন দেখি। কোথায় ভূত বেরুল?'

"আজ্ঞে কোথায় তা কি ঠিক্ আছে? কখনও আমার বাড়ীর ছাদে। কখনও গিরীন বাবুর ছাদে। কখনত কোথাও কিছু দেখা যায় না, বিকট হাসির শব্দ। কখনও মেয়েলি গলায় গান, সে ভয়ানক ব্যাপার।

"দেখুন, এ সব সেই বাঙ্গাল বেটার বদ্মায়েসি। নইলে ভূত কোথা থেকে আসবে? এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না, আর বাঙ্গালটা আস্তেই ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হ'ল। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন্। আমি বাঙ্গালটাকে সিধে করে দিচ্ছি।

আপনি বলেন কি? তিনি ত ভূতের একজন বিখ্যাত ওঝা। তিনি যেদিন বাড়ীতে থাকেন সেদিন ত' কোনও উপদ্রবই হয় না। তিনি যেদিন বাড়ীতে না থাকেন সেইদিনই উপদ্রব হয়।

"তিনি আবার [illegible] কোথায়?"

"তিনি শাক্তি [illegible] করেন। শ্মশানে মশানে যান বোধ হয়।"

আমার আর সহ্য হইল না। বলিলাম "দেখুন আপনারা সব শিক্ষিত লোক। ঐ

বুজরুক বাঙ্গালটার কথায় ভোলেন। ভূত টুত কিছু নয়। সব ও বেটার বদ্‌মায়েসি। আমি আজই ভূত তাড়াচ্ছি। আপনারা দু একদিন চুপ্ করে থাকুন।”

স্থির হইল, আমি সেইদিন অবিনাশবাবুর বাড়ীতে গিয়া রাত্রিতে থাকিব ও স্বচক্ষে ভূতের কাণ্ড দেখিব।

সন্ধ্যার পর বাবুর্চ্চি গরম গরম খানা আনিয়া দিল। খাইয়া বেশ একটু অধিক মাত্রায় ব্র্যাণ্ডি টানিলাম। তারপর স্ফূর্ত্তির সহিত অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় দেখিয়া গেলাম, বাঙ্গালটার বাড়ীর দ্বারে বাহির হইতে তালা বন্ধ। শুনিলাম উকীল শ্যামাচরণ বাবুর মাতার সঙ্কটাপন্ন পীড়াশান্তির জন্য সে শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত রাত্রি হোম করিবে।

সরকারকে শ্যামাচরণ বাবুর বাটিতে পাঠাইয়া বলিয়া দিলাম, ‘বাঙ্গালটা যদি সেখানে না থাকে ত আমায় আসিয়া খবর দিবে। আর যদি থাকে ত সেখানে বসিয়া সারারাত তাহাকে পাহারা দিবে। কোথায় যায় সন্ধান করিবে।’

সরকার চলিয়া গেল। আমি অবিনাশ বাবুর ছাদে উঠিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গে কেহ থাকিতে স্বীকৃত হইল না। আমি একাকী একখানি চৌকির উপর বসিয়া রহিলাম।

তখন বর্ষাকাল। আকাশে চন্দ্র, তারকা কিছুই দেখিবার উপায় নাই। মেঘে সারা আকাশ ঢাকা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে আমি বেশ করিয়া ওয়াটার-প্রুফে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রহিলাম।

আমার বাড়ীগুলির ছাদ একই। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রাচীর তুলিয়া বাড়ী গুলিকে পৃথক্ করা হইয়াছে। আমার পিছনে এইরূপ প্রাচীর। তাহাতে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলাম। সামনে ছাদের শেষে আবার একটা ঐ রকম প্রাচীর।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। কোনও সাড়াশব্দ নাই। কেবল ‘টপ্ টপ্’ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতেছিল। কিছুদূরে একটা গাছ ছিল। মাঝে মাঝে তাহার উপর দু একটা পাখী বোধ হয় ডানা নাড়িতেছিল। তাহারই ঝট্‌পট্ শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম।

এগারটা, বারটা বাজিয়া গেল। কোথাও কিছু নাই। বসিয়া বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। একবার উঠিয়া বেড়াইব বলিয়া দাঁড়াইলাম।

ও-কি-ও! খুব মিষ্ট গলায় কে যেন গান গাহিতেছে শুনিতে পাইলাম। অতি করুণ বিষাদময় সুর। গানের কথা বুঝিতে পারিলাম না। কোথা হইতে গান আসিতেছে। তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কে যেন গান গাহিতেছে ও হাততালি দিয়া তাল রাখিতেছে। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখা গেল না। একবার বিদ্যুৎ চমকিল। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই।

খানিকক্ষণ পরে গান থামিয়া গেল। আবার চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

তখন আমার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। একটু ছাদের উপর বেড়াইলাম। একবার মনে করিলাম—অবিনাশ বাবুকে ডাকি। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা হইল। তাঁহারা মনে করিবেন কি?

ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—কতকগুলি উপর্য্যুপরি শব্দ হইল। আমি যে প্রাচীরে ঠেস্ দিয়াছিলাম ঠিক তাহার পিছনেই শব্দ হইল—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্। আমি সাহসে ভর করিয়া চৌকির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের অপর পার্শ্বে কিসের শব্দ হইতেছে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। মনে হইল শুভ্রবর্ণ কি একটা পদার্থ চলিয়া বেড়াইতেছে। শৃঙ্গের উপর কি একটা উঁচু হইয়া রহিয়াছে।

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম 'কে?'

উত্তর নাই। সঙ্গে একখানা ছোরা ছিল, সেইখানা সশব্দে সেই পদার্থটার উপর নিক্ষেপ করিলাম। অমনি হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি বিকট হাস্যধ্বনি। আমার রক্ত জল হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে নামিয়া পড়িলাম।

সেই হাস্যধ্বনি বাড়ীর আর আর সকলেও শুনিতে পাইয়াছিল। বোধ হইল নীচে কে যেন মূর্চ্ছা গেল। অস্ফুট গোলমাল হইতে লাগিল। আমি নামিতে যাইব এমন সময় দশদিক্ আলোকিত করিয়া একবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। আতঙ্কে প্রাচীরের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম—প্রাচীরের উপরে উন্মুক্তকুন্তলা, বিস্রস্তবসনা এক রমণীমূর্ত্তি। সে একবার হাততালি দিয়া আবার হাসিল—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

তাহার পরই বিকট বজ্রধ্বনিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম বাসায় শয়ন করিয়া আছি। পাশে সরকার ও সেই বাঙ্গাল। বাঙ্গালটা বলিল 'বাবু! এখন কি রকম বোধ কচ্ছেন?'

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। এই ব্যাটার জন্যই ত এত কাণ্ড। কোনও উত্তর দিলাম না।

বাঙ্গাল আবার বলিল 'বাবু আপনি ইংরাজি পড়েছেন। ভূতপ্রেত ত মানেন না। 'ভেণ্টিলেসন' না 'পেণ্টিলেসন' করতে কবাট জান্‌লা খুলে রাখেন। হাওয়া বইলেই উপদেবতার উপদ্রব হয়। যাক্, এখন সাম্‌লেছেন ত? আমাদের কাজই হচ্ছে এই হাওয়া নিয়ে। কত অপদেবতা তাড়িয়েছি তার কি সংখ্যা আছে। আপনি ভাববেন না। কিছু দক্ষিণার বন্দোবস্ত হলেই আমি ভূতটুত সব তাড়িয়ে দোবো।'

আমাকে তখন সামলাইতে হইল। ভূতের উপদ্রব হইলে সব ভাড়াটিয়া ত পলাইবে। হানা বাড়ী বলিয়া প্রচার হইলে ভবিষ্যতে আর ভাড়াটিয়াও জুটিবে না। কাজেই গায়ের রাগ গায়ে মারিয়া বলিলাম 'ঠাকুর! আপনি মনে করিলে কি না পারেন? এ উপকারটি আপনাকে করিতেই হইবে।'

বাঙ্গাল বলিল 'তার আর কি? আমার বাড়ীটা সারিয়ে দিন। ঐ বাড়ীতেই বসে স্বস্ত্যয়ন করব।'

সেইদিনই বাড়ী মেরামত করাইয়া দিলাম। বিকালবেলা দাঁত বাহির করিয়া বাঙ্গালটা হাজির। বলিল 'এবার দক্ষিণার বন্দোবস্তটা হ'লেই—'

কি করিব! উপায় নাই! বাঙ্গাল যাহা বলিল, তাহাই করিতে হইল। দুই বৎসরের ভাড়া পাইয়াছি বলিয়া বাঙ্গালকে এক রসিদ

লিখিয়া দিলাম। রাত্রিতে স্বস্ত্যয়ন ও ভুত শান্তি হইবে।

তৎপরদিন সকালে অবিনাশ বাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া হাজির। বলিলেন 'যাহোক্, খুব ভয়টা পেয়েছিলেন। হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমরাও কি 'আগে জান্‌তুম? তা হ'লে কি আর এত ভয় পাই?'

"কি জান্‌তেন না?"

"আপনি এখনও শোনেন নি। বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক পাগ্‌লী পরিবার আছে। সে ঐ রকম হাস্‌ত, গান গাইত। মই নিয়ে ছাদে উঠত। কেউ ভাড়াটে রাখে না বলে পরিবারের কথা প্রকাশ করেন নাই। নিজে যখন থাকতেন সাবধানে রাখ্‌তেন। বেরিয়ে গেলে পাগলী ছুটোছুটি করে বেড়াত। আজ আমাদের সবাইকে ভটাচার্য্য মহাশয় বল্লেন আর গোপন করা উচিত নয়। সারদাবাবু অমন মহাশয় লোক, উনিই ত সে দিন গিছলেন আর কি? যাহোক্ আমরা এখন নিশ্চিন্ত হলুম। আপনিও shockটা কাটিয়ে উঠেছেন ত?"

আমি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া—"

সারদাকৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি জুড়ি আসিয়া বারান্দার সম্মুখে লাগিল। একজন খানসামা কোচবাক্স হইতে নামিয়া গাড়ির লণ্ঠনের আলোকে বরদাকৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া সেলাম করিয়া বলিল "জমীদার বাবুর বড় অসুখ। আপনাকে এখনই যেতে হবে।"

"চল।" বলিয়া বরদাকৃষ্ণ উঠিলেন। বলিলেন "সারি, বাকিটা বুঝে নিয়েছি।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১। হিত-গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড *

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য-কানন এক সুকণ্ঠ বিহঙ্গের কল-লহরীতে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুর পাকিবার পূর্ব্বেই সে কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, পাখী অজ্ঞাত লোকে উড়িয়া পলাইয়াছে। বঙ্গ দেশ ও সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই!

আমরা কবি হিতেন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি। হিতেন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার যে জীবনী এই গ্রন্থের অবতরণিকায় সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহা হইতে গ্রন্থকারের পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করিব। কারণ কবির জীবনী হইতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাঠকের নিকট সুপরিস্ফুট হয়।

হিতেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশব হইতেই কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীত, এই তিন কলাবিদ্যায় তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং প্রতিভাও

---

* হিত-গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পুণ্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের নিকট শিক্ষা পাইয়া সঙ্গীতে তাঁহার কণ্ঠ অপরূপ সুধা বর্ষণ করিত। তাঁহার স্বর সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ছিল। 'বিশুদ্ধ তাললয়ে ধ্রুপদ ও খেয়াল প্রভৃতি হিন্দী গান তাঁহার কণ্ঠে বড়ই মধুর শুনাইত। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য্য ফাদার লাফোঁ একবার তাঁহার কণ্ঠে হিন্দী তেরেনা গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন যেন Gregorian Chant. জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীতে নিজে সুর সংযোগ করিয়া তিনি যখন সেইগুলি গাইতেন, তখন মনে হইত, জয়দেবের গান যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের ইতিহাস-উদ্ধারেও তিনি আজীবন যত্ন করিয়াছিলেন। পুণ্য, নব্যভারত, সাহিত্য, সমীরণ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাদিতে তিনি ভারত-সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ
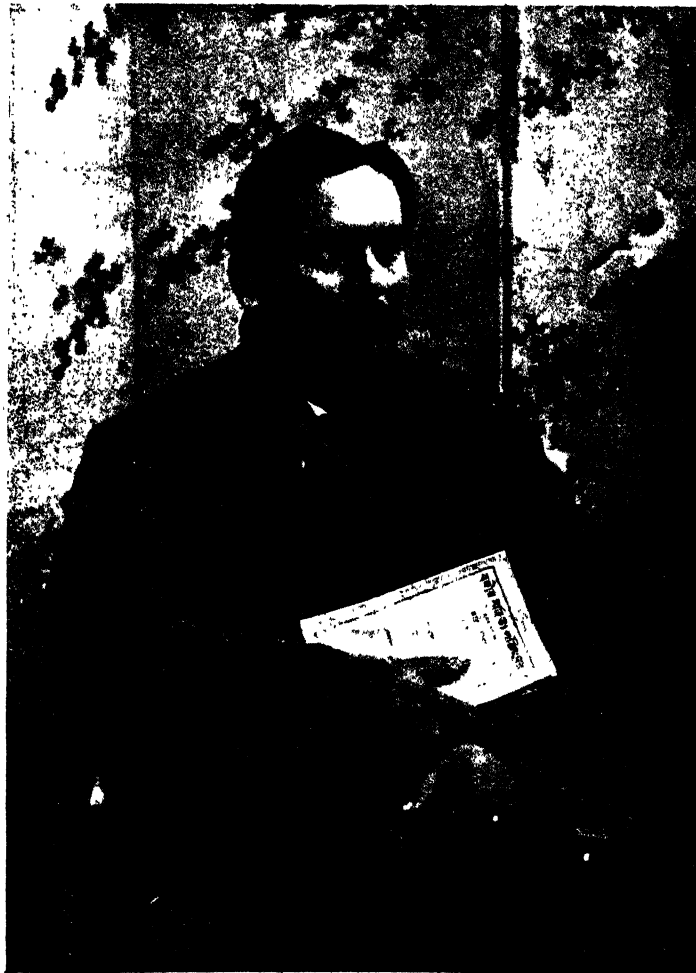
হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি সঙ্গীত-কথাসরিত নামে ভারত সঙ্গীতের এক সুবৃহৎ ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যেও তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইতেছিল। তিনি চারিখানি নাটক, আট-দশখানি কাব্যগ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন নানাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন নামে সজ্জিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ, "শতদল" কয়েকটি কোমল কবিতার সমাবেশ। দ্বিতীয় গ্রন্থ, "ত্রিশূল।" দুই গ্রন্থে পার্থক্য গভীর। 'শতদলের' কবিতাগুলি শতদলের মতই শোভায় সৌন্দর্য্যে কোমলতায় ঢল-ঢল, আর 'ত্রিশূলের' কবিতাগুলি শ্মশান-চারী ভূতপতি ভবানীনাথের জটাজালের মতই গম্ভীর, তেজোদীপ্ত। কবির সমসাময়িক কালে সমাজ-প্রাঙ্গণে যে সকল আবর্জ্জনা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহারই সংস্কার কল্পে কবি ত্রিশূল প্রকাশ করেন। কিরূপে সমাজ ও গৃহ, তপস্যা, আত্মনির্ভরতা ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, 'ত্রিশূলে' কবি তাহারই আভাস দিয়া গিয়াছেন। 'ত্রিশূল' যখন প্রকাশিত হয়, কবির বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র।

চিত্রবিদ্যায় তাঁহার শক্তি যথেষ্ট ছিল। পূর্ব্বে বঙ্গীয় মাসিক পত্রাদিতে রঙ্গীন ছবি বাহির হইত না। হিতেন্দ্রনাথের পুণ্যই প্রথম এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে। প্রথম দুই-এক সংখ্যায় পাঁচশত খণ্ড চিত্র তুলিকা দ্বারা রঙে তিনি চিত্রিত করেন; কিন্তু দেখিলেন, এ ভাবে রঙীন চিত্র প্রকাশ করা বহুকার্য ও শ্রমসাপেক্ষ। তখন তিনি ক্রোমোলিথোর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ক্রোমোলিথো শিখিবার জন্য আর্ট স্কুলে প্রবেশ করিলেন। এবং বাড়ীতেও নিজে পাথর আনিয়া ক্রোমো লিথো বিষয়ক গ্রন্থাদি আনাইয়া তাহার সাহায্যে সাধনা আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরকালেই এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিলেন। এখন তিন রঙের Process Blockএর সাহায্যে নানা রঙে রঙিন ছবি প্রকাশ করা সহজ সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ক্রোমোলিথোর সাহায্যে রঙিন ছবি প্রকাশ করা যথেষ্টই শক্তি-সাপেক্ষ ছিল। হিতেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

হিতেন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রীতিরও সীমা ছিল না। এক চত্বারিংশৎ মাত্র বয়সে তাঁহার জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত কাল মধ্যেই তিনি সঙ্গীত-সাহিত্য চিত্রে যে প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। সেই হিতেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশের উদ্যোগ করিয়া সম্পাদক মহাশয় প্রকৃতই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এমন বিচিত্র যাঁহার জীবন তাঁহার রচনাবলীতেও বৈচিত্র্যের ছাপ কেমন ফুটিয়াছে, তাহার আলোচনা উপভোগ্য লাগিতে পারে। এক্ষণে সংক্ষেপে আমরা তাঁহার রচনা-সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলিব। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে হিতেন্দ্রনাথের ৩১০টি খণ্ড কবিতা ও সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সব রচনাগুলিই ভাবসম্পদে সমান উজ্জ্বল নহে, কিন্তু অধিকাংশই সুন্দর! "ধ্যানবল," "শিবরাত্রে তপস্যা" "হরিনাম," "স্তব", প্রভৃতি গুরু বিষয়ও যেমন কবির তুলিকাসম্পাত

লাভ করিয়াছে, তেমনি নিভৃত সুদূর "পল্লী-দৃশ্য", "পোড়ো ঘাট" "ঝাউবন" "গরিব মুটে"র উপরও তাঁহার দৃষ্টি বিমুখ হয় নাই। ললিত সরলভাবে নিরপেক্ষ কবির স্নেহরসম্পর্শে সেগুলিও অপূর্ব্ব গৌরবে গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছে! 'পোড়ো ঘাট'কে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,

"কাহার স্বপন তুই দেখিছিস বসে হেথা
কার গীত মনে পড়ে তোর?
কার স্মৃতিগুলি ধীরে আকুল ব্যাকুল হৃদে
কেহ নাই, একা, স্তব্ধ ঘোর!
রহিছিস কার-ভাবে ভোর।
* * *
আসেনাকো আর পান্থ আসেনাকো আর হেথা
রূপসীরা নূপুর-চরণে
খেলেনাকো হেথা আর শিশুগুলি ফুল লয়ে
মত্ত শুধু ঢেউগুলি রণে!
* * *
অলস কনক পাখা খেলে মেঘ বায়ুকোণে
হাসিয়া আকাশ দেখে খেলা।
গেয়ে যায় পাখী গান চলে চায় দিগন্তরে
হেসে খেলে কাটায় রে বেলা।
তুই শুধু একা হেথা স্বপন-আসনে বসে
অজানা মরম কথা ধরে,
রয়েছিস্ ভাঙা বুকে। টুটে গেছে আশা বুঝি,
নাহি বুঝি মায়া আর ওরে!
এবে তোর পরাণের পরে?

পোড়ো ঘাটে'র ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের উপর কবির যে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ঘাটের সমৃদ্ধি-সৌভাগ্যের ইতিহাস কি দীপ্ত করুণ রাগে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে! 'নৌকা'য় বসিয়া কবি পল্লীর যেটুকু দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহাও সুনিপুণ ফটোগ্রাফের মত তিনি সকলের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কতটুকু! তবু সমস্ত পল্লীর সাড়া এই ছন্দে সুরে কেমন ধ্বনিয়া উঠিয়াছে!

"কৃষক লাঙ্গল ধ'রে
আঁকা বাঁকা মেঠো পথে চলে চায় গ্রামে ত্বরা;
ছায়াময় গাছতলে
দূর হতে উঁকি মারে, গ্রামগুলি ঘেরা-ঘোরা!

'গোয়াল-পোড়া' দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন, সেখানে 'চক্র-ঘর্ঘর' নাই, জন-কোলাহল নাই, আছে শুধু পত্রমর্ম্মর—বাঁশবনে সমীর-শব্দে কবি বাঁশরীর রব শুনিতে পান, এই সকল সুরের মধ্য দিয়া ছায়া-আলোকের মধুর সম্পাতে তাঁহার মনে হয়, "গ্রামগুলি স্বপ্নময়!" কবির মুটে বলিতেছে,—

"বহিয়া সহিয়া বহে দর দর ঘর্ম্ম।
তাহে সুস্থ সুখী আমি করে করে কর্ম্ম॥"

দুই-একটি ইঙ্গিতে অনেকখানি ফুটাইয়া তোলা প্রতিভাবান লেখকের বিশেষত্ব। কবি তাহাতে বহু স্থলেই সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল, কোথাও তিনি ছন্দে কথায় সযত্ন কারিকুরির চেষ্টা করেন নাই—হাল্কা তরঙ্গে ভাব-বারিধি পাঠকের হৃদয়-তটে উছলিয়া পড়ে! সে তরঙ্গে লীলা ভঙ্গ আছে, সে তরঙ্গ কুলকুল-নিনাদে বহিয়া চলিয়াছে—তাহাতে গভীর গর্জ্জন নাই! নিতান্তই সে শান্ত ধীর স্রোত! সে স্রোত কোথাও অস্পষ্টতার জঞ্জালে বাধা পায় নাই। কবির রচনায় এমন একটি অনাড়ম্বর লালিত্য আছে যে তাঁহাকে নিতান্তই ঘরের লোক বলিয়া মনে হয়। উদ্ধৃত দুই-চারিটি কবিতা-খণ্ড হইতে আমরা ভাবের সরলতা ও কোমলতার পরিচয় পাইয়াছি। এরূপ বহু কবিতা কোমলতার

উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু স্থান-সংক্ষেপ। ভাব-গাম্ভীর্য্যের দুই-চারিটি পরিচয় দিয়াই আমরা হিতেন্দ্র-কথার উপসংহার করিব। 'ভালবাসা' সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,

ভালবাসি ভালবাসি সকলেই কহে
ভালবাসেনা তেমন।
কামনা লইয়া ভাল সকলেই বাসে ;
নিষ্কাম প্রেমের তরে কয়জন আসে ?
ভালবাসেনা তেমন।"

জগতে সত্যের রূপ ধরিয়া কত লোক গুরুর আসনে বসিয়া গিয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন,

"এ আঁধার নিয়ে আমি ছুটি
শিষ্য করিবারে ;
অনৃতে কেমনে রব ফুটি
ডুবিয়া অসারে ?

ভণ্ডের আধিপত্য দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"ভণ্ড বাড়িছে দিন দিন ;
সব হইছে বেতাল, খণ্ড খণ্ড জীবহীন !
ধ্যান চাই, যোগ চাই,
চাই তপস্যা নিষ্কাম ;
কাজে কারো কিছু নাই,
মুখে লয়ে হরিনাম !"

এমন বিস্তর পরিচয় দেওয়া যায়।

এই গ্রন্থাবলীখানির একটি দোষ লক্ষ্য করিলাম। তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে আমরা দায়ী করিব। কবিতাগুলি তিনি বাছাই করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হইত। কারণ কয়েকটি কবিতা নিতান্তই মলিন। বহু উজ্জ্বল কবিতার পার্শ্বে সেগুলির ম্লানিমা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিয়াছে! সেগুলি বাদ দিলে—সেগুলির সংখ্যা অবশ্য অল্প—গ্রন্থাবলীখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

যাহা হউক, তথাপি তিনি হিতেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে যে আনন্দ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যের তরফ হইতে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বইখানির ছাপা-বাঁধাইও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করি, কাব্যরসগ্রাহী পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে।

বসন্ত

বসন্ত আসিছে অই লঘু পক্ষ পরে
মুক্ত হ'ল হিমানীর তুষার শিকল,
মৌন পাখী এতদিন কলরব ভরে,
করিল অরণ্য পথ মুখর চপল।
নগ্ন, দুর্ব্বা পুষ্পহীন পর্ব্বত প্রান্তর
রাঙ্কব আস্তীর্ণ আজি প্রসূন শোভায়,
গায়ক পাখীরে খুঁজি' ব্যাকুল অন্তর,
তরুগুল্মে রুদ্ধ পথে চলা নাহি যায়।
লতার কুঞ্চিত ঘন কুন্তলের মাঝে
কোথায় বাসন্তী-ফুল মেলে না সন্ধান !
শরৎ যখন আসে উদাসীন সাজে
মুক্ত পথে তুলি ফুল যত চাহে প্রাণ !
পাটল ধূসর বর্ণ করিয়া বিদায়,
দীপ্ত শোভা গাঢ় রাগ করিয়া বরণ
শরতের গিরিমালা দাও গো আমায়,
গভীর নিশ্বাস সুখে ফুল্ল তনু মন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র এবং শৈব্যা

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

৩৭শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২০ [১২শ সংখ্যা

আমার বোম্বাই প্রবাস

(১৬)

সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ আধুনিক হিন্দুসমাজের সারভূত দুই প্রধান অঙ্গ। হিন্দুসমাজ-শৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ ও হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জা হচ্চে পৌত্তলিকতা। সমাজ সংস্কর্ত্তাগণ কাল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে কেহ জাতিভেদ প্রথা, কেহ বা পৌত্তলিকতা এই দুই ভিত্তির উপর সাধ্যানুসারে অস্ত্রাঘাত ক'রে আসছেন। সমাজ সংস্কারের প্রতি যাঁদের একান্ত লক্ষ্য তাঁহারা জাতিভেদ উন্মূলন করতে ব্যগ্র। ধর্ম্ম-সংস্কার যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁরা পৌত্ত-লিকতার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্। ভারত ইতিহাসে সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের পূর্ব্বাপর একান্ত চেষ্টা দেখা যায় কিন্তু ধর্ম্মবীরেরা অনেক সময় পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুয়ানীর দুর্গ আটে ঘাটে এমনি দৃঢ় বদ্ধ, জাতিভেদের শৃঙ্খল এমনি কঠোর যে তা ভেদ করা কঠিন ব্যাপার। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বাধা দেবার ক্ষমতা প্রচুর, উন্নতির পথে এগোবার শক্তি নেই। এই সমাজে যা কিছু পরিবর্ত্তন, যা কিছু উন্নতি প্রত্যক্ষ হয় তার বারোআনা বাইরের সংস্রবে, সমাজের নিজস্ব নৈসর্গিক বলে তা সাধিত হচ্চে বোধ হয় না; সে সবই প্রায় ইংরাজি শিক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে। সে যাই হোক্, বিপক্ষ দল যতই বল প্রয়োগ করুক না কেন, হিন্দুসমাজ তার ৩৩ কোটি দেব দেবী ও অগণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে অটলভাবে রাজত্ব করছেন। ওদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর প্রভূত প্রতাপ প্রতিরোধ করতে পারে এমন বল সমাজে আছে কি না সন্দেহ। রাবণ বধের জন্যে রামের মত বীর চাই—তা কোথায়?

সমাজ-সংস্কার

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের নিশ্চেষ্টভাব দেখে কষ্ট বোধ হয়। যে পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হওয়া উচিত তার

তৃপ্তিজনক কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বোম্বায়ের লোকেরা অনেকে আমাদেরই মত বিবাহাদি গৃহ-অনুষ্ঠানে অপরিমিত ব্যয় করে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে পড়েন, ব্যয় সঙ্কোচের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। কিন্তু বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করা ত সামান্য ব্যাপার, আসল যে দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া উচিত সে হচ্ছে বাল্য বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ—এ এক বিষম রীতি। শুধু বোম্বায়ে কেন, বাল্য বিবাহের বিষম ফল ভারতের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ থেকে বিদায় করে যে কি স্বর্গ সুখ লাভ করেন তা আমি ভেবে পাই না। পুত্রের বিবাহেও অনেক স্থলে অকারণ ব্যস্ততা দেখা যায়। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা, তার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের উপায় করে দেওয়া—এ সকল গুরুতর কর্ত্তব্য ছেড়ে সর্ব্বাগ্রে তার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। বোম্বায়ে বালক বালিকার বিবাহ পুতুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভাল বাসতেন—তাঁর সভা-সজ্জন নিমন্ত্রণ করে খুব ধুমধামে কপোত কপোতীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠান করতেন—এই সব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। ওদেশে দশ বার বৎসরের বালক সাত আট বৎসরের বালিকা—এইরূপ দম্পতিকে অনেক সময় উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হতে দেখা যায়। মেয়ে পুরুষের বিবাহ-যোগ্য বয়স বাড়িয়ে না দিলে সমাজের কল্যাণ নেই। পূর্ণ বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়াতে স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট, সন্ততির পক্ষেও অনর্থকর। এইরূপ বাল্য বিবাহ হইতে হিন্দু সমাজের যে কত অনর্থোৎপত্তি হইতেছে বলা যায় না। বিপন্না বালপ্রসূতি, নির্ব্বীর্য্য সন্তান সন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু—জাতীয় অবনতির এই সমস্ত লক্ষণ দেখেও আমাদের চৈতন্য হয় না—আশ্চর্য্য! অকালপক্ক ফল যেমন সুস্বাদু হয় না, অকাল-প্রসূত সন্তানও সেইরূপ নির্বীর্য্য রুগ্ন ক্লিষ্ট হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়।

কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল অকালে পরিপক্ক হয় এইজন্যে তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ত একটা সীমা প্রকৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন্ বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত? পাঠকের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন, বিবাহের নূতন আইন প্রচলিত হবার পূর্ব্বে মহাত্মা কেশব-চন্দ্র সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও য়ুরোপীয় ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তার নর্ম্মান্, ডাক্তার ফেরার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্র, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ প্রভৃতি বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময়ে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ দেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, দেশীয়দের শরীরপ্রকৃতি এই সকল বিষয় বিচার ক'রে তাঁরা বলেছেন যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে,

মেয়ের ১৬ কিম্বা ১৭ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত নেওয়া যায় তার মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এ দেশে স্ত্রী লোকের বিবাহের বয়স অন্যুন ১৪ বৎসর নির্দ্দেশ করেন। এই সকল পণ্ডিতের মত এই যে স্ত্রীলোক স্ত্রীধর্ম্ম প্রাপ্ত হলেই সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় তা নয়। আরো দুতিন বৎসর অতীত হলে তবে তাদের প্রসবের উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ থেকে প্রমাণ হচ্চে যে আমাদের দেশে বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।

যেখানে স্ত্রীর যৌবনাবস্থা হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করা রীতি আছে যেমন মারাঠা দেশের কোন কোন স্থানে দেখেছি, সেখানে অবশ্য বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা খণ্ডন হয় কিন্তু আমাদের দেশে বালক বালিকার বিবাহের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর মত একত্র সহবাসের যে নিয়ম আছে তার চেয়ে অনিষ্টকর কুৎসিৎ নিয়ম আর কি হতে পারে ?

প্রথিতনামা ডাক্তার চুনীলাল বসু তাঁহার নব প্রকাশিত 'শারীর স্বাস্থ্য বিধান' বিষয়ক পুস্তিকায় বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। তাঁহার বক্তব্য এই:—

"আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই তত্ত্বটুকু বিশিষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যে বয়সে, যে অবস্থায় এবং যে ভাবে আমাদের দেশে পুত্র কন্যা জন্মিতেছে, তাহাতে তাহারা যে ক্ষীণ-শক্তি, চিররুগ্ন ও অল্পজীবী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? পিতামাতার দেহ পূর্ণতা লাভ করিবার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদিগের দেহে ইন্দ্রিয়সেবা জনিত ক্ষয়ের আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ২৫ বৎসরের ন্যূনে পুরুষের দেহ পূর্ণতা লাভ করে না; ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইলে অপূর্ণদেহ হইতে সবল সন্তান লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। তদুপরি সাংসারিক অসচ্ছলতা হেতু শারীরিক এই অপূর্ণতা আরো অধিক পরিমাণে আমাদিগের যুবকবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বালিকাগণের যে বয়সে বিবাহ হয় এবং যে বয়সে তাহারা জননীপদগৌরব লাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে এই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই সকল দুগ্ধপোষ্য বালিকাদিগের গর্ভ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা যে কখন জীবনে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিতে পারিবে এরূপ আশা করা বাতুলের কার্য্য মাত্র। আমাদের দেশে শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা যত অধিক, পৃথিবীর অপর কোন দেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মত এই যে, অপরিণত পিতামাতা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এই সকল শিশুদিগের জীবনী শক্তি এত অল্প এবং সামান্য কারণেই উহারা রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও কোন রূপে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবনের নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রম না করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমাদের বালিকাগণ অল্পবয়সে সন্তান প্রসব করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত

হইতেছে অথবা তজ্জনিত ব্যাধি হইতে আজন্ম কষ্ট পাইতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এ দেশীয় চিকিৎসকদিগের অগোচর নাই। অথচ আমরা এমনি অল্পবুদ্ধি যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগের কন্যা ও ভগিনীগণকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বালকদিগের বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত। সাধারণতঃ ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতেও এই বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিত। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে বালকের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ব্যতীত আরো অনেক সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বিবাহ হইলে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বে পুত্র কন্যা জন্মিলে, তাহা-দিগের ভরণপোষণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে হয়, অর্থের প্রয়োজন হেতু জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ে স্বপ্নে পরিণত হয় এবং অবস্থাবৈগুণ্যে সামান্য উপজীবিকার জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্ম-সম্মান ও মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণাবলীকে চির-বিদায় প্রদান করিতে হয়। শুশ্রুতের মতে ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত এবং ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রথা আমাদের সমাজে পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের জাতি যে অর্থসামর্থ্য ও পূর্ব্বগৌরব লাভের অধিকারী হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

বালক বালিকার অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ সঙ্ঘটন যদি প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত হয় তবে এত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পিতামাতার এত আগ্রহ কেন? অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যার উপর এইরূপ অধিকার খাটিয়ে তাঁরা ভাল কাজ—মা বাপের উপযুক্ত কাজ করেন কি? যে বয়সে সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছা পরিস্ফুটিত হয়নি—নিজের মতামত দেবার ক্ষমতা জন্মে না, সে বয়সে চিরজীবনের মত তাদের উদ্বাহশৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে কি তাঁরা সুবিবেচনার কার্য্য করেন? আমি একথা বলচি নে যে, পুত্র কন্যার বিয়েতে পিতামাতার অধিকার নেই—হস্তক্ষেপ করবার আবশ্যক নেই। আমি বলি নিদেন এইটুকু বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত যে বয়সে মেয়ে পুরুষ আপনারা জেনে শুনে বিবাহ করতে পারে, বিবাহে আপনার ইচ্ছানিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। যে বয়সে তারা বিবাহের মর্ম্ম বুঝতে ও নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে অসমর্থ সে বয়সে তাদের বিবাহ ঘটিয়ে দেওয়া অন্যায়। কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাক্ না কেন তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব—ঘটী বাটীর মত ব্যবহারের জিনিষ নয়। তার স্বাধীনতাটুকু যতদূর বজায় রাখা যেতে পারে তা করা কর্ত্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তার প্রতি একেবারেই লক্ষ্য করে না অথবা যার প্রভাবে তা সমূলে বিনষ্ট হয় সে নিয়ম কখন হিতাবহ হতে পারে না।

আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মূলতত্ত্ব বলতে চাই, তার প্রতি সমাজপতিদের দৃষ্টি রাখা

কর্ত্তব্য। প্রথম এই যে, স্ত্রী পুরুষের যোগ্য বয়সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করা; দ্বিতীয়, স্ত্রীপুত্র ভরণপোষণের সামর্থ্য বুঝে দারপরিগ্রহ করা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের বিবাহপ্রণালী এই দুই মূলসূত্রের উপরেই কুঠারাঘাত করে।

এই যে বিষম কীট যা আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্রমিকই অবসাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এর উচ্ছেদের একটা উপায় না করলে আমাদের আর নিস্তার নেই। ব্যাধি যে সাঙ্ঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আশু চিকিৎসার প্রয়োজন, সময় প্রতীক্ষা করে থাকলে চলবে না। গৃহকর্ত্তারা এ বিষয়ে মনোযোগ করুন, বিশেষতঃ আমাদের ছাত্রবৃন্দ সচেষ্ট হোন, তাঁদের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা,—তাঁরা দল বেঁধে দাঁড়ালে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির আর কাল-বিলম্ব হবে না।

বিধবা বিবাহ

বিধবা বিবাহের ন্যায়ান্যায় আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। আমার মতে সামাজিক অনুশাসনে বিধবা বিবাহ বন্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়; অপ্রাপ্ত বয়স্কের কথা ছেড়ে দিলে, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষেব স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত। পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু আপনাদের বেলায় কি করেন? বহুদারগ্রস্ত বিলাসীর মুখে সতীত্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা যেরূপ বিসঙ্গত তাঁদের উপদেশও কতকটা সেইরূপ। উপদেষ্টাগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যতই সমর্থন করুন না কেন, তাঁরা যখন নিজেদের বেলায় মৃতপত্নীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নববধূর পরিণয়ে একটুও ইতস্ততঃ করেন না, তখন তাঁদের কথার মূল্য কি? স্ত্রী পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যে কি বিধাতানির্দ্দিষ্ট এতই প্রভেদ? বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে ব্রহ্মচারিণী আদর্শ-সতী অনেকে আছেন স্বীকার করি, তাই বলে বিধবার উপর জোর জবরদস্তী ক'রে ব্রহ্মচর্য্য চাপানো - এটা কি ঠিক? প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণে কি সুফল প্রত্যাশা করা যায়? এ থেকে আমাদের সমাজে যে ভ্রূণহত্যাদি কুফল ফলছে, হে ভণ্ডতপস্বি, তা কি তুমি দেখেও দেখবে না? একবার ভেবে দেখ বালবিধবার চিরবৈধব্য কি মমতাহীন নিষ্ঠুর বিধান!

বোম্বায়ে সাধারণ হিন্দুসমাজ যে বিধবা বিবাহের বিরোধী তা নয়। এমন অনেক জাতি আছে যাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যের অনুকরণশীল জাতিবর্গেই এই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুপ্রথা আবহমান কাল চলে আসছে—সে কি না বিধবার মস্তক-মুণ্ডন। বঙ্গবিধবাদের অনেক-গুলি কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়, এক সন্ধ্যা আহার, নির্জ্জলা উপবাস, অলঙ্কার বর্জ্জন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার উপর শিরোমুণ্ডন প্রথা নেই। বোম্বায়ে বিধবা রমণীদের এসব ত আছেই, তার উপর বেশীর ভাগ ঐ এক উৎপীড়ন। ভবিষ্যতে বিধবা স্ত্রীদের অদৃষ্টে যে সকল জ্বালা যন্ত্রণা আছে, পতিবিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশচ্ছেদন তার পূর্ব্বাভাস। যাঁতে

তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কার্য্য করা না হয়, তাদের সম্মতিপ্রকাশের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়, সমাজ-সংস্কারকদের তাহা বিবেচ্য। আমি জানি স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রয়োগ করবার উদ্যোগে ছিলেন, কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছিলেন বলতে পারি না।

দেবদাসী

এই প্রসঙ্গে অপ্রৌঢ়া বালিকাদের প্রতি আর এক প্রকার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে 'নায়িকা' নামে একদল বারাঙ্গনা আছে (অন্য নাম দেবদাসী), তারা দেব-মন্দিরে নর্ত্তকী রূপে নিযুক্ত। তাদের বিবাহ হয় না, বেশ্যাবৃত্তিই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এই কার্য্যে দীক্ষিত হবার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে তাকে বলে 'সেজ।' সে অনুষ্ঠান বিবাহের ভড়ং মাত্র। বরের ঠিকানায় একটা খড়্গা রাখা হয় তার উপর ফুলের মালা সাজিয়ে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে ও বালিকা তাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার কার্য্যে ও আনুষঙ্গিক অকার্য্যে তার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। বোম্বাই মফস্বল কোর্টে এইরূপ অত্যাচার-সম্পর্কীয় মকদ্দমা কখন কখন উপস্থিত হয়, আমি কারওয়ারে থাকতে এইরূপ মকদ্দমা আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত্। আসামীর বক্তব্য এই "এ আমাদের চিরন্তন প্রথা, মেয়েকে আমাদের কুলধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে দোষ কি?" কিন্তু দেশাচার যাই হোক্, যারা কিশোরবয়স্ক বালিকাদের মতিভ্রষ্ট ও আজীবন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে তাদের বিধিমতে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তার আর কোন সন্দেহ নেই। এই অত্যাচার নিবারণ উদ্দেশে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উঠেছে তা আমার মতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হোক্ কিম্বা প্রচলিত আইনের পরি-বর্ত্তনই হোক্ যে কোন উপায়ে সুকুমার-মতি বালিকাদের প্রতি এই অত্যাচারের প্রতিকার হয় তাহাই প্রার্থনীয়। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চীৎকার আরম্ভ করেছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক রটনা করছেন তা কি বোঝেন না?

আমি দেখতে পাই দক্ষিণে জাতিভেদের নিয়ম নিরতিশয় কঠোর, আমাদের জাতীয় একতা বন্ধনের পথে বিষম কণ্টক! এক এক জাতির ভিতরে যে কতগুলি শাখা তার অন্ত নেই। এক ব্রাহ্মণবর্ণ দেখ, স্থান ভেদে তার মধ্যে কত শাখা ভেদ, এমন কি নদীর এপার ওপার হলে পরস্পর আদান প্রদান বন্ধ। মারাঠী ব্রাহ্মণের প্রধান তিন শাখা—দেশস্থ, কোকনস্থ ও কহ্রাড়। জাত একই, কেবল মূল নিবাস আলাদা। তাদের পরস্পর পান ভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, আমাদের রাঢ়ী বারেন্দ্রে যেমন। পেশওয়াদের আমলে একবার এই দলাদলি ভাঙ্গবার চেষ্টা হয়েছিল, কেন না দেখা যায় যে বালাজী বাজিরাও পেশওয়া যদিও কোকণস্থ ব্রাহ্মণ তবুও দেশস্থ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করে-ছিলেন। এই তিন শাখার একত্রীকরণ

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলা যায় না, কেন না এই আন্তর্জাতিক বিবাহ যে প্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ তা অস্বীকার করা যায় না। সমাজসংস্কার সভা সমিতিতে এই শাখা দ্বয়ের ঐক্যবন্ধন একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বোম্বাই অঞ্চলে সেনই বা সারস্বত নামে এক জাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন। সুবিখ্যাত জষ্টিস্ তেলঙ্গ এই জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইক্ষণকার হাইকোর্ট জজ চন্দবারকরও সারস্বত ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের জাতিতে আমিষ ভক্ষণ, বিশেষত মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নহে। উচ্চকুলাভিমানী ব্রাহ্মণেরা সেনইকে আমিষাশী আচারভ্রষ্ট ব'লে অবজ্ঞা করেন, তাদের চোখে সেনই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়। আমার একটি সেনই বন্ধু কোন মফস্বল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে একবার কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন, এ অঞ্চলে আমার স্বজাতীয় কেহই নাই, এক প্রকার নির্ব্বাসন যন্ত্রণা ভোগ করছি। কখনো কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী নেমন্তন্নে যেতে হয়, গিয়ে দেখি তাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ মহিলারা আমার স্ত্রীকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন, তাকে যেন ছোঁয়াতেও দোষ। ভোজনে আমাকে সমান পংক্তিতে বসতে দেন না, আমার স্বতন্ত্র আসন, স্বতন্ত্র বাসন হতে পরিবেশন। নেমন্তন্নে গিয়ে এরূপ অপমান সহ্য হয় না। তাই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি বামন বাড়ীতে আর নেমন্তন্ন খাওয়া নয়"। এই উদাহরণ হতেও দেশের জাতিভেদের কঠোরতা উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু বোম্বায়ে জাতিবন্ধন যতই কঠিন হোক্ না কেন, কালের স্রোতে তার বাঁধন অনেক শিথিল হয়ে আসছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাতীয় শিকড়ের চেয়ে ঘটনার স্রোত বলবত্তর, তাই দেখা যায় তার ভাঙ্গন-দশা আরম্ভ হয়েছে। শৌচাশৌচ বিচার, ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর প্রীতিভোজন ইত্যাদি অনেক বিচারে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা কুসংস্কার বর্জিত স্বীকার করতেই হবে। বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আচারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি বাহিরের ঘটনাও এই পরিবর্ত্তনের অনুকূল। আমাদের জাতীয় কঙ্গ্রেস তাঁর চিরন্তন মন্তব্যগুলি বৎসরান্তে একবার আবৃত্তি করে আমাদের পোলিটিকাল উন্নতি কতদূর সাধন করেছেন বলতে পারি না কিন্তু সেই এরক্ষেত্রে নানাজাতির একসূত্রে মেলামেশার অবশ্য একটা উপকারিতা আছে। তার ফলে হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্, অন্ত্যজ জাতি-সমস্যার প্রতি আমাদের কৃতবিদ্য যুবকদের মন পড়েছে, এ একটা শুভলক্ষণ বলতে হবে। আমরা আমাদের রাজপুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্যে চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটিয়ে তুলছি কিন্তু আমাদের ভাইদের মধ্যে যে অসংখ্য লোক হিন্দুসমাজের পদদলিত ঘৃণিত ত্যজ্য পুত্র হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি একবার ভ্রুক্ষেপও করি না, একি সামান্য লাঞ্ছনার বিষয়? এই হীন জাতির উদ্ধারের জন্যে আর্য্যসমাজের উদ্যমশীলতা দেখে আশ্বাস হচ্ছে যে এখনো আমাদের প্রাণ আছে; এই সাধু দৃষ্টান্তে যদি সমগ্র

হিন্দুসমাজ জাগরিত হয়ে এই সকল দীনহীন পতিত সন্তানদের স্বীয় ক্রোড়ে স্থানদান করতে প্রস্তুত হ'ন তবেই দেশের মঙ্গল; নতুবা বলতে হবে আমাদের সমাজ আত্মশ্লাঘার করে আত্মঘাতী হতে চলেছেন, তাঁর অধঃপাতের আর বিলম্ব নেই। আমি যে জাতির হয়ে ওকালতি করছি তাদের স্থান হিন্দু-সমাজের অধঃস্তরে—এর উপরের স্তরও নানাকারণে বিলোড়িত হচ্ছে দেখা যায়। শূদ্রেরা আপনাদের মধ্যে উচ্চতর আসন অধিকার করতে ব্যগ্র, কায়স্থকুল ক্ষত্রিয়বংশীয় ব'লে আপনাদের পরিচয় দিয়ে উপবীত ধারণে তৎপর, কেহই হীনতা-পঙ্কে পড়ে থাকতে রাজী নয়।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আমাদের সমাজে যে কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে তা আমরা অনেকে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ তাঁরা একবার আপনাদের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে দেখুন, সেকাল আর একালের প্রভেদ বুঝতে পারবেন। আমার একটা সহজ দৃষ্টান্ত মনে হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি, এককালে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। তাঁরা বহুপত্নী নিয়ে কেমন দিব্য আরামে ঘর করতেন, পালায় পালায় এক এক পত্নীগৃহে গিয়ে কি সহজ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করতেন। কুলীন মেয়েদের কি দুর্ভাগ্য! কারো, কারো যোগ্য পাত্রের অভাবে চিরজীবন হয়ত আইবড় অবস্থায় কাটাতে হত, অনেকের পতি জীবিত থাকতেও কি দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হত, জীবনে একটিবারও তাদের ভাগ্যে স্বামীর মুখদর্শন ঘটত না—যেখানে সেখানে এইরূপ কুলীনকুল-কলঙ্ককাহিনী শোনা যেত। আমার বেশ মনে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয় নিয়ে কত আন্দোলন করতেন, পারিবারিক শান্তিহর এই অনর্থকর প্রথা উচ্ছেদের কত উপায় চিন্তা করতেন, বলতেন যে বহুবিবাহনিবারিণী রাজবিধি প্রচলন ভিন্ন এ রোগের ঔষধ নেই। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে বিনা আইনে বহুদারব্যবসায়ী কুলীনদের অন্ন মারা গিয়েছে—বহুবিবাহ প্রথা আপনার ভারে আপনি চাপা প'ড়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে।

যেমন বাঙ্গলা দেশে বোম্বায়েও তেমনি জাতিবিপ্লবের লক্ষণ অল্প-বিস্তর দেখা যাচ্ছে। উপরে আর্য্যসঙ্ঘের কথা বলেছি, জাত ভাঙ্গবার চেষ্টাই তাঁদের এক ব্রত। কিছুদিন হল তাঁরা যে সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে প্রায় ৭৮০ লোক উপস্থিত হয়েছিল এবং প্রায় ১৫০ ব্যক্তি জাতের বাধা না মেনে একত্রে পরস্পর প্রীতিভোজনে যোগ দিয়েছিলেন। আর একটা দৃষ্টান্ত বলি—সমুদ্রযাত্রা। বিলাতযাত্রা আগেকার কালে কি ভয়ানক ব্যাপার ছিল আর এখন অপেক্ষাকৃত কত সহজ হয়ে এসেছে। এ বিষয়ে সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের মনোভাব সুবিখ্যাত গুজরাটী 'রিফরমার' করসনদাস মুলজীর জীবনবৃত্ত থেকে আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। আজকের দিনে

বিলাতযাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে স্রোত কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায় না। সমাজের শাসনও অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হয়েছে। শিক্ষা, বাণিজ্য বা রাষ্ট্রীয় অনুরোধে এই যে কত কত হিন্দুসন্তান বিলাত বেড়িয়ে দেশে ফিরে আসছেন তাঁদের জাতে ওঠবার বিহিত ব্যবস্থা করা হয় এ একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। রীত রক্ষার জন্যে কোন রকম সহজ প্রায়শ্চিত্ত নিলেই তাঁরা জাতে উঠতে পারেন, এখন কেবল প্রায়শ্চিত্ত বিধানটা একেবারে উঠে গেলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কেন না ভেবে দেখলে এই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াটাই হীনতা স্বীকার। পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত —তার একটা অর্থ আছে ; কিন্তু বিনাদোষে লোক দেখানো প্রায়শ্চিত্ত, য়ুরোপ প্রবাসের পাপকলঙ্ক ধুয়ে ফেলবার জন্যে সমাজের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা—এতে কি আপনার কাছে আপনাকে খাটো করা হয় না ? এই কি সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষের কার্য্য ?

এই বিদেশ ভ্রমণে ব্যক্তিগত যা কিছু উপকার হচ্ছে, এর ফলভাগী যে সমাজ, কে না স্বীকার করবে এবং এর সুদূর পরিণাম কি দাঁড়াবে কে বলতে পারে ? বিদেশ ভ্রমণে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়, আমরা য়ুরোপীয় সমাজ থেকে নূতন রীতিনীতি; নূতন সমাজতন্ত্র—সাম্য স্বাধীনতা একতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আসি। অল্প লোকের মনোগত ভাব-তরঙ্গ ক্রমে দূরে দূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে।

এই পূর্ব্বপশ্চিমের যোগে, নবীন প্রাচীনের সঙ্ঘর্ষে আমাদের সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। এই সঙ্ঘর্ষের ফলে সকলি যে ভাল, সকলি উন্নতি হচ্ছে তা বলা যায় না ; ভালর সঙ্গে মন্দও প্রসূত হচ্ছে মানতেই হবে। আমাদের জীবন কতকটা দ্বিধাভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—ঘরে এক বাইরে এক ;—নকলের যে সমস্ত কুফল, কতকটা কৃত্রিমতা এসে পড়ছে—আমাদের মধ্যে য়ুরোপ সমাজের বিলাসিতা কতকটা প্রবেশ করছে। সে যাই হোক্, মোটের উপর বলা যেতে পারে এই ভাল মন্দর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পুরাকালে ভারতবর্ষ আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ থেকে জাতি ভেদের দুর্দ্ধর্ষ প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন ; একালে আমরা নূতন শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে সেই প্রাচীর ভাঙ্গবার পন্থা অন্বেষণ করছি—দেখছি ভাঙ্গা কি অসামান্য কঠিন ব্যাপার !

ধর্ম্মসংস্কার

শিক্ষিত মণ্ডলী হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট ; সমাজসংস্কারের আবশ্যকতা তাঁহাদের অনেকেরই মনে জাজ্বল্যমান কিন্তু কি উপায়ে তাহা সাধিত হইবে সে বিষয় লইয়াই মতভেদ। কাহারো মত এই যে জোর জবরদস্তি করিয়া জাতিবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেল—সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত ও দূরদর্শী লোকেরা বলেন জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা আগে লোকের মনকে প্রস্তুত কর, সমাজ সংস্কার আসিতে কালবিলম্ব হইবে না—

মূলে কুঠারাঘাত কর বৃক্ষ আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে। অন্য কথায়, তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম সংস্কারের সোপান দিয়া সমাজ সংস্কারে আরোহণ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সমাজ সংস্কারের বিষয়ে আমার যা বক্তব্য তাহা ত বলা হইয়াছে, এখন ধর্ম্ম সংস্কার সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু ধর্ম্মসংস্কার-বার্ত্তা বলিতে গেলে ধর্ম্মপ্রাণ সাধুপুরুষদিগের জীবন-চর্চ্চা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র ধর্ম্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় যে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার জীবনী হইতে আরম্ভ করিয়া এ কালের আর আর ধর্ম্মবীরের চরিত-চিত্র অল্পাধিক মাত্রায় দেওয়া যাইবে, সেই সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্যবিবরণীও যথাক্রমে বর্ণিত হইবে।

শঙ্করাচার্য্য

মারাঠাদেশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু বলিয়া পূজিত। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অদ্বৈত-বাদী পণ্ডিত ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসী ছিলেন তিনি তাঁহাদের অগ্রগণ্য। তাঁহার জীবনবৃত্ত যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সন্তোষজনক বলা যায় না। আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে শঙ্করের জীবনী এত প্রকার অলৌকিক ব্যাপারে জড়িত যে সত্য মিথ্যা পৃথক করা সহজ নহে। শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণ বৃত্তান্ত তাহার নমুনা স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। বাল্যকাল হইতেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ সংকল্প মনে মনে পোষণ করেন। কিন্তু জননীকে তাঁহার অভিলাষ জানাইলে জননী একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, কিছুতেই তাঁহার অনুমতি পান না, অথচ মাতৃআজ্ঞা না পাইলেও নয়। কথিত আছে, একদা তিনি তাঁহার গৃহ-সমীপবর্ত্তী নদীতে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময় এক কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে জননীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন "কুমীর আমার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে মা আমাকে শীঘ্র রক্ষা করুন।" জননী কি উপায়ে সন্তানকে বাঁচাইতে পারিবেন ভাবিয়া পান না। তখন শঙ্কর বলিলেন "আমার জীবন রক্ষার এক উপায় আছে। যদি আমি সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করি তাহা হইলে এই কুম্ভীর এখনি আমার পা ছাড়িয়া দিবে। আপনার অনুমতি পাইলেই আমার জীবন রক্ষা হয়।" মাতা অগত্যা পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। কুম্ভীরও আপন গ্রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এইরূপ বিচিত্র দৈবঘটনা যোগে তাঁহার জীবন কথা অনু-রঞ্জিত। ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা শঙ্কর-চরিত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই :—

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। কেরল প্রান্তে (মালাবার) ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম। অনতিকাল মধ্যে তিনি অলোকসামান্য প্রতিভাবলে পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাশী, কাঞ্চী, কর্ণাট, কামরূপ প্রভৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সে সময়কার প্রচলিত নানা মত খণ্ডন করিয়া

অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করেন। এই বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ শঙ্কর দিগ্বিজয় বলিয়া ঘোষিত। জীবনের শেষভাগে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন এবং তত্রত্য প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শারদাপীঠে অধিরূঢ় হয়েন। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত কেহ সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন না। দেবীর গৃহের চতুর্দ্দিকে চারিটি মণ্ডপ আছে।(১) "প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পূর্ব্বদ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকের মণ্ডপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ পশ্চিমদ্বার এবং উদীচ্য পণ্ডিতগণ উত্তরদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক পশ্চিম ও উত্তর

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু

(১) শঙ্করাচার্য্য—শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত।

দিগ্বর্ত্তী মণ্ডপে বিরাজমান। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করেন নাই যিনি দেবীর দক্ষিণদ্বার উন্মোচন করিতে পারেন। সুতরাং দেবীর দক্ষিণদিকের দ্বার চিরকাল রুদ্ধ আছে।" শঙ্কর সেই দ্বার খুলিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন কিন্তু পরীক্ষা না দিয়া প্রবেশের অনুমতি নাই। শঙ্কর নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত—নৈয়ায়িক, সংখ্যাতত্ত্ববিৎ, বৌদ্ধ, জৈন, সকলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া সমাদৃত হইলেন। কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ তখন স্বয়ং মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া শঙ্করের প্রবেশ পথ মুক্ত করিয়া দিলেন।" শঙ্কর কাশ্মীর হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হিমালয় স্থিত কেদারনাথে গিয়া নির্বিকল্প সমাধি যোগে ৩২ বৎসর বয়সে মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ মূলক অদ্বৈতবাদ পোষণ করিয়া বেদান্তদর্শন, উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রাদির ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যুক্তি তর্কের নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যদিও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ তাঁহার প্রকৃত মত ও নির্গুণ উপাসনা প্রচার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি তিনি গৌণভাবে সাকার উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। যে জড়বুদ্ধি লোকেরা নিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানের অনধিকারী তিনি তাহাদের ধারণার উপযোগী সাকারবাদের সুলভ মার্গ প্রদর্শিত করিয়াছেন। এক দিকে যেমন জ্ঞানিগণ মধ্যে প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব অদ্বৈত-বাদ, অন্যদিকে প্রাকৃত সাধকের মধ্যে দেব-দেবীর উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু দেখা যায় যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার প্রতি গুরুভক্তি প্রকাশ করে। তাঁহার নাম "ষণ্মতস্থাপক।"

বেদান্ত শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে তিনি চারি স্থানে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। মহীশূরস্থ শৃঙ্গিরি (শৃঙ্গগিরি) মঠ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শৃঙ্গগিরি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জন্ম-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মঠের যিনি অধিস্বামী তিনি মারাঠীদের 'পোপ';—শৃঙ্গিরি মঠ হইতে তিনি তাঁহার অনুশাসন সমস্ত জারী করেন। শঙ্করাচার্য্যের উত্তরাধিকারী-গণের মধ্যে বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য পরিগণিত মারাঠাদেশে শঙ্করাচার্য্যের মানমর্য্যাদার সীমা নাই। যখন অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন আচার্য্যদেব শৃঙ্গিরি হইতে শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যান। দক্ষিণে প্রবাস কালে আমি শঙ্করাচার্য্যের প্রভুত্বের দুই একবার পরিচয় পাইয়াছি। আমি যখন পুণায় কর্ম্ম করি, শুনিলাম যে সমাজ-সংস্কার কাজের অগ্রগণ্য কয়েক জন খ্যাত নামা মারাঠী যুবক কোন মিসনরি বন্ধু গৃহে চা পান করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাদের সমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। শেষে সাব্যস্ত হইল শঙ্করাচার্য্যকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মানা হয়। শঙ্করাচার্য্যের বিধান সংস্কারকদের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তিনি বিচার করিয়া কোন একপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অপরাধীগণ গুরুজীর আদেশানুসারে যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত মণ্ডলির মধ্যে কিরূপ হাস্যাস্পদ হন ও নিজের

পক্ষকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেন তাহা এ পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই। বাঙ্গলাদেশে ওরূপ ঘটনা সম্ভবপর নহে, কেননা সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের মাথার উপর ওরকম কোন পোপের উপদ্রব নাই।

বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী

১৮ শতাব্দীর শেষভাগে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক উন্নতচেতা মহাপুরুষ বোম্বায়ে প্রদুর্ভূত হয়। ইনি যেমন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র সাধু-পুরুষ ও আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন। এ দিকে শিক্ষাবিভাগে তিনি উচ্চ পদারূঢ় কর্ম্মচারী, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির সম্মান, অথচ তাঁহার শরীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহার নম্র স্বভাব ও বিনয় গুণে তিনি সকলেরি চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার চেহারা বেশভূষাতে কে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—তাঁহার আন্তরিক মাহাত্ম্য অনুভব

শৃঙ্গেরি মঠধারী শঙ্করাচার্য্য

করিতে পারে ? এ বিষয়ে একটা কৌতূহল-জনক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি তাঁহার গুণকীর্ত্তনে মোহিত হইয়া পরিচয় লাভের উদ্দেশে বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ডেস্কে ভর দিয়া কি এক দুরূহ প্রবন্ধ লিখিতে-ছেন এমন সময় সেই ব্যক্তি গিয়া উপস্থিত। লেখকটিই যে বালশাস্ত্রী তাঁহার ভাবসাবে বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন "শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কখন্ সাক্ষাৎ হইবে। তিনি তখন কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, সময় নষ্টের ভয়ে উত্তর করিলেন আর কতক ঘণ্টা বিলম্বে আসিলে অমুক সময়ে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আগন্তুকের প্রস্থান ও যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ প্রবেশ। বালশাস্ত্রী সেইখানেই বসিয়া—কেবল সামনে গ্রন্থ কাগজ কলম নাই। আগন্তুক ব্যক্তি যখন জানিতে পারিলেন যে এই সামান্য বেশধারী খর্ব্বকায় ব্যক্তিই সেই বালশাস্ত্রী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। বালশাস্ত্রীর যত্নে বোম্বায়ে একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। মফস্বলের নানাস্থান হইতে বিদ্যার্থী আহরণ করা—নিজ গৃহের নিকট তাহাদের বাসা ভাড়া করিয়া দেওয়া—তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদান ও সর্ব্বতোভাবে তত্ত্বাবধান করা, এই সকল বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না। এই সকল বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দান, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সমাজসংস্কর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন না ও সমাজ বিপ্লবকারী সেকালের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গেও যোগ দিতেন না। বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অল্পে অল্পে সমাজসংস্কার করা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। তিনি বলিতেন ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর সমাজসংস্কার স্থাপন কর, নতুবা স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা নাই। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য। তিনি এত সাবধানে কার্য্য করিয়াও গোঁড়া হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। জাতিতে কহ্লাড় ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা করিত। তাহার কারণ এই যে জাতির অনুরোধে কর্ত্তব্য পালনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাহার দৃষ্টান্ত, রেবরেণ্ড নারায়ণ শেষাদ্রির ভ্রাতা শ্রীপাদ শেষাদ্রি অকারণে জাতিচ্যুত হন। জাতে উঠিবার আবেদন করিলে একদল গোঁড়া-হিন্দু তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন, এই বিবাদে হিন্দু সমাজে মহা হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাণপণে পতিতো-দ্ধারের সাহায্যে তৎপর হইলেন ও নিজে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া শ্রীপাদের বহিস্কার-কলঙ্ক মোচনে কৃতকার্য্য হয়েন। ওদেশে কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতার উপর জয়লাভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্য বশতঃ বালশাস্ত্রী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন—তিনি ১৭ই মে ১৮০০ অব্দে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম সংস্কারের যে ইচ্ছা—সে মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমাজ সংস্কারের বিস্তর হানি জন্মে—সে ক্ষতি পূরণ করে আজ পর্য্যন্ত এমন অল্প লোকই দেখা গিয়াছে।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ

বালশাস্ত্রীর মৃত্যুর পর শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে আর এক নূতন দল উঠিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙের ভ্রাতা দাদোবা পাণ্ডুরঙ এই দলের দলপতি। বাঙ্গলার যেমন কৃষ্ণবন্দ্য বোম্বায়ে তেমনি দাদোবা পাণ্ডুরঙ। এই দুই ব্যক্তি একই ধরণের লোক। উভয়েই সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, উভয়েই খৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব বিশারদ। উভয়েরই ধর্ম্মভাব প্রবল—প্রভেদ এই, কৃষ্ণবন্দ্য খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত সমুদায় বন্ধন ছেদন করিলেন। দাদোবার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন—কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক দাদোবার উৎসাহ—তাঁহার বশীকরণ শক্তি, সামাজিক অনীতি অত্যাচারের উপর জ্বলন্ত বিদ্বেষ, এই সকল বিষয়ে তিনি কৃষ্ণবন্দ্যের সমতুল্য ছিলেন ও ইনি যেমন কলিকাতায়, তিনি তেমনি বোম্বায়ে কতিপয় শিক্ষিত পুরুষের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় দাদোবা পাণ্ডুরঙ বোম্বাই নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই তাঁহার অবসর—সেই স্কুলের ১২ জন প্রধান ছাত্রকে তাঁহার কাজের উপযোগী হাতিয়ার পাইলেন ও নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অপরাপর বিদ্যালয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কুরীতির উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশে এক সভার সৃষ্টি হইল, তাহার সভ্যগণ ফ্রীমেসনদের ন্যায় গোপনে

ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাম
(বোম্বাই সমাজ-সংস্কারক)

কার্য্যারম্ভ করিলেন। এই সভার নাম পরমহংস সভা।

পরমহংস সভা

বোম্বাই অঞ্চলে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টা সময়ে সময়ে যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার শিরোভাগে পরমহংস সভা ধরা যাইতে পারে। ১৮৪৯ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। হংস যেমন জলীয় ভাগ ফেলিয়া দিয়া দুধ বাছিয়া লয় সেইরূপ সমাজের মন্দের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভালটা বাছিয়া গ্রহণ করা এই সভার উদ্দেশ্য; জন্মিয়াই হিন্দু সমাজের উপর বাণ বর্ষণ ইহার প্রথম উদ্যম। বাহিরের লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত বিজনস্থানে অকুতোভয়ে সম্মিলিত

হইয়া কাজ করিতে পারেন তাহার উপযোগী স্থান চাই—অনেক খুঁজিয়া সভ্যেরা একটা বাড়ী স্থির করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তাহাদের দিতে প্রস্তুত কিন্তু একটি ভাড়াটে ব্রাহ্মণ তাহাতে বাস করিতেন তিনি আততায়ী-দের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া ছাড়িয়া যাইতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর বাসন্দা এক ফন্দী করিলেন। তিনি তালা চাবি দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন তাঁহার দেব দেবীর বিগ্রহ সকল ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত। পরমহংসগণ তাহাতে নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের বল ও সাহসের পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। সেই
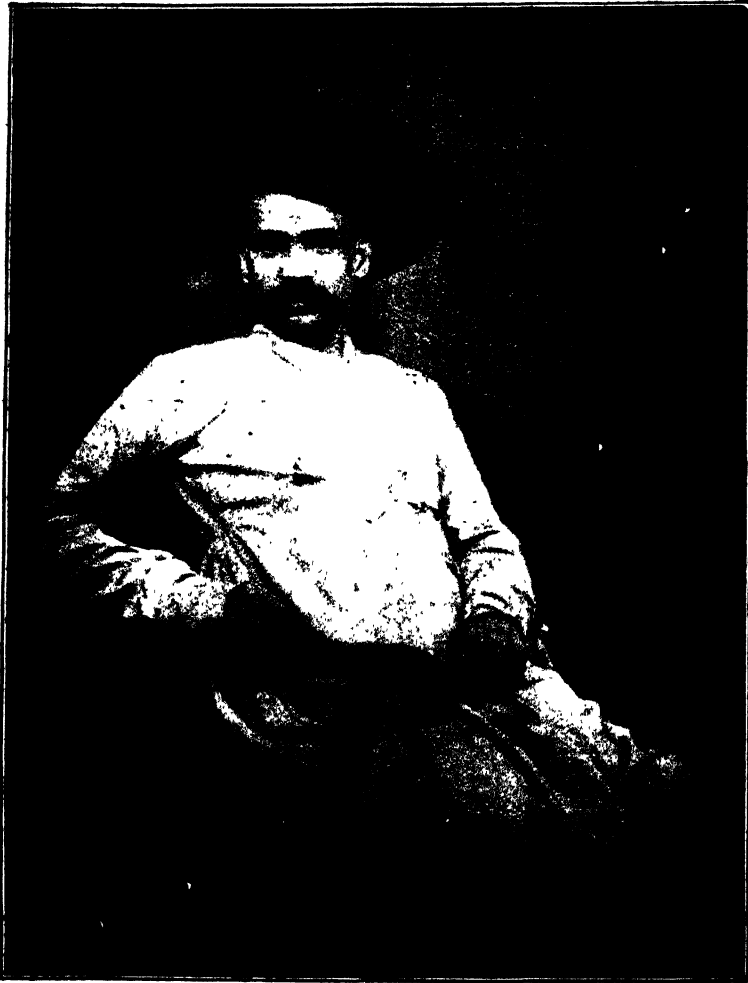
রাম বালকৃষ্ণ

(পরমহংস সভার নেতা)

লোকটির অবর্ত্তমানে তালা চাবি ভাঙ্গিয়া প্রতিমাগুলি এক কোণে সরাইয়া স্বচ্ছন্দে ঘর দখল করিয়া লইলেন। এখানে কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই, গিরগামের এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গৃহে শীঘ্র উঠিয়া যান। প্রতি সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার সময় অধিবেশন হইত। ঈশ্বর প্রার্থনার পর কর্ম্মারম্ভ, এই যা ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক। আর সকল বিষয়ে সভার উদ্দেশ্য সামাজিক। কোন ব্যক্তি সভ্যপদে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, পরে পাঁউরুটির টুকরা মুখে করিয়া আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইত, তদনন্তর সভার রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতেন। প্রথম কয়েক বৎসর মুসলমানের হাতে জলগ্রহণ করিবারও বিধান ছিল।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ বালকৃষ্ণ এইরূপ কতকগুলি লোকের যত্ন ও উৎসাহে ক্রমে সভ্যদল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুণা আহমদ নগর, খানদেশ, বেলগাম প্রভৃতি মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরমহংস সভার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইল। সভ্য সংখ্যা কত ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য তথাপি সভার শ্রীবৃদ্ধি কালে অন্যূন ৫০০ আন্দাজ বলা যাইতে পারে।

এই সভা প্রায় বিশ বৎসর কাল জীবিত ছিল। যদিও ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে গোপনে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তথাপি সময়ে সময়ে সভ্যদের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা গিয়াছে। একবার তাঁহাদের মধ্যে জন কতক যুবক কেল্লার এক রুটিওয়ালার দোকানে পাঁউরুটি কিনিয়া সেই রুটি হস্তে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া তাঁহাদের গৃহদ্বারে চলিয়া আসেন। তাঁহাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে দীক্ষা ও তর্ক বিতর্ক ভিন্ন আর বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হইত না। কেবল বার্ষিক প্রীতিভোজন এই সভার এক বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। সেই সময়ে মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে পরমহংসদল সমবেত হইয়া জাতি নির্ব্বিশেষে একত্রে পান ভোজন করিতেন।

কিন্তু এইরূপে অধিক দিন যায় নাই— পরমহংসমণ্ডলীর শীঘ্রই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন সহজ নহে। এক সামান্য ঘটনা হইতে এই বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি (খুব সম্ভব সভ্যদের মধ্যে একজন) সভার খাতাপত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতে সভার যত গুহ্য কথা—সভ্যদের নাম ধাম, তাহাদের জাতিভেদের প্রতিজ্ঞা যাহা কিছু ভিতরকার কথা সকলি বাহির হইয়া পড়িল। হিন্দু সমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। যতদিন পর্য্যন্ত সভার গোপনীয় কথাসকল প্রকাশ হয় নাই ততদিন হিন্দুসমাজ সন্দেহ করিয়াও তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই। গুপ্তকথা সকল ফাঁস হইয়া সকলের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। হিন্দু সমাজের কাছে তাহারা বমাল ধরা পড়িলেন। তাঁহারা ভয়ে একে একে সরিয়া পড়িলেন— পলাতকদের দৃষ্টান্তে যথার্থ বীরের হৃদয়ও

দমিয়া গেল। সভা ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইল।(২)

আর্য্যসমাজ

প্রার্থনাসমাজের সহযোগী আর্য্যসমাজের উল্লেখ না করিলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের জন্মদাতা। ইনি একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ। দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মভূমি কাঠেওয়াড়। দয়ানন্দের পিতা একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন, আপন পুত্রকেও শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু এই অন্নে তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবল ছিল, পৌত্তলিকতার অসারতা শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। মূর্ত্তিপূজার প্রতি কিরূপে তাঁহার বিরাগ জন্মিল তাহার বৃত্তান্ত তাঁর জীবনীতে যাহা আছে তাহা এই:—একদিন শিবরাত্রির জাগরণে তিনি মন্দিরে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তাঁর পিতা ও আর সকলে নিদ্রামগ্ন, একমাত্র তিনি জাগরিত ছিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, ইন্দুরেরা মিলিয়া ঠাকুরের উপর মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে—বাদাম মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাহা কিছু ভোগের সামগ্রী ছিল তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ ভোগ চলিতেছে, ঠাকুর না আপনাকে আপনি সামলাইতে পারেন, না অন্যকে ডাকিয়া তাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারেন। তাঁর সহজে মনে হইল, যিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম তিনি কি সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর হইতে পারেন? এই ঘটনা হইতে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মিল, তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এক ভগিনীর সহসা অকালমৃত্যুতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উদয় হইল। পিতার ইচ্ছা তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গার্হস্থ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন—তিনি সেই বন্ধনভয়ে গৃহত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করিলেন। অশেষ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনের পর তাঁহার সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মণ উপনিষদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্তিসঙ্কুল, কেবল খাঁটি সত্য বেদ—বেদভিত্তির উপরেই হিন্দুধর্ম্মের পত্তন করা বিধেয়। বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই—একেশ্বরবাদই বেদমন্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম—অগ্নি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সেই একংব্রহ্মের নামভেদমাত্র। তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বেড়াইতেন—যেখানে যাইতেন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও বেদের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতেন—তাঁহার বুদ্ধি বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তাঁহার মতে বেদবাক্য অভ্রান্ত সত্য কিন্তু ভাষ্যকারেরা যেরূপ বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। এই হেতু তিনি স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া 'বেদার্থ প্রকাশ' নামে বেদভাষ্য রচনা করিয়া যান, ইহাই আর্য্যসমাজের ভিত্তিভূমি। তাঁহার মতে পৌত্তলিকতা বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সুতরাং তাহা পরিহার্য্য। তাঁহারি যত্নে ভারতবর্ষের

(২) ইন্দু প্রকাশ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ১৮৬৫ ২ মার্চ হইতে কতিপয় সংখ্যায় Political Rishi স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

স্থানে স্থানে বেদসত্যানুবর্ত্তিকারী আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বায়েও এই সমাজের এক শাখা আছে কিন্তু পঞ্জাব অঞ্চলে আর্য্য সমাজের যেরূপ প্রতিপত্তি বোম্বায়ে সেরূপ কিছুই নহে। কি বোম্বাই কি বাঙ্গলা, এই দুই দেশেই, কেন জানি না, আর্য্যসমাজ হতাদৃত হইয়া রহিয়াছেন, বিশেষ কোন কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—মূল আর্য্যাবর্ত্তই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগ্দত্তা

(৫২)

মানুষ যখন জলের মধ্যে পড়িয়া ক্রমেই অতলে তলাইয়া যাইতেছে, এমন সময় কখন-কখনও একটা বিপরীত মুখের ঢেউ আসিয়া তাহার চেষ্টাহীন বীতসংজ্ঞ দেহখানিকে সবলে ধাক্কা দিয়া যেন পাতালের দিক হইতে মর্ত্ত্যের দিকে বারেক ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতির সে চেষ্টা প্রকৃত নয় একটা ক্ষণিকের খেলা মাত্র। ক্ষণপরেই আবার সেই নিমজ্জমান্ হতভাগ্য উপরের আলোকময়ী পৃথিবীর বক্ষে আশ্রয় না পাইয়া অন্ধ তামস জলতলেই আকৃষ্ট হয়।

নীচেতলার উত্তেজনাপূর্ণ বিলাপধ্বনি সেইরূপ কমলার নিশ্চল হৃদয় শোণিতে বারেকের জন্তই একটা প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিল। একবারের জন্য সেই "ওরে বাবারে একি সর্ব্বনেশে কথা! ওমা একি বলে গো!" সে শুনিল। কি কথা! কে কি বলিতেছে? কি হইল! দাসী আবার আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল "কিরে তোরা বলিস কি? ওমা আমি কি করবো গো! এ যে একেবারে অভাবিনি অচিন্তিনি কাণ্ড!"

"মাইজি!" কমলা কবাটের অবলম্বন ছাড়িয়া চোক তুলিল। বিষণ্ণ আর্দ্দালি যুক্তকরে দাঁড়াইয়া কহিল "গাড়ি খাড়া রয়েছে, যেতে হবে মাজি"।

সে কিছু বলিল না নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। কেমন করিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিল, কখন নীচের উঠান ঘরদ্বার পার হইল, কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিতেছিল না, কেন যাইতেছে কোথায় চলিয়াছে তাহাও সে জানেনা, ভাবে নাই, ভাবিবার ইচ্ছাও ছিল না! কলের পুতুলের মত গাড়ির ভিতর উঠিয়া বসিল। ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাহার সমুখের আসনে বসিয়া বসিয়া চোক মুছিতেছে, বিলাপপূর্ণ স্বরে কতকি বকিতেছে, মধ্যে মধ্যে কহিতেছে "ভ্যালা মেয়ে তুমি যা হোক! এতটুকু যত্ন নেই আয়ত্তি নেই! রাঙা স্বোয়ামি, তাকে এত হেনস্তা! ওরে বাবারে! এত ভ্যাচ্ছল্যি! কিকরে ছেড়ে দিলে গো! আমরা হলে এমন পারতুম না।" কমলা শূন্যনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। পথের দুই পার্শ্বে ক্ষেত্রগুলা জলে ভরিয়া রহিয়াছে। রাস্তায় জন প্রাণী নাই, জলকাদা ঠেলিয়া ঘোড়াগুলা অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। পুনঃ পুনঃ চাবুকের

আঘাত তাহাদের কষাহত পৃষ্ঠের ব্যথা বাড়াইতেছিল। গত রাত্রের দগ্ধস্তূপ দিনের আলোয় ভীষণতর দেখাইতেছে। কোথাও গুমিয়া গুমিয়া শস্যের বস্তাসকল তখনও পুড়িতেছিল, কোথাও আবরণের নিম্নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল ধোঁয়াইয়া উঠিতেছিল, ঊর্দ্ধগামী সর্পের মত ধূমগুলা শূন্যমার্গে ঘুরিতেছিল; সেই বিশাল ধ্বংস ভীষণ নরমেধ যজ্ঞকুণ্ডরূপে প্রাণের মধ্যে বিভীষিকা ও জগতের নশ্বরতার কথা একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিতেছিল। বৈশ্বানরের সেই লীলাক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া ঝঞ্ঝাবৃষ্টি মাথায় লইয়া অসংখ্য গৃহহীন ও দর্শকদল চারিদিকে কোলাহল করিতেছে, হাহাকার করিতেছে। ভাগ্য, ভগবান ও অজ্ঞাত অগ্নিসংযোগ কর্ত্তাকে অভিসম্পাত দিতেছে। ঈশ্বর নিজে যেটুকু রক্ষা করিয়াছেন তা ভিন্ন মানুষের হস্ত একখানি পাটের বস্তা বা চালের থলি সরাইয়া উপকার করে নাই। জনতা করিয়া মজা দেখিতেই তাহাদের আগমন। আগুনের মুখে কাঁচা প্রাণটা তুলিয়া দিতে কেহই রাজী হয় না। সকলেই বলে "লোক পাইলে করিতাম একা কি করিব?"

গাড়ী আসিয়া একখানা একতল বড় বাড়ীর দ্বারে থামিল। বাড়ীখানা কোন সময়ে হল্‌দে রং করা হইয়াছিল, বহু দিনের অসংস্কারে এবং বৃষ্টিজলের চিত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারের নিকট দু'তিন জন পুলিষের লোক ও সাধারণ লোকে বিষণ্ণ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহারা কমলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া সরিয়া গেল। বোধ হইল সকলেরই কণ্ঠ হইতে একটা [illegible] নিশ্বাস একসঙ্গে বহির্গত হইয়াছিল। দ্বারের পিতলের বাঘমুখো হাতলটা ব্যাঘ্রনেত্রের মত তেজস্ক দৃষ্টিতে যেন তাহার দিকে জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া আছে, এমনি মনে হইয়া সে হঠাৎ একবার সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তখনি মনে হইল কে যেন তাহাকে ভিতরে সেইদিক পানেই টানিতেছে। এক পা এক পা করিয়া অবশেষে সে দ্বারের চৌকাটের মধ্যে প্রবেশ করিল। কোথাও কোন সারা শব্দ নাই, সে স্থির কর্ণে একটা কোনরূপ শব্দ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল, কিন্তু কিছুই শোনা গেল না,—প্রেতপুরীর মত স্তব্ধ বাড়ীটা! সে ভিতরে প্রবেশ করিল। কোথা দিয়া কোথায় আসিল সে তাহা অনুভব করিতেও পারিতেছিল না; কিন্তু অপরিছিন্ন গৃহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খট্টায়, ছিন্ন মলিন শয্যাতলে যন্ত্রণার্ত্ত লোকপূর্ণ রুদ্ধ বায়ুর মধ্য দিয়া সে যে অনেকটা স্থান অতিক্রম করিল, এইটুকু শুধু বুঝিতেছিল। সারা বাড়ীখানা যেন কাতরতার ও বিষাদের আশ্রয় স্থল। প্রতি পদক্ষেপে, মলিনতার সংস্পর্শ, প্রতি মুহূর্ত্তে অস্ফুট বিলাপ প্রাণের মধ্যে বিষাদপূর্ণ আতঙ্ক কম্পিত করিয়া তুলে। সম্মুখের একটা দ্বার অর্দ্ধ মুক্ত ছিল, আর্দ্দালিটা তাহা আর একটু খুলিয়া দিয়া নিজে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল,—যন্ত্রচালিত কমলা নিঃশব্দ চরণে অগ্রসর হইল। ইহা একটি অনতি প্রশস্ত হলঘর। ঘরে অনেকগুলি লোক। তাহার মধ্যে কেহ দাঁড়াইয়া কেহ কেহ চৌকিতে বসিয়াছিলেন। কমলা প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে চাহিয়া সরিয়া গেল। দুইজন সাহেব একখানা

খাটিয়ার নিকট চৌকিতে বসিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া স্থির নেত্রে শায়িত ব্যক্তির দিকে চাহিয়াছিলেন, অপর জন একটু দূরে একটা কেদারা অধিকার করিয়াছিলেন,—উভয়েই উত্থিত হইয়া টুপি খুলিয়া নত মস্তকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিলেন। কমলা কোন দিকে চাহে নাই, ধীবপদে আর্দ্দালি নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল।

মলিন বিছানায় দীনহীনের ন্যায় এই সাধারণ দাতব্য হাসপাতালের পুতিগন্ধময় অন্ধকার কক্ষমধ্যে ও কে পড়িয়া? ও কে? কমলা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শায়িতের পানে চাহিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া দুই হাতে দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিল। রোগীর যন্ত্রণার সীমা ছিল না, বাহ্যজ্ঞান নাই, অন্তর্জ্ঞানও বিলুপ্ত প্রায়; অবর্ণনীয় যন্ত্রণার অব্যক্ত ধ্বনি পাষাণকেও বোধ হয় বিগলিত করিতে পারে। কঠোরচিত্ত চিকিৎসক, পুলীষ কর্ম্মচারী শুশ্রূষাকারী সকলের পক্ষেই এ দৃশ্য যেন সহনাতীত।

সহসা রোগী চমকিয়া উঠিল, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া দৃষ্টিহীন দুই নেত্র সবেগে বিস্তৃত করিতে গেল, নিদারুণ যন্ত্রণা ধ্বনি কণ্ঠভেদ করিয়া ঘরটার স্তব্ধতাকে এমনই সহসা আঘাত করিল যে, অকস্মাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত হইতে টুপিটা গৃহতলে সশব্দে পড়িয়া গেল। কমলার সমস্ত শরীরের প্রতি শিরায় একটা বরফের ধারা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বহিয়া গিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া দিল। সে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িয়া খাটের পায়ে মাথা রাখিল।

রোগীর শরীরের স্পন্দন স্থির হইয়া আসিয়াছে; যন্ত্রণার অস্ফুটধ্বনিটুকুও ক্রমে থামিয়া গেল; নিশ্বাসের দ্রুত তাল সমান হইল, সহসা শব্দহীন কণ্ঠ একটা পরিষ্কার স্বর উচ্চারণ করিল "বল কমলা! আমি পাপী নই? বল আমায় ক্ষমা করেছ! উঃ ভগবান!"

ডাক্তার বাবু মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, চেয়ার সরাইয়া সিবিল সার্জ্জন একটু হটিয়া গেলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুপি কুড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলা মুখের উপর হইতে করাচ্ছাদন খুলিয়া যে ব্যক্তি তাহার সম্মুখে নিস্পন্দ নিঃসাড় পড়িয়া আছে তাহার বিভীষিকাপূর্ণ শোচনীয় মুখের দিকে চাহিল। সমস্ত পৃথিবী—এই জীবনের সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিচিত্র ঘটনা জাল,—সমস্তই তাহার মন হইতে এককালে পুরাতন চিত্রের মত নিঃশেষ মুছিয়া গিয়াছিল। কেবল মাত্র মনে ছিল এই অনাদৃত হতভাগ্য, তাহার একটি অনুরোধে নিজের এই শত আশাউদ্দীপ্ত নবীন জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। তাহার মৌন বিবর্ণ অধর কোন ভাষা কোন ধ্বনি উচ্চারণ করিল না, কিন্তু নীরব হৃদয়ের মধ্যে গভীর অনুতপ্তচিত্ত এমন কোন ক্ষমার কথা সেই দগ্ধ বিমুক্ত প্রাণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিল, যাহা অন্য কোন জাগতিক না শুনিলেও তাহার নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। এবং তাহার সমুদয় সংশয় উদ্বেগ দূর করিয়া ইহা তাহাকে যে শান্তি প্রদান করিয়াছিল, সেই পরিত্যক্ত দগ্ধ দেহেও তাহার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল।

(৫৩)

একটা মানুষে কত বড় বড় দুঃখের চাপের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এই মহাপরীক্ষা

যেন কমলার সারা জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। দুঃখ আসে যেমন তেমন নয়। দুঃখের মধ্যে সব চেয়ে বাছা বাছা তীব্রতম দুঃখগুলাই সে আজীবন ভোগ করিয়া আসিয়াছে। অভাব বিয়োগ অপমান সমস্তই তাহাদের পূর্ণমূর্ত্তিতে তাহাকে দেখা দিয়াছে। কিন্তু সকল দুঃখের অন্ধকারেই এতটুকু একটু জোনাকির টিপটিপানি আলো থাকে, তা না থাকিলে মানুষ কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না! আজ এ যে কি মহাপ্রলয়ের নিরালোকশূন্যতা, ইহার বুঝি সীমাসন্ধি নাই।

যে ডাক্তার বাবুর স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করিতে শচীকান্ত প্রাণ দিল, তাঁহার গৃহে কমলার সেবাসান্ত্বনার অভাব ছিল না। গৃহিণী সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাকে মায়ের স্নেহে যেন কোলে টানিতেছিলেন, কিন্তু তাহার তাহাতে কি সুখ? কিসের সান্ত্বনা? যখন বাড়ীর দাসী আসিয়া তাহাকে বিধবার বেশে সাজাইল, তখন অন্তরে অন্তরে সে একবার হাহাকার করিয়া উঠিতে গিয়াছিল, কিন্তু হাত টানিয়া লয় নাই। আজ কাহার জন্য সে বৈধব্য গ্রহণ করিবে? যে তাহার স্বামী নয় তাহার জন্য! কিন্তু এত বড় একটা প্রচণ্ড অস্বীকার করিবার বলই আজ কোথায়? সে যে তাহাকে তাহার স্বীকার বুঝিতে দিয়াছে! তাহারি পণরক্ষা করিয়া সে যেন তাহার পরে জয়ী হইয়া গিয়াছে। যাহার প্রাণের পরে তাহার এতটুকু দাওয়া ছিল না তাহাকে শুদ্ধ এই সঙ্গে অনুমৃত করিল! আবার শুধু মৃত্যু নয় সে কি 'মৃত্যু!'

সেই আত্মসুখী, স্বার্থপরায়ণ হৃদয়ের মাঝখানে যে কত বড় একটা ত্যাগশীল তপস্বীর প্রাণ লুকান ছিল সেটাকে কেহ কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই। কমলা হুতাশনভক্ষিত দগ্ধদেহের সেই মহাঅধিকারীকে হঠাৎ দেখিতে পাইল। সহসা যেন এক অমৃতময় রাম নামে সকল জড়তা কাটাইয়া তাহার দিব্য জীবন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কমলা মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইয়া তাহার অনুমৃতা হইল। ইহজন্মের মরণ নয় চিরদিনের মত।

ডাক্তারবাবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন, সে এখন কোথা যাইতে চায়? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সরকারের তরফ হইতে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর বিধবার যাবজ্জীবন ভরণপোষণ ভার বহিতে প্রস্তুত। এই অল্পদিনেই সে যে কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল তাহা অনন্যসাধারণ। সে সেই অর্থ লইয়া আত্মীয় গৃহে, কিম্বা যথেচ্ছ স্থানে বাস করিতে পারে। কমলাকে কথাটা দুতিনবার বলিতে হইল, তাহার মনটা এমনি শূন্য হইয়া গিয়াছে যে বাহিরের রূপরসশব্দস্পর্শ কিছুই যেন সেখানে গিয়া পৌছায় না। শুনিয়া সে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল "না।" ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন "এতো মা তোমার জোরের টাকা, সংসার বড় বিষম ঠাঁই মা, নিজের নিজস্ব কিছু থাকা বড় ভাল। চারটে কাল এখনতো কাটাতে হবে।" কথাটা সে শুনিলও না, শুনিলেও কিছুমাত্র বুঝিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার জানাইল। ডাক্তার বাবু বা তাঁহার স্ত্রী

ক্ষুব্ধ হইলেও আর বেশি কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। পাছে সে মনে করে যে ইহারা তাহাকে ভার বোধ করিতেছে। কিছু দিন গত হইলে একদিন অতর্কিত আপনা আপনিই তাহার মনে হইল, কাজটা ভাল হইতেছে না। তাহাকে লইয়া এই গৃহস্থদম্পতি বড় বিব্রত হইয়া আছে, সে তাহাদের কে যে এমন করিয়া গরীবের ঘাড়ে চড়িয়া থাকে। গৃহিণী গৃহকর্ম্মের অবসরে কাছে আসিয়া বসেন, দুএকটা দুঃখের কথা পাড়েন, মৃতের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ অশ্রু প্রেরণ করেন আবার চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া যান। কমলা কেবলমাত্র অর্থহীন দৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া থাকে। সে কিছুই ভাল করিয়া যেন অনুভব করিতে পারে না। একমাত্র এই বিভীষিকার ছায়া সেই শূন্য নয়নতলে নগ্ন প্রেতের মত কেবল বলিয়া বেড়ায়, যে তাহার সব গিয়াছে।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এই প্রথম তাহার মুখে এতগুলা শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিলেন এবং সেই সঙ্গে তাহাকে নিজের জন্য ভাবিতে দেখিয়া মনে মনে একটু আশ্বস্তও হইলেন, তিনি কহিলেন "কেন মা, আমাদের মা হয়ে চিরদিন এই খানে থাকবে না।" কমলা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল। "থাকবেন না? বলুন কোথা যাবেন? তাই আমরা রেখে আসি।"

কোথা যাইবে? এ বিশাল বিশ্ব-সাম্রাজ্যে তাহার এতটুকু স্থান কোথায়? সে কোথায় যাইবে? বহুক্ষণ পরে সে মৃদু স্বরে সংশয়জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল "কাশী"।

"কাশী?" তা বেশ তাই যাবেন। সেখানে কে আছেন মা?"

আমার দাদা মশাই?" "তাঁর নাম? বাসা জানেনতো?" কমলা এবার একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "জানি।"

সেই ঘর। ঘরে কম্বলাসনে পুস্তক বেষ্টনী মধ্যে সেই গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি সে দিনও অধ্যাপনানিরত। কমলার জীবনে ষড়ঋতু বহিয়া গিয়াছে, স্থিতির পর প্রলয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই পৃথিবীর বাহিরে শিবত্রিশূলস্থ কাশীধামে কি কালের প্রবেশাধিকার নাই? ডাক্তার বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কমলা দ্বারের বাহিরে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

অনাদি অনন্ত, এবং অনাদি সান্ত ব্রহ্ম ও জীব চৈতন্য স্বরূপ, ও মায়ার বিষয়ে কথা হইতে ছিল। ডাক্তার একপাশে বসিয়া থাকিয়া অবসর ক্রমে কহিল "আমি আপনার পুত্র স্বর্গীয় ডেপুটি বাবুর স্ত্রীকে আনিয়াছি।" ছাত্রটি চলিয়া গেল। সার্ব্বভৌমমহাশয় চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার পুত্র! শচী! স্বর্গীয় সে? বিশ্বনাথ! তোমার হিসাবধারী চিত্রগুপ্ত কি অন্ধ হইয়া গিয়াছে! না এরা স্বর্গের অর্থ জানে না?

ডাক্তার বাবু ধীরভাবে শোকপূর্ণ স্বরে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে একবার উঠিয়া দ্বারের নিকট-বর্ত্তিনী কমলার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "ভিতরে এসো মা' কমলা কম্পিতচরণে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরে বসিয়া পড়িল, প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে তাহার মনে হইল না। দুরন্ত পূর্ব্বস্মৃতি তরঙ্গস্ফীত সমুদ্রতরঙ্গের, ন্যায় তাহার মূর্চ্ছিত হৃদয়বেলার উপর মুহুঃ মুহুঃ আঘাত করিতেছিল। প্রলয়াবসানের পর নব সৃষ্টির উন্মেষে উল্কাপিণ্ডসকলের প্রথম বিশৃঙ্খল

বিত্রস্ত জাগরণের ন্যায় কোথা হইতে কি একটা রুদ্র তাণ্ডব জাগিয়া উঠিয়াছে। গৃহ স্তব্ধ গম্ভীর; গভীর নিস্তব্ধ গৃহে কেবল মাত্র বাতাসের অতি মৃদু বিলাপপূর্ণ নিশ্বাস মাত্র শুনা যাইতেছিল। কমলা অধোমুখে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া আছে, সার্ব্বভৌমমহাশয়ের শান্ত ললাটে গভীর চিন্তারেখা দেদীপ্যমান। ডাক্তার বাবু কি বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেলে তিনি কহিলেন "আপনাকে আর কি বলিব, জীবনদাতা পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, জননীকে এখানে রেখে গেলাম, গৃহ আমার শ্মশান হয়ে গেছে। এ হতভাগ্যের জন্য মায়ের আজ এই অবস্থা একথা এজন্মে ভুলতে পারবো না। প্রণাম, প্রণাম করি মা, অপরাধী ছেলে তবে বিদায় নেয়।'

ডাক্তার চলিয়া গেল, শোকের ছায়া এই কটা কথায় যেন নিবিড় করিয়া দিয়া গেল, তাহার পদশব্দ অস্ফুট মর্ম্মযাতনার বুকফাটা ক্রন্দনের মত মুহূর্ত্তকাল ঘরের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়া রহিল।

আবার কতকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, সহসা কমলা শুনিল, কি অভয় মন্ত্রই শুনিল, "কমলা কাছে এস, বড়ই দুঃখ পেয়েছ মা!" কমলার মাথাটা নিঃশব্দে সেই পা দুখানার উপর নামিয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল, এমন একটি স্নেহের স্বর এখনও তাহার শুনিবার ছিল। তাহার মুখ দিয়া আকুল মর্ম্মযাতনার বিলাপধ্বনির মত বাহির হইল, "আমি খুন করে এসেছি তাঁকে, আমি খুন করেছি, খুনী আমি," সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি ধীরে তাহার মাথার রাশীকৃত রুক্ষ চুলের উপর হাত রাখিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "না তুমি তাকে রক্ষা করেছ! নরকের দ্বার হতে স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছ একে হত্যা বলো না।"

"আপনি বল্‌চেন?" কমলা বড় আশ্বাসে সবেগে উঠিয়া বসিল। একি! সৌম্য সবল মূর্ত্তি দুর্ব্বল রুগ্ন বৃদ্ধের রূপে যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে? মুখে চোখে সেই শান্তি, সেই দীপ্তি, তথাপি কি বিষণ্ণ সে মুখ!

হ্যাঁ আমি বলচি মা, তুমি তার ভাল করেচ। সে জীবনের পরিণামে অবনতি, হয় তো দুটো জীবনেরই ক্রমিক অধঃপতন, তার শেষ যদি এই রকম ত্যাগের মধ্য দিয়াই ঘটে সে কি ভাল নয়?" কমলা আবার তাঁহার পা দুখানির উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা আমার কি হবে?"

"তোমার ভাল হবে মা আমার! এসো তুমি আমার কাছে এস। সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত পিতার দ্বারা যদি কিছু হয় দেখি।"

আমার কি ভাল হবার কিছু আছে?" একথা কমলা মুখ ফুটিয়া বলিল না কিন্তু দিনেরাত্রে এই এক কাতর প্রশ্ন তাহার মনটাকে ঘিরিয়া বাজিতে লাগিল। যাহার আশা করিবার কিছুই নাই তাহার আবার ভাল কি হইবে? তথাপি মন যেন আবার কি আশা করিতে চাহিতেছিল। তীব্র দুঃখের মধ্যেও বারেকের জন্য মন যেন বলিতে ছিল তোমার ভাল হইবে। উনি যখন বলিয়াছেন তখন ভাল হইবে।

তার উপর এতদিন পরে সে আবার একটা কাজও পাইয়াছে। সে যখন দেখিল

সার্ব্বভৌমমহাশয়ের সেই প্রশান্ত দৃষ্টি ও সহাস্য মুখ তেমনি থাকিলেও সে অটুট স্বাস্থ্য আর নাই। জরা যেন অতি প্রবলবেগেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তখন সে নিজের জন্য ভীত হইল। এমনি ভাঙ্গা কপাল লইয়া সে এই জগতে আসিয়াছে যে, যে আশ্রয়টা সে অবলম্বন করিতে যায় তাহাই তাহার হস্ত স্পর্শে খসিয়া পড়ে।

মধ্যরাত্রি। জ্যোৎস্নালোকে জনমর্দ্দিত রাজপথ বিশ্বনাথের কণ্ঠভূষণ বিশ্রামশীল সুবৃহৎ অজগরের ন্যায় নিঃসাড়া পড়িয়া আছে। ওদিকে অন্নপূর্ণা মাতার রজতমেখল'সন্নিভ শুভ্র বারিরাশি জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তীরস্থ মন্দির, হর্ম্ম্যমালা তদপেক্ষা সুষমাময়ী। কমলা ছাতে বসিয়াছিল! তখন চরাচর নিদ্রামগ্ন, কেবল বীতনিদ্র প্রকৃতি তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের ডালি সাজাইয়া বিশ্বনাথের চরণ প্রান্তরে বহিয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন! দূরে অদূরে, ইতস্তত কোথাও মন্দিরের উচ্চ চূড়া, কোথাও মসজিদের সুউচ্চ গম্বুজ কোথাও সমুন্নত প্রাসাদচূড়া স্ফুট জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হইতে হইতে শত পৌরাণিক ঐতিহাসিক যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। পরপারে ঘনবিন্যস্ত ধূসর বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে রাজদুর্গ রামনগর প্রকাশ পাইতেছিল।

বহুক্ষণ কমলা অগণ্য নক্ষত্রখচিত অসীমের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর প্রতিদিনকার মতই অবোধ্য দৃষ্টি নামাইয়া সম্মুখে সলিলরেখার দিকে চাহিয়া দেখিল, উন্মাদনাহীন স্থির লক্ষ্যে সে এক পথেই প্রবাহমান। সে সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদু মৃদু কহিল, আমার মনে অমনি একনিষ্ঠা কেন থাকতে পেলে না?" মুহূর্ত্তে সে একথার উত্তর পাইল, অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে কে উত্তর দিলেন "ক্ষুদ্র কমলা সেই এক পারাবারে মন ডুবিয়ে দাও, একনিষ্ঠ হবে, কেন হবে না।" একি দৈববাণী, কমলার দুর্ব্বল দেহমন বিস্ময়পুলকে অকস্মাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া ঈষদুচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কে সে এক? বলে দাও ওগো বলে দাও, আর এসন্দেহ সহ্য হয় না, আমায় বল আমি জন্মের সকল সম্বন্ধ কেমন করে মুছে ফেলব, আমার কি হবে!"

জলেও যেমন স্থলেও তেমনি চন্দ্রচ্ছায়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সেই কম্পিত আলোকে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রে তিনি অধিকাংশকাল ছাদেই কাটান, কমলা তাহা জানিত না, অথবা মনে পড়ে নাই। তিনি কহিলেন, "মা কমল! তোমার মনের সন্দেহ আমি জানি; যদি নিষ্ঠা দান করতে পার তবে ক্ষুদ্র নশ্বর পদার্থের উপর এ ঐকান্তিকতার অপব্যয় কেন মা? যাঁহাকে পাইলে পাইবার কিছু বাকি থাকে না, যাঁহাকে একবার পাইলে আর হারাবার ভয় নাই যদি যথার্থ কিছু পাইতে চাও, কিছু দিতে পার, তবে তাঁকেই কেন চাও না, তাঁরি পায়ে দাও না মা!"

কমলা সেই হৈমজ্যোৎস্নায় তাঁহার পানে চাহিল। সেই সৌম্য শান্তমূর্ত্তি দুঃখীর দুঃখহরণ অশরণের শরণ দয়ালরূপ! যে সন্দেহে সংশয়ে তাহার বিধ্বস্তচিত্ত কঠিন শীতল হিমশিলায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল তাহা যেন

এই মুখের আদেশবাণীতে গলাইয়া দিল। সে কথা কহিল না, নীরবে দূরে সেই জ্যোৎস্না-জাল জড়িত গঙ্গাজলে চাহিয়া রহিল। ওই সুশীতল পবিত্র সলিল কাহার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে? উর্দ্ধে চাহিল সচন্দ্র তারকাদল নীলাম্বরে চিরহাস্যময়; সেই বা কাহার প্রেমে? এই দৃশ্য অদৃশ্য—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ছোট বড় জীবন সেই একজনের পানে নির্নিমিষে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে। কে বলে তিনি নাই? তিনি আছেন—তিনি আছেন বই কি! ফুলের কলিটি যেমন ঊষার মৃদুবাতাসে অত্যন্ত ধীরে ফুটিয়া উঠে তেমনি করিয়া তাহার অন্ধকার হৃদয়মধ্য হইতে একটী ক্ষীণ আলোকরেখা সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। সে রুদ্ধনিশ্বাসে ডাকিল "বাবা! আমি কিছু জানি না, আমার শেখান্! কেমনকরে ডাকতে হয় ভুলে গেছি বাবা, নিষ্ঠুর পাষাণ বলে অবিচারক বলে তাঁকে ডাকা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তিনি কি সে পাপ ক্ষমা করবেন?"

"ক্ষমা করবেন না? তিনি যে ক্ষমাময়। ভুল, পাপ সব তিনি ক্ষমা করে থাকেন, ক্ষমা করাই তার ধর্ম্ম। শুধু ডাকতে হবে! ব্যাকুল হয়ে শুধু ডাকতে হবে, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে ডাকতে হবে।"

"তিনি সবাইকেই ক্ষমা করেন? আমি যে পাপ করেছি, আমাকেও ক্ষমা করবেন? পরিপূর্ণ প্রাণে আমি তাকে ক্ষমা করেছি বাবা। তাতে আমি পতিতা হয়েছি কি?"

সার্ব্বভৌমমহাশয় তাঁহার উদার দৃষ্টি সেই রজতজ্যোৎস্নামণ্ডিতা সন্ন্যাসিনীর প্রতি স্থির করিলেন। "ক্ষমার মত ধর্ম্ম নাই! ক্ষমা করিয়া থাক ভালই করিয়াছ, বন্ধনভয় ঘুচিয়াছে। কমলা দুই হাতে তাঁহার পাদুখানি জড়াইয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

কমলা আর কথা কহিলনা, একনিমেষে এই সুপ্তযামিনীর মধ্যযামে আপনা ভুলিয়া সে আজ যাহা বলিবার, যাহা জানিবার সব বলিয়া, সব জানিয়া লইয়াছে। আর বলার বা শোনার কিছু বাকি নাই। এখন শুধু কঠোর তপস্যায় নিজেকে দগ্ধ করিয়া সিদ্ধি লাভ, আর তার পর মরণে শান্তির আশা। এত বড় আশা আর কিছু নাই। সে পলকহীননেত্রে ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া গড়ামূর্ত্তির মত খদ্যোতিকা ঝলমলায়মান পরপারের অন্ধকার তরুশ্রেণীর পানে চাহিয়া রহিল। গভীর হতাশার পর নূতন আশার উন্মেষে মনের মধ্যেও শত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। "যাঁকে পেলে আর কারুকে পেতে হয় না সেই তাঁকে পাবার কামনা ভিন্ন অন্য সকল কামনা তাঁরি চরণে নিবেদন করে দিলাম, হে বিশ্বনাথ তুমি গ্রহণ করো।"

(৫৪)

ত্রিপাদগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাযাত্রী সমাগম হইয়াছিল। রাজপথে কেবল মাত্র নরমুণ্ডসারি। কমলা স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ বিদ্ধ কুরঙ্গীর মত ছটফট করিয়া ফিরিয়া আসিল। ব্যাধবাণভীত হরিণের মত প্রায় সে ছুটিয়া আসিয়া দুর্গাবাড়ীর গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। ধ্যানজপমন্ত্রতন্ত্র এক মুহূর্ত্তে যেন সকলি কোথা কি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল।

মন্দিরে আজ মানুষ নাই কেবল মাত্র বানরের রাজত্ব, সে ঘুরিয়া আসিয়া বসিয়া

পড়িল। আকস্মিক উত্তেজনায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণে দারুণ একটা অবসাদে সর্ব্ব শরীরমন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। একবার মনে হইল সেই তরঙ্গের মাঝখান হইতে আজ আর মাথাটা না টানিয়া তুলিলেই চুকিয়া যাইত। সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল! আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল এই যে মহান্ তেজরাশি জগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্য ইঁহার শক্তিও ক্ষণেকের জন্য প্রতিহত হইয়া থাকে, কিছুই বাধাহীন নয়, তবে আমি কতটুকু ?"

সহসা সে শিহরিয়া শুনিল, কে যেন পশ্চাতে বলিয়া উঠিল "এ কি!"

কমলা মুখ ফিরাইল, দুর্গে! একি দৃশ্য আবার দেখাইলে? গঙ্গাতীরে তবে সে স্বপ্ন নয়; সত্যই সে তবে এখানে আসিয়াছে?

নিশ্চলপ্রায় চরণ বহুচেষ্টায় উঠাইয়া স্তম্ভিত মনীশ ঈষৎ অগ্রসর হইয়া সেই শুভ্র বসনা বিধবার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষণেক পরে বিস্ময়মথিত মৃদুস্বরে কহিল "তুমি এখানে? এ বেশে কমলা!"

কমলা, উঠিয়া ছুটিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অবসন্ন শরীর মন তাহাতেও সায় দিল না। অনেকক্ষণ পরে মনীশ আবার তেমনি সন্দেহবিস্ময়ে মৃদুতর কণ্ঠে কহিল, "চিনতে পারছো না কমলা, আমি মনীশ, তোমার এ বেশ কেন?

মনীশ তাহাকে এত সহজে সম্বোধন করিতে পারিল? শচীকান্তের স্ত্রী বলিয়া কি এ আত্মীয় ভাব! সীসা গলিয়া অঙ্গে পড়িলে যেমন অসহ্য জ্বালায় দেহ জ্বলিয়া উঠে নিজের অকস্মাৎ পতিত অশ্রুবিন্দুতে তাহার কোমল গণ্ড তেমনি জ্বালা করিয়া উঠিল। সে বিন্দু দুটি দ্রষ্টার চক্ষে অদৃশ্য রহিল না, "বুঝেছি সে নাই। তাই সংবাদপত্রে ডেপুটি শচীকান্তের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। বিশ্বাস করি নাই যে সেই সে;—আমার বন্ধু চিরসুহৃদ আর নাই চলিয়া গিয়াছে। মনীশের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল!" কিন্তু তাহার শোকপূর্ণ কণ্ঠ কমলার বক্ষে অশনি প্রহার করিয়াছিল। সে বারেক বিহ্বল নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিল। কে এই কথা বলিতেছে! বন্ধু! চিরসুহৃদ। যে তাহার জীবনের সকল বাসনা কামনা ভস্ম করিয়া প্রাণটাকে এই রুদ্র মরুভূমি মাত্রে পরিণত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, বন্ধুপ্রেমে একান্ত বিশ্বাসঘাতক, সে তাহার বন্ধু! সুহৃদ! অভাগিনী কমলা কাহার প্রতীক্ষায় তুই বসিয়াছিলি? আজও কাহার স্মৃতি তোর সত্য সঙ্কল্পে পদে পদে বাধা দিতেছে। সে কি এই তার প্রতি আকর্ষণহীন বন্ধুপ্রেমিক মনীশ! দেখা হইয়াছে—বুঝি ভালই হইল!" বহুক্ষণ পরে মনীশ ব্যথাকাতর দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাহিয়া বলিল "তুমি হয়ত এখন আশ্রয়হীনা? কোথায় কার কাছে আছ? খুড়িমা এখানে এসেছেন তাঁর কাছে যাবে কি? আমরা এই কতক্ষণ মাত্র এখানে এসে পৌঁছেচি। আমি আজ পিতৃহীন, কাকাবাবু আমার এ জগতে নাই। খুড়িমা তোমায় পেলে সুখী হবেন।" কমলা এ কথা শুনিয়া আগ্রহে মাথা তুলিল, তারপর সাশ্রুনয়নে ঘাড় নাড়িল "না।"

"খুড়িমা বড় কাতর, তাঁর কাছে যাবে না ?" এবার অশ্রুধারাপরিপ্লুত বেদনা কাতর মুখ তুলিয়া, কাতর দৃষ্টিতে কি ক্ষীণস্বরে সে কহিল "সেখানে আমার স্থান নাই।"

"কেন কমলা ?" মানুষের কণ্ঠে এমন যন্ত্রণাপূর্ণ স্বর আর কখনও শোনে নাই, কিন্তু তাহার মন তখন প্রতিঘাতে নিষ্ঠুর কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের ন্যায় প্রাণপণ বলে কহিয়া ফেলিল "সেখানে আপনি থাকিবেন।" মনীশকে কে যেন অগ্নিতপ্ত শেলে বিঁধিল, এত বড় অপমানের কথা তাহার পৃষ্ঠে কেহ মারিতে পারে এ ধারণা তাহার কখন ছিল না, সে মুহূর্ত্তকাল আর্ত্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর নিশ্বাস লইবার শক্তি ফিরিয়া আসিলে ক্ষীণস্বরে কহিল "তবে আমি থাকিব না। তুমি গুরুদেবের কাছে যাইও, তুলসী ঘাটের সেই বাড়ীতে সেইখানেই খুড়িমা আছেন। আমি এখনি গিয়া বিদায় লইব, তুমি সেখানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমি কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" মনীশ একটু নড়িয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ মৃতের চেয়েও বোধ হয় অধিক বিবর্ণ। সে যে আজ কতখানি দিল কমলা হয় ত তাহা বুঝিতেও পারিল না। জগতের একমাত্র সুখ খুড়িমার কোল, শোক-জর্জ্জরিতা করুণাময়ীর সেবাভার, গুরুর সঙ্গ সে এক নিমেষে জীবন হইতে নিঙড়াইয়া ফেলিয়া তাহাকে দান করিল, নিজের জন্য রাখিল সুখহীন আশাহীন নিঃস্বত্ব শুষ্ক অংশটুকু! "তবে যাই কমলা, এ জগতে আর বোধ হয় দেখা হইবে না।"

'শুধু এ জগতেই না অনন্ত জগতের কোথাও যেন আর দেখা না হয় এই একমাত্র আশীর্ব্বাদ করুন্!" মনীশ তড়িৎস্পৃষ্টের মত সর্ব্বাঙ্গে—দেহে মনে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখ ক্রমেই অধিকতর অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। এই মুহূর্ত্তে তাহা যেন বিষ-জর্জ্জরিত মুখের মৃত্যুনীলিমার ন্যায় কালো দেখাইল, "কোথাও না দেখা হয়? যাই কমলা, ক্ষমা করো—মুহূর্ত্তের এ পাপ ক্ষমা করো আমার—" স্খলিত জড়িত মন্তচরণে মনীশ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন কমলা উঠিয়া মন্দিরের আড়ালে পাষাণে লুটাইয়া পড়িয়া সকাতরে ডাকিল "আমার মনে বল দাও, হে ঠাকুর! আমায় ধ্বংস করোনা। যে পথ দেখিয়েছ যেন সেই পথেই আমি থাকতে পারি।"

(৫৫)

সম্মুখে পার্শ্বে পুস্তকের রাশি, সজ্জিত সুখাসনে সমাসীন সত্য পাঠনিরত। মুক্ত জানালা মধ্য দিয়া রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্য চলন্ত চিত্রের ন্যায় ক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; মহামূল্য গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত, আসনে বসনে আধারে ভিত্তিতলে প্রাচীরে গৃহের সর্ব্বত্র সৌখীনতা, সুরুচি ও ধনশালিতা ব্যক্ত হইতেছে, কিন্তু পাঠশীল ছাত্রের এ সব দিকে লক্ষ্য মাত্র নাই। গভীর মনোযোগের সহিত সে পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। পিছন হইতে একটি অতি সুন্দর তরুণ মুখ হাসির আলোয় মাখা-মাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিল, কানের কাছে সেই হাসিভরা গোলাপী অধর দুখানা নামিয়া আসিল, কিন্তু তাহার কৌতুক মধ্যপথে বাধা প্রাপ্ত হইল, "ছিঃ গৌরি!" সত্য মুখ তুলিল। "ছিঃ কিসে?"

"পড়ার সময় বাধা দেয় ?"

"ভারিতো পড়া, কত পড়বে ?" "দাদা যাবার দিন কি বলে গেছেন মনে নাই ? পড়লে মানুষ হবো, হলে দাদা সুখী হবেন, তুমি কি চাও না দাদা সুখী হন ?" গৌরীর হাসিখুসী মিলাইয়া গেল "হুই।" "তবে কেন বাধা দাও ?"

"আর দেব না, তুমি দাদাকে বিয়ে করতে বলো না কেন ?" সত্য এবার তাহার দিকে ফিরিল "তাঁ'কে আমি কি বলবো গৌরি, কি দুঃখে তিনি আজীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিলেন তাকি জানি নে যে বলতে যাবো ? জলের দাগ তো নয় যে মুছে যাবে, সোনার খোদাই যে।" গৌরী সত্যের কেদারার হাতাটার উপর বসিল, "তাঁর জন্ত আমার মধ্যে মধ্যে যেন কান্না পায়, কমলা যদি এখন আমার দিদি হতেন কত আহ্লাদ হত বলো দেখি ?"

সত্যেন্দ্র গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল "তা আর বলতে গৌরি, বাবা কেবল সেই দুঃখ বুকে করেই চলে গেলেন। মৃত্যুকালেও দাদার মাথায় হাত দিয়ে বলে গেলেন তোমায় শুধু কষ্ট দিয়ে গেলাম যাদু আমার, একটুকু বিশ্রাম দিতে পারলাম না।"

সত্যর দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। সে আবার গভীর নিশ্বাস ফেলিল। "ছি তুমি এত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলো না আমার ওতে বড় কষ্ট হয়—" এই সময়ে বাহিরে কে ডাকিল "সতু।"

"একি দাদা এমন সময় হঠাৎ ফিরে এলেন যে।" সত্য ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, গৌরী সলজ্জমুখে দ্বারান্তর পথে ছুটিয়া পলাইল। ভাসুরকে সে যে খুব লজ্জা করে তা নয়, পাছে তিনি এ সময় সত্যর পাঠগৃহে তাহাকে দেখিয়া মনে করেন সে তাঁহার ভাইয়ের পড়া শুনায় ব্যাঘাত ঘটায়, অতএব ভাইটিকে ইহার কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া যাই। এই একটা মস্ত ভয় ছিল।

মনীশের অকস্মাৎ প্রত্যাগমনে বিস্মিত নন্দকিশোর তাহার কুশল বার্ত্তা লইতে আসিলেন। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, খুড়িমা গুরুগৃহে কতকটা শান্তিতেই থাকিবেন বুঝিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানকার নৈশ বিদ্যালয়গুলি পাছে তাহার অভাব বোধ করে তা ভিন্ন সতুকে ছাড়িয়া অতটা দূরে থাকা। নন্দকিশোর ইহার ভিতরকার তথ্য জানেন না সুখী হইয়া চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে শিবনারায়ণ তাঁহাকে ডাকিয়া জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তি, তিনি মনীশকে দান করিতেছেন। সে ইহা ইচ্ছানুরূপ লোকহিতকর কার্য্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিবে। ইহাতে তাঁহার কিছু বলিবার আছে কিনা ? নন্দকিশোর প্রসন্নচিত্তে উত্তর দিয়াছিলেন "কিছু না।" তিনিও ইতিমধ্যে তাঁহার বিপুল অর্থ, কন্যা জামাতা উভয়কে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়া উইলপত্র লিখাইয়াছেন। সত্যর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। শিবনারায়ণ কহিলেন "তাহা জানি বলিয়াই আমি তাহার অংশ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। মনীশের সন্তান সাধারণলোকেই ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া সতুর বংশের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে।"

করুণাময়ী সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া যখন কাশী চলিয়া গেলেন তখন নন্দকিশোর নিজের

স্বার্থ ভুলিয়া গৌরীকে তাঁহার সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পতিহীনা সর্ব্বত্যাগিনী সতী পুত্র পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অবিচল কণ্ঠে কহিয়া গেলেন "সতি তোরা আর আমায় জড়াতে চাসনে, তোরা সুখে ঘর কর, তা হলেই আমি সুখী হব।"

সবাই বুঝিয়াছিল সাধ্বী করুণাময়ীর হৃদয় তাঁহার মহানুভব স্বামীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যপূতঃ দেহখানা যে কদিন এ পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করে শান্তির স্থানেই আশ্রয় পাক্। সত্য বুক ফাটিয়া কাঁদিল, বাধা দিল না, সে জানিত তাহার দাদাকে লইয়া মা তাহার নিকটাপেক্ষা আরামেই থাকিবেন।

নন্দকিশোর চলিয়া গেলে মনীশ চাহিয়া দেখিল সত্য তাহার মুখের দিকে সন্দিগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে। মুহূর্ত্তে তাহার কর্ণমূল হইতে ললাট অবধি লাল হইয়া উঠিল। সত্য আর একটু কাছে আসিয়া ডাকিল "দাদা!"

"সতি?" মনীশ মুখ নত করিল। "দাদা কি হয়েছে? মা, মা আছেন তো?" নত মস্তকেই মনীশ বলিল "হ্যাঁ সতি মা ভাল আছেন। উদ্বিগ্ন চক্ষে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে সত্য কহিয়া উঠিল "তবে কি হয়েচে, আমায় বলবে না দাদা? নিশ্চয় কিছু একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেচে, দাদা আমায় বলবে না?"

মনীশ সহসা মুখ তুলিল, "তোকে কেন বৃথা কষ্ট দেব সতু? শুধু জীবনের মধ্যে এই একটা দিন আমায় মাপ কর ভাই, দ্বিতীয় বার আর কখনও তোর দাদাকে এমন দেখতে হবে না—জানিস্।"

"দাদা, আমি কি তোমার দুঃখের সঙ্গী নই? শুধু তুমি আমায় দেবে, কিছুই কি নেবে না? আমায় লুকুবে?" মনীশ অকস্মাৎ ব্যথা-কাতর মুখখানা কম্পিত হস্তে বুকে টানিয়া লইল, ততোধিক কম্পিত স্বরে কহিল "তবে শোন",—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, গলা ঝাড়িয়া বলিল,

"আমার এ জগতের শেষ সুখ যা ছিল সব আজ তাকে দিয়ে এসেছি। যে কোণে একা আমারি স্থান ছিল—তোরও সেখানে জায়গা হয়নি সেখানে আমি আর যাবনা সতি, সেখান থেকে আমার চিরনির্ব্বাসন হয়ে গেছে।"

সত্যেন্দ্র অনেকক্ষণ কিছু বুঝিল না, তাই নির্ব্বাক্ হইয়া সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়িয়া গেল। কাকে? তিনি বৌদি, কমলা—কি সেখানে?"

"হাঁ, সে বিধবা, অনাথা, জানি না কোথায় আছে,—বোধ হয় নিরাশ্রয়া।" "দাদা!" অকস্মাৎ নিবিড় অন্ধকারে যেন একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রের মুখ আশায়, সন্দেহে আরক্ত হইয়া উঠিল "একটা কথা বলবো দাদা, বল রাগ করবে না?" সর্পদ্রংষ্ট্রের মত মনীশ এ কথায় যেন আর্ত্তভাবে চমকিয়া উঠিল "না না সতু না না কিছু বলতে চেষ্টা করো না। সতু তুমি কি বলবে তাকি আমি বুঝি নাই। না না তাকে আমি বলে এসেছি এ জন্মে আর কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এ জন্মের সব দেনা পাওনা আজ মিটিয়ে দিয়ে এসেছি। স্নেহ: আশীর্ব্বাদ

চেয়ে ছিল যেন অনন্ত কালেও আর দেখা না হয়, সে আশীর্ব্বাদ কিন্তু তাকে আমি করতে পারিনি, আর একবার তার সঙ্গে দেখা হবে না একথা আমার মুখ থেকে বেরোয়নি। আমি জানি আবার আমাদের দেখা হবে, তাঁর পাদপদ্মে আবার আমরা সবাই একসঙ্গে মিলব এ আশা আমার এখনও আছে। সে পরলোকে।”

সমাপ্ত

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

চীনরমণীর প্রেমপত্র

(৫)

প্রিয়তম আমার!

নূতন বধূ এয়েছেন এখানে। এ নূতনের সঙ্গে অনেক নূতনের রঙ্গ দেখছি, বিচিত্রতায় বাড়ীখানি পূর্ণ হয়ে গেছে, কত দাসদাসী, বসন ভূষণ! এটা আমি নিশ্চয় বল্‌ছি—যদি তার গাউনগুলি পর পর সাজান যায় তাহলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাবে। সে বসন্তের ফুলের মতো শুভ্র সুন্দর কিন্তু তেমনই অকেজো। একদল সৈন্য আমাদের বাড়ীর উপর তাঁবু বেঁধে থাক্‌লে যতটা গণ্ডগোল না হতো একটী নূতন বালিকার আগমনে তার চাইতে বেশী হচ্ছে। সে তার সঙ্গে মেজে আচ্ছাদনের বহু কম্বল, দেয়ালে টাঙ্গাবার জন্য কনফিউসিয়াস এবং মেনসিয়সের (Confuscious) (Mencious) বহুবাণী, রেশমমোড়া খাট বিছানা এই সব এনেছে।

তোমার পূজনীয়া মাতঠাকুরাণী এই সব জিনিস দেখে বাহকদের সব ডাক্‌লেন, তার পর আমাদের বল্লেন যে তিনি 'সাং ডং' এ তার এক বন্ধুর বাড়ী চা খেতে যাচ্ছেন। সব জিনিস সাজাবার গুছাবার ভার এখন আমার একার উপরেই। লি টি প্রজাপতির মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কথা সে খুব বল্‌ছিল কাজ কিছুই কচ্ছিল না। শয্যা এমন ভাবে করতে হয়েছিল যেন শয়তানে নিশীথে ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মা নিয়ে পালাতে না পারে। পর্দা সব খুব ভাল করে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন শয়তান আক্রমণ করতে আসতেই পর্দায় আট্‌কে যায়। লি-টি ভারী গম্ভীরভাবে আমাকে বোঝাচ্ছিল, যে সব আত্মা আঁধারে ঘুরে বেড়ায় সেগুলি সাধারণতঃ নূতন কিছু দেখ্‌লে তারই মাঝে আশ্রয় নিতে চায়। সে জন্য সতর্ক থাকা দরকার। সে ছাদও পরীক্ষা করেছিল—যদিই বা সে দিক থেকে কিছু আসে। লি-টি রান্না ঘরেও নূতন মূর্ত্তি স্থাপনের কথা বলেছিল, তোমার মা ছিলেন না তাই রক্ষে। বুঝতেই পাচ্ছ তোমার মা যদি নবাগতার গৃহের দেবতাকে নিজের রান্নাঘরে দেখ্‌তেন, তাঁর কি অবস্থা হোত। তোমার মা আসতেই, সব মিটে গেল, তাঁর পুত্রবধূর এতটা বাচালতা তিনি মোটেই পছন্দ করলেন না। তোমার মা প্রায়ই বলেন যে লি-টির পিতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলে হয়—তাঁকে বলবেন যে কন্যার বিবাহে লাখি লাখ

খরচ করতে পেরেছেন আর তার চরিত্র গঠনের জন্য হাজারও কি খরচ করতে পারেন নি? মনটা বড় খারাপ—আজকের মত তবে বিদায়——

তোমারই পত্নী।

(৬)

প্রিয়তম আমার!

"অবিনীত স্বভাব, অসন্তোষ ভাব, পরনিন্দা, দ্বেষ এবং নির্ব্বুদ্ধিতা এই পাঁচটী দুর্ব্বলতা নারীজাতির সর্ব্ব প্রধান শত্রু, প্রথমোক্ত চারিটি এক বুদ্ধিহীনতার দোষেই ঘটে থাকে। তোমার এ সম্বন্ধে মত কি? যতক্ষণ আমরা আমাদিগকে বাড়ীর বধু হিসাবে ধরে নিই ততক্ষণই অস্বস্তি বোধ করি, গৃহকর্ত্রী হিসাবে ধরলে তেমনটী নয়। লি-টি এখনও একটি ছোট্ট বালিকা—তুমি হাসছ যে? বোধ হয় ভাব্‌ছ আমার চেয়ে মাত্র তিন বৎসরের ছোট—সে হলো বালিকা। তবু আমি তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট এক বৎসর বাস করেছি এবং পাকা গৃহিণীর নিকট হ'তে বহু জ্ঞান লাভ করেছি। লি-টিও যদি অবসর সময়ে তার পিতামাতার কথা ভেবে ক্রন্দনে আর বৃথা আলস্যে সময় নষ্ট না করে কিছু দিনের মধ্যেই বুদ্ধিমতী হয়ে উঠবে।

আমার কাছে সে এই পুরাতন প্রাসাদের আনন্দময়ী; সদাই সে হাস্যময়ী - মধুর হাসিতে ভগবান্ সদা তৃপ্ত। গৃহের অশান্তি দূরে পালায়। লি-টি প্রায়ই তোমার মার নিকট অপমানিতা হয়। এখন তোমার মা নিয়ম করে দিয়েছেন যে লি-টি ও মা লি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কনফিউসাস (Confuscious) থেকে রোজ কিছু পাঠ নেবে।

লি-টি প্রসাধন সম্বন্ধে অতিশয় যত্ন নিয়ে থাকে। দুজন দাসী নিয়ে প্রাতঃকালে সে তার আয়নার সম্মুখে বসে। একজন জলের গামলা ধরে থাকে অপরটি প্রসাধনের দ্রব্যাদি গুছিয়ে দেয়। মুখখানি সুগন্ধি মধু দ্বারা সিক্ত করে তার উপরে চাউলের গুড়া লাগায়, ক্রমে মুখ চাউলের মতোই সাদা হয়ে যায়। তারপর গণ্ডদ্বয় তোয়ালে দিয়ে মুছে নীচের ওষ্ঠে কিছু লাল রং লাগিয়ে চুল গুলি বাঁধে। তার চুলগুলি খুব সুন্দর (কিন্তু আমার মতো এত দীর্ঘ বা ঘন নয়, আমার তো এই মনে হয়)। সে যখন তার রেশম ও সাটিনের জামা গায়ে দিয়ে বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি প'রে বার হয় তখন তার বেণীবদ্ধ দীর্ঘ কুন্তল রাশি হ'তে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত যেদিকেই কেন দেখি না অপূর্ব্ব সুন্দর বলে বোধ হয়। তাকে দেখে আমার হিংসে হয়—কারণ তুমি যখন এখানে ছিলে তখন আমি ত, ঐরূপ সজ্জিত হতেম। স্বামী আমার, তুমি নিকটে নাই—কার আনন্দের জন্য আর বেশ ভূষা করবো? পাউডার তোমার যাবার পর ব্যবহার হয়ই নাই—বিরহিণী নারীর কোন্ গাউন মানাবে সে খুঁজ্‌তে কতবার কাপড়ের বাক্স ঘেঁটেছি।

তোমার মা বলেন লি-টি গর্ব্বিতা এবং তিনি প্রায়ই বলেন "রমণীর সুন্দর মুখের চেয়ে ভাল অন্তঃকরণ অনেক মূল্যবান।" আমি বলি সে আমাদের আনন্দময়ী, তার উপস্থিতিতে চারদিকে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তার নারীজন্মও সার্থক হয়েছে—তোমার ভাই সি-

পে তাকে পেয়ে যথেষ্ট সুখী হয়েছে, সে তার এই সুন্দর ফুলটীকে পূজা করে। তোমার মার সঙ্গে হয়তো লি-টির একটু কথান্তর হয়েছে, পি-টি বসে দুঃখ কচ্ছে—সি-পে তার কক্ষের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেই তোমার মা একটু নয়নের আড়াল হলেন অমনই দুজনে মিলন হলো—এখন তাদের হাসি শুন্‌তে পাচ্ছি,—অবসাদ্ অস্বচ্ছন্দতা সব কেটে গেছে বাঞ্ছিতের সমাগমে।

শীতকাল এসেছে এখন আর আমরা ছাদের উপর অধিকক্ষণ কাটাতে পারি না। সমস্ত দেশ যেন ধূসর কুয়াসায় আবৃত হয়ে গেছে—চাষীরা সব মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। পাহাড়ের নীচের রাস্তায় লোকচলাচল একরূপ বন্ধ—যদিও দুএকজন ছাতা বা খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে চলে।

তোমার কাছে আমি এমন সব চিঠিও লিখি। এর চেয়ে আমাদের নারী জীবনের ঘটনাই বা কি—আমাদের সংসার এই গৃহের মধ্যেই বদ্ধ—এর বেশী চাইও না কিছু—।

তোমারই পত্নী।

(৭)

প্রিয়তম আমার!

ভারী একটা মজার ঘটনা,—আমরা দোকানে গিয়ে জিনিষ কিনেছি—আমাদের পক্ষে এটা একেবারে অপূর্ব্ব—লি টির জন্যই আমরা এ আনন্দ লাভ করেছি;—লি-টিকে এজন্যে কত আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। লি-টির জন্যে সব দোকানদারেরা প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই জিনিষ নিয়ে আস্‌ত, কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট না হয়ে নগরের দোকান থেকে জিনিষ কিন্‌বে এই আবদার আরম্ভ করলে, তোমার মার অনুমতির জন্য আমরা কি অস্বস্তিতে দিন কাটিয়েছি—তারপর তোমার মা আমাদের নগরে যাবার জন্য খাটুলির ফরমাস্ করলেন—তখন কি আনন্দ আমাদের! প্রথমে তোমার মা চার বেহারার কাঁদে চড়ে চল্‌লেন, তারপর আমি দুবেহারার কাঁধে চড়ে লি-টি ও মা-লি তার পর চললে; তাদের পেছনে চাকররা সব যাচ্ছিল আমাদের মোট বয়ে আন্‌তে। আমরা যখন নগর দ্বারে পৌঁছিলাম তখন সকলেরই কি আনন্দ! সেদিন হাটবার, রাস্তাগুলি মৎস্য ও শাক-সব্জীর ঝুড়িতে বেজায় সঙ্কীর্ণ করে তুলেছিল। ঘোড়া গাধায় চড়ে বহুলোক যাতায়াত কচ্ছিল—আমার তো ভয়ই হলো—এর মধ্য দিয়ে আমাদের বাহকেরা রাস্তাকরে যেতে পার্ব্বে কি না! আমাদের বাহকদের 'আঃ হোঃ' শব্দে রাস্তা পেতে কোন কষ্ট হলো না। আমরা সেই লম্বা খোলা দোকানগুলি প্রাণভরে দেখে নিলুম। একটা জুতার দোকানের সম্মুখে দেখলুম একজোড়া মস্ত বুট্, পার্ব্বতীয় রাজার জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। পাখার দোকানে পাখাগুলি অবিশ্রাম চল্‌ছিল। রেশমের দোকানীরা জানালা, দরোজা এমন কি রাস্তা পর্য্যন্ত রেশম দিয়ে মুড়ে ফেলেছে।

আমরা অনেক কথা খরচ করে, দর দাম করে সিল্ক ও সাটিন খরিদ করলাম, স্বর্ণালঙ্কার দেব দেবীর মূর্ত্তিও অনেক কেনা গেল। ক্লান্ত, ক্ষুধার্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এসে—মনে হচ্ছিল, কখন চা পান করে প্রাণ জুড়াব! সেই জনপূর্ণ নগরের কোলাহলের চাইতে আমাদের এই দেয়ালঘেরা শান্তিময় জীবন—কত বিভিন্ন। আমি ভাবি এখানে আমরা...কতটা

শান্তিতে বাস কচ্ছি, দুঃখ দৈন্য আমাদের পাশে থাকতে পারে বটে, কিন্তু আমাদিগকে স্পর্শ করতে পারে না। তবু ভাবি আমরা যেন বিশ্ব থেকে কতটা বঞ্চিত—এক একবার এই নূতন দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তোমারই প্রিয় ক্লান্ত পত্নী।

(৮)

প্রিয়তম আমার!

আমি একজনের জন্য বড়ই চিন্তায় পড়ে গেছি। তোমার কি আমাদের দেশের সেন পের কথা মনে পড়ে। আমার বিয়ের মাস দুই পরে যার লিং-পে-উর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল! সে দুঃখে পড়ে কাল আমার কাছে এসেছিল। তার স্বামীর বাড়ী থেকে তাকে বাপের বাড়ী রেখে গিয়েছে। তুমি বুঝতেই পার স্বামীপরিত্যক্তাকে আজীবন কি লজ্জা বহন করতে হয়। আমি জানি না কি করতে হবে, ভারী দুঃখে পড়ে গেছি। তার শ্বাশুড়ীর জন্যেই এতটা ঘটেছে—আমি সেন-পেকে বুঝাচ্ছি যে স্বামীর পিতা মাতাকে প্রত্যেক নারীরই নিজের পিতা মাতার চেয়ে বেশী সম্মান করা উচিত।

আমি ভাবছি সে তাঁকে সম্মান দেখাতে ত্রুটি করেছে—তাই এ শাস্তি ভোগ কচ্ছে। আমরা ছেলে বেলায় পড়েছি যে জ্ঞান লাভের প্রথম উপায়ই হচ্ছে সম্মান করে চলা। আমি বুঝতে পারি যে, সব সময় মুখ বুজে চুপ করে থাকাটা কষ্টকর বটে—কিন্তু শান্তিপ্রয়াসী হলে একটু সহিষ্ণুতা থাকাও যথেষ্ট প্রয়োজন। আমার এখানেই সে দু'দিন থাকবে। কাল রাত্রে সে আঁধার পানে চক্ষু মেলে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। আমি তাকে একটু বুদ্ধিমানের মতো চিন্তা করতে বল্লেম—তার স্বামী ও শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সরলভাবে সব কথা বল্‌তে বল্লেম; কারণ তারা উভয়েই এর যথেষ্ট সম্মানের পাত্র—স্বামীহারা পুত্রহীনা অবস্থায় যখন পরের দয়ার উপর তাকে নির্ভর করতে হবে তখন সে বুঝতে পারবে এর মূল্য। যাক ও সব কথা;—প্রিয়তম আমার, তোমার আমার মধ্যে কখনও অবিশ্বাসের ছায়া মাত্র পতিত হবে না—আমি তোমারই, এ হৃদয় প্রাণ তোমারই, তুমি আমায় ভালবাসবে আমি শুধু এই চাই—!

তোমারই পত্নী।

(৯)

প্রিয়তম আমার!

তোমার কাছে পত্র লিখতে আর সাত দিন অপেক্ষা করতে পারলুম না—কারণ কাল সন্ধ্যায় যে পত্র দিয়েছি সে শুধু দুঃখের কথাতেই পূর্ণ ছিল। কাল রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল, আজ মনটা অনেক ভাল বোধ হচ্চে।

তোমার মা আমায় খুব বকেছেন, যদিও আমি নিজে বুঝতে পাচ্ছি এটা অনর্থক, তবু কথাগুলো আমার প্রাণে ভারী লাগে—তুমি জান তাঁর কথার উত্তর দিতে আমি অভ্যস্থ নই। লি-টিও বড় কষ্টে আছে যদিও এটা সে নিজের জন্যই ভোগ কচ্ছে—তবু এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। লি-টি তার বাপের বাড়ী থেকে যে সমস্ত চাকর চাকরাণী এনেছে তার ভেতর একজন বুড়ো ঝি সেই লি-টিকে পালন করেছিল, ভালও বাসে খুব তাকে—তবে হাতে কাজ না থাকলে মেয়ে লোকের যে দশা হয়—সে অন্দরে বসে কেবল বাজে গল্পেই সময় কাটায়। তার এই রাজ্যের

অবান্তর প্রসঙ্গ—বাজে বকা পরনিন্দা এ সব যদি দাসীদের মহালই বদ্ধ থাকত তবে কথা এতদূর গড়াত না—সে আবার দিন ভ'রে যা সংগ্রহ করে লি-টির প্রসাধনের সময় তার কাছে বসে তাই ঢালে। লি-টি বালিকা ও-সব বাজে কথা শোনবার মোটেই উপযুক্ত নয়। রক্তের সঙ্গে বিষ মি'শলে যেমন সমস্ত শরীরেই ব্যাপ্ত হয়—তেমনই একবার যদি এই বাজে বক্‌বার অভ্যাস মেয়েলোকের হয়ে যায় তবে পরিণাম বড় খারাপ দাঁড়ায়। চাকর চাকরাণীদের ভিতর কেবল একই আলোচনা চল্‌ছে—লি-টির বাপের বাড়ীই বা কেমন,—আর তার এ বাড়ীই বা কেমন, সেই বা কেমন এবং তার স্বামীই বা কেমন, এই সব আলোচনা শেষে এত বেড়ে উঠেছিল যে আমাদের দাসদাসীরাও তাতে যোগ দিয়ে দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই একরূপ অসম্ভব করে তুলেছিল।

এটা সামান্যই বোধ হয় বটে—কিন্তু এতেই আত্মীয়তার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল করে ফেলে,—গৃহের শান্তিও নষ্ট হয়। অবশেষে একদিন আমি লিটি-র বুড়ো ঝিকে বল্লেম যে, যদি আর তার দেশে যাবার ইচ্ছা নাই থাকে—তবে সে যেন তার মুখটা একটু সংযত করে। কয়েকদিন বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল, আবার যে সেই; তাকে একদিন আমার মহলে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লুম—"তোমার অন্ন এখান থেকে উঠেছে—তুমি এখন বিদেয় হও।" লি-টি কেঁদে অস্থির কিন্তু আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—এক সংসারে থাকৃতে গেলে এমন ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়। সে গেল বটে কিন্তু আমাদেরই দরজায় বসে আমাকে গালি দেবার লোভটুকু সম্বরণ করতে পারলে না, সে আমাদের বাহিরের পথে বসে তিনটি ঘণ্টা ধরে 'লিউ' বংশের উপর নানারূপ অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগলো। সে তোমাদের বিখ্যাত পিতৃপুরুষদের কত কুৎসা! প্রিয়তম আমার, আমি জানতুম না—ইতিহাস এই বংশের বীরদের বক্ষে ধরে কত গৌরবান্বিত। আমি কত সুখী হলুম—যে এমন মহৎ বংশ হতে এসেছ তুমি। তারপর সে মিং বংশের আলোচনায় ও তাদের গুণরাশি ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হলো। লি-টির পিতৃপুরুষদের কত সুযশকাহিনী—কীর্ত্তিগাথা। ওরা বংশতালিকা সব খুঁজেছিল দেখছি। যাক্ ও সব বাজে কথা। তিনঘণ্টা সমানে বকার পর বুড়িটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লো। শেষে একজন চাকরের কাছে একখানা চিঠি লিখে বুড়িকে নৌকা করে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম—।

কিন্তু তোমার মার সে কি অবস্থা! তুমি দূরে আছ খুবই সুখে আছ। তিনি এ উঠান থেকে ও উঠান ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলেন, আমি ভাবলুম তিনি বোধ হয় ঝিটাকে জব্দ করতে সৈন্য আনতে পাঠাবেন—তার পর যখন বুঝতে পারলেম যে মেয়েলোকটা তারই অধীনে আছে তখন একটু সংযত হলেন।

কি যে অবস্থা হয়েছিল তাঁর কেবল মরতেই বাকী ছিল—তুমি জান তোমার মার সংযমের অভ্যাস মোটেই নাই—বিশেষতঃ জিহ্বার সংযম নাই বল্লেই চলে। যা হোক শেষে কোন রকমে তাঁকে শয়নগৃহে নেওয়া গেল—আমরা চা ও কিছু গরম মদ" নিয়ে

গেলাম এবং যাতে তিনি এই অপমানের কথা ভুলতে পারেন তারই চেষ্টা করতে লাগলেম। এতেও যখন তিনি সুস্থ হলেন না তখন আমরা পূর্ব্ব-ফটক থেকে ডাক্তার আনতে লোক পাঠালেম, ডাক্তার এসে তাঁর স্কন্ধদেশ পুড়িয়ে ভিতরকার গরমটা বের করে ফেলতে বল্লে, এতে তোমার মা বেজায় আপত্তি করাতে ওঝা তাড়াতাড়ি তার সাজ সরঞ্জাম গুটিয়ে নিজের কাঁধের পানে ভীত ভাবে চাইতে চাইতে পাহাড়ের পথে চল্‌লেন। তাপপর আমি তাঁর প্রিয় পুরোহিতকে ডাক্‌তে পাঠালেম। তিনি কিছু গোলাপী মন্ত্র, ধূপ ধূনো ও মোমবাতি নিয়ে এলেন, কিছুকাল মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, একটু গানও গাইলেন এর মধ্যে তোমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে লি-টিকে ডেকে আনতে বললেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেম 'এখন লি-টিকে ডেকে কোন ফল হবে না, তার মন এমনই অস্থির আছে যে, এখন সে কোন কথাই বুঝতে পারবে না।' তিনি বল্‌লেন ও একটা ছবি,শুধু রংই শাদা—ভিতরে কিছু নেই। আমি বল্‌লেম "আমাদের ওকে গড়ে নিতে হবে।" তিনি রেগে উত্তর করলেন "ও ঘুনেথেকো বাঁশ আর নোয়ান চলে না।" আমি আর কোন উত্তর করলেম না—লি-টি ও সি-পিকে "স্বর্ণ-মৎস্য-মন্দিরে" বেড়াতে পাঠিয়ে দিলুম।—যখন তারা ফিরে এল, ঝড় তখন অনেকটা কেটে গেছে। এতেই আমার মন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল—যত ঝড় ঝঞ্ঝা সব আমাকেই মেটাতে হয়। তুমি মনে করোনা আমি এতে বড্ডো বিচলিত হয়ে পড়েছি। আমি জানি, এর সমস্তই পরিণামে সুখের জন্য—এ দুঃখের দিকে আমি মোটেই চাইনা। প্রিয়তম আমার, তুমি আমার ভাব এর চেয়ে সুখ আর কিসে আমার?

তোমার পত্নী।

(১০)

প্রিয়তম আমার!

সেদিন সহস্রভুজার মন্দিরে মহোৎসব উপলক্ষে আমরা গিয়েছিলাম। তোমার মা ঠিক করলেন যে আমরা নৌকায় কিছুদুর গিয়ে তার পর পাল্কীতে যাব। আমরা সহর থেকে একখানা নৌকা ভাড়া করলুম। কিন্তু নৌকাখানায় আমাদের সকলের ধরবার উপযোগী স্থানের অভাব ছিল—আর একটু বড় হলে ঠিক হোত। তোমার মা, তাঁর চারিজন বন্ধু—আমি লি-টি আর মা-লি ছিলাম, আমাদের সঙ্গে পাচক, চাকর ও তিনজন দাসী ছিল। আমার পক্ষে এই প্রথম নৌকা যাত্রা—দূর থেকে নৌকা দেখার চেয়ে এতে কত বেশী আনন্দ! আমরা নৌকা থেকে চারদিকের দৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম—বাঁশের ঝাড়ের ভিতর থেকে কুঠিরগুলি দেখা যাচ্ছিল। নদীর মাঝে কত নৌকা কত লোক জন। সেই জনাকীর্ণ জলপথে আমাদের নৌকা চলতে লাগলো, দূরে চা-র দোকানে সকলে চা খাচ্ছিল। ছাদের পাশে ছোট ছোট ছেলেরা দাঁড়িয়ে আমাদের পানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে ছিল। কোথাও বা ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রমণীরা সব কাপড় কাচছিল। এত নৌকা এখানে, আমার পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না

যে জগতে এত নৌকা থাকতে পারে। সে কত ছোট, বড়, বোঝাই নৌকা কোন খানা পালে যাচ্ছে—কোন খানা বা দাঁড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা মাছধরা নৌকা যথেষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—ক্ষুধিত আঁখি নিয়ে সন্মুখে মাঝিরা তাদের শীকার সন্ধানে বসে আছে। ক্রমে আমরা বিশ্রামস্থলে উপস্থিত হলেম। বাহকেরা আমাদের অপেক্ষায় ছিল, সেখান থেকে বাঁধা রাস্তা ধরে আমরা মন্দির পথে চলতে লাগলেম।

এখানে যেন সমস্ত জগতই উপাসনা কচ্ছে—ধনী, দরিদ্র কত প্রকারের রমণী কিন্তু এখানে সব সমান, ভেদ বিবাদ কিছু নেই।

আমরা মন্দিরে প্রবেশ করে বাতি জ্বালিয়ে ধূপ ধূনো দিলাম, ভগবতী সহস্র-ভূজার দ্বারে প্রণাম করে তাঁর কাছে নব বর্ষের জন্য আমাদের সমস্ত পরিজনের মঙ্গল প্রার্থনা করলেম। আমি দয়াময়ী দেবী কোয়াণ-ইনের কাছে গিয়ে তাঁকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করলুম—তুমি জান তাঁর কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ—আরো আরো দেব দেবী প্রণাম করলুম বটে কিন্তু কোয়াণ-ইন রমণীরই দেবতা—তাঁর স্থান আমার হৃদয়ের সবটা জুড়ে আছে।

তিনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তুমি বিদেশে বহু দূরে আছ তিনিই আমায় রক্ষা কচ্ছেন। সূর্য্যের আগমনে যেমন আকাশ থেকে চন্দ্র তারা সব দূরে যায় তেমনিই তাঁর কাছে গেলে আমার সমস্ত প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়, দুঃখ দৈন্য কিছু থাকে না– কত ভালবাসি আমি তাঁকে সেটা বুঝাতে পারব না—তিনি যেন আমার কথা শুনে থাকেন—আমার কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাছে অপূর্ণ থাকে না।

মন্দির ছেড়ে আসার সময় দেখলুম সেই প্রকাণ্ড আঁধার কক্ষে জগতের আলো বুদ্ধ-দেব বসে আছেন, সে মূর্ত্তি কি সুন্দর—মন আপনা হতেই ভক্তিতে নত হয়ে আসে। শান্ত স্থির নির্ব্বাক, নিস্পন্দ—ধ্যানী বুদ্ধ—চারিদিকে সহস্র আলো জ্বলছে, ধূপের ধোঁয়ায় ঘরখানা আঁধার হয়ে গেছে। আমি ভাবলুম "তিনি সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন—"।

মন্দির দ্বার থেকে 'পিঠে' কিনে আমরা মাছগুলোকে সব বিতরণ করলুম। তার পর কিছু জলযোগ করে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া গেল। তোমার মা ও তাঁর বন্ধুগণ বহু বিষয়ের আলোচনা কচ্ছিলেন চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্রের আলোচনা থেকে আধুনিক বালক বালিকা, শিক্ষাপ্রণালী, গৃহকার্য্য দাস দাসী কোন কথাই বাদ যায় নি। আধুনিক শিক্ষার কথা উঠতেই তাঁদের বক্তৃতার চোট আরও বেড়ে উঠল, কারণ এটা তাঁদের সকলেরই চক্ষুশূল।

ক্রমে আমরা বাড়ীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলেম, হঠাৎ যেন আমার অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠলো—হায়, তুমি এখন আমার কাছে নাই —পথের পাশে লি-টির স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে—আমার অপেক্ষা করার কোন লোক নেই—আমার পক্ষে সব শূন্য—! এতক্ষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিলুম—আবার বিষাদে হৃদয় ভরে গেল। প্রিয়তম আমার,— তোমার ভালবাসার "সেই"।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সৌধ-রহস্য

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাহিরের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গেল। বাবা চেয়ার ছাড়িয়া বাহিরের জ্যোৎস্নালোকিত ময়দানের দিকে চাহিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া পরিতৃপ্ত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "কি চমৎকার! কি শান্তির রাজ্য! ভগবান্ তোমার এই পরিপূর্ণ প্রসাদসুধার অমৃতরসে যে বঞ্চিত, সে সত্য সত্যই হতভাগ্য?" টেবিলের উভয় পার্শ্বে এসথার ও আমি বসিয়া ছিলাম, বাবা আমাদের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন।

বাহিরের তাজা বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য আমি উঠিয়া হলের বড় দরজাটা খুলিয়া দিলাম, সাদা পালতোলা ছোট ছোট নৌকাগুলির মত খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘে আকাশ খানা ভরাইয়া ফেলিয়াছে। তরল মেঘের ঝালরের ভিতর দিয়া চাঁদ উঠিতেছিল। বিশ্ব তখন জ্যোৎস্না জলে স্নান করিয়া নির্ম্মল হাসি হাসিতেছিল। হলের সাম্নের দরজার উপর দাঁড়াইয়া আমি ক্রুমবারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য্য? জানালাগুলায় আজ আর আলোর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সেই প্রকাণ্ড টাওয়ার হইতে নীচে পর্য্যন্ত কোথাও আলো নাই—অস্পষ্ট মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকের ম্লান ছায়ায় বাড়ীখানাকে যেন একটা প্রকাণ্ড শবাধার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। জীবিত মানবের বাসস্থান বলিয়া কোন রূপেই মনে হয় না। সুপ্তরজনীর নিবিড় নীরবতা আর প্রকাণ্ড অন্ধকার বাড়ীখানা ধীরে ধীরে আমাদের উত্তেজিত মস্তিষ্কে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে বারটা ঘোষণা করিল। সহসা তাড়িতাহতের মত উঠিয়া আমার হাতটা সজোরে টানিয়া আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া এসথার বলিল, "দাদা শুন্চ?" আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম "কৈ—কিছু ত, না?" কম্পিত স্বরে উত্তর হইল, এদিকে দরজার কাছে এগিয়ে এস, এই বার? বুঝতে পাচ্চ না একটা মানুষ ছুটে আসচে।" কথা শেষ করিয়াই সে টেবিলের পাশে নত জানু হইয়া বসিয়া পড়িল এবং অঞ্জলিবদ্ধকরে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম—মেঘ সরিয়া গিয়াছিল, নির্ম্মল চন্দ্রালোকে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত আমি চাহিয়া দেখিলাম, মরডণ্ট ছুটিয়া আসিতেছে! একটা অস্ফুট কাতর চীৎকারের সহিত আমি বলিয়া উঠিলাম "কি হয়েচে? মরডণ্ট কি হয়েচে?" সে দাঁড়াইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবরুদ্ধ স্খলিত বাক্যে উত্তর দিল "বাবা আমার বাবা?" তাহার মাথা হইতে টুপিটা কোথায় খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ম্লান চন্দ্রালোকে মুখখানি কি ভয়ানক পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। চোখ দুইটা যেন ঠিক্‌রিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এমনি মনে হইতেছিল। এক রকম টানিয়াই আমি তাহাকে ঘরে আনিয়া কোমল সোফাখানার

সতীর অগ্নি-সংস্কার।

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

উপর শয়ন করাইয়া দিলাম। এই ঘটনায় এসথার তাহার অভিভূত অবস্থা হইতে অনেকটা যেন সজাগ হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর হইতে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া আনিয়া দিলে—আমি সেটুকু মরডণ্টকে খাওয়াইয়া দিলাম। তাহার ফলে মুখে রক্তের সঞ্চার ও অর্থহীন নেত্রে আবার যেন অনুভূতির ভাব ফিরিয়া আসিতেছিল। মরডণ্ট উঠিয়া বসিলেন এসথারের দক্ষিণ হস্তখানা তাঁহার দুই কম্পিত হস্তে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিলেন যে মনে হইল, তিনি যেন কোন নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্নকে তাড়াইয়া দিয়া বাস্তবের আশ্রয় লইতে চান। আমি কহিলাম "তোমার বাবা—তিনি কোথায়? তাঁর কি হয়েছে?" "তিনি চলে গেছেন। করপোরাল রুফাসস্মিথও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেছে। আমরা আর কখনও তাঁকে দেখ্‌তে পাবনা।" মরডণ্ট ফুকারিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। আমি বাধা দিয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলাম "চুপ চুপ্। "গেব্রিয়েল আর তোমাদের মা। তাঁদের কি হোল?" মরডণ্ট কহিল "গেব্রিয়েল কিছুই জানে না। অভাগিনী সে বাড়ীর শেষপ্রান্তে ঘুমুচ্চে···সকালে উঠে শুন্‌বে। ...মা আমার চিরদুঃখিনী মা—তিনি এম্‌নি একটা ঘটনার জন্যেই বহুকাল থেকে অপেক্ষা করে আছেন···মা আমার—কিছুই আশ্চর্য্য হন্ নি, তাঁর অসীম আত্মসংযম আমার শিক্ষাস্থল হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু এতদিন প্রতীক্ষা করার পর—আজকের আমি পাগল হয়ে গিছলেম।" চেয়ার টানিয়া লইয়া ললাটে হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে আমি কহিলাম—"যদি সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত কোন উপায় না থাকে আমায় সব কথা ততক্ষণ খুলে বল। কি ঘটনা ঘট্‌ল?"

কম্পিত হাত দুইখানা বক্ষে বদ্ধ করিয়া মরডণ্ট আমার পানে চাহিল "সব কথাই তোমায় বল্‌ব,—তোমার জানা আছে বোধ হয়, বাবার যুবাবয়সের কোন অন্যায় কাযের জন্য আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিশোধ প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেম। সেই অপরাধের সঙ্গে করপোরালেরও যোগ ছিল। কাল সকাল বেলা যখন আমি দেখলুম বাবা তাঁর আফগান যুদ্ধের সময়কার পুরোণ পোষকটা বার করে পরেচেন—তখনি আমার মনে হোল বুঝি আমাদের কল্পিত বিপদের ঘনমেঘ এইবার সত্যের আকার ধরে মাটিতে নেমে এলো। তিনি তাঁর প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে অবস্থানকালের অনেক কথা গল্প কচ্ছিলেন, বেশ শান্ত ভাবেই গল্প কচ্ছিলেন। রাত্রি ৯টার সময় তিনি আমাদের নিজের নিজের ঘরে শুতে যেতে বল্লেন;—আমরা ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে বাবা মাকে আর গেব্রিয়েলকে খুব স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন, আর আমার হাতখানা খুব আদর করে ধরে মিষ্টি সুরে বল্লেন, এই প্যাকেটটা ওয়েষ্টকে দিও। আমি মিনতি করে প্রার্থনা জানালুম যে সে রাত্তিরে আমি তাঁর কাছেই থাক্‌ব—আর যে বিপদ আস্‌বে—তার অংশ ভাগ করে নোব।" কিন্তু এমন আগ্রহের সঙ্গে কাতর স্বরে বাবা বল্লেন "মরডণ্ট আমি যে কষ্ট পাচ্চি—তার উপর অবাধ্য হয়ে তুমি আমায় আর বেশী যাতনা দিও না।"

আমি আর কিছু বলতে সাহস কল্লুম না, একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়েই বাবা দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে চলে গেলেন। যখন তাঁর মনের মধ্যে ভয়ের খেয়াল বেশী হোত গেব্রিয়েল ও আমাকে তিনি এমনি চাবি বন্ধ করে নিরাপদে রাখবার চেষ্টা করতেন। বাবা চলে গেলেন, সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, আমি সেইখানে বসে পড়লুম। তখন রাত্রি ১০টা, আমি উঠে ঘরের ভিতর পায়চারী করতে লাগলুম—যখন মাথাটা অনেকটা ঠিক হয়ে এলো—আস্তে আস্তে আলোটা মাথার কাছে এনে রাখলুম—কাপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে বাইবেল খানা নিয়ে পড়তে লাগলুম। বোধ হয় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ আমার কানে একটা জোর আওয়াজ এসে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে। আশ্চর্য্য হয়ে বিছানায় উঠে বস্‌লুম—সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। আলোটা মিট্‌ মিট করে জ্বলছিল—ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখলুম—প্রায় মধ্যরাত্রি! আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালুম—আলোটা নিভে গেল, বাতি জ্বালবার জন্যে দেশলাইটা হাতে করেছি হঠাৎ একটা শব্দ বেজে উঠ্‌ল—এত কাছে যে মনে হোল আমার ঘরের মধ্যেই আওয়াজ হচ্চে! আমার ঘর—তুমি জান—বাড়ীর সাম্‌নেই;—মার আর গেব্রিয়েলের ঘর একেবারে শেষ প্রান্তে। উঠে জান্‌লার কাছে গেলুম—পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে বাগানের দিকে দেখ্‌লুম, কাঁকড়ফেলা জ্যোৎস্নালোকিত পথে দাঁড়িয়ে তিনজন বিদেশী লোক বাড়ীর দিকেই চেয়ে আছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উর্দ্ধমুখে চেয়ে তারা কি বল্‌ছিল—আর সেই সঙ্গে তাদের ছয়টি হাত ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধে ও নিম্নে উত্তোলিত ও নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। হঠাৎ একটা মর্ম্মস্পর্শী তীক্ষ্ণ চীৎকারের মত কি একটা কথা তারা বলে উঠ্‌ল—সেই ভীতিপূর্ণ চীৎকারে আমার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হয়ে গেল—শব্দ যেন স্তব্ধরাত্রের সমস্ত বিজনতাকে ভরিয়ে দিয়ে বায়ুমণ্ডলকেও পূর্ণ করে ফেলেছিল।

আওয়াজটা যখন মিলিয়ে এলো তখন দরজা খোলার শব্দ হোল। তার পরই জ্যোৎস্নালোকে আমি দেখতে পেলুম আমার বাবা আর করপোর‍্যাল সেখানে এলেন। তাঁদের মাথায় টুপী নেই—তাঁরা যেন যন্ত্র চালিতের মতই চল্‌ছিলেন—ঘুমিয়ে কি জেগে তাও আমি বুঝতে পাল্লুম না। বিদেশীরা তাঁদের স্পর্শ কল্লেনা—কোন কথা বল্লেনা;—বাগানের রাস্তা দিয়ে ঝোপের মধ্যদিয়ে তারা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল—বাবা আর করপোর‍্যাল তাদের অনুসরণ করে আমার চোখের উপর থেকে চিরদিনের জন্যেই মিশিয়ে গেলেন।” মুখে হাত ঢাকিয়া মরডণ্ড অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আবার আরম্ভ করিল—

“এ সব হতে খুবই কম সময় লেগেছিল—পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগেনি।

আমি আমার শরীরের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে পাগলের মত দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলুম, হঠাৎ তালাটা খুলে গেল—আমি বারাণ্ডায় এসে পড়লুম—প্রথমেই আমি ছুটে নীচে নেমে রাস্তায় এসে পড়লুম—ঝোপের ভিতর বাইরে ছুটাছুটি কল্লুম কোথাও কোন চিহ্ন

নেই। গেটের প্রকাণ্ড দরজাটা প্রতিদিনের মতই সুদৃঢ় অর্গলে দৃঢ়বদ্ধ। যখন আমার অনুভব শক্তি স্পষ্ট হোল, মনে পড়্‌ল মার কথা;—আবার আমি পাগলের মত ছুটে চল্লেম; মায়ের দরজাতেও চাবী বন্ধ আমি তালাটা জোর করে ভেঙ্গে ফেললেম। দরজা খুল্‌তেই মা বাইরে এলেন—তখনও তাঁর বৈকালিক পোষাক খোলা হয়নি। বাইরে এসেই আমায় অঙ্গুলিসঙ্কেতে নীরব থাক্‌তে আদেশ করে মৃদুস্বরে বল্লেন, "তাঁদের ডেকে নিয়ে গ্যাছে।" আমি মন্ত্রাভিভূতের মত বলিলাম "হ্যাঁ নিয়ে গ্যাছে।" আমার মা—আমার চির বিষাদিনী মা মাটিতে বসে পড়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে—সে অবস্থাতেও প্রার্থনা কল্লেন।...ওয়েষ্ট তুমি বিশ্বাস করবে কি? মা আমার ভগবানকে নিষ্ঠুর বল্লেন না, অভিশাপ দিলেন না, সুধু তাঁর দুই চোখ ছাপিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ল। মা বল্লেন "তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—তাঁর বিচার আমরা মাথা পেতেই নেব—তোমার হতভাগ্য পিতা এ জগতে যে ভাবে কাটিয়ে গেলেন পরজগতে নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক সুখে থাকবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ গেব্রিয়েল এখন ঘুমুচ্চে... আমি তাকে "দুধের" সঙ্গে "ক্লোর্যাল" দিয়ে ছিলুম।" আমি পুলিশে খবর দেবার কথা বলায় মা বলিলেন, "তিনি আমায় অনেকবার ধরে এই কাজটা কর্‌তেই বারণ করে গেছেন, তাঁর আদেশ চিরকালই আমি ভগবানের আদেশের ন্যায় পালন করেচি। আজ তাঁর কথাটা রাখ বাছা আমার!" আমি বলিলাম "প্রত্যেক মুহূর্ত্তই এখন মূল্যবান—হয়ত ঐ ময়লা চামড়াওয়ালা লোকগুলোর হাত থেকে মুক্তির আশায়—এখনও তিনি আমাদের ডাক্‌চেন—" কথাটা মনে হতেই মার দিকে না চেয়ে কোন কথা না বলে আমি আবার ছুটে রাস্তায় এসে পড়লুম—কিন্তু কি করব কোন পথে যাব কিছুই স্থির করিতে পাল্লুম না। এস্‌থার, আমি কি করব?"

ব্যথিত কণ্ঠস্বরে এসথার কহিল, "দাদা—সন্ন্যাসীকে—আমি দেখেছি, তোমরা কিছুই করতে পারবেনা। তবু চেষ্টা করে দেখ, সত্যিই আমরা এমন করে তাঁকে ছেড়ে দেবো না।"

* * *

বৃথা চেষ্টা। কোথাও কোন চিহ্ন নাই! ফিরিয়া আসিয়া আবার আমরা আসন গ্রহণ করিলাম। এসথার তখনও সেই খানে চুপ করিয়া বসিয়াছিল কোন প্রশ্ন করিল না। যদি ঘটনাটার ভিতর দিয়া জেনারলের অদৃশ্য, রহস্যের কোন কিনারা পাওয়া যায় ভাবিয়া আমি মরডণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্যাকেটটা কোথায়? তোমার বাবা যেটা দিয়ে গেছেন?" মরডণ্ট যন্ত্রচালিতের মত পকেট হইতে প্যাকেটটা বাহির করিয়া দিল।

মোড়কটা খুলিয়া ফেলিলাম ভিতরে কতকগুলি পুরাতন কাগজ আর একখানি চিঠি। আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া প্রথমেই চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। চিঠিখানায় তারিখ আছে—

৫ই অক্টোবর বেলা ৩টা

প্রিয় ওয়েষ্ট! অনেক সময় যে রহস্যমূলক ঘটনার ইঙ্গিত তোমায় দিয়াছি তোমার সাগ্রহ অনুরোধেও কেন তাহা প্রকাশ করিতে

পারি নাই সেই কথাই আজ জানাইব। আমার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আমি বুঝিয়াছি যে ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত থাকাই মানবের পক্ষে মঙ্গলের কারণ, তাই মানবহিতাকাঙ্ক্ষা পরম দেবতা মানবের দৃষ্টি ও জ্ঞান এত ক্ষুদ্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে নিশ্চিত শুভ, বা অশুভ ঘটনা মানব শক্তির দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নহে সে সব ঘটনা অজ্ঞাত থাকাই মানবের পক্ষে শান্তিদায়ক,—সুধু এই জন্যই আমার আগত এবং অতীত জীবন আমি প্রকাশ করিতে চাহি নাই। যে অশান্তি আমি দিবারাত্রি সহ্য করিতেছি আমার স্নেহপাত্র সে যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি নাই।

আমার দুর্ভাগ্য জীবনের দীর্ঘ অন্ধকার রজনীরও যে অবসান আছে প্রভাত গগনের সুখতারার উদয়সূচনার ন্যায় তাহার ক্ষণিক আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অসহ্য অনিশ্চিত প্রতীক্ষার বুঝি এইবার কুল মিলিবে। আমার অপরাধের পর এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কেন তাহারা আমায় বাঁচিতে দিয়াছে? আমার অদৃষ্টের উপর যাহাদের ক্ষমতার অসীম প্রভাব-তাহারা বোধ হয় ইহাই আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অশরীরি অভিশপ্ত ঘণ্টা দু-কুড়ী বৎসর ধরিয়া আমার মৃত্যুর ভেরী বাজাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে জগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে গিয়া আমি নিরাপদ। ওঃ, শান্তিঃ শান্তিঃ। জীবন ব্যাপী ধ্বংসের পর—আরামদায়িনী শান্তি!—মৃত্যুর পরপারে যাহাই থাক্—আমি এই শত সহস্র অভিশাপ-গ্রস্ত ঘণ্টার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব। এই শোচনীয় ঘটনার প্রত্যেক কথার আলোচনা অনাবশ্যক। ১৮৪১ ৫ই অক্টোবর যে ঘটনায় প্রধান লামা গোলাবসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল সেই ঘটনাগুলি ইহাতেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

পুরাতন সংবাদ পত্রের আবশ্যকীয় পৃষ্ঠা তোমায় ছিঁড়িয়া দিলাম। ইহা হইতেই মোটামুটি ব্যাপার বুঝিতে পারিবে, এবং ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার স্যার এডোয়াড ইলিয়াটের একটা গল্প যাহার নামগুলা অপ্রকাশিত তাহাও দিলাম। আমার বিশ্বাস যাঁহারা পূর্ব্বদেশীয়দের জানেন না—তাঁহারা মনে করেন স্যার এডোয়ার্ডের নিজের মস্তিষ্ক হইতেই এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় ঘটনার সৃষ্টি। এই বিবর্ণ কাগজ কয়েকখানা দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে তাহা নহে। আমাদের ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের স্বীকার করিতেই হইবে যে এমন সব ক্ষমতা জগতে আছে যাহার বিষয়ে তাঁহারা একেবারেই অনভিজ্ঞ!

জগতে আসিয়া জীবনে—আমি শান্তি পাইলাম না। চিরজীবনটাই নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে জন্য আমি দুঃখ জানাইতেছি না। ভগবান্ জানেন–সুস্থ দেহে অনুত্তেজিত চিত্তে একজন বৃদ্ধ লোককে হত্যা করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব কিনা? যদি সমস্ত শত্রুপক্ষ—আফগান তাঁহার পশ্চাতে একত্র হইয়া আশ্রয় না লইত তাহা হইলে—যতই আমি ক্রোধী ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় শিথিল হই তবুও কখনও করপোর‍্যাল বা আমি তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতাম না।

এখন—বিদায়—গেব্রিয়েলের ভাল স্বামী হইও। আর তোমার বোন্ যদি এই অভিশপ্ত বংশে তাহার ভাগ্য জড়িত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও মরডন্ট ও তাঁহাকে আমি পিতার আশীর্ব্বাদ দিয়া গেলাম। আমার স্ত্রীর বাকী জীবনে অর্থাভাব ঘটিবে না—অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে যখন আমার সহিত মিলিত হইবে—আমার ইচ্ছা আমার পুত্র ও কন্যা আমার সমুদয় সম্পত্তির সমান অংশ পায়। আর ওয়েষ্ট প্রিয়তম,—বাছা আমার, যখন তুমি শুনিবে আমি চলিয়া গিয়াছি—আমার জন্য দুঃখিত হইও না। বরং আমার মুক্তির জন্য আমার অসুখী জীবনের শান্তির জন্য আনন্দ করিও।

তোমার হতভাগ্য বন্ধু জন বার্থিয়ার—হিথারষ্টন।

চিঠিখানা রাখিয়া দিয়া নীল ফুলস্কেপ কাগজের যে বাণ্ডিলটা ছিল—সেইটা খুলিলাম। প্রথম পৃষ্ঠার লেখাগুলি অল্পদিনের, বাকী পৃষ্ঠার কালীর রং পর্য্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা, "১৮৪১ সালের শরৎ কালে—লেফটেনাণ্ট জেনারলের কার্য্যাবলী, "টেরেণ্ডা উপত্যকায় যুদ্ধ।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জন বার্থিয়ার হিথারষ্টনের ডায়ারি

থুল উপত্যকা ১৮৪১—১লা অক্টোবর।

আজ প্রাতে তেত্রিশ সংখ্যক—বঙ্গীয় পঞ্চম সংখ্যক কুইনস্ পদাতিক সৈন্য সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইয়াছে।

উপত্যকাটার চারিদিকে যে সব সরু সরু গলি পথ গিয়াছে সে গুলা কেবল পাঠান আর আফ্রিদীতে ভর্ত্তি। এই লোকগুলি যেমন ডাকাতীতে সিদ্ধহস্ত তেমনি আবার ধর্ম্মের নামে মরিয়া।

আমার পরামর্শে যদি কাজ হইত আমি বলিতাম প্রত্যেক গলির মুখে একটা করিয়া ঐ মোটা ঠোঁট, বাঁকা নাক, রুক্ষ খোঁচা খোঁচা চুলওয়ালা মূর্ত্তিকে ফাঁসীতে লটকাইয়া দেওয়া হউক—তাহা হইলে ভয় পাইয়া তাহারা উৎপীড়ন বন্ধ করিবে। কি ভয়ঙ্কর কালো মুখের ভিতর দিয়া সাদা দাঁতের হাসি তাদের!

আজ সাম্নের দিক হইতে কোন সংবাদ আসিল না।

২রা অক্টোবর—

আমি অদ্যই হার্ব্বাটকে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য লিখিব। কারণ যেরূপ দেখিতেছি—তাহাতে লড়াই বাধিলে—আর তা বাধিবেও, আমায় একেবারে সম্মুখের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইবে।

আজ একদল আহত সৈন্য সম্মুখ ভাগ হইতে আসিয়া পৌঁছিল। সংবাদ শুভ! নট "গজনী" অধিকার করিয়াছে তাহার বন্দীদের সে বোধ করি বেশ ভাল শিক্ষাই দিয়াছে। "পলকের" কোন সংবাদ নাই।

৩রা অক্টোবর—

আজ সম্মুখ হইতে মান্দ্রাজ অশ্বারোহী দলের বরক্লে বড় সুখের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। পলক গত মাসের ১৬ই তারিখে কাবুল সহরে প্রবেশ করিয়াছে। অরো সুখবর সেক্সপীয়র লেডী স্কেল ও

অন্যান্য বন্দী দিগকে উদ্ধার করিয়া শিবিরে ফিরাইয়া আনিয়াছে। এই ঘটনাতেই এবারকার অভিযান সিদ্ধ হওয়া উচিত। কার্য্যসিদ্ধ, নগর প্রবেশ। আমার বোধহয় পলক নিতান্ত ভীরুতা প্রকাশ করিবে না। দেশের মতামত. না চাহিয়াই সে সহরে আগুন ধরাইয়া দিয়া সমভূমি করিয়া ময়দানে লবণ ছড়াইয়া দিবে। বিশেষতঃ রাজপ্রাসাদ আর রেসিডেন্সি এ ছুটিত ধ্বংস করা চাই-ই।

ব্যারণ ম্যাকেন্‌টাস প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা যাঁরা দেশের জন্য তাঁদের মহৎ জীবন দান করিয়াছেন - তাঁদের আত্মা জানিতে পারিবে যে তাঁদের স্বদেশীয় বীরেরা তাঁদের রক্ষা করিতে না পারিলেও জীবনের মূল্য গ্রহণ করিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যশ ও অভিজ্ঞতা অপরে লাভ করিতেছে! আমি কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শক বা নির্ব্বাক্ শ্রোতা! অসহ্য,—এ অসহ্য! যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকা সৈনিক জীবনের বিড়ম্বনা! অসির দ্বারা জয়ের ও যশের পথ মুক্ত হয়। দুই একটা ছোট খাট লড়াই (যুদ্ধ তাহাকে বলা যায় না) ছাড়া আমার ভাগ্যে কিছুই ঘটিল না। ভাগ্যের নিষ্ঠুর নির্ম্মমতা এ!

আজ একদল রসদদার কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছে। শীঘ্রই আর একদল আসিবে।

কলিকাতার ঘোড়দৌড়ে ক্লিওপেট্রায় অনেক টাকা বাজী রাখিয়াছি।

৪টা অক্টোবর—

এবার দেখিতেছি পাহাড়ীরা সত্য সত্যই একটা গোল বাধাইবে। সহজে মিটিবে না। তারাদা গিরিবর্ত্মে আফ্রিদিরা সব জোটজমায়েৎ হইতেছে। বদমাইস হতভাগা জুম্মনের বোধ হয় এ কাজ? আমি পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছিলাম ওকে একটা টেলিস্কোপ দিতে। দিলে হয় ত সে একাজ করিত না। বেটা একবার আমার হাতে পড়ে!

রসদদাররা কাল আবার আসিবে। তাহার পূর্ব্বে পাহাড়ীরা বোধ করি কোন গোল বাধাইবে না। কারণ ওরা যুদ্ধের লুটটাই বোঝে ভাল।

আমরা একটা চমৎকার মতলব বাহির করিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় যদি এটা হয় মজার জিনিষ হবে। ইলিয়টেরও মত আছে। আমরা চারিদিকে রাষ্ট্র করিব যে, আমরা রসদদারদের আগাইয়া যাচ্ছি। আমরা একটা পার্ব্বত্য রন্ধ্রমুখে গিয়া অবস্থান করিব। শুনিতেছি উহারাও নাকি ঐখান হইতেই আমাদের আক্রমণ করিবার মৎলব করিয়াছিল। আজ রাত্রেই আমরা যাত্রা করিব। দুইশত সৈন্যকে গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখা অনায়াসেই চলিতে পারিবে। আমরা দক্ষিণে যাইব শুনিয়া শত্রুপক্ষীয়েরা যখন দেখিবে খাবারের গাড়ী গুলো উত্তরমুখে চলিতেছে তখন বেশ সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া রসদ লুট করিতে যাইবে। মনে করিবে আমরা তখন বিশ মাইল দূরে রহিয়াছি। তাহার পর তাহারা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিবে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সৈন্যদের রসদ আটকান কেমন কৌতুকাবহ অভিনয়। এমন শিক্ষা তাহারা জীবনে আর পাইবে না। বাহির হইয়া পড়িবার জন্য আমারত প্রাণটা ছটফট করিতেছে।

ইলিয়ট তাহার কামানের গাড়ী দুই খানিকে ঠিক্ রসদের গাড়ীর মত সাজাইয়াছে। কারণ কামান সাজাইয়া খাবারের গাড়ী আসিলে স্বভাবতঃই লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইতে পারে। গোলন্দাজেরা ঐ গাড়ীর পশ্চাতের গাড়ীতেই থাকিবে—দরকার হইলেই কামান দাগিতে পারিবে।

আমাদের সিপাহী গুলাকে যাহা করিব না, তাহাই করিব বলিয়া জানাইয়াছি। তোমার যদি কোন সংবাদ দেশ মধ্যে প্রচার করিবার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে তোমার কোন বিশ্বাসী ভৃত্য বা দাসীর নিকট বিশ্বস্তভাবে চুপি চুপি প্রকাশ করিও এবং গোপন রাখিবার জন্য শপথ করাইয়া লইও ব্যস্)। রাত্রি ৮৷৫টা—।

৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা—

কি আনন্দ! কি আনন্দ! ইলিয়ট ও আমাকে লরেলের মুকুট পরাইয়া দাও। আমাদের ন্যায় দুষ্ট দমন কে?

এই মাত্র আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত রক্তে পরিচ্ছদ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। মুখ হাত ধুইবার বা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনেরও সময় নাই। আজিকার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ না করিয়া আমার মন শান্ত হইবে না। ইলিয়ট ফিরিয়া আসিলে ইহা হইতেই আমরা সরকারি রিপোর্ট তৈয়ারী করিব।

যথা সময়েই আমরা অধিত্যকার রন্ধ্র মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম। রসদদারদের মধ্যে তেমন বলবান সৈনিক একজনও ছিল না। পাহাড়ীরা যদি হঠাৎ আক্রমণ করিত কি রকম দাঁড়াইত বলা যায় না। এখন কিন্তু আমরা দুই দল মিলিত হওয়ায় ওদের গ্রাহ্যযোগ্য বলিয়াই মনে করি নাই। যুবা চেম্বারলেন সৈন্য চালনা করিতেছিলেন। তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলা হইল। ঠিক্ ভোর বেলা রসদদারদের বাহির করা গেল। অনেক খাবার রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া গোলন্দাজদের গাড়ীর ভিতর ঢুকান হইল। ভোরের ক্ষীণ আলোয় আমাদের ছোট দলটিকে খুব দুর্ব্বল বলিয়াই মনে হইতেছিল।

গাড়ীর ভিতরকার ক্যাম্বিসের পর্দার ছিদ্র দিয়া আমি পাহাড়ীদের বড় বড় পাগড়ীবাঁধা মাথার ছুটাছুটি লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমাদের তারাদা গিরিপথে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত তাহারা আক্রমণ করে নাই। রন্ধ্রপথের দুই দিকে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ; আমরা যদি প্রস্তুত হইয়া না আসিতাম আমাদের ভাগ্যে কি ঘটিত নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পর্ব্বতান্তরালে চমৎকার ভাবে আত্মগোপন করিয়া তাহারা আমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। চেম্বারলে·কে কহিলাম লোকজনের উপর নজর রাখ, হুঁসিয়ার। গাড়ীগুলা এই ভাবেই চলুক উহারা পাছু লইবে। অনুমান মিথ্যা হয় নাই! রসদদারদের সৈন্যেরা যখন অগ্রসর হইয়াছিল তাহারাও বিকট চীৎকারে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া পাহাড় হইতে পাহাড়ে বন্দুক হস্তে লাফাইয়া নামিতে আরম্ভ করিল। বিশ্রী আলখাল্লার মত পোষাক পরা, বিকট কালো মুখগুলা মিল্‌টন বর্ণিত সয়তানের অনুচরদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। যেদিকে চাও কেবল সেই পাগড়ীবাঁধা কালোমুণ্ডগুলা, তারা যেন বেড়াজালে আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল।

একটা বিকট উল্লাসব্যঞ্জক ধ্বনির সহিত তাহারা প্রথমেই শকট আক্রমণ করিল। পরক্ষণেই আমাদের রসদের গাড়ীর প্রত্যেক ছিদ্র দিয়া ঘোর গর্জ্জন সহিত শত শত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবৃষ্টি হইয়া গেল। পর্ব্বত গাত্রচ্যুত পার্ব্বত্য খরগোষের ন্যায় অসংখ্য হত ও আহত শত্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অবশিষ্টেরা ভয় পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের সেনাপতির আদেশে বিপুল বিক্রমে গাড়ীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বৃথা তাহাদের আশা! তাহাদের দলপতিরা নিহত হইবামাত্র ছত্রভঙ্গ পাহাড়ী সেনা পলাইতে আরম্ভ করিল। এই বার আমাদের পালা! আমাদের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল, নীল আকাশের বক্ষচ্যুত কালো কালো পক্ষীগুলির মত পর্ব্বত গাত্রচ্যুত পার্ব্বত্য পাখীগুলি উৎকৃষ্ট শিকারীর লক্ষ্যচ্যুত হইল না। আমাদের পদাতিক সৈন্যেরা পলাতকদের সঙ্গীনবিদ্ধ করিতেছিল। ঠিক যেন ছায়াবাজীর ছায়াচিত্রের মত মুহূর্ত্তে রঙ্গভূমির দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শত্রু এখন আমাদের করতল গত। সহজে তাহারা মুক্তি পায় আমার ইচ্ছা নহে। এমন শিক্ষা তাহাদের দিয়া দিব যাহাতে লালকোর্ত্তা দেখিলেই তাহারা সহস্র হাত দূরে থাকে। নির্ম্মম ভাবেই আমরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলাম। পলাতকের অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি, পথ আমাদের অপরিচিত, এমন সময় তারাদা গিরিপথের রন্ধ্রমুখে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম। রন্ধ্রের উভয় পার্শ্ব রক্ষার জন্য চেম্বারলেন ও ইলিয়টকে কতক সৈন্য সামন্তসহ দুই দিকে পাঠাইয়া অল্প সংখ্যক সৈন্য সমেত আমি রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিলাম। সাহস ও শক্তি মানবঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের সহায়। কিন্তু এই যে কেতাদুরস্ত আঁটসাঁট ছাঁটকাটওয়ালা সৈনিকের পরিচ্ছদ পর্ব্বতের উঁচু নীচু অসমতল স্থানে আরোহণে অনেক সময় বাধা দিতেছিল। (নোট —পর্ব্বতপথে খরগোষের মত উঠা নামার পক্ষে বিধর্ম্মীদের ঐ কুৎসিত আলখোল্লা গুলাই উপযোগী)। এ অবস্থায় তাহারা পলাইতে পারিত। কিন্তু ভাগ্য তাহাদের প্রতিকূল। আমরা যে পথ ধরিয়া ছুটিতে ছিলাম তাহারই বাঁদিক দিয়া আর একটা সরুপথ গিয়াছে, প্রায় পঞ্চাশজন পলাতক সেই পথে প্রবেশ করিল। পথপ্রদর্শকদের নিকট শুনিয়াছি এ পথে বাহির হইবার এই আমাদেরই সম্মুখ দিয়া ছাড়া অন্য পথ নাই; পথের শেষে অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা। ইঁদুর স্বেচ্ছায় গর্ত্তে ঢুকিয়াছে নির্গমের পথ রাখে নাই। তখন দিবালোক স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল তবু সে স্থানটা অন্ধকার। সূর্য্যরশ্মি সেখানে অবাধে প্রবেশ লাভে সক্ষম ছিল না। দুই ধারে উচ্চ শৃঙ্গ, কোথাও উন্নত কোথাও অবনত। সৈন্যদিগকে বন্দুক ঠিক করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলাম। পথের শেষ দেখা গেল, আর পথ নাই শিকারীতাড়িত পলাতক কুকুরগুলা সম্মুখে প্রস্তরখণ্ড জমা করিয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। ইহাদের বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ায় ফল কি? ছাড়িয়া দেওয়াও অসম্ভব। মৃত্যুই ইহাদের

উচিত প্রাপ্য। একটা প্রচলিত কথা আছে যে "ঋণের শেষ, ও শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।" খোলা তরোয়াল হাতে আমি আমার ক্ষুদ্র বাহিনীর সম্মুখ ভাগে বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইতে গেলাম, সহসা বাধা পড়িল। রঙ্গমঞ্চে এমন ঘটনা বিরল না হইলেও বাস্তবজীবনে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। পর্ব্বত গাত্রে যেখানে পলাতকেরা পাথরের স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারই নিকটে গুহা, প্রকৃতি হস্তনির্ম্মিত অতি ক্ষুদ্র আকৃতির গুহাটি দেখিলে মানববাসযোগ্য বলিয়া অনুমান হয় না। গুহামধ্য হইতে যেন যাদু মন্ত্রবলে এক অদ্ভুত দর্শন বৃদ্ধ বাহির হইয়া দাঁড়াইল, অতি বৃদ্ধ তাহার শ্মশ্রু ও কেশ শুক্লবর্ণ। জটাবদ্ধ কেশভার ভূপৃষ্ঠ চুম্বনে উদ্যত, শ্মশ্রুও জানু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে; বর্ণ মৃত্তিকার ন্যায়। মুখের এবং দেহের চর্ম্ম কঠিন অস্থির আবরণ মাত্র, দেখিলে মনে হয় জীবনীশক্তিও বুঝি সে দেহে থাকা সম্ভব নহে। কেবল সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণ চর্ম্মের অভ্যন্তরে কোটরগত দুই চক্ষু দুই খণ্ড অত্যুজ্জ্বল হীরকের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে ছিল। সেই অপূর্ব্ব অমানুষিক মূর্ত্তি গুহা হইতে বাহির হইয়া উভয় পক্ষের মধ্য স্থলে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া গম্ভীর আদেশের স্বরে কহিলেন "যাও!" কোন সম্রাট তাঁহার ক্রীতদাসকেও বোধ হয় এমন তুচ্ছ অবহেলার সহিত আদেশ করিতে পারিতেন না। আমাদের সমভাবে থাকিতে দেখিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় গম্ভীর বজ্রনাদের ন্যায় আবার কহিলেন "রক্ত পিপাসী মানবের দল এ স্থান সাধনার জন্য, ভগবানের আরাধনার জন্য; তাঁহারই সৃষ্ট তাঁহারি সন্তানদের রক্তপাতের জন্য নহে—যাও।" আদেশব্যঞ্জক স্বরের সহিত দক্ষিণ হস্ত আবার আমাদের চলিয়া যাইবার জন্য পথ দেখাইয়া দিল। অন্য সময় হইলে কি হইত বলা যায় না কিন্তু এখন এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজিতপ্রায় অবস্থায়—কর্ত্তব্য স্থির করিবার অবসর কোথায়? শত্রুদলের সাহস বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহারা ঐ বুড়াকে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে ছিল, আমাদের সেপাইরা ভীত হইয়াছিল। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় অদৃষ্ট চক্র ভিন্ন পথে ঘুরিয়া যাইবে, সাহসী সেনাপতি আমি, একি দুর্ব্বলতা! অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলাম "বৃদ্ধ নির্ব্বোধ! সরিয়া দাঁড়াও নতুবা নিশ্চয় মৃত্যু।" ইংরাজ গোলন্দাজদের লইয়া প্রবল বিক্রমে অগ্রসর হইলাম। বৃদ্ধ নিবৃত্ত হইল না, অগ্রসর হইয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া যেন প্রার্থনার মত কি একটা ভাষা উচ্চারণ করিল, কিন্তু তখন সে সব লক্ষ্য করিবার সময় নাই, আমারি কোষমুক্ত তীক্ষ্ণধার তরবারি বৃদ্ধের বক্ষে বিদ্ধ হইল। আমার পশ্চাৎ হইতে একজন ইংরাজসেনা তাহার বন্দুকের বাঁট দিয়া বৃদ্ধের মস্তকে আঘাত করিল। মুহূর্ত্তে তাহার মৃতদেহ আমারই পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বত্য দস্যুরা একটা ব্যাকুল বেদনাপূর্ণ আর্ত্তস্বরে দিকবিদিক পূর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর আর কোন বাধা নাই—মুহূর্ত্তে যুদ্ধ জয় হইয়া গেল। "হ্যানিবল" বা "সীজর" আমাদের চেয়ে কি বেশী করিয়াছিল!

এ যুদ্ধে আমাদের অল্পই ক্ষতি হইয়াছে, হত তিনজন আহতের সংখ্যা পনেরো। তাদের পতাকা আমরা কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম ছোট এক টুকরা সবুজ কাপড়ে দুইছত্র কোরাণের বয়েদ্ লেখা।

আমি কঠিন তবু কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না। যুদ্ধের পর বৃদ্ধের মৃতদেহের সন্ধান লইবার কথা প্রথমেই আমার মনে পড়িল। অনেক অনুসন্ধানেও দেহ পাওয়া গেল না। সত্যকথা বলিতে কি, বৃদ্ধকে হত্যা করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না—সে আমার পথের বাধা না হইলে এ কার্য্য আমা দ্বারা কখনই ঘটিত না। তাই কেমন একটা আত্মগ্লানি জাগিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্ত্তব্য করিয়াছি—কেন এ দুর্ব্বলতা!

আমাদের পথপ্রদর্শকেরা বলিল লোকটির নাম "গুলাবসিং—উনি একজন সন্ন্যাসী মহাত্মা ব্যক্তি, অহিংসাই ওঁর ধর্ম্ম। জীবে দয়া, জীবের কল্যাণই উঁহার প্রার্থনা। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান—আর ভগবানের সাধক পরম সিদ্ধ যোগী পুরুষ ইনি।—এ প্রদেশের সকলে তাঁকে ঈশ্বরের ন্যায় ভয় এবং ভক্তি করিত, তাই তাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে শত্রুগণ অমন হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল।" তাহারা আরও বলিল, তৈমুরলঙ্গ যখন এই পথে আসিয়াছিলেন তখন ঐ সন্ন্যাসী ঐ স্থানে অমনি ভাবেই উপাসনায় রত ছিলেন। আরও অনেক অদ্ভুত আজগুবি বর্ণনা তাহারা শুনাইল।

গুহাটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম—ওখানে দুই দিন থাকিতে হইলে আমি ত চরম শাস্তি মনে করি। উচ্চে চারিফুট, লম্বে ছয় হাত আন্দাজ;—স্যাঁতানে অন্ধকার, আসবাবের মধ্যে একখানি বহু পুরাতন জীর্ণ কাঠের তক্তাপোষ তাহার উপর কতকগুলি হরিদ্রাভ কাগজের বাণ্ডিল, হস্তাক্ষরে লেখা—কোন দুর্ব্বোধ্য ভাষা। দুইটি কাঠের বাসন এবং একখানি মৃগচর্ম্ম—আর কিছু না। যাক্—সে যেখানে গিয়াছে সেখানে গিয়া শিক্ষা করুক যে, হাজার উপবাস কঠোরতায় দেহ ক্ষয় করিলেও বিধর্ম্মীদের তরোয়ালের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা নাই।

—তবু আমি অন্তরের সহিত তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। শান্তিঃ।

ইলিয়ট আর চাম্বারলেন তারা আমাদের সঙ্গে মিলতেই পারলে না—আজকের জয়ের অংশীদার নাই—এ গৌরব—এ সম্মান আমার একারই প্রাপ্য—এর দরুণ গেজেটে অন্ততঃ নাম প্রকাশও হওয়া উচিত। পদোন্নতি—কে বলে তা হতে পারে না?—কি শুভাদৃষ্ট!

৬ই অক্টোবর বেলা ১১টা।

কাল রাত্রে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা কিছু অদ্ভুত রকমের। আমি জীবনে কখনও স্বপ্ন দেখি নাই—ঘটনাটি বাস্তবিক স্বপ্নও নহে—অপরে যদি এই ঘটনাটিই আমার কাছে প্রকাশ করিত, আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতাম না। সেই ঘণ্টার অপূর্ব্ব রুণুঝুণু শব্দ! আচ্ছা ঘটনাটা বলি। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ইলিয়ট আমার তাঁবুতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল। সে চলিয়া গেলে জমাদারকে লইয়া আমি একবার পাহারা ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য ছাউনীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম।

সবেমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছিল হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম দেশী পোষাক পরা একটি লোক আমার তাঁবুর দরজার ভিতর দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল; কেবল তার উজ্জ্বল চোখের কঠোর দৃষ্টি আমার মুখের উপরে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। লোকটা হয়ত ধর্ম্মোন্মত্ত গাজী বা আফগান,—আমায় হত্যা করিবার জন্য গুপ্ত ভাবে আসিয়াছে। কথাটা মনে হইবামাত্র উঠিবার চেষ্টা করিলাম। কি আশ্চর্য্য! উঠা ত পরের কথা, হাত পা নাড়িবার সাধ্যও আমার ছিল না;—যদি আমার বুকের উপর ছুরি নামিতে দেখি তথাপি বাধা দিবার ক্ষমতা নাই—এমনি অসহায় আমি। সাপের দৃষ্টিতে পাখী যেমন অচল ভাবে তারই পানে চাহিয়া থাকে তেমনি ভাবেই আমিও তার পানে চাহিয়া রহিলাম। আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ সতেজ—কিন্তু দেহটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অসাড় হইয়া গিয়াছে। সেই অদ্ভুত ব্যক্তির অদ্ভুত স্থির দৃষ্টি আমার উপরেই সমভাবে ন্যস্ত। অসহ্য—এ—অসহ্য। দেহ অক্ষম কিন্তু চেষ্টা করিতে কণ্ঠে স্বর বাহির হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কে সে? কি চায়, কেন এসেচে?" গম্ভীর স্বরে অত্যন্ত ধীর ভাবে লোকটা উত্তর দিলে, "লেফ্টেনাণ্ট হিথারষ্টণ,—যে কাজ তুমি আজ করেচ, জগতে তার তুল্য মহাপাতক আর নাই, মানুষে এমন কাজ কখনও করিতে পারে না। ভগবানের প্রিয় সন্তান, প্রগাঢ় বিশ্বপ্রেমিক, অসীম শাস্ত্রজ্ঞানী, নির্ব্বিরোধী, সংসারত্যাগী চীরধারী সন্ন্যাসী, পরমপূজ্য গুরুদেবকে বিনা অপরাধে তুমি হত্যা করিয়াছ। তোমার জীবনের সংখ্যা যত তদপেক্ষা বহুতর বৎসর তিনি এই নির্জ্জন গুহায় মহাযোগে সাধন পথে অবস্থিত ছিলেন। ভক্তি যখন তাঁকে মুক্তির দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, মোক্ষ যখন তাঁহার করতলের নিকটে, পাপিষ্ঠ সাধুহত্যাকারী তখন তুমি তাঁর মহাসাধনের বিঘ্নরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে হত্যা করেচ।

দীর্ঘ জীবন লাভ বিনা এ বিদ্যা এ জ্ঞান—ভগবৎ সাযুজ্য অসম্ভব! তাই পরমজ্ঞানী মহাত্মারা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর নিয়মিত পালনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে—যোগৈশ্বর্য্যলাভে আত্মাকে অমরাত্মায় পরিণত করিতে চাহেন। নতুবা দেহ রক্ষায় তাঁহাদের প্রয়োজনই বা কি? ঘট ভঙ্গ হইলে ঘট মধ্যস্থ আকাশ যেমন আকাশই থাকে তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলেও জ্ঞানীর আত্মা নষ্ট হয় না—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মেই যুক্ত থাকেন। কিন্তু আমরা যাহা হারালেম—এ জীবনে জীবনান্তে কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তরে—আর তাহা ফিরিয়া পাইব না। যে মহাপুরুষের রক্তে নিজের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছ তাহাতে ইহজীবনে তোমার মুক্তি নাই! মনে কর কি হিথারষ্টণ, এ অপরাধের ক্ষমা আছে? শাস্ত্রের আদেশ—ধর্ম্মদ্বেষী সাধু হত্যাকারীর তুষানলে প্রাণত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত। এ নিয়ম ধনী নির্ধন সবল দুর্ব্বল সকলকারই জন্য। রাজার সাধ্য নাই তোমায় রক্ষা করেন। তুমি দেবতার কোপে পতিত হইয়াছ। তুমি যোদ্ধা, সাধারণ মৃত্যু দণ্ড তোমার পক্ষে ঠিক নয়। তুমি হিন্দু নও—হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি অন্যায়াচরণ পাপ বলিয়া তোমার মনে হয়নি—

তাই পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যোদ্ধার ঈপ্সিত মৃত্যু লাভ না করাই তোমার দণ্ড স্থির হইয়াছে। আজ হইতে যত কালই তুমি জীবিত থাক এই ঘণ্টা প্রতিনিয়ত তোমাকে তোমার শাস্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। তোমার গর্ব্বান্ধ পাপিষ্ঠ ভৃত্যটা যে সন্ন্যাসীকে আহত দেখিয়াও প্রহার করিয়াছে সেও বুঝিবে যে এ জগতে বাহুবল ও পদগৌরব ছাড়া অন্য শক্তিও আছে। ৫ই অক্টোবর--তোমাদের মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের শেষদিন জানিও—আবার তোমার শেষ দিনে দেখা হইবে।"

কঠোর তীব্র ভৎসনার দৃষ্টিপাত করিয়া মূর্ত্তি বাহিরে মিলাইয়া গেল।—সহসা আমার জড়ত্ব ঘুচিল—আশ্চর্য্য আমি কি এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম! ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। যে শাস্ত্রি তখনও পাহারায় জাগিয়াছিল—সে কিছুই জানে না, সে বলিল "এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার পাহারার কালে তাঁবুর মধ্যে কেহ প্রবেশ করে নাই বাহিরেও যায় নাই"। তাহার মুখের ভাব ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছিল সে আমার প্রকৃতিস্থতায় সন্দিহান হইয়াছে। আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। না স্বপ্ন নহে সব সত্য—আমার মাথার উপর বাতাসে ঘণ্টার শব্দ স্মরণ করাইয়া দিল সব সত্য। আমার পরিচিত ভারতবর্ষের দেবমন্দিরের পূজারীরা পূজাকালে এইরূপ ঘণ্টার শব্দ করিয়া থাকেন আমি কতদিন শুনিয়াছি। উঠিয়া তাঁবুর ভিতর বাহির তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিছুই নাই কেহই নাই।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে সব ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল, কিন্তু আবার সেই রোমাঞ্চনকারী ঘণ্টা ধ্বনি!

সন্ধ্যা—

গোলন্দাজ স্মিথের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল—তাহার অবস্থাও ঠিক আমারই ন্যায়। সেও ঘণ্টার আওয়াজ শুনেছে। মাথায় আগুণ জ্বলচে। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন—"।

ডায়ারির সঙ্গে আর একখানি আলাদা কাগজ আঁটা ছিল লেখা দেখিয়া মনে হয় তাহা অল্পদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। লেখাটি এই—

"সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ অতিদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের প্রত্যেক দিন, প্রতিরাত্রি সেই নিষ্ঠুর ঘণ্টাধ্বনি তেমনি করিয়াই আমার বুকের উপর হাতুড়ীর ঘা মারিয়া মাথার উপর বজ্রের মত বাজিয়া আসিয়াছে। রক্তের তেজ কমিয়া গিয়াছে, শক্তি অপহৃত, দেহ জরাক্রান্ত; ভয় বাড়িয়াই চলিতেছে—ভয়—কী সে ভয়? আর সহ্য হয় না—অসহ্য—ওঃ ঈশ্বর আমার জ্ঞান আমার স্মৃতি লুপ্ত করিয়া দাও। আমার দেহমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে শব্দ মৃত্যুর ভেরীনিনাদের চেয়েও ভয়ানক তাহাও দিবানিশি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকি। বন্ধু নাই, লোকের সহিত মিশিবার সাহস নাই, কাহারও সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারি না—মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন আশা নাই। তবু আজিও আমি অহঙ্কারের সহিত বলিতে পারি আমি আত্মহত্যা করি নাই—ইচ্ছা করিলে আমার শক্তিশালী শাস্তিদাতাদের হাত আমি অনায়াসে ছড়াইয়া যাইতে পারিতাম তবু যাই নাই। আমার

বিশ্বাস—আমার উপরওয়ালা যেখানে আমায় দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন—তাঁহার আদেশ ব্যতীত সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার অধিকার আমার নাই। মৃত্যুকে আমি আহ্বান করেছি। শিখ যুদ্ধে সিপাহী যুদ্ধে অকুতোভয়ে তার সাম্‌নে বুক পেতে দিয়েছি সে আমায় প্রত্যাখ্যান করেচে, আমার চোখের উপর বুকভরা আশা ভালবাসা নিয়ে —যুবকেরা চলে গেছে। বৃদ্ধ আমি—আমার জীবন অটুট—কেবল উপাধি আর মান্য! হায় মান্য—হায় ভাগ্য!

অনেক দুঃখের মধ্যে আমার একমাত্র সুখ—অভাগিনী স্ত্রী ক্লারা! বিবাহের পূর্ব্বে সকল কথাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছি —জানিয়া শুনিয়াও এই অভিশপ্ত হতভাগ্য সৈনিকের পত্নী হইতে স্বেচ্ছায় তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার দুঃখের ভার স্কন্ধে বহিয়া হাসি মুখে নিজেকে ক্ষয় করিয়া আমার দুঃখের জীবনে যথাসাধ্য শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছেন। সুশীল পুত্রকন্যা দুটিও তাহাদের সমস্ত হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা দিয়া আমাকে সুখী করিয়াছে।"

ডায়ারি পাঠ শেষ হইয়া গেল। মরডণ্ট ও এসথার গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল তাহাদের দুইজনের চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। পাণ্ডুর আকাশে নক্ষত্রগুলা নিবিবার যোগাড় করিতেছিল। ক্লোক ও টুপি তুলিয়া লইয়া মরডণ্ট ও আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। এসথার নতজানু হইয়া যুক্ত করে উপাসনা করিতে লাগিল।

সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিয়াই চলিতেছিলাম—প্রত্যেক ঝোপঝাপ জঙ্গল গর্ত্ত দেখিতেছিলাম। প্রতি পদক্ষেপে আশার সহিত আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছিল কি দেখিব—যদি সন্ধান মিলে—কি মিলিবে? ফুলারটনকে উঠাইয়া তাহার কুকুরটাকে সঙ্গে লইলাম—সেও স্বেচ্ছায় সঙ্গী হইল।

কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও কোন ফল পাওয়া গেল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রায় তিন বৎসর পরে—"ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া" নামক ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রের একটি সংবাদে আমায় আকৃষ্ট করিল। সংবাদ স্তম্ভে "লালহুমি, শনৎসুন ও অর্হৎ নামক তিনজন পরিব্রাজক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—যে তাঁহারা সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ডেনাক জাহাজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত একজন ইংরাজ সন্ন্যাসীও আসিয়াছেন। প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্যের শিক্ষারও যথেষ্ট আছে।" সংবাদটি সম্ভবতঃ অপর কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, মরডণ্ট ও আমার স্ত্রীর কাছে এ সংবাদ গোপনই রাখিয়াছিলাম। বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদককে পত্র লিখিয়া জানিলাম, সংবাদদাতার কোন খবর তিনি জানেন না। প্রাপ্ত সংবাদ ছাপা হইয়াছে এই পর্য্যন্ত।

একদিন পাগলাগারদ দেখিতে গিয়া রুফাসের সহিত আশ্চর্য্যভাবে সাক্ষাৎ হইল। সে পাগল হইয়া গিয়াছিল, কোন কথাই বলিতে পারিল না। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন,

তাহাকে পাগল দেখিয়া পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। তবে আমরা কি ভাবিয়া লইব ঐ তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত যে ইংরাজ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে গিয়াছেন তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত মেজর জেনারল হিথারষ্টন। বাবা কহিলেন," গুরু হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁরা 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—কিন্তু অহিংসক ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে জীবনে মৃত্যুদণ্ড দিয়া ঐ শরীরেই পুনর্জ্জন্ম প্রদান করিয়াছেন। এবং সম্ভবতঃ হিথারষ্টণ যে মহান্ শক্তি দেখিয়াছেন জগতের নশ্বরতাময় ভোগৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া সেই শক্তির সাধনার জন্য উঁহাদেরই আশ্রয় লইয়াছেন।" কথাটা এবার আর মরডণ্ট, গেব্রিয়েলকে লুকাইতে পারিলাম না। হায়! যদি মিসেস হিথারষ্টন শুনিয়া যাইতেন। তিনি স্বামীর চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য দৈব শক্তির সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু আমি ফদারজিল ওয়েষ্ট নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে বিজ্ঞান এখানে ভ্রান্ত। বিজ্ঞান কি? কতকগুলি বৈজ্ঞানিকের মতের সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু কি? ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে অনেক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে বিজ্ঞান অন্যায়রূপে কালক্ষেপ করিয়াছেন। যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্বন্ধে, বিজ্ঞান বিশ বৎসরকাল অবিশ্বাসে হাসি তামাসা করিয়া আসিয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান প্রমাণ দিয়াছে, লোহার জাহাজ জলে ভাসিতে পারে না, বিজ্ঞান ইহাও প্রচার করিয়াছিল যে বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে আটল্যাণ্টিক মহাসাগর পার হওয়া অসম্ভব! বিজ্ঞানবিদেরা যদি নিজেদের ভ্রান্ত মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া না রাখিয়া জানিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, প্রাচ্য জগতের অক্ষয় ভাণ্ডারে বুধমণ্ডলীর জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইবার কত বিচিত্র উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে। দার্শনিক শ্রেষ্ঠ এমার্সন বলিয়াছেন "ইয়োরোপ উচ্চতর ধর্ম্মভাবের জন্য চিরদিনই প্রাচ্য প্রতিভার নিকট ঋণী"। প্রাচ্য জগতে এখনও এমন সব দার্শনিক ও মহাপণ্ডিত আছেন—যাঁহাদের জ্ঞানের, শক্তির, ধর্ম্মের নিকটে দাঁড়াইবার যোগ্য হইতে আমাদের হাজার হাজার বৎসর সাধনার আবশ্যক। (সমাপ্ত)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

অভিজ্ঞান

জানি আমি, জানি আমি, কহিও না কিছু,
বিশ্বের হৃদয়-লগ্ন আমার হৃদয়!
যা' কিছু দুর্লভ ব্যথা বাজে তব বুকে
সকলি পলকে আমি করি বিনিময়,
সর্ব্বস্ব প্রতিভূ দিয়া। তা' তুমি জান না!
অনন্ত হৃদয়ে মোর ঘিরেছি তোমারে
সুগোপনে সঙ্গোপনে; আনন্দ-পুলক
ফুটে যাহা তব বুকে দীর্ণ শতধারে
সহস্র রোমাঞ্চ মুখে উঠে শিহরিয়া
আমার হৃদয়পদ্ম পলে কাঁপাইয়া!
বলিও না কিছু আর! আমি অন্তর্য্যামী;
আছি দেবালয়ে তব দিবস যামিনী!
মোর পূজাবেদীমূলে তুমি চিরন্তন,
রহিয়াছ সুকুমার স্বর্ণপদ্ম সম!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

বসন্ত-ঋতু

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

আত্মা ও মন সম্বন্ধে শারীরবিধান শাস্ত্রের মত

গীতায় একটী শ্লোক আছে :—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি যে বুদ্ধে পরতস্তু সঃ ॥ ৪২।৩।

দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিরও পরে যিনি সেই আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান যুগেব শারীরবিধান বিদ্যার সাহায্যে এই শ্লোকটী সুন্দররূপে বুঝা যায়।

মানব ও অন্যান্য সকল জীবই এক একটী ক্ষুদ্র কোষরূপে জীবন আরম্ভ করে। সেই আদি কোষটী মাতৃদেহজাত একটী কোষ (cell) ও পিতৃদেহজাত একটী কোষ এই দুইটীতে মিলিয়া সংগঠিত হয়। এই আদি কোষটী জীবদেহ সংগঠন কালে বিভক্ত হইয়া দুইটীতে পরিণত হয় এবং সে দুইটী আকারে বাড়িয়া পুনরায় বিভক্ত হইয়া চারিটীতে পরিণত হয়। এইরূপে উহা সংখ্যায় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সেই সকল কোষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজাইয়া শরীরের অবয়বসমূহকে গঠন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ এবং বুদ্ধি ও মনের যন্ত্র মস্তিষ্ক নির্ম্মিত হয়।

যে আদি কোষ (embryonic cell) হইতে মানবদেহ নির্ম্মিত হয় তাহাতে মস্তিষ্ক নাই, ইন্দ্রিয়গণ নাই কাজেই উহার মন বা বুদ্ধি নাই বলিতে হইবে। অতএব মন ও বুদ্ধি আত্মা নহে। ঐ কোষের অভ্যন্তরে এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে উহা তৎপ্রভাবে নিজের মন ও বুদ্ধির যন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যে আদি কোষ হইতে মানব নিৰ্ম্মিত হয় এবং যাহা হইতে কুকুর জন্মে তাহাদের উভয়কেই দেখিতে ঠিক একরূপ অথচ উহাদের একটী হইতে মানুষ হয় ও অপরটী হইতে কুকুর জন্মে। এই যে এক নির্দ্দেশক শক্তি যাহা ঐ ভ্রূণের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া উহার কোষগুলির বিভাগ ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিজের উপযোগী হস্ত, পদ, দেহ, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় গঠন করিয়া লয় সেই দুজ্ঞের্য় শক্তিই কি উপনিষদের "আত্মা" ?

মস্তিষ্ক যে মন ও বুদ্ধির যন্ত্র শারীর-বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা ভূরি ভূরি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে। মস্তিষ্কের (Brain) অংশবিশেষকে উৎপাটিত করিলে খুব সহৃদয় ব্যক্তিকেও দয়াহীনে পরিণত করা যায়। কিম্বা মস্তিষ্কের উপর ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা স্বভাবের যৎপরোনাস্তি পরিবর্ত্তন করা যায়।

মস্তিষ্কের কোন কোনও স্থানকে অনুভূতির স্থান (Senory) ও কোন কোন স্থানকে বুদ্ধির স্থান (Psychic) নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন মাথার পশ্চাৎদিকে অবস্থিত দৃষ্টির অনুভূতির স্থান (Visuo Sensory area) ও উহার চারি পাশে কিয়দ্দূর ধরিয়া দৃষ্টিজনিত বুদ্ধির স্থান (Visuo Psychic area)।

বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও স্পষ্টীভূত হইবে। একজন ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন সময় তাহার ঘরে তাহার ছেলেটী প্রবেশ করিয়া তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিল। সে অন্যমনস্ক'কাজেই ছেলের আগমন ও তাহার কথা শুনিতে পাইল না। এখানে 'বিষয়' (শব্দ ও মূর্ত্তি) এবং চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়, উভয়ই বিদ্যমান তত্রাচ সে ব্যক্তির মনে কিছুই অনুভূত হইল না।

একটু ডাকাডাকির পরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল একটী শব্দ ও একটী মূর্ত্তি নিকটেই আছে। ইহা মনের দ্বারা অনুভূতি,—অর্থাৎ Visuo sensory এবং auditory sensory areaর কার্য্য।

তারপর তাহার একটু বেশী মনোযোগ পড়িল, তখন মনে হইল এ মূর্ত্তি ও শব্দ তাহার জানা—তাহারই পুত্রের মূর্ত্তি ও তাহারই কণ্ঠস্বর। ইহা বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ Visuo psychic এবং auditory psychic areaর কার্য্য।

অতএব বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য বুঝা গেল।

কিন্তু এই তিনেরই অন্তরালে আর এক শক্তি কার্য্য করিতেছে—যাহা ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে মনকে মনের কার্য্যে এবং বুদ্ধিকে বুদ্ধির কার্য্যে প্রযুক্ত করিতেছে।*

এই শক্তি কে?

ইনিই আত্মা!

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মোগল শাসনাধীনে ভারতের আর্থিক অবস্থা

(De la mazeliereর ফরাসী হইতে)

মোগল-সম্রাট ও আমীর-ওম্‌রাওদিগের শাসনাধীনে ভারতের জনসাধারণ দাসত্ব দশায় উপনীত হইয়াছিল। এই পরিণামের চারিটি কারণ:—রাজাদিগের চিরপ্রচলিত অনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রণালী, সামন্ততন্ত্র, বিধর্ম্মীদিগের সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে এই যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের আদেশ, এই আদেশ অনুসারে মুসলমানদিগের প্রতিশোধমূলক দিগ্‌বিজয়, এবং সমস্ত ভূমি রাজসরকারের নিজস্ব—এইরূপ প্রতীতি। শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান। Bernier বলেন, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইলেও কোন সৈনিক ধান্য বা ফলাদি অপহরণ করিতে সাহস করে না; ভূমির সমস্ত ফসল সম্রাটের নিজস্ব। Tavernier অনেকবার এই কথা বলিয়াছেন যে, আমীরদিগকে যে জায়গীর

---

* কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ পততি প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেব যুনক্তি।

প্রদত্ত হয়, মোগল সম্রাটই তার ভূস্বামী; সম্রাট্ ইচ্ছা করিলে, জায়গীর হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন। তাহাদের মৃত্যুর পর জায়গীর আবার সরকারেই ফিরিয়া যায়।

সম্রাট্ই ভূমির অধিস্বামী, ভূমির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। তবে ভূমির উপস্বত্বভোগসম্বন্ধে ভেদনির্দ্দেশ করা আবশ্যক। জায়গীর ভূমির উপস্বত্ব মনসবদার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিত। কৃষক জমীর মজুর মাত্র; ইচ্ছা করিলে জায়গীরদার তাহাকে দিয়া বেগার খাটাইতে পারে, তাহার নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করিতে পারে। সম্রাটের খাস-মহলে সম্রাট্ই ভূমীর উপস্বত্বভোগী। ইহার কৃষকেরা রাজ সরকারের খাস কৃষী। এই জন্য বহু কাল পর্য্যন্ত অন্য কৃষি-মজুর অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা একটু ভাল ছিল। ভূমিজাত ফসলের এক তৃতীয়াংশ সরকারকে ছাড়িয়া দিতে হইবে এই নিয়মে আক্‌বর খাস-মহলের কৃষকদিগকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ভূমির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু খাস মহলের আয়তন শীঘ্রই হ্রাস হইল। ক্রমাগত নূতন নূতন মন্‌সবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং রাজকোষের অবস্থা এরূপ খারাপ হইয়াছিল যে, রাজকর্ম্মচারিদিগকে নগদ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভূমি না দিলে চলিত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলার অবস্থায়, রাজসরকার সাক্ষাৎভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে বিরত হইয়াছিলেন, জমিদারের দ্বারা আদায় করিতেন। জমিদারের অবস্থা মনসবদার হইতে অল্পই তফাৎ ছিল।

খাস মহলের কৃষকেরা, আবার আমীরদিগের কৃষক হইল। ভূমির কর্ষণ ও উপস্বত্ব ভোগসম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমীরদিগের অনুগ্রহাধীন হইল।

নগরের লোকেরাও এই গোলামী হইতে রেহাই পায় নাই। কৃষকদিগের ন্যায় কারিগরেরা বিধিমত একজন প্রভুর অধীন না হইলেও, উহারা দায়ে পড়িয়া আমীরদিগের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হওয়ায়, এই কারিগরেরা, সম্রাট ও আমীর-ওমরাও ছাড়া অন্য কোন খরিদ্দার পাইত না। ভাল করিয়া কাজ আদায় করিবার জন্য, সম্রাট ও আমীরগণ ইহাদিগকে বেতন দিয়া কাজে নিযুক্ত করিতেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমীরদিগের কারখানায় এবং অধিকাংশ কারিগরই সম্রাটের কারখানায় কাজ করিত। আইনতঃ না হউক কার্য্যতঃ উহারা একপ্রকার গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল।

এক এক সম্রাটের বিভিন্ন শাসনপ্রণালী অনুসারে প্রজাপুঞ্জের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইত। প্রতিভাবান স্বেচ্ছাতন্ত্রী আক্‌বর বেশ বুঝিয়াছিলেন, প্রজাদিগের মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিস্তার করাই বিদ্রোহভাব প্রশমনের একমাত্র উপায়। প্রজাবৃন্দ দরিদ্র হইয়া পড়িলে বহুব্যয়সাধ্য রাজ-দরবারের কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব।

আইন ই-আকবরি রাজকর্ম্মচারিদিগকে মিতচারিতা, দূরদৃষ্টি ও সাধুতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন :—

"রাজপ্রতিনিধি, কৃষিকর্ম্মের পুষ্টি বিধান করিতে সচেষ্ট হইবেন, দেশের দুরবস্থা প্রশমন করিয়া প্রজাবৃন্দের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে

যত্নবান হইবেন। জলের চৌবাচ্চা, কূপ, খাল, উদ্যান, সরাই এবং অন্যান্য পুণ্য কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন কীর্ত্তি-মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া তিনি যেন ভাবী কালকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলেন।" (১)

তখনকার অবস্থাও আকৃবরের প্রতিভার অনুকূল ছিল; বহু শতাব্দীর পর, সেই সর্ব্বপ্রথম পঞ্জাব ও হিন্দুস্থান শান্তিসম্ভোগ করে।

সেই সময় দেশ উন্নতির পথে চলিয়াছিল, দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দুঃখদুর্দ্দশা ও বিপ্লব-যুগের পরেই নিয়ত এইরূপই ঘটিয়া থাকে। অবশ্য, আইন্-ই আকৃবরীতে যে বেতনের হার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত নিম্ন। মজুরের সমস্ত দিনের সর্ব্বোচ্চ মজুরী ছিল ৫ হইতে ৭ "দাম"। দাম—এক টাকায় সিকি অংশ; এবং টাকার মূল্য ছিল ২ ফ্রাঙ্ক ৬০ সেন্‌টিম্। কিন্তু সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মূল্যও খুব কম ছিল। ১২ দামে এক মণ শস্য পাওয়া যাইত। এক মণ চাউলেরর মূল্য ছিল ২০ হইতে ১১০ দাম ইত্যাদি; আর মণের ওজন ইংরাজি ২৫ পৌণ্ডের সমতুল্য।

আকৃবরের উত্তরাধিকারিগণ আকৃবরের ন্যায় দূরদর্শী ছিলেন না। জেহাঙ্গীর ও শাজাহান এসিয়া-সুলভ প্রকৃত স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। শাজেহান লক্ষলক্ষ হিন্দু মজুরকে বেগার খাটাইয়া তাজমহল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে কোন বেতন দিতেন না; এবং তাহারা এত কম খাইতে পাইত যে যথেষ্ট আহারাভাবে তাহাদের অধিকাংশ, পীড়ায় কিংবা দুঃখকষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহাদের স্থান অন্যেরা অধিকার করিত, আবার তাহারাও এই একই দশা প্রাপ্ত হইত। শাজেহান দুই-বার দিল্লির অধিবাসী-দিগকে জাহানাবাদে বাস স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। এই প্রত্যেকবারের যাত্রায় শতসহস্র লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

অওরংজেব হিন্দুদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন অনুমোদন করিতেন। তিনি হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজদরবারের বিলাসিতা-নিবন্ধন রাজকরের অঙ্ক ২০ কোটীতে উঠিয়াছিল অথচ সাম্রাজ্যের লোক সংখ্যা অধিক ছিল না, (ভ্রমণকারীদিগের বর্ণনা অনুসারে, প্রদেশ-গুলিতে বেশি লোকের বসতি ছিল না) এবং আকবরের পর, বেতনের হারও বর্দ্ধিত হয় নাই। তাই তত্রত্যয়ুরোপায়েরা, জনসাধারণের দুরবস্থা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মাটির কুটীরবিশিষ্ট ও খোড়ো ঘর-সমন্বিত নগর, তদপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট গ্রাম – এই নগর ও গ্রামগুলি তাঁহারা ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি স্থগিদ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রেরা ধনাভাবে অবসন্ন; প্রতি বৎসর শরৎকালে সমস্ত লোক দুর্ভিক্ষ মহামারীতে উৎসন্ন যাইতেছে। রক্ষি-

---

(১) আইন-ই-আকবরী;—ভারতের বড় বড় পূর্ত্তকর্ম্মগুলি খিলিজি ও মোগল রাজবংশ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু চীন দেশে মোগলেরা যে সকল পূর্ত্ত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার সহিত উহার তুলনা হয় না। বহু সংখ্যক খাল ছিল; যে খালের দ্বারা কাসিমবাজারের সহিত গঙ্গার যোগ হইয়াছিল, বাণিজ্যের হিসাবে উহা সর্ব্বপ্রধান (৩৪ লীগ)।

সৈনিকেরা শুধু একবেলা প্রাতে আহার করিতে পায়; শুষ্ক ময়দার ছোট ছোট গোলাকার পিণ্ড—উহারা জল ও গুড় মাখিয়া তাহাই আহার করে। কখন কখন সায়াহ্নে একটু লবণ ও শাক-সব্‌জির সহিত ভাত রাঁধিয়া খায়। ধনাঢ্যেরা মাটির মধ্যে ধনরত্ন পুঁতিয়া রাখিয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করে। তাহাদের সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে শাসনকর্ত্তা ও আমীরেরা তাহাদের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। সম্রাটের কারখানার বাহিরে, সমস্ত শ্রমশিল্প অবনতি-গ্রস্ত; আমীরেরা যৎসামান্য মূল্য প্রদান করে; এবং দোকানদারেরা বেশী মূল্য দাবী করিলে তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বত্রই শোচনীয় অজ্ঞতা। প্রায় কেহই লেখাপড়া জানে না, গণনা করিতে পারে না, নিজ নিজ ব্যবসায় সম্বন্ধেও শিক্ষা পায় না; সর্ব্বত্রই সৈনিকদিগের উৎপীড়ন, রাজকরের আতিশয্য। যে সকল রাজ-কর্ম্মচারী শাসনবিভাগের পদ মূল্য দিয়া ক্রয় করে এবং যে সকল জমিদার রাজস্বের ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয় তাহাদের বিষম অর্থ-গৃধ্নতা। উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়া যায়; এবং তৎক্ষণাৎ আফগান ও মোগলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সৈন্যবিভাগ বা শাসনবিভাগে প্রবেশ করে, অথবা অলসভাবে কষ্টের সহিত জীবন যাপন করে, এবং তাহাদের পূর্ব্বতন স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করে। অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। Tavernier ৮ হাজার ফকির ও ১২ লক্ষ যোগীর উল্লেখ করেন। (২)

আওরংজেবের শাসনতন্ত্র যতই বিরক্তিকর হউক না কেন, তাঁহার শাসনতন্ত্রের অন্ততঃ এই একটা সুবিধা ছিল যে, তিনি উত্তর ভারতের শান্তিরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও আমীরেরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মানিত ও ভয় করিত। ইঁহার মৃত্যুর পর অরাজকতা, গৃহ-বিবাদ ও সর্ব্ব-প্রকার অন্যায্য কর আদায় আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানে, ভারত যার-পর-নাই দারিদ্র্য দশায় উপনীত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীহার

ঊষার নীহার সম আছিল সে মোর বুকে
এ হিয়া-কমল-ফুল্ল কম্পিত উল্লাস-সুখে।
ব্যাকুলিয়া যত তারে রাখিবারে গেনু ধরি,
মুকুতার মত হায় গড়ায়ে পড়িল ঝরি॥

শ্রীলীলা দেবী

---

(২) আধুনিক ভারতীয় লেখকগণ এইরূপ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, মোগলদিগের শাসনাধীনে লোকের অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহারা ইহাই দেখাইতে চান যে, ইংরাজের ভারত জয়ের সময় হইতেই ভারতের দারিদ্র্য সুরু হইয়াছে। আমি পরিশিষ্টে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিব।

শান্তি

আমার পয়সা কড়ির অভাব ছিল না। কিন্তু বুদ্ধির দোষে সে সবই হারাইলাম—টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সব গেল। আমি এখন একেবারে নিঃস্ব।

এখানে থাকিয়া আর ফল কি! শুধু বিড়ম্বনা বই ত নয়! একদিন নিশাশেষে বাহির হইলাম; ঠিক করিলাম, সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া দেখি, কোথাও শান্তি পাই কি না।

অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিলাম। কিন্তু শান্তি কৈ? যাহার সন্ধানে জীবনপাত করিতেছি, সে কোথায়?

তখন শীতকাল; বরফ পড়িতেছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড; পত্রহীন গাছগুলা হি হি করিয়া কাঁপিতেছিল। চারিদিকে তুষার, সমস্ত শুভ্র! আমারও শীত করিতেছিল।

তবু ভাল! দূরে আলো দেখা যাইতেছে। আলো লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম।

সম্মুখে একটা মস্ত বাড়ী। দরজার কাছে একটী ছোট ছেলে খেলা করিতেছে।

"আমি আজ এখানে থাকব, ভাই?"

বালক বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিল—বোধ হয় ভয় পাইয়াছিল। কহিল, "আমি ত জানি না; ঐ ঘরে দাদা পড়্‌চে, তাকে জিজ্ঞেস কর।"

ঘরে ঢুকিলাম—টেবিলের উপর বাতি জ্বালাইয়া এক যুবক পাঠে নিবিষ্ট।

"মশায়——" যুবক ফিরিল।

"আজ অনুগ্রহ করে যদি আমাকে—"

"সে কথা বাবাকে বলুন গে। তিনি বারান্দায় বসে আছেন—এই দিকে" বারন্দায় গেলাম। দীর্ঘশ্মশ্রু এক বৃদ্ধ বসিয়া তামাক টানিতেছে।

"কি চান?"

"আজ রাত্তিরের মত——"

"ঐ ঘরে বাবা আছেন; তাঁকে বলুন, তিনিই এ বাড়ির কর্ত্তা"

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, দূরে খাটের উপর এক অতি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ শয়ন করিয়া আছে; সে জীবিত কি মৃত তাহা ঠিক করিবার উপায় নাই।

"মশায়"?

অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর আসিল, "আজ্ঞে"?

"আমি আজ এখানে——"

"সে কথা আমাকে বলচেন কেন? বাড়ির কর্ত্তা বাবা; তাঁকে বলুন। তিনি ঐ ঘরে রয়েচেন।"

পাশের ঘরে গেলাম। শিকেয় টাঙানো একটা দোলনার উপর এক অতি বৃদ্ধ শুইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীর নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে; শরীরের চর্ম্ম লোল; নাড়া দিলে হাড় কখানা খুলিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

"মশায়, আমাকে আজ—"

বৃদ্ধ অনেক কষ্টে অঙ্গুলি সঙ্কেতে পাশের ঘর দেখাইল।

পাশের ঘরে আরো বৃদ্ধ কাহাকেও দেখিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু কৈ? বৃদ্ধ কৈ? ঘরে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া এক কৃষ্ণবসনাবৃতা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী! রূপের আলোয় ঘর উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। কালো কাপড়ে তাহাকে আরো চমৎকার দেখাইতেছিল! তাহাকে যে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যে মুখ এতক্ষণ মুখর ছিল, তাহা যেন একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম—মুখে কথা ফুটিল না। আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া যুবতী কহিল,

"কি চাই তোমার?"

কি মধুর সে স্বর! স্বর্গের বীণাধ্বনিও বুঝি এত মধুর নহে! প্রাণ শান্ত হইল; বহুদিন-সঞ্চিত বেদনা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়া গেল।

"ভয় পাচ্চ? তোমার কি চাই বল! আমিই সমস্ত দিই। আমার নাম মৃত্যু"।

কি চাহিব! মনের মধ্যে লক্ষ বাসনা জাগিয়া উঠিল। শেষে ভাবিলাম, যে সমস্ত দেয় তাহাকেই যদি আমি চাই, তাহা হইলেই ত আমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়! সাহস করিয়া কহিলাম,

"আমি তোমাকে চাই"।

"বেশ, নাও আমাকে"।

যুবতী সরিয়া আসিল! তাহার শীতল ওষ্ঠ আসিয়া আমার ললাটে লাগিল!

আঃ, কি শান্তি!*

শ্রীরত্নাবলী দেবী

বসন্ত-পঞ্চমী

বসন্তের বাতাসের দুরন্ত সোহাগে
লতার কুন্তলে জটা রচিবার আগে
মোহন চিকণ শোভা তুমি একবার
দেখে যাও প্রিয়তম বাসনা আমার!

বসন্তের বনলক্ষ্মী দিয়াছে বিছায়ে
অরুণ চুনারি তার অশোকের গায়ে;
মলয় দক্ষিণ হও, এস আজ ধীরে
লাজ বাস দোঁহাকার দিয়োনাক ছিঁড়ে!

আজি বন্ধু বসন্তের আসন্ন প্রভাত,
জীর্ণ পর্ণ অসহায় সহসা ঝরিয়া হায়
পাণ্ডুর করিয়া ছায় গোমুখী প্রপাত!
জানি গেল চিরতরে তবু কোন মোহভরে,
হেরি সবে রত্নাকরে চলে সাথে সাথ।

নব বসন্তের নিশি আছে কুয়াশায় মিশি
চন্দ্রালোক বাষ্পশুভ্র ছায়া সম ভাসে
ফুল্লমে মালতী লতা কে জানিত সে বারতা
গন্ধ যদি না আসিত চঞ্চল বাতাসে!

নীল আকাশের গায়ে ফোটে শত শত
স্বর্ণতনু পুষ্পের কাহিনী,
শ্যাম বন ভূমে পিক গায় অবিরত
জগতের সাহানা রাগিনী!
আনন্দের নাহি ওর, বসন্ত ভুবনে
বাসরের আজি আয়োজন,
দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রসন্ন পবনে,
লাজ বর্ষে' বনলক্ষ্মীগণ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* পিটার ক্রিষ্টেন্ অ্যাস ব্যোর্ণসের লিখিত গল্পের অনুবাদ। ইনি নরওয়ের একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ও গল্পলেখক।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা

প্রাচীনত্বের অধিকার-সূত্রে যে নাটকটি ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের শীর্ষস্থানে সচরাচর স্থাপিত হইয়া থাকে, সেই শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকাকে আমরা এ পর্য্যন্ত এক পাশে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম। অন্ততঃ য়ুরোপের ইহাই সাধারণ মত যে, শূদ্রক কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শকুন্তলার পূর্ব্বে মৃচ্ছকটিকা রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই অন্ধসংস্কারের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। যাঁহারা ভারতীয় নাট্য ইতিহাসের ক্রমবিকাশ অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বিনা-বিচারে গৃহীত এই মতটি তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। যে প্রস্তাবনায় এই নাটকটি শূদ্রের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, সেই প্রস্তাবনার কথায় বড় একটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, কেননা উহার রচয়িতা-কবির মৃত্যু উহাতে বর্ণিত হইয়াছে :—"পশিলেন হুতাশনে, শত বর্ষ দশ দিন করিয়া যাপন।" এই রীতি-বিরুদ্ধতা ভাষ্যকারদিগকে পরাঙ্মুখ করা দূরে থাকুক বরং উহাতে তাঁহারা আরও আকৃষ্ট হইলেন। কেননা, এই উপলক্ষে তাঁহারা অতিসূক্ষ্ম আলোচনার পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। লালা দীক্ষিত অতি গম্ভীর ভাবে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সূত্রধার যে শ্লোকটি পাঠ করিয়াছেন তাহাতে শূদ্রক আত্মসম্বন্ধে অতীত কালের প্রয়োগ করিয়াছেন; নিজ জন্ম-পত্রিকা দেখিয়া তিনি তাঁহার মৃত্যুর দিন ঠিক জানিয়াছিলেন; এবং তিনি ভাবী বংশীয় লোকদিগের নিকট তাঁহার মৃত্যু পূর্ব্বাহ্নেই বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। মহেশ ন্যায়রত্নের ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত যিনি য়ুরোপীদিগের আধুনিক আলোচনাদি অবগত আছেন তিনিও সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সমক্ষে এই ব্যাখ্যার পোষকতা করিয়াছেন। (Proceedings August 1887); যাহা হউক, প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে তিনি আর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজা শূদ্রকের যে অগ্নিপ্রবেশের কথা আছে তাহা একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপার সে অনুষ্ঠানের নাম, "অগ্নি সমারোপণ।" সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার সময় এই অনুষ্ঠান করিতে হইত। কিন্তু এই উভয়বিধ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া, এই সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিবার অধিকার পাশ্চাত্য সমালোচকের আছে। M. Windisch যিনি মৃচ্ছকটিকার প্রাচীনত্ব মানিয়া লইয়াছেন, তিনি কিন্তু শূদ্রকের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি বাক্যগুলি একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। M. Windisch বলেন, "নাটকের বর্ণিত বিবরণ হইতেই, গ্রন্থকার সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করা হইয়াছে।"

সাহিত্যের ইতিহাসে শূদ্রকের নাম অপরিচিত হইলেও, সাহিত্যে সুপরিচিত। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শূদ্রক বহুযুগব্যাপী আখ্যানাদির নায়ক না হইলেও মধ্যবিন্দু বলা যাইতে পারে। কখন তিনি বিদিশার রাজা (কাদম্বরী), কখন শোভাবতীর রাজা

(কথাসরিৎসাগর) কখন বৰ্দ্ধমানার রাজা (বেতাল-পঞ্চবিংশতি)। বহু সংগ্রহ-গ্রন্থে যে কাহিনীটীর উল্লেখ আছে (কথা সরিৎসাগর, 'হিতোপদেশ) সেই কাহিনীতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যে আসন্ন-মৃত্যু রাজা শূদ্রকের শতবর্ষ পরমায়ু স্থির রাখিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করে; 'দশকুমার চরিতে" রাজা শূদ্রকের জন্মজন্মান্তরের বিবিধ অদ্ভুত কৃত্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কি দক্ষতার সহিত তিনি তাঁহার শত্রু চকোরের রাজকুমার চন্দ্রকেতুর অন্তর্ধান ঘটাইয়াছিলেন, হর্ষ চরিতে তাহারি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। রাজতরঙ্গিনী, ধৈর্য্যের আদর্শ বলিয়া বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তাঁহারও নামোল্লেখ করে। পুরাণাদিতেও তাঁহার নাম আছে; স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে, তিনি নন্দবংশের পূর্ব্বে ৩২৯০ কলি অব্দে (= খৃষ্টোত্তর ১৮৯), বিক্রমাদিত্যের ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামিলা ও সোমিল এই দুই কবি একত্র মিলিয়া শূদ্রকসংক্রান্ত একটি আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ঐ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্রক নিরবচ্ছিন্ন আখ্যায়িকার বিষয় হইয়া আছেন, তাঁহার বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ নাই। পক্ষান্তরে, সর্ব্বপ্রথমে বামন-কৃত কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি গ্রন্থে গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখ হইয়াছে। বামন, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জয়াপীড়ের রাজত্ব কালে গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। বামন নিজ গ্রন্থে, পাঠককে "শূদ্রকের রচনাবলীর" উপর বরাত দিয়াছেন। অবশ্য তিনি "মৃচ্ছকটিকা" মনে করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন, কেন না, তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃচ্ছকটিকার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বান-কবি যেখানে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বড় বড় লেখকের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই হর্ষ চরিতের মুখবন্ধে শূদ্রকের নাম করেন নাই। কালিদাসও মালবিকার প্রস্তাবনায় অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাটককারের সঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শূদ্রকের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মৃচ্ছকটিকার যেরূপ রচনারীতি তাহাতে বাম ও বামন এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী কোন কালে শূদ্রককে স্থাপন করিতে কি কোন বাধা আছে? মৃচ্ছকটিকার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যে সকল হেতুবাদ প্রদত্ত হইয়া থাকে, M. C. Kellner সেই সব হেতুবাদ একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন; উহার মধ্যে কতকগুলি হেতুবাদ সাহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত এবং অন্যগুলি সামাজিক শ্রেণীভুক্ত। একদিকে সরলতা, রচনার দুর্ব্বলতা, উপাখ্যানের প্রাচুর্য্য, কার্য্যের খণ্ডতা, কতকগুলি ভূমিকার অত্যধিক পরিপুষ্টি; অন্য দিকে, পাত্রদিগের রীতিনীতি, সমাজের অবস্থা অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অধিষ্ঠান—এই সমস্ত বিষয়, অন্যান্য নাটক হইতে ইহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করে এবং নাটকের "ক্লাসিক" যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ইহার পরিচয় প্রদান করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

২। ক্ষিতীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

জিতেন্দ্রনাথের সহোদর ক্ষিতীন্দ্রনাথের নামও বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহার রচিত বিবিধ বিচিত্র প্রবন্ধ মাসিক পত্রাদিতে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। ইঁহার সাহিত্য-সাধনাও লোক-প্রসিদ্ধ। ক্ষিতীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গ্রন্থ আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম গ্রন্থ, আলাপ (মূল্য পাঁচ সিকা)। আলাপে সাহিত্য, দর্শন ও সমাজ বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ ও কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধ গুলি এতদিন বিবিধ মাসিক পত্রিকা-পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল; সেগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। "অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয় বাদ গ্রন্থের মুখবন্ধ" "ইউনেটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ" "রামমোহন রায়" প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর বিষয়ের প্রবন্ধ হইতে কাঠুরিয়া বিরহ প্রভৃতি কবিতা ও "হিমাচল" "নির্ঝরিণী" প্রভৃতি প্রবন্ধও এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি হইতে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সুনিপুণ যুক্তি-তর্কের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, স্বদেশ-প্রীতি ও অনুশীলনের পরিচয়ও তেমন পাইতে বিলম্ব ঘটে না। "ভারতোদ্ধার ও ব্রহ্মচর্য্য" প্রবন্ধে লেখক বঙ্গে জীবনের সাড়া পাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। স্বদেশ-প্রীতিকে তিনি হিন্দুতার উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে পৃথক করিতে বলিয়াছেন। 'হিন্দুয়ানীর' পরিবর্ত্তে তিনি 'হিন্দুত্ব' চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তুমি আমি যে কার্য্যকে হিন্দুর কর্ত্তব্য বলিব, তাহাই যে কর্ত্তব্য হইবে, তাহা নহে; মনু প্রভৃতি পুরাতন ঋষিদিগেরই আদেশ হিন্দুর কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হইবে। ...হিন্দুত্ব ব্যতীত বঙ্গদেশের ও ভারতে মঙ্গল নাই। ...এই হিন্দুত্বের মূল কি? ইহার কেন্দ্রভূমি কি? ...মনু প্রচারিত ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুত্বের পত্তনভূমি।...যখন দেখি; পাঁচ বৎসর বয়স হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সিগারেটের ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া বীরত্ব অনুভব করে; যখন দেখি, যৌবনে পদার্পণের বহু পূর্ব্বাবধি ছাত্রগণ বাল্যের অনুপযুক্ত অসার কার্য্য সমূহে অভ্যস্ত হইয়া উঠে,; যখন দেখি, কি সম্ভ্রান্ত, কি অসম্ভ্রান্ত, অধিকাংশ যুবক বিলাতী বা দেশী মদ্যের চরণে আত্ম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন; ...তখন কি আর আমাদের জীবনের আশা ভরসার কথা বলিতে সাহস হয়।...চারিদিকে বক্তৃতা হইতেছে সংযমের মূল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার কথা কেহই বলে না।...ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলাস আপনিই বিদূরিত হইবে... আপনা হইতেই মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে আসক্তি জন্মিবে।" এ কথা যে খুবই ঠিক, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্থানাভাবে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই গ্রন্থের বহু

প্রবন্ধে গ্রন্থকার সুনিপুণ ইঙ্গিতে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে পথ অবলম্বন করিলে আমাদিগের মঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈত থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি (মূল্য বারো আনা)। এই গ্রন্থে অন্যান্য নানা বিষয়ের সহিত ব্রহ্মলোক, ধর্ম্মপথ, বিবেক ও বৈরাগ্য, প্রায়শ্চিত্ত, আত্মধর্ম্মের ভিত্তি, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিস্তার, উপধর্ম্ম সংকারাত্মা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অন্তরায়, ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা ও স্বাধীন মত-প্রকাশের নির্ভীকতা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র (মূল্য আট আনা) এখানি রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গল্প-কথা নহে, ইহাতে গ্রন্থকার হরিশ্চন্দ্র-কথার মূল আলোচনা করিয়া বিবিধ পুরাণ-শাস্ত্রের সাহায্যে এ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; বিবিধ পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্র চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা অভিনব ও সুচিন্তিত হইয়াছে—পাণ্ডিত্যেও পরিপূর্ণ। অসাধারণ মনীষার বলে লেখক সাহিত্যে এক নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীভগবৎ কথা (মূল্য আট আনা) বালক-বালিকাগণকে ভগবানের বিষয়ে খুব সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থ লিখিত। এমন গুরু বিষয় এমন সহজ কথায় বুঝাইতে পারা সাধারণ শক্তির কথা নহে—গ্রন্থকার সেই অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাই তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও সরল যুক্তি-তর্কে ভগবৎ কথা উজ্জ্বল ভাবে বিবৃত হইয়াছে। শুধু বালক-বালিকা নহে, আপামরসাধারণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন!

আঁখিজল। (মূল্য আট আনা) এখানি কাব্য-গ্রন্থ। ৫৬টি খণ্ড কবিতা ও গান এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি আকারে ছোট হইলেও ভাবে গভীর, বিশাল বিপুল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

সকল গ্রন্থগুলিই ভালো কাগজে পরিষ্কার ছাপা, বাঁধাই চমৎকার এবং সকল গুলিই সাহিত্য-অনুরাগী পাঠকের আদরের সামগ্রী হইয়াছে। শ্রীসঃ

৩। কর্ম্ম-কথা ; চরিত-কথা।*

কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ প্রণীত দুইখানি পুস্তক আমরা উপহার পাইয়াছি ; একখানি "চরিত-কথা" ; অপরখানি "কর্ম্ম-কথা"। এই দুইখানি পুস্তকে গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে রামেন্দ্র বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার মন যেন একটী সুন্দর উপবন। এ উপবনে নানাবিধ ফুল ফুটে। ফুলগুলি অতি মনোরম। কিন্তু ফুলগুলি

* কর্ম্ম-কথা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা।
চরিত-কথা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

এতদিন চারিদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল। আজ ফুলগুলিকে মালায় গাঁথিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

রামেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তার ফল কতকগুলি প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব অধিকাংশ স্থলে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল এবং সেই তত্ত্বগুলি সহজভাবে ব্যক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর লেখনী-মুখে সেই অতি জটিল তত্ত্বও সহজ, সরস ও সুবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

"চরিত-কথায়" বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হেলম্ হোলৎজ, মোক্ষমূলর প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির বহু চরিত-কথা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর চরিত-কথায় একটা বিশেষত্ব আছে। ইহাতে উপাখ্যান নাই; বাহ্য জীবনের বাহ্য কাহিনী নাই। ইহাতে আছে, অন্তঃ-প্রকৃতির কথা, ইহাতে আছে সুনিপুণ মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণ। ইহাতে কাহার চরিত্র কি ধাতুতে গড়া, কাহার চরিত্র কি বিশেষত্বের পরিচয় দেয়, তাহার বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও "বাঁকানল আর টেষ্ট টিউব হাতে দিয়া নানা জাতি কিম্ভূত কিমাকার দ্রব্যের বিশ্লেষণ" রামেন্দ্র বাবু সাধারণতঃ করিয়া থাকেন, তথাপি মানব চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি যে শিক্ষা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

"কর্ম্ম-কথায়" গ্রন্থকার কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি হইতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের একাধারে পরিচয় পাওয়া যায়।

যদিও প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এগুলি একই সূত্রে বাঁধা। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" এই বাক্যকে গ্রন্থকার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলিকে দাঁড় করাইয়াছেন। কর্ম্ম-পরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই, অধিকারও নাই, ইহাই গ্রন্থকারের মুখ্য বক্তব্য।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি যেমন কোন কোন সমাজে প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি,—জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের বিনাশ, সেইরূপ অন্য সমাজে প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের মূল। জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়া, জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিলেই—সেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিবে, এই বিশ্বাসে কতক মনুষ্য বহু যুগ ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছে। জ্ঞানের পন্থা পরিহার করিয়া দুঃখ-নাশের উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্ব জাতির মধ্যে এই বাক্য স্বীকৃত হয় নাই। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে দুঃখের ধ্বংস হয়, এই মত আবার একটা বৃহৎ সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু জ্ঞান হইতেই এই সুখ-দুঃখময় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তির সহিত দুঃখের উৎপত্তি ও সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের দুঃখভোগ

লোপ করিতে গেলে সুখের ভাগ আপনা হইতেই লোপ পাইয়া যায়, এবং সুখভাগ লোপ করিতে গেলে দুঃখের ভাগও লোপ পায়, এবং সুখ-দুঃখ লোপ করিতে গেলে সুখ-দুঃখময় জগতেরও আর অস্তিত্ব থাকে না।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের পরিবর্ত্তে, দুঃখকে দূর করিয়া তাহার স্থানে সুখের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। সুতরাং মুক্তি অর্থে কেবল দুঃখ হইতে মুক্তি নহে, উহা সুখ হইতেও মুক্তি; ভ্রান্তির পাশ হইতে মুক্তি, জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি। ভারতবর্ষে এককালে এইরূপ মুক্তিতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল, গ্রন্থকারের "মুক্তির পথ" নামক প্রবন্ধে এই কথাই প্রকটিত হইয়াছে।

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

জীবন যাতনা-সঙ্কুল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই। যে কারণেই হউক, তুমি মানব সমাজ হইতে দূরে রহিতে চাহিতেছ, কিন্তু মানব সমাজ তোমাকে চাহে। তুমি যদি মনুষ্য জাতিকে ফাঁকি দিতে চাও, সেও তোমাকে নিগ্রহ করিতে ছাড়িবে না। সমাজের ভিতর বাস করিয়া তাহার নিগ্রহ ও অত্যাচার সহ্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজ সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য নহে; এখানে স্বার্থের সহিত স্বার্থের বিরোধ। তোমার আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সহিত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধ। মানবিকতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়া, মনুষ্যকে জীবন-হীন লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতে এক রকমের মুক্তিলাভ না ঘটিতে পারে এমন নহে; কিন্তু তাহা জড়ের বাঞ্ছনীয়, মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। অতএব আসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মাচরণ কর; ফল কামনা করিও না; কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই। গ্রন্থকার "বৈরাগ্য" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

সমস্ত বাহ্য জগৎটা আমারই ভিতর, আমারই এক অংশ। সমগ্র বাহ্য জগৎটা আমার অনুভূতি ও আমার অনুভূতিই সমগ্র বাহ্য জগৎ। তুমি আমার কল্পিত, তুমি আমার সৃষ্ট, তুমি আমার অন্তর্গত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়োগে আমি তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; আমি ছাড়া আর একজন আছে, মানিয়া লই। তোমাতে আমাতে এক ও অভিন্ন, অথচ তোমা হইতে আমি স্বতন্ত্র। মূলে বিরোধ। তুমি আমার, অথচ তুমি আমার নহ। তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন; এবং যদ্দ্বারা সেই সম্বন্ধ স্থাপন ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়াস সফলতা লাভ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। এই কথা "জীবন ও ধর্ম্ম" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

স্বার্থ সাধন ব্যক্তি-জীবন রক্ষার উপযোগী; পরার্থ-সাধন সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক। যেখানে সমাজ বাধে নাই; সেখানে স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, পর-তন্ত্রতার লেশ নাই। সমাজের আঁটা আঁটির সহিত পরতন্ত্রতা আসে, পরাধীনতা আসে, পরের জন্য স্বার্থসংহার আসে, ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়; "স্বার্থ ও পরার্থ" প্রবন্ধে এই তথ্যের সম্যক আলোচনা হইয়াছে।

মনুষ্যত্বের বিকাশ আবশ্যক। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিরও অভিব্যক্তি আবশ্যক, সামাজিকত্বেরও অভিব্যক্তি আবশ্যক। যাহাতে সমাজের মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম; তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্য বাধ্য। তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাভাবিক সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উপদেশ দেয়। এই কথা "ধর্ম্ম প্রবৃত্তি" প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সামাজিক আচারগুলি বর্ত্তমান কালে যতই অর্থশূন্য ও অনাবশ্যক হউক না কেন, এককালে হয়ত উহারা অর্থযুক্ত ও অত্যাবশ্যক ছিল। তবে একালে সে অর্থও নাই, সে প্রয়োজনও নাই। কিন্তু আমরা এই সকল কৃত্রিম আচার পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমাজ হইতে এই সকল কৃত্রিম আচার উড়াইয়া দিলে, স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে,

আরাম বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু যাহাতে মনুষ্যত্বের শোভা হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে এই মর্ম্ম "আচার" প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

"জীবের আভ্যন্তরীন শক্তি ক্রমাগত বহিঃস্থ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। জড় চারিদিক হইতে জীবকে আক্রমণ করিয়া জড়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; জীব জড়ের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সেই তুমুল সমরে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।"

এই সংগ্রামে যাহা জীবের জীবনের অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম। যাহা মনুষ্যের সমাজ-জীবনের অনুকূল, তাহাই মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম। কিন্তু মনুষ্যের সমাজ-জীবনের অনুকূল কি, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রকৃতি মনুষ্যকে কোন সংস্কার দেয় নাই। পশু-জীবন মুখ্যতঃ সংস্কার দ্বারা চালিত; জীবন রক্ষার নিতান্ত আবশ্যক কতিপয় জৈব ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে মনুষ্য-জীবন মুখ্যতঃ প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক চালিত। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি বা হৃদিস্থিত অন্তর্য্যামীর পরিতোষ মনুষ্যের সকল ধর্ম্মের মূল ও প্রমাণ। "ধর্ম্মের প্রমাণ" প্রবন্ধে এই কথার বিশদ আলোচনা হইয়াছে।

ব্যক্তি-বিশেষকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা দিতে সমাজ অত্যন্ত কাতর। ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রচলিত পদ্ধতির লঙ্ঘন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সমাজ-দ্রোহেরই প্রকার-ভেদ বলিয়া গৃহীত হয়। মনুষ্যকে সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে। সমাজের আদেশ যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও তাহা মানিতে হইবে। সামাজিক জীব জীবনের অধীন। প্রচলিত ধর্ম্মে তোমার আস্থা না থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি যোগ দাও। না দিলে তুমি সমাজ-চ্যুত হইবে, সমাজের হস্তে তোমাকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে। সমাজ নিজের জীবন রাখিতে চাহে। তাহার স্বার্থ ও তোমার স্বার্থ সর্ব্বত্র এক নহে। মানুষ আপনা হইতে ছয়টা রিপুকে বশ করিতে চাহে না বা পারে না। সমাজ শক্তি রাষ্ট্র-শাসনের বা ধর্ম্ম-শাসনের মূর্ত্তি ধরিয়া রিপুকয়টার শাসনে প্রবৃত্ত হয়। মানব প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল নীতির শাসনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। এইজন্য রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন আবশ্যক। যেখানে রাজশাসন পরাভূত, সেখানেও ধর্ম্মশাসন বিমুখ হয় না। এই হিসাবে ধর্ম্মশাসনের উপযোগিতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কঠোরতা বুঝা যায়। "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রবন্ধে এই কথা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

প্রকৃতির পীড়নে মনুষ্য মাত্রই চিরদিন পীড়িত। প্রকৃতি সরল ও মনুষ্য দুর্ব্বল। দুর্ব্বল মনুষ্য বোধ হয় সমাজ-সংস্থিতির প্রারম্ভ হইতে সরলা প্রকৃতিকে নানা উপায়ে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই কথা "প্রকৃতি পূজা" প্রবন্ধে প্রকটিত হইয়াছে।

অভিব্যক্তির সোপান পরম্পরায় আরোহণ করিয়া যখন সমাজবদ্ধ মনুষ্য ক্রমশঃ উচ্চতর পদবীতে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমশঃ তাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ হয়।

মনুষ্য সমাজবদ্ধ বলিয়াই ধর্ম্মের অস্তিত্ব। ভূমণ্ডলে মানুষ একজন মাত্র থাকিলে তাঁহার

ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিত কি না, তাহা সংশয়ের স্থল। পশুর মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই। যাহা লোককে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জয় হাতে হাতে ঘটে না। ধর্ম্মের পথ কণ্টকে আকীর্ণ। কিন্তু যথা ধর্ম্ম তথা জয় হয় কি না এই বাক্য "ধর্ম্মের জয়" প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

আমি আছি—ইহা আমার পক্ষে অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। আর এই যে আমার কল্পিত জগৎ, উহার অস্তিত্ব ব্যবহারিক মাত্র। আমি উহাকে সৃষ্টি করিয়া আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেছি ও উহার সহিত আমার একটা কাল্পনিক সম্পর্ক পাতাইয়াছি। আমা ছাড়া আর কোন বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই—অহং ব্রহ্মাস্মি নাপরঃ। এই জগদ্ব্যাপার আমার কামনামাত্র, আমার ইচ্ছা মাত্র, আমার লীলা মাত্র। এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক। জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছে, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল। ত্যাগাত্মক কর্ম্মই ধর্ম্ম; জীবের অন্যথা গতি নাই, "যজ্ঞ" নামক এই বিষয়ের প্রবন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে পরার্থ কর্ম্ম করিব কেন, এই প্রশ্নের উত্তর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ডারুইন-পন্থীরা কিরূপে হিতবাদের মূল অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট আমি পরের জন্য কেন ত্যাগ স্বীকার করিব, এ কথার চরম উত্তর পাওয়া যায় না। পরার্থপরতার মূল সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

চেরি-পুষ্প

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্ব্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রং গোলাপী উষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছ ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছ ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রক্তভেরি!

মর্ম্মর-কঠিন-শুভ্র তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙ্গীন আলোক,
পূর্ব্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভূবিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব দরশনে॥

হিমালয়। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভারতে শিক্ষাবিস্তার

(Progress of Education in India 2 vols. 1907-1912)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত অভিনন্দন-গ্রহণ-কালে ভারত-সম্রাট বলিয়াছিলেন, "সারা দেশে স্কুল-কলেজ জালের মত বিছাইয়া পড়ুক। সেই সকল স্কুল-কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইবে, তাহারা রাজভক্ত পুরুষ, ও সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ হইবে, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেই তাহারা প্রভূত উন্নতি-সাধন করিতে সক্ষম হইবে। আরও আমার ইচ্ছা হয়, জ্ঞানের আলোকে আমার ভারতীয় প্রজাবর্গের গৃহ উজ্জ্বল, পরিশ্রম মধুর হোক; তখন তাহার ফলে উচ্চ চিন্তা, আরাম ও স্বাস্থ্য তাহাদিগের আয়ত্ত হইবে। শুধু শিক্ষার দ্বারাই আমার এ অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। ভারতে শিক্ষা-বিস্তার-চিন্তাই আমার হৃদয়ে চিরদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিরাজ করিবে।" সম্রাটের অভিলাষ-অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রভূত আয়োজন করিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরে (১লা এপ্রিল ১৯০৭ হইতে ৩১ মার্চ্চ ১৯১২) শিক্ষা কতখানি বিস্তার লাভ করিয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সদস্য শার্প সাহেব বিস্তর পরিশ্রমে তাহার সুবৃহৎ বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই বিবরণী নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। অঙ্কের প্রাচুর্য্য থাকিলেও রচনা-ভঙ্গীটি এমনই চিত্তাকর্ষক ও সুশৃঙ্খল যে সম্পূর্ণ অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এই বিবরণীখানি অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবেন। বিবরণীর মুখবন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবাদি সঙ্কলিত হইয়াছে; ইহা হইতে শিক্ষা-ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ও কার্য্য রীতি সুস্পষ্ট বুঝা যায়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে খাস তহবিল হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় ভারতে কি পরিমাণ শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে, এই বিবরণী গ্রন্থে তাহারই বিশদ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণী-পাঠে জানা যায় ভারতে দশ লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক পরিমাণ প্রদেশে পঁচিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে ⅚ অংশ শিক্ষা-গণ্ডীর মধ্যে পদার্পণ করিয়াছে।

এই বিবরণী দুইখানির আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে, ভারতের স্কুল-সমূহে ছাত্র সংখ্যা-বৃদ্ধি। ১৯০৭ সালে ছাত্রগণের সংখ্যা ছিল, ৫৩, ৮৮, ৬৩২; ১৯১২ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া ৬৭,৮০, ৭২১ হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বকার তুলনায় শতকরা ১৭,৭ বাড়িয়াছে। ছাত্র-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে, ব্রহ্মদেশে (শতকরা ৩,৭ হিসাবে); তৎপরে যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রদেশ-সমূহের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে,—বোম্বাই (শতকরা ৩,৪);

মান্দ্রাজ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম (শতকরা ৩,১); বঙ্গদেশ (শতকরা ২,৯)। যুক্ত প্রদেশে অল্পই বাড়িয়াছে (শতকরা ১,৬ হিসাবে)। পূর্ব্বে শিক্ষা-ব্যাপারে যে স্থলে ৫২৯০৩৬৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, এক্ষণে সেই স্থলে ব্যয় হইয়াছে, ৭৮১৯২৬০৫ টাকা। সকলেই যে এখন শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহারও স্চনা দেখা যায়। স্কুল-কলেজের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় উচ্চ শিক্ষা-লাভের জন্য দেশের লোকের মনও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৮০৬০ জন মাত্র। ১৯০২ হইতে ৯০৭ সালের মধ্যে উক্ত সংখ্যা এক হাজার মাত্র বাড়িয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে (১৯০৭ হইতে ১৯১২) কলেজ সমূহের ছাত্র সংখ্যা ১৮০০১ হইতে ২৮,৯৬য়ে উঠিয়াছে, অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার বাড়িয়া গিয়াছে। যুক্ত বঙ্গ ও আসামেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে। কলেজ সমূহের ছাত্রীর সংখ্যা ২৭৯; তন্মধ্যে বঙ্গে ৮১ জন ও বোম্বাইয়ে ৭৬; বাকী অন্যান্য প্রদেশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে দেখা যায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজের কলেজগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তবে মান্দ্রাজে পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল-কলেজের সংখ্যা অধিক। বঙ্গদেশে সুলভে শিক্ষাদানের জন্য যে কয়টি প্রাইভেট্ কলেজ আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন, সিটি, রিপন, সেণ্ট্রাল ও বঙ্গবাসী কলেজই উল্লেখ-যোগ্য। বঙ্গদেশের মফঃসলস্থ প্রাইভেট কলেজগুলির অবস্থা এ গুলির তুলনায় তেমন নহে। পূর্ব্ব বঙ্গীয় প্রাইভেট কলেজ গুলির অবস্থা শোচনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার কলেজে Residential System-এর প্রচলন-কল্পে আশাপ্রদ আয়োজন চলিতেছে।

ছাত্রগণের সহবৎ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের রিপোর্টে আছে, ভারতীয় ছাত্রগণের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে কিছুকাল পূর্ব্বে ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রান্ত ধারণায় বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শার্প সাহেব বলিয়াছেন, "দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহার এখনও অন্ত হয় নাই; বঙ্গদেশে কয়েকজন শিক্ষকের দায়িত্বহীনতা ও রাজদ্রোহ-প্রচারের অপরাধের কথা ও হুগলি কলেজের জনৈক প্রোফেসরের উক্ত দোষে বিতাড়িত হওয়ার বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজসাহী কলেজ ও মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজেও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই। শার্প সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন, ছাত্রগণের সহবৎ ভাল না হইলে বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য প্রচুর লাবোরেটরির সৃষ্টি করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইবে না। শিক্ষার মূল চরিত্র গঠন। সেই চরিত্র যাহার সুগঠিত না হইল, বৃথাই তাহার জন্য লাইব্রেরী বা লাবোরেটরির সৃষ্টি! কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে ইহাতেও আমরা নিরাশ হইব না। তুলনায় মন্দ ছাত্রের সংখ্যা

নিতান্তই নগণ্য। এবং এমনও আমাদের আশা আছে, বিপথগামী ছাত্রগণ অতঃপর ভ্রান্ত ও অমঙ্গলকর ধারণা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য পথে আপনাপন দৃষ্টি রাখিতে অবহেলা করিবে না! তাহাদিগের উপরই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে—সমাজের প্রতি দায়িত্বও তাহাদিগের সামান্য নয়,—এইটুকু বুঝিয়া সকল প্রকার পাপ ও অশুভ চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সাধনে তাহারা তৎপর হইবে, দেশের ও দেশের মঙ্গল-সাধনে সবলে সক্ষম হইবে, নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিখা-বৃদ্ধি শুধু সাগরতীরে বালুকার ঘর রচার মতই নিরর্থক।

এই বিবরণীখানি আর একটা সুমহান আশার আশ্বাস বহন করিয়া আনিয়াছে। বিবরণী-পাঠে জানা যায় স্কুল-কলেজ-সমূহে মুসলমান ছাত্র-সংখ্যাও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ জ্ঞানে বুদ্ধিতে হিন্দুর সমতুল। তাঁহারা ঔদাস্য ও অবহেলা ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। নীচ জাতীয়গণের মধ্যেও শিক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছে। অসভ্য আদিম অধিবাসীগণের মধ্যেও শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সাঁওতাল, গণ্ড প্রভৃতি জাতিসমূহ মিশনরীগণের চেষ্টায় স্বীয় মাতৃভাষার সহিত অপর ভাষাদিতেও শিক্ষা-লাভ করিতেছে।

ইহার মধ্যে দুঃখের কথা এইটুকু যে শিল্প কৃষি প্রভৃতি বিষয় শিখিবার জন্য এখনও আশানুরূপ চেষ্টা দেখা যায় নাই। বিদেশীয় ভাষা শিখিয়া কোন মতে চাকুরি করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়-সন্ধানেই অধিকাংশ ছাত্র ব্যস্ত। ফলে উচ্চ উপাধি-লাভের যোগ্য শক্তি যাহার নাই, তাহারা অল্প-কিছু শিখিয়াই বাধা পাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি ক্রয় করিতেছে মাত্র।

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে উন্নতির বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০২৯৪৭ হইতে ১১০৬৯২তে এবং ছাত্র-সংখ্যা ৩৬৩০৬৬৮ হইতে ৪৫২৩৬৪৮তে উঠিয়াছে; শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও যথেষ্ট সুলভ।

এই বিবরণী-গ্রন্থ আগাগোড়া বিস্তর তথ্যে পরিপূর্ণ। আমরা সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দিলাম মাত্র। যাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের অনুরাগী, তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিস্তারকল্পে অর্থদানে মুক্তহস্ত হইয়াছেন, দেশের সুসন্তানগণও এ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় অগ্রসর,—দেশের সর্ব্বত্র সুপবন বহিতে সুরু করিয়াছে—সকলের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষার আলোকে সমস্ত দেশ ভরিয়া উঠুক—অজ্ঞানের অন্ধকার সমূলে ধ্বংস হোক্। উন্নতির ইহাই একমাত্র উপায়—এই পথই প্রকৃষ্ট পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।

পাটলিপুত্র

(খননের বিস্তৃত বিবরণ ১৯১২—১৯১৩)

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা খননের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়াছি এবং প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি যে চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা দৃষ্টে, এবং ডাক্তার ওয়াডেল, ও ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের কার্য্যাবলী কতকাংশে অনুসরণ করিয়া ডাক্তার স্পুনার গত বৎসর কার্য্যারম্ভ করেন। ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার মার্সাল পাটলিপুত্রে আগমন করেন এবং ডাক্তার স্পুনারের সহিত পরামর্শ করিয়া কুমড়াহার ও বুলন্দিবাগ নামক দুইটী স্থানে খনন কার্য্য আরম্ভ করিতে উপদেশ দেন। কুমড়াহারের সন্নিকটেই ডাক্তার ওয়াডেল একটী অশোকস্তম্ভের কতকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুলন্দিবাগ কুমড়াহারেরই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ডাক্তার ওয়াডেল অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শীর্ষদেশের চিত্র ১৩২০ সনের ফাল্গুনের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কুমড়াহারে যে অনেকগুলি দর্শনীয় দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রস্তর-স্তম্ভের যে সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, বিশেষজ্ঞগণের মতে সেগুলি একটী বহু প্রাচীন হলেরই স্তম্ভ। ডাক্তার ওয়াডেল মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ গুলি পর্য্যটক-প্রবর হিউয়েন-সিয়াং কথিত নিলিস্তম্ভের অংশবিশেষ। কিন্তু, পরিশেষে এতগুলি ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেল, যে ওয়াডেলের অনুমান যে সত্য নহে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইল। প্রথমতঃ সমান-দূরে অবস্থিত তিনটী স্থানে কয়েক-খানি করিয়া প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টে ও পরে সেইরূপ দূরত্বে—১৫ ফিট অনুযায়ী স্থান খনন করিয়া বহু প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টে সহজেই অনুভূত হইল যে, ঐ সকল খণ্ডগুলি কোন একটা বৃহৎ হলের স্তম্ভসমূহের নিদর্শন—১টী কি ২টী স্তম্ভের নিদর্শন নহে। ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ তারিখে এই ঘটনা ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে ঠিক পঞ্চদশ ফীট অন্তর অন্তর খনন করিয়া ৮ শ্রেণীতে ১০টী করিয়া মোট ৮০টী স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু, ডাক্তার স্পুনার অনুমান করেন যে, এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি স্তম্ভের নিদর্শন মৃত্তিকা গর্ভে রহিয়াছে। যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, হলটী সুবৃহৎ ও সুন্দর ছিল। আশা করা যায় যে, হলের সম্পূর্ণাংশ দেখিতে পাইলে প্রাচীন ভারতীয় স্থপতি বিদ্যাসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইবে।

এই হল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ডাক্তার স্পুনার নিম্নলিখিতরূপ অনুমান করেন :—

খৃষ্টীয় পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, অশোক বর্ত্তমান কুমড়াহার নামক স্থানে প্রায় একশতটী স্তম্ভসুশোভিত একটী বৃহৎ গৃহ

নির্ম্মাণ করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই হল বা গৃহ রাজচক্রবর্ত্তীর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন ছিল অথবা তাহারই অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই স্তম্ভগুলির নিম্নদেশ ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চে ইহারা অন্ততঃ ২০ ফিটের কম নহে। এই সকল স্তম্ভগুলির যে কাষ্ঠমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রতিকৃতি এই স্থানে প্রদত্ত হইল। যতদূর বোধগম্য হইতেছে তাহাতে এই স্তম্ভগুলির স্থান পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। পূর্ব্বপশ্চিমে পঞ্চদশ ফিটের ব্যবধান রাখিয়া তাহাদিগকে স্থাপিত করা হইয়াছিল। পার্সিপোলিসে যে শতস্তম্ভ হলের চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত কুমড়াহারের এই হলের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন যে, পার্সিপোলিস ও কুমড়াহাড়ের দুইটী হলের কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে। এই স্তম্ভগুলির উর্দ্ধদেশে সুবৃহৎ শালকাষ্ঠের গাঁথুনি (Superstructure)

কাষ্ঠমঞ্চ

ছিল এবং ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, এই স্তম্ভগুলির উপরে কোন প্রকার কারুকার্য্য-খচিত শীর্ষদেশ (Capital) ছিল না। যাহাতে স্তম্ভ ও উর্দ্ধস্থ কাষ্ঠগুলি স্থানচ্যুত না হয়, তজ্জন্য ধাতুনির্ম্মিত গোলাকার দণ্ড বা অর্গল ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ গুলি খুব সম্ভব তাম্রনির্ম্মিত ছিল। শাল কাষ্ঠগুলিকে একটী অপরের সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য সুবৃহৎ কীলক সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্তম্ভমূল ও গৃহতল কাষ্ঠের ছিল এবং বর্ত্তমান কালের মৃত্তিকার সপ্তদশ ফিট নিম্নে অবস্থিত ছিল।

এই গৃহ যে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহাতে যে বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বহু মূর্ত্তি ছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে ইহা দেখিতে কিরূপ ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

সম্ভবতঃ, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই স্থান ও গৃহ জলপ্লাবিত হয় এবং এই প্লাবনে গৃহতল ৮।৯ ফিট কর্দ্দম ও বালুকায় আবৃত হয়। সম্পূর্ণ কর্দ্দমা ত হইবার পূর্ব্বে একটি স্তম্ভ ভূমিসাৎ হয়। সে স্তম্ভটীর চিত্র আমরা পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি এবং স্তম্ভের তলদেশের চিত্র এই স্থানে প্রদত্ত হইল। প্লাবনে অন্যান্য স্তম্ভগুলির ক্ষতি হয় নাই। তাহারা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াই ছিল। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকিবার পরে হল অগ্নিদগ্ধ হয়। অগ্নিতে স্তম্ভের উপরস্থ কাষ্ঠ সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া ভস্ম স্তরে পরিণত হয়। যে সকল তাম্রকীলকের সাহায্যে কাষ্ঠগুলি প্রস্তরস্তম্ভের সহিত গ্রথিত ছিল, সেই সকল কীলকগুলি অগ্নিতাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভগুলি, চূরমার হইয়া যায়। সেইজন্য স্তম্ভগুলির উর্দ্ধাংশ যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, নিম্নাংশগুলি সেরূপ হয় নাই। উর্দ্ধাংশের সহিতই কাষ্ঠখণ্ডগুলি কীলক সহযোগে আবদ্ধ ছিল বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছিল। ডাক্তার স্পুনারের মতে স্তম্ভের নিম্নাংশ মৃত্তিকা-স্তরাভ্যন্তরে থাকায় অগ্নির পরেও কয়েকটি দণ্ডায়মান ছিল এবং অন্যান্য গুলিকে উত্তোলন-

স্তম্ভের নিম্নদেশ

পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়।" (These projecting stumps evidently interfered with the further utilization of the site, and as this was almost immediately desired, the stmups appear to have been broken off by the next comers and the ground levelled for further use) তৎপরে, এইস্থানে গুপ্তরাজগণের সময়ে ইষ্টকের গৃহ নির্ম্মিত হয় কিন্তু এই শেষোক্ত গৃহ নির্ম্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হয় নাই।

গুপ্তরাজগণের সময়ে এই যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্তম্ভের নিম্নস্থ কাষ্ঠমঞ্চগুলি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল। এদিকে বহুদিন পূর্ব্বে যে জলপ্লাবন হইয়াছিল, তাহাতে কাষ্ঠমঞ্চের নিম্নস্থ ভূমিও নরম হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং যে কয়েকটি স্তম্ভ মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকার জন্য দণ্ডায়মানাবস্থায় ছিল, তাহারা অনেক পরিমাণে আশ্রয়হীন হওয়াতে ক্রমে ক্রমে আরও গভীর মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিতে থাকে। এই সকল স্তম্ভের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকাগর্ভে বৃত্তাকার গর্ত্ত হইতে থাকে এবং উর্দ্ধস্থ প্রস্তরখণ্ড ও ভস্ম এই সকল গর্ত্তগুলি পূর্ণ করে। স্তম্ভের অধোগতির সঙ্গে গুপ্তরাজগণের সময়কার ইষ্টক-গৃহেরও অধোগতি হইতে থাকে। তৎপরে, অনেকদিন আর এস্থানে কোন গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা শালকাষ্ঠের মঞ্চগুলির উল্লেখ করিয়াছি। এই মঞ্চগুলি উচ্চে ৩০´×৬´×৪½´। শাল কাষ্ঠগুলি প্রায় ৩০ ফিট দীর্ঘ। আমরা ইহার আলোকচিত্র প্রদান করিলাম। এই প্রকার সাতটী মঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ, এই বৎসরের খননে আরও মঞ্চ আবিষ্কৃত হইতে পারে। আলোকচিত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে এগুলি বর্ত্তমানেও সুন্দর অবস্থায় আছে। এগুলি কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা অনুধাবন করা যায় না, তবে বোধ হয় যে, সুবৃহৎ কয়েকটি স্তম্ভ ইহাদের উপরে স্থাপিত করিবার জন্য এই মঞ্চগুলি নির্ম্মিত হয়। এগুলি কুড়ি ফিট নীচে অবস্থিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এগুলি ঘাট নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ কাষ্ঠমঞ্চগুলি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব।

যে একটী স্তম্ভের চিত্র আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রদান করিয়াছি, তাহা ১৪ ফিট ৩ ইঞ্চি। ইহার উর্দ্ধের অংশ পাওয়া যায় নাই। আমরা ইহার তলদেশের চিত্র প্রদান করিলাম। নিম্নদেশে কতকগুলি চিহ্ন আছে। পার্শিপোলিসে প্রাপ্ত একটী স্তম্ভের নিম্নদেশেও কতকটা এইপ্রকার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনীয় দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি ত্রিরত্ন পাওয়া গিয়াছে—ইহার নিম্নদেশে ধর্ম্মচক্র রহিয়াছে। ভ, দ এবং ড উৎকীর্ণ একখানি প্রস্তরের ক্ষুদ্র খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির বক্ষস্থলের অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহা "মথুরা প্রস্তরে" নির্ম্মিত। এ মূর্ত্তিটী যে সুবৃহৎ ছিল তাহা এই ক্ষুদ্রাংশ হইতেই অনুমান করা যায়। একটি বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকও পাওয়া গিয়াছে।

আরও, কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে—সংখ্যায় ৬৯টী। ইন্দ্রমিত্রের একটী মুদ্রা ও কণিষ্কের দুইটী তাম্র মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫—৪১৩) একটী মুদ্রাও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

অষ্টাদশটী মোহর (Seal) আবিষ্কৃত হইয়াছে। অষ্টাদশফীট মৃত্তিকাগর্ভে ত্রিশূল চিহ্নিত একটি মোহর প্রদর্শনীয়। গোপাল নামক একজনের একটি মোহর পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই শেষোক্ত মোহর সুঙ্গরাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল—চিহ্নদৃষ্টে তাহাই প্রতীয়মান হয়।

যে স্থানে কাষ্ঠমঞ্চ রহিয়াছে সেই মঞ্চ সন্নিকটস্থ একটী গর্ত্তে কয়েকটী অটুট মৃত্তিকা-পাত্র পাওয়া গিয়াছে। এগুলি কি করিয়া এত গভীর মৃত্তিকাগর্ভে অক্ষতাবস্থায় রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। অথচ, এ সম্বন্ধে কোন অনুমানই বর্ত্তমানক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।

পাটলিপুত্র খননের স্থলে উপস্থিত হইলে একটি কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, অশোকের প্রাসাদাদি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল—কেননা উহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত ছিল। আজ একজন ইংরাজও সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন "When one considers the difficulty of getting out these large columns from small pits with all our modern day appliances, it makes one wonder how the stones were brought to the place from several hundred miles away and erected over 2000 years ago." অর্থাৎ নানাবিধ যন্ত্রাদি দ্বারা এই সকল স্তম্ভগুলির সামান্য স্থান পরিবর্ত্তন করিতে আজও যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বহুদূর হইতে এই সকল স্তম্ভ যে কি প্রকারে আনীত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়।

১৯১৩ সনের ৬ই জানুয়ারী প্রথম কার্য্যারম্ভ হয় এবং গত বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৫,০০০ মনস্বী তাতার তহবিল হইতে প্রদত্ত ও বাকী ৪০০০ গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। চম্পারণে দুইটী স্তম্ভ স্থানান্তরিতাদি করিতে ১০,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে; সুতরাং সে হিসাবে অল্প-ব্যয়েই গত বৎসরের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে। সেজন্য যে সুযোগ্য ডাক্তার স্পুনার ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ ধন্যবাদার্হ, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বেদেস্থ্যৌঃ

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তর কুরুবাসের অন্যতর প্রমাণ)

'দ্যৌঃ' বেদের অতীব প্রাচীন দেবতা; এত প্রাচীন যে ইহাকে বেদের আদি দেবতাই বলা যায়। কারণ 'দ্যৌষ্পিতা' নামে বেদে ইহাঁর উল্লেখ রহিয়াছে। আর্য্যদিগের পাশ্চাত্য শাখার ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রধান প্রধান দেবতার নামে দ্যৌঃ শব্দের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আর্য্যদিগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাখার একত্র বাসের সময়ই যে দ্যৌঃ দেবতার কল্পনা হয় তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এংগ্লো সেক্সন্‌দিগের Tiu, জার্ম্মেণদিগের Zio, গ্রীক্‌দিগের Zeus, এবং লাটিনদিগের Jovis, নামে আমার দ্যৌঃর পরিষ্কার রূপান্তরই লক্ষ্য করিতে পারি। লাটিনদিগের Jupiter নামটী দ্যৌষ্পিতা' বা 'দ্যৌষ্পিতর' শব্দেরই সাক্ষাৎ অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই দ্যৌঃদেবতার মূল ধারণা যে আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বেদালোচনায় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। দিব্‌ শব্দটীও দ্যৌঃ শব্দেরই ন্যায় আকাশবাচী। দিব্‌ ও দ্যৌঃ * উভয় শব্দই দ্যোতনার্থক দিব্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে উজ্জ্বল আকাশেরই নাম যে দ্যৌঃ তাহাই বুঝিতে পারা যায়। রমেশ বাবু এ সম্বন্ধে তদীয় "Civilisation of India." নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Dyu or Dyaus is the name of the sky that shines, and is the most ancient name for the divine powėr among the Aryan nations. Civilisation of India, Temple Primer Series) p. 9. "দ্যু বা দ্যৌঃ দীপ্তিশীল আকাশের নাম এবং ইহা আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে দিব্যশক্তির প্রাচীনতম নাম।

দিবাতে সূর্য্যালোক ও রাত্রিতে চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত আকাশকেই আর্য্যগণ প্রথম "দ্যৌঃ" দেবতারূপে পূজা করিতেন। যেমন দ্যৌঃ বা আকাশ দ্যুতিমান্‌ বলিয়া দেবতা, তেমনই চন্দ্র সূর্য্যাদিও দ্যুতিমান্‌ বলিয়া দেবতা। আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন যে চন্দ্রসূর্য্যাদি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহাতেই তাঁহারা আকাশরূপী 'দ্যৌকে 'দৌষ্পিতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়া সমস্ত দেবতার পিতারূপে কল্পনা করিলেন।

"দ্যৌঃ দেবতার পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাধান্য কিন্তু বহুকাল স্থায়ী হয় নাই,—শীঘ্রই আমরা সেই প্রাধান্য ইন্দ্রের দ্বারা অধিকৃত দেখিতে পাই। আমরা নিম্নে দুইটী ঋক্‌ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে—

পরিদ্যাবা পৃথিবী জভ্র উর্ব্বী নাস্যতে মহিমাং পরিষ্টঃ। ৮
অস্যেদেব প্ররিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্য্যন্তরিক্ষাৎ ॥
স্বরালি দম আন্দ্রো বিশ্বগূর্ত্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়।৯
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৬১ সূক্ত।

"ইন্দ্র বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী অতিক্রম করিয়া-

---

* "From Sanscrit div or dyu. to shine, meaning 'the bright' or the shining one." The Teaching of the Vedas by M. Phillips p 31.

ছিলেন, তাঁহারা ইন্দ্রের মহিমা অতিক্রম করিতে পারিবে না।" ৮

"ইন্দ্রের মাহাত্ম্য দ্যুলোক ও ভূলোক ও অন্তরীক্ষ অপেক্ষাও অধিক। তিনি নিজ আবাসে স্বকীয় তেজে বিরাজ করেন, সকল কার্য্যে সমর্থ হয়েন। তাঁহার শ সুযোগ্য" তিনি যুদ্ধ গমনে নিপুণ এবং (মেঘরূপ শত্রু-দিগকে) যুদ্ধে আহ্বান করেন।৯

ইন্দ্রের দ্বারা দ্যৌঃ স্থানচ্যুত হওয়া সম্বন্ধে রমেশবাবু তদীয় ঋগ্বেদানুবাদে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন "ইন্দ্র যেরূপ "দ্যু"কে পদচ্যুত করিয়াছেন সেইরূপ বরুণকেও পদচ্যুত করিয়াছেন।" ঋগ্বেদানুবাদ ৫ পৃঃ।

ইন্দ্র যে স্বীয় মাহাত্ম্য দ্বারা দ্যৌকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে দ্যৌঃ যে আকাশের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ছিলেন তৎস্থলে ইন্দ্র-দেবতা হইলেন কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ইহার মধ্যে যে গভীর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে আমাদিগকে তাহাই উদ্ধার করিতে হইবে।

রমেশবাবু তদীয় ঋগ্বেদানুবাদে সেই ঐতিহাসিক সত্যের যে সন্ধান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—আমরা প্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

"কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে "ইন্দ্র" বলিয়া নূতন নাম দিলেন সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—আকাশের পুরাতন দেব"দ্যুর" তত গৌরব রহিল না। ইহার কারণ, কতক অনুভব করা যায়। আর্য্যদিগের প্রথম বাসস্থান মধ্য আসিয়াতে আকাশের গৌরব অধিক। ভারতবর্ষে নদীর জল; ভূমির উর্ব্বরতা ধান্য ও খাদ্যদ্রব্য, মনুষ্যের সুখ ও জীবন সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক। "দ্যু" আর্য্যদিগের পুরাতন আকাশদেব, "ইন্দ্র" হিন্দুদিগের নূতন আকাশদেব, সুতরাং বৃষ্টিদাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"

রমেশবাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ৪পৃঃ।

আর্য্যগণ পরিষ্কার আকাশের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমে যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রাজ্যে উপনীত হইলেন এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশের উপযোগিতা আপনাদের জীবন ধারণের পক্ষে অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিলেন তেমনই পরিষ্কার আকাশ-দেবতা 'দ্যৌ'র পরিবর্ত্তে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-দেবতা ইন্দ্রকে আপনাদের অভীষ্ট দেবতার পদে বরিত করিলেন। এইরূপেই 'দ্যৌ' অপেক্ষা ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইন্দ্রের মাহাত্ম্য "দ্যৌ' অপেক্ষা অধিক হইলেও 'দ্যৌঃ' ইন্দ্রের পিতা বলিয়াই সম্মানিত হইতে লাগিলেন যথা—

"সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য কর্ত্তা স্বপস্তমোভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্য্যং সুবজ্রমপচ্যুতং সদসো ন ভূম ॥৪

ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ১৭ সূক্ত।

"অতিশয়, স্তুত্য, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট স্বর্গ হইতে অনপচ্যুত ও মহিমান্বিত ইন্দ্রকে যিনি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের জনয়িতা "দ্যু" আপনাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত শোভনকর্ম্মা হইয়াছিলেন।"

রমেশবাবুর অনুবাদ।

এক্ষণে দেবরূপে দ্যৌর প্রভাব খর্ব্ব হইলেও আকাশরূপে দ্যৌর প্রভাব খর্ব্ব না হইয়া বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইল। কারণ 'দ্যৌঃ' দেবতারূপে পরিদৃষ্ট না হইলেও দেবস্থানরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল; দ্যৌঃ কেবল আকাশ রহিল না—ইহা স্বর্গে পরিণত হইল।

তাহাতেই অভিধানে স্বর্গপর্য্যায় নামের মধ্যে আমরা 'দ্যৌ, (দ্যু), ও 'দিব্' শব্দ অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই কিন্তু আকাশ অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই না—যথা অমরকোষে—

"স্বরব্যয়ং স্বর্গনাক-ত্রিদিব-ত্রিদশালয়াঃ।
সুরলোকো দ্যোদিবৌদ্বে স্ত্রিয়াং ক্লীবে ত্রিবিষ্টপম্॥"

উল্লিখিত পর্য্যায়ের 'দ্যো' (দ্যু) শব্দই 'দ্যৌঃ' রূপের মূল।

পক্ষান্তরে আকাশ পর্য্যায় শব্দের মধ্যেও 'দ্যো' (দ্যু) ও দিব্ শব্দ প্রথমেই পরিগণিত হইয়া আকাশের সহিত যে পূর্ব্বযোগের স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহার প্রমাণও অমরকোষ হইতেই পাওয়া যায় যথা—

"দ্যোদিবৌদ্বে স্ত্রিয়ামভ্রং (ভ্রং) ব্যোমপুষ্কর মম্বরম্।
নভোঽন্তরীক্ষং গগনমনন্তং সুরবর্ত্ম খম্।
বিয়দ্বিষ্ণুপদংবাতু পুংস্যাকাশবিহায়সী॥

উপরে আকাশের পর্য্যায় যে সকল শব্দ পাওয়া গিয়াছে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তন্মধ্যে কয়েকটী শব্দই মেঘাচ্ছন্ন বা অনুজ্জ্বল অর্থ প্রকাশক।'দ্যো' (দ্যু) ও 'দিব্' ও শব্দের পর সর্ব্বাগ্রে যে অভ্র (অভ্র্) শব্দ আওয়া যায় তাহারই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন—কারণ 'অভ্র্' শব্দটী অপ্ অব্দ পূর্ব্বক ভৃ ধাতু যোগে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে—তাহাতে ইহার অর্থ 'অপঃ বিভর্ত্তি' (অপ্ জল অর্থাৎ মেঘ-বাষ্প ধারণ করে ইহা) এই হয়। পুষ্কর শব্দটী আকাশ অর্থ অপেক্ষা জল ও মেঘ অর্থেই অধিক প্রচলিত। 'নভঃ' শব্দটী 'ন' ও 'ভা' এই দুই শব্দ যোগেই উৎপন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে ইহার অর্থ 'নভাতি' অর্থাৎ অনুজ্জ্বল হয়। এই অনুজ্জ্বল অর্থ গ্রহণ করিলেই 'মেঘ,' 'শ্রাবণ', 'বর্ষা প্রভৃতি ইহার নিম্নোদ্ধৃত আভিধানিক বিবিধার্থ আকাশের অনুজ্জ্বল অর্থের সহিত সঙ্গতি প্রাপ্ত হইয়া সহজেই বোধগম্য হয় ;—

"নভো ব্যোম্নি নভা মেঘে শ্রাবণেচ পতদ্গ্রাহে।
ঘ্রাণে মৃণাল সূত্রেচ বর্ষাসুচ নভাঃ স্মৃতাঃ॥"

আকাশ নামটী পর্য্যন্তও আমরা অনুজ্জ্বল অর্থেরই প্রকাশ বলিয়া মনে করি। আকাশ শব্দটী সাধারণতঃ 'আ সমন্তাৎ কাশতে প্রকাশতে' এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু 'আ শব্দের অর্থ ঈষৎ' বা 'অসম্যক্' ও যে না হইতে পারে তাহা নহে। 'আভাস' শব্দে আমরা ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই।

উপরিউক্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম কিরূপে আর্য্যদিগের আদি নিবাসের 'দ্যৌঃ'রূপ পরিষ্কার আকাশের ধারণাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাদের শেষাধিবাসের 'অভ্র' বা 'নভঃ'রূপ মেঘাচ্ছন্ন অনুজ্জ্বল আকাশের ধারণায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

'দ্যৌঃ' শব্দটীকে যে আমরা স্বর্গরূপ অর্থ-গৌরব লাভ করিতে উপরে দেখিয়াছি—তাহাতে 'দ্যৌঃ' রমেশ বাবুর অনুমিত মধ্য আসিয়ার আকাশ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পরন্তু ইহা উত্তর আসিয়া বা উত্তর কুরুর আকাশ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কারণ ভারতীয় আর্য্যগণ পুরাণাদিতে স্বর্গের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহা হইতে স্বর্গ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মনে যেরূপ সাধারণ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে – তৎসমস্তেরই উত্তর কুরুর সহিত যেরূপ সামঞ্জস্য হয়—অপর কোনও স্থানের সহিত তদ্রূপ সামঞ্জস্য

হয় না। প্রকৃতিবাদ অভিধানে উত্তর কুরুর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"ইহা দেবতাগণের প্রিয় নিবাসভূমি।"

উত্তর কুরুতে উত্তরায়ণের ছয় মাস দিন থাকায় এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস রাত্রি থাকায় আমাদের এক বৎসরে যে উত্তর কুরুবাসিদিগের একদিন রাত্রি (অহোরাত্র) হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। দেবতাদিগের দিনরাত্রি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আমাদের শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় তাহা উত্তর কুরুবাসিগণের দিন রাত্রির সম্পূর্ণই অনুরূপ। আমরা এস্থলে অমরকোষ হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রঃ। বর্ষেণ দৈবতঃ ॥"

ইহার উপর ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র ভানুজি এইরূপ টীকা করিয়াছেন "নৃণাং, মাসেন পিতৃণামহঃ পৌত্রোহহোরাত্রঃ তত্র শুক্লপক্ষোদিনং কৃষ্ণপক্ষোরাত্রিঃ। নৃণাং বর্ষেণ দেবতানামহঃ দৈবতোহহোরাত্রঃ. তত্রোত্তরায়ণং দিনং। দক্ষিণায়নং রাত্রিঃ।

ইহার অর্থ এই "মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকের (পৈত্র) এক দিনরাত্রি হয়। তাহাতে শুক্লপক্ষ দিবাভাগ ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি ভাগ। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের (দৈবত) এক দিনরাত্রি হয়—তাহার উত্তরায়ণই দিবা ও দক্ষিণায়ণই রাত্রি।"

ধ্রুব-লোক স্বর্গের উচ্চতম লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। যে ধ্রুব-নক্ষত্রের নামে এই লোকের নাম হইয়াছে তাহা উত্তরকুরুরই সন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র। পাশ্চাত্য ভাষায় 'ধ্রুব' নক্ষত্রের যে 'Polestar' নাম পাওয়া যায় তাহাতেই ইহা যে মেরু-নক্ষত্র তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যে সমস্ত যুক্তিমূলে দেবগণ উত্তর কুরুবাসী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন—সেই সমস্ত যুক্তিমূলেই দ্যৌঃ উত্তরকুরুর উজ্জ্বল আকাশ বলিয়াও প্রমাণিত হইতেছে—কারণ বেদে দ্যৌঃ দেবগণের পিতা ও 'জনিতা' বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দেবগণের পিতা ও জনিতা হইতে দ্যৌঃ স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের বাসস্থান স্বর্গরূপে কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয় আর্য্যগণ উত্তরকুরু হইতে সুদূর ভারতবর্ষে আগমন করিলে পর—সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ইহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন ইহা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অপরূপ স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল—তখনই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", এই স্বতঃসিদ্ধ মানসিক ভাববলে ভারতীয় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের আদি নিবাস উত্তরকুরুবর্ষের স্বর্গরূপে কল্পনা সম্ভবপর হইয়াছিল! এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি কিরূপে এক 'দ্যৌঃ' শব্দের মধ্যে ভারতীয় আর্য্যদিগের স্মরণাতীত কালের আদিবৃত্ত সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া অক্ষয়রূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অপ্রস্তুত

(মার্ক টোয়েন হইতে)

আমি ও বন্ধুবর হ্যারিস তখন সুইজার-ল্যাণ্ডে। গ্রীষ্মে যাঁহারা সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণে আসেন তাঁহাদের অর্দ্ধেকই ইংরেজ - বাকীর মধ্যে বেশীর ভাগই জর্ম্মান ও আমেরিকান।—

হোটেলের টেবিলের চারিদিকে ঘিরিয়া যখন নানা প্রকার পোষাক পরিধান করিয়া নানাদেশীয় লোক আহারে বসিতেন, আমি ও হ্যারিস্ তখন অনুমানে স্থির করিতে চেষ্টা করিতাম তাহাদের মধ্যে কে কোন জাতি, কাহার কি নাম,—বয়স কত ইত্যাদি। অনেক ব্যক্তির জাতি কি তাহা সময় সময় স্থির করিতে পারিলেও—নাম ঠিক করাটা বড় সহজ হইত না। একদিন আমি ও হ্যারিস্ নিম্নলিখিত রূপ আলোচনা করিতেছিলাম—

আমি। "ওঁরা দেখিতেছি আমেরিকান।"

হ্যারিস্। "তা যেন স্বীকার করা গেল। কিন্তু তাঁরা আমেরিকার কোন ষ্টেটের তা যদি বল্‌তে পার তবে ত বুঝি।"

আমি একটা ষ্টেটের নাম করিলাম—হ্যারিস্ বলিল অন্য একটা। কিছুতেই মীমাংসা হয় না। তবে একটা বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত হইলাম।—ওঁদের সঙ্গের যুবতীটী অপরূপ সুন্দরী, এবং তাহার পোষাক সুরুচির পরিচায়ক। —কিন্তু সুন্দরীর বয়স লইয়া আমাদের মধ্যে পুনরায় অনৈক্য হইল। আমি বলিলাম যুবতীর বয়স ১৬ পার হয় নাই,—হ্যারিস্ বলিল বিশেষ কম হইতেই পারে না। কিছুক্ষণ কলহের পর আমি গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, এবিষয়ে মীমাংসার একটী উপায় আছে। আমি যাই যুবতীকেই জিজ্ঞাসা করে আসি।"

হ্যারিস্ বিদ্রূপের ভান করিয়া বলিল—"অবিশ্যি; সেই ত ঠিক কথা। যাওনা—জিজ্ঞাসা করে এস। বলো, আমি আমেরিকা হতে এসেছি। তা'হলেই তোমার সঙ্গে যেচে আলাপ করবে এখন। কোন চিন্তা নেই।"

আমি বলিলাম—"আমি একটা কথার কথা বলছিলাম মাত্র; যাবই যে তা ভেবে কথাটা বলিনি। কিন্তু তুমি দেখ্‌ছি জাননা, আমি মোটে ভীরু প্রকৃতির লোক নই। ভ্রমণে বেড়িয়েছে এমন কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করতে আমার কোনও ভয় হয় না! এই যাই আমি।"

আলাপ আরম্ভ করিবার একটা সহজ উপায়ও মনে মনে স্থির করিলাম। আমি গিয়া রমণীকে বেশ ভদ্রতার সহিত সম্বোধন করিয়া বলিব—তিনি আমার পরিচিতা মনে করে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি যদি ভুল করে থাকি—তবে যেন ক্ষমা করেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রমণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটীকে নমস্কার জানাইয়া—যুবতীর দিকে ফিরিয়া কথা

আরম্ভ করিব এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"আমি জানতাম আমার ভুল হয়নি। জনকে আমি আগেই বলেছিলাম তোমাকে দেখিয়ে, যে এ তুমি ছাড়া অন্য কেউ না। জন্ বলিল—বোধহয় তুমি নও। কিন্তু আমার কখনও ভুল হয় না—বিশেষতঃ তোমাকে। আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয় তুমিও আমায় চিন্তে পেরে আমার কাছে আসবে। বোস বোস, কি আশ্চর্য্য তোমাকে যে এখানে দেখ্‌তে পাব—তা আমি ভাবতেই পারিনি।"

আমি ত অবাক্। কিছুক্ষণের জন্য আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল। যাহা হউক—আমরা তখন বেশ পরিচিতভাবে পরস্পরের হাত চাপিয়া ধরিলাম। এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একখানা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি মনে মনে বড়ই অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলাম। অস্পষ্ট ভাবে মনে হইল কোথায় যেন রমণীকে দেখিয়াছি—কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলাম, এবং তাঁর নামই বা কি—তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়া রমণীর সঙ্গে আলাপ সুরু করি। নতুবা অন্য প্রকার প্রসঙ্গে যদি বাহির হইয়া পড়ে—যে আমি তাঁকে চিনিতে পারি নাই শুধু চিনিবার ভান করিতেছি মাত্র তবে বড়ই লজ্জায় পড়িব। কিন্তু আমার ভাবা মাত্রই সার। যুবতী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—"কি ভীষণই ছিল সেই রাত্রিটা ভাই। যেদিন আমাদের সামনের নৌকা-গুলি একটী একটী করিয়া ঢেউয়ের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল?—তোমার সে রাত্রির কথা মনে আছে ত?"—

আমি বলিলাম "মনে নাই?" যদিও এর বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

"আর মেরির কান্না? ভয় পেয়ে কি কান্নাটাই না সুরু করলে সে।"

আমি বলিলাম "হাঁ; বেশ মনে আছে।"

হায়! কোন কথাই মনে ত আসিল না। আমি যে তাঁকে চিনিতে পারি নাই প্রথমেই সে কথা খুলিয়া বলিলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। তাহা হইলে এরূপ বিপদে পড়িতাম না। কিন্তু এত কথার পর কি করিয়াই বা এখন বলি—যে, তাঁকে আমি চিনিতে পারি নাই! ফল হইল এই, আমি ক্রমেই গভীর ভাবে, এই অজ্ঞাত অভিনয়ের জালে আট্‌-কাইয়া যাইতে লাগিলাম। কোনও প্রকারে আলাপের স্রোত অন্যমুখী হউক এই কথাই আমি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রার্থনা করিতেছিলাম—কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট—রমণী ক্রমেই জাল প্রসারিত করিয়া ধরিতেছিলেন।

"তুমি কি শোন নি, শেষে জর্জ্জের সঙ্গেই মেরির বিয়ে হয়েছে?"

"না, তাত শুনিনি। জর্জ্জই তাঁকে বিয়ে করলে নাকি?"

"হাঁ, সেই বিয়ে করেছে। সে বলে, তাতে মেরির পিতার যত দোষ, মেরির বা তার কিছুই দোষ ছিল না। আমার মনে হয় জর্জ্জের কথাই ঠিক। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

"নিশ্চয়! জর্জ্জই ঠিক। আমি ত আগা-গোড়াই তাই বলে আসছি।"

"কই, তুমি ত এতদিন তা স্বীকার কর নি, অন্ততঃ গত গ্রীষ্মে ত তোমার অন্যরূপ মত ছিল।"

"ও, না মা। তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ধারণা আগে অন্যরূপই ছিল। কিন্তু গত শীতকালে আমি আমার পূর্ব্বের ভুল বুঝতে পেরেছি।"

"যাক্। বাস্তবিক ঘটনা এমনি ঘুরে দাঁড়াল যে মেরির যে কোনও দোষ নেই তা স্পষ্ট ভাবেই বেরিয়ে পড়লো। সমস্ত দোষই তার পিতার। অন্ততঃ তার পিতার ও বৃদ্ধ ডার্লির।"

"আমি বরাবরই ডার্লিকে একটী ভয়ানক জিনিস্ জেনে আস্ছি।" এ সম্বন্ধে একটা কিছু ত বলা চাই।

"তাই সে ছিল। ওদের সকলেই কিন্তু সেটাকে খুব স্নেহ কর্‌তো। তোমার হয় ত মনে আছে ওর হ্যাকামির কথা? যখনই একটু শীত পড়্‌ত ওটা অমনিই এসে একেবারে মেরিদের বস্‌বার ঘরে ঢুকতো।"

বেশী দূর অগ্রসর হইতে আমার রীতিমত ভয় হইতেছিল। ডার্লি তা'হলে কোন মানুষের নাম নয়। অন্য কোন প্রাণীর! হয় ত একটা কুকুর বা হাতিও হতে পারে। যাহোক সকল জন্তুরই ত লেজ আছে এই ভেবে আমি বলিলাম—

"কি লেজটাই না বেরিয়েছিল ওর!"

"একটা? তার শত শত লেজ ছিল বল!"

আমি ত অবাক। বুঝিতেই পারিলাম না এর পর কি বলা সঙ্গত হইবে তাই কেবল বলিলাম—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?"

"কি বিশ্রীই ছিল, এই নিগ্রোটার স্বভাব। এত দুর্গুণের আধার যে তার শত শত লেজ ছিল বল্‌তে হবে বই কি।"

অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতে ছিল! আমি কায়মনে প্রার্থনা করিতেছিলাম আমার এই বিপদ হইতে রক্ষার একটা উপায় হউক। রমণী কি তাহার মন্তব্যের উত্তরে আমার নিকট হইতে কোনও বাক্য প্রত্যাশা করিতেছেন? যদি তাই হয় তবে আমাদের রহস্য অভিনয়ের এই খানেই যবনিকা পতন। শত শত লাঙ্গুলধারী, নিগ্রোর বিষয় আলোচনা সোজা কথা নয়। নিগ্রোদের বিষয় ভালরূপ জ্ঞান না থাকিলে তাদের নিয়ে সমালোচনা করা কোনও ভদ্র লোকেরই কর্ম্ম নয়। আগপাছ্ না ভাবিয়া এ বিষয় কিছু বলিয়া ফেলিলে তার—

সৌভাগ্য ক্রমে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রমণী বলিলেন—"নিগ্রোটার থাক্‌বার ঘরটা বেশ ভালই ছিল এক রকম। কিন্তু তার এমনি স্বভাব খারাপ ছিল যে, দিনটা একটু মেঘাচ্ছন্ন হলেই অমনি সে তার ঘর ছেড়ে একেবারে মেরিদের সামনে এসে উপস্থিত হতো। কিছুতেই তাকে আট্‌কিয়ে রাখা যেত না। কিন্তু তাঁরা সকলেই ওর এরূপ অত্যাচার সহ্য করতেন কারণ একবার ডার্লি মেরীর জীবন রক্ষা করেছিল? টমের কথা মনে আছে তোমার?"

"হাঁ বেশ মনে আছে। বেশ স্বভাবটী ছিল তার।

"সে বেশ ভাল লোকই ছিল। আর কি সুন্দর সন্তানটী তার জন্মেছিল।"

"তা তুমি বেশই বল্‌তে পার। এর চেয়ে সুন্দর শিশু আমি কখনও দেখিনি।"

"শিশুটীকে কোলে নিয়ে আদর করতে, নাচাতে, আমার এমন আমোদ বোধ হত।"

"আমিও তাকে খুব ভালবাসতাম।"

"তুমি ত তার নামকরণ করেছিলে? কি নামটা রেখেছিলে?"

আমার বোধ হইতে লাগিল যেন জমাট বরফ ক্রমেই তরল হইয়া আসিতেছে। শিশুটী ছেলে না মেয়ে তা না জানিয়া কি করিয়া বা একটা কল্পিত নাম বলি। যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে এমন একটা নাম মনে পড়িল যাহা ছেলে মেয়ে উভয়ের নামেই চলিতে পারে। তাই বলিলাম।

"আমি ওর নাম রেখেছিলাম, "Frances।"

"কোনও আত্মীয়ের নাম অনুসারে বোধ হয়। আচ্ছা, যে শিশুটী মরে গেছে ওর নামও ত তুমিই রেখেছিলে। ওটীকে আমি দেখিনি। ওর কি নাম স্থির করেছিলে?"

এইরে! এখন কি বলা যায়! আমার বিদ্যায় উভয়লিঙ্গে প্রযুজ্য নামের জ্ঞান ত আর নাই! যাহা হউক, ভাবিলাম যখন শিশুটী ইহলোকে আর নাই তখন একটা কোনও নাম ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারি। বরাতজোরে যদি বাঁচিয়াই চাই। এই ভাবিয়া বলিলাম—

"আমি সে ছেলেটীর নাম রাখিয়াছিলাম থমাস হেনরি।"

রমণী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "তাইত তাই বা কি করে হয়!"

আমি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলাম। কপাল বহিয়া শীতল ঘাম পড়িতে লাগিল। কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি। তবুও যদি রমণী অন্য কোনও শিশুর নাম দাবী না করেন তবেই রক্ষা! এর পর কোথায় যে আসিয়া বজ্রাঘাত পড়িবে তাহাই ভাবিতেছিলাম। রমণী তখনও সেই শিশুটীর সম্বন্ধেই মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সে কথা না তুলিয়া তিনি বলিলেন—

"তুমি সে সময় সেখানে ছিলে না, না হলে তোমাকে দিয়েই আমার ছেলেরও নামকরণ করাইতাম।"

"তোমার ছেলে? সে কি? তুমি কি বিবাহিত?

"সে তের বৎসরের কথা। এই যে ছেলেটি দেখছ ও আমারই সন্তান। আমার বয়সও ত কম হয় নি! ঝড়ের কথা যে বলছিলাম সেই দিন আমার জন্মদিন ছিল; তখনই আমার বয়স উনিশ হয়েছিল।"

রমণীর বয়স কত তাও ইহাতে ঠিক বুঝা গেল না। কবে যে ঝড় হইয়াছিল তাহাই আমি জানিতাম না। একবার ভাবিলাম বলি "তুমি কিন্তু এতদিনে একটুও বদলাও নি।" কিন্তু কে জানে হয়ত বা অনেক বদ্‌লেছেন। আবার ভাবিলাম বলি, "আগের চেয়ে অনেকটা ভাল হয়েছ তুমি!" কিন্তু তাই বা নিঃসন্দেহে কি করিয়া বলা চলে। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় রমণী বলিলেন,—

"সেই সব কথা মনে হলে কতই না আনন্দ হয়। আজ সেই পুরান দিনের কথায় কত সুখ পাওয়া গেল। কেমন তোমার সে কথা আলোচনা করতে বেশ আনন্দ বোধ হচ্ছে না?"

"আজ আধঘণ্টার আলাপ প্রসঙ্গে যত আনন্দ উপভোগ করেছি সারা জীবনে এমন করিনি।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা কি? যাহা হউক ইহার পর রমণীকে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইব ভাবিতেছি এমন সময় তিনি বলিলেন—কিন্তু একটা বিষয় নিয়া আমি বড়ই গোলে পড়েছি!"

"কেন কোন বিষয়?"

"সেই মৃত শিশুটীর নাম নিয়ে। কি নাম বলেছিলে তার?"

এইবার আবার এক মহা বিপদে পড়িলাম শিশুটীর নাম যে কি বলিয়াছিলাম তাহাই মনে নাই। নামটার যে আবার দরকার হইবে এ কথাত ত তখন মনে হয় নাই।—উপায়? যা হোক যা আছে অদৃষ্টে,—রমণীওত নামটা ভুলিয়া গিয়া থাকিতে পারেন, এই ভরসায় ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলাম—

"জোসেফ্ উইলিয়াম।"

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট ছেলেটী আমায় সংশোধন করিয়া দিল।

"জোসেফ্ উইলিয়াম নয় হেন্‌রি থমাস"

আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—

"ওঃ, ঠিক। আমি অন্য একটী ছেলের কথা ভেবে ও নামটা বলেছিলাম। অনেক ছেলেমেয়েরই নাম রেখেছি কি না, তাই কেমন একটা গোল বেধে যায়। ঠিক ঠিক ও ছেলেটীর নাম রেখেছিলাম হেন্‌রি থমপসন্।

"থমাস হেনরি।"

ছেলেটী আবার সংশোধন করিয়া দিল। পুনরায় তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম—

"থমাস হেন্‌রি; তাই থমাস হেন্‌রিই বটে। ওই নামই রেখেছিলাম তার। থমাস্‌টা মনে আসে—এই—এই—থমাস কারলাইলের কথা ভেবে। থমাস্ কারলাইল—এই যে বিখ্যাত সাহিত্যিক। আর হেনরিটা বাথি-ই—ই—টম হেনরির নামে। ছেলের বাপ মা নামটা শুনে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।—"

"এতেই ত আমি আরও গণ্ডগোলে পড়েছি।—"

"কেন কেন?"—

"ওর বাপ মা যখনই ওর কথা বলেন তখনই সুসেন এমিলা নামে অভিহিত করে থাকেন।—"

ষাঃ, এইবার আমার সমস্ত জারিজুরি ধরা পড়িয়া গেল। ইহার পর আর আমার কিছুই বলিবার রহিল না। যতই ভাবিতে লাগিলাম লজ্জায় যেন পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম। রমণী আমার যন্ত্রণা অনুভব করিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সেই সুখের দিনের আলাপে কি আমোদই না পেয়েছি আজ। তুমি প্রথমেই এরূপ ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগ্‌লে যে অচিরেই বুঝ্‌লাম তুমি আমাকে চিন্‌তে পার নাই, শুধু ভান করছিলে। ভাবিলাম এর শাস্তিটা তোমাকে দিতে হচ্ছে। সে শাস্তি তুমি কড়ায় গণ্ডায় পেয়েছ। তুমি যে জর্জ্জ, টম, ডার্লি এদের চিন্‌তে পেরেছ তাতেও খুব আমোদ বোধ করেছি। কেননা ওদের নাম আমিও জন্মে শুনিনি। আর শিশুদের কল্পিত নাম গুলির কথাও আমি ভুলতে পারব না। কেউ যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্ন করে যায় তবে তোমার কাছ

থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সংবাদ বের করে নিতে পারে দেখ্‌ছি। মেরি ও জর্জ্জের কথা আর ঢেউয়ে নৌকাগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কথা সত্য, বাকী সমস্ত তৈরি গল্প। মেরি আমার ছোট বোন তার পূরা নাম মেরি——কেমন এখন চিন্‌তে পারছো আমায় ?”

“হ্যাঁ এখন তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। তোমার হৃদয় তের বৎসর আগে যেমন কঠিন ছিল এখনও দেখ্‌ছি তার একটুও বদ্‌লায়নি। তা হলে কি এমন ভাবে আমায় শাস্তি দিতে পারতে। তোমার স্বভাবও যেমন বদলায়নি তোমার শরীরও তেমনি আগের মতই রয়েছে। তখন যৌবনে তোমাকে যেরূপ সুন্দর ও কমনীয় দেখাত—এখনও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে আর তোমার এই সুকুমার ছেলেটীও তোমার কমনীয়তা পেয়েছে। যাক্ যদি আমাদের অদ্ভুত প্রহসনের কথা তুমি একটুও মনে বেখে থাক তবে চল এই বেলা শান্তির নিশান উড়িয়ে দেওয়া যাক। আমি স্বীকার করছি আমারই সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে।—”

তখন আমরা পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া হাসিমুখে বিদায় লইলাম।

রমণী আমাকে ভাল করিয়াই জব্দ করিয়াছিলেন তাই আমি এর ষোল আনা ঝাল হ্যারিসের উপরে ঝাড়িতে চলিলাম।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধূরী।

বসন্ত বায়ুর প্রতি

১

বসন্তের ওগো সমীরণ —
সিন্ধু আর সিকতার নব জাগরণ,
অরণ্যে জাগালে আজি গাহিবারে গান,
মোরে মুক্তি দাও বন্ধু, সুপ্তি চাহে প্রাণ,
তটিনীর উরস শিহরে
তোমার সুগন্ধে ভরা নিশ্বাসের ভরে,
প্রতি উৎস কল স্বরে স্বাগত জানায়,
তরল কেতন দোলে পল্লবের প্রায়!

২

সমাহিত অদৃশ্য কুসুমে
স্পর্শ কর নাই তুমি স্বপ্নে কিম্বা ঘুমে,
জাগ্রত চঞ্চল করে নব জন্ম দিয়ে,
অশ্রান্ত সুরভি ধারা দিতেছ ঢালিয়ে!
কমল করিছে আবাহন
চম্পক সুরভিধূপে ছাইল গগন,
রুদ্ধ শুধু থাক বন্ধু, হৃদয় আমার,
নিবারি সকল ব্যথা নব চেতনার!

৩

মরণের স্মরণ আধার
মর্ম্মর বেদিকা কভু জাগেনাক আর,
তোমার ও আগমনে মলয় পরশে,
সেথায় জাগেনা ফুল নূতন হরষে!
কোকিলের আকুল কাকলি—
ব্যর্থ চিরদিন যেথা নিদ্রিত সকলি,
সেই বেদিকার মত আজিকে পরাণ।
রোদন বিলাপ নাই, নাই কলগান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

অজন্তা—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধে যে ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা উর্দ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত চিত্র-শিল্পের শেষ দীপাবলী যেখানে আজও বিচিত্র ছটা বিস্তার করিতেছে—বৌদ্ধ যুগের সেই অজন্তা গিরি-গুহায় আর বৈদ্যুতিক আলোকপ্রখর এই নব্য বাঙ্গালায় ব্যবধান বিস্তর—পথের ব্যবধান কালের ব্যবধান, সভ্যতা ভব্যতা উভয়েরই ব্যবধান; সুতরাং অজন্তার চিত্র-শিল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেটা দেখিয়া বোঝাও প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমান্ নন্দলাল ও অসিতকুমার প্রমুখ বাঙ্গালার তরুণ শিল্পিগণ অজন্তার তীর্থমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেই তীর্থ যাত্রারই ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হয় ত প্রাচীন ভারতের নির্ব্বাপিতপ্রায় সেই প্রদীপের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে—যে প্রদীপের শিখা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয় নয়নের পীড়াও দেয় না।"

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। লেখকের অনাড়ম্বর স্বচ্ছ সরল ভাষা মুক্ত প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে, সেই প্রবাহে আমরাও যেন আমাদিগের মনের তরীখানি ভাসাইয়া চলিয়াছি। সে তরী কোথাও আবর্ত্তে না পড়িয়া, অস্পষ্টতর জঙ্গলে বাধা না পাইয়া বজ্রনাদী উচ্ছ্বাসের পাহাড়ে ঘা না খাইয়া দিব্য লঘু গতিতেই ছুটিয়া চলিয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্য-মন্দিরের তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অজানা স্বপ্নলোকের মাধুরী-কুঞ্জে মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়! গ্রন্থকার বহু স্থানেই ভাষাকে যেন কথা কহাইয়াছেন,—গ্রন্থের বহু ছত্রে ভাবের ফুল বিচিত্র বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বর্ণনার ভঙ্গীটিতে এতটুকু মুরুব্বিয়ানা বা পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই; তাহা আগাগোড়া শান্ত সংযত শ্রীতে সমুজ্জ্বল। চিত্র-শিল্পকলায় গ্রন্থকারের প্রতিভা বসন্তের ফুলের মতই সুন্দরভাবে বিকশিত হইতেছে। রচনা-কার্য্যেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় গ্রন্থখানির সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে! গ্রন্থকারের ভাষা প্রকৃতই আর্টিষ্টের ভাষা, কবির ভাষা,—ভাবুকের ভাষা। সে ভাষার মধ্য দিয়া একখানি নির্ভীক, দৃঢ় ও শক্তি নির্ভর চিত্তের আভাস পাইতে বিলম্ব ঘটে না। গ্রন্থকারের শক্তির বিশেষত্বের কথা ইঙ্গিতে বলিলাম গ্রন্থের মধ্যে কি আছে পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন। সংক্ষেপে আমরা এইটুকু শুধু বলিয়া দিতেছি যে এই গ্রন্থ চিত্র-সাহিত্য-বিভাগে অমূল্য সামগ্রী। ইহা একাধারে প্রাচ্য কলাচিত্রের ব্যাখ্যা-পুস্তক ও সুললিত ভ্রমণ-কাহিনী এবং ভারতের গৌরবময় অতীতের এক কীর্ত্তির ইতিহাস। উপন্যাস অপেক্ষা এ গ্রন্থ অধিক চিত্তাকর্ষক। দর্শনীয় যাহা-কিছু সে সমস্তই বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরে লেখা বলিয়া মনে হয় না—মনে হয়, যেন চোখের সম্মুখে সে সমস্ত বিচিত্র বর্ণরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। গ্রন্থে অজন্ত গুহায় খোদিত উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে একখানি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত। যাঁহার প্রাচ্য চিত্র-কলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, প্রাচ্য চিত্রকলার বিশেষত্ব নির্ণয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে উপকৃত হইবেন, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই।

পরাগ—শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশ গুপ্ত, বি, এ, প্রণীত। কলিকাতা ১৩২০। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। মাসিক-পত্রের পাঠকের নিকট সুকবি গঙ্গাচরণ বাবুর নাম অপরিচিত নহে। এই গ্রন্থে ৪১টি খণ্ড কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি ভাব গম্ভীর, ভাষায় বলময়ী প্রকৃতির বেশ ছাপ পড়িয়াছে। কবির বীণায় বহু স্থলে উচ্চ সুরই, ধ্বনিয়া উঠিয়াছে,

কোথাও এতটুকু চটুলতা নাই। গ্রন্থের মূল্য কত, তাহা কোথাও লিখিত দেখিলাম না।

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত। ঢাকা নয়াবাজার হইতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ভাওয়াল, কাশীমপুর তালিপাবাদ, চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার * * অধিকাংশ স্থানই এখন মনুষ্য-বসতিশূন্য এবং শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় বনাকীর্ণ। কিন্তু ইহার অন্তরালে বহু শতাব্দীর প্রাচীন কীর্ত্তি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। হিউয়েন সাংয়ের বর্ণিত সমতট এবং কামরূপ রাজ্যের বহু বৌদ্ধ স্তুপের ভগ্নাবশেষ এই অরণ্যানীতেই বর্ত্তমান আছে, এইরূপ অনুমিত হয়; এবং এমন কি এই প্রদেশে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। গৌড়ের পালরাজবংশের অধঃপতনের সময় তদ্‌বংশীয় কোন কোন নৃপতি জলবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত পূর্ব্ববঙ্গের এই অংশে আগমন করিয়া কতিপয় খণ্ড-রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ এবং নগরাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি এই প্রদেশের বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ যুগের এই নিদর্শন দেশের ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ, সন্দেহ নাই।" এবং এই জন্যই তিনি এই গুপ্ত রত্ন উদ্ধারকল্পে সকলকে যত্ন লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাওয়ালের প্রাচীনত্বের আলোচনান্তে পালরাজগণের বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। বিষয়টি পরিপূর্ণ ভাবে আলোচিত হয় নাই—লেখক প্রবন্ধের মত সংক্ষেপেই দুই-চারিটি মাত্র কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; তবে যেটুকু তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইলেও, ঐতিহাসিকের নিকট তাহার মূল্য সামান্য নহে। আশা করি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার ভাওয়াল প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের সম্পূর্ণকাহিনী সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত করিয়া আপনার শ্রম সার্থক ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবেন।

কমলকুমার—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

সচিত্র আরব-ইতিবৃত্ত—হাফিজল হাসান প্রণীত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মহম্মদ্দল হোসেন দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থখানি সুলিখিত; লেখকের ভাষা সরল, আড়ম্বর-বর্জ্জিত, পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভালোই হইয়াছে। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যাকরণ-দোষ দুই-চারি স্থানে লক্ষিত হইল, গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম, সুতরাং তাহা ততটা ধর্ত্তব্য নহে। আশা করি, গ্রন্থকার সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি মোসলেম প্রদেশ-সমূহের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী ও ইতিবৃত্তাদি সঙ্কলন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

জৈনধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন, মন্ত্রী সর্ব্বধর্ম্ম পরিষৎ, কাশী। কলিকাতা লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। জৈন ধর্ম্মের আলোচনা বিষয়ক এই গ্রন্থখানি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। বিষয়টি জটিল হইলেও লেখকের সরল ভাষার গুণে দুরূহ হয় নাই।

সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার চন্দ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরণেন্দ্রকুমার চন্দ। ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। গ্রন্থখানির ভাষা সহজ। বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালা পড়ায় অবহেলা করিলে চলিবে না। এই ব্যাকরণখানি প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে মন্দ হয় নাই, তবে সকল স্থলে গ্রন্থকারের কথা সুবোধ্য হয় নাই; আমরা তাঁহার বক্তব্য বুঝিতেও পারি নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে এরূপ অস্পষ্টতা মার্জ্জনীয় নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিই,—"যদ্ তদ্ প্রভৃতি সর্ব্ব নাম শব্দগুলির বিভক্তির বহুবচনে যে যে রূপ হয়, সাধারণতঃ উহাদের পরে 'সকলে' এই পদটি বসাইয়া সপ্তমীর বহু বচনের রূপ করিতে হয়। যথা—আমাদের সকলে, যাহাদের বা যাদের সকলে ইত্যাদি।" "আমাদের সকলে"—এরূপ পদ শুদ্ধ নহে, এবং বাঙ্গালায় চলিত আছে বলিয়াও আমরা শুনি নাই। "আমরা সকলে"

'অর্থনীতি', 'অর্থশাস্ত্র', 'ইংরাজের কথা', 'সমসাময়িক ভারত'
প্রণেতা
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার।

কিম্বা "আমাদের সকলের" এইরূপ পদই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং গ্রন্থকার-প্রদত্ত এ সূত্রের অর্থ কি, তাহা বুঝিলাম না। লেখক সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। স্বাধীনভাবে বঙ্গ-ভাষার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ যে লিখিত হইতেছে না, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। অধ্যাপক ললিতকুমার এ দিকে নিপুণ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু আজও তাঁহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া মাথা ঘামাইয়া কেহ বঙ্গ ভাষায় ব্যাকরণ লিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া ত শুনা যায় নাই।

Child's Simple Grammar. (Anglo-Bengali)—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চন্দ প্রণীত। মূল্য ।৵৹ আনা ঢাকা। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এই শিশুপাঠ্য ইংরাজী ব্যাকরণ গ্রন্থখানি প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। সূত্রগুলি লেখক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন।

'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। ভারত মহিলা প্রেস, ঢাকা। মূল্য এক টাকা। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসারতা কি করিয়া বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক একটি ইতিহাস এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। কি করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারও বিবরণী আছে। গ্রন্থকার ও তাঁহার বন্ধুগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কতখানি উদ্যোগ-সহায়তা করিয়াছিলেন, স্ব-মতানুসরণে কতখানি একনিষ্ঠ ছিলেন, তাহার কাহিনীটুকু গ্রন্থকারের সহজ সরল ভাষায় অনাড়ম্বর বর্ণনা ভঙ্গিমায় সুন্দর ফুটিয়াছে। লেখকের নির্ভীকতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষহীনতা প্রশংসার্হ। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

শান্তিজল। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে সম্প্রতি যে দুইজন তরুণ কবি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতেছেন, ভবিষ্যৎ যাঁহাদের দিব্য সমুজ্জ্বল, করুণানিধান সেই দুইজন কবির অন্যতম। শব্দে চিত্রাঙ্কণ করিবার ক্ষমতা করুণানিধানের অপূর্ব্ব। তাঁহার ছন্দ ভাবের ফুল বুকে লইয়া শান্ত মধুর প্রবাহে বহিয়া যায়; কোথাও এতটুকু জটিলতা বা বাধা রাখে না। করুণানিধানের বীণায় যেন সুরের ফুলঝুরি ঝরিয়া পড়ে। এই গ্রন্থে আঠারোটি খণ্ড কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি বসন্তের ফুলের মত সুন্দর;—বর্ণে গন্ধে পরিপূর্ণ; কবির ভাষায়—thing of beauty, পাঠকের চিত্তটিকে মাধুরী-ধারায় স্নান করাইয়া তুলে; কিন্তু একটি ত্রুটি চোখে পড়ে। বহুস্থলেই কবি আত্মহারা হইয়া সৌন্দর্য্য সমাবেশে এতখানি মুক্তহস্ত হইয়াছেন যে কবিতাগুলির সৌন্দর্য্যভার বহিবার কতটুকু শক্তি আছে তাহার বিচার করিবার অবসর পান নাই। রাশি রাশি সৌন্দর্য্য জড় করিয়া তিনি অনেকগুলি কবিতাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে কবিতার মর্ম্মগত ভাবটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে;—সেইজন্য খণ্ড খণ্ড ভাবে কবিতাগুলি উপভোগ্য হইলেও পরিপূর্ণতার যে একটি দিব্য মূর্ত্তি আছে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। পরিমিত সংযমের অভাবে 'শান্তিজলে'র কয়েকটি কবিতায় এই দোষটুকু আসিয়া কয়েক স্থলে রসহানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাপি এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে কবিতাগুলি যে মধুর আনন্দদানের উপযোগী হইয়াছে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

সমসাময়িক ভারত—প্রথম কল্প। তৃতীয় খণ্ড। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিত ভূমিকা। প্রাচীন ভারতের মানচিত্র ও চিত্রাদি সহ মূল্য ১।৵৹। আমরা এই গ্রন্থাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা কালে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। তৃতীয় খণ্ডে সুবিখ্যাত আরিয়ানের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত বিস্তৃত পাদ-টীকাদিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডেও পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে। অতিরিক্ত পাদটীকায় গ্রন্থকার আলেক-জান্দার সম্বন্ধীয় বহু প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারের

মতামত প্রদান করায় গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থাবলী শেষ হইলে বঙ্গভাষার যে বিশেষ পুষ্টি সাধন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়া প্রীত হইলাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয়ের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশখানি করিয়া এই গ্রন্থাবলী ক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন। বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া বিদ্যানুরাগিতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীঃ

Orissa and Her Remains—by Babu Monmohon Ganguli.

সে দিন গিয়াছে যে দিন উৎকল-দেশের মহাবনের অন্ধকার হইতে উড়িষ্যা শিল্পের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল একটি একটি করিয়া স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল আমাদের জন্য বাহির করিতেছেন। উৎকল স্থাপত্যের যে শিল্প রাজেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যাহার সন্ধানে চলিয়া তিনি শ্রমকে শ্রম, বাধাকে বাধা বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, দুঃখের বিষয় সেই শিল্প তাঁহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত আর এ দেশের কাহারও মন তেমন করিয়া যে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা পাই নাই। আমাদের মধ্যে অনেকে অনেকবার উড়িষ্যা ভ্রমণে গিয়াছি এবং শ্রীমন্দির সকলের চূড়ায় নিজের নিজের কীর্ত্তি ধ্বজা উড়াইয়া দিয়া সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছি, কিন্তু তাহাতে হইয়াছে এই যে, না পাইয়াছি নিজেরা কিছু, না দিয়াছি অন্যকে এমন একটা কিছু যাহা কাযে লাগে।

যেখানে শিক্ষার্থির মত নম্রভাবে যাওয়া উচিত ছিল সেখানে আমরা গিয়াছি পাণ্ডিত্যের অভিমান লইয়া স্ফীত বক্ষে এবং তাহার ফলে হইয়াছে এই যে তর্ক ও মীমাংসা-জাল দিয়া আমরা নিজেকেও ঘিরিয়াছি, পরকেও অভিভূত করিয়াছি।

সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিক ভ্রমণকারিগণের মধ্যে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যা যাত্রা-কালে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ ঝুলিটি সঙ্গে না লইয়া, সরল দৃষ্টি, সহজ জ্ঞান ও রিক্ত অঞ্জলি লইয়া বাহির হইয়াছিলেন. সুতরাং শিল্প-লক্ষ্মীর অযাচিত দান তাঁহারই ভাগ্যে পড়িয়াছে এবং তিনি নিজে যাহা পাইয়াছেন তাহা তাঁহার এই সুবৃহৎ পুস্তকখানিতে সম্পূর্ণরূপে আমাদের দিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক এই শ্রেণীর পুস্তকের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নানা কার্য্যে বিব্রত থাকায় মনোমোহন বাবু প্রাচীন শিল্প চর্চ্চার তেমন সুযোগ পান নাই, নচেৎ আমরা তাঁহার নিকট হইতে এতদিনে আরও অনেক লাভ করিতাম নিঃসন্দেহ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আত্মসমর্পণ

(হাফেজ হইতে)

বাঁধিতে অবোধ হিয়া কোথা হতে এলো প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস,
তোমার নয়ন-ছায়ে স্বপনেরা গায়ে গায়ে
পরাণ হরিতে করে বাস।
তোমার কেশের তলে যূথিকা ফুটিয়া উঠে
আদীন প্রবালগুলি ও রাঙা অধরে লুটে
সুরার উজল তেজ শোণিতে শোণিতে ছুটে
মদালস তব মৃদুহাস॥
কে ছিটালে ফুলদল ঘেরি তব অঞ্চল
এত কেন আতরের বাস?
তোমার তোরণ তলে মলিন ধূলির মাঝে
রবি শশী শির দুটী লুকাক্ লুটাক্ লাজে
দিবস হউক ম্লান, জোছনা সে ম্রিয়মান
হোক্ আজি গোলাপ হতাশ।
মিছে-আভরণ ফেলি পিছে আবরণ ঠেলি,
কর তনু-তনিমা প্রকাশ।
তোমার গমন পথে পাতি দেই এই হিয়া
তোমার চরণ রাগ রুমালে মুছায়ে নিয়া
তোমার কপোল কূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া
ডুবিয়া মরুক্ তব দাস,
যাহা কিছু মোর আছে তোমার পায়ের কাছে
সঁপিয়া বাঁচিবে ফেলি' শ্বাস।

শ্রীকালিদাস রায়।

শোক সংবাদ

শরৎকুমার লাহিড়ি মহাত্মা রামতনু লাহিড়ির পুত্র। গত ১লা ফাল্গুনে ৫৫ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি। ইনি কলিকাতার একজন প্রধান পুস্তক-ব্যবসায়ী ছিলেন। বাংলা দেশে ব্যবসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা বড়মানুষ হইয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দাতা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। শুনা যায়, ইনি নিজের সাধ্যমত গরীব ছাত্রদিগের সাহায্য করিতেন। তাহাদের জন্য নিজ দোকান হইতে প্রতিদিন অন্তত ৫ খানি করিয়া পুস্তক বিতরণের বন্দোবস্ত ছিল, ইহা ছাড়া মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক বৃত্তিরও বরাদ্দ ছিল। ইনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় নব্বই হাজার টাকার সম্পত্তি—যাহার বাৎসরিক সুদ তিন হাজার টাকা,—দান করিয়া দেশের স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে খুবই ধনী লোক ছিলেন তাহা নহে, পুত্র কন্যাও তাঁহার অনেকগুলি,—এ অবস্থায় এই দানে তিনি যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন তাহা প্রকৃতই আদর্শস্বরূপ। দেশের সকলেরই নিকট এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ে দেশবাসীর এই কৃতজ্ঞতা যে পুণ্যসান্ত্বনা দান করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুত্রগণ পিতার আদর্শ গ্রহণে ধন্য হউন এই আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা।

শরৎকুমার লাহিড়ী

কন্যাদায়

কুমারী স্নেহলতার আত্মাহুতিতে দেশময় একটা হাহাকার পড়িয়া গেছে। এই হাহাকার যদি সত্যকার হাহাকার হয় অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র হুজুগ না হয় তাহা হইলে ইহা হইতে শুভফল যে ফলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন একটা বেদনা এতদূর তীব্র হয় যাহাতে দেশের সমস্ত হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠে তখন সে বেদনা কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না—তাহার প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী। স্নেহলতার পিতা মাতা আজ যে শোক পাইয়াছেন তাহা যদি সত্যভাবে আমাদের দেশকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা এখনই জোর করিয়া বলিতে পারি যে শোকের কারণ আর নাই—নইলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। এই শোক যেখানে সত্যভাবে গিয়া লাগিয়াছে সেখানে ফলও ফলিয়াছে—ইহার প্রমাণ আমরা সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি। বিনা পণে দুই একটী বিবাহ হইয়াছে।

কুমারী স্নেহলতার করুণ মৃত্যুঘটনা লইয়া বাংলাদেশের চারিদিকে সভা সমিতি বসিতেছে। স্থানে স্থানে অবিবাহিত যুবকগণের নিকট হইতে এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইতেছে যে বিনা পণে বিবাহ করিতে হইবে। এ সমস্ত চেষ্টার উদ্দেশ্য যে শুভ তাহা বলিতেই হইবে। কিন্তু দেশের সমস্ত অবিবাহিত যুবকের দ্বারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করানো কখনো সম্ভব হইবে না এবং যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতেছেন তাঁহারা সকলেই যে কার্য্যকালে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ অনেকবার এমন দেখিয়াছি যে যেমন তাড়াতাড়ি প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে তেমনি ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা ভঙ্গ করাও হইয়াছে। তাহা ছাড়া, দেশের দুর্দ্দশা দূর করা, প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করার মতো যদি এত সহজ কাজ হইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? দেশের মধ্যে যতরকম দুঃখ দৈন্য আছে তাহার বিরুদ্ধে একটা করিয়া প্রতিজ্ঞা ফরম ছাপাইয়া লইলেই তো উদ্ধার হইয়া যাইতাম। প্রতিজ্ঞা করাটা তো কিছু নয়—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার বল থাকাই আসল—সেই বল কি আমরা অর্জ্জন করিয়াছি? আমরা সব জিনিষকে ফাঁকি দিয়া সহজে এড়াইয়া যাইতে চাই বলিয়া বিপদের মতো ভয়ঙ্কর জিনিষও যখন সম্মুখে আসে তখনও ফাঁকির পথ খুঁজি। কিন্তু বিপদ তো কোনো কালেই ফাঁকা নয়, কাজেই সে ফাঁকি মানে না। কিন্তু তবুও একথা বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতেছেন তাঁহারা সকলেই না পারুন্ অন্তত কয়েক জনও তো প্রতিজ্ঞাপালন করিবেন। তাহা মন্দের ভালো বটে কিন্তু তাহার দ্বারা আমরা এই ঘোর দুর্দ্দশা হইতে যে মুক্তিলাভ করিব একথা স্বীকার করা যায় না।

কন্যাদায়ের দায় আমরা যতদিন স্বীকার করিব ততদিন এ দায় হইতে কাহারো সাধ্য

নাই আমাদের রক্ষা করে। কন্যাদায় আছে পুত্রদায় থাকিবেনা কেন? কন্যার বিবাহ দেওয়া কন্যার পিতার যেমন দায় পুত্রের বিবাহ দিবার দায়ও পুত্রের পিতার তেমনি—পুত্রের পিতাকে এই কথাটা স্বীকার করানো যায় না বলিয়াই না কন্যার পিতাকে এমন দীনভাবে পুত্রের পিতার দ্বারস্থ হইতে হয়।

কথা হইতেছে এই—পুত্রের পিতার অন্তরে পুত্রদায়ের তাগিদ নাই কেন? সে দিব্য আরামে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকে কন্যার পিতা তাহার বাড়ি আসিয়া সাধ্য সাধনা করে—সে যে এই দিব্য অধিকার-টুকু পাইয়াছে সে কিসের বলে? ছেলের বাপের প্রথম সুবিধা এই যে ছেলের বিয়ের বয়স লইয়া কোনো সামাজিক শাসন নাই। মেয়ের বাপের এক্ষেত্রে হাত পা বাঁধা;—মেয়ের একটু বয়স হইলেই পাড়াময় ঢি ঢি পড়িয়া যায়, সেইজন্য মেয়ের বাপকে কন্যার বিবাহের জন্য যত শীঘ্র উদ্বিগ্ন হইতে হয় ছেলের বাপকে তেমন নয়; ছেলে সমাজে থাকিয়া যতই কুকার্য্য করুক না, সমাজ তাহা নীরবে সহ্য করিবে কিন্তু মেয়ের বেলায় যদি পাণ হইতে চুণটুকু খসে তাহা হইলে সমাজ অমনি উগ্রমূর্ত্তি—কাজেই ছেলের বাপের পোয়া বারো। ছেলে ও মেয়ের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের যে এই তারতম্য ইহারই ফলে কন্যাদায়ের সৃষ্টি। ছেলেমেয়েকে যদি সমাজে সমান আদরযোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা হইলে এরূপ কন্যাদায় থাকে না।

এই সামাজিক সুবিধা ছাড়া ছেলের বাপের আর একটা বলিবার কথা আছে যে ছেলেকে সে শিক্ষা দিয়াছে, উপার্জ্জনক্ষম করিয়াছে। পুত্র সেখানে পুত্র+তাহার বিদ্যা, তাহার অর্থউপায়ের ক্ষমতা ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই+টুকুর বাজার দর আছেই এবং থাকিবেও। অঙ্কশাস্ত্রের বিধানে এই +এর পরে যতই অঙ্ক পড়িবে ততই তাহার মূল্য বাড়িবে। এই জন্যই দেখা যায় যে বি, এ-পাশ-করা ছেলের চেয়ে এম,এ পাশকরা ছেলের দর বেশী। তা ছাড়া জিনিষের চাহিদার মাপকাঠিতে জিনিসের দাম বাড়ে, কমে। একটা জিনিসের উপর যদি অনেক খরিদ্দার ঝোঁকে তাহা হইলে তাহার দাম বাড়িয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। সকল মেয়ের বাপ স্বভাবতই ভালো ছেলে, উপার্জ্জনক্ষম ছেলে খোঁজে, সেই জন্য এই শ্রেণীর ছেলের চাহিদা বেশী—কাজেই তাহাদের দামও অনেক। নইলে একেবারে মূর্খ ছেলে—যাহার বিদ্যাও নাই, বংশগৌরবও নাই এমন ছেলেকে এখনও প্রায় বিনা পয়সায় বা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিবাহের বাজারে ছেলের তত মূল্য নাই, যত মূল্য তাহার বিদ্যা ইত্যাদির। কারণ এই বিদ্বান ছেলেরই চাহিদা বাজারে বেশী।

আসল গোল এইখানেই—এই বাজার চাহিদা লইয়া। কেবল প্রতিজ্ঞাপত্রের স্বাক্ষর দ্বারা এই বাজার চাহিদাকে ঠেকানো যাইবে কেমন করিয়া? প্রতিজ্ঞাপত্র না হয় স্বাক্ষর করিলাম কিন্তু তাই বলিয়া যে মেয়ে এবং যতগুলি মেয়ে উপস্থিত হইবে তাহাকেই তো বিবাহ করা চলিবে না। একটি বিদ্বান ছেলের জন্য শত শত উমেদার জুটিবেই। তখন

সেই উমেদারের মধ্যে কোনো একজনের কন্যাকে বাছাই করিতে হইবে এবং সে বাছাই নির্ভর করিবে এখনো যেমন হইতেছে কন্যার দর বা কদরের উপর। এখনো তো দেখা যায় সুন্দরী মেয়ের বিবাহ অপেক্ষাকৃত সস্তায় সারা যায়। এখানে মেয়ের বাপেরা প্রতিজ্ঞাপত্রের দাবীতে নগদ টাকার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপ এক্ষেত্রে টাকার পরিবর্ত্তে এমন কিছু চাহিবেন যাহার মূল্য টাকার চেয়ে বেশী বই কম নয়—এবং যে সামগ্রী সকল পিতার ভাণ্ডারে নাই। যে পিতা তাহা জোগাইতে পারিবেন তাহারই জয়—অন্যের হায় হায়—এখনও মেয়ের বাপের যে দুঃখ তখনও সেই দুঃখ—শত শত প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার কোনো লাভ হইবে না।

এই জন্য বাজারে যেমন করিয়া ছেলের দর এবং ছেলের বাপের গুমর বাড়িয়াছে তেমনি করিয়া মেয়ের কদর এবং মেয়ের বাপের গৌরব বাড়াইতে হইবে—অর্থাৎ মেয়েকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে; বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে কর্ম্মে মেয়েকে ছেলের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে—ছেলের সহিত একাসনে বসিতে পারে এমন যোগ্যতা তাহাকে দিতে হইবে—সে যেন কিছুতেই হীন হইয়া না থাকে—তাঁহাকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে যে কেহ যেন মনে করিতে না পারে মেয়ে এদেশের ফেল্‌না জিনিস! বিবাহ সভায় বরের যেমন প্রয়োজন কন্যার প্রয়োজনও তো তদপেক্ষা কম নহে—তবে আমাদের দেশে ছেলের বাপ নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া সুখে নিদ্রা যাইবেন এবং মেয়ের বাপ হন্যে কুকুরের মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন কেন? ছেলের যেমন দেমাক আছে মেয়েরও তেমনি গৌরব বলিয়া একটা জিনিস আছে ইহা সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি না বলিয়াই এবং তাহাদের হীন করিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই মেয়ে লইয়া আমাদের লাঞ্ছনা এত। যদি সমানে সমান করিয়া তুলিতে পারি, তবে ছেলের বাপের চেয়ে মেয়ের বাপকে কিছুতেই খাটো হইয়া থাকিতে হইবে না। যে দেশে কন্যালাভ করিবার জন্য হরধনু ভঙ্গ করিতে হইয়াছে, লক্ষ্যভেদ করিতে হইয়াছে, যুদ্ধ জয় করিতে হইয়াছে সে দেশের মেয়ে যে সস্তার সামগ্রী নহে তাহাই মেয়ের বাপকে দেখাইতে হইবে; তবেই মেয়ের বাপের দুর্দ্দশা ঘুচিবে।

বরপণ

মানুষের যখন কোন একটা অভাব হয় তখনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারেরও একটা চেষ্টা জাগে, এটা অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন স্থলে আমাদের এমন জড়তা ধরে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও চক্ষু মেলিয়া চাহিতে ইচ্ছা করে না।

স্নেহলতার মৃত্যুর পর সভাসমিতিতে পুরুষেরা একদিকে আন্দোলন করিলেন বটে কিন্তু এই আন্দোলনে ফল হইল কতটুকু?—একবার অবনী আকাশ ঢাকিয়া একটা ঝড়ের মত উঠিল, তাহার পর সে ঝঞ্ঝা আবার শান্ত হইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর

শিক্ষিত-সমাজ পরিতাপে দগ্ধ হইয়াও এ পণ-প্রথা উঠাইতে পারিলেন না। ইহার কারণ কি?—সমাজে স্ত্রী-শক্তির অভাব। পিতামাতা যদি কন্যাকেও পুত্রের মত শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার চিন্তা অগ্রে রাখিয়া পরে তাহাকে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করেন তবেই এরূপ দুর্ব্বহ পণপ্রথার কঠোরতা শিথিল হয়।

দেখা যাইতেছে পাস-করা ছেলের জন্যই যৌতুক অছিলায় এই পণ জোর জবরদস্তি করিয়া লওয়া হয়। বার তের অথবা চৌদ্দ বৎসরের বোধোদয়-পড়া বালিকা ত আর দর্শন বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা বিদ্যাপারদর্শী যুবকের সমকক্ষ হইতে পারে না। যে সকল কন্যা সুন্দরী তাহারা সৌন্দর্য্যের দরে বিকাইয়া যায়, কিন্তু যাহারা তেমন সুন্দর নহে, তাহারা কি গুণে পাত্রের আদরযোগ্য হইবে? কাজেই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বরপণ দিতে হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার কন্যাকে সুশিক্ষিতা করা। ইহাতেই পাত্রের নিকট তাহার আদর বৃদ্ধি হইবে। ইহার ফলে কন্যাপক্ষীয়দিগের দিক হইতে পাত্র "অনুসন্ধান" পরিবর্ত্তে, পাত্রপক্ষই পাত্রীর সন্ধান করিবে। ইহাই হওয়া উচিত। উত্তর পশ্চিমে কোন কোন হিন্দুজাতির মধ্যে এখনও এইরূপ হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস কন্যাকে সুশিক্ষিত করিলে কালে বরপণের স্থলে মেয়েপণের দিন আসিবে। তখন উভয় পক্ষের পিতামাতাকে সমানভাবে পণ করিতে হইবে যে পুত্রকন্যা কাহারও বিবাহে পণ লইব না।

পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে এরূপ পণের কঠোরতা ছিল না, ইহা সকলেই জানেন। তখনকার কন্যাবধূরা অলঙ্কার ও যৌতুকের ভার বহিয়া লইয়া না গেলেও কেবল নিজ গুণে ও কর্ত্তব্য পালনে শ্বশুরালয়ে সকলের প্রিয় হইয়া সুখী হইতেন। তখনকার পুত্রেরা কি এখনকার মত শ্রীমান ধীমান ছিলেন না? তখনকার গুণবান পুত্রের জন্য কেবল সুলক্ষণা অর্থাৎ গুণবতী কন্যা সদ্বংশের হইলেই যথেষ্ট হইত। এই পবিত্র উদ্বাহকার্য্য যে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের সোপান, এই ভাবটি বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইয়া, ইহা ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিনিময় স্বরূপ সমাজে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। যে বিষে জর্জ্জর হইয়া, বাঙ্গালী মাত্রেই কেবল কাঁদিয়া কাটিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন আজ সেই বিপদের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ একটি নিরপরাধ কোমল জীবন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে; সেই ভস্মরাশির অণু পরমাণু প্রত্যেক নিঃশ্বাসে আমাদের মর্ম্মের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বরপণপিপাসু দেবতাদের "স্নেহলতার" বলিদানে যদি পরিতৃপ্তি না হইয়া থাকে তবে কিছুতেই সমাজে সে রীতির অনুষ্ঠানে পাষাণ-প্রাণ কম্পিত হইবে না। এই দুঃসময়ে গৃহের শক্তিময়ীগণ যদি দুঃখের শান্তিস্বরূপা হইয়া একপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করেন যে মেয়েকে বড় করিয়া বিবাহ দিব, এমন কি চিরকুমারী রাখিব সেও স্বীকার তবু পণ দিব না, তবেই স্নেহলতার আত্মহত্যা সার্থক হইবে। মেয়েকে বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া বা চিরকুমারী রাখা আমাদের দেশে তো নূতন জিনিস নহে—সেকালে কুলীনের ঘরের অনেক মেয়ে পাত্র অভাবে তো চিরকুমারীই থাকিত। এখন যদি দরকার হয় তো তাহাদের চিরকুমারী রাখা যাইবে না কেন? মেয়েরা শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলে বিবাহ না হইলেও তাহাদের জীবনে কার্য্যের অভাব হইবে না। সুতরাং কন্যা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহার বিবাহের ভাবনায় আকুল না হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য পিতামাতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন। এই প্রতিজ্ঞাতে কেবল ব্যক্তিগত দুঃখের নিষ্কৃতি নহে—জাতিগত দুঃখ নিবারণের পথ মুক্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আগামী বৎসরের ভারতী

১। আগামী বৎসরে যাঁহারা ভারতীর গ্রাহক থাকিতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ভারতীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবেন—যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে না চাহেন অনুগ্রহ করিয়া সে কথা ১৫ই চৈত্রের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নিষেধপত্র না পাইলে আমরা বৈশাখের ভারতী ভি, পিতে পাঠাইব।

১। আগামী বৎসরের ভারতী প্রবন্ধ-গৌরবে ও প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য যাহাতে অতুলনীয় হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। যাহাতে বাছাই-করা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবার বেশী করিয়া থাকে তাহার আয়োজন হইতেছে। ছবি যেমন চলিতেছে তেমনি চলিবে।

৩। ১৩২১ সালে তিনখানি নূতন উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইবে। তন্মধ্যে একখানি গার্হস্থ্য চিত্র—"স্রোতের ফুল"—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, প্রণীত, ও অপরখানি জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা প্রণীত—"লাইকা"—হিন্দী গাথা অবলম্বনে রচিত সুমধুর রোমান্স। আর একখানি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এল কৃত। ইহা ছাড়া শিল্প সাহিত্যের ওস্তাদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত আর্ট সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ কয়েক মাস ধরিয়া বাহির হইবে। এই প্রবন্ধে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের অনেক অজানা তথ্য প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাল্যজীবনী ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবে তাহাতে অনেক সেকালের কথা থাকিবে। এবং বিখ্যাত বিদেশী নাটক ও গল্পের অনুবাদ মধ্যে মধ্যে থাকিবে। সম্পাদিকা মহাশয়ার রচনা, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফরাসী সাহিত্যের চয়ন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বার-য়্যাট-লর গম্ভীর ও হালকা রচনা, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের প্রত্নতত্ত্ব, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির ছোট গল্প, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণের কবিতা ও অন্যান্য বিখ্যাত লেখকগণের লেখা নিয়মিত দেওয়া হইবে। গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশী সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে বিবিধ চয়ন থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ মুদ্রিত হইবে।

কলিকাতা ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।